

ধীমান দাশগুপ্ত সম্পাদিত

# চলচ্চিত্রের আভিধান

---



# চলচ্চিত্রের অভিধান

সম্পাদনা

ধীমান দাশগুপ্ত



প্রথম প্রকাশ

অক্টোবর ১৯৮১

দ্বিতীয় পরিবর্তিত সংস্করণ

ডিসেম্বর ১৯৯৬

দ্বিতীয় মুদ্রণ

সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

তৃতীয় মুদ্রণ

মার্চ ২০০০

© দীমান দাশগুপ্ত

প্রকাশক

অবনীন্দ্রনাথ বেরা

বাণীশিল্প

১৪এ টেমার লেন

কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর

অরিন্দিৎ কুমার

টেকনোগ্রিফ

৭ স্ট্রিটের দস্ত লেন

কলকাতা ৭০০ ০০৬

তিনশো পঞ্চাশ টাকা

## লেখকসূচি

অমিয় বসু  
রয় আৰ্মস্  
ইরাবান বস্‌রায়  
দেখর চক্রবৰ্তী  
জে. এইচ.  
আলান ক্যাণ্ডি  
গোপা সেনগুপ্ত  
আলবার্ট জনসন  
এন. জোরকায়া  
ল্যাংডন ডিউই  
দিলীপ মুখোপাধ্যায়  
ধীমান দাশগুপ্ত  
ধীরেশ ঘোষ  
ফ্রব গুপ্ত  
পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়  
পূৰ্ণেন্দু পত্নী  
প্রদীপ বিশ্বাস  
প্রলয় শূর

ডব্লিউ. এইচ. প্রাইস  
আইলিন বাউজার  
ডি. বি.  
বিপ্লব মাজী  
বীতশোক ভট্টাচার্য  
বীরেন দাশশর্মা  
ত্রিগরি ত্রিতিক্ত  
মিহির সেনগুপ্ত  
মৃগাঙ্কশেখর রায়  
জে. এফ. ম্যার  
রঘুনাথ গোস্বামী  
রজত রায়  
রণজিৎ রায়  
গান্ত' রোবেৰ্জ  
ড. টি. ল্যালি  
সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়  
সোমেন ঘোষ  
ডগলাস স্নকোষে

অনুবাদ

অজয় সরকার  
তপন মান্নাল  
পবিত্র বল্পত  
বীরেন চক্রবর্তী  
সুখিতা ভট্টাচার্য  
হীরেন্দ্র চক্রবর্তী

অলংকরণ

প্রণবশ মাইতি

প্রচ্ছদ

প্রণবশ মাইতি  
সঞ্জয় সেনগুপ্ত

স্বীকৃতি

আন্তর্জাতিক আঙ্গিক  
চিত্রকল্প  
চিত্রবীক্ষণ  
মুভি মনতাজ  
দি স্টেটসম্যান  
দি হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড  
ইউ. এস. আই. এস.  
ফিল্ম ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়া  
সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা  
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য  
রবি দত্ত  
সুভাষ পাল  
সোমেশ্বর ভৌমিক  
স্বপন মল্লিক  
ডরোথি হাওয়ার্ড

চলচ্চিত্রের অভিবান। চলচ্চিত্রের সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে জড়িত ৩৯০টি বর্ণাত্মকমিক প্রসঙ্গের এক সংকলন। এর মধ্যে ছবি ৭০, ছবির ধরন ২৫, চলচ্চিত্রের বিভিন্ন শাখা ১২, টেকনিক ২৫, টেকনোলজিকাল প্রসঙ্গ ২১, চিত্র-সম্বোধনাকারী দেশ ২৩, চিত্রপরিচালক ১১২, কলাকুশলী শিল্পী সমালোচক ইত্যাদি ১১১, চলচ্চিত্রের তত্ত্ব ও তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ ১৪, চলচ্চিত্রের সঙ্গে অস্থান প্রসঙ্গের মিথস্ক্রিয়া ১৫, এবং বিবিধ অনুষঙ্গ ২৯। বাংলায় এমন কোনো অভিধান নেই, অথ কোনো ভারতীয় ভাষাতে আছে বলেও জানি না। তবে আছে বিভিন্ন বিদেশী ভাষায়। সেই সব অভিধান বা চলচ্চিত্রকোষ থেকে আমাদের এই গ্রন্থ নির্বাচন, সংকলন ও সম্পাদকীয় নীতিতে কিছুটা আলাদা, যা ব্যাখ্যা করা দরকার।

প্রথমত এই গ্রন্থ শুধুই তথ্যগত নয়, তারই সঙ্গে তত্ত্বগতও। ফলে নির্বাচনে নির্বাচন না করে এন্ট্রি বাজা হয়েছে হাত শক্ত করে। অপরিহার্য নয় এমন কিছু বিয়্য বাদ পড়েছে, আবার এমন অনেক তাত্ত্বিক, টেকনোলজিকাল ও ইন্টার-অ্যাকশনাল প্রসঙ্গ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যা এই ধরনের অধিকাংশ বিদেশী বইতেও নেই। চলচ্চিত্রের শিল্পরূপ, চলচ্চিত্রে রঙের ব্যবহার, সাদা কালো ও রঙিন নেগেটিভ ফিল্ম, চিত্রকলা ও চলচ্চিত্র, নৃত্য ও চলচ্চিত্র, তথ্যচিত্রাংশ প্রভৃতি তার সামান্য কয়েকটি উদাহরণ। চলচ্চিত্রের ইতিহাস এবং ফিল্ম টেকনিক, ফিল্ম সেস ও ফিল্ম এ্যাপ্রিসিয়েশনের বিভিন্ন দিকের কথা মনে রেখেই এন্ট্রি বেছেছি। তবে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সম্পাদনা বলে তো কিছু হয় না তাই নির্বাচনের সময় পাঠকের প্রয়োজন ও যুগরুচির পাশাপাশি ব্যক্তিগত মতাদর্শ ও বিবেচনাকেও মূল্য দিয়েছি। তাই বাণিজ্যিক ও হলিউডের ছবির চেয়ে বেশি জোর পড়েছে যুরোপীয় ও সিনিয়স ফিল্মের ওপর। সেটা জরুরি।

দ্বিতীয়ত নির্বাচিত প্রসঙ্গ নিয়ে লেখার সময়েও তথ্যমূলকতা, কলাকৌশল, তত্ত্ব ও নান্দনিকতা প্রতিটি দিককেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। স্বভাবতই প্রসঙ্গটি কী তার ওপর নির্ভর করেছে কোন্ দিকটার প্রতি বেশি জোর দেওয়া হবে তা। কার্কে দিয়ে কোন্ প্রসঙ্গ লেখানো হবে ও প্রকাশিত রচনার কোন্ কোন্ অংশ গৃহীত ও অন্তর্বাদিত হবে তাও নির্বাচন ও রচনার পূর্বোক্ত নীতির সঙ্গে সমন্বিত।

কিছু কিছু রচনার শেষে তৃতীয় বন্ধনীতে সম্পাদকীয় সংযোজন তাই এই বইয়ের সামগ্রিকভার পক্ষে দরকারি।

তৃতীয়ত সমালোচকরা ও তাঁদের রচনা। এই বইয়ে ৩৬ জন সমালোচককে স্থান দেওয়া গেছে, এর মধ্যে ২৩ জন বাংলায় চলচ্চিত্র বা অস্ত্রাণ্ড বিষয় নিয়ে লেখালেখি করছেন বছদিন হলো। এঁদের অনেকেই চিত্রসমালোচক রূপে প্রতিষ্ঠিত, বিভিন্ন পত্রিকার সাথে যুক্ত। বাকি ১৩ জন বিদেশী, যার দু'জন সিনে-টেকনোলজিতে পৃথিবীর দুই সেরা বিশেষজ্ঞ—ড. টি. 'ল্যান্ডি ও ডবলিউ. এইচ. প্রাইস; অস্ত্রাণ্ড পেশাদার চিত্রসমালোচক বা নিয়মিত লেখক। বাঙালি ও অভ্যন্তরীণ লেখকদের পাশাপাশি রেখে অভিধানটিকে এইভাবে এক আন্তর্জাতিক চরিত্র দিতে পারা গেছে। গৃহীত রচনার বেশ কয়েকটি গত ত্রিশ বছরে পশ্চিমবঙ্গেরই বিভিন্ন চলচ্চিত্র পত্রিকায় প্রকাশিত, তা থেকে আমাদের এখানে চলচ্চিত্রচর্চার বিষয়ে একটা আন্দাজ পাওয়া যাবে। অস্ত্রাণ্ডে এই গ্রন্থ উপলক্ষে লেখা ও লেখানো। নানান বিষয়, ধরন ও মেজাজের এই সব রচনা ক্রম রেফারেন্সের মাধ্যমে প্রায়ই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। কোনো কোনো তথ্য এক জায়গায় না থাকলে অন্য জায়গায় লভ্য। যেমন অ্যান্ডারসন বিষয়ক কোনো তথ্য হয়তো পাওয়া যাবে গ্রেট ব্রিটেন বা চলচ্চিত্র সমালোচনার মধ্যে। ইত্যাদি।

চতুর্থত রচনার আকার। অস্ত্রাণ্ড লেখার তুলনায় কয়েকটা লেখা আকারে দীর্ঘ। দীর্ঘ এই কারণে যে সেই এনট্রিকে একক এনট্রি না রেখে তার সাহায্যে সিনেমার বিশেষ কোনো অঙ্গুষ্ঠকে উদঘাটিত করা হয়েছে। যেমন 'টোলাণ্ড' শুধু চিত্রগ্রাহক হিসেবে আসেননি, তাঁকে দিয়ে ক্যামেরা ভাষার একটা গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় বর্ণনা করা হয়েছে। 'নৃত্য ও চলচ্চিত্র' তথ্যচিত্র, সমাজতত্ত্ব ও চিত্র-সমালোচনা প্রদর্শেও উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছে। একটা দেশকে প্রতিনিধি হিসেবে নিয়ে সিনেমার ধরন ও প্রকরণের পরিবর্তন, পরিমার্জনা ও বিবর্তন কীভাবে হয়েছে তা দেখিয়েছে 'ফ্রান্স'। শিল্প রহস্য ও কৌশলের কী রকম সম্মেলন তা বলা গেছে 'বার্গম্যান'-য়ে। তাঁকে আমি এই বইয়ের কেন্দ্রীয় শিল্পী রূপেও ধরেছি, কলাকুশলী, অভিনেতা / অভিনেত্রী ও চিত্র নির্বাচনে তার ছাপ পড়েছে। 'ব্যাটলশিপ পটেকিন' ছবির গঠন ও চলচ্চিত্রের নাটকীয় অভিঘাত সম্বন্ধেও মূল্যবান বিশ্লেষণ দেয়। চলচ্চিত্রে ভাবনাশ্ফীতি, মাধবী মুখোপাধ্যায়, মৃগাল সেন, ম্যাকলারেন, চলচ্চিত্রে রঙের ব্যবহার প্রভৃতি এই রকমই একক এনট্রি হয়েও অস্ত্রাণ্ডে কোনো অঙ্গুষ্ঠের উদঘাটক।

পঞ্চমত সম্পাদকের ব্যক্তিগত বক্তব্য। কতগুলি পূর্ণাঙ্গ এনট্রি নয়, উল্লেখ মাত্র,

সেগুলি অমূল্য আলোচিত, যেমন অ্যারিক্লেক্‌স্‌ ক্যামেরা, পথের পাঁচালী, ইত্যাদি। গুরুত্বপূর্ণ এনুট্রির নিচে ইংরেজিতে বা বাংলায় প্রকাশিত প্রাসঙ্গিক গ্রন্থের নাম দেওয়া আছে। সেন্সরশিপ এনুট্রি প্রদর্শনে বলতে চাই সেন্সরের নিয়মবিধির প্রয়োগে জনসাধারণের অধিকারে আমি বিশ্বাসী, যে প্রসঙ্গ এসেছে চলচ্চিত্রে ভাবনাস্বীতি, মেয়েদের বিরুদ্ধে সিনেমা ও আর দু একটি এনুট্রিতে। উচ্চারণ নিয়ে দ্বিমত থাকবেই। আর্ভা গার্দ না আউ গার্দ? ওফালস না ওফুলস? জেনিংস না য়ানিংস? ডভঝেক্সো না দভঝেক্সো? মিজোগুচি না মিকোগুচি? ও এই রকম বহু। গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত চারজন সমালোচক যারা ফরাসি, জার্মান, রাশিয়ান ও ইতালিয়ান ভাষার কোনোটা না কোনোটা জানেন তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে উচ্চারণের ব্যাপারে যা ভালো বুঝেছি, করেছি। আর কোনো ইংরেজি শব্দ যখন বাংলায় লিখেছি তখন আমরা সাধারণ বাঙালিরা যেভাবে উচ্চারণ করি সেভাবেই লিখেছি। ইচ্ছে থাকলেও কয়েকটা সনতারিখ অনিবার্য কারণে যথাস্থানে দেওয়া যায়নি। যেমন আলিয়ার জন্মসন ১৯২৮, ইভেনের মৃত্যু ১৯৮৯তে, ওয়েলেনের ১৯৮৫তে, গুণের ১৯৮৪তে, এখানে বলা দরকার, ভারতীয় অভিনেত্রীদের জন্মসন সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য ভাবে পাওয়া মুশকিল (যেমন মাধবীর জন্ম ১৯৪৩-য়ে না ১৯৪০য়ে?)।

সবশেষে কিছু ফর্মাল কথাবার্তা। বইটি পড়লেই বোঝা যাবে আমাদের এই বই আকাদেমিক দৃষ্টিভঙ্গির ও সাধারণীকরণের বিরোধী। চলচ্চিত্র জহুশীলনে ফিল্ম সেন্সর গুরুত্ব ও সিনেমা বিষয়ক রচনায় ক্যানডিজ রীতির সম্ভাবনা, এই বই বিষয়ে আমাকে প্রথম অবহিত করান যথাক্রমে ভূপেন্দ্রনাথ সাংখ্যাল ও ড. টি. ল্যালি, এই বই ওই ভাবধারার অনুসরণ, আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। প্রথম সংস্করণে যারা সহ সম্পাদক ছিলেন তাদের ধন্যবাদ। গ্রন্থ সম্পাদনা ও প্রয়োজন্য প্রতিটি পর্যায়ে পরামর্শ করতে পেরেছি রজত রায় ও অমিয় বহুর সঙ্গে। এ তাঁদের বদান্ধতা। এই বইয়ের যেটুকু সাফল্য তার পেছনে এঁদের প্রত্যেকের অবদান রয়েছে। ব্যর্থতা যদি থাকে তার দায়িত্ব পুরোপুরি আমার। অস্বাক্ষরিত সমস্ত লেখা আমার লেখা, ভাইদা, ভূমিকা, রোজেলিনি, খাত্তল, স্মৃথদেব ছাড়া। লেখকদের ইচ্ছানুসারে এই কটি লেখা অস্বাক্ষরিত রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের এনুট্রি ও বিভিন্ন লেখক বলে এই গ্রন্থে রচনার কোনো প্রোটোটাইপ হাঁচ বা ধাঁচ অনুসরণ করা হয়নি। যারা চান প্রতিটি এনুট্রি হবে স্লট মেশিন থেকে বেরিয়ে আসা কার্ডের মতো ‘uniform and consistent’, একই রকম চকচকে ও ঝকঝকে, একই আকার ও মানের, তারা নিরাশ হতে বাধ্য। আমি আলোচনা করতে ও করতে

চেয়েছি খুলে মেলে, এগিয়ে পেছিয়ে, উঠে নেমে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে, যাতে পাঠক প্রথম থেকেই সেই আলোচনার অংশীদার হয়ে উঠতে পারেন। বাণীশিল্পের একটি বই সম্পর্কে বলতে গিয়ে নীহাররঞ্জন রায় লিখেছিলেন, এসব ভৌ পাণ্ডিত্যের কথা, কিছুটা বোধহয় রুচিরও, এবং সেক্ষেত্রে (মৌলিক রচনায়) মতভেদ, এমনকি তথ্যভেদও বোধহয় প্রায় অনিবার্য। কথাটি খুব মূল্যবান, কেননা আমাদের দেশের অধিকাংশ সমালোচকের ধারণা তথ্য হবে অটল অনড় নিষ্কম্প নিখুঁত, সমস্ত ভেদাভেদের উর্ধ্বে। কিন্তু একাধিক বিদেশী কোষগ্রন্থ পাশাপাশি রেখে পড়তে গেলেই দেখা যায় বিস্তর তথ্যভেদ ঘটছে। মতভেদের ক্ষেত্রে বলতে হয় লেখক বা সম্পাদকের নিজস্ব মত অনুসারে কোথাও কোথাও বিতর্কিত মন্তব্য আনবেই। পাঠক দেখবেন, সেক্ষেত্রে আলোচনা ওইসব মন্তব্য-নির্ভর না মন্তব্য-জুলিই আলোচনা-প্রসূত। যেটাই হোক না কেন, দ্বিতীয় মতের অবকাশ থাকছেই। স্নাত্য ভুল মনে নেওয়া, স্নাত্য সমালোচনার উত্তর দেওয়া ও নিজের মতকে ডিফেন্ড করা : এ-ছাড়া সম্পাদকের আর কী করণীয় থাকতে পারে !

বাঙালি পাঠকের ক্রয়ক্ষমতার কথা মনে রেখে এই গ্রন্থ একটি নির্দিষ্ট আকার ও গুল্যের মধ্যে সীমায়ত রাখতে হয়েছে। ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোনো-কোনো এনট্রি বাদ দিতে হলো। যেমন ব্যক্তিনামের ক্ষেত্রে পরিচালক, চিত্রগ্রাহক, অভিনেতা-অভিনেত্রী ও সমালোচকদের অনেককে স্থান দেওয়া গেলেও সম্পাদক, শিল্প নির্দেশক ও সংগীত পরিচালকদের স্থান দেওয়া যায়নি। সম্পাদক ও প্রকাশক এক্ষেত্রে নিরুপায়।

চিত্রপরিচিতি দিয়েছি বইয়ের শেষে, ছবিগুলো ১৬টা, ১৬টা করে দু জায়গায় দেওয়া আছে। ভূমিকায় এর বেশি আর কিছু আপাতত বলার নেই। কারো কিছু বক্তব্য থাকলে আমি জানতে আগ্রহী, প্রথম সংস্করণ বিষয়ে বিভিন্ন মতামত এই সংস্করণের কাজে লেগেছে, এই সংস্করণ বিষয়ে কোনো-কোনো মত পরবর্তী সংস্করণে হয়তো কাজে আসবে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী স্মরণে

## বিষয়সূচি

<u>ছবির নাম</u>	১৪৭	খণ্ডসংখ্যা
অক্টোবর	১৭	১৫৫ গান্ধী
অপু-জয়ী	১৭	১৬৪ গুপ্তী গাইন বাঘা বাইন
অয্যাজিক	২৭	১৬৮ গোল্ডরাশ
অয়দিপাউম রেক্স	৩০	১৬৯ গ্যাব্রিকা
আই ভান দি টেরিবল্	৩৯	১৬৯ গ্রিড
আকালের সন্মানে	৪০	১৭৩ দি গ্রেট ডিক্টেটর
ল' আভেস্তুরা	৫৪	১৭৬ গ্র্যাণ্ড ইনুশন
আমবার্টো ডি	৫৫	১৯২ চারুলতা
আলেকজান্ডার নেভ্‌স্কি	৬২	২১৮ জুল অ্যাণ্ড জিম
অ্যাশেজ অ্যাণ্ড ডায়মণ্ডস	৬৬	২২২ জ্যাকিঙ্কি পয়েন্ট
ইকিরু	৬৬	২২৫ ২০০১-এ স্পেস ওডিসি
ইনটলারেন্স	৭২	২২৯ টোকিও অলিম্পিয়াড
ইফ	৭৪	২৩৯ ডেথ ইন ভেনিস
উইক-এণ্ড	৮৪	২৭২ লা দোলচে ভিতা
উগেৎসু মোনোগাতারি	৮৫	২৭৫ লা নস্তে
এইট অ্যাণ্ড হাফ	৯০	২৭৫ নাজারিন
এ ম্যান অ্যাণ্ড এ ডায়ম্যান	৯৫	২৭৮ নানুক অব দি নর্থ
এপিপাথাইয়াম	৯৫	২৯৩ পথের পাঁচালী
ওকা উরি কথা	৯৫	২৯৮ পারসোনা
ওয়াইল্ড স্ট্রবেরীজ	১০০	৩০১ পিয়েরো লো ফু
কল্পনা	১১৩	৩০৯ প্যাশন অব জোয়ান অব আর্ক
কাগেমুশা	১১৫	৩১০ প্রফেসর মামলক্
দি কানাল	১১৭	৩৩৬ ফ্যানি অ্যাণ্ড আলেকজান্ডার
দি কিড	১২৪	৩৫০ বনি অ্যাণ্ড ক্লাইড
দি ক্যাভিনেট অব		৩৫১ বাইশে শ্রাবণ
ডক্টর কালিগারি	১৩৪	৩৫১ বাইসাইকেল থীভ্‌স্

বার্থ অব এ নেশন ৩৬৩	১২১ কাটুর্ন ছবি
বেল ছ জুর ৩৭৮	১২৩ কাহিনীচিত্র
ব্যটল অব আলজিয়ারস ৩৮০	২০৩ চেম্বার ছবি
ব্যটলশিপ পটেমকিন ৩৮১	২৩৭ ডিরেক্ট সিনেমা
ভূমিকা ৪০৭	২৪৬ তথ্যচিত্র
মিয়াকল ইন মিলান ৪৩৮	২৭৯ নিও-রিয়ালিজম্
মেট্রোপোলিস্ ৪৫২	২৮৬ হুভেল ভাগ
মেফিস্টো ৪৫৪	৩০৯ প্রচারমূলক ছবি
রশোমন ৪৮৩	৩২৬ ফিল্ম নয়্যার
দি রুল্‌স্ অব দি গেম ৪৯০	৩৩৫ ফ্যানটাসি-ছবি
দি র্যাট ট্র্যাপ ৫০৮	৩৬৭ বিমূর্ত ফিল্ম
লাস্ট ইয়ার এট মারিয়েনবাদ ৫১৫	৩৯০ ব্লু ফিল্ম
লা শিনোয়াজ্ ৫৩৩	৪২৯ মিউজিক্যাল ছবি
সিটিছেন কেন ৫৮৮	৫৪২ শিশুদের জন্ম ছবি
স্ববর্ণরেখা ৫৯৭	৫৮১ সার-রিয়ালিজম
সেভেন সামুর্নাই ৬০৫	৫৮৯ সিনেমা ভেরিতে
দি সেভেন্‌স সীল ৬০৬	
স্টকার ৬২৪	
হিরোশিমা নন্ আনুর ৬৪৮	<u>চলচ্চিত্রের বিভিন্ন শাখা</u>
হ্যামলেট ৬৪৯	২৩ অভিনয়
	২৫ অভিনেতা
<u>ছবির ধরন</u>	৪০ আঙ্গিক
অপেরা ছবি ১৮	১৩৭ ক্যামেরাভাষা
আণ্ডারগ্রাউণ্ড চলচ্চিত্র ৪১	১৪০ ক্যামেরাম্যান
আউ গার্ড ৫৩	১৯৭ চিত্রনাট্য
অ্যাকশন প্রধান ছবি ৬২	২২৬ টেলিভিশন
অ্যানিমেটেড ফিল্ম ৬৪	২৯৪ পরিচালক
এক্সপ্যাণ্ডেড সিনেমা ৯১	৪৭১ রঙের ব্যবহার
এক্সপ্রেশনিজম ৯৩	৫২৯ শব্দ ও সংগীত
ওয়েস্টার্ন ছবি ১০২	৫৪০ শিল্প নির্দেশনা
কমেডি ১১১	৫৫৮ সম্পাদনা

<u>টেকনিক</u>	৬৬ অ্যারিলেক্সক্স ক্যামেরা
ইন্সার্ট ৭৩	৭৪ ইয়ালশন
এক্সপোজার ৯১	৯৪ স্পেশাল এফেক্ট
ওয়াইপ ১০০	৯৯ ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স
ক্যামেরাকোণ ১৩৭	১৩৫ ক্যামেরা
ক্যামেরা মুভমেন্ট ১৩৯	১৭৫ গ্রেডিং
ক্রোন শট ১৪২	১৮৫ চলচ্চিত্রের টেকনোলজি
ক্লোজ আপ ১৪৬	২২৬ টেকনিকালার
চলচ্চিত্রের টেকনিক ১৮২	২৩৩ ডিউপ
ক্রু ২১৭	৩১৯ ফিলটার
টিপ্টিং ২২৪	সাদা কালো ও রঙিন নেগেটিভ
ডলি ২৩২	৩২০ ফিল্ম
ডাবিং ২৩২	৩২৪ পজিটিভ ফিল্ম
ডায়নামিক ফ্রেম ২৩৩	৩৯১ রো আপ
ডিজলভ ২৩৫	৪৩৯ মুভিঅলা / স্টেইনবেক
ডিপ ফোকাস ২৩৬	৪৬৯ ন্যারেড প্রিন্ট
ডিফিউশন ২৩৭	৪৮৯ রিডাকশন প্রিন্ট
প্যান ৩০৮	৪৯০ রিভার্সাল ফিল্ম
ফ্রন্ট / ব্যাক প্রজেকশন ৩৩৭	৫২০ লেন্স
ফ্রিজ ৩৪৫	<u>দেশ</u>
ফ্ল্যাশ ব্যাক / ফরোয়ার্ড ৩৪৫	৩১ অস্ট্রেলিয়া
মিকসিং ৪৩২	৪৬ আফ্রিকা
স্লো / কুইক / স্টপ্‌ড মোশন ৪৬৫	৫৬ আমেরিকা
রাফ-কাট / রাশ ৪৮৭	৬৮ ইতালি
লাইটিং ৫১০	৭৮ ইয়োগোশ্চাভিয়া
শট ও শট বিভাজন ৫২৭	১১৬ কানাডা
<u>টেকনোলজি</u>	১২৪ কিউবা
৮/১৬/৩৫/৭০ মিমি	১৭৪ গ্রেট ব্রিটেন
ফটোফিল্ম ৪১, ৫৪৮	২০১ চীন
আর্কাইভ ৫৮	২০২ চেকোস্লোভাকিয়া

জাপান ২১২	১১৩ কষ্টা-গাত্রাস
জার্মানি ২১৪	১১৭ কাপরা
ডেনমার্ক ২৪০	১১৯ কাভালকান্তি
পোল্যান্ড ৩০৭	১২২ কার্ণে
ফ্রান্স ৩৩৮	১২৫ কীটন
বুলগেরিয়া ৩৭০	১২৬ কৃত্তিক
ভারতবর্ষ ৪০১	১২৭ কুরোশাওয়া
রোমানিয়া ৫০৩	১৩৩ কোজিনৎসেভ
লাতিন আমেরিকা ৫১১	১৪২ ক্লুজো
সুইডেন ৫৯৪	১৪৪ ক্লেয়ার
সোভিয়েত রাশিয়া ৬১৯	১৪৮ গদার
হল্যান্ড ৬৪০	১৫৬ গাল
হাঙ্গেরী ৬৪১	১৫৭ গাঁস
	১৬২ গুণে
	১৬৫ আব্দুর গোপালকৃষ্ণন
	১৭০ গ্রিফিথ
	১৭২ গ্রিয়ারসন
	২০৪ চ্যাপলিন
	২০৮ জাহুসি
	২১৯ জেনিংস
	২২০ জেফিরেল্লি
	২৩৩ ডিজনি
	২৩৮ ডুরাজ
	২৪০ ডে সিকা
	২৪৪ ড্রেয়ার
	২৫৬ তান্তি
	২৫৮ তারকোভস্কি
	২৬২ ক্রফো
	২৬৪ দনস্কোয়
	২৬৭ দভবোঙ্কো
	২৯৩ পল্টিকর্ভো
<u>পরিচালক</u>	
জি. অরভিন্দন ২৮	
আইজেনস্টাইন ৩৪	
আন্তনিওনি ৪৪	
আলিয়া ৫৯	
অ্যানডারসন ৬৩	
ইচিকাওয়া ৬৭	
ইয়াকো ৭৫	
ইভেন্স ৮০	
ঋত্বিক ঘটক ৮৬	
এপল্ট্যা ৯৪	
ওজু ৯৭	
ওফুলস ৯৯	
ওয়েলস ১০১	
ওশিমা ১০৬	
ককতো ১০৭	

পাব.স্ট ২৯৫	৪৪৩ মৃগাল সেন
পাসোলিনি ২৯৯	৪৫৮ মেন্ডিল
পুদভকিন ৩০১	৪৬০ মেলিয়েস
পেন ৩০৪	৪৬২ মেহরজুই
পোর্টার ৩০৫	৪৬৬ ম্যাকলারেন
পোলানস্কি ৩০৬	৪৭৬ রব-গ্রিয়ে
ফাব্রি ৩১১	৪৮৮ রিচার্ডসন
ফাসবিগার ৩১৩	৪৮৯ রিড
ফেপিগি ৩২৮	৪৯১ রুশ
ফোর্ড ৩৩২	৪৯২ রে
ফোরম্যান ৩৩৪	৪৯৫ রেণে
ফ্ল্যাহার্টি ৩৪৭	৪৯৮ রেনোয়া
বন্দারচুক ৩৪৮	৫০০ রোজেলিনি
বার্গম্যান ৩৫৪	৫০৫ রোসি
বুল্‌এল ৩৬৮	৫০৮ রোহ্মের
বেকের ৩৭৩	৫১৬ লীন
শ্রাম বেনেগাল ৩৭৪	৫১৭ লুবিংশ
বের্তোলুচ্চি ৩৭৬	৫২০ লুমেট
বেল্লোচ্চিও ৩৮০	৫২৪ ল্যাঙ্ক
ব্রেস ৩৮৬	৫৪৫ শ্রাত্রল
ভাইদা ৩৯২	৫৪৭ শ্লেডিংগার
ভিগো ৪০৪	৫৪৯ সত্যজিৎ রায়
ভিসকল্ডি ৪০৫	৫৭৮ সাবো
ভের্তভ ৪০৮	৫৮৭ সিগেল
মণি কাউল ৪০৯	৫৯৩ সিস্টেম
মাকাভেজেভ ৪২০	৫৯৬ এস. স্বন্দেব
মার্কীর ৪২৬	৬০৪ সেমেট
মাল্ ৪২৭	৬০৭ সেমুবেন
মিজোশ্চি ৪৩৩	৬২৫ স্টার্নবার্গ
মুক ৪৩৯	৬২৮ স্ট্রাইম
মুরনাউ ৪৪০	৬৩৩ স্পীলবার্গ

ইক্স ৬৩৮  
হাস্‌ত্রা ৬৪৩  
হাস্টন ৬৪৪  
হিচ্‌কক ৬৪৫

৪১৫ মনরো  
৪১৯ মরো  
৪২২ মাধবী মুখোপাধ্যায়  
৪২৪ মায়ার  
৪২৬ মার্কস ভ্রাতৃবৃন্দ  
৪২৮ মাস্‌ত্রোইয়ানি

কলাকুশলী/শিল্পী/সমালোচক ইত্যাদি

ইস্টম্যান ৮৩  
উলম্যান ৮৬  
এডিসন ৯৩  
কারটিয়ার-ব্রেসঁ ১২০  
কুলেশভ ১৩২  
গার্বো ১৫৫  
চেরকাসভ ২০৩  
জেনিংস ২১৯  
জ্যাকবস ২২১  
টিশে ২২৪  
টোলাঙ ২৩০  
ডীট্রিশ ২৩৮  
থুলিন ২৬৪  
দালি ২৭০

৪৬৪ মোর্ত্ত  
৪৬৮ ম্যানভেল  
৫০৩ রোথা  
৫০৯ লরেন্‌জ  
৫১৫ লিওর  
৫১৮ লুমিয়ের ভ্রাতৃবৃন্দ  
৫২৩ লোরেন  
৫২৬ ল্যাংলোয়া  
৫৩১ শাবানা আজমী  
৫৭৭ সাহুল  
৫৯৩ সিম্বো  
৬১৮ সোন্‌টাগ  
৬৩৬ স্মিতা পাতিল

নিকিভিষ্ট ২৮৩  
দাদাসাহেব ফালকে ৩১৩  
ফিশার ৩২৭  
বার্জাঁ ৩৫২  
বার্গম্যান ৩৬২  
বালাজ ৩৬৩  
বেলমন্দো ৩৭৯  
ব্রেখ্‌ট ৩৮৫  
ব্র্যাণ্ডো ৩৮৯  
ভন সিডো ৩৯১  
মনটাঙ ৪১২

চলচ্চিত্রের তত্ত্ব ও তাত্ত্বিক প্রশ্ন

৩১ অ্যাত্যর ( Auteur ) তত্ত্ব  
১২২ কালচেতনা  
১২৫ কিনো-আই  
১৮৭ চলচ্চিত্রের শিল্পরূপ  
২২৩ টাইপেজ  
২৫১ তথ্যচিত্রায়ণ  
৩৫৩ বাদ/ইজম  
৩৬৬ চলচ্চিত্র আঙ্গিকে বিভাজন  
৪১২ মনভাজ  
৪৩৬ মিজ-জঁ-সেন

মোটফ ৪৬৩	১৭৬ ঘটনা
সেমিওলজি ৬১৬	১৭৭ চলচ্চিত্র
স্ট্রাকচারালিজম ৬২৯	১৭৯ চলচ্চিত্রের ইতিহাস
স্থান-কাল চেতনা ৬৩১	১৯৩ চিত্রকল্প / দৃশ্যকল্প
	২২১ জ্যাজ
<u>চলচ্চিত্র ও অস্থায় প্রসঙ্গ</u>	২৩৫ ডিটেল
ইতিহাস ও চলচ্চিত্র ৭০	২৭০ দৃক্‌বিজ্ঞান
কবিতা ও চলচ্চিত্র ১০৯	২৭২ সিনেমায় ধারাবাহিকতা
চিত্রকলা ও চলচ্চিত্র ১৯৩	২৮৩ নিগ্রো
নাটক ও চলচ্চিত্র ২৭৬	২৯২ নো-নাট্য
নৃত্য ও চলচ্চিত্র ২৮৮	২৯৩ পরিচয় লিপি
বিচ্ছিন্নতা ও চলচ্চিত্র ৩৬৪	৩০৪ চলচ্চিত্র পুরস্কার
চলচ্চিত্রে ভাবনাস্বীতি ৩৯৪	ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব
মনস্তত্ত্ব ও চলচ্চিত্র ৪১৬	৩২৫ ফিল্ম আর্কাইভস
যৌনতা ও চলচ্চিত্র ৪৬৯	৩২৭ ফিল্ম স্কুল ও সোসাইটি
রাজনীতি ও চলচ্চিত্র ৪৮৪	৩৪৫ ফ্রেম
বিবিধ শিল্পকলা ও চলচ্চিত্র ৫৩৪	৪৫৫ মেয়েদের বিরুদ্ধে সিনেমা
সমাজ ও চলচ্চিত্র ৫৬৪	৪৭৯ চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথ
সংগীত ও চলচ্চিত্র ৫৭০	৫২২ লোকেশন
সংযোগ ও চলচ্চিত্র ৫৭৩	৫৪৩ চলচ্চিত্রে শেক্সপিয়ার
সাহিত্য ও চলচ্চিত্র ৫৮৩	৫৬৮ চলচ্চিত্র সমালোচনা
	৫৭৭ সাইট অ্যাণ্ড সাউণ্ড
<u>বিবিধ</u>	৫৮১ সাবটাইটেল
চলচ্চিত্র উৎসব ৮৫	৫৯০ সিঞ্চল
কাইয়ে দ্বা সিনেমা ১১৪	৫৯৮ সেনসরশিপ
কারুকিনাট্য ১১৮	৬৩৯ হলিউড



## ॥ অক্টোবর ॥

১৯১৭-র সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্মরণার্থ সংবাদচিত্র / তথ্যচিত্র ও ধারা-ভাষ্য / ধারালিপি হিশেবে নির্বাচন চলচ্চিত্র অক্টোবর ( ১৯২৮ ) উল্লেখযোগ্য। জন রীডের পৃথিবী কাপানো দশ দিন-গ্রন্থ অবলম্বনে, এস. আইজেনস্টাইনের চিত্রনাট্য, তাঁর শুষ্কি. আপেক্ষিকতার যৌথ পরিচালনায় ছবিটি নির্মিত। এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলনারহিত, ছবিতে দেখা যায় লেনিন, কেয়েনস্কি ও ইউস্কির কার্যকলাপ আর হাজার হাজার সৈন্য ও মানুষের ঘটনাবলীকে ( ড. সোভিয়েত রাশিয়া )। এই প্রযোজনাগত সাফল্যের পাশে রয়েছে এর দৃশ্যরচনা ও দৃশ্য-বিশ্লেষণের বিশেষ নুসীয়ানা যাকে আইজেনস্টাইন ইনটেলেকচুয়াল সিনেমা ( ড. মনতাজ ) নাম দিয়েছেন। রাজনৈতিক কারণে ছবিটির মুক্তি বিলম্বিত হয় ও কোন কোন দেশে সংক্ষেপিত সংস্করণ প্রদর্শিত হয়। কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনের অভিযাত্রী শিল্পরূপ হিশেবে ছবিটি আজও অদৃত। এতে অবলিক ফ্রেমিং ( ড. ফ্রেম ), রিভার্স মোশন ( ড. ক্যামেরাভাষা ) ও এক্সপ্রেসিভ মনতাজের অনবদ্য ও প্রতীকী ব্যবহার আছে। আইজেনস্টাইনের উদ্দেশ্যাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি, দৃশ্য-প্রতিমার অনবদ্য ব্যবহার ও বিবিধ ধর্মীয় দেবতার ষাণ্ডিক মূল্যায়ন এই ছবিকে এক কালজয়ী প্রাদম্বিকতা দিয়েছে। ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক চিত্র হিশেবে এর গুরুত্ব আজও অক্ষুণ্ণ।

অভিনয়ে নিকান্দ্রভ, পোপভ, লিভানভ ; চিত্রগ্রহণে E. Tisse, সম্পাদনায় আইজেনস্টাইন, ছবির আধুনিক প্রিন্টে শস্টাকোভিচ প্রদত্ত আবহ সংগীতের সাউণ্ড ট্র্যাক ব্যবহৃত হয়।

## ॥ অপু-ত্রয়ী ॥ (Apu-Trilogy)

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধ্রুপদী উপন্যাস পথের পাঁচালী ও অপরাধিত-র কেন্দ্রীয় চরিত্র অপু ( অর্ধকুমার রায় )-কে অবলম্বন করে সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় নির্মিত পথের পাঁচালী ( ১৯৫৫ ), অপরাধিত ( ১৯৫৬ ) ও অপূর সংসার ( ১৯৫৯ ) কাহিনীচিত্র তিনটিকে একত্রে অপু-ত্রয়ী আখ্যা দেওয়া হয়।

এর মধ্যে পথের পাঁচালী সত্যজিতের প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্র। ছবিটি দেশ-বিদেশের পুরস্কার, সমালোচকদের প্রশংসা এবং ব্যবসায়িক সাফল্য সমস্তই পেয়েছে। শৈল্পিক সাফল্য ও প্রভাব উভয় বিচারে এই ছবিটিই ভারতবর্ষের প্রথম আন্তর্জাতিক মানের ছবি। অপু-ত্রয়ীর বিশেষত প্রথম ছবি ছুটি বাংলা ও ভারতীয় চলচ্চিত্রে নতুন যুগ আনে। ছবি ছুটি উপাদান-নির্বাচন, দৃশ্যগঠন প্রণালী ও রসের বিচারে যথেষ্ট আলাদা, প্রায় দু'ধরনের (ড. ইজম)। পথের পাঁচালীতে যদিও লিরিক রয়েছে যুল উপস্থাসের ভাবপ্রবণতা ও কল্পনাময়তা থেকে তা মূলগত ভাবে আলাদা। অপরাঙ্কিত-য় বস্তুচেতনার স্থান ও ভূমিকা তো আরো বেশি। অপু-ত্রয়ীর গতিপথকে প্রধানত নিয়ন্ত্রিত করেছে পাঁচটি যত্ন—ইন্দিরা ঠাকরণ, দুর্গা, হরিহর, সর্বজয়া ও অপর্ণার, যা পর্দায় আজ অবধি প্রদর্শিত সবচেয়ে স্বাভাবিক যত্নগুলির অন্ততম। যত্নবর্ণনার এই নিরাসক্তি যুল কাহিনীতেও লভ্য। অপু-ত্রয়ীর যুল বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিরিত্র ও দেশজ বিষয়কে সার্বজনীন আবেদন ও আন্তর্জাতিক রসগ্রাহিতা দেওয়া (ড. সত্যজিৎ)। শুধু পথের পাঁচালী নয়, তিনখানি ছবিই দেশ-বিদেশে উচ্চ প্রশংসিত ও পুরস্কৃত।

প. পঁ. অভিনয়ে চুনীবালা, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, পিনাকী সেনগুপ্ত (অপু)

কান চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ হিউম্যান ডকুমেন্ট-এর পুরস্কার (১৯৫৬)

অ. অভিনয়ে কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, অরণ ঘোষাল (অপু)  
ভেনিসে গোল্ডেন লায়ন অব সেন্ট মার্ক-পুরস্কার (১৯৫৭)

অ. স. অভিনয়ে শর্মিলা ঠাকুর, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (অপু)

ছবি তিনটির চিত্রগ্রহণে সুরভ মিত্র, সম্পাদনায় দুলাল দত্ত, সংগীতে রবিশঙ্কর ও শিল্প নির্দেশনায় বংগী চন্দ্রগুপ্ত।

• এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রবিন উডের দি অপু ট্রিলজি ॥

॥ অপেরা ছবি ॥

[Opus শব্দের বহুবচনে Opera, যার অর্থ—মিউজিক্যাল কম্পোজিশন। বিভিন্ন শিল্পকোষে অপেরার বৃহত্তর সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়েছে এইভাবে—এ ড্রামা সেট টু মিউজিক। ফলে অপেরা ছবি হলো—এ ফিল্ম সেট টু মিউজিক। অর্থাৎ শুধুমাত্র সংগীতপ্রদান হলেই অপেরাধর্মী ছবি হয়ে উঠবে এমন নয়। (ড. গুপী গাইন... )। এখানেই মিউজিক্যাল (ড. ) ছবি থেকে সে আলাদা; অপেরাতে

গানের মধ্য দিয়ে প্লটকে এগোতে হচ্ছে। মিউজিক্যালের প্লট কিন্তু গান গেয়ে হচ্ছে না, স্বাধীনভাবে এগোচ্ছে। বড়ো জোর কোনো এক বা একাধিক বিশেষ অংশে অপেরার আঙ্গিক এসে যেতে পারে। প্রচলিত সাহিত্য থেকে, যেমন শেক্সপিয়ারের ওথেলো আর ম্যাকবেথ অথবা বোমার্শের ম্যারেজ অব কিংগারো, ভেদি ও মোৎসার্ট অপেরা রচনা করেছেন মূল কাহিনীর সঙ্গে যাদের অমিল স্পষ্ট। তেমনি অপেরাধর্মী ছবির প্রসঙ্গ, পদ্ধতি এবং স্বাদও তার নিজস্ব, অছাচ্চ সাধারণ ছবি থেকে তার পার্থক্য প্রত্যক্ষ। শিল্প হিসেবে তাতেই তার সাফল্য। (ড্র. শব্দ ও সংগীত)। দেমি-র লে পারাপুই দ্য শেরবুর্গ ছবিটা এর বিশ্বকর উদাহরণ। গানের মধ্যে যে দেশান্তর, কালান্তর আবেদন থাকে সেটিই অপেরা-ধর্মী ছবির প্রাণ। সিনেমার আঙ্গিক অপেরাকে নির্বাক চলচ্চিত্রে রূপান্তরের নিয়মিত প্রয়াস দেখা যেত, যদিও মোটের ওপর এইসব ছবি হতো সংগীতহীন তবু কখনো কখনো ছবি প্রদর্শনের সময় নির্দিষ্ট সংগীত হলে গেয়ে শোনানো হতো। শব্দের আগমনের ফলে স্বল্প দৈর্ঘ্য অপেরা ছবির সংখ্যা ও মান বাড়লো। অপেরা গায়কদের অভিনেতা-অভিনেত্রী হিসেবে নিয়ে ছবি করার, কিংবা অল্প অভিনেতার ঠোঁটে তাদের গান ব্যবহার করার প্রবণতা দেখা দিল। এক জিপসি প্রেনিকার উত্তেজক প্রেমের কাহিনী Carmen-কে নিয়ে বহুবার অপেরাধর্মী ছবি হয়েছে, ১৯০৯ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত, ফ্রান্স স্পেন জার্মানি ইতালি হলিউড থেকে চাপলিনের প্যারডি অবধি, অপেরা ছবি থেকে শিলহট ছবি বা কার্টুন ছবি পর্যন্ত, বহু বার। পঞ্চাশের বছরগুলির শেষ দিকে সম্পূর্ণ ও বিস্তৃত সিনেমা হিসেবে অপেরাকে চলচ্চিত্রায়িত করা সম্ভব হয়েছে। এ প্রসঙ্গে শস্টাকোভিচের নাম উল্লেখ্য। অপেরা ছবির আঙ্গিক নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে আজও। যেমন পোরকার কাব্যনাট্য অবলম্বনে ব্যালে-রূপের মাধ্যমে নির্মিত কার্লো সগুরার ছবি ব্লাড ওয়েডিং, ইত্যাদি।]

অপেরা মূলতঃ গীতিনাট্য। রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যগুলি এই অপেরাধর্মী শিল্পপ্রকরণের উজ্জ্বল উদাহরণ। খাঁটি ‘অপেরা ফিল্ম’ আর অপেরাধর্মী ছবির মধ্যে অবশ্য তফাৎ আছে। বিস্তৃত অপেরা ফিল্ম হলো সেই ছবি যা একনিষ্ঠভাবে কোনো নির্দিষ্ট অপেরাকে অবলম্বন করে তৈরি। কিছু কিছু সংগীতপ্রধান ছবিতেও মাঝে মাঝে অপেরার লক্ষণ ফুটে ওঠে, তাকে আমরা ‘অপেরাটিক ফিল্ম’ বলতে পারি, কিন্তু খাঁটি অপেরা ফিল্ম সেটা নয়। অপেরা ফিল্মের ক্রমবিকাশ বলতে গেলে চলচ্চিত্রে শব্দ ও সংগীত প্রযুক্তির পর থেকে। যদিও ইতিহাস থেকে

আমরা জানি যে নির্বাক যুগেও অনেকে অপেরাকে চলচ্চিত্রে রূপ দেবার প্রয়াস করেছিলেন। ১৯০৭-এর সময়সীমায় ব্রেজিলে এক বিশেষ রীতির চলচ্চিত্র নির্মাণের হুদিশ মেলে, যাকে বলা হ'ত *fitas cantatas*, অর্থাৎ গানের ছবি। এগুলি আদতে তদানীন্তন অপেরা ও গীতিনাট্যধর্মী মঞ্চ প্রযোজনার চলচ্চিত্ররূপ ছিল। গায়কেরা এইসব ছবি প্রদর্শনের সময়ে পর্দার আড়ালে থেকে সরাসরি চলচ্চিত্রের পাত্র-পাত্রীদের মুখের গানে *lip* দিতেন। ১৯০৮ থেকে ১৯১০-এর সময় পর্বে এই জাতীয় ছবি কাহিনীচিত্রের সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

অপেরা ফিল্ম বিশেষ অর্থেই সংগীতবহুল ছবি। কিন্তু সাধারণ 'মিউজিক্যাল ফিল্ম'-এর সঙ্গে শিল্পপ্রকরণে তার অনেক পার্থক্য আছে। এমন অনেক অসাধারণ মিউজিক্যাল ফিল্ম তৈরি হয়েছে যার মধ্যে অপূর্ব অপেরাটিক ফর্ম অংশবিশেষে ব্যবহৃত হয়ে ছবিতে অল্প মাত্রা সংযোগ করেছে। নির্বাক যুগে এবং সবার যুগের প্রথমদিকে অপেরাকে নিয়ে কেউ কেউ আংশিকভাবে বিদ্রোহিত দিকোয়েন্দও তৈরি করেছিলেন। ১৯২২-এ তৈরি জারমেইন ডুলাকের ফরাসি আউ গার্দ ছবি 'The Smiling Madame Bendet', এ প্রদর্শ উল্লেখ্য। ১৯৩১-এ তৈরি রেনে ক্লেয়ারের 'Le Million'-ছবির অতুলনীয় অপেরা দিকোয়েন্দও বিশেষ দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। আধুনিককালে আমরা অনেক উৎকৃষ্ট ছবিতে অপেরার অনুভব ব্যবহৃত হ'তে দেখেছি। কখনো অপেরা শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে, কখনো অপেরা অনুষ্ঠানের নেপথ্য কাহিনী নিয়ে, কখনো অপেরার সংগীত পরিচালকের অপেরা মঞ্চস্থ করার নানাবিধ ঘটনাবলী নিয়ে সে সব ছবি তৈরি হয়েছে। ১৯৮৯-তে তৈরি হাঙ্গেরীয় পরিচালক ইস্ত্ভান জাবোর 'মীটিং ভেনাস' এ জাতীয় উৎকৃষ্ট সৃষ্টি।

পঞ্চাশ দশকের শেষদিক থেকেই প্রকৃত অর্থে খাঁটি 'অপেরা ফিল্ম' তার নিজস্ব চরিত্র ও শিল্প আঙ্গিকে ঝড় হ'য়ে ওঠে। পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সংগীতের বহু স্রষ্টা তাঁদের নানাবিধ কম্পোজিশনের পাশাপাশি স্বতন্ত্র ভাবে অনন্য 'অপেরা' রচনা করে-ছিলেন। অপেরা ফিল্মের পরিচালকেরা সেইসব অপেরা অবলম্বনে যে ছবি তৈরি করেন বিভিন্ন দশকে তার প্রয়োগ প্রকরণ যেমন বিচিত্র, তার শিল্পিত বিকাশও নানা ধারায় একাল পর্বন্ত প্রসৃত। দিনেমান্তাত্মিক এ মত পোষণ করেছেন যে অপেরা ফিল্ম আসলে মঞ্চাভিনীত অপেরার মৌলিক স্বরূপটি ক্যামেরায় ধরে রাখার উদ্দেশ্যেই নির্মিত হতো। কিন্তু এমন অনেক অপেরা ফিল্ম তৈরি হয়েছে যেখানে নাট্যরীতি হিশেবে মৌলিক অপেরা এবং চলচ্চিত্র আঙ্গিকের স্বকীয় গুণাবলী একীভূত হয়ে এক স্বতন্ত্র আঙ্গিকের জন্ম দিয়েছে। প্রখ্যাত পরিচালক

আবেল গাঁস যখন ১৯৩৯ সালে Louise নামে অপেরা ফিল্ম তৈরি করেন, তখন তিনি অষ্টাদশ শতকের স্বরশ্রী মার্ক আতোয়েন কার্পেটিয়েরের মূল অপেরাটিকে যথাসম্ভব বিশ্বস্তভাবে চলচ্চিত্রের শর্তে রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। অল্পদিকে ১৯৫১-তে ইতালিয়ান স্বরকার গিয়ান কার্লো মেনেস্তি যখন 'The Medium' নামের অপেরা ফিল্ম করেন, দেখানে ছবিতে তিনি অপেরা এবং দিনেমার দর্বাঙ্গহৃদর সার্থক শিল্প সময় ঘটাতে পেরেছিলেন। যার জন্তে অনেকেই ছবিটিকে একই সঙ্গে মৌলিক অপেরা এবং খাঁটি ফিল্ম হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। দিনেমাত্মিক রূপার বলেছিলেন "The world of opera is built upon premises which radically defy those of cinematic approach." তাই আধুনিক-কালে অপেরাকে নিয়ে সৃষ্টিধর্মী ছবি করার ক্ষেত্রে পরিচালককে অপেরার স্বর্ধর্ম এবং চলচ্চিত্রের বাস্তব অুতিপ্রায় দুটোই মাথায় রাখতে হয়।

ভাবলেও অবাধ লাগে চলচ্চিত্র প্রদর্শনযন্ত্রের অত্ৰতম উদ্ভাবক বিজ্ঞানী এডিসন তাঁর ১৮৮৯ সালে তৈরি Kinetograph যন্ত্রের মাধ্যমে অপেরা ফিল্ম প্রদর্শনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, এমনকি ১৯১০-এর ২৭শে আগস্ট New York Times সংবাদপত্রে এমন কথাও তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে 'We will be ready for the moving picture shows in couple of months, but I'm not satisfied with that. I want to give grand opera.' বাস্তবিক, এডিসনের দেদিনের আকাঙ্ক্ষা পরবর্তীকালে ফলপ্রসূ হয়েছিল। বিশ শতকের প্রথম দশক থেকেই বলতে গেলে কিছু জনপ্রিয় অপেরা চলচ্চিত্রায়িত হয়। সেই ১৯০৯ থেকে সাম্প্রতিককালে নির্মিত ফ্রান্সিসকো রোদির ছবি পর্যন্ত নানা আঙ্গিকে, নানা পরিপন্থনায় অপেরা ফিল্ম তৈরি হয়েছে।

একটা লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, ১৯৭০ এবং আশির দশকে অপেরা বিহয়ক ছবি তৈরির একটা বিশেষ প্রবণতা চোখে পড়ার মতো। এর একটা কারণ আমরা অনুমান করতে পারি যে, ১৯৩০ থেকে ১৯৫০ দশকের পর্বে তৈরি অসংখ্য হলিউড থ্রিডিমেনশিয়াল ছবির গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলো যখন ক্রমশঃ ম্লান হতে হতে সাংগীতিক সৃষ্টির অতীতচারণার দিকে মুখ ফেরাতে থাকে, যখন দিনেমার আধুনিক প্রযুক্তির মোহিনীনায়া আর বিশ্বছুড়ে সামাজিক ডামাডোলের ভাঙাগড়ায় চলচ্চিত্র নিত্য নতুন জীবনজিজ্ঞাসায় মানুষের অস্তিত্বসংকটের চেহারাটাকে খুঁজে ফেরায় ব্যস্ত, তখন তথাকথিত সাংগীতিক ছবির সেই মুগ্ধতা স্বাভাবিকভাবে অপসৃতমান হবে জানা কথা। এরই পাশে রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক বৈপরীত্যে উদ্ভাল

পারিপার্শ্বিকতায় পরবর্তী যেসব মিউজিক্যাল ছবির প্রচেষ্টা হয়েছে সেগুলো চরিত্র ও শিল্পগোত্রে আগেকার সাংগীতিক ছবি থেকে অনেকটা দূরে সরে এসেছে।

তাই দশের দশকে এবং আশির দশকে নতুন করে, অতীত স্বভাবে আধুনিক অপেরা ফিল্ম করতে গিয়ে একালের প্রতিষ্ঠিত পরিচালকেরা বোধহয় মার্কিনী স্রষ্টাদের তৈরি Music genre-এর সাংগীতিক পরিমণ্ডলকে নাট্যকলা ও সিনেমার মেলবন্ধনে নতুন কোনো চলচ্চিত্র রীতির স্বরূপে সন্ধান করতে চেয়েছেন। ওয়ার্নার স্ক্রোয়েটারের Death of Maria Malibran, হারজোগের ফিংস-কারাল্ডো, বিয়েনিক্সের Diva, ফেলিনির E la nava va, বার্তোলুচির La Luna, এমনকি গ্রীক নাটক আশ্রিত প্যাসোলিনীর ছবি Medea, সবগুলির মধ্যেই অপেরা নতুন সম্ভাবনায় উজ্জীবিত হ'তে চেয়েছে। সবগুলিতেই অপেরার রূপকধর্মী লক্ষণ চোখে পড়ে।

বেঞ্জামিন জিট্রেন রচিত অপেরা Owen Wingrave অবলম্বনে নির্মিত টেলিভিশন ফিল্মে পরিচালক স্বয়ং জিট্রেন মূল মঞ্চ প্রযোজনাটিকে টেলিভিশনের শর্তে অতীত স্বভাবে রূপদানের চেষ্টা করেছিলেন। বার্ম্যানের তৈরি অপেরা ফিল্ম 'Magic Flute' স্ক্রিডেনের দূরদর্শনে দেখানো হয় ১৯৭৫-এর নববর্ষের দিন। পরবর্তী এক আত্মগোষ্ঠানিক দিনে একই সঙ্গে এটি জিটিসি দূরদর্শন কর্তৃক প্রদর্শিত হয় এবং ছবি হিসেবে লগনে মুক্তি পায়। সৃষ্টিতত্ত্ব ও জ্ঞানের দার্শনিক রহস্যময়তায় নিবিড় সোংসার্টের এই অপেরার মূল মুদ্রিত সংস্করণটি বার্ম্যানের শিল্প-মানসিকতায় যে দার্শনিক প্রসঙ্গের উন্মেষ ঘটিয়েছিল পরিচালক তাকে স্বকীয় মননের আলোকে চিত্রিত করতে চেয়েছেন। যুগপৎ নাটক ও চলচ্চিত্রের প্রতি সমান অঙ্গীকারবদ্ধ বার্ম্যান ক্যামেরার দৃষ্টিকোণে মূল অপেরার নাট্যলক্ষণ ও সাংগীতিক ভাষ্যটিকে নিজের ভাবনাচিত্তা অনুযায়ী ফুটিয়ে তুলেছেন। স্কোয়েনবার্গ রচিত দু'অঙ্কের অপেরা 'Moses and Aran' অবলম্বনে নির্মিত ছবিটি তৈরি হয় ১৯৭৫ সালে এবং এডিনবার্গ চলচ্চিত্র উৎসবে প্রথম প্রদর্শিত হয় ১৯৭৭ সালে। পরিচালক ছিলেন জঁ মারিয়ে স্ট্রাউব ও ডানিয়েল হিউলেট। এ ছবি নির্মাণ পরি-কল্পনায় চলচ্চিত্রগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার চেয়ে পরিচালকেরা মূলত স্কোয়েনবার্গের সাংগীতকেই বেশি মর্যাদা দিতে চেয়েছেন। জোসেফ লোসে পরিচালিত অপেরা ফিল্ম 'Don Giovanni' (১৯৭৯) তৈরির পিছনে দু'জনের উৎসাহ ও উগ্রম বিশেষ সক্রিয় ছিল। স্ক্রিডেন সুরকার রলফ লাইবেরম্যান এবং প্যারিস অপেরার পূর্বতন সাধারণ অধ্যক্ষ দু'জনের মূল অভিপ্রায় ছিল মূল অপেরাটিকে থিয়েটারের

সীমিত দর্শকগোষ্ঠীর বিশেষ উপভোগ্যতার বাইরে এনে এটিকে আরো ব্যাপকভাবে বৃহত্তর দর্শক সমাজের কাছে পৌঁছে দেওয়া। ছবিতে ত্রেখ্টায় নাট্যভঙ্গি ঘনিষ্ঠ-ভাবে চোখে পড়ে। পরিচালক অপেরার মূল নাট্যাংশের প্রতি যেমন একাগ্র ছিলেন, তেমনি তিনি অভীতকে যুগোপযোগী করার ক্ষেত্রেও স্বকীয়তার প্রমাণ রেখেছেন। ফ্র্যাঙ্কো জেফিরেল্লি নির্মিত ছবি 'লা ত্রাভিয়াতা' (১৯৮৩) অপেরা ফিল্মের আর এক রূপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটায়। ১৯৮২-তে কান চলচ্চিত্র উৎসবেই জেফিরেল্লি অপেরা ফিল্মের পণ্য স্বার্থের প্রতি ইংগিত করেছিলেন। তাঁর মতে শাস্ত্রিক সময়ে প্রকৃত নয়নাভিরাম দৃষ্টি আকর্ষক মিউজিক্যাল ছবি আর তৈরি হচ্ছে না বলেই যোগ্যতম অপেরা ফিল্মের সামনে ব্যবসায়িক বিরাট ক্ষেত্রটা পড়ে আছে। জেফিরেল্লি ভেঁদি রচিত মূল স্বরলিপিকেই আশ্রয় করে-ছিলেন। ছবির দৃশ্যক্রমের চলচ্চিত্রানুগ গতিময়তা, দৃশ্যসজ্জার সৌন্দর্য, এমনকি নৃত্য পরিকল্পনা—সব মিলেমিশে জেফিরেল্লি ভেঁদির ত্রাভিয়াতা থীমটিকে সিনেমা ও অপেরার এক মিশ্রিত আঙ্গিক হিসেবে খাড়া করতে চেয়েছেন।

ভাগ্নারের অপেরা নিয়ে হান্সজুরগেন দিবারবার্গ ১৯৮২-তে একটি অপেরা ফিল্ম করেন Parsifal। স্বরণ করা যেতে পারে যে এর ঠিক একশো বছর আগে ১৮৮২-তে 'বেরেউৎ'-এর থিয়েটারে ভাগ্নার নিজে তাঁর এই অপেরাটির প্রথম দৃশ্যভিনয়ের উদ্বোধন করেন। গত একশো বছর ধরে 'পার্সিফাল' অপেরাটির অনন্য অভিনয় মঞ্চস্থ হয়েছে যার প্রয়োগ পরিকল্পনা দিবারবার্গের মূল ছবির পরিমণ্ডল রচনায় সহায়ক উপাদান হয়ে উঠেছে।

সিনেমার ক্যামেরা নামক যন্ত্রটি ও তদানুযায়িক অভ্যন্তরীণ কর্মকাণ্ড মঞ্চের নাট্য ও সংগীতের মাঝাকে নিজস্ব ভঙ্গিতে ও স্বকীয় প্রযুক্তির আশ্রয় কুশলতায় এক সম্পূর্ণ নতুন শিল্পের ভূমিতে আমাদের হাজির করে। তাই নাটক ও মঞ্চাভিনাস, নাট্য শৈলী ও সংগীত, এতদ্ব্যতিরিক্ত সার্বিক ধারণাই অপেরা ফিল্মকে সার্থক করে তুলতে পারে।

সোমেন ঘোষ

॥ অভিনয় ॥

চলচ্চিত্র-অভিনয় চলচ্চিত্রের সঙ্গে অভিনেতার শৈল্পিক সম্পর্ক ও অভিনেতার সঙ্গে পরিচালকের ব্যক্তিগত সম্বন্ধের প্রকাশ। অভিনেতার সঙ্গে সিন্টিয়েশনের ও পরিচালকের সঙ্গে অভিনেতার স্বতঃস্ফূর্ত যোগাযোগই তা প্রকৃত ফলপ্রদ

হয়ে ওঠে। দর্শকদের কেউ যদি পর্দার কোনো চরিত্রের আনন্দ-বেদনার শরিক হন তবে তার কারণ এই যে ওই চরিত্রাভিনেতা সমগ্র সমাজের আনন্দ-বেদনার এক অংশ তথা বিশেষ দর্শকটির ব্যক্তিগত অনুভবের একটা দিক প্রতিকলিত করেন। ফলে অভিনেতার দায়িত্ব ও করণীয় অনেকটা। সিনেমার আদিয়েগে অভিনেতার। এসেছিলেন মূলত মঞ্চ থেকে। কিন্তু ক্যামেরার সৃষ্টি চোখ, তীব্র আলো, তীক্ষ্ণ শব্দগ্রহণ ও প্রসারিত পর্দায় তাঁদের অভিনয় ও চলাফেরা অভিনাটকীয় মনে হয়েছিল, মুখে ধরা পড়েছিল বয়সের ছাপ। এটা স্বাভাবিক। মঞ্চে যদি প্রয়োজন হয় একটু ওভার-অ্যাকটিং, চলচ্চিত্রে দরকার আওর-অ্যাকটিং। এখানে কমাতে হয় কণ্ঠের তীব্রতা, আনতে হয় অভিব্যক্তির সংযম, আর দেখতে হয় অভিনেতার ভিসুয়্যাল এ্যপিল চরিত্রের সঙ্গে যাচ্ছে কিনা। এই দৃশ্যগত আবেদনের জন্ম উপযুক্ত ও নতুন মুখ খোঁজার সূচনা করেছিলেন গ্রিফিথ। নবাগতদের মধ্যে ঝারা প্রতিষ্ঠা পান তাঁরা হলেন মেরি পিকফোর্ড, লিলিয়ান গিশ, গ্রেটা গার্বো, পোলা নেগ্রি, চার্লস লটন ও হ্যানসন। নির্বাক যুগের শিল্পী গার্বো সবাক ছবিতেও সফল হলেন। ধীরে ধীরে অভিনয় রীতিতে সৃষ্টিতা এল : গেনর, রেটি ডেভিস, হামফ্রে বোগার্ট, ক্যারি গ্র্যান্ট, কেথারিন হেপবার্ণ, স্পেনসার ট্রেসি, হেনরি ফগা প্রমুখের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। চরিত্রকে সম্পূর্ণ চরিত্র ও টাইপ চরিত্র হিসেবে ভাগ করে নেওয়ার প্রবণতা এই সময়ে কমেডি ছবির সাফল্য ও জনপ্রিয়তার ফলে রীতিমতো স্থায়িত্ব পেল। কমেডির পাশাপাশি ছিল একেবারে ভিন্ন ধরনের, অ্যাকশনধর্মী ওয়েস্টার্ন ছবি। চ্যাপলিন, কীটন, লরেল/হার্ডির পাশাপাশি ছিলেন জন ওয়েন ও অন্ডরা। বিভিন্ন দেশের প্রারম্ভিক চিত্র-নির্মাতারা চ্যাপলিন ও আদি হলিউডের প্রাথমিক ছবির মজায় যতটা মজেছিলেন আইজেনস্টাইন, পুদভকিন বা স্তানিস্লাভস্কির বৈজ্ঞানিক চিন্তায় ততটা ডোবেননি, তাই চলচ্চিত্রে চলচ্চিত্রধর্মী অভিনয়ের প্রবর্তনের জন্ম আরো অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। ১৯৪৭-এ এলিয়া কাজান প্রখ্যাত অভিনেতাদের সদস্য করে 'দি এ্যাক্টরস' স্টুডিও স্থাপন করার পর দিনেমায় পরিমিত ও স্বাভাবিক অভিনয়ের প্রচলন হলো। যেমন ত্র্যাগো বা ডিনের অভিনয়। এই বাস্তবধর্মী অভিনয় নিও-রিয়ালিজমের আবির্ভাবের ফলে ব্যাপক প্রসার পেল। অপেশাদার অভিনেতাদের নিয়ে কাজ করা শুরু হলো, চেষ্টাকৃত অভিনয়ের বদলে অভিনয়হীনতার সমাদর বাড়লো, চরিত্রের জন্ম নির্দিষ্ট মুখের সন্ধানে গুরুত্ব পড়লো। বোঝা গেল প্রত্যেক মুখেরই নিজস্ব প্রকাশযোগ্য অভিব্যক্তি আছে ও প্রকৃতির নির্ভুল সৃষ্টিতে

প্রতিটি মুখই একক। ( ড. টাইপেজ )। সেই বিশেষ জনকে দিয়ে চরিত্রের মনস্তত্ত্ব স্পষ্ট করানোই পরিচালকের উদ্দেশ্য। ফলে অভিনেতার সঙ্গে নির্দিষ্ট সিচুয়েশন বা অনুভবের যোগাযোগই ওই দৃশ্যকে অর্থবহ করে তোলে। ( ড. পরিচালক )। আধুনিক অভিনেতার আঙ্গ সংলাপের / অভিব্যক্তির সঙ্গে ছবির ছন্দগত মিলের প্রসঙ্গ, চলচ্চিত্রের অভিনয়ে ধারাবাহিকতার সমস্তা ও চরিত্রকে নিজের মধ্যে ধারণ করেও তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার অভ্যাস আয়ত্ত করেছেন। ফলে আঙ্গকের অভিনয় সিনেমাটিক, টানটান, মাপা ও নিচুমাত্রার। সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁদের স্বাধীনতাও দেওয়া হচ্ছে আগের চেয়ে বেশি করে। এই স্বাধীনতা ও ছবির প্রয়োজনে অভিনেতার নিয়ন্ত্রণে সিপিএ দেওয়ার যৌথ প্রয়াস কতদূর দার্থক হয়ে উঠতে পারে তার প্রমাণ লাভেন্দুরাতে মনিকা ভিত্তির অভিনয়। বা ডাঙ্কিন হফম্যান।

একটা সময় ছিল যখন পরিচালক ছিলেন ছবির সঙ্গে জড়িত আর দশজনের একজন, অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রথম জন নন। তারকা অভিনেতা ও অভিনেত্রীর ভূমিকা ও মর্যাদা ছিল তখন তাঁর চেয়ে বেশি। ক্রমে-ক্রমে পরিচালকদের প্রতিষ্ঠা দুটতর হয়। তবু আঙ্গও পরিচালকের টেকনিক্যাল সহকর্মীরা যত সহজে তাঁর আধিপত্য মেনে নেন, অভিনেতার, বিশেষত তারকা অভিনেতার, তত তাড়াতাড়ি তাঁর কর্তৃত্ব মেনে নিতে চান না। ব্যক্তিত্বের এই সংঘাতটার জন্ম বলা যায়, একদিক থেকে দেখলে অভিনয় হলো অভিনেতার সঙ্গে পরিচালকের সপ্রেম শৈল্পিক কলহের আর এক নাম। বিভিন্ন পরিচালকের ছবিতে ও বিভিন্ন ধরনের চলচ্চিত্র-অভিনয়ের মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রের সঙ্গে বিভিন্ন অভিনেতার শৈল্পিক সম্পর্ক কীভাবে প্রকাশ পায় এই অভিধানে প্রদত্ত বিভিন্ন অভিনেতা-অভিনেত্রীর পৃথক পরিচয়ে তাঁর প্রমাণ মিলবে।

## ॥ অভিনেতা ॥

অভিনয় এমন একটা প্রক্রিয়া যার দ্বারা অভিনেতা-অভিনেত্রী একটা চরিত্রকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলেন। কারো কারো মতে অভিনয়ের প্রথম কথা হচ্ছে প্রাক্ দৃশ্য বিলোপ। কথাটা ওভাবে না বলে এভাবে বললে বোধহয় আরও সঠিক হয়—‘মমেতি চ মমেতি ন’—আমি এই আমি এই না।

অভিনয়ের মাধ্যমেই দর্শক একটা ছবির কাহিনী ও অগ্রগতির সঙ্গে প্রাথমিক ভাবে একান্ত হন। ছবির বার্তাকে দর্শক-সাধারণের মধ্যে পৌঁছে দেবার প্রধান হাতিয়ার এটি। ফলে অভিনেতা-অভিনেত্রীর দায়িত্ব অনেকটাই।

অভিনয়শিল্পীর সত্য হলো কল্পনা। একটি চরিত্র বিশ্লেষণ ও যথাযথ চরিত্রসৃষ্টি অভিনেতার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, মনন ও কল্পনাশক্তির উপর নির্ভরশীল। একটি চরিত্রকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়— ১. ব্যক্তিগত মানুষ ২. পারিবারিক মানুষ ৩. সামাজিক মানুষ। চরিত্রসৃষ্টিতে কোন্ ভাগের কতটুকু ভূমিকা থাকা দরকার তা নির্ধারণ করে শিল্পীর কল্পনা, মনোযোগ ও অনুভব। মনোযোগ প্রসঙ্গে স্তানিস্লাভস্কি circle of attention-এর কথা বলেন। ব্যাপারটা এইরকম—কোনো একটা ছোটো জিনিসের উপর মনোযোগ সংহত করে ক্রমশঃ সেটার পরিধি বাড়িয়ে, ছড়িয়ে দিতে হবে। অভিনয়ের সময় মনোযোগ প্রেক্ষাগৃহে ছড়িয়ে দেবার দায়িত্বটুকু ছবির ক্ষেত্রে মোটেই জরুরি নয়। তবে সহ-অভিনেতার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার দায় একটা থেকেই যায়। তৃতীয়তঃ অনুভব। বিখ্যাত অভিনেতা জুভে বলেছিলেন, ‘যে চরিত্রটির রূপ দেবে, তার সঙ্গে মনে-প্রাণে এক হও, তার অনুভবকে নিজের করে নাও।’ শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের অভিনীত চরিত্রগুলি তার স্বস্পষ্ট প্রমাণ।

সিনেমার প্রধান অভিনয়রীতিগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

— আচারালিষ্টিক অভিনয় : বলা হয়, ‘one of the most important attributes in naturalistic acting is that of seeming to be unconscious of anybody watching or listening.’

রোম্যান্টিক অভিনয় : অস্বাভাবিক অভিনয়শৈলী থেকে এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের, কারণ ‘a greater degree of emotional intensity is needed for its interpretation.’ এই অভিনয়ের ক্ষেত্রে মেক-আপের বিশেষ ভূমিকা থাকে। আচারালিষ্টিক অভিনয়ে যদি জোর পড়ে realistic feature of human face-এর উপর, তো এক্ষেত্রে জোর পড়ে romantic feature of human face-এ।

ট্রাজেডি অ্যাকটিং : এ ক্ষেত্রে মুখাভিনয় ও ফিজিক্যাল অ্যাকটিং-এর বিশেষ ভূমিকা থাকে। অর্থাৎ চরিত্র ও পরিস্থিতি অনুযায়ী মুখ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কথা বলবে।

এই gesticulation ব্যাপারটা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে খুব দরকারি। শরীরের কতখানি ফ্রেমের ভিতর রয়েছে সেই অনুযায়ী হয় অভিনেতার behaviourism. একজন সংবেদনশীল অভিনেতা এই জেসটিকুলেশনকে সাধারণ প্যাটার্ন থেকে সবিশেষ মোটিফের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারেন।

এরপর আসে অভিনেতার কণ্ঠস্বরের কথা। সংলাপ অভিনয়ের প্রাণ। সংলাপ যথাযথ ভাবে শোনানোই হলো অভিনেতার প্রধান দায়িত্ব। সংলাপ শোনানোর

তবুটি সংলাপের স্পষ্ট উচ্চারণে। সংলাপকে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে হবে, উচ্চস্বরে উচ্চারণের প্রয়োজন নেই। এছাড়া ছবিতে উচ্চস্বরে উচ্চারণ আদর্শ ঠিক নয়, বরং তা অভিনয়কে ব্যাহত করে। উচ্চারণের জন্ত স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের প্রকৃতি সম্পর্কে অভিনেতার অবহিত হওয়া প্রয়োজন। স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণগুলি অর্থ ছোতনায় সাহায্যকারী। জোরের সঙ্গে যখন কিছু বলার প্রয়োজন তখন আমরা ব্যঞ্জনবর্ণগুলির উচ্চারণে জোর দিই। কিন্তু আমরা যখন expressive হতে চাই তখন স্বরবর্ণগুলিই আমাদের সাহায্য করে। আমাদের প্রত্যেকের গলায় তিনটে করে Octave আছে এবং প্রত্যেকটিতে ৮টি করে tune আছে। কেউ যদি তার একটি Octave-এর ৮টি স্বর ব্যবহার করতে পারেন অভিনয়ের ক্ষেত্রে তিনি যথার্থ ভাষ্যবান। এই প্রসঙ্গে আসে ডাবিং-এর কথাও। মাইক্রোফোনে স্বরক্ষেপণ সম্পর্কে সচেতন থেকে পর্দার অভিনয় অনুযায়ী ডাবিং করতে হয়। সংলাপ বলতে হলে গলা modulate করতে হবেই। তবে এই মডিউলেশন যদি স্কেল-বহিস্কৃত হয় তবে অভিনয়ের অন্তর্ভুক্ত ব্যাহত হয়।

ছবিতে অভিনয়ের ক্ষেত্রে যেমন কতগুলো স্ববিধে আছে, তেমনই অস্ববিধাও কম নয়। পল মূনির মতে, "To act in motion picture is to act in the world in which mechanical problems beset the actor on all sides. His problems are governed by them. He cannot escape them from the time he appears on the set, his steps are caged by chalk marks and focal distances. His voice is directed by microphones controlled by dials, and image can only be seen if he moves with care with the cages."

মনে করি, শ্রেষ্ঠ চিত্রাভিনয়ে ওই বাঁচা থেকে মুক্তিরই প্রমাণ মেলে।

গোপা সেনগুপ্ত

॥ অযান্ত্রিক ॥

ভারত, ১৯৫৮। অযান্ত্রিকই ঋষিক ষটকের প্রথম সর্বার্থে উল্লেখযোগ্য ছবি এবং সম্ভবত একমাত্র ছবি যা সর্বজন প্রশংসিত। একটি মানুষ একটা গাড়িকে ভালোবেসেছে—এই সহজ কাহিনী থেকে ছবিটি শেষ পর্যন্ত উত্তীর্ণ হয় মানুষ ও যন্ত্রের ঝান্ডিক সম্পর্কে। ঠাণ্ডার গ্রামে গিয়ে যা ঋষিকের প্রথম প্রতীতি তাই তাঁর অযান্ত্রিক ছবির মৌল ও সচেতন প্রত্যয়। ঋষিক জানান মানুষের একটা

অংশ প্রকৃতির মধ্যে গিয়ে পড়েছে, সেটা পশু। আর একটা অংশ সভ্যতার মধ্যে গিয়ে পড়েছে, সেটা যন্ত্র। যন্ত্র ও জন্তুর এক যন্ত্রণাদায়ক সম্মুখে মানবিক বোধ জন্মায়, অযান্ত্রিক-এ কালোয়াররা যখন গাড়ির জঞ্জাল ঠেলে নিয়ে যায় তখনো হেডলাইট জ্বলতে থাকে, পশুর মতো টলে টলে এগিয়ে যায় ভাঙাচোরা যন্ত্র, ঋত্বিক হেডলাইট জালিয়ে রাখতে বাধ্য করেন। মনে হতে পারে যন্ত্র আর মানুষের জটিল সম্পর্ক মিলিয়ে ঋত্বিক এভাবে এক দুর্ভাগ্য সাইবারনেটিক্স রচনায় ত্রুটি হয়েছেন। কিন্তু ঋত্বিক জানেন শেষ পর্যন্ত মানুষ ছাড়া ছবি হয় না, মানুষ ছাড়া পরীক্ষার আর কোনো বিমূর্ত বিষয় নেই, তাই শেষ দৃষ্টে একটি শিশুর হাতে গাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখে বিমল হাসিতে স্নিগ্ধ হয়। জীবন এগিয়ে চলে।

অভিনয়ে কালী বন্দ্যোপাধ্যায় (বিমল), অনিল চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়; আলোকচিত্রে দীনেন গুপ্ত, সম্পাদনায় রমেশ ঘোষী, সংগীত আলি আকবর খান।

## বীতশোক ভট্টাচার্য

॥ জি. অরভিন্দন ॥

১৯৩৫-১৯৯১, মালয়লম চলচ্চিত্র জগতের বিতর্কিত পুরুষ। তাঁর বেশ কয়েকটি ছবির শিল্প-স্বীকৃতিতে সর্বভারতীয় চলচ্চিত্রেই তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। তিনি ছিলেন জীববিদ্যার স্নাতক, জন্মে ছিলেন কেরালার এক ছোট্ট শহর কোটায়ানে। বাবা মালয়লম সাহিত্যের বিখ্যাত হাঙ্গুরদিক লেখক ছিলেন। কলেজোত্তর জীবনে অরভিন্দনের জীবিকার শুরু কার্টুনিষ্ট হিসেবে। দীর্ঘ তের বছর মালয়লম সাপ্তাহিক 'মাক্ৰভূমি'তে তিনি কার্টুন এঁকেছেন। পরে সেই অসংখ্য ব্যঙ্গচিত্রের নির্বাচিত অংশ নিয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। উত্তর ভারতীয় শাস্ত্র সংগীত এবং কর্ণাটকী সংগীতে ছিল তাঁর সনান ব্যুৎপত্তি। ছিলেন 'থিরাভারুপ্প' নাট্যগোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান পুরুষ।

প্রথম ছবি 'উত্তরায়নম' তৈরি হয়, ১৯৭৪-এ। দ্বিতীয় ছবি 'কাঞ্চন সীতা' (১৯৭৭), তৃতীয় ছবি 'থাম্পু' (৭৮)। 'থাম্পু' অরভিন্দনের শিল্প-স্বীকৃতি আরো বাড়িয়ে দেয়। পরবর্তী ছবি 'এস্বাপ্নম' (৭৯)। ঐ একই বছর নির্মিত হয় 'কুম্মাস্তি'। ১৯৮১ সালে অরভিন্দন নির্মাণ করেন 'পঙ্কভেইল'। ১৯৮৫-তে তাঁর 'চিদাম্বরম' শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে জাতীয় পুরস্কার অর্জন করে। তাঁর পরের ছবি 'ওরিদাথু' (০৭)। বারো বছর সময় সীমায় তৈরি আটটি পূর্ণ দৈর্ঘের ছবি, যার

সবকটিই একাধিক পুরস্কারে সম্মানিত, এবং তার পাশাপাশি প্রায় আধ ডজন তথ্যচিত্র নির্মাণও তাঁর শিল্প-প্রযত্ন ও নিষ্ঠার দিকটা তুলে ধরে। অরভিন্দনের এবিধিধ সৃষ্টিপ্রাচুর্য এবং চলচ্চিত্র ঐকান্তিকতার জাতীয় স্বীকৃতির প্রতি লক্ষ্য করেই তাই সমালোচককে বলতে হয় ‘he has given to Malayalam cinema the stature that Satyajit Ray has given to Bengali cinema.’

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মালয়লম সিনেমার তথাকথিত অতি নাটকীয়তা, অতিরঞ্জন, বিকৃতি, অর্পহীন বাস্তব বিবিধ পারস্পর্ঘহীনতার বিপরীতে, একেবারে স্বকীয় ভঙ্গিতে, স্বকীয় মনন-বিলাসে অরভিন্দন যে ছবি নির্মাণ করেছেন, তা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। তাঁর বিষয় নির্বাচনের মধ্যেই তাঁর স্বিত, প্রশান্ত শিল্প-মানসিকতার ছাপ স্পষ্ট হয়ে আছে।

তাঁর ‘খাম্পু’ দেখেই বোঝা গেছিল তিনি চলচ্চিত্রের ভাষা এবং আত্মার প্রতি প্রযত্নবান। কিন্তু তাঁর কোনো-কোনো ছবির শরীর ছাড়িয়ে আত্মার সন্ধান তিনি পাননি। কাহিনীর ভেতরটা দেখতে জানলেই তার স্টাইলটা আপনি গড়ে ওঠে। বিষয়ের বৈচিত্র্য নিয়ে আনন্দের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু ‘কুম্মান্তি’র আপাত রূপকথার কাঠামো ছাড়িয়ে যেমন স্পষ্ট কিছু বেরিয়ে আসে না, তেমনি ‘পঙ্কভেইল’ ছবির তরুণের মানসিক ক্রম অবনতির ভেতর দিয়ে তিনি কোনো বিশেষ জায়গায় পৌঁছান না। এক ঘণ্টা সাতচল্লিশ মিনিটের এই রঙিন ছবির অসাধারণ ফোটোগ্রাফি, স্থানিক মায়াময়তার মধ্য দিয়ে পরিচালক তাঁর আত্মমগ্ন স্বপ্নচারিতায় ভ্রমণ করেছেন। বিষাদময় কাহিনীর আধারে তিনি যে ভঙ্গিতে বিষয়ের বিস্তার করেছেন, সেটি বক্তব্যের সঙ্গে অদ্বাদ্বি যুক্ত হয়নি। ‘কাঞ্চন সীতা’ ছবিতে তিনি পৌরাণিক কাহিনীর আধুনিকীকরণ করতে চেয়েছেন। রামায়ণের দেবত্বের তুলনায় বেশিমাাত্রায় মানবিক করে চরিত্র-চিত্রণের চেষ্টা আছে। মধুর, শান্ত, এক অকারণ জটিল ট্রুট্টেমেন্টের আশ্রয়ে পরিচালক আর্থ-অনার্থের সংঘাত ও সংমিশ্রণের প্রতি ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন। সম্ভবতঃ ‘চিদাম্বরম’ তৈরি করার সময়ই তিনি একটু ভিন্ন পথে ছায়েটিভের দিকে ঝুঁকিয়েছিলেন। ‘Of my films, only Chidambaram had a well-knit story...to a degree.’

ওই কাহিনীর কাঠামোয় অরভিন্দন প্রকৃতি, মাহুয, প্রেম, আসক্তি, সম্পর্ক, মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে নিজের মতো করে ভেবেছেন। একদিকে ভারতীয় সনাতন সংস্কৃতির প্রতি আস্থা, অত্য়দিকে ভারতের ধর্মীয় প্রজ্ঞা, দর্শনের রহস্য

এবং তার সঙ্গে কিছুটা ঈশ্বর চিন্তার আভাস অরভিন্দনের চেতনায় ক্রিয়াশীল দেখতে পাই। শিল্পিত স্বভাবে তিনি কিছুটা মিস্টিক। প্রকৃতির সঙ্গে মালুঘের এক অনন্ত সম্পর্কের প্রতি তিনি প্রথমাবধিই আস্থাশীল। জড়বস্তু, আদিম প্রকৃতি, প্রবাহিত নদী, অনবন্ত ল্যাণ্ডস্কেপের মধ্যে সঞ্চারমান তাঁর চরিত্রেরা অনেকাংশেই তাই আত্মমগ্ন। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মার্গ সংগীতের ব্যুৎপত্তি থেকে লব্ধ চেতনায় তিনি ভিস্ময়ালের সঙ্গে বস্তু ও চরিত্রের অঘয় স্থাপনে সচেষ্ট।

আসলে নিজস্ব শিল্পদৃষ্টি ও চলচ্চিত্রের ব্যাকরণ অরভিন্দনের অধীগত ছিল, কিন্তু দিনেমার ভাষা নিয়ে তিনি ততোটা ভাবিত ছিলেন না। বিষয়ের আতিশয্যে তিনি দৃশ্য ও বস্তুর মধ্যে চলচ্চিত্রের প্রার্থিত গতির সাযুজ্য অনেক সময়ই রক্ষা করেননি।

তাঁর অকাল মৃত্যু তাঁর আগামী ভাবনা চিন্তার পরিণত ফসল-থেকে আমাদের বঞ্চিত করেছে।

**সোমেন ঘোষ**

॥ অয়দিপাউস রেক্স ॥

১৯৬৭তে পাওলো পাসোলিনি পরিচালিত ইতালিয় ছবি। পুরাণকে আধুনিকে ভেঙে নির্মাণের কাজ থেকে যায় অধিকাংশ সং দায়িত্বশীল শিল্পীর। সোফোক্লেসের প্রাচীন ট্রাজেডি অবলম্বনে প্রাগৈতিহাসিক প্রেক্ষাপট, বিষয় মরুভূমির পটভূমিতে স্বতঃস্ফূর্ত বিচিত্র রঙিন আলোকচিত্রে বন্ধনহীন ক্যামেরাশৈলী ও আদিম সংগীতকে আশ্রয় করে পাসোলিনি এই ছবিতে ধীর ও ধারাবাহিক ভাবে নায়কের ব্যক্তিগত আতঙ্কের মর্মান্তিক উদ্ঘাটন দেখিয়েছেন। ট্রাজিক-চেতনায় বিশ্বাস রাখেন বলে একদিকে যেমন এ ছবিতে বস্তু উল্লাসের সঙ্গে মানবিক বিষাদ মিশে আছে, অঙ্ক-দিকে তেমনি মিথকে পরিচালক অতীত থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তার দিয়েছেন, দেখিয়েছেন অজ্ঞাত নিয়তির তার প্রত্যেকের কাছে এখনও তেমনই মর্মান্তিক, মিথের উদ্দেশ্য এইভাবে সাম্প্রতিক অস্তিত্ব ও অহুসঙ্গ পায়, তার প্রয়োজন ও অভিঘাত হয়ে ওঠে সর্বাধুনিক। বস্তুসত্য থেকে পাসোলিনি আসেন কাব্যসত্যে। রুক্ষ মরুভূমি মুছে গিয়ে ভেসে ওঠে সবুজ প্রান্তর যা অয়দিপাউস স্বপ্নে দেখেছেন কতবার। ছবির আঙ্গিকে ও আবেদনে এমন এক কালোত্তর সমৃদ্ধি আছে বলেই কোনো কোনো শিথিলতা সবেও পারসোনাল ফিল্ম রূপে অভিহিত এ ছবি এত মূল্যবান।

অভিনয়ে ফ্রান্সো সিটি (অয়দিপাউস), বেনে, পাসোলিনি; চিত্রগ্রহণে Colli, শিল্প নির্দেশনায় Donato, আবহ সংগীত হিশেবে ছবিতে আদিম সংগীত ব্যবহৃত ।

॥ অস্ট্রেলিয়া ॥

এই দেশে সিনেমার সৃষ্টি ১৮৯৬-এ সংবাদচিত্র দিয়ে । প্রথম কাহিনীচিত্র সাড়ে ছেয়টি মিনিট ব্যাপী স্থায়ী দি স্টোরি অব দি কেলি গ্যাং (১৯০৬), এটি অনেকের ধারণা পৃথিবীর প্রথম কাহিনীচিত্র । অস্ট্রেলিয়ার চলচ্চিত্রের প্রধান ঐতিহ্য ও সাফল্য সংবাদচিত্র, তথ্যচিত্র ও নৃতাত্ত্বিক চলচ্চিত্রের । তার এই ধরনের ছবির মান খতি উন্নত । এই ঐতিহ্যের দক্ষন তার প্রথম দিককার কাহিনীচিত্রগুলিতেও এক ধরনের আন্তরিকতা দেখা যায় । তৎকালীন পরিচালকদের মধ্যে আর. লংফোর্ড, C. Chauvel ও তার পরে এইচ. ওয়াট ও আর. স্মার্ট উল্লেখযোগ্য । এঁদের ছবিতে দেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য আর দেশজ সংস্কৃতি ও দেশাচারের সরল, স্বতঃস্ফূর্ত উদাহরণ মেলে । এই দেশ শব্দ-প্রযুক্তি আয়ত্ত করে খুব তাড়াতাড়ি, ১৯৩০য়েই প্রথম সবাক ছবি নির্মিত হয়, জাতীয় ফিল্ম বোর্ড স্থাপিত হয় ১৯৪৫-এ । এ দেশের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ছবিতে গ্রেট ব্রিটেনের প্রভাব থাকলেও পরবর্তীকালের ছবিতে আমেরিকারই প্রভাব বেশি । তৎকালীন পরিচালকদের মধ্যে আয়ান ডানলপ ও ক্রস বেরেসফোর্ডের নাম করা যায় । অস্ট্রেলিয়ান ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন স্থাপিত হবার পর, সম্প্রতি চলচ্চিত্র এখানে সার্থক সাহিত্য থেকে ভাবনা সংগ্রহ করা শুরু করেছে, যার ফল ভালো হতে পারে । এর প্রমাণ পল কল্ল ও তাঁর ছবিগুলি । কল্লের ছবিতে পশ্চিম চিত্ররীতির সঙ্গে প্রাচ্য চিত্রভাবনার মন্দর সমন্বয় ঘটেছে ।

॥ অ্যাত্যর (Auteur) তত্ত্ব ॥

[ চলচ্চিত্র সমালোচনার একটি বিশেষ ধরন ও পদ্ধতি । ঊর্দে বাজঁর ফিল্ম বাস্তবতা ও নান্দনিক আদর্শের ধারণাকে উৎস করে ও তাকে ক্রমবিকশিত করে এই তত্ত্ব পূর্ণাঙ্গ রূপ পায় । ফরাসি চলচ্চিত্র পত্রিকা কাইয়ে হু সিনেমা ১৯৬৩ পর্যন্ত এই তত্ত্বের প্রধান ধারক ও বাহক ছিল । এই তত্ত্বের বিখ্যাতী বহু সমালোচক পরে চলচ্চিত্র পরিচালনা করেছেন, যেমন স্ত্রাল, ক্রফো, গদার, রিভেত, রোহ্মের । ( দ্র. চলচ্চিত্র সমালোচনা ) । পরের পৃষ্ঠায় এই তত্ত্বের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেওয়া হলো । ]

১৯৪৬ সালে La Revue du Cinema-র জন্ম থেকে কাইয়ে চলচ্চিত্র সমালোচনার ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে এক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে—‘Politique des auteurs’ অথবা অত্যন্ত তব্ব অথবা অথর পলিসি। সমসাময়িক রাজনৈতিক চলচ্চিত্র নির্মাণের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কাইয়ে পরবর্তীকালে বাজী প্রবর্তিত ভাববাদী নন্দনতত্ত্বকে পরিত্যাগ করে বস্তুবাদী নন্দনতত্ত্ব উপস্থাপন করে। একসময় কাইয়ে উৎকৃষ্ট ফিল্ম করিয়েদের সমর্থন করেছিল, পরে তার রূপান্তর ঘটে পোলিটিক্যাল ফিল্ম অথরের সমর্থনে—যদিও উৎকৃষ্ট পরিচালকদের ক্ষেত্রেই ওই সমর্থন নীমাবন্ধ।

অথর পলিসির উৎপত্তি হয় এই বোধ থেকে যে, ফিল্ম তার চরম উৎকর্ষতার ব্যক্তিগত শিল্পীর সৃষ্ট একটা অখণ্ড সমগ্র (organic whole)। অথর থিয়েরি দিনেমাকে তার বিষয়বস্তু ও আনুমানিক ভঙ্গি অনুসারে western, musical, gangster, filmed theatre, science fiction ইত্যাদি কতকগুলো ধরন বা genre-এ ভাগ করার বিরুদ্ধে। বস্তুত দুই দৃষ্টিভঙ্গি পরস্পর-বিরোধী নয়, কেননা ধরনগত বা গোষ্ঠীগত ফিল্ম ফিল্মকরিয়েকে কতকগুলো চলিত প্রথা বা নিয়মকানুন দিয়ে থাকে এবং তিনি সেই নির্দিষ্ট ধরনের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত শৈলী প্রয়োগ করেন।

এই অথর পলিসি কতকগুলো নির্দিষ্ট মূল্যায়ন করেছে যেমন, ফিল্মকরিয়ে মাত্রই অথর নয়, অথর হলেন কমবেশি প্রতিভাবান। যদিও একই অথর বিভিন্ন genre-র ছবি করেন তবু তাঁর সৃষ্টি এক অখণ্ডতা বা সমগ্রতায় বিধৃত। ফলত এক মহৎ অথরের ব্যর্থতা সাধারণ ফিল্মকরিয়ের সার্থকতার চাইতে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

অবশ্যই এই তত্ত্ব ক্রটিমুক্ত নয়, ফিল্মের গুণাগুণ বিচারের ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতি ও ধরনকে অবহেলা করে এই নীতি একদেশদর্শী হয়ে উঠেছিল। অতীতকে বহু ফিল্মের ও ফিল্মকরিয়ের স্ফায় গুণাগুণ বিচারে এই নীতির দান অনস্বীকার্য। বলা বাহুল্য, এর অবর্তমানে অনেক ফিল্ম ও চিত্রপরিচালককে অন্তরালে থেকে যেতে হতো। সর্বোপরি, দিনেমাদর্শকদের দিনেমার গুরুত্ব সম্বন্ধে সজাগ হতে ও শিল্পীদের ফিল্ম-মাধ্যমে নিজেদের প্রকাশ করতে অথর তত্ত্ব বরাবরই উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়ে এসেছে।

কাইয়ের লেখকরা বহু ফিল্মকরিয়ের সৃষ্টিতে আগ্রহ দেখিয়েছেন—এই ফিল্মকরিয়েদের খুব কম সংখ্যকই এক শ্রেণীতে পড়েন। রুচির এই বিভিন্নতার বিপরীতে ষাট দশকের মাঝামাঝি কাইয়ের হঠাৎ দ্রুত প্রগতিশীল পরিবর্তন ঘটে। এই

পরিবর্তন এসেছিল ফিল্মের দিক থেকেই। ফিল্মই কাইয়েকে ভিন্ন পথ অনুসরণে বাধ্য করাল। প্রকৃতপক্ষে, ফিল্মের দ্বারা নীতিগত পরিবর্তন খুবই যুক্তিসম্মত, অথর তবের কার্যকারিতাই এর দ্বারা প্রমাণিত হয়। কাইয়ে ছিল অথর অনুসরণী, সেই অথরেরা পলিটিক্যাল ফিল্ম করতে শুরু করলেন। এঁদের ফিল্মের মূল্যায়ন করতে গিয়ে কাইয়েকে নতুন সমালোচনা তবের অবতারণা করতে হলো। কেননা, পুরনো ভাববাদী নন্দনতব বস্তুবাদের পথ ধরে যে সমস্ত ফিল্ম তৈরি হচ্ছিল তাদের ব্যাখ্যা করে উঠতে পারছিল না।

ফিল্ম করার সকল স্তরেই ভাববাদী ও বস্তুবাদী চিন্তার প্রধান প্রধান পার্থক্যকে তাই চিহ্নিত করা হলো—

বাস্তবের পুনর্গঠন : বুর্জোয়া মানসিকতায় বাস্তব বেরকমভাবে প্রতিসরিত হয়ে থাকে ভাববাদী সিনেমা সেই বাস্তবের সৃষ্টি করে; বস্তুবাদী সিনেমা অবশ্যই বাস্তবের পুনঃসৃষ্টি করে থাকে, বস্তুবাদী মনের মাধ্যমে যে বাস্তব প্রতিসরিত হয়, কিন্তু বাস্তবের ইনুশন তৈরির প্রয়োজনীয়তা তাতে থাকে না।

ইতিহাস : ভাববাদী সিনেমার ইতিহাস রৈখিক, কারণভিত্তিক, স্বশাসনিক; বস্তুবাদী সিনেমার ইতিহাস উন্মুক্ত—বরাবরের জন্ম নতুন করে সৃষ্টি হচ্ছে।

উদ্দেশ্য : ভাববাদী সিনেমা উপলব্ধি করার কারণ সরবরাহ করে থাকে; বস্তুবাদী ফিল্ম পৃথিবীকে অনুসন্ধানের উপায়।

যান্ত্রিক প্রক্রিয়া : ভাববাদী সিনেমা ক্যামেরা ও পর্দাকে ফেটিশ্-এর মতো ব্যবহার করে; বস্তুবাদী সিনেমা ফিল্ম টেকনিকের যান্ত্রিক প্রকৃতিকে নুকোবার চেষ্টা করে না।

মাধ্যমের প্রয়োগ : ভাববাদী সিনেমা স্বচ্ছতার অনুসন্ধানকারী; বস্তুবাদী সিনেমা সচ্ছতা অনুসন্ধান করে না, সচ্ছতাকে প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যায় অভিযুক্ত করে।

পর্দা : ভাববাদী সিনেমায় পর্দা মুখোশের মতোই বাস্তবকে আড়ালে রাখে; কিন্তু পর্দায় প্রতিফলিত স্পেসের সঙ্গে পর্দার বাইরে কল্পিত স্পেসের সম্বন্ধ দ্বন্দ্বিক।

দৃষ্টিভঙ্গি : ভাববাদী ফিল্ম মানবতাবাদী, ভাবপ্রবণ, আধ্যাত্মিক ও ঈশ্বরতত্ত্ব কেন্দ্রিক; অতীতকে বস্তুবাদী ফিল্ম বস্তুবাদী, বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনার অনুসন্ধানকারী ও স্বাভাবিকভাবেই নাস্তিক।

বিশ্বাস : ভাববাদী সিনেমায় পর্দাকে থিয়েটারের ঘনক্ষেত্রের মতো চারদিক-আবদ্ধ মনে করা হয়; কিন্তু বস্তুবাদী পর্দা শ্রেণীসংগ্রামের দৃশ্য উন্মোচিত হয়ে যায়।

প্রণালী : ভাববাদী নন্দনতত্ত্ব পরীক্ষালব্ধ, বিক্ষিপ্ত ; বস্তুবাদী নন্দনতত্ত্ব দ্বন্দ্বিক, বিজ্ঞানসম্মত ।

শট : ভাববাদী সিনেমায় শট হলো এক সমগ্রের অংশ, যে সমগ্র অংশকে অভিক্রম করে যায় ; বস্তুবাদী সিনেমা মনে করে যে, প্রত্যেক শটই স্বয়ংনির্ভর এবং অন্ত্যন্ত শটের সঙ্গে সম্পর্কে আবদ্ধ ।

দর্শক : ভাববাদী সিনেমা সবার কাছে পৌঁছবার চেষ্টা করে ; বস্তুবাদী সিনেমা বিশেষ দর্শকদের উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট ।

পরিভাষা : ভাববাদী নন্দনতত্ত্ব যথাযথ উপায়ে ভাষা ব্যবহার করে না, শব্দের মিথ্ সৃষ্টি করে ; অন্ত্যদিকে বস্তুবাদী পারিভাষিক শব্দাবলী আরো যথাযথ ।

এই ধরনের তুলনার শেষ নেই, সম্ভবত এগুলো কিছুটা সরলীকৃতও । তবে মোটামুটিভাবে এই তুলনা সাধারণ প্রবণতাগুলি নির্দেশ করে । এবং অপর পলিসি থেকে এই পলিটিক্যাল ফিল্ম তত্ত্ব—অত্যন্ত তত্ত্বের এই হলো কাইয়েকৃত বিবর্তন ও বিকাশ ।

গান্স্ট রোবের্জ

॥ সের্গেই মিখাইলোভিচ আইজেনস্টাইন ॥

( ১৮৯৮-১৯৪৮, নোভিয়েত রাশিয়া ) । পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ দশজন চিত্র-পরিচালকের একজন, খুব সম্ভবত, প্রথম জনই সের্গেই আইজেনস্টাইন । তথাপি আইজেনস্টাইন নিতান্ত চিত্রপরিচালকই নয়, প্রাথমিক ভাবে তিনি হলেন চলচ্চিত্রের ও শিল্পের এক অনন্ত দার্শনিক, সৃষ্টির বিবিধ মাধ্যমের মধ্যে চলচ্চিত্রও যার কাছে একটি মাধ্যম । তাঁর রচনা, হাতে আঁকা ছবি ও নির্মিত চলচ্চিত্রের ভেতর একটা স্পষ্ট যোগসূত্র কাজ করেছে যেহেতু সৃষ্টি হিসেবে তাঁর কাছে এগুলো পরস্পরের পরিপূরক ও সম্পূরক ।

১. আইজেনস্টাইনের চিত্রজীবন : যেহেতু তাঁর কোনো কোনো ছবির, বিশেষত, সর্বশেষ চিত্র 'আইভান দি টেরিবল্'-এর আঙ্গিক, প্রচলিত আঙ্গিক থেকে আলাদা, ( বিশুদ্ধ ও গবেষণামূলক ), ফলে কারও কারও মনে হতে পারে যে তাঁর ছবি আঙ্গিকসর্বশ । এটা যে অন্ত্যায় ধারণা শুধু তাই নয়, চিত্রনির্মাণ সম্পর্কে তাঁর উদ্দেশ্য ও বিধেয় সম্বন্ধে পুরোপুরি অজ্ঞানতাও । কেননা আঙ্গিক নিয়ে প্রদর্শন-প্রিয়তা তিনি স্বপ্নেও ভাবতেন না, আঙ্গিক বিষয় কলাকৌশল—সব মিলিয়ে মাধ্যমটিকে নিজের অধিকারে আনাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য । আঙ্গিক বিষয়ে তাঁর

আগ্রহ ছিল নিশ্চয়ই, তাঁর একেবারে প্রথম দিককার একটা লেখা হলো ‘The question of a materialist approach to form’ ( ১৯২৫ ), তাঁর একখানা প্রবন্ধ-সংকলনের নামও ফিল্ম ফর্ম। সেই ব্যাপারটা কিন্তু প্রায়ুক্তিক, তিনি ছিলেন শিক্ষক ও বিজ্ঞানী, ছবি তৈরি করা, অধ্যাপনা করা, ও প্রবন্ধ লেখা—তাঁর কাছে এগুলো ছিল শিল্পসৃষ্টির রহস্য উপলব্ধি করার চেষ্টা, যাতে সৃষ্টির নিয়ামক সূত্রগুলিকে গঠন করা যায় ও চলচ্চিত্রের ছাত্রদের হাতে তা তুলে দেওয়া যায়। ক্রাসখন, গুটুডিও আর নিজম্ব এয়াগার, আইজেনস্টাইনের গবেষণায় এরা যাকে অথোর সাথে আঁড়ি। ক্রাসখন তো অনেকটা গবেষণাগারের মতোই দেখানো। তিনি তাঁর গবেষণাকে পরীক্ষা করে দেখতেন। ছাত্রদের জন্ত রচিত তাঁর প্রবন্ধ নিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা নতুন প্রবন্ধের চিন্তা জোগাত। যেমন রেখাচিত্রের অঙ্কন হলো সঠিক আকারে উপনীত হবার অপরিহার্য অনুশীলন পদ্ধতি।

মাত্র চলচ্চিত্র ও শিল্প নয়, তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র ছিল বহুবিস্তৃত। রসায়ন থেকে অধিবিজ্ঞা, আদিম সংস্কৃতি থেকে ঐতিহ্যপরায়ণ চীনা বা জাপানি শিল্প সমস্তই তার অন্তর্ভুক্ত। সারাজীবনে যা তিনি শুনেছেন, পড়েছেন, দেখেছেন সবই তাঁর গবেষণার কাজে লেগেছে। ছবিতে, আলোচনায় তা কোনো না কোনো ভাবে খসে গেছে। যে জন্ত তাঁর ছবির সমস্ত উপাদানকে সঠিক বুঝে গুঠা এত কঠিন। তার মানে এই নয় যে তিনি ছবি করতেন দর্শকদের কথা না ভেবে। তাঁর চিন্তার প্রাথমিক স্তরেই ছিল দর্শকরা, যে উদ্দেশ্যমূলকতায় তিনি তথাকথিত ‘কম্যুনিয়াল’ পরিচালকদের নতো দর্শক-সচেতন ছিলেন। পার্থক্য ছিল এই যে, দর্শকদের নিছক প্রমোদ দান তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, তিনি তাদের বুদ্ধি ও মন বর্ধনের পক্ষপাতী ছিলেন, যা একটা ম্যানিফেস্টোয় একবার তিনি স্পষ্ট করে গেলেন। মূলগতভাবে তাঁর ছবি ছিল শিক্ষামূলক-প্রচারবাদী। চলচ্চিত্রের আদিক দিনয়ে তাঁর গবেষণা দর্শকদের উপযুক্তভাবে শিক্ষিত করে তোলার জন্ত মাধ্যমটিকে শাসনালী করার চেষ্টা, বা মাধ্যমকে, তাঁর ভাষায়, জীবন্ত অনুশীলনী গ্রহণ করে তোলা। তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না যে মাক্সের দাস ক্যাপিটালকে চলচ্চিত্রায়িত করা সম্ভব।

দর্শকদের ওপর তাঁর ছবির নির্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত প্রভাব থাকবে এটা ছিল আইজেনস্টাইনের প্রধান বাসনা। এটি তাঁর গবেষণা ও চিত্রনির্মাণ উভয়কে প্রভাবিত করেছে। চিত্রনির্মাণের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি তাস্বিক গবেষণার খোরাক পেতেন ও তা তাঁর পরবর্তী সৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করত। ছবি তৈরির সময়ে তিনি

অনুসরণ করতেন স্বজ্ঞাকে ও তৈরি শেষ হয়ে যাওয়ার পরে, যে সব মেকানিজম ছবিটিকে সার্থক করে তুলেছে তাদের বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করতেন, যাতে আগামী ছবিতে ওই মেকানিজমকে নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে কাজে লাগানো যায়। তাঁর সমসাময়িক পরিচালকদের অনেকের মাধ্যমটিকে রহস্যময় করে তোলার চেষ্টা চলচ্চিত্রকে অধিকারে আনার ও একে সাংস্কৃতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের প্রয়াসে বিফলতা আনবে, তিনি আশংকা করছিলেন। আইজেনস্টাইনের নিজের মধ্যে ছিল একদিকে স্বজনশীল শিল্পচেতনা, অন্যদিকে বিজ্ঞানভিত্তিক প্যাশন, আর স্বজনপ্রতিভার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ, এমনকি প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও। তিনি বিশ্বাস করতেন চলচ্চিত্র নির্মাণসহ সমস্ত মানবিক কার্যাবলী গাণিতিক খুঁতহীনতায় পরিকল্পিত ও নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। তাঁর 'থু রেভলিউশন টু আর্ট, থু আর্ট টু রেভলিউশন' প্রবন্ধে তিনি এই প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন যে যন্ত্রবিদ হিসেবে তাঁর স্বল্প অভিজ্ঞতাপ্রসূত শিক্ষার সমর্থন তিনি পেয়ে যাবেন সৃষ্টির উৎস ও শিল্পের প্রকৃতি নিয়ে তাঁর অনুসন্ধানের ভেতর। যে প্রতিভার তিনি সবচেয়ে প্রশংসা করতেন তিনি হলেন শিল্পী-বিজ্ঞানী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি। শিল্প ও বিজ্ঞানচেতনার এই সমন্বয়ের প্রয়াস সিনেমা মূলত টেকনিকপ্রধান বলে আরও বেশি সম্ভাবনাময় ও বাস্তবসম্মত।

আইজেনস্টাইন বলতেন, শিল্পীর কোনো একটা ছবিকে বুঝে উঠতে গেলে তাঁর অন্ত্য ছবি, রচনা ও রেখাচিত্রেরও অনুশীলন প্রয়োজন। বিশেষত সেই ছবি প্রযোজনার সময়ে যে সমস্ত ছবি হাতে আঁকা হয়েছিল সেগুলো। 'ক্লাসিককে বুঝতে হলে, চূড়ান্ত সৃষ্টিই যথেষ্ট নয়, শিল্পী বিবিধ নোট ও স্কেচে তাঁর যে তাৎক্ষণিক ও আত্মপাঙ্কিক বিবরণ রেখেছেন তাও জরুরি', তিনি লিখেছিলেন। এই মতবাদ তাঁর নিজের ছবির ক্ষেত্রেও পুরোপুরি প্রযোজ্য। তাঁর রেখাচিত্র তাঁর আত্মপাঙ্কিক কল্পনাশক্তির দৃশ্যরূপ ও তার পক্ষে দৃশ্যগত সমর্থন। এই অঙ্কন আসলে আকার ও আকৃতি নিয়ে পরীক্ষা, যা শীলিত ও সরলিকৃত। তাঁর কর্মজীবনের (১৯২৪-১৯৪৮) পুরোটাই রচনার জগৎ নিয়োজিত, পেটাও আলোচনীয়।

২. রচনা : আইজেনস্টাইনের প্রবন্ধগুলিতে তাঁর তত্ত্ব, সিনেমা বিষয়ে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি, ও শিল্পসৃষ্টির পদ্ধতি প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর রচনার কার্যকারী ও কালজয়ী তাত্ত্বিক উপাদানগুলিকে একত্র করে একটি বা কয়েকটি সংহত প্রবন্ধে প্রকাশ করা সময়ের অভাবে হয়ে ওঠে নি। তবু অসম্পূর্ণ কিন্তু স্বদীর্ঘ *The Non-indifferent Nature* আলোচনা এই দিকে এক বড়ো পদক্ষেপ। চল্লিশের দশকে তাঁর

কয়েকটি প্রধান প্রবন্ধের অনুবাদ *The Film Sense and Film Form* নামে প্রকাশিত হয়। পরে আরো সংকলন-গ্রন্থ *Film Essays, Notes of a Film Director, Lessons with Eisenstein* প্রকাশ পায়। বিভিন্ন সময়ে রচিত প্রবন্ধ বিভিন্ন সময়ে অনূদিত ও প্রকাশিত হয়ে আইজেনস্টাইনের চিন্তাধারা সম্পর্কে নানা দৃষ্ণের সৃষ্টি করেছে। বিশেষত মনতাজ বিষয়ে তাঁর ধারণা সম্পর্কে। এই তত্ত্ব কুড়ি বছরেরও বেশি সময় ধরে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়ে কীভাবে একটা যান্ত্রিক কৌশল থেকে এগুটা notion হয়ে উঠতে পেরেছিল (আরিস্টটলে যেমন দ্রষ্ট থেকে আ্যাকশন) তা আইজেনস্টাইনের প্রবন্ধগুলি কালানুক্রমিক ভাবে পাঠ না করলে কিছুতেই বুঝে ওঠা যায় না। তিনি যে সমস্ত বই যখন পড়েছিলেন তখনো তাঁর প্রবন্ধে উদাহরণ দিতে, তুলনা আনতে, ও ভাবনা সৃষ্টিতে কীভাবে সাহায্য করেছে তাও আগ্রহকর। যেহেতু অনুবাদে মূল বক্তব্য একটু অস্পষ্ট হয়ে যাবেই তাই তাঁর একই প্রবন্ধের বিভিন্ন অনুবাদ পাশাপাশি রেখে পড়াও জরুরি। তাঁর প্রথম দিকের রচনা 'মনতাজ অব্ অ্যাট্রাকশনস' (১৯২৩)-য়ে উপাদানের মনতাজ বিষয়ে যে তাত্ত্বিক আলোচনা আছে কালক্রমে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাকে পরিবর্তিত করে শিল্পের সাধারণ তত্ত্বের রূপ দেন। এইভাবে তাঁর একটি বক্তব্যকে তাঁর পরবর্তী রূপ ও অস্থান বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে রেখে অধ্যয়ন বাঞ্ছনীয়। তাহলে তা আরো প্রাসঙ্গিক ও সহজবোধ্য হবে। তাঁর রচনায় চিন্তার একটা অ্যাসোসিয়েটিভ ধরনও চোখে পড়ে, এক বিষয় আরেক বিষয়কে এনে দেয় ও দুয়ে মিলে তৃতীয় এক বিষয়কে উপস্থাপিত করে। উপাদান-সংশ্লেষণের মনতাজসম্মত এই পদ্ধতি তাঁর রচনার ক্ষেত্রেও সক্রিয়। যেখানে তাঁর পরিচালনায় সম্পূর্ণ ছবির সংখ্যা মাত্র আটটি দেখানে ১৯৬৪-তে রাশিয়ান ভাষায় পুনর্নির্মিত তাঁর রচনাবলীর দুয়টি খণ্ড, ও আরো একাধিক খণ্ড যন্ত্রস্থ। এর মধ্যে তাঁর অনেকাধিক ছবি সম্পর্কে নিজের দীর্ঘ ও মূল্যবান আলোচনাও রয়েছে। এমন হলে পারে সংশ্লিষ্ট, সংক্ষিপ্ত ও সম্পাদিত অবস্থায় এইসব রচনা তাঁর ছবির চেয়ে বেশি মূল্যবান হয়ে উঠবে, ছবি তখন হবে রচনার প্রায়োগিক ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

৩. রেখাচিত্র : আইজেনস্টাইনের পেনসিল, ক্রেয়ন, প্যাস্টেল ও কালিতে আঁকা ছবিগুলিকে দুটো প্রধান ধরনে ভাগ করা যায়, চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে অঙ্কিত চিত্র ও অস্থান বিষয়ভিত্তিক চিত্র। ছবির জন্তু আঁকা রেখাচিত্র, যেমন 'ক্য ভিতা মেসিকো' ও 'আইভান দি টেরিবল্' চিত্রমালা চিত্রনাট্যেরই আর একটি দিক— অনেকটা শর্ট হ্যাণ্ড স্ক্রিপ্ট রাইটিং-এর মতো। তিনি বিশ্বাস করতেন একজন যোগ্য

চিত্রনাট্যকার / পরিচালক তাঁর নির্মীয়মান ছবির জ্ঞান বিভিন্ন দৃশ্য মনশ্চক্ষে এত সূক্ষ্মভাবে কল্পনা করতে পারবেন যে তিনি তা এঁকে ফেলতে পারেন খুঁতহীন ভাবে। তাহলে শিল্প-নির্দেশক ও অভিনেতাদের তিনি নির্দেশ দিতে পারেন সঠিকভাবে। আইজেনস্টাইনের কাছে আঙ্গিক ও দৃশ্যরূপ ছিল বিষয়ের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যে জ্ঞান ছবির বিষয়বস্তুকে তিনি শেষ ডিটেল পর্যন্ত ভেবে ও কখনো কখনো এঁকে নিতেন। কখনো বিশেষ কোনো ইমেজ অল্পঘটকের কাজ করতো ও বিষয়ের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে সূদৃঢ় করতো। যেমন ওডেসপার সিঁড়ি দেখে তিনি এত অল্পপ্রাণিত হয়েছিলেন যে সমগ্র পট্টেমকিন ছবিটি, জ্যামিতিক ও প্রতীকী ভাবে, ওডেসা-সিঁড়ির দৃশ্যকল্প ঘিরে রচিত। এক্ষেত্রে একটা ভোঁত ইমেজ তাঁর কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করে। আবার কখনো কাল্পনিক ইমেজ তাঁর ছবির কেন্দ্রীয় মোটিফ তৈরি করেছে। তুলনীয় তাঁর উক্তি : In an accomplished film there probably is a scene in which are condensed the stylistic qualities of the whole and which can give a key as to its compositional structure.

১৯২৪-য়ে নাটক ও মঞ্চ থেকে সরে আসার পর চিত্রজীবন শুরু করে ১৯৩১ পর্যন্ত সাত বছর রেখাচিত্রের বিশেষ ব্যবহার তিনি করেননি। চলচ্চিত্রের সঙ্গে জড়িত নয় এমন যে সব ছবি তিনি এঁকেছেন সেগুলিও প্রাথমিক যাতে আকারের সরলতা ছাড়া আর যা উল্লেখযোগ্য তা হলো তাঁর অঙ্কনশৈলীর দুটি দিক : burlesque ও erotic. দুটি একই উৎস থেকে নির্গত, জীবনের দুই অভিঘাত। একটিতে জীবনের স্বাধীন, আশঙ্কাহীন, অবিনাশী, বহির্মুখী রূপ, অচুটায় জীবনের অন্তরঙ্গ, অন্তর্মুখী প্রকাশ। দুইই জীবন। erotic, festive ও religious—এই তিন অল্পঘটকের মধ্যকার জীবনমুখী সম্পর্ক তাঁর মেকসিকো চিত্রমালায় বিধৃত। তাঁর রেখাচিত্রের সযত্ন কম্পোজিশন দেখে অনেকে বলেন আইজেনস্টাইন পরবর্তী জীবনে মনতাজে আগ্রহ কমিয়ে একক ও পৃথক শটের প্রতি বেশি মনোযোগ দেন। আসলে কিন্তু মনতাজের প্রতি তাঁর আগ্রহ মোটেই কমেনি, মনতাজ প্রতিটি ইমেজ ও শট নিয়ে কার্যকর বলে তিনি পৃথক শটের মানের প্রতিও সমান গুরুত্ব দিচ্ছিলেন। তাঁর অঙ্কনে ও নির্মিত চিত্রে তার সন্দেহাতীত প্রমাণ রয়েছে। (ড. মনতাজ, টাইপেজ, পরিচালক, শিল্প নির্দেশনা)

নির্মিত ছবি : স্ট্রাইক (১৯২৪), ব্যাটলশিপ পট্টেমকিন (২৫), অক্টোবর (২৮), জেনারেল লাইন (২৯), ক্যা ভিভা মেকসিকো (৩১/৭৯), বেঝিন

মেডো (৩৫), আলেকজান্ডার নেভস্কি (৩৮), আইভান দি টেরিব্‌ল্ (১ম পর্ব ৪৪, ২য় পর্ব ৪৬)।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ: Yon Barna-র আইজেনস্টাইন, মারি সিটনের এস এম আইজেনস্টাইন—এ বায়োগ্রাফি ॥

গান্ত রোবের্জ

॥ আইভান দি টেরিব্‌ল্ ॥

প্রথম পর্ব: ১৯৯৩য়ে নির্মিত, দ্বিতীয় পর্ব: ১৯৪৬য়ে সমাপ্ত, তৃতীয় পর্বটি চলারামাণীক য়ানি। আইজেনস্টাইনকে নিয়ে তখন রাজনৈতিক মতভেদ চলছে; মে ১৯৯৩য়ে তিনি মোড়শ শতকের রাশিয়ার প্রতিপত্তিশালী জার আইভান যিনি অসংখ্য ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্যকে একত্র করে এক অখণ্ড রাশিয়া গঠন করেছিলেন, তাঁর জীবন নিয়ে এক ঐতিহাসিক চিত্র নির্মাণের দায়িত্ব পেলেন। নানা কারণে এই ছবির চিত্রনাট্য রচনা ও স্যুটিংয়ের কাজ কখনোই নিয়মিত ভাবে এগোয়নি। তবু ১৯৪৩য়েই প্রথম পর্ব নির্মাণের কাজ শেষ হয় ও তা প্রদর্শিত হয় পরের বছর। প্রথম পর্ব আইভানের নিজেই রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস ও তাঁর ব্যক্তিগত প্রেমের কাহিনীতে। ইতিহাসচেতনা ও ব্যক্তিগত চরিত্রচিত্রণ এখানে এক সৃষ্টিশীল, ষাটিক সম্পর্কের সৃষ্টি করেছে। দ্বিতীয় পর্বে বিষয়পানে প্রেমিকার মৃত্যুর পর নির্ময় আইভানের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য শত্রুদের বিরুদ্ধে নির্ময় অভিযান। এখানে আইজেনস্টাইন চরিত্রটিকে দিয়েছেন মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, চরিত্রে এনেছেন বিধা-বন্দ-অনিশ্চয়তা। আইভানের নব মূল্যায়ন, অসাধারণ মননগম্যী মুগ্ধশৈলী, ও ছবিটির একাধিক স্তরে অর্থবহতা এই পর্বের নির্মাণে স্তালিনের ক্রোধের খটায়। এগত এই পর্ব, নির্মাণের বারো বছর পর ১৯৫৮-এ, যখন স্তালিন ও আইজেনস্টাইন দুজনেই মারা গেছেন, প্রদর্শিত হয়। আজ যখন এই ছবির সমাপ্তিতে আমরা দেখি পুরোভূমিতে আইভানের মুখের বিশাল ক্রোড আপের পেছনে অসংখ্য অনসাধারণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্তি, তখন আইভানের ছত্রছায়ায় জনগণের সম্বন্ধ আশ্রয়ের প্রতীকী ব্যঞ্জনাকে চিনতে ভুল হয় না। বোঝা যায় জাতীয় বীরকে অবনত করা হয়েছে বলে দ্বিতীয় পর্ব সম্পর্কে প্রচার একেবারে ভ্রান্ত। আসলে এই অনবদ্য ফর্মালিস্ট ফিল্মকে (ড. আইজেনস্টাইন) উপলব্ধি করা তখন কঠিন হয়েছিল। এ ছবির সংগঠনে আমরা দুটি প্রধান থিমের উপস্থিতি লক্ষ করি—প্রথমত আইভানের ঐতিহাসিক ভূমিকা, দ্বিতীয়ত সেই ভূমিকা সম্পর্কে আইভানের ব্যক্তিগত ধারণা ও

বোধ। এ ছবির অন্তর্লীন প্রবাহকে বলা হয়েছে 'আবেগের উৎক্রম'— প্রেম থেকে যুগায়। ছবির দ্বিতীয় পর্বের ছোটো একটি অংশ রঙিন, রঙ নিয়ে আইজেনস্টাইনের একমাত্র কাজ, যেখানে উজ্জ্বল লাল রঙকে নীল ছোপযুক্ত লালে রূপান্তরিত করে নির্দিষ্ট চরিত্রের আতঙ্ক তিনি চমৎকার ফুটিয়েছেন। মহাকাব্যোচিত এই ছবির

অভিনয়ে চেরকাশভ (আইভান), পুদভকিন; আলোকচিত্রে টিশে ও Moskvin, সম্পাদনায় আইজেনস্টাইন, সংগীতে প্রোকোফিয়েভ।

প্রাদঙ্গিক গ্রন্থ : গান্ত্ রোবের্জ-এর আইজেনস্টাইন'স আইভান দি টেরিব্ন্  
— এ্যান এ্যানালিসিস ॥

## ॥ আকালের সন্ধানে ॥

১৯৮০-র একটা ফিল্ম ইউনিট ১৯৪৩-এর মনস্তর নিয়ে ছবি করতে এক গ্রামে গিয়ে পৌঁছল। ছবি তৈরির উত্তেজনা, মজা, পরিশ্রম— এ হলো আকালের সন্ধানের বাইরের দিক। ১৯৮০-র শিল্পীরা যখনই ১৯৪৩কে রি-ক্রিয়েট করছে তখনই শিল্প ও বাস্তব, গল্প ও তথ্য, অতীত ও বর্তমানের মধ্যে একই সঙ্গ সংঘাত ও সহাবস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে— এটা এ ছবির ভেতরের দিক। উভয় দিক মিলিয়ে এই ছবি এক-রৈখিক নয়, দ্বিমাত্রিক নয়, বহুমাত্রিক। আকাল যেন এমন এক বিষয় যা বহু আগে ঘটে গেছে কিন্তু একটা যোগসূত্র এখনো রয়েছে। পরিচালক যুগাল সেনের ভাষায়, গ্রামের লোকদের কাছে সিনেমার যে দলটা কল্পজগতের তা থেকে তারা সম্পূর্ণভাবে পুরোপুরি বাস্তবে নেমে এলে রিয়ালিটির যে ক্রাইসিস দেখা দেয় তাতে গ্যাটিং অসমাপ্ত রেখে দলটিকে চলে আসতে হয়। শিল্পী সম্পর্কে এই আত্ম-সমালোচনা ভারতীয় চলচ্চিত্রে নতুন। (ড. যুগাল সেন)। এই ছবির বীজ স্পষ্ট ছিল বাইশে আবেগের মধ্যে। এবং একদিক দিয়ে দেখলে কলকাতা ৭১ ছবি আকালের সন্ধানের পূর্বসূরী।

অভিনয়ে স্মিতা পাতিল, যুতিমান চট্টোপাধ্যায়; আলোকচিত্রে কে. মহাজন, সম্পাদনায় গঙ্গাধর নস্কর।

বালিনে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কার (১৯৮১) ॥

## ॥ আজিক ॥

যে কোনো শিল্প-মাধ্যমের থাকে দুটি দিক : প্রদঙ্গ ও পদ্ধতি। যে কোনো শিল্প-সৃষ্টিরও দুটি দিক থাকে : বিষয় ও আজিক। শিল্পকর্ম যা তা আজিক নয়, শিল্পকর্ম

যেভাবে রচিত হয় তা-ই আঙ্গিক। চলচ্চিত্রের আঙ্গিক তার বিবিধ ও বিচিত্র টেকনিকের সমন্বয়ে। টেকনিক আবার শিল্পরূপের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এছাড়া শৈলীর প্রশ্নও আসছে। (ড. কামেরাভাষা, চলচ্চিত্রের শিল্পরূপ)। চলচ্চিত্রের আঙ্গিকের বিভিন্ন গঠনমূলক উপাদান আছে, যেমন—রঙ, ইমেজ, মনভাঙ্গ, কাঠামো, গণিত, সংগীত এবং বিবিধ নান্দনিক উপাদান, যেমন—পুনরাবৃত্তি, মোটিক, আর্কিটাইপ, বিমূর্তীকরণ, উপাদানগত বিভাজন, ইত্যাদি। চলচ্চিত্রকারের আঙ্গিকও শিল্পী থেকে শিল্পীতে আশাদা।

পাদঙ্গিক গ্রন্থ : সেগেই আইজেনস্টাইনের ফিল্ম কর্ম। ধীমান দাশগুপ্তের সিনেমার আঙ্গিক ॥

### ॥ আট মিলিমিটার ফটোফিল্ম ॥

ফটোফিল্মের প্রচলিত ক্ষুদ্রতম আকার। এই ফিল্ম ফ্রেমের ফর্ম্যাট বা প্রস্থ ও উচ্চতার অনুপাত ১:৮৫ : ১। ১৯৩২-য়ে এই ফিল্ম বাজারে ছাড়া হয়। এটির সঙ্গে তখন ব্যবহার করা হতো শব্দের ম্যাগনেটিক ফিতা। এই ফিল্ম মূলত অপেশাদার ও অব্যবসায়িক ব্যবহারের জন্ম। ১৯৬৫-তে এই ফিল্মের পরিমার্জিত সংস্করণ স্থান ৮ প্রবর্তিত হয়। এই ফিল্মে ছবি তুলতে হয় আট মিলিমিটার মুঁচ ক্যামেরার সাহায্যে। তাকে ১৬ মি. মি. বা ৩৫ মি. মি. পজেটেতে বসিত করা সম্ভব। কিন্তু বসিত প্রিন্টের মান যথেষ্ট উন্নত হয় না। (ড. রো আপ)

### ॥ আণ্ডারগ্রাউণ্ড চলচ্চিত্র ॥

যেমন চিত্রপরিচালক প্রচলিত ধারার বাইরে ছবি তুলতে চেয়েছেন তাঁরা আণ্ডারগ্রাউণ্ডের ছবি প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের বাইরে প্রযোজনা ও পরিবেশনা করতে গায়া চেয়েছেন। এবং এই আত্মীয় ফিল্মগুলি প্রায় চিরকালই এক আণ্ডারগ্রাউণ্ড আণ্ডারগ্রাউণ্ড মাপন করেছে। যেমন—বিশ দশকের শেষ দিকে ইয়োরোপের নানাদেশে ব্যাটলশিপ পটেমকিন ছবিটি বেগাইনি ভাবে দেখানো হতো। তবে এখন সাধারণ ভাবে আমেরিকার নব্যধারার চলচ্চিত্র-আন্দোলনকেই আণ্ডারগ্রাউণ্ড চলচ্চিত্র বলা হয়ে থাকে। মায়্যা ডেরেন, কেনেথ অ্যান্ডার, সিডনি পিটারসন এবং গ্রেগরী মার্কেপুলাস যখন স্বাধীনভাবে ব্যক্তিগত (Personal) ছবি সৃষ্টি করছিলেন তখন অর্থাৎ চল্লিশের দশক থেকেই মার্কিনী নব্যচলচ্চিত্র একটি সক্রিয় ও দপ্রাণ অস্তিত্ব হিসেবে পরিচিত। উক্ত পরিচালকদের শিল্পকর্মগুলি প্রধানত ফ্রয়েডিয় ও মগ-

চৈতন্যমূলক ছিল। নানারকম অবশেষের প্রকাশের উদ্দেশ্যে, মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা ও প্রতীকীবাদ আশ্রয় করেই ছবিগুলি নির্মিত হয়েছিল। আমেরিকার নতুন ধারার চলচ্চিত্রের স্টাইল ও উপজীব্য অধুনা বিস্তৃত ও বিচিত্রতর। সাইকেডেলিক বিমূর্ততা কিংবা যন্ত্রগণক দ্বারা উৎপন্ন ছবি থেকে প্রণয়মূলক ফ্যান্টাসি পর্যন্ত সর্বত্র এর বিচরণ। প্রখ্যাত আঙ্গিক ও বিবৃতিমূলক ছবি সম্পর্কে এঁরা সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং ইচ্ছে করেই মাধ্যমটিকে অপ্রচলিত পদ্ধতিতে ব্যবহার করার উপায় খোঁজেন। একটা দৃষ্টান্ত : অপরিচ্ছন্ন ভারসাম্যহীন চিত্রগ্রহণরীতি ; আণ্ডারগ্রাউণ্ড পরিচালকদের কয়েকজন অপরিচ্ছন্নতাকেই যথাসম্ভব একটা গুণ করে তুলেছেন। বিষয়ের দিক দিয়ে ছবিগুলি সাধারণতঃ প্লটহীন। এরা গল্প বলে না, অন্ততঃ অধিকাংশ ছবির ক্ষেত্রে তা-ই। বরং এরা প্রকাশ করে নির্মাতার আত্মগত মুড কিংবা ব্যক্তিগত বা বহির্পৃথিবীর অভিব্যক্তিমূলক কোলাহলসদৃশ স্বপ্নদর্শন। কখনো কখনো ছবিগুলি ফর্মাল, কখনো বা জীবন্ত অ্যাকশন অথবা অ্যানিমেশনের মাধ্যমে বিশৃঙ্খল বিমূর্ত রচনা। গল্প অপেক্ষা কবিতার সঙ্গেই তাদের অধিকতর আত্মীয়তা, আর তাদের কাঠামো নাটকের নয়, সংগীতের। সাধারণতঃ ৫ থেকে ৩০ মিনিট অধিকাংশের আয়ু, ৮ ও ৩৫ মি. মি.-এর ছবি থাকলেও অধিকাংশ ১৬ মি. মি.-এ তোলা। ষাট দশকের প্রথম দিকে জোনাস মেকাসের নেতৃত্বে 'ফিল্ম-মেকাস কোঅপারেটিভ' স্থাপিত হয়। যাদের তিনি পরিচিত করে দিয়েছেন তাদের মধ্যে প্রভাবক্ষম হলেন ষ্টান ব্রাকেজ, জ্যাক স্মিথ ও জাণ্ডি ওয়ারহোল। নিজের পরিবারই ব্রাকেজের বিষয়। প্রথম কন্সার ভন্মকে বিষয় করে ১৯৫৯ সালে রচিত 'উইগো ওয়াটার বেবি নুভিং' ছবিটি ভন্ন রহস্যের একটি অসাধারণ প্রতিকৃতি। মনুষ্য-জীবনের সংগ্রামকে জটিল ও অ্যামবিশাস রূপকের আড়ালে তুলে ধরা হয়েছে 'প্রিলিউড : ডগ ষ্টার ম্যান' ছবিতে। সদা পরিবর্তনশীল সময়ের, ক্রমপ্রসারমান দৃশ্যবদল এবং পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে এ ছবিতে যে টেকসূচীর তৈরি করা হয়েছে তা অসম্ভব সম্ভাবনাময়। জ্যাক স্মিথের 'ফ্লেমিং ক্রিচার্স' ছবিটি দীর্ঘকাল স্থায়ী বিভিন্ন অদ্ভুত যৌন-সিকোয়েন্সের মধ্য দিয়ে বিস্তৃত ফ্যান্টাসি, এই ছবি সাধারণ লোকের মনে এই ধারণা গড়ে তুলেছে যে আণ্ডারগ্রাউণ্ড চলচ্চিত্রের একমাত্র বিষয় যৌনতা। কিন্তু বেশিরভাগ ছবিই যৌনোত্তেজক নয়, এবং যৌনবিষয়ক ছবিগুলির অধিকাংশও অত্যন্ত শৈল্পিক, বিমূর্ত, এমন কি ঋচির দিক দিয়ে, অ-যৌন। জাণ্ডি ওয়ারহোলের প্রথম দিকের নিশ্চল ছবিগুলি, যেমন 'স্লিপ' কিংবা 'এম্পায়ার' ফিল্মকে নিছক বিবৃতির পর্যায়ে নিয়ে গেছে। ক্রস বেইলি সমাজের

অধিকারচ্যুত মানুষের ওপর গভীর নমতাপূর্ণ কাব্যিক ডুকুমেটারি সৃষ্টি করেছেন। জর্ডান বেলসন এবং জন ও জেমস্ হুইটনি অসাধারণ স্মরণ আর সম্পূর্ণ বিমূর্ত ছবি রচনা করেছেন, এগুলিকে যথার্থভাবে সংগীত বলতে পারি। সমকালীন মার্কিন মূল্যবোধগুলিকে বিদ্রূপ করে বিভিন্ন স্টাইলের ব্যবহার দ্বারা রবার্ট বেলসন তীক্ষ্ণ হাস্যরস পরিবেশন করেন। বিভিন্ন বুননে, পর্যায়ক্রমিক সম্পূর্ণ সাদা ও নিকষ কালো ফ্রেম ব্যবহার করে টনি কনরাড নির্মাণ করেছেন 'দি ফ্লিকার' নামক ছবিটি।

ফলস্বরূপ ছবিটি বশীকরণের ক্ষমতা পেয়েছে। তীব্র সামাজিক ও রাজনৈতিক বক্তব্যকে কেন্দ্র করে অ্যানিমেশনের মাধ্যমে কোলাজের মতো কয়েকটি ছবির স্রষ্টা স্টান ভাওয়ারবেক ব্যক্তিগত পরিচালকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রতিভাময়দের একজন। এঁদের মূল প্রেরণাটা কি? মনে হয় দুটি—প্রথমত স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশের আদিম ও সার্বিক প্রয়োজন; এবং দ্বিতীয়ত চলচ্চিত্রের প্রতি অহুরাগ। কীভাবে ছবির মাধ্যম ব্যবহৃত হতে পারে? কেমন করেই বা তা আমাদের দৃষ্টিতে নতুন করে তোলে? এই রকমের প্রশ্ন তোলা এবং তাদের উত্তর দেবার চেষ্টা করে নব্যধারার চলচ্চিত্র। এঁরা যুক্তিপূর্ণ, বিশ্লেষণাত্মক ও সাহিত্যমূলক স্তর অপেক্ষা চলচ্চিত্রের নান্দনিক, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং আবেগময় স্তরে দর্শককে লিপ্ত করতে চেয়েছেন। ছবিকে একটা স্ট্রীকচার দেবার জগ্ন এঁরা ভাষা ব্যবহার করেন না, ছবির মধ্যে অল্প একটা উপাদান—একটা টেকসূচার, পরিবেশের একটা দিক—তৈরির জগ্নই ভাষার আশ্রয় নেন। কোনো স্মৃতিস্তম্ভ পরিকল্পনা থাকে না, থাকে কিছু ইমেজ ও চিন্তা যাকে পরীক্ষা করতে এবং একটা ফর্মে স্থাপিত করতে পারা যায়। সম্ভাব্য শরীরটা রূপ নিতে কখনো সময় লাগে, কখনো লাগে না। অযত্নরূপ খারাপ ছবিও সম্ভোগমনের মনে হয় যদি তার মধ্যে অন্তত একটাও চমকে দেবার মতো মুহূর্ত থাকে এবং তার সম্ভোগমন স্বাধীন দিনেমা হল অপেক্ষা আওয়ারগ্রাউও চিত্র প্রদর্শনে বেশ। আওয়ারগ্রাউও ফিগা ৭৪ অথ্য আরো কিছু কারণের চাপে আমেরিকার ঐতিহ্যবাহী চলচ্চিত্র ব্যবস্থার কাঠামো আঘাত পাচ্ছে। ব্যবসা বন্ধ হচ্ছে না বটে, তবে হাত পাঁট হচ্ছে। বড়ো বড়ো স্টুডিওর স্থান নিচ্ছেন বহু একক চিত্রনির্মাণ। এবং এইসব প্রথা-বিরোধী ছবির প্রযোজনা ও পরিবেশনার জগ্ন যে সাংগঠনিক সমর্থন প্রয়োজন তা যোগাবার জগ্ন স্বতন্ত্র আওয়ারগ্রাউও প্রতিষ্ঠানও স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠছে।

জে. এইচ.

॥ মাইকেল এঞ্জেলো আন্তনিওনি ॥

ইতালিয়ান চিত্রপরিচালক, জন্ম ১৯১২। চলচ্চিত্র সমালোচক ও চিত্রনাট্যকার রূপে তাঁর চিত্রজীবন শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্রান্সে পরিচালক কার্নের সহকারী হিসেবে কাজ করার পর তিনি কয়েকটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেন। তাঁর প্রথম কাহিনীচিত্র লাভ স্টোরি তৈরি হয় ১৯৫০-এ। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে রয়েছে দি গার্ল ফ্রেন্ডস (১৯৫৫), ইল গ্রিডো (১৯৫৭), লাভেস্তুরা (১৯৬০), লা নন্তে (১৯৬১), দি রেড ডেজার্ট (১৯৬৪), দি ব্লো আপ (১৯৬৬), জ্যাট্রিস্কি পয়েন্ট (১৯৬৯), দি প্যাসেঞ্জার (১৯৭৫), সাফার অর ডাই (১৯৭৯), আইডেনটিফিকেশন অব গুয়ান (১৯৮২)।

ষাটের বছরগুলিতে আন্তনিওনিকে সাধুবাদ দেওয়া হয়েছিল তাঁর আঙ্গিকের জ্ঞান, বলা হতো এই আঙ্গিক আধুনিক সিনেমার চূড়ান্ত পর্যায়। সত্তরের বছরগুলিতে কিন্তু বেশি করে নজর দেওয়া শুরু হলো তাঁর ছবির বিষয়বস্তু ও উপাদান বৈচিত্র্যের ওপর। বলা হলো ওখানেই তাঁর ছবির মূল শক্তি। এইভাবে গঠন থেকে সমালোচকরা এলেন প্রশংসে। বিচ্ছিন্নতা, স্ববিরোধিতা, যে জগতে আধুনিক স্মরণ-স্ববিধা ও দ্রুতগামী জীবনের খাতিরে আবেগকে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে সেখানে ইমোশনের সন্ধান, আর প্রদর্শনক্ষম প্রযুক্তি ও নির্মম প্রকৃতির পটভূমিতে মানুষের অসহায়তা—এই সব প্রশংসা আন্তনিওনির প্রিয়। আধুনিক মানুষের দ্ব্যর্থতা, জটিলতা, সন্দেহ, অস্থিতি; জীবন ও প্রেমের অবোধ রহস্য ও সাময়িকতা, এবং সামাজিক বৈসাদৃশ্য, চিত্রণে ওই প্রশংসার চমকপ্রদ ব্যবহার ঘটে। সমাপ্তিতে ও সামগ্রিক বিচারে তিনি হতাশাবাদী (যেমন ইল গ্রিডো/ব্লো আপ/জ্যাট্রিস্কি/প্যাসেঞ্জার) না সব দিকেই আশাবাদী (লা নন্তে/লাভেস্তুরা) এ নিয়ে বিভ্রান্ত থাকতে পারে। আমার ধারণা তাঁর চরিত্রগুলির একাকিত্ব, শূন্যতা ও বিচ্ছিন্নতার পাশাপাশিই রয়ে গেছে প্রেম, উত্তাপ ও স্নিহতার জ্ঞান আন্তনিওনির আঁতি, যা কান্নার ভাষায় আমাদের শীতলতা ও আমাদের জগৎকে অন্ধকার থেকে উদ্ধার করতে পারে। এই হিউম্যান সারভাইভ্যালের আশ্বাস (হয়তো নিরাসক্ত আশ্বাস) আন্তনিওনিতে আমি পাই। আধুনিকমনস্ক আর এক পরিচালক গদার থেকে অবশ্য বিশ্বাস ও বক্তব্যে তিনি আলাদা। গদারের চিত্র-ফর্মুলা যদি হয় : কোথায়—কোন ক্রিশংয়ে, কেন—কোন মেয়ের জন্ম অপেক্ষা, কীভাবে—অধৈর্যভাবে; আন্তনিওনির চিত্র-ফর্মুলা তবে : কখন—সূর্যাস্ত বা সূর্যোদয়, কেন—নিজের জন্ম

অপেক্ষা, কীভাবে—উদাসীনভাবে। গদারের মতে আন্তর্নিওনির ছবি হলো। সংযোগহীনতার ছবি, যা তাঁর বিষয় নয়। অধিকাংশ সমালোচকের কিন্তু ধারণা আন্তর্নিওনি চরিত্র ও দর্শকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগে বিশ্বাসী ও প্রায়ই তাতে সক্ষম। শেষ বয়সে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও যেভাবে তিনি বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন, তাতে এ-কথার সত্যতাই প্রমাণিত হয়।

এবার আঙ্গিকের আলোচনা। তাঁর ছবির প্রধান আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যগুলি এই রকম—

১. প্রথমত তাঁর প্রতিটি নতুন ছবি তিনি এতদিন যা করেছেন এবং ভবিষ্যতে যা করতে চান এই দুই বিস্তৃত সংযোগরেখার উপর অবস্থান করে। আর দ্বিতীয়ত প্রতিটি ছবির কনসেপ্ট-নির্ভর প্যাটার্ন স্বরণ ও মননকে এবং দৈহিক সক্রিয়তার সঙ্গে মানসিক নিষ্ক্রিয়তা ও মানসিক সক্রিয়তার সঙ্গে দৈহিক নিষ্ক্রিয়তাকে পর পর সংযুক্ত করে যেতে থাকে। এই তাঁর ট্র্যানজিশনের সূত্র।

২. তাঁর প্রতিনিধিস্বানীয় ইমেজে ফ্রেমের মধ্যের চরিত্রগুলি পরস্পরের সাথে কথা বলে না, স্থান আগ্রহ ও ভাষার দূরত্ব তাদের পৃথক করে রাখে। আর যখন তারা কথা বলে প্রায়ই তার মূল্য হয় তাৎক্ষণিক, অভিজ্ঞতা ও আবেগের কোনো স্থায়ী আদান প্রদান নয়।

৩. কম কাটিং ও বেশি প্যানিং তাঁর ফ্রেমে গতির চেয়ে মন্তব্যকে বড়ো করে তোলে। তাঁর ছবি তাই বাস্তবাহুসরণের চাইতে বাস্তব সম্পর্কে মন্তব্য করার পক্ষপাতী। যৌনতা চিত্রণে ক্যামেরার ধীর গতি এবং তির্যক, নিরাবেগ, স্লেষাঙ্ক দৃষ্টিকোণ যৌনতার অব্যবহিত পরেই কোনো ট্র্যাজেডিকে তুলে ধরে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করে।

৪. ক্যামেরার উদ্দেশ্য-প্রণোদিত, মননশীল ব্যবহারে কম্পোজিশন হয় আশ্চর্য শাকশালী। তা হয় স্পষ্ট, সখক ও কম সময়-সাপেক্ষ। সমৃদ্ধ চিত্রভাষার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এটি।

৫. ফ্রেমের ব্যাকগ্রাউণ্ড দ্রুত পরিবর্তনশীল থাকে, ব্যাকগ্রাউণ্ড ও ফোর-গ্রাউণ্ডের মধ্যে স্থান-বিনিময় হয়, ক্যামেরাকোণ প্রায়ই মোটিকের পর্দায়ে উঠে আসে, ফ্রেমের মধ্যে দৃশ্য-স্পেস তৈরি করা হয় ভাব ও স্বর অনুসারে।

৬. স্বপ্ন ও নিখুঁত শৈলীতে ইচ্ছাকৃত কোনো ক্রটি বা বিকৃতি রাখা হয় যা তাঁর ছবিকে বলিষ্ঠতার অভিঘাত ও একাধিক স্তরে গ্রহণযোগ্যতা দেয়। ছবির শেষ দৃশ্য যে বিশেষ কিছু হয় তা অকারণে নয়।

একজন পরিচালকের ক্ষেত্রে প্রসঙ্গ ও আঙ্গিক ছাড়াও আর একটি জিনিশ দরকারি ( প্র. পরিচালক )। যাকে বলা যেতে পারে তৃতীয় মাত্রা বা দস্তা। আন্তনিওনির ক্ষেত্রে তা মনস্তত্ত্ব। তাঁর শিল্পীদস্তা ও ব্যক্তিদস্তা ও দুয়েরই অ্যাম্বি-ভালেসকে বুঝে ওঠার পক্ষে এটা জরুরি। একাধিক আইডিয়া থেকে জন্ম নিয়েছে র্নো আপ বা জ্যাব্রিস্কি বা প্যাসেঞ্জার। একটি মাত্র মূল আইডিয়া থেকে জন্ম নিয়েছে ইল গ্রিডো বা লা নস্তে। লাভেস্তুরাতে পারম্পরিক অনুকম্পার অনুভব, লা নস্তে-তে একের জন্ত অস্তের সহানুভূতি। জ্যাব্রিস্কিতে ইমেজ হলো সত্য, রঙ হলো কাহিনী ; ইল গ্রিডোর মুখের পর্যায়ক্রমিক ক্লোজ আপে সত্য, ইমেজ হলো কাহিনী। র্নো আপের ফটোগ্রাফার-নায়ক ক্যামেরার সীমাবদ্ধতা বিষয়ে অচেতন, প্যাসেঞ্জারের ফটোগ্রাফার-নায়ক ক্যামেরা ও মানুষ উভয়ের ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন। সরলতা আন্তনিওনি নিজে ভালোবাসেন কিন্তু তাঁর সৃষ্ট জগৎ জটিল। ছবিতে সফট তাঁর প্রিয় বিষয় কিন্তু তিনি নিজে শান্তিপ্রিয়, ব্যক্তিজীবনে ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে সফট তাঁকে ক্লান্ত করে। পরিবেশের সঙ্গে নিজের সম্পূর্ণ একাত্মতা চান তিনি আর চারপাশ থেকে তাঁর চরিত্রগুলি ক্রমেই বিচ্ছিন্ন। কিন্তু সব মিলিয়ে ব্যক্তি হিশেবে ও শিল্পী হিশেবে আন্তনিওনির মধ্যে কোথাও কোনো ভগ্নামি নেই, ভগ্নিতা নেই। ১৯৬১তে কানে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলে-ছিলেন, ছবি করার গোড়ার শর্ত হচ্ছে সততা, নিজের অনুভূতি ও উপলব্ধির সৎ প্রকাশ। তা আজও অপরিবর্তিত আছে।

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : P. Leprohon-এর এম. আন্তনিওনি, অ্যান ইনট্রোডাকশন, I. Cameron ও Robin Wood-এর আন্তনিওনি। তাঁকে নিয়ে একাধিক তথ্য-চিত্রও নির্মিত হয়েছে।

ধীমান দাশগুপ্ত

॥ আফ্রিকান চলচ্চিত্র ॥

করাসি চলচ্চিত্র সমালোচক আন্দ্রে গার্দী (André Gardies) যখন বলেন আফ্রিকানরা ছবি করে কিছু 'বলা' (dire)-র জন্ত নয়, কিছু 'দেখাবার' (montrer) জন্ত—তখন কথাটাকে আমাদের বিশেষ অর্থে নেওয়া উচিত। কেননা ছবির মধ্য দিয়ে তারা নিশ্চয় নিজেদের সম্পর্কে আমাদের জন্ত অনেক বক্তব্য রাখেন, অর্থাৎ দেখাতে দেখাতেই অনেক কিছু 'বলেন'ও, যেমন ধরা যাক 'Xala' ( অভিলাপ ) ছবিটার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা-উত্তর সেনেগালের বুর্জোয়া সমাজ বিষয়ে উসমান

সেম্বেন্ অনেক কিছু বলেন। কিন্তু সেনুলয়েডের ফিতের আফ্রিকার জীবনকে নিছক 'দেখানোর' একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। এ পর্যন্ত তাদের সিনেমাতে অন্তরা এত অসম্মানজনকভাবে দেখিয়েছে যে নিজেদের ইমেজ তৈরি করে (সে ইমেজ যে বরকমই হোক না কেন) অন্তকে দেখানোর মধ্যেই সেই অসম্মান দূর করার প্রতিজ্ঞা রয়েছে। এ কারণে সেম্বেন্ একসময় বলেছিলেন আফ্রিকাতে ছবি করাটাই একটা রাজনৈতিক কাজ।

প্রথম মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত আফ্রিকার বিভিন্ন ইয়োরোপীয় কলোনিয়াল অঞ্চলে ইয়োরোপীয় তথ্যচিত্রকাররা তথ্যচিত্র তৈরি করে লন্ডন, ব্রাসেলস, প্যারিস, বার্লিন, আঁভের ইত্যাদি শহরে দেখাতো। উদ্দেশ্য 'Mission civilisatrice'-এর সাফল্য প্রদর্শন জগতকে দেখানো—দেখো অন্যদের টেনে তোলবার জন্ত আমরা কত কী করছি। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সে ধরনের কাজ কমে গেল, শুরু হলো ইলিউডি 'exotica'-র যুগ, টারজান ফিল্মের যুগ—যেখানে বস্তু আফ্রিকাকে বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের খদ্দেরদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হতো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর একটা বড়ো কাণ্ড ঘটে গেল। জঁ রুশ এসেছিলেন নিজের-এ ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে, ক্রমে নৃতবে আগ্রহী হলেন তিনি তারপর সিনেমাতে। ফলে তাঁর 'সিনেমা ভেরিতে' রীতিতে তিনি নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতেই একের পর এক তথ্যচিত্র নির্মাণ করলেন আফ্রিকাতে। আগেকার তথ্যচিত্রের সঙ্গে তাঁর ছবির পার্থক্য হলো এই যে তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও দরদর সঙ্গে আফ্রিকার সমাজজীবনকে চলচ্চিত্রে ধরলেন। রুশের প্রেরণায় পঞ্চাশ দশকের শেষ দিকে, বিশেষ করে মাট দশকের গোড়ায় আফ্রিকান শিল্পী বুদ্ধিজীবী মহলে দারুণ মাদা জাগল। নিচের ও উমান গান্দা (Oumarou Ganda) ফিল্ম সোসাইটির মাধ্যমে চলচ্চিত্র শিল্পের পাঠ নিয়ে আফ্রিকান ঘারা নির্মিত ও আফ্রিকান চলচ্চিত্র রচনার ক্ষেত্রে একজন পথিকৃত হলেন। অতীদিকে ফ্রান্সোফোন আফ্রিকার অন্তান্ত অঞ্চল থেকে পলিন ভিয়েইরা (Paulin Vieyra), দেজিরে একারে (Désiré Ecaré), ফিলিপ মোরি (Philippe Maury), দানিয়েল কামওয়ানা (Daniel Kamwana), এবং মেড্ হোন্ডো (Med Hondo) ইত্যাদি প্যারিসের IDHEC (Institut d'Hautes Etudes du cinématographie)-এ শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে আফ্রিকান সিনেমার গোড়াপত্তন করে দেন। উমান সেম্বেন্ শিক্ষা নেন মস্কোতে।

গোড়ার দিকে এদের অনেকের তৈরি ছবি ছিল ইয়োরোপে আফ্রিকান ছাত্র

বা শ্রমিকের অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক, অর্থাৎ তাতে আমরা আফ্রিকানের চোখে ইউরোপ কেমনভাবে ধরা পড়েছে তার একটি ছবি পাই। মেড্ হোণ্ডোর সোলেইল ও (Soleil O, 1970) ছবিতে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন আছে। মরিতানিয়ার হোণ্ডো ছিলেন থিয়েটারের লোক, দেখা যাবে এ ছবিতে তিনি তার থিয়েটারের দলের অভিনেতাদের এক একজনকে দিয়ে বহু ভূমিকায় অভিনয় করিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে যেহেতু এ ছবি ঠিক ক্লাসিকাল থ্র্যাগেডিভ অহুসরণ করা কতগুলি চরিত্র নিয়ে প্রুট ভিত্তিক ছবি নয়, বরং গদার ধরনের (লা শিনোয়াজ ধরনের ছবির প্রভাব স্পষ্ট) ‘প্রবন্ধ ছবি’, তাই এতে অভিনয়টাও অনেকটা ত্রেঘট-ধর্মী। এ ছবির গোড়াতে এনিমেশন ও থিয়েটারি কায়দায় দাসধরা—মিশনারি প্রভাব—কলো-নিয়ালিজমের ঐতিহাসিক পটভূমিকাটি দেওয়া হয়েছে, তারপর ফ্রান্সে একজন আফ্রিকান কর্মী কিভাবে পদে পদে বর্ণচেনাভিত্তিক অবজ্ঞার সম্মুখীন হচ্ছে তা ধরা হয়েছে, গ্যারাজে চাকরি নিতে গিয়ে বাড়ি ভাড়া নিতে গিয়ে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উত্তর ঔপনিবেশিক পর্বেও আফ্রিকানদের মানসিক দাসত্ব আর্থিক দাসত্ব (neo-colonialism), ৬৮-র আন্দোলন ইত্যাদি প্রসঙ্গ। অর্থাৎ এ ছবিতে বিখ্যাত ব্রিটিশ ফিল্ম সমালোচক Roy Armes যাকে আফ্রিকান ‘Space’, আফ্রিকান ‘Story’ বলেছেন তা ঠিক পাওয়া যাবে না, শুধু আফ্রিকান ‘Voice’কে পাওয়া যাবে, তাও ঠিক Armes যে অর্থে বলছেন সেই অর্থে নয়, একজন বুদ্ধিজীবী আফ্রিকানের ‘Voice against European domination’ অর্থে An African Critique of colonialism and neo-colonialism অর্থে সেই voiceকে আমরা পাব মেড্ হোণ্ডোর এই ছবিতে।

ফ্রান্সের শহরে বাড়ুদার আফ্রিকান শ্রমিককে হোণ্ডোর ছবিতে দেখা যায়। উসমান সেম্বেনের ‘মনিঅর্ডার’ (Mandabi, 1968) ছবিতেও তাকে দেখি একটি মাত্র দৃশ্যে, তা ছাড়া সেম্বেনের ঐ প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ ছবির সবটাই ‘African space’—সেনেগালের গরীব অঞ্চল। সে দৃশ্য চরম irony-র সঙ্গে দেখানো হচ্ছে ভাইপো প্যারিদের রাস্তা কাঁট দিচ্ছে অথচ সাউও ট্র্যাক-এ শোনা যাচ্ছে ভাইপো, কাকাকে লিখছে, এখানে আমি মহানন্দে মহাবচ্ছন্দে আছি। মনিঅর্ডারটি ভাঙাতে গিয়ে বেচারী নিরক্ষর কাকার যে কী দুর্গতি হলো সেটা এ ছবিতে দেখাতে গিয়ে সেম্বেনু কুবার টমাস আলিয়ার ‘ডেথ অফ এ ব্যুরোক্রেসিট’ বা কুরোনোওয়ার ‘ইকিফ’র মতো করে স্বাধীনতা উত্তর আফ্রিকার দুর্নীতিপূরণ ব্যুরোক্রেসিকে ব্যঙ্গ করেন। উসমান সেম্বেনের ছবির ব্যঙ্গর মধ্যে বহুয়েলের স্যাটারারের গুণটা.

পাওয়া যায়। Xala (অভিশাপ, 1974) ছবিতে সমাজ সমালোচনার ক্ষেত্রে সেই আটায়ারকে তিনি ভুলে তোলেন, সেখানেও তাঁর আক্রমণের পাত্র 'Nouveaux riches'।

সমাজ সমালোচনার ধারা আমরা মালির সুলেমন সিসের (Souleymane Cissé) মধ্যেও পাই। তাঁর Bara (Work, 1978) ছবিতে তিনি পুরুষপ্রতাপ এবং মালিকপ্রতাপকে একত্রে রাখেন— স্বাধীনতা উত্তর সমাজে নারী ও শ্রমিককে নবধনী রক্ষণশীল পুরুষের নির্বাতনের পাত্র হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়। এখানে নারীর পরপুরুষ প্রেমকে প্রতিবাদের ভাষার মতো করে দেখা হয়, একভাবে সেটাকে আমরা আরো অল্প দু'একটি আফ্রিকান ছবিতেও দেখতে পাই, যেমন বুরকিনা ফাসোর ইদ্রিসা উদ্রেওগো (Idrissa Ouedraogo)র, Yaba (ঠাকুমা 1989)র মধ্যে। সমাজ সমালোচনার বিষয়টিকে আফ্রিকান সিনেমাতে আমরা অনিবার্য কারণবশতই পাশ্চাত্য ও আফ্রিকান এই দুই সংস্কৃতির সংঘাতের বৃহত্তর পটে বিদ্যত হতে দেখি। Xalaতে সে সংঘাতকে শুধু পাশ্চাত্য 'ফেটিশ' (মার্সিডিস, ক্বাইস্কোপার, ব্রীফকেস, সানগ্রাস, ইভনিং ড্রেস, মুসলমান-বিবাহ ও পাশ্চাত্য ওয়েডিং ড্রেস ইত্যাদি) ও আফ্রিকান 'ফেটিশ' (মন্ত্রপূত জিনিস, যৌনক্ষমতা ফিরিয়ে দেবার ক্ষমতার অধিকারী বলে নির্দিষ্ট বা লাঠির আগায় মূর্তি) এর দ্বন্দ্ব হিসাবেই উপস্থাপিত করা হয়নি। সেখানে ফরাসি ভাষার সঙ্গে স্থানীয় ওলোফ ভাষার 'Binary opposition' সৃষ্টি করা হয়েছে।

ধরা যাক শেষ দৃশ্যে যখন আলহাজ্বির দ্বারা জন্ম থেকে উৎখাত হওয়া কৃষকরা এসে তার বাড়ি চড়াও করে তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্ত, (বুয়েলের VIRIDIANA মনে পড়ে), তখন সব সংলাপ চলে ওলোফ (Wolof)এ, ঠাৎ সেপাট লুকে জিজ্ঞাসা করে Qu'est cequi se passe (কী হয়েছে?)। মালিক ও তার মধ্যে বাকি সংলাপ হয় ফরাসি ভাষাতে, আবার সে চলে গেলে ওলোফ সংলাপ ফিরে আসে। সাত্তী যখন 'আমরা প্রাইভেট প্রপার্টিকে অন্ধা করি' বলে চলে যায়, তার মধ্যেও সেম্বেনু Senghor-এর তথাকথিত সমাজ-বাদকে একটা খোঁচা মারেন। এইসব খোঁচা মারার জন্ত (যেমন Ceddo ছবিতে Islamic orthodoxy-কে খোঁচা মারার জন্ত) সেম্বেনুকে প্রায়ই আফ্রিকান ও আরব প্রশাসকবর্গের সামনে বিপদে পড়তে হয়।

যাইহোক পাশ্চাত্য আফ্রিকান সংস্কৃতির সংঘাতকে আমরা সেনেগালের জিব্রিল দিয়প মেম্বেটি (Djibril Diop Mambety)-র Touki-Bouki (হায়নার ডাক,

1973) ছবিতেও দেখি, একটি ছেলে ও মেয়ের ফরাসি স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গর প্রেক্ষিত হিসাবে। সেখানে মোটর বাইকের ওপর গোকর শিং, জাহাজের ভৌর সঙ্গে গরুর ডাককে সন্নিবিষ্ট করা ছাড়া, শব্দে, সংগীতে, পোশাকে সেই দৃশ্যকে একটি বিচিত্র নিরীক্ষামূলক narrative-এ ধরা হয় যেখানে সময়ের ক্রমাত্মসারী প্রবাহকে ভীষণভাবে অগ্রাহ্য করা হয়েছে।

ধীরলয়ের সময় প্রবাহতে আবার আফ্রিকান সিনেমা স্থিত হয় তাদের এপিক ধর্মা ছবিগুলিতে। মেডু হোগো তাঁর Sarraounia (1986) ছবিতে oral tradition-এর কাহিনীকে ধরেন, Ceddo (1977) ছবিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে এক কাল্পনিক কাহিনী গুলু করে দাস ব্যবসায়ী-ইসলামিক ইমাম-মানবতাবাদী খ্রিষ্টীয় মিশনারী বিধৃত শক্তি (Power Structure)-র বিরুদ্ধে জনসাধারণের এবং বিশেষভাবে নারীর বিদ্রোহকে লোকগাথার ছন্দে ধরেন। সমস্তা সেখানে আছে, 'oral tradition' একটি performance, সেখানে বক্তা ও শ্রোতার ভূমিকা একই যোগে সমান গুরুত্বপূর্ণ, এবং বক্তা সেখানে তো ঠিক দিনেমার 'auteur' নন। সিনেমাতে ফিল্ম প্রদর্শনকালে দর্শকের সেই ভূমিকা একটা ইতিমধ্যে রচিত film-text-এ থাকার কথা নয়। তাই সিনেমাতে oral tradition-এর এই গ্রহণের বিষয়টা একটু পরোক্ষ, সেটা হয়তো সম্পাদনার গতি, লং-শর্ট এবং সংলাপের বিস্তারনে নেওয়া হয় বলা যেতে পারে। যাইহোক, পাশ্চাত্য স্টারিটেড সিনেমার শিক্ষা নিয়েও তার অল্পসংখ্যক বর্জন করে Cissé-ও এখন এপথে এসেছেন। তার YELEEN (আলো, 1988) ছবিতে তিনি মিথলজি অবলম্বন করেছেন, পিতাপুত্রের সংঘর্ষের মধ্যে 'Evil magic' ও 'Benevolent magic'-এর দৃশ্যকে দেখিয়ে চলচ্চিত্রীয় ফ্যান্টাসি রচনা করেছেন, শিশু উৎসাহের ব্যবহার করেছেন আশার ছোতক হিসাবে।

একটি সহাস্ত শিশু পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে YABA ছবিতে। তার সঙ্গে গ্রাম থেকে 'ডাইনি' বলে বিতাড়িত এক হতভাগ্য বুড়ির গভীর মানবিক সম্পর্ক (পথের পাঁচালীর স্মারক) এ ছবির উপজীব্য। এখানে যদিও পাশ্চাত্য হোয়া ছবিতে কোথাও নেই (এক টেকনিক্যাল কাজকর্ম ছাড়া) কিন্তু এ ছবি মিথলজি নির্ভর নয়—গ্রামের জীবনের অন্তরের কাহিনী, এতেও নারী প্রসঙ্গ আছে, শার্বাটানের গ্রাম শোষণের প্রসঙ্গ আছে—কিন্তু এই গ্রামীণ জীবনের ওঠাপড়ায় কাহিনীটা আধুনিক শহরে চোখে না দেখার চেষ্টা এতে আছে—তাই দেখা যাবে যত্নকে (বুড়ির) কেন্দ্র করে এখানে কোনো নাটকীয়তা সৃষ্টি করা হয় না। তাই বলে

এই ছবির জগৎই যথার্থ আফ্রিকান এবং XALA ছবির ডাকার আফ্রিকান নয় — একথা বললে যে দোষ হবে তাকে বোধ হয় বিখ্যাত দর্শনবিদ বিমলকৃষ্ণ মতিলালকে অনুসরণ করে বলা যায় ‘cultural relativism’.

আফ্রিকা মহাদেশের বিশালত্ব, তার অগাধ বৈচিত্র্যের জন্ত একক ‘আফ্রিকান সিনেমা’ বিষয়ে কিছু বলা যায় কিনা আদৌ ( অন্তত পক্ষে ছোট নিবন্ধে ), সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন সমালোচক জাক্ বিনে (Mais peut on parler d’un cinema Africaine alors que le continent est immense et que ses populations sont fort diverses ?— Jacques Binet, Cinemaction, No.-26, P-16)। এখানেও তা করা হলো না। বহু অঞ্চলের কথা তোলাই হলো না, যথা—ইথিওপিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, জাইর, এমনকি নিজের—এ Le Medecin de Goffre নামক চিকিৎসার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য ও আফ্রিকান সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব আশ্রয়ী ছবি ( পরিচালক, মুস্তাফা দিয়প ) বা মহিলা চলচ্চিত্রকার সারা মালডোরর (Sara Maldoror) বা সোফি ফাইয়ে (Safi Fayé) অনালোচিত রইল, ইংরাজি ভাষী আফ্রিকা অর্থাৎ ঘানার কোয়া আনসা (Kwaw Ansah) বা নাইজেরিয়ার ওলে বালুগান (Ola Balogun) এর কথা অনুল্লিখিত রইল, সাংস্কৃতিক পার্থক্য হেতু মাত্রেব অঞ্চলের কথাও তোলা হলো না, যদিও আলজেরিয়ান ও তিউনিসিয়ান ছবির অসামান্য দিক্ধির কথা আমরা জানি। শুধু ফ্রাংকোফোন পশ্চিম আফ্রিকার গোটাকয়েক ছবির মাধ্যমে এমন একটা জগতের সন্দে এখানে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা হলো যার বিষয়ে আমাদের ধারণা নিতান্ত ক্ষীণ অথবা প্রাপ্ত।

দশমণ্ডা দেশের পশ্চিম। এখনও প্রদর্শন বিদেশি কোম্পানির হাতে, প্রযোজনার অধীন পশ্চিমের দারস্থ ও হস্তে। পশ্চিম আফ্রিকার ক্ষেত্রে FEPACI (Federation Pan-Africaine des CINEMASTES) হুড়ি বছর ধরে এমনকিছু এগোতে পারেনি। তাই এসব আফ্রিকান ছবি দেখানো হয়েছে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের আর ফিল্ম ক্লাবগুলির সীমিত চহরে। প্রদর্শন ক্ষেত্রে ভারতীয় বাজারি ছবির দাপট এখনো কমেনি। ১৯৮৮ সালে নই-এর চলচ্চিত্র উৎসবে একটি সাক্ষাৎকারে সেম্বেনু স্বয়ং আমাদের জানিয়েছেন অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। ওয়াগাডুগু শহরের চলচ্চিত্র উৎসবের সাফল্য আফ্রিকান চলচ্চিত্রকারদের উৎসাহ দিচ্ছে। হুঁবছর অন্তর অন্তর সেখানে ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগ হচ্ছে (FESPACO)। সম্পূর্ণ আফ্রিকান উত্তোগে তৈরি হয়েছে সেম্বেনের Camp-THIAROYE, যুদ্ধে সাধারণ লৈগুদের দুর্গতির কাহিনী।

প্রতিবন্ধকতা যতই থাকুক, সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্রে আফ্রিকার চলচ্চিত্রকাররা এতই এগিয়েছেন যে তাদের ক্লপার চোখে দেখার বিরুদ্ধে সতর্ক করে বিখ্যাত ফেমিনিস্ট চলচ্চিত্র সমালোচক লরা মালভি বলেছেন, 'African cinema should not be seen as a developing cinema, but a cinema which, in spite of the enormous difficulties presented by the post-colonial context, is now making an original and significant contribution to the esthetics of contemporary cinema.'

শ্রবণ শ্রুতি

[আলজেরিয়া: যদিও ভৌগোলিক বিচারে আফ্রিকার অন্তর্গত তবু স্বাদ ও আদর্শের দিক থেকে আলজেরিয়ার সিনেমা যেন লাতিন আমেরিকার বেশি কাছাকাছি। চলচ্চিত্রের প্রযোজনা ও পরিবেশনা ওই দেশে ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত্ব। বামপন্থী মতবাদে সমৃদ্ধ আলজেরিয়ান চলচ্চিত্র ঐতিহাসিক তথ্যমূলকতা ও জাতীয় সচেতনতার সঙ্গে চিত্রভাষার ও কলাকৌশলের সমৃদ্ধির মিলন ঘটতে পেরেছে। গুরুত্বপূর্ণ ছবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য Chronicle of the Years of Glowing Embers, The Dawn of the Condemned, দি ওপিয়াম অ্যাণ্ড দি ব্যাটল, দি প্যান আফ্রিকান ফেস্টিভ্যাল, দি ব্যাটল অব আলজিয়ার্স, Elles ও Mektoub. আফ্রিকান চলচ্চিত্রের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় দিকগুলির মধ্যে রয়েছে আলজেরিয়ার সিনেমা।

মিশর: ১৮৯৬ সনেই এখানে লুমিয়ের-এর ছবি দেখানো হয়েছে। ১৯১৮ সন থেকে এখানে ছবি তৈরি শুরু হয়। প্রথম দিকের অধিকাংশ ছবিই ছিল মেলোড্রামা ও পরে মিউজিক্যাল। ১৯৫২-র বিপ্লবের পর এদেশের ছবিতে বাস্তববাদের ছোঁয়া লাগে। সরকারি সাহায্যের হাতও প্রসারিত হয়। ১৯৫৯-য়ে কায়রোর ফিল্ম স্কুলও স্থাপিত হয়। আন্তর্জাতিক স্তরের একাধিক যৌথ প্রযোজনার কথাও এখানে উল্লেখ করতে হয়। উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে আছে দি ইম্প্রিভল, দি পোস্টম্যান, দি নাইট অব কাউন্টিং দি ইয়ারস, ইত্যাদি। আবু সইফ, মুহম্মদ শাহিনে, হসেন কামাল, শাদি আবসেলাম প্রমুখ, পরিচালক হিসেবে উল্লেখযোগ্য। মিশরীয় অভিনেতা ওয়র শরীফ হলিউডে গিয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন।

(সেনেগাল: আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিম উপকূলের একটি ক্ষুদ্রায়তন দেশ, উত্তর আফ্রিকা থেকে মরুভূমি অতিক্রম করে আগত ইসলামি সংস্কৃতির (আংশিক ভাবে) সুপ্রাচীন পটভূমি; দাস ব্যবসার সূত্রে ষোড়শ শতাব্দী থেকে ইউরোপীয়

সংসর্গে আগত, গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ফরাসি সাম্রাজ্যের অন্তর্গত, ১৯৬০ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্ত। রাজধানী ডাকার কলোনি আসলে ফরাসি-পশ্চিম আফ্রিকার প্রশাসনিক কেন্দ্রস্থল এবং আধুনিকতার প্রসারের কেন্দ্রবিন্দু (ভৌগোলিক অর্থে নয়)। এ শহর যেন পারীর আফ্রিকান সংস্করণ, চেহারাও চরিত্রে। চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এখানে, অনিয়মিত ভাবে। সেনেগাল-এর কাব্যের শেকড় পারীতে ও ডাকারে। সেনেগালের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রপরিচালক উসমান সেম্বেন্ (ড্র.)-এর কর্মক্ষেত্রও এই নতুন পুরোনোতে মেসা ডাকার নগর। — ধ. গ. )

আফ্রিকান ছবির ক্ষেত্রে একাধিক বিষয়ে এই সেম্বেন্কে প্রবর্তকের স্বীকৃতি দিতে হয়। শিল্পগত-কলাকৌশলগত বিচারেও এবং সামাজিক-রাজনৈতিক গুরুত্বের দিক থেকেও। মরক্কোর বেন বারকা ও মিশরের মুহম্মদ শাহিনেও দেশীয় পটভূমিতে এক-একটি বিশিষ্ট আঙ্গিক সংশ্লিষ্ট করেছেন। আফ্রিকান ছবিতে, দেশ নির্দেশে, কয়েকটি সাধারণ ঋষি বা ভাববস্তু লক্ষ করা যায়। যেমন, প্রথমত বিদেশি সংস্কৃতির উপস্থিতি ও প্রভাব এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ—দি নাইট অব কাউন্টিং দি টয়ারস ছবিতে ব্রিটিশ সংস্কৃতি বা সেম্বেনের ছবিতে ফরাসি সংস্কৃতি (যেমন লাতিন আমেরিকান ছবিতে মার্কিন সংস্কৃতি, সেরকম)। দ্বিতীয়ত, গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষের অকল্পনীয় দারিদ্র ও তজ্জনিত ক্ষোভ—যেমন ইথিওপিয়ার ছবি হারভেস্ট : থি, থাউজেণ্ড ইয়ারস। তৃতীয়ত, নতুন ও পুরাতনের সংঘাত, যেমন সেম্বেনের Xala, রোগোদিনের কাম ব্যাক আফ্রিকা (প্রাক্তন দক্ষিণ আফ্রিকা)। চতুর্থত, বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ—যেমন নাইজেরিয়ার ছবি জাই ফ্রিডম।

এই সাধারণ ঋষির উপস্থিতির কারণে আফ্রিকান ছবি তৃতীয় বিশ্বের ছবির মধ্যে বিশেষতঃ লাতিন আমেরিকান ছবির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ।

যাণ্ডো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আফ্রিকান ছবি : লাস্ট গ্রেভ অ্যাট ডিমবাজা, গ্রাক অ্যান্ড হোয়াইট টন কালার, দি একুসাইল, অ্যামোক, Emitai, Tabataba ।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : ফ্রব গুপ্তের আফ্রিকান সিনেমা : এ ভিউ ফ্রম ইণ্ডিয়া ।

॥ আউ গার্দ ॥

সাধারণভাবে শিল্পের যে কোনো নিরীক্ষামূলক মৌলিক আন্দোলনকেই এই নামে অভিহিত করা হয়, যা তৎকালে প্রচলিত আঙ্গিক এবং ব্যবসায়িক বিবেচনা ও

কখনো কখনো সামাজিক মূল্যবোধ থেকেও বিশিষ্টভাবে স্বতন্ত্র। সিনেমায় আদিকের অবকাশকে বাড়িয়ে তোলার সম্ভাবনা একেবারে নতুনভাবে স্পষ্ট করে না তুললে তাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায়ে ফেলা যায় না। আর্ভ গার্দ মূলত বিশেষ দশকে ফরাসি ও জার্মান চিত্রনির্মাতাদের একটা বড়ো অংশের স্টাইল। ফ্লেয়ার, ছলাক, দেনুক, এপস্টা ও রেনোয়া প্রবর্তিত এই স্টাইলে অন্তরঙ্গ বিষয়, অন্তর্লোকের প্রকাশ, ইমেজ বা প্রতিমার গুরুত্ব, স্বপ্ন-সদৃশ রূপ এবং শকট ফোকস, স্থপার. ইমপোজিশন ও অপ্রচলিত ক্যামেরাকোণের প্রাধান্য। কালক্রমে এই পরীক্ষা-মূলকতা বিভাজিত হয়ে ছড়িয়ে গেছে বিভিন্ন দেশে নতুন ধরনের ছবি করার প্রয়াসে। যেমন বিশেষ দশকের প্রথম আর্ভ গার্দের পরে, চল্লিশের দশকে দ্বিতীয় আর্ভ গার্দ। যেমন পঞ্চাশের দশকের আগারগ্রাউও ছবিগুলি প্রসঙ্গে তৃতীয় আর্ভ গার্দের উল্লেখ, ইত্যাদি। ফলে অ-বর্ণনাত্মক আঙ্গিক, বিঘূর্ত চলচ্চিত্র, সাররিয়া-লিজম ও এক্সপ্রেশনিজম (ড্র. বাদ / ইজম), দ্বন্দ্বিক মনতাজের পরীক্ষা ও ফিল্ম কাব্য, অ্যানিমেশন ও সমস্ত রকমের প্রতিষ্ঠান-বিরোধী ছবি বৃহত্তর অর্থে সমস্তই আর্ভ গার্দের অন্তর্ভুক্ত। আর্ভ গার্দের অনেক উপাদান এখন প্রচলিত আদিকের অন্তর্ভুক্ত, যা তার শক্তি ও সাফল্যেরই প্রমাণ। এর সবচেয়ে বড়ো সাফল্য হলো সিনেমার দৃশ্যরূপ ও শাব্দিক অভিঘাত, আর দৃশ্যছন্দ ও সাংগীতিক ছন্দের সংশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ফিল্ম সেন্স সংক্রান্ত ধারণাকে স্পষ্টতর করা। যার অনবদ্য উদাহরণ ১৯৫৭ নাগাদ সূচিত ফ্রান্সের নিউ ওয়েভ বা নতুন রীতির চলচ্চিত্র। দীর্ঘাবধি অর্থে পরীক্ষামূলক ছবির বদলে প্রগতিশীল ছবিকেও এর আওতায় আনা হয়। তবে আর্ভ গার্দ চিত্রনির্মাতারা প্রায় কখনোই ছবিতে বহির্বাস্তবতা আনবার চেষ্টা করেননি। ক্যামেরার কৌশলে নিম্প্রাণ বস্তুকে পর্দায় সচল গতিময়তা দেওয়ারও এই নামে অভিহিত করা যায়, যেমন, জলন্ত মশালের নাচ; যেমন স্বল্প দৈর্ঘ্যের 'দি চেয়ার' ছবিতে চেয়ারের জীবন্ত আচরণ।

॥ ল' আভেল্লুরা ॥

এম. আন্তনিওনির ছবি, ইতালি, ১৯৬০। কাহিনীর স্বল্পতা ও কী ঘটছে / কেন ঘটছে-র প্রচলিত স্মার্টটিককে বর্জন ছবিটিকে তৎকালে একটা আপাত দুর্ভাগ্য দিচ্ছেছিল। আজ এই ছবিকে আমাদের আরও বেশি বাস্তব ও অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক মনে হয়। প্লটগত ভাবে এই ছবি এক যৌন সমস্যার, যৌগত ভাবে বিশ্বাসভঙ্গের। আন্তনিওনির প্রিয় বিষয় (মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের রহস্য),

নিজস্ব ক্যামেরা শৈলী ও মাপা সম্পাদনা এই ছবিকে আশ্চর্য পরিমিতি দিয়েছে। নিখোঁজ মেয়েটির জন্ম অনুসন্ধান ছবিতে বৃহত্তর ও বিমূর্ত কোনো কিছুর সন্ধান, এইরকম যাত্রা পেয়েছে। ক্যামেরার অসাধারণ ব্যবহার ও দীর্ঘ মডুলেটিং শটসমূহ অনুসন্ধানের দৃশ্যগুলিকে অনবদ্যভাবে ধরে রেখেছে। ছবির ধীর, শান্ত, বিবাদাচ্ছন্ন গতিভঙ্গি এই প্রতীকী অনুসন্ধান / যাত্রাকে বিশ্বাসযোগ্যতা দিয়েছে। সমাপ্তিতে পরিচালক যখন আমাদের দৃষ্টিকে আবদ্ধ ফ্রেম থেকে বিস্তৃত করে দেন তুম্বারা-বৃত্ত দুয়ের পর্বতমালায় তখন তা আন্তর্নিওনির শিল্পসত্তার এক মূল্যবান দিক আমাদের সামনে তুলে ধরে। (ড. আন্তর্নিওনি)

আমাদের মানিকা ভিডিও ও গ্যাভিয়েল ফেরজেন্তি; আলোকচিত্রে A. Scavarda, সম্পাদনা ই. ডি. রোমা, সংগীত G. Fusco, শিল্প নির্দেশনা P. Poletto।

॥ আমবার্টো ডি ॥

ইতালি, ১৯৫২। নিও-রিয়ালিজমের প্রধান হ্রদ দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ও তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনার নিজস্ব মূল্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণে, যাতে ঘটনা-সংযোগ, আরোপিও নাটকীয়তা, বিমূর্ত শিল্পিতা ও প্রথাগত মুদ্রাদোষ থাকে না, কিন্তু ছবির অতি তীব্র বাস্তবতাকে এক সর্বাঙ্গীণ মানবকল্যাণবোধ ঘিরে রাখে। অপেশাদার অভিনেতাদের নিয়ে তৈরি ভিস্তোরিয়ো ডে দিকার আমবার্টো ডি এর এক সার্থক উদাহরণ। ছবিতে মূল চরিত্র দুটি, এক অবসরপ্রাপ্ত নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ আমবার্টো ও তার ঘরের কাজকর্ম করে দেয় যে সেই অল্পবয়সী গর্ভবতী মেয়েটি। দারিদ্র, নিঃসঙ্গতা ও অসম্মানের সঙ্গে ক্রমাগত যুঝে ক্লান্ত বৃদ্ধের একমাত্র সাহায্য হতে পারত মেয়েটির সাথে তার দিক থেকে স্থাপিত কোনো সম্পর্ক, স্নেহের, যোগাযোগের, সংলাপ আদান-প্রদানের। কিন্তু তা হয়নি। এই নিরুপায় অসহায়তার চিত্রায়ণে যে আণ্ডরিকতা, মানসিক আবেদন ও সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী পটভূমিতে তার আবেগগত রস ও বস্তুগত মূল্য দুই-ই অনস্বীকার্য। এই ছবি সম্পর্কে আবেগ-বাহুল্যের যে অভিযোগ করা হয়েছিল তার অনেকটাই সম্ভবত ছবির আবহ সংগীতের দরুন। কেননা দৃশ্যগঠন, বিশেষত, বৃদ্ধের আত্মহত্যার কল্পনার দৃশ্যে জুম শটের ব্যবহার বা তাঁর যে সময় বিছানায় কাটে সেই সময়ের ও মেয়েটির রান্নাঘরের কাজকর্মের দৃশ্য-পরম্পরা আজও আশ্চর্য পরিমিত ও দিনেমাটিক মনে হয়।

অভিনয়ে কার্লো বাতিস্তা ( বৃদ্ধ ), মারিয়া ক্যাসিলিও ( মেয়েটি ); চিত্রনাট্য জাভাস্তিনি, ডে সিকা ; আলোকচিত্র জি আর অ্যালডো, সম্পাদনা ই ডি রোমা । ছবিটি উৎসর্গ করা হয়েছিল ডে সিকার বাবাকে ।

## ॥ আমেরিকা ॥

১৮৯৫য়ে লুমিয়ের ভাইদের প্রযোজিত স্বল্প দৈর্ঘের ছবি দেখিয়ে আমেরিকায় চলচ্চিত্রের সূচনা । চলচ্চিত্র ইতিহাসের আদি যুগে যাদের প্রারম্ভিক প্রচেষ্টায় চলচ্চিত্রের টেকনোলজির দিকটি সমৃদ্ধ হয়ে একে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্পমাধ্যম করে তুলছিল তাদের অগ্রতম শ্রেষ্ঠ দুজন আমেরিকান—টমাস আলভা এডিসন ও জর্জ ইস্টম্যান । এডিসন চলচ্চিত্রকে যান্ত্রিক ভাবে যতটা সমৃদ্ধ করেছেন আর কেউ ভেমন করেননি, ফিল্মের যে আদি ফর্ম্যাট তিনি ঠিক করে যান তা সাধারণভাবে আজও অক্ষুণ্ণ আছে । ইস্টম্যান স্থাপিত ফটোগ্রাফিক সংস্থা ইস্টম্যান কোডাক কোম্পানির ভূমিকাগো আজ পর্যন্ত সমান গুরুত্বপূর্ণ । যন্ত্র-সযন্ত্রির পর দিনেমার পক্ষে জরুরি হলো শিল্প-উৎকর্ষ অর্জন । এই কাজে যাদের অবদান সবচেয়ে বেশি তাদেরও অন্তত দুজন আমেরিকান—এডউইন এস পোর্টার ও ডি. ডবলিউ গ্রিফিথ । প্রথম জনের ‘দি গ্রেট ট্রেন রবারি’ ও দ্বিতীয় জনের ‘বার্থ অব এ নেশন’ ও ‘ইনটলারেন্স’ পৃথিবীর সবচেয়ে আলোচিত ছবিগুলির কয়েকটি । এই সময়ের মধ্যে লস এঞ্জেলসের ক্যালিফোর্নিয়ায় ফিল্ম স্টুডিও স্থাপন ও চলচ্চিত্র প্রযোজনার বিভিন্ন স্থবিধা কেন্দ্রীভূত করে হলিউড (ড্র.) নাম দিয়ে চলচ্চিত্র শিল্পের মূল কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কাজ অনেকটা অগ্রসর হয়েছে । গ্রিফিথ, ডেমিলে ও অগ্রদেদের ছবির পৃথিবীব্যাপী ব্যবসায়িক সাফল্য বিশেষ দশকের শেষ ভাগে ওই হলিউডকে সবচেয়ে ব্যস্ত চিত্র-নির্মাণ কেন্দ্র করে তুলল । বিশ ও ত্রিশের দশকই হলো হলিউডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্ব । এই সময়ে জন ফোর্ড, হাওয়ার্ড হক্স, ফ্রান্স কাপরা নতুন নতুন পরিচালকের আবির্ভাব হলো । এরই সঙ্গে অস্ট্রােল দেশ থেকে আগত বিশিষ্ট পরিচালকরাও ছিলেন, যেমন, গুরনাউ, কোর্ডা, স্টার্নবার্গ, স্ট্রাইইম । আর ছিলেন চ্যাপলিন তাঁর কমেডি নিয়ে । কমেডি, ওয়েস্টার্ন, সংগীত প্রধান ছবি, শিশু অভিনেতা নির্ভর চিত্র— হলিউডে বিভিন্ন ধরনের ছবি তৈরি হচ্ছিল । হলিউড নামটা ততদিনে একটা দৃষ্টিভঙ্গি ও ঐতিহ্যের প্রতীক হয়ে উঠেছে । গ্ল্যামারও বেড়েছে । অভিনেতা অভিনেত্রীরা ( গার্বো, মনরো, ডীট্রিশ ) হয়ে পড়েছেন তারকা । আমরা যাকে বলি স্টার সিস্টেম ( একদিকে স্টুডিওগুলি চিত্রতারকা তৈরি করার ক্ষমতা রাখত, অগ্র-

দিকে ভারকাদের নিজস্ব দর্শকমণ্ডলী থাকত) তার জন্ম আমেরিকাই দায়ী। জনগণের মনোরঞ্জনের ব্যাপক নিয়মবিধি ও মূল পদ্ধতিও হলিউডই বেধে দিচ্ছিল। শব্দের আগমনে হলিউড সাময়িকভাবে থমকে গেল। কিন্তু ১৯২৭য়ে 'দি জাজ সিদ্ধার' সর্বকচ্ছিত্রের সাফল্যে ও শব্দের যুগে এসেও গার্বোর অপ্রতিহত জনপ্রিয়তায় হলিউড শব্দকে অধিকারে আনার সাহস পেল। আমেরিকার প্রধান ফিল্ম কোম্পানিগুলির; ফক্স, ওয়ার্নার ব্রাদার্স, এম জি এম, প্যারামাউন্ট, কলম্বিয়া, ইউনিভার্সাল, ইউনাইটেড আর্টিস্টস, আর কে ও; প্রত্যেকেই নিজস্ব ধরনে সর্বকচ্ছিত্র তৈরি শুরু করল। অষ্টাশ্র দেশ থেকে আরো পরিচালক—হিচকক, ল্যাং, বেনোয়া—এসে আমেরিকায় কাজ করতে লাগলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে একসময় এই দেশেই চিত্র প্রযোজনার কাজ মোটামুটি অব্যাহত ছিল। যুদ্ধের পর বিলি ওয়াইল্ডার, এলিয়া কাজান প্রমুখ নতুন পরিচালক এলেন। হলিউডের ছবি পেশাদারিত্ব, চাকচিক্য, কলাকৌশলগত উৎকর্ষ, বর্ণনাভিত্তি, নাটকীয় গতি, তারকার উপস্থিতি, গ্রহণযোগ্য প্লট ও ব্যবসায়িক আশ্ববিধাসের অত্যন্তদিন যে জনপ্রিয়তা পেয়েছিল তা ধরে রাখার জন্ত এখন বিভিন্ন নতুনধরনের প্রযোজনা হলো। লোকেশন শুটিংয়ের চল বাড়ল, রঙের মাধ্যমে আর দিনেরামা, সিনেমাস্কোপের প্রসারিত পর্দায় ছবি করা শুরু হলো, বিষয়বস্তুতে অটিলতা এলো, পরিচালকদের মূল্য ও গুরুত্ব বাড়ল। জিন্ম্যান, আর্থার পেন, ক্লরিক ও তার পরে উডি অ্যালেন, কপোলা, স্পিলবার্গ, লুকাস চিত্রনির্মাণে সফলতা পেলে। আমেরিকার ছবিতে অসাধারণ টেকনিক্যাল বৈচিত্র্য এলো, আন্তর্জাতিক, ফোরম্যান, পোল্যানস্কি, কুরোশাওয়া, স্করসিজ—বহু বিদেশি পরিচালক আমেরিকায় এসে এই বৈচিত্র্যকে কাজে লাগালেন। থীমের ও শৈলীর বৈচিত্র্যে এখন গভীর হতাশাবাদে এই সমস্ত ছবি চিহ্নিত। ব্যতিক্রম কুরোশাওয়ার কিছুমাত্র। কিন্তু ততদিনে বর্ধমান হলিউড আর চিত্রনির্মাণের প্রধান কেন্দ্র নয়। টোলিভশনের প্রসার, ইউরোপের প্রায় সর্বত্র ব্যাপক হারে চিত্র উৎপাদন ও আমেরিকান ছবির প্রদর্শন সম্পর্কে বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা এই অবস্থার কারণ। এ ছাড়া, হলিউডের ছবির জনপ্রিয়তাও মধ্যে কমেছিল। তবু সম্প্রতি কল্পবিজ্ঞান-ভিত্তিক কাহিনীর চমকপ্রদ দৃশ্যরূপের ব্যাপক বাণিজ্যিক সাফল্যের দরুন এবং আমেরিকার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধির আর সাংস্কৃতিক প্রচারের সুবাদে এই দেশের ছবির ভূমিকা এখনও উল্লেখযোগ্য। চলচ্চিত্রের রাজধানী না থাকলেও হলিউড এখনো প্রতীকসম। কেননা হলিউড যতটা না চিত্রনির্মাণ কেন্দ্র,

তার চাইতে বেশি একটা ঘরানা ও তার চেয়েও বেশি—একটা ঐতিহ্য ।  
( ড. আগারগ্রাউণ্ড চলচ্চিত্র, ওয়েষ্টার্ন, তথ্যচিত্র, মিউজিকাল )

প্রাদঙ্গিক গ্রন্থ : C. Higham-এর দি আর্ট অব দি আমেরিকান ফিল্ম ॥

॥ আর্কাইভে ছবি সংরক্ষণ ॥

ফিল্ম আর্কাইভ হলো চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জিনিশ—ছবির প্রিন্ট, চিত্রনাট্য, স্থিরচিত্র, আবহ সংগীতের স্বরলিপি, সংলাপ ও সংগীতের ক্যাসেট ইত্যাদি এবং পরিচালক প্রমুখের রচনা ও ডায়েরির পাণ্ডুলিপি—সংরক্ষিত করে রাখার জন্ত স্থাপিত আগার । আর্কাইভ গ্রন্থাগার ও মিউজিয়ামের এক সমন্বিত রূপ । এর প্রাথমিক সূচনা ১৯১৮য় । ১৯৩৫য়ে স্থাপিত ব্রিটেনের গ্রাশনাল ফিল্ম আর্কাইভ এর প্রথম পূর্ণাঙ্গ রূপ । চলচ্চিত্র বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্ত আর্কাইভের সাহায্য নেওয়া প্রথম গুরু হয় রাশিয়ায় । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আর্কাইভের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে, ও এখন সমস্ত ফিল্ম স্কুলেই এর উপস্থিতি অপরিহার্য । স্থানাভাবের জন্ত সমস্ত ছবিকে সংরক্ষিত করে রাখা সম্ভব হয় না, ফলে বিশেষভাবে ছবি নির্বাচন করা হয় । যে সমস্ত ছবির অ্যাকাডেমিক / ঐতিহাসিক / শৈল্পিক / টেকনিক্যাল গুরুত্ব ও মূল্য রয়েছে এবং ফলে ছাত্র, গবেষক ও রসজ্ঞ দর্শকের প্রয়োজনে আসবে সেই সব ছবি আগে নির্বাচিত হয় । গ্রেট মাস্টার ও শ্রেষ্ঠ পরিচালকদের ছবি অগ্রাধিকার পায় । বিশেষ বিশেষ দেশের আর্কাইভ ছবি নির্বাচনে ভৌগোলিকতা ও সামাজিক প্রসঙ্গকে, বিশেষ কোনো আর্কাইভ বিশেষ ধরনের ছবিকে ( সংবাদচিত্র বা নৃতাত্ত্বিক ছবি বা অ্যানিমেশন বা বিজ্ঞান-বিষয়ক ইত্যাদি ) প্রাধান্য দেয় । ছবি সংরক্ষণ একই সঙ্গে অর্থ ও প্রযুক্তি সাপেক্ষ । তাপ-নিয়ন্ত্রিত ও মুলোহীন ঘরে, রঙিন ছবি হলে C৩ আলোয়, —৪°C তাপমাত্রায়, ১৫% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় এবং সাদা কালো ছবি হলে N১ আলোয়, ১৩°C তাপমাত্রায়, ৫৫% আপেক্ষিক আর্দ্রতায়, ছবি রাখা হয় । ঘরের দেয়ালে লাগানো হয় বিশেষ ধরনের ডিস্টেম্পার । নির্বাচন, নির্বাচিত ছবির উপযুক্ত কপি সংগ্রহ, সেই সব প্রিন্টের সংরক্ষণ, আগ্রহীদের জন্ত তার তালিকা তৈরি ও প্রয়োজন মতো ছবির অভিরিক্ত কপির প্রজেকশন—আর্কাইভের কাজ বহুমুখী । রচনা বা স্থির-চিত্রের তুলনায় চলচ্চিত্রের তথ্যমূলকতা ও ফলে তাতে ভবিষ্যতে-ইতিহাস-রচনার উপাদান অনেক বেশি । তাই ছবি সংরক্ষণ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ । এই কাজে সরকারের জাতীয় ফিল্ম আর্কাইভকে যথেষ্ট অর্থসাহায্য দেওয়া যেমন প্রয়োজন, বিভিন্ন

জাতীয় আর্কাইভের মধ্যে আন্তর্জাতিক স্তরে সহযোগিতাও সমান বাঞ্ছনীয়। এর জন্য ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ফিল্ম আর্কাইভস (ড্র.) স্থাপিত হয়েছে। (ড্র. ল্যাংলোয়া)। এম জি এম-এর মতো নামী প্রযোজক বা ইন্সট্যানকোডাকের মতো বড়ো প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আর্কাইভের কথা এখানে উল্লেখ্য। ভারতবর্ষের জ্ঞানশাল ফিল্ম আর্কাইভ স্থাপিত হয়েছে পুনে-তে।

টি. ল্যান্ডি

॥ টমাস গুতিয়েরে আলিয়া ॥

‘সমাজবাদী’ ছনিয়ার, বিশেষ করে অন্ততপক্ষে তরুণতভাবে সমাজবাদী রয়েছে এখনও যে দেশ সেই সুবার ( কিউবার ) চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে আলিয়া অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ শিল্পী। আলিয়া তাঁর স্বল্প জটিল চলচ্চিত্র কর্মে রাজনীতি নিয়ে কোনোদিন কোনো-রকম সরলীকরণকে প্রত্যাখ্যান করেননি। কান্ট্রোর বিপ্লবের পর কুবাতে সমাজবাদের প্রতিষ্ঠার পরও তিনি মাহুয়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক সত্তা এবং ব্যক্তিসত্তার জটিল সম্পর্কে গভীরতার সঙ্গে তাঁর ছবিতে ধরতে চেষ্টা করেছেন। ফলে তাঁর ছবিতে যথার্থ আত্মসমালোচনা চিরকালই লভ্য হয়েছে। বিপ্লবের আগে আলিয়া পপুলার স্ট্রোনালিস্ট পার্টির (PSP) সদস্য ছিলেন না, কিন্তু তাদের হয়ে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ‘লা কাপেকচিতা রোহা’ এবং ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ‘উন্ ফফির’ নামে দুটি ছবি করেন নেস্টর আলমেন্ডেসের সাহায্যে। পঞ্চাশের দশকে বাতিস্তার একনায়ক-তন্ত্রের আমলে ‘হুয়েস্তো তেম্পো’ বা ‘আওয়ার টাইম’ সংস্কার মাধ্যমে আরও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অত্যন্ত অংশগ্রাহী হিসাবে আলিয়া চলচ্চিত্র কর্মকে আন্দোলনের অত্যন্ত ক্ষেত্র বলে বেছে নেন—তারই ফল হলো পরে কান্ট্রোর বৈপ্লবিক সরকার গঠনের পর কুবান ইনস্টিটিউট অফ সিনেমাটোগ্রাফিক আর্ট (ICAI), যার অত্যন্ত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আলিয়া। এই ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে আলিয়া ইতালির নিও-রিয়াশিজ্‌মের আদর্শে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে ছবি করেন—‘স্টোরিস্ অফ দ্য রেভোলিউশন’, যার ক্যামেরাম্যান ছিলেন ইতালিয় ক্যামেরাম্যান ওতেল্লো মার্ভেল্লি। তিনটি কাহিনী ভিত্তিক এই ছবির একটি পর্ব চে গুয়েভেরার সংগ্রাম নিয়ে রচিত। এর দু’ বছর পর আলিয়া তার প্রথম কমেডি ছবি দ্য টুয়েল্ভ চেয়ার্স তৈরি করেন। রাশিয়ান কাহিনীকে কুবান বিপ্লবের পটে স্থান করে। ম্যাক সেনেট ও চ্যাপলিনের আদর্শে ‘ক্রেজি কমেডি’র চিত্রভাষা অবলম্বন করে যে কমেড গুণ আলিয়া এখানে সৃষ্টি করেন তাতে ‘ডেথ অফ এ

ব্যুরোক্রাট' এবং 'সার্ভাইভার্স'-এর ডার্ক কমেডির পূর্বাভাস রয়েছে বলা যায়। এর পরের ছবি কামবাইট (1965, Cumbite) তাঁর রসেলিনির নিওরিয়ালিজমের আদর্শে প্রস্তুত শেষ ছবি। আলিয়া নিজে এ বিষয়ে বলেন 'যখন আমরা বিপ্লবোত্তর সময়ে ছবি করতে শুরু করি তখন বিপ্লবের খাতিরে ঐ রীতি প্রয়োজনীয় বলে মনে হয় এবং আমরাও অন্য রীতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্ম প্রস্তুত ছিলাম না। ...ঐ ঐতিহাসিক মুহূর্তে ঐ রীতিই ছিল সবচেয়ে সুপ্রযুক্ত।' এরপর তিনি যা বলেন তার অর্থ হলো বছর কয়েক পর বিপ্লবের চরিত্রেও পরিবর্তন এসেছে এবং সেই অনুযায়ী চলচ্চিত্র রীতিও পালটাতে হয়েছে। কারণ 'বাস্তবের প্রতি বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন'-এর জন্মই চলচ্চিত্রাদর্শও পালটাতে হলো। শুরু হয় ফেল্লিনি-গদারকে তন্নতন্ন করে দেখে আলিয়ার নতুন চলচ্চিত্রাদর্শ সৃষ্টির প্রচেষ্টা। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে প্রস্তুত 'ডেথ অব এ ব্যুরোক্রাট' ছবিতে হলিউড কমেডির প্যারডি রচনার মাধ্যমে তিনি বিপ্লবোত্তর আমলাতন্ত্রকে যে ভাবে ব্যঙ্গ করেন, একটি মৃতদেহকে কবর দেবার ঘটনাকে অবলম্বন করে, তাতে বোঝা যায় বিপ্লবের জন্ম স্টালিনী আদর্শে সরলরৈখিক প্রচারের বদলে বিপ্লবের অন্তর্মুখী বিশ্লেষণ, তাকে শিরস্তর প্রদান করাই তাঁর ব্রত হবে। তবে এটা লক্ষ করার মতো যে স্টালিনী রাশিয়ায় এ ছবি করা যেত না, কারণে কুবাতে করা গিয়েছিল। এরপর ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে প্রস্তুত 'মেমরিজ অব আওয়ারডেভেলপমেন্ট'-এ আলিয়া বিপ্লবোত্তর যুগে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর অন্তর্লোক উদ্ঘাটন এবং ক্রমশ তার সম্পূর্ণ 'এলিয়েনেশন'-এ আশ্রয়ের যে অসামান্য ছবি-তৈরি করেছেন তাতে কাহিনীবর্ণনের গতিতে, সনয়কে ভাঙুর করার দুঃসাহসী পরীক্ষার সঙ্গে কুবা-সিম্পাইলদের ইতিহাসকেও নিপুণভাবে সন্নিবিষ্ট করেছেন। আত্মীয়-স্বজনের কুবা-ত্যাগের পরও সাগিওর বিপ্লবোত্তর কুবাতেই থেকে যাওয়া তার পূর্বাভাসের রেশ টেনে নিজের চিন্তনের জগতে নিজের নিষ্ফল আশ্রয় গ্রহণ, এবং তারই আত্মকথনে (সাউণ্ড ট্র্যাক মনোলোগে পূর্ণ) তার নিজস্ব সর্বনৃপ্তি এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির দাবা খেলায় কুবারও বিলুপ্তি সম্ভাবনাকে এক অপূর্ব হৃদয়গ্রাহী এবং বুদ্ধিদীপ্ত জটিল নকশাতে ধরেছেন আলিয়া।

কিন্তু যে গদার ষাটের দশকে তাঁর আদর্শ ছিল তার মধ্যে সত্তরের দশকে আলিয়া 'নিজসৃষ্টি ছর্ষোধ্যাত্ম নিজস্ব তৃপ্তি'র পরিচয় পেয়ে নিও-রিয়ালিজম-এর মতো সে সিনেমার আদর্শকেও ছেড়ে 'দ্য লাস্ট সাপার'-এ এপিকধর্মী লোক-ঋাখাশ্রয়ী রীতিতে মনোনিবেশ করেছিলেন। সত্তরের দশকে বিপ্লবেরও অনেক

পরিবর্তনও হয়েছে, ষাটের দশকের প্রাণবন্ত সিনেমা সংস্কৃতিতেও নানা ধরনের বদল এসেছে। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে হাইতিতে একটি দাস বিদ্রোহকে অবলম্বন করে এখানে বড়ো ক্যানভাসে আলিয়া ইতিহাসকে গ্রন্থ করেছেন এবং তারপর এই ইন্টারের পাঁচদিনের জন্ত পাঁচ অধ্যায়ের একরৈখিক কাহিনী বর্ণনের মধ্যেও তিনি কৃষ্ণকায় দাসদের কাউন্ট কাসা বাইয়োনার নিজের মধ্যেই খ্রিস্ট ইমেজ সৃষ্টি করে বারজন দাসকে বেছে নিয়ে যে ‘শেষ নৈশতোজের’ আয়োজনটি করেন সেই দীর্ঘ অধ্যায়টির বুল্লেলীয় ডার্ক কমেডি অতুলনীয়—তাকে ‘তিরিদিয়ানা’র মগোজ মনে হয়। সেখানে লাতিন আমেরিকার সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের, তার মধ্যে আফ্রিকান সংস্কৃতির উপাদানের সম্মিলনের বর্ণনা ছবি আঁকেন আলিয়া, এক সময় আফ্রিকান সংগীত ও নৃত্য কৃষ্ণকায় দাসদের হাতে সাংস্কৃতিক লড়াই-এর অস্ত্র-তুলা হয়ে যায়। বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত দমন করা হলেও, একজন দাসের পলায়নের দৃশ্যকে দীর্ঘায়িত করে তাকে লিটিন বা অস্বাভাবিক লাটিন আমেরিকান চলচ্চিত্রকারদের সৃষ্ট প্রতীকিতার সঙ্গে এক করে দেন আলিয়া, যে প্রতীক মুক্তির প্রতীক।

‘লাস্ট সাপার’ তৈরি শেষ হয় ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয় ‘দু সার্ভাইভার্স’, যেখানে আলিয়া বুল্লেলীয় ডার্ক কমেডিকে তুঙ্গে তোলেন বিপ্লবোত্তর কুবার এক ধনী সম্পত্তিশালী পরিবারের একটি বিরাট অংশের বিপ্লবকে অগ্রাহ করে প্রাক-বিপ্লব অবস্থার পুনরাগমন (আমেরিকার সাহায্যে)-এর আশায় টিকে থাকার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার প্রচণ্ড হাঙ্গামার অথচ মর্মান্তিক এবং শেষ পর্যন্ত ভয়াবহ নরমাংস ভক্ষণের স্তরে নিয়ে এসে। এরপর ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে আলিয়া ফিরে যান বিপ্লবোত্তর কুবাতে সাম্যবাদী বুদ্ধিজীবীর আত্মবিশ্লেষণে, এদের বিপ্লব তাঁর নারীপুরুষের সমতার সমস্যা। সেখানে দেখা যায় বিপ্লবোত্তর কুবাতের একজন নরনারীর সাম্যে বিশ্বাসী পুরুষ চলচ্চিত্রকার (যিনি তাঁর স্ত্রীর সহযোগিতায় নারী আন্দোলনের জন্ত তথ্যচিত্র তৈরি করছেন) পুরুষ হিসেবে তাঁর আধিকার ছাড়ছেন একটা দূর পর্যন্ত, তার বেশি নয়, ছবির নামও ‘আপ টু এ পয়েন্ট’। বিপ্লবী সমাজে ব্যক্তির সমালোচনার মাধ্যমে এইভাবে নিরন্তর আলিয়া বিপ্লবের আন্তর চরিত্রকে প্রদর্শন করে যেতে থাকেন।

আশির দশকের শেষ দিকে লাতিন আমেরিকায় বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহ-প্রযোজনা কিছুটা ফলপ্রসূ হচ্ছিল, গাব্রিয়েল গাসিয়া মার্কোস নিজে চলচ্চিত্রে গোটা আশির দশকে বিশেষ সক্রিয় অগ্রহ নিয়েছিলেন। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে মার্কোসের চিত্রনাট্য অবলম্বনে আলিয়া ‘লেটার্স ফ্রম দ্য পার্ক’ ছবিটি তৈরি করেন। কিন্তু তার

পরেই এল পূর্ব ইউরোপ ও প্রাক্তন সোভিয়েত রাশিয়াতে পালা বদলের পালা, এবং কুবার সমাজে রাজনীতিতে তার প্রবল অভিব্যক্তি। এই অনিশ্চয়তার মুহূর্তে ১৯৯৩ সালে তৈরি হলো তাঁর 'স্ট্রুভেরিজ অ্যাণ্ড চকলেটস্' নামক সাম্প্রতিকতম, প্রচণ্ড বিতর্কিত, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দের বালিন চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি। বিতর্কের প্রধান কারণ সম্ভবত বিষয়বস্তুতে সমকামিতার অবতারণা। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক টালমাটালের মধ্যেও আলিয়া তাঁর সৃষ্টিশীলতা নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণে রত।

**শ্রবণ গুপ্ত**

॥ আলেকজাণ্ডার নেভস্কি ॥

সোভিয়েত রাশিয়া, ১৯৩৮। মধ্যযুগের রাশিয়ার জাতীয় বীর আলেকজাণ্ডার। তিনি রুশদেশ-আক্রমণকারী জার্মান নাইটদের পরাজিত করে স্বদেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখেন। সেই ঐতিহাসিক ঘটনাকে প্রতীকী রূপ ও মূল্য দিয়ে এই ছবি আইজেনস্টাইনের নাৎসিবাদ বিরোধী ছবি। সম্পন্ন দৃশ্যরস, সচেতন ও কেতাবী দৃশ্য-পরিকল্পনা, দৃশ্যহন্দ ও সাংগীতিক ছন্দের সমন্বয় এবং উদ্দেশ্যমূলক সম্পাদনায় ছবিটি প্রাণবন্ত। এই ছবি নিয়ে আইজেনস্টাইনের নিজস্ব আলোচনা (আঙ্গিক 'ও প্রসঙ্গ : অহুশীলনী) খুবই মূল্যবান। (ড. আইজেনস্টাইন)

অভিনয়ে চেরকাশভ (আলেকজাণ্ডার), চিত্রনাট্য আইজেনস্টাইন ও পাভলেস্কো; আলোকচিত্র টিশে, সম্পাদনা আইজেনস্টাইন, সংগীত প্রোকোফিয়েভ।

॥ অ্যাকশন প্রধান ছবি ॥

এক শ্রেণীর 'ওয়েস্টার্ন' ছবি যাতে অ্যাকশন / হিংস্রতা / গতি / দস্যুদল / বীর-তন্ত্রের প্রারম্ভ, এদের উপস্থিতি সেখানে প্রায় ফর্মুলা মারফি। (ড. চলচ্চিত্রের ইতিহাস)। নির্বাক যুগে যা ছিল শুধুই অ্যাকশন, শব্দের আবিষ্কারের পর তা চটুল সংলাপ ও উদাস্ত আবহ সংগীতে পরিবর্তিত হয়ে আরো বেশি উত্তেজক হয়ে উঠেছে। এই ছবির জগৎ যন্ত্রণভাতার মিথের এক নতুন জগৎ। এই ছবিতে এখন বহির্মুখী অ্যাকশনকে লুক্কায়িত বা গুপ্ত অ্যাকশন ও বৈধ বা অবৈধ যৌনতার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এর ওপর ছড়িয়ে পড়ছে বিজ্ঞানের গাদ ও মনস্তত্ত্বের আবর্জনা, যা সামাজিকভাবে আরো বেশি ক্ষতিকর। (ড. ওয়েস্টার্ন, চলচ্চিত্রে ভাবনাস্বীতি)

## ॥ নিগূসে অ্যান্ডারসন ॥

( জন্ম ১৯২৩, ভারতে, মৃত্যু ১৯৯৪। ব্রিটিশ চিত্রপরিচালক )। অক্সফোর্ডে পড়াশুনার পর সিকোয়েন্স পত্রিকার সম্পাদনা ও চিত্রসমালোচনার মাধ্যমে চিত্রজীবনের সূচনা। টিভি ফিল্ম, বিজ্ঞাপনী চিত্র ও স্বল্প দৈর্ঘ্যের চিত্রনির্মাণের ( যার মধ্যে আছে লণ্ডনের বিশ্ববিখ্যাত সবজি-বাজার কন্ভেন্ট গার্ডেন নিয়ে তথ্যচিত্র 'এভরি ডে একসেপ্ট ক্রীস্টমাস', ) এবং নাট্য পরিচালনার বিবিধ কাজ করে ১৯৬০তে তিনি প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্র 'দিস স্পোর্টিং লাইফ' নির্মাণ করেন। ব্রিটেনের পোস্ট অফিসের আন্দোলনের এই অত্যন্ত প্রধান প্রবক্তার পরবর্তী উল্লেখযোগ্য কাহিনীচিত্র 'টম' ১৯৬৮তে, 'ও লাভি ম্যান' ১৯৭২য়ে, 'ইন সেনিট্রেশন' ১৯৭৪য়ে ও 'নির্গাণিকা' ১৯৮২তে নির্মিত হয়। তাঁর ছবি সম্পর্কে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের কথা মনে আসে তা হলো, প্রথমত সাধারণভাবে ব্রিটিশ ছবিতে বিষয়বস্তুর যে প্রাধান্য দেখা যায় কাহিনী ও বক্তব্যের সেই গুরুত্বকে অ্যাণ্ডারসন আঙ্গিকের বিশিষ্টতার সাথে সমন্বিত করতে পেরেছেন, যেজন্য চিত্রভাষার স্বাভাবিক ও সাফল্যের বিচারেও তাঁর স্থান খুব উঁচুতে। দ্বিতীয়ত প্রত্যক্ষ বিষয়বস্তুর চেয়ে বিষয়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা গীমের ওপর তিনি বেশ মনোযোগ দেন বলে দেশজ বিষয়ও এক আন্তর্জাতিক মাত্রা পায়— যেমন বধির শিশুদের শিক্ষাদান সম্পর্কে 'থারস্‌ডে'জ চিল্ড্রেন' সমগ্র শিশু-সমাজতত্ত্বেরই এক প্রসঙ্গ হয়ে ওঠে, ব্রিটিশ শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে 'ইফ'-এর নায়কের ব্যক্তিগত বিদ্রোহ প্রশাসনের ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আধুনিক তরুণদের দেশনিরপেক্ষ প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ হয়ে ওঠে। তৃতীয়ত তাঁর শিল্পকর্মে এক ধরনের বৈপরীত্য কাজ করে, যেমন 'ও ড্রিমল্যান্ড'-এর রুক্ষতা বনাম 'দি কোয়ার্টার মাস'-এর সারল্য, 'দিস স্পোর্টিং লাইফ'-এর আবেগবাহুল্য বনাম 'ও লাভি ম্যান'-এর নিরাপেক্ষ। এই বৈপরীত্যের প্রসঙ্গটিকে আরও প্রসারিত ও সার্বজনীন করা যায়। যেমন 'টম'য়ে বাস্তব ও কল্পনার দ্বন্দ্ব, বা 'ইফ' যদি হয় কালের কঠোরতা ও 'ও লাভি ম্যান' ম্যাজিক অব স্পেস। স্থান ও কালের, আর বাস্তব ও কল্পনার এই দ্বন্দ্ব, সঙ্কীর্ণ ও সম্মুখেই অ্যাণ্ডারসনের ছবির প্রাণ। তিনি সিনিক না অ্যানাকিষ্ট, বাস্তববাদী না আধুনিককে মিথ্যে রূপান্তরিত করার পক্ষপাতী, এই সব প্রশ্ন বড় কথা নয়। তাঁর ছবিতে এমন এক গতি, বলিষ্ঠতা ও তেজ রয়েছে যা থও প্রশ্নকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সমগ্র ছবির মেজাজ প্রচণ্ড অভিধাতী হয়ে ওঠে। সমস্ত উদাসীনতা নিয়েই তিনি মানবিকতায় বিশ্বাসী, যেমন তাঁর চিত্র-

সমালোচনায় ক্ষোভের যে স্বর তা আসলে চলচ্চিত্রের প্রতি বিগ্ৰহ ও প্রগাঢ়  
 প্রীতি থেকে। তাঁর ছবির মধ্যে যদি কেউ রূপকথার আরোপণ পান তবে তা  
 বয়স্কদের রূপকথা, বর্তমানের রূপকথা, চ্যাপলিনকে যেমন বলা হয়েছিল রূপকথার  
 শিল্পী। 'ইফ'য়ের কাল্পনিক বিদ্রোহের দৃশ্য থেকে একটা স্মৃতি উড়ে গিয়ে  
 আমেরিকার যন্ত্রযুগের রূপকথা 'জ্যাক্সিক পয়েন্ট'য়ে বিস্ফোরণের কাল্পনিক দৃশ্যটিকে  
 প্রচ্ছলিত করেছিল এমন বললে আরোপিত মনে হবে কি ?

অগ্ণাচ্ছ ছবি : দি অ্যাডভেঞ্চারস অব রবিন হুড ( পাঁচ পর্বে টিভিচিত্র )।

রচিত গ্রন্থ : মেকিং এ ফিল্ম।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : এলিজাবেথ সাসেক্স-এর লিগুসে অ্যাওয়ার্ডসন ।

## ॥ অ্যানিমেটেড ফিল্ম ॥

চলচ্চিত্রের প্রাথমিক তথ্যটি হলো ধারাবাহিকভাবে তোলা ছবির মালা পর্দায়  
 নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রজেক্ট করে গতির বিভ্রম আনা। এই তথ্যটির মধ্যেই রয়ে গেছে  
 অ্যানিমেটেড ছবি তৈরির রহস্যের চাবিকাঠি। গতিময় কোনো কিছুর চলচ্চিত্র হলো  
 সেই গতির প্রত্যেকটি পর্যায়ের ধারানুক্রমিক স্থিরচিত্রের সমষ্টি। এই ভাবে যে  
 কোন মুভমেন্ট বা অ্যাকশনের পর্যায়গুলির ধারানুক্রমিক ছবি হাতে এঁকে সেই  
 স্থির চিত্রগুলিকেও চলচ্চিত্র করে তোলা যায়। এই ধরনের ছবিকেই বলা হয়  
 অ্যানিমেটেড ছবি। অ্যানিমেটর যে কোনো মুভমেন্টকে সব সময়েই ধারাবাহিকতা  
 হিসাবে দেখেন। তিনি অনায়াসে লাইভ অ্যাকশন ছবির ফ্রেমগুলি রেখাচিত্রে  
 নকল করে অবিকল বাস্তব-অ্যাকশন গতির অনুরূপ গতি সৃষ্টি করতে পারেন।  
 কিন্তু সম্ভব হলেও তা করা হয় না, কেননা এ কাজ অত্যন্ত পরিশ্রমশাধ্য। তাই  
 অ্যানিমেটেড ছবিতে মুভমেন্টের ব্যাপারে বাস্তবের অবিকল অহুঙ্কতি না করে  
 তাকে সরলীকৃত করা হয় ও মুভমেন্টের সরলীকরণের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে এই ছবিতে  
 ব্যবহৃত মানুষ, জন্তুজানোয়ার, গাছপালা সবকিছুর চেহারাকেই অনেকখানি সরল  
 করে আঁকা হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে অ্যানিমেশন সব সময়েই এক ধরনের  
 গ্রাফিক স্টাইলাইজেশন। এবং এর মধ্যেই এ জাতীয় ছবির যা কিছু মজা। এই  
 স্টাইলের দিক থেকে অ্যানিমেশনের মধ্যে মূলত দুটি সম্পূর্ণ পৃথক ধারা বর্তমান।  
 একটি এই ছবির মধ্যে মানুষ বা পশুপাখির চলাফেরার গতিভঙ্গির ব্যাপারে  
 স্বাভাবিকতাকে অনুসরণ বা অনুকরণ করা ( ড্র. ডিজনি ), অগ্ণাট নিরাভরণ ও  
 অভ্যন্ত সরল সাদাসিধা রেখাচিত্রের বা কাল্পনিক ক্যারিকচারের সাহায্যে বা

বিমূর্ত ও পরীক্ষামূলক বিষয়বস্তুকে আশ্রয় করে ছবি তৈরি যা স্বাভাবিকতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই দ্বিতীয় রীতিতে বিশ্বাসী চিত্রনির্মাতারা নন্দনতত্ত্বের আধুনিক প্রত্যয়কে ভিত্তি করে নব্য চিত্রকলাকে অনুসরণ করে অভিনব ধরনের ছবি তৈরি করেছেন। এঁদের তৈরি ছবি অ্যানিমেটেড ছবিতে প্রচলিত শৈলীর ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়েছে, Halas, Batchelor, Sarvnt, ইউ. পি. এ. ও Larkin's ইউনিটসের ছবি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

মোটামুটিভাবে দেখতে গেলে অ্যানিমেটেড ছবির বিবর্তনের ইতিহাসকে (১৯০৮ সাল থেকে) চারটি ভাগে ভাগ করা যায় : ১. প্রথম যুগের ট্রিক্ ও ম্যাজিক ছবি। ২. ১৯২০ সাল থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যে কার্টুন ছবির প্রমোদ-চিত্র হিসাবে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠালাভ। ৩. ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে অ্যানিমেশনের কলাকৌশলের নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এই সময়েই ফিচার হিসাবে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের এ জাতীয় ছবির সৃষ্টি। ৪. আধুনিক যুগ—টেলিভিশনে ব্যবহারের জন্ম বছরকমের পরীক্ষামূলক এ জাতীয় ছবি থেকে শুরু করে বিশেষভাবে প্রস্তুত ইস্টাকশনাল ফিল্মের আবির্ভাব। প্রথম পর্যায়ে Emil Cohl, W. McCay ; দ্বিতীয় পর্যায়ে কর্নেল Heezaliar, Krazy Kat, ফেলিক্স দি ক্যাট, কোকো দি ক্লাউন প্রভৃতি ছবি ; তৃতীয় পর্যায়ে ওয়াশট ডিঙ্গনি উল্লেখযোগ্য। ১৯২০ থেকে ১৯৩০ সাল মূলত তাঁর কৃতিত্বে কার্টুন ছবির স্বর্ণ-যুগ। প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের অ্যানিমেটেড ছবি তাঁর স্নো হোয়াইট এণ্ড দি সেভেন ডোয়ার্জস্, এই সময় থেকেই রং, সুর এবং ধ্বনিবৈচিত্র্য এ জাতীয় ছবিকে এক আশ্চর্য পরিপূর্ণতা প্রদান করে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বয়ংনির্ভর প্রমোদ-উপকরণ হিসাবে স্পৃহিত করল। সেই সময়ের নির্মাতাদের মধ্যে লেন লী ও ম্যাকলারেনও বিখ্যাত। ১৯৩০-এর একদিকে অ্যানিমেশনের প্রধান আশ্রয় হয়েছে টেলিভিশন, নির্মাতাদের বিদ্যাপনের কাজে, বিভিন্ন সংগঠন ও সরকারি বিভাগের প্রচারে, এবং শিল্পের, বিদ্যান ও প্রযুক্তি-বিচার, ও শিক্ষামূলক ও নির্দেশনামূলক ছবির ক্ষেত্রে এর ব্যৱহার বেড়েছে। অল্প ধরনের ছবির টাইটেলও এর সাহায্যে নেওয়া হচ্ছে। [ অ্যানিমেশন পদ্ধতির বিস্তৃত বিবরণের জন্ম ম্যাকলারেন দ্রষ্টব্য। ]

অ্যানিমেটেড ছবির একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো পাপেট ফিল্ম। পাপেট ছবির ক্ষেত্রে হয় পুতুল তৈরি করে অ্যানিমেট করার জন্ম তার অল্প প্রত্যয়ের ক্রমিক সংস্থাপন করে স্টপ মোশন পদ্ধতিতে ছবি তোলা হয়, নয়তো লোকচকুর অন্তরালে থেকে চালকরা পুতুল চালনা করে ও সেই অবস্থায় সোজাহুজি (যার নাম

অপারেটেড পদ্ধতি) ছবি তোলা হয়। প্রথম পদ্ধতির পুতুল চিত্রগুলিই অ্যানি-মেশনের অন্তর্ভুক্ত। ১৮৯০ সাল নাগাদ এর সূচনা। পাপেট মডেল তৈরি করে কীট পতঙ্গের জীবনযাত্রা নিয়ে ছবি তৈরির জন্য Starewicz, বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনীর পাপেট ছবির জন্য Gerg Pal, অসাধারণ নাট্যরস ও নান্দনিক মূল্য সমৃদ্ধ ছবি এবং পুতুল তৈরির নতুন রীতি ও ক্যামেরার নব কলাকৌশলের জন্য Jiri Trnka, ফ্যাণ্টাসি ও কাব্যগুণের জন্য Karel Zeman বিখ্যাত। প্রায় সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশেই একদা রসোত্তীর্ণ পাপেট চিত্র তৈরি হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : রজ্জার ম্যানভেলের দি টেকনিক অব ফিল্ম অ্যানিমেশন ॥

রঘুনাথ গোস্বামী

॥ অ্যারিস্কেক্স ক্যামেরা ॥

বিশেষ এক ধরনের মুক্তি ক্যামেরা। (ড্র. ক্যামেরা)

॥ অ্যাশেজ অ্যাণ্ড ডায়মণ্ডস ॥

কানাল (১৯৫৬-৫৭)-র পর ১৯৫৮য় নির্মিত অ্যাশেজ এণ্ড ডায়মণ্ডস পোলিশ চিত্রপরিচালক আন্দ্রে ভাইদাকে শৈল্পিক প্রতিষ্ঠা দেয়। (ড্র. ভাইদা)। এ জেনারেশন ও কানালের পর এটি তাঁর যুদ্ধ-বিষয়ক ট্রেলজির তৃতীয় ছবি। এক যুগাকার আবর্তে এই ট্রেলজির সঞ্চরণ, আশা থেকে আশাভঙ্গ, অনিশ্চয়তা থেকে নিশ্চয়তা হয়ে ফের অনিশ্চয়তা। অ্যাশেজ-এর প্রধান চরিত্রদ্বয় মাচেক ও স্জুক্কার মনো মূর্ত হয়েছে ৫৬-র ওয়রশ অভ্যুত্থানের পরবর্তী মোহভঙ্গের কিছুটা। এই ছবি জটিল ও বিশ্বয়কর কলাকৌশল এবং প্রতীক, রূপক ও অলুপঙ্গ নির্ভর। ছবিটি যতটা না বাস্তববাদী তার চাইতে বেশি অলুপঙ্গবেদ।

অভিনয়ে সিবুলস্কি, চিত্রনাট্য ভাইদা ও J. Andrzejewski, আলোকচিত্র J. Wojcik ॥

॥ ইকিরু ॥

জাপান, ১৯৫২। পরিচালক আকিরা কুরোশাওয়া বলেছিলেন, মাঝে মাঝে আমি নিজের মৃত্যুর কথা ভাবি; সেই ভাবনা থেকে ইকিরুর উৎপত্তি। মৃত্যুচিন্তা, মৃত্যু-চেতনা ও মৃত্যুর আগের দিনগুলোকে অর্থবহ করে তোলা, ইকিরুর এই হলো বিষয়বস্তু। ক্যানসারে আক্রান্ত এক প্রৌঢ় কর্মজীবী মারা যাওয়ার আগে পৌর

প্রতিষ্ঠান ও আমলাতান্ত্রিক বাধা-নিষেধ / সামাজিক অনীহার বিরুদ্ধে একক উচ্চাঙ্গে, বস্ত্রের শিশুদের জন্তু কী-ভাবে একটা খেলার মাঠ প্রতিষ্ঠান করে গেলেন তার ধীর ও ধারাবাহিক বর্ণনা নায়কের আত্মতৃপ্তি ও সামাজিক অবদানের অন্তরঙ্গ রূপায়ণও। আধুনিক নগর-জীবনের নিস্ত্রাণ ও অবক্ষয়ী প্রেক্ষাপটে স্থাপিত এই ছবির মানবিক আবেদন ও নান্দনিক / দার্শনিক অভিঘাত ও উত্তরণ শান্ত, ত্রিষ্ট, সরল আর মহৎ। আলোকচিত্রের ও সম্পাদনার রীতি এই মেজাজ তৈরিতে সাহায্য করেছে। এই ছবিতে কুরোশাওয়া জাপানি চলচ্চিত্রের ইতিহাসে দীর্ঘতম ক্লোজ আপটি গ্রহণ করেন। আমবার্টো ডি ছবিতে বুদ্ধ নায়কের অসনাক্ত সস্তার সঙ্গে ইকিরুর প্রৌঢ় নায়কের তুলনা মনোগ্রাহী হতে পারে। বাঙালি দর্শকের আরো মনে পড়বে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সিদ্ধেশ্বরের মৃত্যু গল্প।

আলোকচিত্র এ নাকাই, চিত্রনাট্য ও সম্পাদনা কুরোশাওয়া।

॥ কন ইচিকাওয়া ॥

১৯১৫। অ্যানিমেশন বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতায় ও আনন্দাঙ্কন পীঠিকিতে সফল এই জাপানি চিত্র-পরিচালককে ওজুর চেয়ে বেশি আনন্দিত করে কুরোশাওয়ার চেয়ে কম চিরকালীন বলা হয়। আধুনিক মাহুসের সামাজিক ও নৈতিক সমস্যা নিয়ে তাঁর ছবি অসাধারণ আত্মবিশ্বাস ও বলিষ্ঠ আশ্রয়ে সমৃদ্ধ। শাদা কালো ও রঙিন আলোকচিত্র দুয়ের ব্যবহারেই ইনি সমান সফল। তাঁর ছবিতে প্যাশন ও রহস্যময়তা, রুক্ষতা ও সৌন্দর্যের সুষম সংমিশ্রণ হয়েছে। মাহুসের নিজের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম তাঁর ছবিকে দিয়েছে আধুনিক আনন্দিত্য। এই প্রসঙ্গে ১৩৫টি অ্যারিস্টো ক্যামেরা ব্যবহার করে তোলা টোকিও 'আলাপিয়াড (৬৫) ছবিটির কথা উল্লেখ করা যায়। যেখানে খেলার রূপকের মধ্য দিয়ে ইচিকাওয়া তাঁর নিজস্ব দর্শনকে সরস ও সহানুভূতিশীল রূপ দিয়েছেন। তাঁর ছবি আধুনিক সমাজের প্রেক্ষাপটে কিছু মনস্তাত্ত্বিক / দার্শনিক / নান্দনিক প্রশ্নের বলিষ্ঠ উত্থাপন। তাঁর অগ্গা ছবির মধ্যে আছে—প্রথম দিককার গ্লেসায়ক কমেডি, যার জন্তু তাঁকে বলা হয়েছিল জাপানের ফ্রাঙ্ক কাপরা, যুদ্ধবিরোধীচিত্র দি বার্মিজ হার্প (৫৬) ও ফায়ারস অন দি প্লেইন (৫৯) এবং এনুজো (৫৮), অব অবদেশন (৫৯), অ্যানু অ্যাক্টর'স রিভেঞ্জ (৬৩), দি ফীনিশ (৭৯)। তাঁর ছবি কলাকৌশলগত ভাবেও চমৎকার ও দৃশ্যগত ভাবে চমকপ্রদ। তাঁর অনেক ছবিতে সহযোগী চিত্রনাট্যকার বিশেষে কাজ করেছেন তাঁর স্ত্রী।

## ॥ ইতালি ॥

১৮৯৫য়ে চিত্র-গ্রহণ, প্রস্কুটন ও প্রদর্শনের প্রথম জাতীয় পেটেন্ট নথীভুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইতালিতে চলচ্চিত্রের ক্ষেত্র-প্রস্তুতি শুরু হলো বলা যায়। পরবর্তী বছরগুলিতে লুমিয়ের-চিত্র ও অন্তান্ত বিদেশি ছবি সময়ে সময়ে ইতালিতে প্রদর্শিত হয়েছে। স্বল্প দৈর্ঘ্যের প্রথম ইতালিয় চিত্র La Presa di Roma নির্মিত হয় ১৯০৫য়ে। ১৯০৮-এর শেষাংশে ইতালিতে কয়েকশো কাহিনীচিত্র ও সংবাদচিত্র নির্মিত হয়ে গেছে, তার মধ্যে আছে ৯৫ মিটার দীর্ঘ একটি রঙিন ছবিও, সেই সময়ে এ দেশে প্রতি সপ্তাহে তিনটে থেকে চারটে ছবির গুটিং চলছে। এই আদি-পর্বের পরের আট বছরকে (১৯০৯-১৬) স্বর্ণযুগ বলা হয়েছে। এই সময়ে ঐতিহাসিক চিত্র, কমিউইম ফিল্ম, কমেডি, নাটকীয় কাহিনী, তথ্যচিত্র ও এমনকি আর্ট ফিল্মও নির্মিত হয়েছে। রিকিওস্তো কানুদো, যিনি সিনেমাকে সপ্তম শিল্প আখ্যা দিয়েছিলেন ও বিশের দশকের ফরাসি চলচ্চিত্র নির্মাতারা ঝাঁকে গুরু বলে মানতেন, ছিলেন একজন ইতালিয়। তিনি মনে করতেন, 'সিনেমা হলো চিত্রকলা ও হৃদবন্ধের বিজ্ঞান ও শিল্পের একাত্মকরণ।' ১৯১৫ নাগাদ ইতালির বার্ষিক প্রযোজনা প্রায় ৫০০ চিত্র, যাদের গড় দৈর্ঘ্য ১০০০ মিটারের কাছাকাছি, চিত্র-গৃহের সংখ্যা কমবেশি ১৫০০। তখন পর্যন্ত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ইতালিয় ছবি কুয়ো ভ্যাডিস (১৯১২) ও পাসত্রোনের Cabiria (১৯১৪) যাদের প্রভাব কালক্রমে দূরপ্রসারী হয়েছে। সাধারণভাবে এ দেশের ছবিতে তখন ফরাসি চিত্রের প্রভাব পড়ত, আর ১৯১০ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত চটুল নাট্যিকাদের আবেগ ও অদ্ভুতপ্রধান প্রেমকে বিষয়বস্তু করে ছবি তৈরির প্রবণতা বাড়ল। বিদেশি শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ, আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক মন্দার দরুন স্বর্ণযুগের পরবর্তী সময়টি (১৯১৭-২৯) ইতালিয় চলচ্চিত্রের পক্ষে বন্ধাযুগ। চলচ্চিত্রের সংখ্যা ও প্রযোজিত চলচ্চিত্রের মান দুইই তখন যথেষ্ট হ্রাস পায়। আপাতবিচারে অবস্থার উন্নতি হলো ১৯৩১ থেকে, ছবির সংখ্যা বাড়লো, ছবিতে শব্দ এলো, খুব বড়ো বাজেটের কয়েকটি ছবি তৈরি হলো, বিষয় ও আঙ্গিকগত সৃষ্টির বহু উদাহরণ দেখা গেল, ১৯৪০য়ে সর্বাধুনিক ব্যবস্থানস্পন্ন একগুচ্ছ স্টুডিও স্থাপিত হলো, কিন্তু সময়টা ছিল ফ্যাসিস্ট শাসনের যুগ, ফলে চলচ্চিত্র নির্মাণের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ ছিল। স্বাধীনতা নিয়ে পরিচালকরা কাজ করতে পারতেন না। তাই সমসাময়িক বিষয়কে এড়িয়ে তাঁরা অতীতের ঘটনায় মনোনিবেশ করলেন;

অথবা ঐতিহাসিক তথ্য ও ব্যাখ্যাকে বিকৃত করে প্রচারধর্মী ছবি বানাতে লাগলেন। ততদিনে ভেনিসে চলচ্চিত্র উৎসবের সূচনা হয়েছে, যদিও অচিরেই প্রচারধর্মী ইতালিয় ও জার্মান ছবি ছাড়া অন্যান্য ছবির আগমন সেখানে বন্ধ হয়ে যাবে। এই রাজনৈতিক সঙ্কটের সময়কার তিন জন পরিচালক, De Robertis, Blasetti ও Camerini ইতালিতে যে নতুন চলচ্চিত্র আন্দোলন অদূর ভবিষ্যতে দানা বাঁধবে তার আদি প্রবর্তক। এই আন্দোলনের নাম নিও-রিয়ালিজম (দ্র.)। এটা হলো বাস্তবতার সিনেমা যা ফ্যাসিবাদের ঠিক পরবর্তী-কালীন রাজনৈতিক-সামাজিক-মানবিক সচেতনতা থেকে উঠে এসেছে। এই আদর্শকে প্রথম চিত্ররূপ দিলেন ভিসকন্তি, তারপর এলো রোজেলিনির ওপেন সিটি, এলেন De Santis ; দর্শকদের এই আন্দোলন সম্পর্কে সচেতন করার জন্য চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্রিকা সিনেমা-কে আধুনিক রূপ দেওয়া হলো। ভিসকন্তি ও রোজেলিনির সঙ্গে তৃতীয় আর যিনি নয়া-বাস্তবতার শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও প্রবক্তা, তিনি হলেন ডে সিকা, La Terra Trema ও বাইসাইকেল থীভস হলো এ সময়ের শ্রেষ্ঠ দুই ছবি। আশির দশক যদি চিহ্নিত হয় চীনা চলচ্চিত্রের জাগরণের দশক হিশেবে, সত্তরের দশক নতুন জাগরণ চলচ্চিত্রের দশক হিশেবে ও ষাটের দশক ফ্রান্সের নুভেল ভাগ চলচ্চিত্রের দশক হিশেবে, তবে পঞ্চাশের দশককে চিহ্নিত করতে হবে ইতালির নিও-রিয়ালিজম প্রভাবিত সিনেমার দশক রূপে। অবশ্য অল্প ধরনের ছবি, যেমন লিরিকধর্মী বা এপিক চিত্রও, তখন ইতালিতে নির্মিত হয়েছে। ক্রমে এলো মিরাকল ইন মিলান, আমবার্টো ডি, ইউরোপা ৫১। দেখা গেল নয়া বাস্তবতার আদর্শকে নান্দনিক প্রয়োজনের সঙ্গে সমন্বিত করার প্রয়াস শুরু হয়েছে। পুরনোদের পাশাপাশি, মাল্লুয়ের অস্তিত্বের প্রাথমিক সমস্তার চিত্র নিয়ে এলেন ফেলিনি, বাস্তবতার চেয়ে বেশি কিছু—অন্তর্বাস্তবতার—শিল্পী হয়ে এলেন আন্তনিওনি। এল-লা দোলচে ভিতা, লাভেন্তুরা। বাজারচলতি ছবির সাধারণ মানও ছিল বেশ উন্নত। ইতালিতে দীর্ঘদিন ধরে তারকাদের ও তারকা প্রথার অস্তিত্ব ছিল, যার ফলস্বরূপ তখন পাওয়া গেল লোলোত্রিজিডা, লোরেন, মাসত্রোইয়ানিকে। ক্রমে একদিকে টেলিভিশনের প্রসার বাড়তে লাগল, অন্যদিকে নতুন নতুন পরিচালকের আবির্ভাব হলো : রদি, বের্তোন্টি, অলমি, ডে সিটা, পাসোলিনি, ফ্রেডা। এই সময়ে জাতীয় সমস্যা ভিত্তিক ছবি করার প্রবণতা দেখা গেল, যার আদিশ্বরী ছিলেন জাভান্তিনি। আর, একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্য ছবির মধ্যে একাধিক স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবির অন্তর্ভুক্তি শুরু হলো, যার মেজাজ ও রস ছিল একেবারে অল্প ধরনের। যেমন

বোঙ্কাচিয়ো ৭০। এরপর এলেন পটিকর্ভো, বেল্লোচ্চিও, বোলোগনিনি, জেফিরেল্লি। সব মিলিয়ে ইতালিয় চলচ্চিত্র (তথ্যচিত্র ও স্বল্প দৈর্ঘ্য চিত্র নিয়ে) — আন্তর্জাতিক স্তরের যৌথ প্রযোজনাও এখানে হচ্ছে, যেমন ইউলিন্দিস বা ওয়র অ্যাণ্ড পীস — আজ মাত্রাগত, গুণগত ও প্রভাবগত, তিন ভাবেই বিশ্ব চলচ্চিত্র আসরের অতীতম অংশীদার। এই চলচ্চিত্র পরিবর্তন ও সমন্বয়ের এক স্পন্দিত, বলিষ্ঠ, ক্রমবর্ধমান রূপরীতি। হয়তো আধুনিক ইতালিয় চলচ্চিত্রে হতাশা, যৌনতা, আরোপিত প্রতিবাদ ও অনুকরণের অতিরিক্ত প্রাধান্য দেখা দিয়েছে কিন্তু তা তারুণ্য ও প্রাণময়তারই আর একটি দিক। যার প্রমাণ রসির সমাজতাত্ত্বিক ছবি থেকে রসির মনস্তাত্ত্বিক ছবি মেজাজে আলাদা, আবার তাভিয়ানি ভাইদের ছবির মেজাজ আরেক রকম। অর্থাৎ এই বৈচিত্র্য ও বাহ্যিক সংকটে পরিণত হবে না, বিশেষজ্ঞদের এই ধারণাই প্রমাণিত হচ্ছে।

### ॥ ইতিহাস ও চলচ্চিত্র ॥

ফিল্ম বা যে কোনো শিল্পই, কোনো বিষয়কে তুলে ধরতে গেলে ছব্ব ইতিহাসকে অনুসরণ করে না, ইতিহাস কথাটিকেও অবশ্য ব্যাখ্যা করে নেওয়া প্রয়োজন, যা কিছু অতীতে ঘটে গেছে শুধু তাই ইতিহাসের অন্তর্গত নয়; যা ঘটে চলেছে, সমাজ বা ব্যক্তিজীবনে, তাও ইতিহাসের সামগ্রী; রাজনীতি, সমাজ, দেশ, সভ্যতার ঘটমান ও পরিবর্তমান রূপই ইতিহাসের বিষয়। ইতিহাস অবশ্য শুধু তথ্যকেই লিপিবদ্ধ করে যায়, শিল্প তথ্যসংকলন করে না, সে খোঁজে তথ্যের ভিতরের গতিকে, প্রাণকে। ফলে শিল্পেও ইতিহাস আসে, কিন্তু তথ্য হয়ে নয়, নির্যাস হয়ে। ফিল্মে এই ব্যাপারটা কিভাবে আসতে পারে? দৃশ্যশিল্পের কাছে আমাদের প্রত্যাশা একটু বেশি থাকে, বাস্তবতা বিষয়ে; বা বলা যেতে পারে দৃশ্যশিল্পের ধরনটির মধ্যেই লুকিয়ে থাকে এক ধরনের ডকুমেন্টেশনের ঘাঁক। ফলে এখানে বস্তুগত তথ্য, ঐতিহাসিক উপাদান ইত্যাদি ব্যবহার করার প্রয়োজন ও স্বযোগ যেমন বেশি, তেমনি ঝুঁকিও যথেষ্ট। চলচ্চিত্রের আবহ, চরিত্রের বিশিষ্টতা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করার জ্ঞান সমকালীন চেহারাকে রূপায়িত করে তোলার প্রয়োজন হয় অনেক সময়, সেখানে বিশেষ কোনো তথ্য থেকে এই আবহকে সৃজন করা হয়। ‘চারুলতা’য় ইতিহাসের উপাদানকে ব্যবহার করা হয়েছিল আবহ নির্মাণে। এমনও হতে পারে ঐতিহাসিক উপাদানকে কাহিনী ও চরিত্র নির্মাণেই কাজে লাগাতে হচ্ছে। এমন উদাহরণ, বিদেশি চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে অনেক। রুশ

চলচ্চিত্রের দিকেই তাকানো যেতে পারে। সোভিয়েত চলচ্চিত্রের প্রাণপুরুষ আইজেনস্টাইনের ছবিগুলির মধ্যে 'ব্যাটলশিপ পটেমকিন'-এ ইতিহাসের আদলে কাহিনীকে বেঁধে নিয়েছিলেন পরিচালক, যেমন করেছিলেন 'আলেকজান্ডার নেভস্কি' বা 'আইভান দি টেরিবল্'-এ। ঐতিহাসিক ঘটনা, তথ্য এখানে কাজ করেছে ছবির প্রাণবন্তরূপে, ঐতিহাসিক ভাবনাকে আইজেনস্টাইন ছড়িয়ে দিয়েছেন ছবির সারা অঙ্গে, ফলে আলাদা করে কোনো তথ্যকে চেনা যায় না। বস্তুতঃ 'ব্যাটলশিপ পটেমকিন' হতে পারত তথ্যচিত্র, কিন্তু খুঁটিনাটি খবর, ঘটনার সমাহারে ইতিহাস বলে যাওয়ার বদলে আইজেনস্টাইন নজর দিয়েছিলেন ঐ ইতিহাসের মূল প্রেরণাকে তুলে ধরার দিকে। উষ্টোদিকে 'অক্টোবর' ছবিতে তাঁর দায়িত্ব ছিল প্রধানত তথ্যচিত্র নির্মাণের, কিন্তু সেখানেও খুঁটিনাটি তথ্য, তাদের নানা দৃশ্যগ্রহণ রূপকে তিনি ব্যবহার করেন, ক্যামেরায় ধরে রাখা নানা প্রামাণ্য দৃশ্যসমূহকে কাজে লাগান, সেগুলির ওপর ভর দিয়ে দাঁড় করান যে ছবি, তা নামে তথ্যচিত্র হলেও নীরস দলিল হয়ে না থেকে অক্টোবর বিপ্লবের এক স্পন্দিত চলচ্চিত্ররূপ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যেখানে তথ্য বা ইতিহাসের ঘটনা মূল ব্যাপার নয়, ইতিহাসের অন্তর্ভুক্তই কিছের বিষয়, সেখানে তথ্যকে কিভাবে মেলানো যেতে পারে? আইজেনস্টাইনের 'জেনারেল লাইন'-এর কথা মনে করা যায়। সোভিয়েতে সমাজ পরিবর্তন, নতুন সৃষ্টির উল্লাস, এই তো 'জেনারেল লাইন'-এর বিষয়। এখানে সাজানো কাহিনীর সঙ্গে পরিচালক মিশিয়ে দেন সমকালীন জীবনের নানা ঘটনা বা দৃশ্যকে, যা হতে পারত তথ্যচিত্রের অঙ্গ, তাকে বসিয়ে দেন ছবিতে। এই বসানোটা যদি মাপমত হয় তবেই কাহিনীচিত্র তার ধর্মে স্থির থাকে, মাপে না মিললে তথ্য মাথা উঁচিয়ে থাকে। ইতিহাসের উপাদান বা তথ্যকে চলচ্চিত্রের মধ্যে ব্যবহার করা, এটা নানাভাবে হতে পারে। কখনও এটা করা হয় নানা সংবাদকে কাহিনীর সঙ্গে জুড়ে দিয়ে, কখনও আলগা তথ্যকে ছবির নানা জায়গায় ছড়িয়ে দিয়ে, কখনও বা মূল কাহিনীর সঙ্গে সমান্তরালভাবে তথ্যের প্রসঙ্গকে টেনে নিয়ে গিয়ে। তথ্যকে কিভাবে কাজে লাগানো হবে, তা অবশ্যই পরিচালকের ইচ্ছাধীন। কিন্তু যেখানেই ইতিহাসের উপাদানকে ছবিতে ব্যবহার করা হচ্ছে, সেখানেই সেই উপাদানকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার দায়িত্ব এসে পড়ে। ইতিহাসের উপাদান, তা অতীত বা সমকালীন যাই হোক না কেন, তাকে বিকৃত করে উপস্থাপিত করার কোনো অধিকার চলচ্চিত্রকারের থাকে না — সেই উপাদানকে ব্যবহার করেও তার ব্যাখ্যাই তিনি শুধু নিজের ইচ্ছানুযায়ী

করতে পারেন। তথ্যের ব্যবহারটা কাহিনীচিত্রের মধ্যে সম্পূর্ণ ঢালাই করে নিতে পারলে তথ্যচিত্রের বিবরণধর্মিতা থেকেই যে শুধু মুক্তি ঘটে তাই নয়, তথ্য সেখানে কাহিনীর মধ্যচারী হয়ে নানাভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। ‘স্ববর্ণরেখা’র প্রথম দিকে গান্ধীর মৃত্যু সংবাদ আর শেষ দিকে মহাকাশ বিজয়ের সংবাদ—এ দুটিকে ছবিতে ব্যবহার করে ঋত্বিক বিশেষ ব্যঞ্জনা আনতে চেয়েছিলেন, যা সম্পূর্ণই সিনেমাটিক। ঐতিহাসিক উপাদান ব্যবহারের সার্থকতা আবার অনেকটা নির্ভর করে কাহিনীর বুনোটের ওপর, তথ্য অতিরিক্ত অংশকে পরিচালক কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যান তার ওপর। মুম্বই রাজনৈতিক ছবিকে অনেক সময় ঐতিহাসিক তথ্যের ওপর অতিরিক্ত নির্ভর করতে হয়। ‘ব্যাটল অব আলজিয়র্স’-এ পণ্ডিতেরা যেমন ঐতিহাসিক তথ্যকে ব্যবহার করেছিলেন, বা ল্যাটিন আমেরিকার নানা ছবিতে যেভাবে সমকালীন ঐতিহাসিক উপাদান ব্যবহৃত হয়, পূর্ব ইন্ডোরোপের নানা দেশে নাৎসি বর্বরতা নিয়ে তোলা ছবিগুলিতেও জলন্ত ঐতিহাসিক উপাদানকে প্রচুর পরিমাণে কাজে লাগানো হয়েছে। ঐতিহাসিক হলেও উপাদান উপাদানই, তা সম্পূর্ণ শিল্প নয়—ছবিকে যদি তা ছাড়িয়ে ওঠে, তা শিল্পেরই ক্রটি। ইতিহাস, অতীত বা সমকালীন যাইহোক না কেন, তার এক-আধ টুকরো ব্যবহার করেও ছবিকে ব্যঞ্জনাময় করে তোলা যায়, যদি অবশ্য তার পিছনে কাজ করে ইতিহাসবোধ, পরিমিতিবোধ ও চলচ্চিত্রবোধ। এই মিলন সম্ভব হলে তথ্যচিত্রও পৌঁছে যায় কাহিনীচিত্রের সার্থকতায়। যেমন যায় ‘রবীন্দ্রনাথ’ বা ‘ইনার আই’। আরেকটি ব্যাপার এ প্রসঙ্গে মনে আসে। চলচ্চিত্র বা অন্য যে কোনো শিল্পে যেমন ঐতিহাসিক উপাদানকে ব্যবহার করা হয়, তেমনি শিল্প, চলচ্চিত্রও ঐতিহাসিক উপাদান হয়ে ওঠে বহু সময়েই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধান্তর বুর্জোয়া পৃথিবীর সঙ্কটকে জেনে নেওয়া যায় ‘মিসিয়ে ভেদু’ থেকে, বাংলাদেশের অবসিত মহিমাকে জানার জন্ম দাঁড়াতে হয় ঋত্বিকের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’-এর সামনে। শিল্পের জন্মই তথ্য—এ কথা অবশ্যই ঠিক নয়, আবার নিছক তথ্যের জন্মেও শিল্প নয়, কিন্তু ইতিহাসের উপাদান হয়ে ওঠে শিল্প আর এই হয়ে ওঠার জন্মই তাকে ব্যবহার করতে হয় ইতিহাসের উপাদান।

ইরবান বসুরায়

॥ ইনটলারেন্স ॥

আমেরিকা, ১৯১৬। যে সমস্ত প্রারম্ভিক ছবির মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্র শিল্প হয়ে উঠেছিল গ্রিফিথের বার্থ অব এ নেশন তার প্রথমটি ও ইনটলারেন্স তার

দ্বিতীয়টি। বার্থ অব...অসাধারণ শৈল্পিক ও ব্যবসায়িক সাফল্য পেলেও ছবিটিকে ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্কও সৃষ্টি হয়েছিল যথেষ্ট। গ্রিফিথের বিরুদ্ধে বর্ণবিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ আনা হয়েছিল। তারই উত্তর যেন ইনটলারেন্স। এই ছবির থিম হলো মানুষে মানুষে ঘৃণা ও বিদ্বেষের বিরুদ্ধে আর সামাজিক অত্যাচার ও অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক গুভেহা ও বন্ধুতার জয়গান। ইনটলারেন্সের প্রধান বিশেষত্ব কিন্তু এর আঙ্গিকে, আভ্যন্তরীণ সংবিধানে। ছবির চারটি ভিন্ন ভিন্ন এপিসোডের চারটি ভিন্ন মুভমেন্টকে (যা একই সঙ্গে অগ্রসরমান) সম্পাদনার এক জটিল রূপবন্ধে সঞ্চয় করা হয়েছিল। ছবির অন্তর্লীন মুভমেন্ট এক ছান্দিক স্পন্দনের সৃষ্টি করেছে যার কম্পাস, এপিসোডগুলি যতই সমাপ্তির দিকে এগিয়েছে, ততই বৃদ্ধি পেয়েছে। বলিষ্ঠ সম্পাদনা প্রতিটি শটকে একক-ভাবে ও সমস্ত ছবির পরিপ্রেক্ষিতে সামগ্রিকভাবে ফলপ্রদ করে তুলেছে। লং শট, মিড শট, ক্লোজ আপ ও তাদের মধ্যবর্তী রূপভেদ; ট্রাকিং, তথাকথিত প্যানিং, মনস্তাত্ত্বিক অভিঘাতের কথা মনে রেখে ক্যামেরাকোণ; ক্রমবলয়, স্বল্প-বৃত্ত শট ও অত্যাচার নাটকীয় উপাদানের মধ্য দিয়ে ফ্রেমিং; ট্রানজিশন, ক্রশ কাটিং, ডিটেল; আর আবেগগত অভিঘাতের জন্য রঙিন টিষ্ট করা ফিল্মের ব্যবহার—কতো দিক দিয়ে যে ইনটলারেন্স চলচ্চিত্রের ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে তা শুনে শেষ করা যায় না। অসাধারণ গঠন-স্বয়ম্বা এবং ছন্দ ও টেনশনের মধ্যে চমৎকার একতার জন্ম এই ছবিকে বলা হয় ভিসুয়াল সিম্ফনি। ফিল্ম তত্ত্ব রচনায় এই ছবি অনুপ্রাণিত করেছিল আইজেনস্টাইনকে। অনুপ্রাণিত করেছিল জারমানি, ফ্রান্স ও রাশিয়ার বহু প্রারম্ভিক পরিচালককে। আবেগ-বাহুল্য, অতি নাটকীয়তা ও দৃশ্য-আড়ম্বরের ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপের জন্য অনেকে এই ছবির চেয়ে আগের ছবি দি বার্থ অব এ নেশন-কে মহত্ত্ব মনে করেন। ইনটলারেন্সের ব্যবসায়িক ব্যর্থতাও চমকপ্রদ।

অভিনয়ে প্রধান শিল্পীরা ছাড়াও ষাট হাজার এক্সট্রা, আলোকচিত্র G. W. Bitzer।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : T. Huff-এর Intolerance : Shot by Shot Analysis।

॥ ইন্সার্ট ॥

একটি দৃশ্যের বিভিন্ন শটের মধ্যে অল্প দৃশ্যের কোন শট সংযোজন। ইন্সার্ট হতে পারে শটের বা একাধিক শটের সংযোগে কোন দৃশ্যংশের। কাহিনীর

প্রয়োজনে, কোনো মন্তব্য, ব্যঞ্জনা বা শাস্ত্রা আনতে, অথবা সময়ের ব্যবধান (টাইম-ল্যাপস) বোঝাতে এর ব্যবহার হয়। ইন্সার্ট অর্থের বিস্তার ঘটায় এবং সাবজেক্ট-অবজেক্ট সম্পর্কে প্রভাবিত করে। কোন কোন ধরনের মনতাজ তৈরিতে এর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। দাস্‌পেন্স ছবির গঠনপ্রণালীতে এর ভূমিকার কথাও উল্লেখযোগ্য। সম্পাদনার কাজে এটি একটি ছোট কিন্তু দরকারি উপাদান। ইন্সার্ট হতে পারে সংলাপ বা ধ্বনিরও।

॥ ইফ ॥

গ্রেট ব্রিটেন, ১৯৬৮। আধুনিক যে সমস্ত ছবি একই সাথে ব্যবসায়িক ও শৈল্পিক সাফল্য পেয়েছে স্বাতন্ত্র্যবাদী চিত্র পরিচালক লিওসে আনডারসনের ইফ তাদের অন্যতম। জঁ ভিগোর স্টুডি ফর কণ্ট্রি (১৯৩৩) দ্বারা অল্পপ্রাণিত ইফ, স্কুলের কয়েকটি ছাত্রের যে বিদ্রোহ চিত্রায়িত করেছে তা সমাজের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে প্রয়োগযোগ্য। এই বিদ্রোহ শুধুমাত্র কর্তৃত্ব বা প্রতিষ্ঠানের নিয়ম কানূনের বিরুদ্ধেই নয়, সমাজের তথাকথিত মূল্যবোধ ও নৈতিকতার বিরুদ্ধেও, যে জন্ম এ ছবিতে নগ্নতার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এ গেল থিমোটিক দিক। আঙ্গিকের দিক থেকে এখানে চলচ্চিত্রের দৃশ্যগত ও দৃশ্যাতিরিক্ত সম্ভাবনার মিলন ঘটানো হয়েছে। বাস্তব ও কল্পনার মধ্যে সম্পর্ক আর রঙিন দৃশ্য ও শাদা কালো দৃশ্যের মধ্যে যোগাযোগ ইচ্ছাকৃতভাবে অস্পষ্ট রাখা বা ছবিতে বিভিন্ন পর্ব ভেদ ও ব্যবহার করা এবং ব্যবহারে আদি-মধ্য-অন্ত পারস্পর্য ভেঙে দেওয়া চলচ্চিত্র আঙ্গিকে বিভাজন-রীতির উৎকৃষ্ট উদাহরণ। (ড. বিভাজন রীতি)। তাঁর পরবর্তী ছবি 'ও লাকি ম্যান'-এর সঙ্গে ইফের সাদৃশ্য / বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয়।

অভিনয়ে ম্যালকম ম্যাকডয়েল, আলোকচিত্র M. Ondricek, সম্পাদনা ডি. গ্র্যাডওয়েল।

কানে শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কার, ১৯৬৯ ॥

॥ ইমালশন ॥

নেগেটিভ ফিল্মের মূল অংশ, যে অংশে দৃশ্যবস্তুর ছবি ওঠে, তা ইমালশনে তৈরি। নেগেটিভ ফিল্মের প্রকারভেদ অনুসারে ইমালশন বা অবদ্রবের উপাদান, সংবেদন-শীলতা ও অন্ত্যন্ত ধর্মে পরিবর্তন ঘটে। ইমালশনের ধরনের উপর নির্ভর করে ছবি তোলার সময়ের আলোকরীতি, ক্যামেরার ফিট্টারের নির্বাচন ও এক্সপোজ করা ছবির

প্রসেসিং। বিশেষভাবে অবদ্রবিত ফটোফিল্মে বিশেষভাবে চিত্রগ্রহণ করে ছবি তৈরিও হয়ে থাকে। যেমন ২০০১—এ স্পেস ওডিসি ছবিটি। এক্স-রে, পূজিটিভ ফিল্ম প্রভৃতিতেও ইমালশন ব্যবহৃত হয়। ইমালশন মিনেমা-টেকনোলজির একটা প্রধান বিষয় যা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা অত্যাবশ্যিক। (ড্র. শাদা কালো ও রঙিন নেগেটিভ ফিল্ম)

## ॥ মিকলোশ ইয়াকো ॥

চলচ্চিত্রে নিজস্ব কণ্ঠস্বর এবং দৃশ্যরচনায় নূতন ভঙ্গির জন্ম প্রসিদ্ধ ইয়াকো (জন্ম; হাঙ্গেরি, ১৯২১) সত্যজিৎ রায়ের সমবয়স্ক। ‘পথের পাঁচালী’র স্রষ্টার মতো তিনিও চলচ্চিত্রে আসেন অপেক্ষাকৃত বিলম্বে, বেশ কয়েকটি বিষয়ে (আইন, লোকায়ত কাহিনী ও শিল্প ইতিহাস, সবশেষে নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র) পড়াশোনা ও পাশ করে। এছাড়া, তিনিও কান চলচ্চিত্র উৎসবে ছবি দেখিয়ে (The Round-up, ১৯৬৬) প্রথম আন্তর্জাতিক পরিচিতি লাভ করেন।

একটি তথ্যচিত্র দিয়ে ইয়াকোর চলচ্চিত্র-জীবন শুরু হয় ১৯৫৪ সালে। ৬৩ সাল পর্যন্ত তথ্যচিত্র ও শর্ট ফিল্ম পরিচালনা করেন মোট ১৬টি। ১৯৫৮ সালে প্রথম কাহিনীচিত্র। এগুলির কোনোটি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। প্রথম দিকের ছবির মধ্যে Cantata (১৯৬৩) সমালোচকদের উৎসাহে দেখান হয় বেশ কয়েক বছর পরে। এখান থেকে ভবিষ্যতের ইয়াকোকে চিনতে পারা কঠিন, তবে দুটি-তিনটি চরিত্র নিয়ে তিনি যে ঘরোয়া ও গৃহ মনস্তত্ত্বের নাট্যক্রিয়া রচনা করেছেন তাতে আন্তর্জাতিকের অস্পষ্ট প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। চলচ্চিত্রকার হিসেবে স্মৃতিস্তম্ভিত হওয়ার পরেও আন্তর্জাতিকের প্রতি ইয়াকোর শ্রদ্ধা অবিচল আছে। ১৯৭০ সালে ইতালিতে The Pacifist নামে যে ছবিটি তিনি করেন (নায়িকা: মনিকা ভিন্টি) সেটি আন্তর্জাতিকের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার্থ্য। Cantata ছবির নায়ক ছিল এক সফল ডাক্তার যে কৈশোরের কিছু স্মৃতির তাড়নায় ক্লিষ্ট; The Pacifist ছবির মূল চরিত্র এক মহিলা সাংবাদিক যাকে ইতালির একটি বিশাল নগরীতে ঘুরে কিছু অপ্রীতিকর তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। দুটি ছবিতেই প্রণয়, মহানগর ও যন্ত্রসভ্যতা সম্পর্কে আন্তর্জাতিকের দৃষ্টিভঙ্গির সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে।

My Way Home (১৯৬৪) থেকে স্পষ্টত ইয়াকোর সৃষ্টিকর্মের প্রথম পর্বের সূত্রপাত; যেসব ঐম বা বিষয় বারবার তাঁর ছবিতে আসা-যাওয়া করেছে বা দৃশ্যরচনার যে অনন্য ভঙ্গি তাঁর নামের সঙ্গে জড়িত সেগুলি এখানেই প্রথম

প্রকাশিত। এই পর্বে আর যে-সব ছবি অন্তর্ভুক্ত হবে সেগুলি *The Round-up* ( ৬৫ ), *The Red and the White* ( ৬৭ ), *Silence and Cry* ( ৬৮ ), *Winter Wind* ( ৬৯ ) এবং *Agnus Dei* ( ৭০ )।

ওই ছবিগুলির ঘটনাকাল বিভিন্ন হলেও সব ছবিতেই দুটি ভিন্ন যুগ এবং দুটি বিপরীত রাজনৈতিক শক্তিকে প্রেক্ষাপট হিসেবে রাখা হয়েছে। ছবির কুশীলব দুই শ্রোতের সঙ্গনে অনিশ্চিত। *My Way Home*-এর পশ্চাৎপট দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের শেষ দিনগুলি। একটি তরুণ হাঙ্গেরীয় সৈনিক ফিরে চলেছে ঘরে, তার একদিকে পশ্চাদপসরণশীল জার্মানবাহিনী অন্যদিকে আণ্ডয়ান রুশ সৈন্য। *The Red and the White*-এর নাম থেকেই প্রতীয়মান হয় প্রতিপক্ষ কারা—ছবির ঘটনাকাল রাশিয়ায় বিপ্লবোত্তর কয়েক মাস। *Agnus Dei* ছবিতেও ১৯১৯ সালে হাঙ্গেরিতে প্রথম কমিউনিস্ট বিপ্লবের পরবর্তী দিনগুলি উপস্থাপন করা হয়েছে— একদিকে কমিউনিস্ট বাহিনী অন্যদিকে হার্ডির ফৌজ। হাঙ্গেরির আদিগন্ত সমতল প্রান্তরের পশ্চাৎপটে দুই পক্ষের মরণপণ সংগ্রাম ইয়াঙ্কোর হাতে প্রায় মহাকাব্যের মর্যাদা পেয়েছে। তাছাড়া, যে বিরাট যুগ-পরিবর্তনের আভাস তাঁর সব ছবিকে আচ্ছন্ন করে আছে তা ছবির চরিত্রগুলিকেও যেন বিমূঢ় করে রাখে; তাদের মুখে কথা নেই বললেই হয়, এমন কি বিদ্রোহের ছলেও তারা হাসে না। ইয়াঙ্কোর কঠোর পৃথিবীতে মায়া-মমতার স্থান নেই, তাই তাঁর ছবিতে শিশুর স্থান নেই। তাঁর ছবিতে প্রেমের চেয়ে স্থলভ অবমাননা (humiliation) এবং বিশ্বাসের চেয়ে সন্দেহ।

মাত্র ৬টি চরিত্র নিয়ে অংশত পৃথক স্বাদের ছবি *Silence and Cry* এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একটি পলাতক সৈনিক জোর করে আশ্রয় নেয় এক কৃষকের ঘরে এবং পরিবারের সকলের ওপর ( কৃষকের মা, স্ত্রী ও ছালাকা ) তার মানসিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে। শাসক / শাসিত সম্পর্কের মনস্তত্ত্ব ইয়াঙ্কোর অত্যন্ত প্রধান বিচার্য বিষয়; কেউ কেউ এই সম্পর্ককে বিড়াল-ইঁদুরের খেলা আখ্যা দিয়েছেন। একথা যে একেবারে অসত্য তা নয়, কারণ অত্যাচারী অত্যাচারিতকে পশুত্বের পর্যায়ে নামতে বাধ্য করে। *The Round-up* ছবিতে বিজিতকে আদেশ করা হয় আত্মসমর্পণ করার জন্ত। উদ্দেশ্য, তাকে কাছ থেকে নিরাপদে গুলি করা যাবে। অথবা জনতার মাঝখানে তার জামাকাপড় খুলে নেওয়া হয় (লাঙ্কনা; অথবা যত্ন যার আসন্ন তার জামাকাপড়গুলি যাতে বাঁচে); অথবা তাকে হঠাৎ মুক্ত করে দেওয়া হয় যাতে সে পিছন ফিরলেই গুলি করা যায়। ইয়াঙ্কোর ছবিতে

অত্যাচারীর সামনে অত্যাচারিত্তকে জানান হয় সে নিঃশ ও অসহায় । বিশ্বয়ের কণা, তাঁর ছবিতে সাধারণ শারীরিক নির্ঘাতন নেই বললেই চলে ।

সাদা-কালোয় তোলা এই পর্যায়ের ছবিগুলিতে ক্যামেরার বিচিত্র গতি এবং ল্যাঙ্কস্কেপ-এর ব্যবহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বিস্তীর্ণ প্রান্তর ( অসহায়তা ) এবং বৃন্তাকারে বিচরণশীল বলদৃপ্ত অশ্বারোহীর দল ( অত্যাচার ) ইয়াঙ্কোর ব্যক্তিগত প্রতীকে পরিণত হয়েছে । একজন সমালোচক বলেছেন, ইয়াঙ্কোর অবিরাম পরীক্ষা-নিরীক্ষা সত্ত্বেও তাঁর ছবির সেই আদিগন্ত ধূমর প্রান্তর, সেই বলদৃপ্ত ষোড়-সপ্তদ্বারের দল এবং সেই প্রস্তর মূর্তির মতো নগ্ন নারীদেহগুলি দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি । আমাকে যদি পছন্দ করতে বলা হয় তো তাঁর সাম্প্রতিক ছবিগুলির বদলে আমি দি রাউণ্ড আপ আরো অনেকবার দেখব । **The Round-up** ছবিতে কাহিনীর মেজাজ অনুযায়ী ক্যামেরার গতি ছিল ধীর ও স্থনির্দিষ্ট ; মুখ থেকে দেওয়াল, দেওয়াল থেকে অস্ত্র মুখ অথবা স্বদূর প্রান্তর থেকে প্যান করে প্রান্তরের কোণে ছোট্ট একখানি ( একখানিই ) ঘর । আবার **The Red and the White** ছবির ক্ষণে ক্ষণে পটপরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে ক্যামেরা সতত সঞ্চরণশীল । ক্ষুদ্র ও বিরাট দুয়ের সমান্তরাল রচনা ইয়াঙ্কোর ক্যামেরার মাধ্যমে সাধিত হয়েছে । একজন সমালোচক বলেছেন যে, ইয়াঙ্কো প্রমুখ কয়েকজন চলচ্চিত্রকার না থাকলে জুম ও ওয়াইড্ লেন্সের মাহাত্ম্য একালের দর্শক বুঝতে পারত না ।

১৯৬৯ সালে তোলা **The Confrontation** ছবির সঙ্গে ইয়াঙ্কোর চলচ্চিত্রে লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা গেল । এইখানে তাঁর শ্রষ্টা-জীবনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হলো । মৌল ঋীমগুলির পরিবর্তন না হলেও তাঁর ছবির ফর্মে যেমন রূপান্তর ঘটল তেমনি ঘটল বিষয়বস্তুর বিচ্ছাসে । **My Way Home**-এর পর 'নায়ক' বলতে কিছু তাঁর ছবিতে ছিল না, কিন্তু এখন থেকে তাঁর ছবির মূল চরিত্র হলো— জনতা । ব্যষ্টিমন থেকে সরে গিয়ে সমষ্টি-মন (**social psyche**) এই পর্বে তাঁর প্রধান অধিষ্ট । এই সঙ্গে তাঁর ছবিতে এলো একটি নূতন উপাদান—সম্মেলক গান ও নাচ ( অরণীয় যে ইয়াঙ্কো একদা ছিলেন লোকসাহিত্যের ছাত্র ) । সংলাপ থেকে এলো গান, গান থেকে আবার সংলাপ । তাছাড়া, এই পর্যায়ে বহিদৃষ্টির ব্যবহার শতকরা নব্বই ভাগ, ক্যামেরা সর্বদা সচল এবং দৃশ্যগুলি দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী । **Winter Wind** ছবিটি সর্বসাকুল্যে বারোটি দৃশ্যে (**take**) সম্পূর্ণ । ইলেকট্রে-ইয়াতেও ছিল ১২টা শট । এ্যলোগ্রোতে ২২টা । এই সময় থেকে ইয়াঙ্কোর ছবি-গুলি রঙিনও বটে ।

The Confrontation, The Technique and the Rite ( ৭১ ), Red Psalm ( ৭২ ), Elektreia ( ৭৭ ) এবং দুই অংশে তোলা Hungarian Rhapsody ও Allegro Barbaro ( ৭৮-৭৯ ) ছবিগুলিতে ক্রমেই stylisation বর্ধিত হয়েছে। নৃত্যগীত-প্রধান হলেও The Confrontation মোটের ওপর একটি বিশেষ স্থানকালের ঘটনা; কিন্তু Elektreia ( প্রখ্যাত গ্রীক কাহিনী অবলম্বনে ) ছবির কুশীলব সর্বত্র ঐ সময়ের পোশাক পরেনি। ছবির শেষ দৃশ্বে একটি রক্তবর্ণ হেলিকপ্টার উড়ে যায় দেশে দেশে বিপ্লবের বাণী প্রচারের কাজে। শহীদ-হওয়া মানুষগুলি নতুন জীবন পেয়ে উঠে দাঁড়ায়; Red Psalm-এ শহীদের রক্তাক্ত হাতে ফুল ফুটে ওঠে। এই ছবিগুলির ঝোঁক সর্বকালীনতার দিকে। তাই ইলেকড্রেইয়া বা রেড সাম-এর শেষ দৃশ্বে তিনি কাহিনীকে নিয়ে যান বিশেষ থেকে সামান্তে, কয়েকটি মানুষের সংগ্রামকে উত্তীর্ণ করে দেন সর্বকালের, সর্বদেশের সংগ্রামে।

ইয়াকোব চলচ্চিত্রকে একটি নতুন কর্মের দিকে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায় রত আছেন। পুরনো বহু ভাবনা—যেমন চরিত্রসৃষ্টি থেকে আবেগ ( emotion ) ও ক্রমপরিণতি ( development )—তিনি বহু পূর্বেই বর্জন করেছেন। যুদ্ধোত্তর-কালের সাহিত্যিকদের মতো তিনিও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের বিরোধী। বস্তুত, তাঁর ছবির চরিত্রগুলি প্রায়শই ব্যাখ্যার অতীত; শেষ দিকের ছবিতে কার্যকারণ-বোধও অনুপস্থিত। এই অর্থে তিনি আধুনিক, যদিও একেবারে আধুনিক সময়ের পটভূমিতে তিনি মাত্র একটি কি দুটি ছবি করেছেন। কম্যুনিজমের পতন ও কুশীলবদের মোহভঙ্গ নিয়ে সাম্প্রতিক ছবি ‘God Walks Backward’ তার একটি। সবচেয়ে বড়ো কথা বোধহয় এই যে, পর্দায় ইয়াকোবর ছবি আলাদা করে চিনিয়ে দিতে হয় না। দর্শক প্রায় এক নজরেই তাঁর হাতের কাজ চিনতে পারেন। একজন auteur বা জাত স্রষ্টার পক্ষে এইটাই সব সেরা পরিচয়।

অমিয় বসু

॥ ইয়োগোস্লাভিয়া ॥

বিদেশ থেকে আনা স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবির প্রদর্শন এদেশে শুরু হয় ১৮৯৬ থেকে। নিজেদের প্রয়োজনায় প্রথম কাহিনীচিত্র নির্মিত হয় ১৯১০য়ে। এই সময় থেকেই নিয়মিত ভাবে সংবাদচিত্রও তৈরি হচ্ছিল। বলকান যুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে তোলা সংবাদচিত্রের কথা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়

পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ কাহিনীচিত্র হলো এম. এম. পোপোভিচের উইথ ফেথ ইন গড। ওই সময়কার আর একজন উল্লেখযোগ্য পরিচালক মিলটন মানাফি। ১৯৪২য়ে প্রদর্শিত হয় ইনোসেন্স আনুপ্রটেস্টেড যার একটি পরিবর্তিত সংস্করণ পরে দুশান মাকাভাজেভের কাছ থেকে পাওয়া গেছে। জাতীয় ফিল্ম বোর্ড স্থাপিত হয় ১৯৪৫য়ে। কার্টুন, পাপেট ও অ্যানিমেশন ফিল্মের বিশেষ প্রসার ঘটে এর ফলে। জাগ্রেব স্কুলের অ্যানিমেটেড চিত্র ও বেলগ্রেড স্কুলের তথ্যচিত্র আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেল। যুদ্ধের পরবর্তী বারো বছর ধরে কাহিনীচিত্রের মূল বিষয় ছিল যুদ্ধ ও আত্মমুগ্ধিক প্রসঙ্গ। তারপর অত্যাচার আধুনিক সমস্যা ও বিষয় নিয়েও ছবি করা শুরু হলো। এই সব ছবিতে সাধারণ দক্ষতা, সহজ সরলতা ও প্রাণচাকাল্য থাকলেও নির্মাতাদের এই বিভ্রান্তি থেকে গেছিল যে ছবিতে ব্যক্তিচেতনাকে বিস্মৃত করে সমাজচেতনার আসা হবে না সমাজচেতনাকে কেন্দ্রাভিমুখী করে ব্যক্তিচেতনায় যাওয়া হবে। এই বিভ্রান্তি ও ছবির চরিত্রদের নিজস্ব বিভ্রান্তি প্রায় ছবিতে মূল বিষয়বস্তুর অস্পষ্টতা ও বিষয়ের বস্তুমূল্যের অভাবের জন্য দায়ী। সাধারণভাবে এই সময়ের ইয়োগোপ্লাভ ছবির আঙ্গিকে আর একটু বিজ্ঞান, নির্বাচনে আর একটু বিচার ও আর একটু কম তির্যক দৃষ্টিকোণের প্রয়োজন ছিল। আধুনিক পরিচালকদের মধ্যে নিঃসন্দেহে মাকাভাজেভ সবচেয়ে খ্যাতিমান। তাঁর ইনোসেন্স..., সুইচবোর্ড অপারেটর ও মিস্ট্রিজ অব দি অরগ্যানিজম্ ছবিতে বিজ্ঞপাত্মক শৈলী, চতুর ও তীক্ষ্ণ সম্পাদনা, এবং আঙ্গিক সচেতনতা ও ভিসুয়াল পানের সুন্দর উদাহরণ আছে। প্রোভোকেটিভ তরু সিম্প্যাথেটিক এঁর মেজাজ। আন্তর্জাতিক স্তরের যৌথ প্রযোজনা ও নিজের দেশের মাটিতে অল্প দেশের ছবির গ্যাটিংয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য ইয়োগোপ্লাভিয়ার সুনাম ছিল। সুনাম ছিল অতি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত উন্নত মানের অ্যানিমেটেড ও পাপেট ছবি তৈরিরও। আশির দশকের শুরুতে উন্নতির সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা গেলেও চলচ্চিত্রশিল্প ও শিল্প হিসেবে চলচ্চিত্র হান্দেরি, পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক দেশে পায়ের নিচে যে শত্রু মাটি পেয়েছিল এই দেশে কখনো তা পায়নি। আর পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতনের পর তো এদেশে রাজনৈতিক সংকট চরমে উঠেছে, গৃহযুদ্ধ চলছে, দেশ সার্বদের, ক্রোটদের ও স্লোভেনদের পৃথক-পৃথক শাসনাধীন অঞ্চল হিসেবে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাওয়ার মুখে, মাকাভাজেভ সহ উল্লেখযোগ্য পরিচালকরা দেশ ছেড়ে বিদেশে গিয়ে ছবি করছেন।

## ॥ ইয়োরিস ইভেন্স ॥

বিশ্ববিখ্যাত তথ্যচিত্র পরিচালক ও তার চেয়েও বড়ো কথা সমাজবাদী চিত্রপরিচালক হিসেবে ইয়োরিস ইভেন্সের নামটি অরণীয় হয়ে আছে। মূলতঃ তথ্যচিত্রের নতুন ধারার প্রবর্তনে তাঁর স্বতন্ত্র মর্যাদা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জন্মেছিলেন হল্যান্ডে ১৮৯৮ সালে। প্রগতিশীল শিল্পসম্মত তথ্যচিত্র নির্মাণের ইতিহাসে তাঁকে আজও অন্ততম অগ্রণী নেতা হিসেবে গণ্য করা হয়। জন্মস্থানে হল্যান্ডের অধিবাসী হলেও ইভেন্স কর্মজীবনের বেশিরভাগ সময়টাই কাটিয়েছেন ফ্রান্স ও পূর্ব এশিয়ার নানা ভূখণ্ডে। চিত্রপরিচালকরূপে জীবন শুরু করেন ১৯২৭ সালে। চলচ্চিত্রের প্রতি আকর্ষণ জন্মেছিল পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যের ফলস্বরূপ। তাঁরা ছিলেন চিত্রগ্রাহক। আন্তর্জাতিক আর্ট গার্দ চিত্র নির্মাণের জগতে নির্বাক যুগের শেষপর্ব থেকেই ইভেন্সের নামটি সমধিক পরিচিত ছিল। ১৯২৮-এ তৈরি তাঁর 'দু ব্রীজ' ও ১৯২৯-এ তৈরি 'রেইন', এই দুটি ছবিই ইভেন্সের মৌলিক শিল্প দক্ষতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। কিন্তু ত্রিশ দশকের গোড়ায় তাঁর একাধিকবার রাশিয়া ভ্রমণ তাঁর চলচ্চিত্র প্রবণতায় এক আচম্বিং পরিবর্তন আনে। এবং ইভেন্স তৎ পরবর্তী সময়ে কয়েকটি অনবদ্য জঙ্গিবাদী চিত্র নির্মাণ করেন। যার মধ্যে ১৯৩৩-এ বেলজিয়ামের বোরিনেজের খনি শ্রমিক ধর্মঘটের পরবর্তী পর্যায় নিয়ে তৈরি 'বোরিনেজ' ও ১৯৩৪-এ তৈরি 'দ্য নিউ আর্থ' দুটি ছবি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মার্কিন তথ্যচিত্রের ইতিহাসে ইভেন্সের মৌলিক অবদান চিহ্নিত হয়ে আছে বিশেষতঃ ত্রিশ দশকের শেষে এবং চল্লিশ দশকের গোড়ায় তৈরি তাঁর কিছু ছবির অল্পবধে। ঐ পর্বে তৈরি তাঁর তিনটি বিখ্যাত ছবিই তাঁর চলচ্চিত্র দক্ষতা ও স্বতন্ত্র শিল্প অভিপ্রায়ে নিরিখে উজ্জ্বল হয়ে আছে। ১৯৩৭-এ তৈরি স্পেনের গৃহযুদ্ধ কেন্দ্রিক 'দ্য স্প্যানিশ আর্থ', চীনের ভূখণ্ডে জাপানি আক্রমণের বিরুদ্ধে চীনের প্রতিরোধ নিয়ে ১৯৩৮-এ নির্মিত 'দ্য ফোর হানড্রেড মিলিয়ন' এবং ওহিও নগরের একটি জোত জমিতে পরিকল্পিত গ্রাম বৈদ্যুতিকরণ সম্পর্কে ১৯৪০-এ তৈরি 'দ্য পাওয়ার এ্যাণ্ড দ্য ল্যাণ্ড'।

১৯৪৪-এ মার্কিন দেশ পরিত্যাগ করার পর ইভেন্সের কর্মজীবন অন্তধারায় প্রবাহিত হয়। তিনি আর পরে মার্কিন মূলকে ফিরে যাননি। ১৯৪৫-৪৬-এর পর্বে, যখন তাঁর স্বদেশ ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিকতার আগ্রাসী শক্তি বিস্তার করে তখন ইভেন্স ফিল্ম কমিশনার ফর দি নেদারল্যান্ডস ইন্সটাইটিউট

পদটি ত্যাগ করেন ও ইন্দোনেশিয় প্রজাতন্ত্রের প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে-  
ছিলেন। বস্তুতঃ ‘স্প্যানিশ আর্থ’ ও ‘ফোর হানড্রেড মিলিয়ন’ ছবি দুটি তাঁর  
চলচ্চিত্র এষণার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করে তোলে এবং অচিরেই তিনি  
বামপন্থী চলচ্চিত্রকারদের জনক হিসেবে স্বীকৃতি পান।

ইন্দোনেশিয় পক্ষ সমর্থনের পরবর্তী সময়ে ইভেন্স ইউরোপে প্রত্যাবর্তন  
করেন এবং জাম্যমাণ চলচ্চিত্রবিদ্য রূপে নানা জায়গায় সিনেমার ব্যাকরণ ও  
নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে পূর্ব ইউরোপের সমাজতন্ত্রী চলচ্চিত্রকারদের শিক্ষা প্রদান  
করেন। এই সময়ে প্রায় দশ বছর ধরে তাঁর ছবি তৈরিও অব্যাহত থাকে। এই  
সময়ে তৈরি তাঁর অগ্রণম বিখ্যাত ছবি ‘সঙ অফ দ্য রিভারস্’ (১৯৫৪)। ১৯৫৭-তে  
ইভেন্স ফ্রান্সে চলে যান যা পরবর্তীকালে তাঁর দ্বিতীয় বাসভূমি হয়েছিল। এখানে  
তিনি তৈরি করেন ‘The Seine Comes to Paris’। বস্তুতঃ যুদ্ধ পরবর্তী এই  
ছবিটিই উল্লেখযোগ্যভাবে মার্কিন দর্শকদের দেখার সুযোগ ঘটে। (কাব্যধর্মী  
এই ছবিটি ইভেন্সের প্রথম দিকের ‘রেইন্’ ছবিটির শিল্পনন্দন মনে পড়িয়ে  
দেয়)। এই সময়ে তিনি ইউরোপীয় জনসমাজে যতোটা পরিচিত ছিলেন, মার্কিন  
দর্শকদের কাছে ততোটা নন। তবে পরবর্তীকালে তাঁর ছবির সঙ্গে পরিচিত  
হবার সুবাদে মার্কিন দর্শকমণ্ডলী ও সমালোচকেরাও তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন।  
১৯৫৮-তে ইভেন্স চীনের পিকিং শহরের স্টুডিওতে তথ্যচিত্রের শিক্ষক হিসেবে  
দুটি ছবির তত্ত্বাবধান করেন। যার মধ্যে একটি ছবি ‘লেটারস্ ফ্রম চায়না’ ইউরোপে  
মুক্তি পায়। এ ছবিতে রঙ এবং তথ্যচিত্রের কাব্যধর্মিতা প্রাচীন চৈনিক চিত্র-  
কলার অনুসঙ্গে পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

ভিয়েৎনামের বিধ্বংসী যুদ্ধ এবং মার্কিন আক্রমণের বিরুদ্ধে ভিয়েৎনামের  
জনগণের অনমনীয় প্রতিরোধে উজ্জীবিত ইভেন্স ভিয়েৎনামের ওপর বেশ কয়েকটি  
ছবি নির্মাণ করেন। ১৯৬৫-তে ভিয়েৎনাম যুদ্ধের তীব্রতায় পীড়িত এবং মুক্তি-  
যোদ্ধাদের প্রতি রুশ সাহায্যের গাফিলতিতে অবসাদগ্রস্ত ইভেন্স অতঃপর অল্প  
আর এক মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে মধ্যবর্তী হন। এর পরবর্তী পাঁচ বছরে তিনি  
দুটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ও তিনটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি করেন ইন্দোচীনে। ইন্দোচীনে তৈরি  
তাঁর ছবির মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত হলো ‘Loin du Vietnam’। যদিও এই  
পর্বে তৈরি তাঁর দর্শনশ্রেষ্ঠ ছবিটি হলো ‘দ্য সেভেনটিস্ প্যারাল’ (১৯৬৭)।  
বোম্বার আঘাতে বিধ্বস্ত উত্তর ভিয়েৎনামের এক অংশে চাষীদের প্রতিরোধ নিয়ে  
তৈরি এ ছবিকে ইভেন্স মহাকাব্যিক ব্যঙ্গনা দান করেছিলেন। পরবর্তী বছরে তিনি

একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি করেন লাওসে। নাম 'দ্য পিপল্‌স্‌ এ্যাণ্ড ইট্‌স্‌ গান'। ছবির নির্মাণ পদ্ধতিতে ১৯৬৮ পরবর্তী ফ্রান্সের নব্যধর্মী ছবির আদিকের প্রচ্ছন্ন প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

এর পরবর্তী সময়ে ইভেন্স চৌ-এন লাই-য়ের আমন্ত্রণে দ্বিতীয়বারের জ্ঞান চীন সফরে যান ১৯৭২ সালে। এখানে তিনি তাঁর সহযোগী চিত্রপরিচালক শ্রীমতী মারসেলাইন লোরিভানের সঙ্গে যে বারোটি ছবি নির্মাণ করেন সেগুলি চীনের জনসাধারণ ও সামাজিক জীবনযাত্রার নতুন দিক উন্মোচিত করেছিল। সাংস্কৃতিক বিপ্লবোত্তর চীন সম্পর্কে ইভেন্স ১১ ঘণ্টা ৫০ মিনিটের সম্পাদিত যে ছবি তোলেন তা মোট বারোটি ছবিতে বিভক্ত হয়। যার মধ্যে ছিল চারটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি, চারটি মধ্যম দৈর্ঘ্যের ছবি ও চারটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি। মূল ছবির প্রাথমিক নামকরণ হয় 'দ্য সেকেন্ড লুই মার্চ'। পরে ছবির টাইটেল পরিবর্তন করে নাম রাখা হয় 'হাউ যুক্‌ মুভ্‌ দ্য মাউন্টেন্‌স্‌'। তথ্য ও সত্যের মেলবন্ধনে ইভেন্স ছবিগুলির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক বিপ্লবোত্তর চীনের সার্বিক প্রগতির ইতিহাসকে যথাসম্ভব নিষ্ঠা ও মননে মেলে ধরেছিলেন। কোনো কোনো সমালোচকের মতে চীন সম্পর্কিত এই ছবিগুলি যতোটা ইভেন্সের আদর্শগত ও কল্পনাপ্রসূত, ততোটা বাস্তব সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত নয়। কেউ কেউ ছবিগুলির কিছুটা বিরূপ সমালোচনাও করেছিলেন। কিন্তু বলা বাহুল্য, বিশ্বের দর্শক প্রথম এই ছবিগুলির মাধ্যমেই আধুনিক চীনের উন্নতি, রাজনৈতিক আদর্শ ও আন্তর চরিত্রের সম্যক পরিচয় লাভের সুযোগ পান। চীনে ইভেন্সের দীর্ঘ দিনের অবস্থান, জনসমাজের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় ও মমত্ব ছবিগুলিকে তথ্যচিত্রের নিরস বর্ণনা ব্যতিরেকে এক শিল্পসম্মত রূপ দানে সমর্থ হয়েছিল। ইভেন্স বিশ্বাস করতেন যে একমাত্র সমাজতন্ত্রের ছত্রছায়াতেই তথ্যচিত্র নির্মাণ ব্যবস্থা শিল্পগত দিক থেকে চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছতে পারে। ইভেন্স তাঁর চার দশকের চলচ্চিত্র নির্মাণ অভিজ্ঞতা মেলে ধরেছেন তাঁর আত্মজীবনীমূলক 'দ্য ক্যামেরা এ্যাণ্ড আই' গ্রন্থে।

সমালোচকেরা তথ্যচিত্র নির্মাণের পদ্ধতি ও মৌলিক আদর্শের ক্ষেত্রে ইভেন্সের রাজনৈতিক দর্শন-প্রসূত নৈপুণ্যকে ব্যাখ্যা করেছিলেন 'Cinematic Maoism' বলে। ইভেন্স রাজনৈতিক বিপ্লবের পদ্ধতি বা প্রভাব সম্পর্কে কোনো সারগর্ভ গ্রন্থ রচনা করেননি বটে, কিন্তু বিপ্লবী জনগণের জীবনধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুবাদে, তাদের নিবিড় আন্তর পরিচয় জানার একনিষ্ঠতায় প্রকৃত বিপ্লবী

চেতনার আদর্শকে তাঁর ছবির ভেতর দিয়ে আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে পেরেছেন। তিনি বিভিন্ন দেশের নারীদের নিয়েও ছবি করেছেন, দেখিয়েছেন সমাজে তাদের ভূমিকা, পৃথিবী জুড়ে নারী-ঐক্য।

বস্তুতঃ, রাজনৈতিক চলচ্চিত্র নির্মাণের ইতিহাসে ইভেন্সের প্রভাব স্বদূর-প্রসারী। তাঁর তৈরি ছবি পৃথিবীর নানা প্রান্তের গণ আন্দোলনকে উজ্জীবিত করেছে। যদিও তথ্যচিত্রের মহান অগ্রণী হিসেবে ইভেন্সকে স্বরণ করা হয়, কিন্তু চলচ্চিত্র নির্মাণের মৌলিক অভিপ্রায়ের ক্ষেত্রেও তিনি বিশ্বাস করতেন যে প্রকৃত সংস্কৃতির পরিচয় একটা স্পষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থাকা অত্যন্ত জরুরী। 'Personhood' ছবি তৈরির ক্ষেত্রে ইভেন্সের সিনেম্যাটিক প্রয়োগকৌশলভাৱে ইভেন্সের প্রভাব অলঙ্কিত নয়। কিন্তু সিনেমার ভাষায়, তথ্য ও সত্যের শিল্পসম্মত ব্যাখ্যায় তিনি সমাজবাদী প্রগতিশীল চলচ্চিত্র তৈরির ক্ষেত্রে এক প্রবল ঝোঁয়ার স্রোত ছিলেন। সিনেমার আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। নীরস নিউজরীল আর বিবর্ণ তথ্যচিত্রের তথাকথিত ধারার পাশে ইভেন্স স্বকীয় দৃষ্টি, মনন আর শিল্পাত্মকভাবে তথ্যচিত্র নির্মাণে নবতম আধুনিক ধারার সঞ্চার করেছিলেন যা বিভিন্ন দশকে নানা প্রষ্টাবে অনুপ্রাণিত করেছে। প্রকৃত তথ্যচিত্র নির্মাণ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধারণা মূল্যবান দলিল স্বরূপ বিব্রাজ করেছে : 'The difference between newsreel and documentary film is that, the newsreel tells us where-when-what, the documentary film tells us why and the relationship between events and provide historic perspective.'

রচিত গ্রন্থ : দ্য ক্যামেরা এ্যাণ্ড আই ॥

সোমেন ঘোষ

॥ জর্জ ইন্সটম্যান ॥

( ১৮৫৪-১৯৩২ ), মার্কিন আবিষ্কারক ও শিল্পপতি, ফটোগ্রাফির ইতিহাসে অত্যন্ত প্রধান ব্যক্তিত্ব। তিনি ড্রাই প্লেট ও ব্রোমাইড পেপার নির্মাণ করেন ( ১৮৭৯ ), কোডাক ও রোল ফিল্মের প্রচলন করেন ( ১৮৮৯ ), এবং ইন্সটম্যান কোডাক কোম্পানির প্রতিষ্ঠা করেন। এই কোম্পানির উৎকৃষ্ট রঙিন নেগেটিভ ফিল্ম এখন ইন্সটম্যানকালার নামে পরিচিত ( ড্র. শাদা কালো ও রঙিন নেগেটিভ ফিল্ম )। বস্তুত মুক্তি ফটোগ্রাফিতে ইন্সটম্যান কোডাক কোম্পানির অতুলনীয় অবদান রয়েছে,

নাসা তাদের মহাকাশযাত্রার কর্মসূচিতেও এই কোম্পানির প্রায়ুক্তিক সাহায্য গ্রহণ করে থাকে। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে ইস্টম্যান যা করেছিলেন তা হলো, ফটোগ্রাফির সাজসরঞ্জামের উৎপাদনকে প্রথম বৃহৎ ও ভারী শিল্পের আওতায় নিয়ে আসেন, দ্বিতীয়ত ব্যাপকভাবে ক্যামেরার ও ফিল্মের উৎপাদন ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে ফটোগ্রাফিকে ধীরে ধীরে একটা গণমাধ্যম করে তোলেন, তৃতীয় প্রযুক্তি ও প্রদানের যৌথ প্রভাবে ফটোগ্রাফি ও সিনেমার যে অর্থনৈতিক ভূমিকা সৃষ্টি হলো তার ফলে সমস্ত শিল্পকলা বা গণমাধ্যমই এরপর থেকে ক্রমে ক্রমে আর্থিক কারণের দ্বারা কম-বেশি নিয়ন্ত্রিত হতে শুরু করল। মানসিক কারণে ইস্টম্যান আত্মহত্যা করেছিলেন।

## ॥ উইক-এণ্ড ॥

ফ্রান্স, ১৯৬৭। গদারের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছবিগুলোর মধ্যে সাধারণত উইক-এণ্ডের নাম করা হয় না। কিন্তু একাধিক কারণে ছবিটিকে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক মনে করি। প্রথমত এই ছবিতে গদারের বক্তব্য স্পষ্ট এবং তিনি সেই বক্তব্য দর্শকদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পেরেছেন, ছবির আঙ্গিক বক্তব্যকে অতিক্রম করে যায় নি। দ্বিতীয়ত আধুনিক পাশ্চাত্য জীবনে ও চলচ্চিত্রে মোটরগাড়ির একটা প্রাসঙ্গিক ভূমিকা আছে (ড্র. টেলিভিশন, চলচ্চিত্রে ভাবনাস্বীতি), সেই মোটরগাড়িকে কেন্দ্রীয় প্রসঙ্গ করে গদার একদিকে যেমন ধনতান্ত্রিক সমাজের হিংসা-বর্বরতা-বিভিন্ন ধরনের অবক্ষয়-মূল্যবোধের অভাবকে তীক্ষ্ণভাবে আঘাত করেছেন, তেমনি অন্যদিকে সূচত্বর ক্যামেরা-শৈলী ও সম্পাদনায় মোটরগাড়ি-গুলিকে জীবন্ত চরিত্র করে তুলতে পেরেছেন যা পূর্বোক্ত আঘাতকে আরো অর্থবহ করেছে। তৃতীয়ত তাঁর বিশিষ্ট আঙ্গিকের একাধিক মূল্যবান উপাদানের চমৎকার উদাহরণ উইক-এণ্ড লভ্য (ড্র. গদার, চলচ্চিত্র আঙ্গিকে বিভাজন)। থেমে থাকা গাড়ির দীর্ঘ সারি, পরপর ও পাশাপাশি, ষ্টিয়ারিঙে ষ্টিয়ারিঙে অশান্ত চালক—দশ মিনিট ব্যাপী স্থায়ী ট্র্যাকিং শটে এই দৃশ্য দেখতে দেখতে এইট অ্যাণ্ড হাফ ছবির অল্পরূপ দৃশ্যের কথা মনে পড়ে, সেখানে অধিবাস্তবতা নায়ককে উদ্ধার করেছিল, গদারের ছবির চরিত্রদের অত সহজে পরিচ্রাণ নেই।

ইস্টম্যানকালার, অভিনয়ে Darc, Yanne, Kalfon, Leaud ; আলোক-চিত্র R. Coutard, সম্পাদনা A. Guillemot, চিত্রনাট্য গদার ॥

## ॥ উগেৎসু মোনোগাতারি ॥

জাপান, ১৯৫৩। মিজোগুচির এই ছবিটি জাপানের অল্পতম শ্রেষ্ঠ ছবি, ১৯৫৮য় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রসমালোচকদের বিচারে সর্বকালের সবসেরা দশটি ছবির একটি হিসেবে নির্বাচিত। ছবির পটভূমি ষোড়শ শতাব্দীর জাপান, বিষয়বস্তু তাঁর অবিকাংশ ছবির মতোই নারী-কেন্দ্রিক—নারীর প্রেম/স্নেহ, তার ভালোবাসার অধীনতাপ্রিয়/প্রতিশোধপর প্রবণতা। এ ছবিতে তাঁর শৈলী শান্ত ও লিরিক্যাল। শান্ত, কাব্যিক ক্যামেরা মুভমেন্ট ছবিতে যে রহস্যময়তা আছে (যাকে অতি-পাণ্ডিত্যিক বলব না, বরং বলব মিস্টিক, অনেকের মতে রূপকধর্মী) তার পক্ষে পটভূমি হয়েছে। ছবিতে কৌমুদীন ও আবেগানুভূতির সমান্তরাল উপস্থাপনা এবং জাপানি শিল্পের ঐতিহ্য ও মানব-মনস্তত্ত্বের আধুনিক পর্যবেক্ষণ দুয়ের সমন্বয়, ঘটায়, উগেৎসু...এমন এক মানবিক আবেদন পেয়েছে মহৎ শিল্পের মতো যা শান্ত বিধাদেশ। দক্ষ, বিস্ময়, স্নেহ ও অদ্ভুত এই ছবি রেনোয়াকে মনে করিয়ে দেয়। দশটি ছবির জুয়া মিজোগুচিকে গদার গ্রিফিথ, আইজেনস্টাইন ও রেনোয়ার সমকক্ষ বলেছিলেন।

কাহিনী Y. Yashikata, আলোকচিত্র K. Miyagawa ॥

## ॥ চলচ্চিত্র উৎসব ॥

চলচ্চিত্র উৎসব প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩২য়ে ভেনিসে। তারপর ১৯৩৫য়ে মস্কো (১৯৫৭ থেকে নিয়মিতভাবে ও বর্তমানে আবার অনিয়মিতভাবে), ১৯৪৬য়ে কান ও ১৯৫১য় বার্লিনে চলচ্চিত্র উৎসবের সূচনা হয়। স্বল্প দৈর্ঘ্য ছবির উৎসব ওয়ারহাউজেনে শুরু হয় ১৯৫৫ থেকে। পৃথিবীতে এই রকম উৎসবের মোট সংখ্যা এখন প্রায় দু'শোর কাছাকাছি। চলচ্চিত্র উৎসব বিভিন্ন দেশের পরিচালক ও নব-নির্মিত ছবির প্রচার ও ব্যবসায়িক প্রসারের মূল কেন্দ্র। যে দেশে উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে পর্যটন, সংস্কৃতি ও সিনেমার বাণিজ্যিক দিক থেকে দেখলে সেই দেশের পক্ষেও তা এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। উৎসবে প্রতিযোগিতা, দেশীয় ছবি, নতুন পরিচালকদের ছবি, ইনফরমেশন, রেট্রোস্পেকটিভ, মার্কেটিং—বিভিন্ন শাখা থাকে। প্রতিযোগিতা বিভাগে বিবিধ পুরস্কার দেওয়া হয়, শ্রেষ্ঠ ছবির সর্বোচ্চ পুরস্কার হলো ভেনিসে স্বর্ণ সিংহ, কানে স্বর্ণ পত্র, বার্লিনে স্বর্ণ ভলুক, মস্কোয় ছিল স্বর্ণ পদক, ওয়ারহাউজেনে অর্থমূল্য। বহু উৎসবে প্রতিযোগিতা বিভাগ থাকে না। আবার বহু উৎসব বিশেষ ধরনের ছবি বা উদ্দেশ্যের জুয়া নিবেদিত। যেমন,

তৃতীয় বিশ্বের ছবি, রাজনৈতিক বা সামাজিক কমিটমেন্টের ছবি অথবা বিজ্ঞান-কাহিনীর ছবি (ত্রিয়েস্তে), শিক্ষামূলক ছবি (পিসা), পরীক্ষামূলক / অ্যানিমেটেড / ক্রীড়া / বা সংগীত বিষয়ক ছবি ইত্যাদি। চলচ্চিত্র উৎসব নিয়ে রাজনৈতিক ও অগ্নাত বিতর্ক ও মতভেদ ক্রমেই বাড়ছে। তুলনীয় : অলিম্পিকস নিয়ে বৃহত্তর মতান্তর (নীতিগতভাবে) ও নোবেল পুরস্কার নিয়ে অনুরূপ মতান্তর (সুগতভাবে)।

## ॥ লিভ উলম্যান ॥

জন্ম ১৯৩৯, টোকিওতে। নরওয়ের মঞ্চ ও চিত্রাভিনেত্রী যিনি সুইডেনে এসে আন্তর্জাতিক খ্যাতি পান। স্বল্প ও অন্তর্মুখী অভিনয় এবং অসাধারণ অভিব্যক্তিময় মুখমণ্ডল বার্গম্যানের ছবিতে ও ম্যাক্স ভন সিডোর বিপরীতে তাঁর চরিত্রচিত্রণকে একই সঙ্গে বলিষ্ঠ, মর্মস্পর্শী ও অভিঘাতী করেছে। বার্গম্যানের পারসোনা, আওয়ার অব দি উল্ফ, শেম, এ প্যাশন, ক্রাইস অ্যাণ্ড হুইদপারদ, সীনস ফ্রম এ ম্যারেজ, ফেন টু ফেন, দি সারপেন্ট'স এগ ও অটাম সোনার্টা ছবিতে উলম্যানের অভিনয়ে রয়েছে স্বপ্না, রহস্য, সংরাগ ও যন্ত্রণার সহাবস্থান। উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন দি এমিগ্রেন্টস ও দি ওয়ে-ওয়ার্ড গার্ল ছবিতেও। তাঁর অভিনয়ে একই সাথে পাওয়া যায় প্রত্যয় ও স্বতঃস্ফূর্ততা। উলম্যান এক সময়ে বার্গম্যানের জীবন-সঙ্গী ছিলেন, তাঁদের একটি কন্যা-সন্তান আছে। তাঁর আত্মজীবনী পড়লে বোঝা যায় তিনি জীবনে যখন যেটা এসেছে সেটাকে সহজভাবে আঁততে দিয়েছেন। পৃথিবীর অল্পতম সেরা এই অভিনেত্রীকে নিয়ে রিচার্ড ক্যাপলানের পূর্ণ দৈর্ঘ্য তথ্যচিত্র এ লুক এট লিভ, শিল্পী হিসেবে ও তার চেয়েও বড়ো কথা মানুষ হিসেবে উলম্যানের এক আন্তরিক ও অন্তরঙ্গ উন্মোচন। সম্প্রতি উলম্যান তাঁর প্রথম ছবিটি পরিচালনা করেছেন—সোফি (ডেনমার্ক)। একটি ইহুদি তরুণীর প্রেম, আশাত্ত্ব ও স্বপ্ন নিয়ে এই ছবি। তিনি হলিউডের মিউজিক্যাল লস্ট হরাইজন, থি লার কোল্ডসোয়েট ও কমেডি ফার্ট ক্যারাক্টস-এও অভিনয় করেছেন কিন্তু সেখানে তাঁকে তেমন মানায়নি।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : তাঁর আত্মজীবনী চেঞ্জিং ॥

## ॥ ঋহিক ঘটক ॥

জন্ম : ৪ নভেম্বর ১৯২৫

মৃত্যু : ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬

শুধু শিল্প করার তাগিদে তিনি সিনেমা করতে আসেননি।

তঁার বলার আছে অনেক কিছু। লাথো লাথো মাল্লুষের কাছে সেই কথাটা পৌঁছে দেবার জন্তে তিনি এই মাধ্যমটাকে বেছে নিয়েছিলেন। তখন বাংলা-দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং মানসিক জগতে একটা পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। প্রথম ছবি করলেন 'নাগরিক' ১৯৫২, ছবির নায়ক রামু। একটার পর একটা চাকরিতে সে ইনটারভিউ দিতে যায়। হতাশ হয়ে ফিরে আসে। ছবির শুরুতে রামু সকলের থেকে আলাদা, সে শুধু একটা চাকরি পেলে কতো সুখে থাকবে এত কথা আছে। ছবির শেষে, যেহেতু সে চাকরি পায় না, পরিচালক তাকে গাণ্ডা ক্রমের পরিবারের অ্যাটর্নের পাশে এসে দাঁড়াতে। রামু উমা সীতা গাণ্ডা গণ্ডা পরিবারের কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়। আমরা যারা নিয়মমতাবিত্ত তারা। চরিত্রগুলি অর্থনৈতিক দিক থেকে এই পর্যায়ে থেকে যাবো, কোনোদিনও ওপরে উঠতে পারবো না, এই উপলক্ষিতেই ছবি শেষ হচ্ছে। একটা পুরোনো দেয়ালের মতো বাংলাদেশের অবস্থা। রামুর বাবা মাস্টারমশায়ের বাংলা ছিল গড়ার বাংলা, সেই বাংলা ভারতের বাংলা।

একটি প্রতি সাধারণ কাহিনীর কাঠামোতে পরিচালক তখনকার বাংলাদেশের নিয়মমতাবিত্ত সমাজের ক্ষয়িক্ত রূপ বর্ণনা করেছিলেন। টেকমিকের দিক থেকে অভ্যন্তরীণ এই ছবি। তবু চলচ্চিত্রে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর বাংলার মধ্যবিত্তের জীবন যাত্রার প্রথম বস্তনিষ্ঠ শিল্পরূপ দেয়ার চেষ্টা কিন্তু নাগরিক ছবিতেই আমরা দেখি।

সত্যজিৎ রায় লিখিত শোকপ্রস্তাবে বলা হয়েছিল, 'তঁার দ্বিতীয় ছবি 'অ্যান্ট্রিক' দ্বারা দেখেছিলেন তঁারা ঋষিকের অসামান্য বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকতার পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হয়েছিলেন। 'অ্যান্ট্রিক'-এর পর নানান অন্তরায় হেতু ঋষিক বিশ বছরে মাত্র ছ'খানি পূর্ণ দৈর্ঘ্য ছবি করার স্বযোগ পেয়েছিলেন। সংখ্যায় কম হলেও বিবিধ গুণে সমৃদ্ধ এই ছবিগুলি ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।' যার মা নেই, স্ত্রী নেই, আত্মীয় প্রিয়জন কেউ নেই, সেই বিমল প্রাণতরে ভালোবাসা দেয় তার গাড়ি জগদলকে। বিমলের আশপাশের আদিবাসীরা বিমলকে যে চোখে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে, বিমলের জীবনদৃষ্টিও সেরকমই। একটা যন্ত্রের মধ্যে মাল্লুষের আত্মা আরোপের চেষ্টা। বিমল তার সব দিয়েছিল জগদলকে, যে আর চলবে না। অথচ একদিন কী পাহাড়ভাঙা রুটির মধ্যে ছুটে গেছে যাত্রীবোঝাই জগদল। একটি স্বন্দরী মেয়েকে যাত্রী হিসেবে নিয়ে এসে সে দেখল মেয়েটি পরিত্যক্তা, সে তাকে বাঁচাতে

চাইল। কিন্তু নিজের অহুভূতি আর একজনের কাছে প্রকাশ করার ভাষা তার জ্ঞান নেই। অতএব মেয়েটিকে টেনে চড়ে চলে যেতে দেওয়া ছাড়া আর কি করার আছে? আছে। কিন্তু জগদল যে চলতে চায় না। যার গতি ছিল তার গতি নষ্ট হয়ে গেছে। মাহুসই হোক আর যন্ত্রই হোক সবকিছুই চলেছে ভাঙা লোহার বাজারের দিকে। ছবিতে আদিবান্দী ওরাওঁদের যে সাংকেতিক মৃত্যের মহাযাত্রা দৃশ্য সন্নিবিষ্ট হয়েছিল, ঋত্বিক মনে করেন, তাতে প্রকাশ পাচ্ছিল জন্ম, শিকারে যাওয়া, বিবাহ, মৃত্যু, পূর্বপুরুষের প্রতি পূজা ও নবজন্ম।

আধুনিক জীবনের বহু পাপের প্রতি যুগের প্রকাশ আছে ‘মেঘে ঢাকা তারা’তে। উদ্বাস্ত সমস্তা যুরে ফিরে এসেছে তাঁর ছবিতে। শিকড় ছেঁড়া মাহুস তার অচেনা জমিতে পুনর্বাসনের অর্থনৈতিক লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, নীতির লড়াই, আদর্শ ও বিবেকের লড়াই। দেশটাকে দু’ভাগ করা হলো। সেই যন্ত্রণায় এ দেশ ক্ষত বিক্ষত। রাষ্ট্রীয় ঐক্যের আদর্শ বিনা বিবেচনায় চাপিয়ে দেবার ফলে অবদমিতচিত্ত, আর সেই অবদমনের ফলস্বরূপ পশ্চিমী সভ্যতার রনে পরিপুষ্টচিত্ত জাতীয় নেতাদের চিন্তারাজ্যের দেউলেপনা, এই রকম দেশজ ও আন্তর্জাতিক কারণে দেশের চরম দুর্গতি।

‘কোমল গান্ধার’ এর লক্ষ্য সেই অধোগমনের, সেই মূলহীনতা ও আশ্রয়-হীনতার চিত্রায়ণ। শকুন্তলার প্রতিমূর্তি এ ছবির নায়িকা, আর একালের যুবচিহ্নে যে বিফোভের প্রদাহ, তারই প্রকাশ নায়কের চরিত্রে। এ শুধু প্রেমের উপস্থাস নয়, এখানে আছে দীনমলিন নাট্য আন্দোলন ও দলাদলি। দেশভাগের যন্ত্রণায় এক যুবকের রক্তাক্ত হৃদয় আশ্রয় পেতে চায় শিল্পের সাধনায়। অনশ্রুয়ার দ্বিধা-বিত্তক মন, বাংলার গণনাট্য আন্দোলনের দ্বিধাগ্রস্ত নেতৃত্ব এবং দ্বিধাবিত্তক বাংলাদেশের মর্মবেদনা এই তিনটিকেই তিনি একত্রে টানতে চেয়েছেন।

দেশ ভাগ হওয়াটাই বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ভেঙেছে, রাজনৈতিক জীবনকে আন্দোলিত করেছে। ‘স্বর্ণরেখার’ শুরুতেই শোনা গেছে, ‘রাতে কোনো যুবক ঘুমোবেন না।’ সেই ছবিতেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এক প্রলয়ক্ষেত্রে পরমানন্দে হাততালি দিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছিল ছোট মেয়েটি সীতা। হঠাৎ তার সামনে এসে দাঁড়ায় একটি কালীমূর্তি। মেয়েটি ভয়ে চমকে ওঠে। দেখলাম ওটা একটা বহুরূপী। সে ওকে ভয় দেখাতে চায়নি। এই সীতা বড়ো হয়ে জীবনের একটা ভয়ঙ্কর অবস্থার সামনে এসে দাঁড়ায়। ছবির শুরুতে যে রাত জাগার কথা ছবির শেষে সেই রাত্রি কী ভয়ঙ্কর। সেই রাত্রিতে সীতা এই জীবন থেকে পালিয়ে

যেতে পারলেই বাঁচে, কিন্তু সে পালাতে চায় না, 'ঈশ্বর তুমি না পলাইছিল',  
বঁচে যাবার একটাই রাস্তা—আত্মহত্যা।

ঋত্বিক বিশ্বাস করেন না তাঁর কোনো শিল্পকর্ম করার অধিকার আছে যদি না তাঁর দেশের সংকটকে কোনো না কোনো দিক থেকে তিনি উদ্‌ঘাটিত করতে পারেন। তাঁর ছবি এই সংকটকে ধরবার চেষ্টা। তিনি জানতেন মুসলিম লীগ আর কংগ্রেসীরা দেশের সর্বনাশ ঘটিয়ে দেশটিকে ছুঁটুকরো করে দিয়ে আদায় করল '১৭৭ খাদীনতা'। গঙ্গা পদ্মার জল ভাইয়ের রক্তে লাল হয়ে গেল। আমরা গান শুনাতাম। ঋত্বিক বাংলাদেশে আঁকড়ে ধরে মুখ খুঁড়ে পড়ে রইলাম। এ কোন্‌ গান। যেখানে দারিদ্র্য আর নীতহীনতা আমাদের নিত্যসঙ্গী, যেখানে কালো-নাআগী আর অসং রাজনৈতিক নেতাদের রাজত্ব, যেখানে বিভীষিকা আর দুঃখ দারিদ্র্য মানুষের নিয়তি। বিভক্ত জরাজীর্ণ বাংলার যে রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করছি দিনের পর দিন, তার ঐ পতিতালয়ে সীতার মতো দশা। আর আমরা যেন উন্মত্ত মনোযাচরণের পর আচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে বঁচে আছি। ঋত্বিক ব্যথিত হয়েছেন, পীড়িত হয়েছেন, কষ্ট পেয়েছেন। এদেশে দেশভাগের যন্ত্রণার সবচেয়ে সার্থক দার্শনিক 'স্ববর্ণরেখা'। একদিন ঋত্বিকের মনে হয়েছিল, যদি আপনি সচেতন হয়ে ওঠেন, ছবি দেখে বেরিয়ে এসে বাইরের সামাজিক বাধা বা দুর্নীতি বদলানোর কাজে লিপ্ত হয়ে ওঠেন, আমার প্রতিবাদকে যদি আপনার মধ্যে চারিয়ে দিতে পারি তবেই শিল্পী হিসেবে আমার সার্থকতা।

সেই ঋত্বিকই নির্মাণ করেছেন এই বিশ্বয়কর চলচ্চিত্র, 'স্ববর্ণরেখা'। এই সেই একমাত্র ভারতীয় ছবি যা দেখে আমাদের মনে হয়, এই জগৎকে বদলাবার শক্তি মানুষের নেই।

যে বাংলাদেশের কথা তিনি ভাবেন সেই বাংলাদেশ যে হারিয়ে গেছে। এটা তিনি বুঝতে পারেন, 'তিতাস' করতে গিয়ে। ঋত্বিক বলেছেন, সে বাংলাদেশ আপনারা দেখেননি, সেই প্রাচুর্যময় জীবন, সেই সুন্দর জীবন...আমি যেন সেই জীবনের পথে চলে গেছি, সেই জীবনের মাঝখানে...এখনো যেন সব সেরকম আছে, ঘড়ির কাঁটা যেন এর মাঝে আর চলেনি। ছবি করতে করতে দেখলেন, সেই অতীতের ছিটেফোঁটা আজ আর নেই, থাকতে পারে না। ইতিহাস ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর।

নীলকণ্ঠ তাঁর স্ত্রী দুর্গার কাছে গিয়ে হাজির হয়েছিল, যে দুর্গা একমাত্র ছেলে সত্যকে নিয়ে একা থাকে, প্রতিভাবান স্বামীর সঙ্গে যে দুর্গার দীর্ঘকাল কোনো

সম্পর্ক নেই। নীলকণ্ঠ পথের মধ্যে পেয়েছে নচিকেতা নামে এক বেকার ইঞ্জিনিয়ার যুবক আর ইয়াহিয়ার পাশবিকতায় উন্নত দিনগুলোতে ঘরহারা নো একটি মেয়ে বঙ্গবালাকে। বাংলাদেশ থেকে ঐ মেয়েটিকে গুরা খেদিয়ে দিয়েছে। দুর্গার কোয়ার্টারে নীলকণ্ঠ থাকার জন্ম আসেনি। শেষবার দেখা করে চলে যেতেই এসেছিল।

ঐ শহরে ঢোকার মুখে নীলকণ্ঠ দেখেছিল একটা শালবন। নীলকণ্ঠ ঐ শালবনে বাকি রাতটা কাটাতে চায়। তারপর বিরীচ পথ সামনে পড়ে রয়েছে। নীলকণ্ঠ তার স্ত্রীকে বলেছে কালকে সকালে কিছু রন্ধে নিয়ে ঐ শালবনে চলে এসো। সঙ্গে সত্যকে এনো।

ভোরের আলোয় নীলকণ্ঠ ছেলের মুখটা দেখতে চেয়েছিল। আর ওখানেই শালবনের ভেতর নকশাল যুবকের মুখোমুখি বসে এই আলোয় সম্পর্কে, তার নিজের সম্পর্কে নীলকণ্ঠর মুখে আমরা অনেক কথা শুনতে পাই। পুলিশ আক্রমণ করে। নীলকণ্ঠ মারা যান। পুলিশ মৃতদেহ জঙ্গল থেকে বার করে আনে। বেঁচে থাকে সত্য, দুর্গা, নচিকেতা, বঙ্গবাল।

তখন যে ভেতরে ভেতরে সব পুড়ছে, ব্রহ্মাণ্ড পুড়ছে। অথচ তাঁর যে কতো অফুরন্ত কথা বলবার ছিল। জ্ঞানের অগ্নিতে তিনি ভালোবাসায় আলোকিত, জ্ঞানের অগ্নিতে তিনি দুঃখে দগ্ধ।

ঋত্বিকের ছবি আমরা চোখ বুজেও দেখতে পাই।

নির্মিত ছবি : ১৯৫২ নাগরিক, ১৯৫৮ অযান্ত্রিক, ১৯৫৯ বাড়ি থেকে পালিয়ে, ১৯৬০ মেঘে ঢাকা তারা, ১৯৬১ কোমল গান্ধার, ১৯৬২ স্বর্গরেখা, ১৯৭৩ তিতাস একটি নদীর নাম, ১৯৭৪ যুক্তি তর্কো আর গল্পো।

খান দশেক তথ্যচিত্র ও স্বল্প দৈর্ঘ্যের চিত্রও তিনি নির্মাণ করেছেন।

রচিত গ্রন্থ : চলচিত্র, মানুষ এবং আরো কিছু ; সিনেমা অ্যাণ্ড আই।

সম্পাদিত গ্রন্থ : সুরমা ঘটকের ঋত্বিক, অতনু পাল সম্পাদিত ঋত্বিককুমার ঘটক ॥

**প্রলয় শুর**

॥ এইট অ্যাণ্ড হাফ ॥

ইতালি, ১৯৬৩। ছবিটি ফেলিনির এক রহস্যময় সৃষ্টি। একটা প্রকৃত-অর্থে-সুন্দর, ঈষৎ অপ্রাসঙ্গিক ও কখনো-জটিল ব্যক্তিগত চিত্র। এর মনস্তাত্ত্বিক উদ্ঘাটন, মনন-

গত উত্তেজনা, আবেগময় অভিব্যক্তি, আকর্ষণীয় দৃশ্যরূপ ও অভিজ্ঞতা আর কল্পনার চলচ্চিত্র-সুলভ প্রকাশভঙ্গি বহু আলোচিত। ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র এক চিত্র-পরিচালক ( যার প্রতিকৃতি ফেলিনি গড়েছেন নিজের আদলে ) যিনি তাঁর নিজের জীবনের সাথে সম্পর্কিত ও নতুন ছবির সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ঘটনা ও ব্যক্তির সম্মুখীন হয়ে, প্রকারান্তরে নিজেরই দ্বিধাদ্বন্দ্ব, অনিশ্চয়তা ও সমস্যার মুখোমুখি হয়ে, বাস্তব থেকে স্মৃতির রাজ্যে ও কল্পনার জগতে পালিয়ে যেতে থাকেন। এই চিত্ররূপ এক শিল্পীর ব্যক্তিগত সমস্যা-কেন্দ্রিক হয়েছে শিল্পীর প্রেরণা ও পরিশ্রম, শিল্পের সৌন্দর্য, সঙ্গীত, আলোকচিত্র ও সমাজের দ্বন্দ্ব, সঙ্গী ও সমস্যার মাধ্যমে আমাদের সমস্যার মতো সমস্যা-কেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। ( ড. ফেলিনি )। তাঁর নিজের জীবন, এই ছবির জীবনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার চেষ্টা আছে, তা হলো নিজের সঙ্গে মৌলিক-জ্ঞানতাত্ত্বিক, সম্পূর্ণ নির্ভর্য, দ্বিধাহীন ও নিঃস্বার্থ যোগসাধন। নানান ঘটনা থেকে পাতনিয়ত যুক্ত হতে চাওয়া, যেমন এই ছবির নায়ক গুইডো চাইছে।

আমাদের মায়েজোইয়ানি, আলুক এইমে; চিত্রগ্রহণ G. d. Venanzo, শিল্প নির্দেশনা P. Gherardi, সংগীত নিনো রোটা।

শ্রেষ্ঠ বিদেশি ছবি হিসেবে অ্যাকাডেমি পুরস্কার, ৬৩ ও প্রথম পুরস্কার, মস্কো, ৬৩ ॥

## ॥ এক্সপোজার ॥

এক্সপোজার হলো দৃশ্যবস্তু থেকে আগত আলোকরশ্মির সামনে ফটোফিল্মকে উন্মুক্ত করা যাতে সেখানে দৃশ্যবস্তুর লীন প্রতিবিম্ব-এর ছাপ পড়ে। কী পরিমাণ আলোকে ফটোফিল্ম পর্যন্ত পৌঁছতে দেওয়া হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে এক্সপোজার-মাত্রা। এটি, কত সময় ধরে ফিল্মকে আলোর সামনে উন্মুক্ত রাখা হলো ও আলোর তীব্রতা কত, এই দুইয়ের ওপর নির্ভরশীল। ( ড. ক্যামেরা )। আলোকপাত পরিমাপের একক হিসেবে ধরা হয় মিটার-ক্যাণ্ডল বা ফুট-ক্যাণ্ডল সেকেন্ডে। নির্দিষ্ট ফটোফিল্মের নির্দিষ্ট আলোকসংবেদনশীলতা বোঝানো হয়ে থাকে এক্সপোজার ইনডেক্সের সাহায্যে।

## ॥ এক্সপ্যাণ্ডেড সিনেমা ॥

তাৎক্ষণিক, প্রত্যক্ষ ও জীবনাত্মকী ছবি তোলার প্রসঙ্গে এক্সপ্যাণ্ডেড সিনেমার কথা আসে। একে এক্সপ্যাণ্ডেড বা বিস্তারিত বলা হয় এই কারণে যে প্রথমত

এখানে নানা মাধ্যমের ব্যবহার আছে আর দ্বিতীয়ত এখানে মানুষের সচেতনতার প্রসার ঘটানো হয়। ফিল্ম তৈরির জন্য বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক উপায় ব্যবহারের দ্বারা এই প্রকার অভিজ্ঞতা সৃষ্টি বা প্রকাশ করা সম্ভব। নানা মাদক-দ্রব্যের ব্যবহার, নাবিক নীতিবোধের ভাঙন, মানব-অভিজ্ঞতার সব রকম সম্ভাবনাকে পরীক্ষা করে দেখার আগ্রহ ইত্যাদি ঘটনাগুলি যে মনোজাগতিক অভিজ্ঞতার প্রতি মানুষের কোঁতুল বাড়িয়ে তুলেছে। যার পরিণতি হলো এই নতুন ধরনের চলচ্চিত্র—এক্সপ্যাণ্ডেড সিনেমা, যেখানে মনোজাগতিক অভিজ্ঞতা সৌরজাগতিক মাত্রায় পৌঁছে যায়। তবে অভিজ্ঞতার এই বিশালত্বের জন্য এক্সপ্যাণ্ডেড সিনেমার চাই প্রকাণ্ড এক্সপ্যাণ্ডেড পর্দা এবং উন্নত ধরনের শব্দগ্রহণ। আর, মানুষের অভিজ্ঞতা যেহেতু নিঃসঙ্গ মনোজাগতিক নয়, বরঞ্চ তা প্রতিবেশী ও সমাজ নির্ভর, সেহেতু এ-জাতীয় ছবি কতদিন দর্শককে টানতে পারবে সেটাও ভাববার বিষয়।

জীন ইয়ংব্লাড এক্সপ্যাণ্ডেড সিনেমার সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন এইভাবে—এ হলো নান্দনিক-সময়ের ছবি, কারণ এখানে মানুষ একটি সমগ্র অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করার চেষ্টা করছে, আর সেটি হলো তার নিজেরই সচেতনতা। শিল্পের ইতিহাসকে মোটামুটি চারটি প্রকরণ-গত ভাগে ভাগ করা চলে : বাস্তবতা (রিয়্যালিজম), অতিবাস্তবতা (সুপার-রিয়্যালিজম), নির্মাণতত্ত্বনির্ভরতা (কনস্ট্রাক্টিভিজম) ও প্রকাশবাদ (এক্সপ্রেসনিজম)। নানাভাবে এই চারটি রীতি মানুষের সচেতনতার চারটি ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত : চিন্তা (থট), আবেগ (ইমোশন), প্রজ্ঞা (ইনটুইশন) ও ইন্দ্রিয়চেতনা (সেনসেশন)। অতীতে, শিল্পের শৈলী ও প্রবণতা এক একটি বিভাগের সঙ্গে বা সচেতনতার একটি ক্ষেত্রের সঙ্গে এক এক সময়ে সংযোগ স্থাপন করেছে, অপর তিনটিকে অগ্রাহ্য করে। এক্সপ্যাণ্ডেড সিনেমা সচেতনতার এই চারটি বিভাগের সঙ্গে একই সময়ে সংযোগস্থাপন করার চেষ্টা করে। অতএব, প্রকৃত অর্থেই, এ-জাতীয় ছবি এক পূর্ণাঙ্গ পরিবেশ সৃষ্টি করে, যে-পরিবেশ পূর্ণ বোধের। এ-জাতীয় ছবি সামগ্রিক আবেদনের ভাষায় কথা বলে।

এই ধারার কয়েকটি আদর্শ ছবি, ইয়ংব্লাডের মতে, মাইকেল মোর 'ওয়েভ লেংথ', স্কট বারটলেট-এর 'অফ অন' বা জর্ডন বেলসন-এর 'ওয়ার্ল্ড'। এইসব ছবি অবশ্যই কোনো গল্প বলছে না, এবং প্রত্যক্ষ কোনো অর্থও বহন করছে না। এগুলি দৃষ্টি দ্বারা উপলব্ধির এক-একটি অভিজ্ঞতা, সচেতনতার সন্ধানে এক-একটি অহুশীলন। অর্থের ভিতরে অর্থ, তার ভিতরে অর্থ, তার ভিতরে অর্থের অনুসন্ধান।

এইসব ছবির এবং সমধর্মী আরো কিছু ছবির উল্লেখযোগ্য লক্ষণ হলো তাদের

আধ্যাত্মিক চরিত্র এবং বিশ্বয়কর প্রয়োগকৌশলের সমাবেশ। বেলসন-এর মতো পরিচালক নিজেই একজন হঠযোগী।

এক্সপ্যাণ্ডেড সিনেমা প্রসঙ্গে ইয়ংব্লাড যে অঙ্কপণ উচ্চাঙ্গ প্রকাশ করেছেন তাও প্রায় ধর্মের সমান হয়ে উঠেছে। তাঁর উপসংহারের শেষ পংক্তি হলো: এক্সপ্যাণ্ডেড সিনেমার শিল্প ও প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা এই মর্ত্যভূমিতেই স্বর্গ পত্তন করতে পারব।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : জীন ইয়ংব্লাড-এর এক্সপ্যাণ্ডেড সিনেমা ॥

## গান্ত রোবের্জ

॥ গান্ত রোবের্জ ॥

বিশ্ব শতাব্দীর প্রথম ভাগে জরমন চিত্রকলা / ভাস্কর্য / সাহিত্য / নাটক / ও চলচ্চিত্রের এক বিশেষ শিল্পশৈলী। বহির্কালের বদলে মানুষের অন্তঃসত্তাকে এই শৈলী বেশি ফোর দেয়। এর উদ্দেশ্য : objective expression to inner experience—'কোনো প্রতিক্রম থেকে তার সবচেয়ে ছোটক উপাদানটি ছেকে বার করে আনা : মনের মধ্যে জগতের যে প্রতিক্রম রয়েছে, তারই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অগভীর এক প্রতিক্রম রচনা।' এখানে মানুষ প্রায়ই চিত্রিত অতিপ্রাকৃত ও ভয়াল অলৌকিক শক্তির ক্রীড়নক হিসেবে। যেখানে বারবার আবির্ভাব ঘটেছে অসামাজিক ও সমাজবিরোধী চরিত্রের। চলচ্চিত্রে এক্সপ্রেসনিজম এনেছিল অভিনয়, শিল্প নির্দেশনা ও ক্যামেরার বিশেষ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ দি ক্যাবিনেট অব ড. ক্যালিগারি, নসফেরাতু, ফাউস্ট ও মেট্রোপলিস ছবিগুলি এবং ভিনে, ল্যাং ও মুরনাউ প্রমুখ পরিচালকরা। ১৯২৪-২৫ সনের পরেও জরমন চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এটি অন্ততম প্রধান ধারা হিসেবে উপস্থিত ছিল। পরবর্তীকালে ওয়েলস ও হিচককের ছবিতে এই শৈলীর কিছু কিছু উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। (ড. বাদ / ইজম)। কার্টুন ছবির ক্ষেত্রে এর প্রভাব আজও লক্ষণীয়।

॥ টমাস আলভা এডিসন ॥

(১৮৪৭-১৯৩১, মার্কিন আবিষ্কারক।) আইনস্টাইন বলেছিলেন, এডিসন হলেন পৃথিবীর সর্বকালের সর্বোত্তম আবিষ্কারক। চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন যন্ত্র-তিনি আবিষ্কার করেছেন, তাদের কর্মপদ্ধতিকে উন্নতও করেছেন, যেমন ক্যামেরা, ভিউয়ার, প্রজেক্টর। মোশন-পিকচার বা মুভি ফটোগ্রাফির পদ্ধতি আবিষ্কার

করা ও তাকে কার্যকর করার পেছনে তাঁর অবদানই সকলের চেয়ে ও সবচাইতে বেশি। তিনি ফিল্মের যে আকার নির্ধারণ করেন—৩৫ মি. মি., তা আজ পর্যন্ত প্রমাণ-আকার বলে স্বীকৃত। (ড্র. চলচ্চিত্রের ইতিহাস)। সমাজের বিশেষ অবস্থা ও পরিবেশে কোন্ জিনিশ কখন আবিষ্কার করা দরকার এ-সম্পর্কে তাঁর খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল। তাঁর নিজস্ব পরীক্ষাগার ‘আবিষ্কারের কারখানা’ এখন আমেরিকার অন্ততম জাতীয় দৌধ। ব্যক্তি হিসেবে এডিসন ছিলেন জটিল চরিত্রের মানুষ।

॥ জঁ এপস্ট্যা ॥

(১৮৯৭-১৯৫৩)। ফরাসি পরিচালক, আঁঁ গার্দ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ফ্রান্স যখন নাৎসিদের অধিকারে আসে তখন তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। কয়েকটি স্বরণীয় ছবি করলেও চিত্রপরিচালকের চেয়ে তাঁর বেশি খ্যাতি ফিল্ম-তাত্ত্বিক রূপে। Photogénie ও Cinema et cie নামক দুটি পত্রিকার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৯২১ থেকে ১৯৩৫-এর মধ্যে তিনি অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর মতে সিনেমা আসলে একটি অতিপ্রাকৃত বস্তু, যার অস্তিত্ব নেই তাকেই আমরা দেখছি। (ড্র. চলচ্চিত্র-সমালোচনা)। একদিকে তিনি আগস্ট লুমিয়ের-এর সঙ্গে সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন, অন্যদিকে এক সময়ে নিজের সহকারী হিসেবে পেয়েছেন বুল্‌য়েলকে। (ড্র. ফ্রান্স)। নিজের ছবি থেকে কাহিনীকে তিনি নির্ধারিত করেছিলেন।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : P. Leprohon-এর Jean Epstein ।

॥ স্পেশাল এফেক্ট ॥

প্রযুক্তিনির্ভর বিশেষ কলাকৌশল।

চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত সমস্ত ধরনের দৃশ্যবিভ্রম, ট্রিক ও ট্র্যানজিশনাল কৌশলকে (ড্র. সম্পাদনা) এক কথায় বলা হয় স্পেশাল এফেক্ট। এর মধ্যে শব্দগ্রহণের একাংশও অন্তর্ভুক্ত, যার নাম সাউণ্ড এফেক্ট। ক্যামেরার স্বাভাবিক কৌশলের বাইরের যে কোনো জিনিশ এফেক্টের মধ্যে পড়ে, যেমন—ডিজলভ, ফেড, ওয়াইপ (যার নাম অপটিক্যাল এফেক্ট); গ্লাস ও মাস্ক শট, ব্যাক ও ফ্রন্ট প্রজেকশন, মাল্টিপল প্রিন্টিং ও বিভাজিত স্ক্রিন, ইমেজ প্রতিস্থাপন ও মিনি ইমেজ (স্পেশাল এফেক্ট); ও বন্যা ভূমিকম্প ধ্বংসের মতো সাজানো দৃশ্য যাতে বিশেষ যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় (মেকানিক্যাল এফেক্ট)। অপটিক্যাল এফেক্ট ও স্পেশাল এফেক্ট

মূলত ক্যামেরা ব্যবহারের কৌশলে এবং ল্যাবরেটোরিতে ফিল্ম সম্পর্কিত প্রক্রিয়ায়।  
 আর মেকানিক্যাল এফেক্ট অর্জিত হতে পারে বিবিধ কৌশলে—এর মধ্যে আছে  
 মডেলের সাহায্যে দৃশ্যগ্রহণ ও ভ্রাম্যমাণ দৃশ্যপট নির্ভর কৌশল। নেগেটিভ-  
 উন্মোচনের সংবেদনশীলতা বাড়িয়ে ও প্রস্ফুটনের সময় বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ  
 করেও এফেক্ট তৈরি করা যায়। (ড. চলচ্চিত্রের টেকনোলজি)। সিনেমা  
 এফেক্টেই পর্দায় মায়াজাল সৃষ্টি করে। স্পেশাল এফেক্ট সেই বিভ্রমকেই গাঢ়  
 করে আনো।

॥ এম্যানুয়েল আঁথু এ উয়ম্যান ॥

ফ্রান্স, ১৯৬৬। রঙের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে খুব অল্পসংখ্যক রঙিন ছবিই  
 দাপ্তক শিল্পসৃষ্টি যেখানে রঙের ব্যবহার অপরিহার্য ছিল। এম্যানুয়েল আঁথু এ উয়ম্যান  
 এফেক্টের একটি সর্বাঙ্গিক রঙিন চলচ্চিত্র। একটা খুব আলতো প্রেমের গল্পকে উচ্ছল  
 দৃশ্যশৈলী, তীক্ষ্ণ সম্পাদনা ও চমৎকার অভিনয়ে ধরে রাখা হয়েছে। পরিচালক  
 রুদ লেনশকে অনেক দামী গ্যামার পত্রিকার বিজ্ঞাপন-ফটোগ্রাফার-ভুল্য বলে  
 সমালোচনা করেছেন, বলেছেন, এই ছবিতে তাঁর আঙ্গিক অলংকারবহুল, বিষয়  
 চৌলফটো লেন্সে যে ঘনিষ্ঠতা ধরা পড়ে সেই রকম অন্তরঙ্গতা। মনে করি এই  
 মত প্রাসঙ্গিক। হালিউডের কিছু প্রভাব থাকলেও, এই ছবির উচ্ছলতাকে স্মরণ বিষাদে  
 আর অন্তরঙ্গতাকে বিভ্রান্তি ও যন্ত্রণায় স্মৃতিভীক্ষণ করা, সময়ের ধারাবাহিকতা ভেঙে  
 দেওয়া এবং রঙের অনবচ্ছন্ন প্রয়োগে মুহূর্ত, মেজাজ, রস তৈরি করা সবই আধুনিক  
 ও শিল্পিত প্রয়াস। ছবি শেষ হওয়ার পরও অনুরণন থেকে যায়।

ইন্টরম্যানকালার, অভিনয়ে Anouk Aimee, J. L. Trintignant; কানে  
 প্রথম ছবির মুগ্ধ পুরস্কার ও উল্লেখযোগ্য বিদেশি ছবি রূপে দুটি অস্কার।

॥ এলিপাথাইয়াম ॥

(ড. দি স্যাট ড্র্যাপ)

॥ ওকা উরি কথা ॥

ভারত, ১৯৭৮। প্রেমচাঁদের কাহিনী অবলম্বনে মৃগাল সেনের অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য  
 ছবি। রাজনৈতিক শিল্পী যদি মান্নাবাদী হন, তবে সমস্যার মূলে পৌঁছতে তার  
 সামাজিক বিচার করেন, রাজনীতিকে অর্থনীতি দিয়ে বিচার করেন। ছবিতে

সামাজিক চরিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তারপর তার বিচার হয় অর্থনৈতিক। ওকা উরি কথার পটভূমি গ্রাম, কাহিনী শোষণের, শোষণের যন্ত্র শ্রম এবং লক্ষ শ্রমিক। ছবির নায়ক ভেঙ্কায়। একজন শ্রমিক—কৃষিশ্রমিক বা দাসশ্রমিক নয়, স্বাধীন শ্রমিক। একজন মুক্ত শ্রমিক, যে সমাজের যাবতীয় আচার থেকে বিচ্ছিন্ন অথচ মুক্ত সেক্ষেত্রেই সেক্ষেত্রে সে সমাজের কাছে প্রয়োজনীয়। আধা সামন্ততান্ত্রিক যে সামাজিক অবস্থায় সে বাস করছে সেখানে বসে সে কী করে কোনো অর্থনৈতিক বিচার বা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করতে পারে? হয়তো পারে না যদি সে একজন শ্রমিক মাত্র হয়। এখানে ভেঙ্কায়ার অতিরিক্ত আর এক বিশেষণ আছে, সে সর্বহারার। অভিজ্ঞতা দিয়ে তার মতো একজন লক্ষ্য করতে পারে বঙ্কনার ইতিহাস, সে বুঝতে পারে তারই শ্রমের মুনাফা লুটছে মালিক। অর্থাৎ শ্রমিকের শ্রম থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে পুঁজি। স্বাভাবিক, শোষণের এই কুৎসিত-রূপ ভেঙ্কায়ার ধরে ফেলেছে। শোষণের যে রহস্যের কথা তার মুখে তা এই গল্পের শরীর—সেটা আগে থেকেই ছিল। পরে যেটা আসছে সেটাই আসল অর্থাৎ প্রতিবাদ। যতই চলে শোষণ, ততই প্রতিবাদের নতুন নতুন পরিকল্পনা এঁটেছে ভেঙ্কায়ার। প্রতিশোধের। ব্যঙ্গ বিক্রম গ্লেশ, সাময়িক সমঝোতা সব নিয়ে তার লড়াইয়ের কৌশল। শোষণের প্রচণ্ডতা যত বেড়েছে, ক্রমশঃ তার শ্রেণী বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে ভেঙ্কায়ার। সমাজের বিধিনিষেধ ততই ভেঙেছে সে। সমস্ত নীতিবোধ সংস্কার এক এক করে ঝেড়ে ফেলেছে চরিত্র থেকে। সমাজের বুনিয়াদের গোড়ায় শেষ আঘাতটা হানে সে সংস্কারের জন্তু ভিক্ষা করা পয়সায় মদ খেয়ে। ছবির শেষ দৃশ্যে তার হাতের মুঠোয় পয়সা, 'মা পণ্যের প্রতীক', যার ভেলকিতে জমে উঠেছে পুঁজি, এসেছে বৈষম্য। অর্থনীতির ক্রীড়নক এই মুদ্রাকে হাতের মুঠোয় পেয়ে সে তার অভিযোগগুলি জানায়। মাত্র তিনটি আর্ত দাবি তার : ভ্রম, বস্ত্র, বাসস্থান। এই তিনের স্বস্থ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে সে চায় সামান্য কিন্তু মহৎ আরো কিছু—ভালোবাসা, প্রিয়জনের পরমাণু, এইভাবে ভেঙ্কায়াকে দিয়ে ওকা উরি কথায় সমাজের যে ব্যাখ্যা করানো হয়েছে তা একটি গ্রামের পর্যায়ে না থেকে সমগ্র শোষিত সমাজের প্রতীক হয়ে ওঠে, ভেঙ্কায়ার সে সমাজের বিরুদ্ধে এক জীবন্ত অর্থনৈতিক প্রতিবাদ।

ইন্স্ট্যানকালার, অভিনয়ে বাসুদেব রাও (ভেঙ্কায়ার), আলোকচিত্র কে. কে. মহাজন, সম্পাদনা গঙ্গাধর নন্দর ।

ঈশ্বর চক্রবর্তী

॥ ওয়াই ওজু ॥

( ১৯০৩-১৯৬৩, জাপান )। তাঁর চিত্রজীবনের সূচনা সহকারী পরিচালক রূপে। টেলিথ্যাগফ ছবির মধ্যে আছে লেট শ্রিঙ, দি ফ্লেভার অব গ্রীন টি এণ্ড রাইস, দি টোকিও স্টোরি, টোকিও টুইলাইট, গুড মনিং, ফ্লোটিং উইডস, আলি অটাম, এ্যান আটাম আফটারনুন, ইত্যাদি।

আপানে যে কয়জন ভিন্নধর্মী প্রতিভাবান চিত্রপরিচালক আছেন তাঁর মধ্যে ওজু ওয়াই ওজু পঞ্চাশটির বেশি ছবি করেছেন। তার মধ্যে গোটা তিরিশ ছবির ছাপশ পাওয়া যায়, বাকিগুলো নিখোঁজ। ওজুকে বলা হয়েছে ‘জাপানি ছবি নির্মাণীদের মধ্যে সবচেয়ে জাপানি’। [ কুরোশাওয়াকে সবচেয়ে আধুনিক বললে সবচেয়ে সনাতনী বলতে হয় ওজুকেই। আর এই দুজনের মাঝামাঝি মিজোগুচির অবস্থান। ] জাপানি ঐতিহ্যের প্রতি ওজুর অকৃত্রিম বিশ্বাস। যুদ্ধোত্তর পারম্পরিক জীবনে বিদেশি প্রভাবে প্রভাবিত সমাজ-ব্যবস্থা ও অতি আধুনিক শিল্পের উন্নতি এদিকটি সমাজকে তুলে ধরার সাথে সাথে পশ্চিমী সমাজের প্রতি যে কটাক্ষ তিনি করেছেন তার ছাপ এই কয়টি ছবিতে বেশ লক্ষ্য করা যায়, যাঁদের তিনি এই কটাক্ষ করেছেন অত্যন্ত সংযতভাবে। নো-ও থিয়েটারও ওজুকে দৃষ্টিগোচরে পেঁচানো করেছেন বলে কেউ কেউ মনে করেন। ওইরকমই একটা গৌরবময় গতি ওজুর সারা ছবি জুড়ে থাকে বলে মনে হয়। এ সম্বন্ধে তাঁর ছবির চরিত্রগুলি, তাদের অভিনয়, শট বিভাজন, সম্পাদনার চং এবং সর্বোপরি দৃশ্যের উপস্থাপনা—সব মিলিয়ে একটা অনবদ্য মানবিক আবেদন ফুটিয়ে তোলে। নো-ও থিয়েটারে একঘেয়ে ধীর চালের তালের আকর্ষণের মতো ওজুর ছবিতে মানবিক আবেদনের আকর্ষণ অসাধারণ। ওজুর ছবির গতি অতি মন্থর। সব কিছু যেন খটে চলে একটা ধরা বাঁধা তালে। এটা যেন জাপানি জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য। প্রথম থেকেই যে দুটো জিনিস দর্শকের চোখে পড়ে তার একটি হলো ক্যামেরা গুভমেন্টবিহীন শট। অর্থাৎ প্রত্যেকটি শট স্থির। ক্যামেরা নড়ে না। অপরটি হলো ছবির প্রতিটি শট একটা নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে নেওয়া। ( ড্র. সিটিজেন কেন )। ওজুর অধিকাংশ ছবিরই বক্তব্য পারিবারিক জীবনকে ঘিরে। পরিবার হচ্ছে সমাজের কেন্দ্রবিন্দু। কাজেই পারিবারিক বিচ্ছেদ করে দেয় সমাজকে বিক্ষিপ্ত। এর জন্য প্রধানতঃ দায়ী পশ্চিমী জীবনবোধ। একাধিক ছবিতে পরিচালক একথা বলেছেন। ওজু বলেছেন—‘Japanese are as they are’

and this is how they act.' ওজুর ছবিতে মহুয়া চরিত্রের সবদিকগুলিকে অসাধারণভাবে ধরে রাখা হয়েছে। তেমনি আঙ্গিকের দিকেও ওজুর বেশ বোঁক। সম্পাদনার ঢং ও ধরা বাঁধা ফ্রেম থেকে এটা বেশ বোঝা যায়। এ ছাড়া আছে একই ধরনের কাটের বরাবর ব্যবহার এবং খালি ফ্রেম। এই ধরনের কাটের ব্যবহারে একটা নতুন আঙ্গিকের ঢং লক্ষিত হয়। সেইরকম খালি ফ্রেম যেন ওজুর ছবির নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টির কাজে একটা অচ্ছেদ্য অঙ্গ। এক এক সময় কম্পোজিশন-গুলি অত্যন্ত নির্দয় মনে হয়। ফ্রেমের মধ্যে হয় কোনো টেবিলের একটি অংশমাত্র দেখা যাচ্ছে নয় কোনো পাত্রপাত্রী এমনভাবে এসে দাঁড়াবে তার শরীরের উর্ধ্বাংশ হয়তো অর্ধেকের বেশি দেখা যাবে না—চরিত্র ফ্রেম থেকে বের হয়ে চলে গেছে বেশ কিছুক্ষণ, ফ্রেম একেবারে খালি তারপর চরিত্র এসে চুকছে—এই জিনিসগুলি ওজুর ছবিতে প্রায়শঃ ও ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহৃত। এ ছাড়া আছে দীর্ঘস্থায়ী শট। ওজুর পাত্রপাত্রীদের অভিনয় এক কথায় নির্ভুল বলা যেতে পারে। কোনো চরিত্রকে কোনোভাবেও নাটকীয় করা হয়নি—কেবল সংলাপ ও আচার ব্যবহারের সাহায্যে তাদের চরিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। চরিত্রগুলি যেন পরিবেশ-সৃষ্ট। তাঁর মনতাজ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তিনি প্রথমে একটি দৃশ্যের চরিত্র থেকে তীক্ষ্ণ কাট করে অত্র দৃশ্যের পরিবেশ ও সেটে আসেন তারপর ঐ সেটের চরিত্রদের ফ্রেমে ধরেন। ওজু নাটকীয় প্লটে বিশ্বাস করেন না বলেই তাঁর ছবিতে নাটকীয় উত্তেজনাও চোখে পড়ে না। শট কম্পোজিশনের মধ্যে একটা স্থিরচিত্রের গুণের আভাষ থাকে যা অনেকটা পেইন্টিং-এর মতো দেখতে মনে হয়। ওজু 'তুলনাকে' এক একটি দৃশ্যে অনির্বচনীয় করে তুলেছেন যেমন ঘরের ভিতর আধুনিক আসবাব-পত্র অথচ জীবনযাত্রা সেরকম পুরানো ধাঁচে রয়ে গেছে যেন একটা মানসিক সংঘর্ষ। জাপানের জাতীয় ইতিহাসে একটা জঙ্গি বোঁক লক্ষ্য করা যায়—(ওজু নিজের সামরিক বাহিনীতে বেশ কয়েক বছর কাজ করেছেন) কিন্তু তার শিল্প ও সংস্কৃতির মধ্যে একটা প্রশান্তি সব সময় লেগে থাকে। শিল্প সংস্কৃতির এই প্রশান্তি বোধ হয় ওজুকে সব চেয়ে বেশি প্রভাবান্বিত করেছে তাই তাঁর ছবির মধ্যেও সেই প্রশান্তির ছোঁয়াচ আঁঠে পৃষ্ঠে লেগে আছে, এটাও ওজুর আঙ্গিকের অগ্রতম লক্ষণ হতে পারে। [বস্তুত তাঁর ছবিতে, আমরা ইংরেজিতে যাকে বলি রিচুয়া-লিষ্টিক অ্যাপ্রোচ, তার প্রমাণ রয়েছে। তাঁর চলচ্চিত্র বিশুদ্ধ সিনেমা যাতে তিনি জোর দেন সিনেমাটিক সারসংক্ষেপের ওপর। হয়তো ড্রেয়ার বা ব্রেস্ট-র সঙ্গে তাঁর

মিল খোঁজা যেতে পারে। ভারতীয় চিত্রপরিচালক যশি কাউলের ছবিতে তাঁর প্রভাব আছে।]

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : ডোনাল্ড রিচির ওজু : হিজ লাইফ এণ্ড ফিল্মস ॥

ধীরেশ ঘোষ

॥ ম্যাক্স ওফুলস ॥

(১৯০২-১৯৫৭)। ওফুলস জন্মস্থলে জরমন্, যিনি কর্মজীবনে শুরু করেন সাংবাদিক রূপে, পরে মঞ্চাভিনেতা ও নাট্যপরিচালক হন। তিরিশের দশকে তিনি নাৎসি জর্মনী থেকে ফ্রান্সে চলে আসেন। চিত্রপরিচালক হিসেবে ছবি করেছেন জর্মনী ফ্রান্স হল্যান্ড ইতালি ও হলিউডে। উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে আছে *Une Histoire d'Amour* (১৯৩৩)—তাঁরই একটি জর্মন ছবির ফরাসি রূপান্তর, লেটার ফ্রম অ্যান আননোন ডায়ান (১৯৪৮), *La Ronde* (১৯৫০), *Madame de...* (১৯৫৩), *Lola Montes* (১৯৫৫)। ওফুলসের খ্যাতি তাঁর ছবির বিষয়-বস্তুর জ্ঞান যতটা তার চেয়ে বেশি আঙ্গিকগত সমৃদ্ধির জ্ঞান। শিল্পী হিসেবে তিনি ডেলেন প্যাবলিকতাবাদী বা ছাচারালিষ্টিক। তাঁর আঙ্গিকে হয়ত অলংকারিতা ছিল, ছিল শিল্প নির্দেশনার বিশেষ ভূমিকা, কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কথা, ছিল দীর্ঘ ট্র্যাকিং শটের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে উঠে আসা চমৎকার ফিল্ম মুভমেন্ট যে চলচ্চিত্র-ময়তা তাঁকে বড়ো চিত্রপরিচালক করেছে। (ড. ফ্রান্স)।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : রিচার্ড রাউডের ম্যাক্স ওফুলস ॥

॥ ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স ॥

স্বাভাবিক দৃষ্টিক্ষেত্রের চেয়ে বেশি কোণিক ক্ষেত্র যে লেন্সের সাহায্যে ধরা পড়ে তাকে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স বলে। *Wide angle converter lens system* গ্যালিলিও-র টেলেস্কোপ কনভার্টার পদ্ধতির বিপরীত, অর্থাৎ অপটিক্যাল ম্যাগনিফিকেশন এখানে একের কম। ফলে ফোক্যাল লেন্থ ছোট। এই ছোট ফোক্যাল লেন্থের (স্বল্প ফোকাস দৈর্ঘ্যের) লেন্সকেই ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স বলা হয়। ১৮ মি. মি. ও ২৫ মি. মি. লেন্স সাধারণতঃ এর আওতায় পড়ে। এর ব্যবহার যেমন অ্যাঙ্গেল অব ভিশনকে বাড়িয়ে দেয় তেমনি এই লেন্সের ফোকাস ক্ষেত্রের গভীরতাও খুব বেশি হয়। (ড. লেন্স)। চলচ্চিত্রে এই লেন্সের ব্যবহার, নাটকীয় সংঘাত তৈরির জন্ম এক ফ্রেম থেকে কেটে অন্য ফ্রেমের উপাদানে যাবার প্রচলিত পদ্ধতির

বদলে, ফ্রেমের দৃশ্যপরিধি বাড়িয়ে একই ফ্রেমের মধ্যে বিভিন্ন উপাদানকে সংহত করতে পেরেছিল। এর অসাধারণ ব্যবহার আছে সিটিজেন কেন ছবিতে।

## ॥ ওয়াইপ ॥

দিনেমার পর্দার ওপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে একটি রেখা চলে যাওয়ার ফলে আগের দৃশ্যের প্রস্থান ও নতুন দৃশ্যের আগমনকে ওয়াইপ বলে। এই রৈখিক দৃশ্যান্তর নানা ডিজাইনের হতে পারে। ( দ্র. সম্পাদনা )। চলচ্চিত্রে এর ব্যবহার দ্রুপ্তি কমে গিয়েছিল। কিন্তু আজকাল টিভি ও ভিডিওতে এর ব্যাপক ব্যবহার ঘটছে।

## ॥ ওয়াইল্ড স্ট্রবেরীজ ॥

১৯৫৭, সুইডেন। বার্গম্যানের ছবিগুলিকে মোটের ওপর তিনটে শ্রেণীতে ভাগ করা যায়— ১. চেম্বার ড্রামা ২. জার্নি ফিল্ম ৩. ১ ও ২-এর এক সমন্বয়। ওয়াইল্ড স্ট্রবেরীজ সম্ভবত দ্বিতীয় ভাগে পড়বে। এই ছবির নায়ক আটাত্তর বছর বয়নের এক বৃদ্ধ, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসাবিজ্ঞানী বর্গ। অধ্যাপক বর্গ তাঁর গাড়ি করে বাড়ি থেকে দূরের শহরে যাচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি গ্রহণ করতে, এই যাত্রা নিয়ে ওয়াইল্ড স্ট্রবেরীজ। ছবির কাহিনীর সময় ভোর থেকে রাতের প্রথম প্রহর অবধি। দৃশ্যগতভাবে বাস্তব, স্মৃতি ও স্বপ্নের এক মিশ্রণ, থিম নিঃসঙ্গতার। যাত্রার সময়টুকুতে বর্গ তাঁর অহংকার, আত্মকেন্দ্রিকতা ও অহুত্ব-হীনতার আত্মসমীক্ষা করেন, বার্গম্যান করেন বর্গের সমীক্ষা আর দর্শক এই দুটি সমীক্ষার বিশ্লেষণ করেন, এইভাবে আমরা ত্রিমাত্রিক সমীক্ষণ পাই। যে নিঃসঙ্গতার কথা বলেছি শুধু বর্গ নন, তাঁর স্ত্রী, মা, পুত্র, পুত্রবধু সকলেই তার শিকার। একই যত্না, বিচ্ছিন্নতা, অসহায়তা, যা আধুনিক প্রযুক্তি-সভ্যতার লক্ষণ। যথেষ্ট সাহিত্য ও প্রতীক নির্ভরতা সত্ত্বেও ( এই ছবি স্ট্রিওবার্গের ড্রীন প্লে দ্বারা কিছুটা অনুপ্রাণিত। গুস্ত বা মুলিসিসের আঙ্গিকের ছাপও আছে এই ছবিতে। ) শব্দ-আলো-ছন্দ, শাদা-কালো আলোকচিত্র ও অসাধারণ মুখাভিনয়ের দিনেমাটিক ব্যবহারের ফলে ছবিটি সম্পূর্ণ চলচ্চিত্রও। ছবির শেষ স্বপ্নদৃশ্য ( বর্গের স্বর্গতঃ পিতা ও মাতার যৌবনকালের একটি ঘটনা নিয়ে ) শান্তিময়, কয়েক যুগ ব্যাপী অপ্রীতি, তিক্ততা ও গীতলতার শেষে যেন বর্গের মনে প্রেম, শান্তি ও আত্মোপলব্ধির কবোক্ষ তাপ এসে লাগছে। পরিবর্তনই জীবন। বার্গম্যানের চিত্রনাট্যে চলচ্চিত্রায়িত বেস্ট ইন্সটেনশন্স ছবির বীজ যেন রয়ে গিয়েছিল এই দৃশ্যেই।

অভিনয়ে ভিষ্টর সীফ্টম (বর্গ), ইনগ্রিড থুলিন, বিবি অ্যানডারসন ; আলোক-চিত্র G. Fischer, সম্পাদনা O. Rosander ।

বার্লিনে শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কার, ১৯৫৮ ; আমেরিকার জাতীয় বোর্ড অব রিভিউয়ের শ্রেষ্ঠ বিদেশি ছবির পুরস্কার, ১৯৫৯ ॥

॥ অরসন ওয়েলস ॥

( জন্ম ১৯১৫, আমেরিকা ) । শৈশবকাল থেকেই ওয়েলসের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেছে, তখনই তিনি কবিতা লিখতেন, কার্টুন আঁকতেন, পিয়ানো বাজাতেন, ম্যাজিক দেখাতেন, মঞ্চস্থ করতেন শেক্সপিয়ারের নাটক । আর একটু বড়ো হয়ে তিনি কর্মজীবন শুরু করলেন সাংবাদিক রূপে, মঞ্চাভিনেতা হলেন, নাট্যপরিচালক । উনিশ বছর বয়সে বিয়ে করলেন, ষই বছরই তাঁর প্রথম স্বল্প দৈর্ঘ্য চিত্র পরিচালনা করলেন । এই বালক প্রতিভা তাঁর প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্য ছবি নির্মাণ করলেন ১৯৪১য়ে, সিটিজেন কেন, যা আজ পর্যন্ত যে কোনো পরিচালকের প্রথম ছবি হিসেবে সর্বশ্রেষ্ঠ ছবি, পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ছবিগুলির একটি, যা পছন্দ নতুন পরিচালককে দশকে-দশকে অনুপ্রাণিত করেছে । কেনের বিষয়বস্তু শিল্পীর বিচ্ছিন্নতা যা কালোত্তীর্ণ দৃশ্যশৈলী আর শব্দ ও অভিনয়ের বিশিষ্ট প্রয়োগের মধ্য দিয়ে চিত্রায়িত হয়েছে । দৃশ্যশৈলীর মধ্যে পড়ছে আলোকচিত্রী টোল্যাণ্ডের ওয়াইড অ্যাপেল ও ডিপ ফোকস লেন্সের ব্যবহার যা নাটকীয় সংঘাত তৈরির জন্য এক ফ্রেম থেকে কেটে অন্য ফ্রেমের উপাদানে যাবার প্রচলিত পদ্ধতির বদলে ফ্রেমের দৃশ্য-পরিধি বাড়িয়ে একই ফ্রেমের মধ্যে বিভিন্ন উপাদানকে সংহত করে । শব্দ-প্রয়োগের মধ্যে পড়ছে একটি সংলাপের ওপর আর একটি সংলাপকে এনে ফেলা । আর আলোকসম্পাতের মধ্যে পড়ছে শাদা/কালো, আলো/ছায়ার তীব্র বৈপরীত্য যা অভিনয়কে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে । তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও ইউনিটের আর সকলের তা মেনে নেওয়ার প্রমাণ কেনের সর্বান্তে । তাঁর পরের আর কোনো ছবিই কেনের ধারে-কাছে আসেনি । সেসব ছবির মাত্র অংশবিশেষে অসাধারণত্বের ছাপ আছে, সমৃদ্ধির পাশেই রয়ে গেছে দৈন্ত, যে প্রত্যাশা প্রথম ছবিতে তিনি জাগিয়েছিলেন তা আর পূর্ণ করেননি, পূর্ণ হয়নি । পরে হয় টাকার অভাবে তাঁর ছবির গতি ভীষণ ব্যাহত হয়েছে ( ওথেলো ), নয়তো আকস্মিক প্রয়োজনে ছবির কাজ শেষ করতে হয়েছে অতি দ্রুত ( ম্যাকবেথ ) ; হয় ছবি ঘোষিত হয়েছে কিন্তু শুরু হয়নি, নয় ছবি শুরু হয়েছে কিন্তু তিনি শেষ করেননি ;

হয় ছবি বাণিজ্যিকভাবে ব্যর্থ হয়েছে, নয় শৈল্পিকভাবে অসফল। কেনে যেন তাঁরই ভবিষ্যৎ জীবনের বিচ্ছিন্নতার ক্ল্যাশ ফরোয়ার্ড ঘটেছে। বস্তুতঃ তাঁর পরবর্তী সমস্ত শিল্পায়াস কেনের-ই প্রসারণ বা রূপভেদ। দি লেডি ফ্রম সাংহাই ছবিতে তাঁর এই প্রাপ্তবয়স্ক হতাশা, দ্বিতীয় স্ত্রী রীতা হেওয়ার্থ-এর সঙ্গে বিবাহিত জীবনের তিক্ততা ও তাঁর নারীবিশেষ/নারীত্বিত্তির ছাপ পড়েছে। এই বিষ্ময় শিশু, বালক প্রতিভা, ক্ষুদ্র প্রাপ্তবয়স্ক গুণ ছবিতে নয়, নিজের জীবনেও দেখিয়েছেন কীভাবে প্রত্যাশা/কল্পনার স্থানে চলে আসে কঠোর বাস্তব, আর কল্পনার সাথে তখন তার ফারাক হয় কত দ্রুত। এই প্রসঙ্গে মনে পড়তে পারে ঋষিককেও। নিয়মাবদ্ধ চলচ্চিত্র জগতে দীর্ঘদিন ধরে শৃঙ্খলা মেনে কাজ করার মানসিকতা এঁদের ছিল না। ওয়েলস; ক্যারল রীড, হান্টন, পাসোলিনি, জিম্ম্যান, Clement, শ্চাবল প্রমুখের ছবিতে অভিনয় করেছেন। পরিচালিত ছবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য দি স্ট্রেঞ্জার (১৯৪৬), ম্যাকবেথ (১৯৪৮), ওথেলো (১৯৫২), টাচ অব ইভলু (১৯৫৮), এফ ফর ফেক (১৯৭৫)।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : C. Higham-এর দি ফিল্মস অব অরসন ওয়েলস ॥

## ॥ ওয়েস্টার্ন ছবি ॥

ওয়েস্টার্ন ছবি একান্তভাবেই একটি মার্কিন চিত্র-জাতি এবং বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাসে হলিউডের অচ্যুতম অবদান। তবু ১৯৫৭ সালে অঁদ্রে বাজঁ্যা যা লিখে-ছিলেন তা আজও দুর্ভাগ্যক্রমে সত্য : ‘ওয়েস্টার্ন ফিল্ম আজও সবচেয়ে ডুল-বোঝা ছবি’। ওয়েস্টার্ন ছবিকে যথোচিত গুরুত্ব দিতে এখনো অনেকেই নারাজ।

ওয়েস্টার্ন ছবিকে কেন ডুল বোঝা হয়, এবং তাকে কেন সচরাচর যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হয় না, তার কারণ খুব তুচ্ছ নয়। যেহেতু ওয়েস্টার্ন ছবিতে বিধৃত মিথ বা অতিকথা এখনো অনেকের মানসিকতার খুবই কাছাকাছি, তাই তাঁদের পক্ষে এই জাতীয় ছবি বিশ্লেষণ করে দেখা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই লোকে ওয়েস্টার্ন ছবিকে নিছক বিনোদনের ছবি হিসেবে ধরে নিয়ে নিশ্চিত বোধ করে।

পৃথিবীর অনেক দেশে ওয়েস্টার্ন ছবির জনপ্রিয়তা থেকে প্রমাণ হয় যে, এই শ্রেণীর ফিল্ম এমন একটি জগৎ সৃষ্টি করে যার আবেদন সর্বজনীন। অথচ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই শ্রেণীর ছবি আমেরিকার ইতিহাসের সঙ্গে, বিশেষত ১৮৬০-১৮৯০ সালের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। কিন্তু কয়েকটি সাম্প্রতিক ওয়েস্টার্ন ছবি এখনকার আমেরিকার নানা সংস্কারের গভীরে প্রবেশ করেছে। বিশেষ করে স্লাম

পেকিনপা-র ছবি দেখে মনে হয়, এই জাতের ছবিতে আবার প্রাণ দণ্ডার করা সম্ভব। তাছাড়াও আশ্চর্যের কথা এই যে, হলিউডের বিশাল কাঠামো যখন ভেঙে পড়ছে, তখনই কয়েকটি চিত্তাকর্ষক ওয়েস্টার্ন ছবি তৈরি হয়েছে, যেমন : 'দ প্রোফেশনল্‌জ্', 'টু গ্রিট', 'বুচ ক্যান্ডিডি অ্যাণ্ড দ সানডান্‌স্ কিড', 'দ ওয়াইল্ড্ বান্ধ', 'দ ব্যালাড অব কেব্‌ল্ হোগ'।

সম্ভবত শতকরা পঁয়ত্রিশটি আমেরিকান ছবিই ওয়েস্টার্ন। লিউইস হারমান-এর মতে, বহু বছর ধরেই দেখা গেছে, কম খরচে তৈরি যে-কোনো ওয়েস্টার্ন ছবিই শতকরা পঞ্চাশ ভাগ মুনাফা করে। 'এল ডোরাদো', 'দি ওয়ার ওয়াগন', 'দি ওয়েস্ট'-এর মতো কয়েকটি সাম্প্রতিক ওয়েস্টার্ন ছবির অত্যন্ত তিজ্র এক সমালোচনায় ১৯৬৭ সালে পল্লী কায়ল বলেন, এই ছবির ব্যবসায়িক বিস্তার টাকালাত হয়। তিনি লিখেছেন : 'আদি ওয়েস্ট ছিল এক স্বপ্নরাজ্য যার মূল্যবোধের কেন্দ্রে ছিল পৌরুষধর্ম। পুরনো ওয়েস্টার্ন ছবির নায়কদের জীবনাদর্শের তেমন কোনো তাৎপর্যই নেই আজকের দর্শকমণ্ডলীর কাছে। ওয়েস্টার্ন ছবির কাহিনী তাদের পুরনো আচারের সেই আদল হারিয়ে ফেললেও তাদের মধ্য দিয়ে পুরনো ওয়েস্টার্ন ছবির তারকারা যখন লড়াই করে চলেন তখন তারাই যেন এক নতুন অর্থপূর্ণ আচারের জন্ম দেন। এক্ষেত্রে কোনো স্বপ্নবিলাস নেই। এইসব অভিনেতারিা চিত্রতারকায় পরিণত হয়েছেন, এবং সারা বিশ্বের দর্শকদের মুগ্ধ করে রেখেছেন। সাম্প্রতিক কালের অন্তঃসারশূন্য ওয়েস্টার্ন ছবি দেখতে যে দর্শকরা ভিড় করেন তার মূলে আছে এই অভিনেতাদের আকর্ষণী ক্ষমতা। যখন তার থেকেই মুনাফা আসতে থাকে, তখন আর তা কেবল তাদের ব্যক্তিগত কল্পনাবিলাসের স্তরে বাধা থাকে না। যখন নায়কদের কেবলমাত্র চিত্রতারকা ছাড়া আর অন্য কোনো ভূমিকায় বিশ্বাসই করা যায় না, তখন বোঝা যায় একটা শিল্পরূপ কত দূর বিকৃত হয়েছে।'

ওয়েস্টার্ন-এর দীর্ঘায়ুর পিছনে নিশ্চয়ই মুনাফার দান আছে। কিন্তু সেটাই তার প্রধান কারণ নয়। জন পের্রি-র মতে, 'দ কভারড্ ওয়াগন' ( ১৯২৩ ) ছবির মুক্তির আগের বছর মাত্র পঞ্চাশটি ওয়েস্টার্ন তৈরি হয়েছে। ঐ ছবিটির বিপুল সাফল্যের পরই তার পরের বছরই তৈরি হয়েছিল প্রায় দেড়শোটি ওয়েস্টার্ন ছবি। প্রথম যুগের ওয়েস্টার্ন ছিল সরল এবং ঐকান্তিক ; এবং হার্ট ও দিক্‌স্-এর মতো অভিজ্ঞ 'কাউবয়'-রা সেগুলি তৈরি করেছিলেন। সেই সময়ের ওয়েস্টার্ন ছবিতে

এখনকার দর্শকরা মোটরগাড়ির উপস্থিতি দেখে অবাক হন। আদি ওয়েস্টার্ন-এর বাস্তবতারই অঙ্গ ছিল এই মোটরগাড়ি। কিন্তু আদি ওয়েস্টার্ন-এর বাস্তবতা ছিল স্বপ্নায়ু। হার্ট এবং অংকো বিলি-র পরে এলেন গাইয়ে কাউবয়রা—রজার্স এবং অট্টে। এঁদের ছবি ছিল কম বাস্তব। পরবর্তীকালে তৈরি হয়েছিল শত শত দ্বিতীয় শ্রেণীর ওয়েস্টার্ন—যাদের বলা হত ‘বি ক্লাস’ বা দ্বিতীয় শ্রেণীর ছবি। কিন্তু ঐ একই সময়ে জেম্‌স্‌ ক্রুজ (‘দ কভারড্‌ ওয়্যাগন’) ও জন ফোর্ড-এর (‘দ আয়রন হর্স’, ১৯২৪) মতো প্রতিভাবান শিল্পীরা এই জঁর বা জাতের ছবির শ্রেষ্ঠ প্রথাগুলি উদ্ভাবন করছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ দিকে ওয়েস্টার্ন ছবির জনপ্রিয়তা পড়ে যায়। তবু এই সময়ে সামান্য যে কটি ওয়েস্টার্ন তৈরি হয়েছিল তাদের মধ্যে এমন একটা পরিণত দৃষ্টির ছাপ ছিল যাতে এই জাতের ছবির চিরকালীনতার সপক্ষে একটা যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু ওয়েস্টার্ন ছবিতে নতুন উপাদানের অল্পপ্রবেশ ঘটলে তাকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াস চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছয় ‘হাই নুন’ ও ‘শেন’ ছবিতে। ‘হাই নুন’ (১৯৫২) ছবিতে কিছু সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির যে-বিশ্লেষণ আছে, তা এই জাতীয় ছবির লক্ষণ-বহির্ভূত। ছবিটির মধ্যে একটি সামাজিক মাত্রা এসেছিল চিত্রনাট্যকার কার্ল ফোরম্যানের আগ্রহেই। যেহেতু ওয়েস্টার্ন-এর সৌন্দর্যের উৎস নিহিত-রয়েছে তার অতিকথা-পুরাণের স্বতঃস্ফূর্ততা ও আত্মসচেতনতাবিহীন প্রকাশের মধ্যে, যেহেতু তার পুরাণ সমুদ্রনীরে লবণের মতোই তার মধ্যে সম্পূর্ণ বিলীন, তার অতিকথাকে আলাদা করতে যাওয়া পণ্ড্রম মাত্র। এই প্রচেষ্টা তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ, এবং শেষ পর্যন্ত যা প্রকাশ করে তাকেই বিনাশ করে। যাই হোক অনতিকালের মধ্যেই ওয়েস্টার্ন তার স্বতঃস্ফূর্ততা ফিরে পায়, এবং বহুসংখ্যক ওয়েস্টার্ন ছবি এই জাতের ছবির নকল বাস্তবতা আশ্রয় করতে থাকে। ষাটের দশকের শেষ দিকে ওয়েস্টার্ন ছবি একঘেয়ে হয়ে পড়ে। লী মারভিন, জ্যাক প্যালান্স্‌ ও জন ওয়েন-কে দেখলেই বড়ো ক্লাস্ত মনে হয়। ওয়েন চল্লিশ বছর ধরে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন...

কম খরচে তোলা সাদাসিধে ওয়েস্টার্ন ফিল্ম-ই হোক, আর মিউজিকাল বা ব্যয়বহুল ছবিই হোক, ওয়েস্টার্ন ছবি মাত্রেই কয়েকটি বাঁধাধরা চরিত্র ও পরিবেশ থাকবেই : ভালো শেরিক, গুধরে যাওয়া বন্দুকবাজ, পলাতক প্রতিপক্ষ বা হারানো প্রেমিকার সন্ধানে অভিযানরত নায়ক, সোনা বা গুপ্তধনের সন্ধানে দুর্গম অঞ্চলে একদল অভিযাত্রী, অশ্বারোহী বাহিনীর সঙ্গে রেড ইণ্ডিয়ানদের লড়াই, গবাদি

পশুর পালকদের সঙ্গে খামার-বসতির মানুষদের লড়াই। এইসব চরিত্রেরা দ্বরত সব ঘটনায় অংশ নেয়, আর সেই ঘটনা থেকেই গড়ে ওঠে সিনেমা। ধাবমান ঘোড়া ও গবাদি পশু, প্রবহমান বর্না ও নদী, প্রবল ঘুসোঘুসি, বিস্তীর্ণ দৃশ্যপট বা ছোটো শহরের পটভূমি, শিবিরে উন্মুক্ত মাঠে আঙনের ধারে উদ্দাম নৃত্য বা রোমাটিক গান, মদের আড্ডায় আবেগের বিস্ফোরণের সম্ভাবনা, রুক্ষ পাহাড়ী নিসর্গ বা সবুজ প্রান্তর—এই সবই সিনেমার উপযুক্ত বিষয়। সবাই জানে এসবই এক অবাস্তব জগতের বাস্তবতা। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি দৃশ্যপটই দর্শকের পরিচিত। দর্শক জানেন কে কেমন লোক, কে কী করবে। ঘটনা যখন কোনো অপ্রত্যাশিত মোড় নেয়, কিংবা আঙ্গিকে যখন কোনো নতুনত্ব দেখা যায়, তখনই দর্শক মজা পান। বস্তুত ওয়েস্টার্ন ছবি ভারতীয় রাগসংগীতের মতো, তার মধ্যে অসংখ্য ছোটো ছোটো আপাত ইম্প্রোভাইজেশন বা নিজস্ব লয়কারী দেখাবার সুযোগ আছে। দর্শক আশস্ত যে ছবিতে যা-কিছু ঘটে তা ঐতিহাসিক হলেও আজ পুরাকাহিনীতে পরিণত হয়েছে। এ এমনই এক কল্পনারাজ্য যে তার প্রতি দর্শককে কোনোভাবেই দায়বদ্ধ হতে হয় না। কিন্তু এখানে একটি ভ্রান্তি আছে। ওয়েস্টার্ন ইতিহাসনির্ভর না হলেও তার বিশেষ জাতিধর্মের প্রতি তাকে অনুগত থাকতে হয়। এই বিশেষ মানসিকতার প্রতি আনুগত্যের কারণেই তাকে ইতিহাস থেকে সরে যেতে হয়। দর্শকেরা চান বা না চান ঐ মানসিকতা তাঁদের স্বীকার করে নিতে হয়। এই মানসিকতার প্রধান উপাদান মারদাঙ্গা, এবং মারদাঙ্গার প্রতি একাধিক দৃষ্টিভঙ্গির সমাবেশ।

কোনো দ্বর্ভুত্তের বা কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হলে ওয়েস্টার্ন ছবির ব্যক্তি নায়ককে এক অতিমানব বলে মনে হয়। অথচ বেশির ভাগ সময় নায়কেরা, এবং খলনায়কেরা তো বটেই, দলবদ্ধ হয়ে কাজ করে। যেমন; 'হাই নুন' ছবিতে একা এক শেরিফ চার দ্বর্ভুত্তের সঙ্গে মোকাবিলা করে। আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলে এবং পূর্ব প্রদেশগুলিতেও একসময় ফেরারী বন্দুকবাজদের আধিপত্য ছিল। এদের কীর্তিকাহিনীই পরবর্তী কালে লৌকিক উপাখ্যানের রূপ নিয়েছে, অসংখ্য উপন্যাসের উপজীব্য হয়েছে, এবং হয় সরাসরি নয়তো উপন্যাসের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রথম কাহিনীচিত্র বলে বর্ণিত ( যদিও কথ্য ঠিক নয় ) এডউইন এস. পোর্টার-এর 'দ গ্রেট ট্রেন রবারি' ছবিটিই পরবর্তীকালে ওয়েস্টার্ন ছবির উপমান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব প্রদেশের ওয়াই-

য়োমিও অঞ্চলে একদল দুর্বৃত্ত কর্তৃক ট্রেন লুঠের ঘটনার ঠিক তিন বছর পর পূর্ব প্রদেশেই এই ওয়েস্টার্ন ছবিটি তৈরি হয়েছিল ( ১৯০৩ )।

ওয়েস্টার্ন ছবি মার্কিন জীবনযাত্রার এমনই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ যে আমেরিকানিজম-এর বিতর্কিত সমালোচক অ্যানডি ওয়রহল খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কিছু দুর্বোধ্য চরিত্রকে 'কাউবয়' পরিস্থিতিতে হাজির করেছেন। কাউবয় পরিস্থিতির মধ্যে বিস্তৃত করে বর্তমান কালের মার্কিন জীবনের সমগ্র বর্ণালীকেই বিশ্লেষণ করা সম্ভব। বস্তুত ওয়েস্টার্ন-এর অন্তর্নিহিত 'মিথ' বা অতিকথাকে যে ক্রমশই বাস্তবের কাছাকাছি নিয়ে আসা হচ্ছে এবং তা যে শেষ পর্যন্ত রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে তার সম্ভাবনাও দেখা গেছে 'মিডনাইট কাউবয়' এবং দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে জন লঙ্ঘেনকার-এর ছাত্রাবস্থায় তোলা 'দ রিটার্ন অব ব্রঙ্কো বিলি' ( ১৯৭০ )-র মতো ছবিতে। দুটি ছবিতেই দেখা যায়, তরুণ নায়ক কাউবয় চরিত্রের সঙ্গে কিছুতেই একাত্ম হতে পারে না।

গান্স' রোবের্জ

॥ নাগিসা ওশিমা ॥

( জন্ম ১৯৩২ )। আইন নিয়ে পড়াশুনো শেষ করে তিনি ছবির কাজে যোগ দেন। ওশিমা জাপানি চলচ্চিত্রের নব্য ধারার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিচালক। তাঁকে বলা যেতে পারবে জাপানি পরিচালকদের মধ্যে সবচেয়ে কম জাপানি। জাপানি সমাজ ও ঐতিহ্যের সনাতনী ভাবধারার তিনি এক ক্লান্ত সমালোচক। তাঁর ছবির বিষয়বস্তু আধুনিক জাপানি তরুণ তরুণীর বিভিন্ন সমস্যা, বিভ্রান্তি ও স্ববিরোধিতা এবং দেশের সমাজ-শাসন ও আইন-ব্যবস্থার নানান ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে। এই সব বিষয়ের অন্তর্নিহিত নাটকীয়তা ও সামাজিক / মানবিক প্রাসঙ্গিকতাকে তিনি রূপকের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারেন। প্রায়ই কোনো বাস্তব ঘটনা থেকে তিনি শুরু করেন ও ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে বাস্তবকে ছাড়িয়ে চলে যান। বাস্তব ও কল্পনার সমন্বয় ও সংঘাত তাঁর ছবিতে সমাজতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক মাত্রা নিয়ে আসে। রাজনীতিচেতনা ও সম্ভবত বামপন্থী রাজনৈতিক আত্মগত্য ওশিমার হাত দিয়ে জাপানি টেনডেন্সি ফিল্মের ( ড্র. জাপান ) ভাবধারার নবজীবন ঘটিয়েছে বলা যায়। তাঁর ছবিতেই এই ভাবধারা ও স্মৃদ্ধ শিল্পিতার সবচেয়ে সূক্ষ্ম সমন্বয় ঘটেছে। হিংসা ও যৌনতাকে বিশেষ প্রাধান্য দেন তিনি, এক অদ্ভুত হিমশীতলতা ও আঘাত করার প্রবণতা রয়েছে ওশিমার বহু ছবিতে, বৃহত্ত্বলের মতোই তিনি

জালাকর কিন্তু যুগলত ভাবে বিভক্ত। বুলিয়েল ছাড়া তাঁর ছবি দেখতে দেখতে অ্যানডারসনের কথাও কখনো কখনো মনে পড়ে, কিন্তু আঙ্গিকের প্রদর্শনতা ওশিমার ছবিতে কম, বরং সামাজিক মনস্তত্ত্বের ভূমিকা বেশি। উল্লেখযোগ্য ছবি *The Sun's Burial*, দি ক্যাচ, ডেথ বাই হ্যাঙ্গিং [এ-ছবি তাঁর প্রতিনিধিস্থানীয় ছবি। যাকে মনে হতে পারে মানবিক সমস্যা মাত্র, যার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল ঘোঁস বাসনার বিকৃতি, তাকে ওশিমা দাঁড় করিয়ে দেন রাজনৈতিক প্রশ্নের হাত ধরে—এমনি করে বুঝিয়ে দেন, আমাদের সমগ্র অস্তিত্ব, আমাদের জীবনযাপন, কামনা, প্রাপ্তি—সবই তুগলভাবে রাজনীতি-নির্ভর, রাজনীতি-বহির্ভূত কিছু নয়। এই ছবি আসলে সেই অন্তর্গত রাজনীতিরই ছবি।—ই. ব. র. ], *Shinjuku Thief*, দি বয়, গ্লেনজারস অব দি ফ্রেশ, দি সেরিমনি, *In the Realm of the Senses*, ক্যানটম লাভ।

॥ জঁ ককতো ॥

(১৮৮৯-১৯৬৩)। ফরাসি ককতোর প্রতিভা ছিল প্রকৃত অর্থেই বহুমুখী। চলচ্চিত্র কখনোই তাঁর কাছে একমাত্র চর্চার বিষয় ছিল না, কবি ঔপন্যাসিক নাট্যকার সমালোচক (ইউরোপীয় নৃত্যনাট্য) রচনাকার এমনকি চিত্রশিল্পী হিসেবে তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। তাঁর পঁয়তাল্লিশ বৎসরের কর্মবহুল জীবনে তিনি লিখেছেন অজস্র কবিতা, অনেকগুলি উপন্যাস, দশবারোটি নাটক এবং আরো নানা ধরনের প্রবন্ধ সমালোচনা। ককতো প্রত্যক্ষভাবে চলচ্চিত্র সৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করেন ১৯৩০ সালে তাঁর স্বরচিত কাহিনী ও চিত্রনাট্য নিয়ে গঠিত ছবি 'দি ব্লাড অব এ পোয়েট'-এর মাধ্যমে। ককতোর এই প্রথম ছবিটি ছিল একটি রূপকাকৃত-কল্প-কাহিনী। ছবিটিতে ঘটনা বলতে বিশেষ কিছু নেই, যা আছে তা হলো স্রষ্টার মানসিক কিছু বিমূর্ত চিন্তাভাবনা। এই সময় থেকেই ইউরোপীয় চলচ্চিত্রে, বিশেষ করে ফরাসি চিত্রে, 'সারিয়ালিজম' মতবাদের প্রভাব দেখা দিতে থাকে। পরবর্তীকালেও ককতোর কিছু কিছু ছবিতে সারিয়ালিজম-এর সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্নটি বারে বারে উঠেছে। তাঁর পরিচালিত প্রথম আর দ্বিতীয় ছবির মাঝে সময়ের ব্যবধানটি যথেষ্ট দীর্ঘ ও প্রলম্বিত—পুরো পনেরোটি বছর। এই পনেরো বছরের মধ্যে তিনি অল্প পরিচালকদের হয়ে আরো চারটি ছবির সংলাপ ও চিত্রনাট্য রচনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ১৯৪৬ সালে তাঁর পরিচালিত দ্বিতীয় ছবির নাম 'দি বিউটি এণ্ড দি বিট'। গল্প বলার স্টাইলের দিক থেকে ছবিটি ছিল উল্লেখযোগ্য। কখনো হান্সা প্রহসনের মেজাজ, কখনো

স্বপ্নের মতো আমেজ সৃষ্টির জন্য ধীরগতির ফটোগ্রাফি, পোশাক-আশাকে অভিনবত্ব এবং নেট-সেটিং-এ ডাচ পেইন্টিংয়ের প্রভাব ছবিটিকে দৃষ্টিস্বাক্ষর করে তুলেছিল। দানবের দুর্গট রূপকথার হলেও, এটি তৈরি করা হয়েছিল একেবারে বাস্তবের অনুকরণে। ককতো একে বলেছেন 'রিয়ালিজম অব দি আনরিয়াল'। 'লে পেরাঁ তেরিব্ল' ( ১৯৪৮ ) চলচ্চিত্র হিশেবে ককতোর সব চাইতে মার্কক সৃষ্টি। এটি ছিল সব রকম অর্থেই একটি নাট্যধর্মী চলচ্চিত্র। প্রধান তিনটি চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক আচরণের জটিলতাই ছিল ছবির মুখ্য বিষয়। ককতো স্বয়ং বলেছেন 'লে পেরাঁ তেরিব্ল' ছবিতে আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তিনটি— প্রথমত কিছু অতুলনীয় অভিনেতা অভিনেত্রীর অভিনয়কে ফিল্ম ধরে রাখা, দ্বিতীয়ত এই চরিত্রগুলিকে থিয়েটারের স্টেজের মতো দূর থেকে না দেখে কাছ থেকে তাঁদের মধ্যে চলাফেরা করা এবং সরাসরি তাঁদের মুখগুলিকে ভালো করে দেখা। আর-তৃতীয়ত আমার ছবির বুনো জন্তুগুলির আচরণ দরজার ফুটোর ফাঁক দিয়ে টেলি-লেন্সের সাহায্যে লক্ষ্য করে যাওয়া।' ককতো পরিচালিত অগ্রতম শ্রেষ্ঠ ছবি 'অরফি' ( ১৯৫০ )। যার মধ্যে দিয়ে জীবন-যুত্ব, কবির ব্যক্তিত্ব এবং কবির দৃষ্টিতে জগৎ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর স্বকীয় ভাবনা-চিন্তাকে তিনি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। বাস্তব জীবন ও যুত্বের পরপারের কাল্পনিক জীবনের মধ্যে সীমারেখাটি এই ছবিতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। আত্মগত ( সাবজেকটিভ ) কবি-কল্পনা ও মননের এই ছবিটির প্রধান চরিত্রের মধ্যে কবি জঁ ককতো সম্পূর্ণভাবে নিজেকে আরোপিত করেছিলেন। তেনিসের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এটি 'গ্র্যাণ্ড প্রিন্স' পুরস্কারে ভূষিত হয়। সিনেমা নামে মাধ্যমটি যে পরিচালক তথা স্রষ্টার যে কোনো স্তরের মানসিক অনুভূতিকেই প্রকাশ করতে সক্ষম, তা সে অলীক মায়ার কল্পনা, বা স্বপ্ন রূপকথা অথবা অতিকথার ( মিথ ) কল্পনা যাই হোক না কেন, তা ককতোর পরিচালিত ছয়টি ছবি দেখলেই উপলব্ধি করা যায়। চলচ্চিত্র শিল্পের তব্ ও রূপরেখা নিয়েও জঁ ককতো লিখে গেছেন বিস্তার। অঁদ্রে ফ্রেইগন-এর সঙ্গে তাঁর কথোপকথনগুলি লিপিবদ্ধ হয়ে যে বইটি প্রকাশিত হয়েছে ( 'ককতো আন দি ফিল্ম' ) চলচ্চিত্রের তাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে তা একটি মূল্যবান পুস্তক। চলচ্চিত্রের প্রয়োগনৈপুণ্যের দিক থেকে তাঁর বিশেষ অবদানকে ( সিনেমাটিক পোয়েট্রি ) কোনো মতেই অস্বীকার করা চলে না। ( ড. কবিতা ও চলচ্চিত্র )

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : F. Stegmuller-এর ককতো।

রাজত রায়

## ॥ কবিতা ও চলচ্চিত্র ॥

ভাষাশ্রয়ী ওতপ্রোত প্লট, গতি, সংলাপ, ইমেজ প্রভৃতির ইদ্রিতময় সম্ভাবনা যুক্ত-  
অনুভূতি ও মননের প্রত্যক্ষ প্রকাশকে—যেখানে উপাদানগুলি অভিব্যক্তিকে  
সাহায্য করে—লিরিক কাব্য বলা যায়। ঠিক এটাই হচ্ছে ফিল্মকাব্যেরও লক্ষ্য,  
অবশ্যই নিজস্ব মাধ্যমে। ফিল্মকাব্যে কাহিনী থাকতে পারে কিংবা তা একেবারে  
কাহিনী-শূন্যও হতে পারে। এ জাতীয় ছবি কখনো সচিত্র ইমেজনির্ভর, কখনো  
সংগীতকেন্দ্রিক শুধু—কোনো ক্ষেত্রে ধার করা, অন্তত বিশেষভাবে রচিত, ছবিতে  
সংলাপের উপস্থিতিও আশ্চর্য নয় অথবা বর্ণনার, অবশ্য উপকরণগুলির অস্তিত্বই যে  
ফিল্মকে কবিতা করে তোলে তা নয়। এদের একেটাই কবিতা তৈরি হয়। সদৃশ  
অভিব্যক্তি থাকলেও অনেক ছবিকে কাব্য বলা যায় না। এবিধ ক্ষেত্রে, ফলাফল  
বা যোগাযোগের মধ্যে অভাব রয়েছে তীব্রতা, মগ্নতা ও ব্যক্তিগত মানসের যা  
লিরিকের বৈশিষ্ট্য। এটা আরেকটা শক্তিশালী ফর্মাল উপাদানের ফল, তার মধ্য  
দিয়েই কাব্যরস নিঃসৃত হয়। জেরারের ‘প্যাশন অব জোয়ান অব আর্ক’ ছবিতে  
স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্ত জোয়ানের ওপর অত্যাচার চালানো হচ্ছে। এ দৃশ্যে  
তার যন্ত্রণা এবং কাঁরাগারের পরিবেশের যে পরিচয় আছে ঘটনা তথা বর্ণনার  
পরিপূরকরূপেই তাদের স্থান, নিজস্ব প্রয়োজনে তারা আসেনি। তা ছাড়া আরো  
বড়ো কথা হলো এই যে আমাদের মনে হয় অনুভূতিগুলি জোয়ানের নিজস্ব,  
নির্মাতা বা আমাদের নয়। এ সীমাবদ্ধতা খাঁটি ফিল্মকাব্যে—যেখানে অভিব্যক্তি  
চরম ও সার্বিক, আমরা তা গ্রহণ করি বা না করি—পাওয়া যাবে না। প্রসঙ্গত  
‘ফোর হানড্রেড ব্লোজ’ ছবির অংশ বিশেষ, বিশেষতঃ কিশোর নায়কের ভ্যানে  
করে থানায় যাওয়ার দৃশ্যটি এসে পড়ে। বালকটির দৃষ্টিতে অপস্রয়মান রাত্রির পথ,  
ক্রমাগত দূরে সরে যাচ্ছে যে জীবন তার কয়েকটি টুকরো উন্মাদিত। কিন্তু এই  
মর্মভেদী ব্যঞ্জনাটুকুও বিশেষ পরিস্থিতিনির্ভর বলেই আমাদের আক্রান্ত করে,  
এবং কাব্যময় বর্ণনা হলেও এ দৃশ্য ফিল্মকাব্য নয়। ফিল্মকাব্যকে, প্রথমতঃ ব্যক্তিগত  
ও বিমূর্ত অভিব্যক্তির মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে। তার সঙ্গে বর্ণনাত্মক কিংবা  
অন্ত কোনো প্রথাগত একেটাই যোগ করাটা নিতান্ত গৌণ। ফর্মাল প্রসঙ্গেও, এমনকি  
বাস্তব চরিত্রকে কেন্দ্র করেই, যে ফিল্মকাব্য সৃষ্টি করা যায় তার এক চমৎকার  
দৃষ্টান্ত পাই বার্গম্যানের ‘দি নেক্‌ড নাইট’ ছবির ক্ল্যাশব্যাক অংশে। দর্শকের  
সামনে সৃষ্ট হয় এক মুখর জগৎ যেখানে এক ক্লাউন ও তার স্ত্রী কবিতার প্রতীকী

মানুষ হয়ে উঠেছে। কয়েকজন দৈনিক মহড়া দিচ্ছে সমুদ্রের ধারে। স্ট্রাইপদেশা জাঁকালো পোশাকে আলমা তাদের সামনে ধোঁয়াখুরি করছে; লোকগুলো তাকে আপাদমস্তক গিলছে যেন। তারা আলমার বাড়িয়ে ধরা টুপিতে কিছু পয়সা ফেলল। আলমা কাপড় ছাড়তে আরম্ভ করেছে। এর মধ্যে খবর পেয়ে সমুদ্রতীরে পৌঁছে ক্লাউন ফ্রন্ট নগ্ন আলমাকে এককোমর জলে দাঁড়িয়ে কতকগুলো দৈনিকের সঙ্গে মস্করা করতে দেখে। বাকি সবাই মজা দেখছে। ফ্রন্ট আলমাকে ডাকল। ফ্রন্টের ডাক শুনে লজ্জিত আলমা উঠে আসতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না, ফ্রন্ট জামা ছেড়ে জলে নামে, আলমাকে সে তুলে ধরে, আলমা তার কাঁধ ধরে বোলে, ফ্রন্ট তার পিছনে হাত রাখে। এইভাবে স্ত্রীর নগ্নতা কিছুটা আড়াল করে ফ্রন্ট নিজের শরীর দিয়ে। সমুদ্রতীর ছাড়িয়ে আলমাকে নিয়ে টলতে টলতে ফ্রন্ট একটা চড়াইয়ে ওঠে। সেপাইগুলো বুনো আনন্দে পিছু নেয়, অল্প লোকও জড়ো হতে থাকে। আমরা দেখি আলমার মুখ, যন্ত্রণার, লজ্জার। আমরা দেখি ফ্রন্টের মুখ— নিজের ও স্ত্রীর অপমানে, অবসাদে ও ক্ষতের জ্বালায় কাতর ক্লাউনের মেকআপকেও মুখের ক্ষত বলে মনে হয়। ফ্রন্ট পড়ে গেলে আলমা তাকে টেনে তোলে, গুরু হয় আবার পথ চলা। অবশেষে কোনোরকমে সার্কাসের তাঁবুতে পৌঁছিয়েই সে জ্ঞান হারায়, সঙ্গীরা তাকে ও আলমাকে ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে যায়। একজন আকাশের দিকে তাকিয়ে ভুরু মোছে, বড়ো নিষ্করণ আকাশ। এইভাবে বর্ণনাত্মক দিচ্চুয়েশনে বাস্তব চরিত্র মিথের তাৎপর্য পায়। নির্মাতার দৃষ্টিতে আগাগোড়া সম্পৃক্ত চরিত্র আর ঘটনাটি আপাত অর্থ হারিয়ে মানবিক প্রেমের যন্ত্রণার এক ধর্মীয় গাথায় রূপান্তরিত হয়েছে। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ই, উল্লসিত ভীড়ের মতো, থ্রিস্টের মতোই অপমানিত, মানুষটির কাঁধে রক্তমাংসের মানবীটি ক্রশের মহিমা পেয়েছে। ওপরের আলোচনা থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে ফিল্মকাব্য সৃষ্টির জ্ঞান প্রয়োজন বাস্তব চরিত্র ও ঘটনাগুলিকে প্রচার মনন ও অনুভূতির প্রতীকে রূপান্তরীকরণ। তাদের সত্তার আভাসটুকু থাকবে কেবল, বেশি স্বরূপে থাকলেই কিংবা অত্যধিক বর্ণনাত্মক বা বাস্তব-নির্ভর হলেই লিরিকের শুদ্ধ নির্ধারনটুকু হারিয়ে যায়। ফিল্মকাব্যের মূল শর্ত হচ্ছে আঙ্গিক ও বিষয়কে সামগ্রিকভাবে শিল্পীর কল্পনায় রূপান্তর করা। নিছক শারীরিক অস্তিত্বের আবেদনকে কবিতার মতো রূপায়িত করা হয়েছে রেনোয়ার 'এ ডে ইন দি কানট্রি' ও 'পিকনিক ইন দি গ্রাস' ছবিতে। উভয় ছবিতেই গ্রামীণ প্রেম প্রকৃতির স্তব হয়ে উঠেছে, মুখর হয়েছে পর্নকল্পন, দ্রুত বিকিমিকি জলধারা, বাতাসতাড়িত তৃণদল, পাতার ওপর জলবিন্দু আর

পুষ্পান্ধিত পতঙ্গ। মানস লোকের মালমশলা নিয়ে সাহিত্যগুণবর্জিত ফিল্মকাব্য  
 হৃদয়ভাবে, এমনকি ধ্রুপদী পর্যায়ে সৃষ্ট হয়েছে মগ্নচৈতন্যকেন্দ্রিক Un Chien  
 Andalou ছবিতে। যেহেতু মগ্নচৈতন্যনির্ভর কিংবা মুক্তাহুবদ্রজাত ছবি কখনোই  
 সম্পূর্ণ 'আর্ট' হিশেবে সফল হয় না, স্তত্রাং ইম্প্রেশনিজম ছাড়া অন্য কোনো ভাবে  
 অ-সাহিত্যমূলক বিস্কৃত ফিল্মকাব্যের সাফল্যটাই আসল প্রশ্ন হয়ে ওঠে।  
 [কবিতার সঙ্গে চলচ্চিত্রের যোগাযোগ পরিচালক থেকে পরিচালকে আলাদা।  
 যেমন ককতো নিয়েছেন মূলত কবিতার কাব্যময়তা থেকে। কিন্তু ইয়াকো নিয়েছেন  
 মূলত কবিতার সংগীতময়তা থেকে। আবার পাসোলিনি গেছেন বস্তুত্যা থেকে  
 কাব্যসত্যের দিকে। আর বার্গম্যান ও তারকোভস্কির ছিল কাব্যিক অন্তর্দৃষ্টি,  
 যেমন মহাকবিদের থাকে।]

জে. এইচ.

॥ কমেডি ॥

কমেডি ছবি হলো মূলত হাস্যরসপ্রধান ছবি যা নানান উদ্ভট ও অসঙ্গতির দিকে  
 দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শুধুই হাসি নয়, ট্রাজিক কোঁতুক, আর মপ্রতিভ অসহায়তা।  
 ম্যাক সেনেটকে দিয়ে ১৯০৭ সাল থেকে এর সূচনা। তাঁর কমেডি ছবি হলো  
 তাৎক্ষণিক মিচুয়েশন, স্বতঃস্ফূর্ত মেজাজ ও দ্রুত গতির। জরুরি সামাজিক প্রশ্ন  
 থেকে অবাস্তব অসম্ভব মুহূর্ত পর্যন্ত এক বিশাল জগৎ, তার সাথে অল্প ছবির  
 প্যারডি। সব নিয়ে তাঁর ছবিকে বলা হয়েছে জেজি কমেডি। কমেডিয়ান হিশেবে  
 ম্যাক্স লিগারের সাফল্য ১৯১৫র পর থেকে হলিউডেও নির্ধারিত কমেডির সূচনা  
 করে। এই ধরনের ছবি তখন এক বা একাধিক কমেডি অভিনেতার অভিনয়-  
 ক্ষমতা ও কল্পনাশক্তির ওপর নির্ভরশীল। যেমন চ্যাপলিন, বাস্টার কীটন, হ্যারল্ড  
 লয়েড, হ্যারি ল্যাংডন, ডবলিউ সি ফিল্ডস। এর মধ্যে চ্যাপলিনের হাতে কমেডি  
 এক নতুন মাত্রা পেল। তাঁর জগৎ ছিল মানবিক, বিপ্রতীপের জগৎ। পোশাক,  
 চরিত্রচিত্রণ, মুকাভিনয় ও ট্র্যানজিশনের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে কমেডিকে তিনি সূক্ষ্ম,  
 পরিশীলিত করে তুললেন। বিষয়গত ও চলচ্চিত্র-ভাষাগত, উভয়দিক থেকেই  
 চ্যাপলিনের ছবি ছিল কমেডি অতিরিক্ত আর কিছু। সোশ্যাল কমেডি, সিরিও-  
 কমেডি, স্টিটায়ার। এক বৈপরীত্য, এক দ্বিধাসমতার জগৎ : ক্রমাগত সঙ্কল্প ও  
 ক্রমশ ত্যাগ, উৎসাহের আঘাত ও ক্লাস্তির গুস্তা, আসা ও ফিরে যাওয়া, প্রবেশ  
 ও প্রস্থান তাঁর বিপন্নবিস্মিত নায়কের। যেখানে বুদ্ধি নিবোধের ছন্যবেশ, জরুরি

অপ্রয়োজনের প্রতিধ্বনি। এই বৈপরীত্যের সূত্রটাই বিস্তৃত ট্রাম্প চরিত্রে : ঢোলা প্যান্ট আর আঁটগাঁটো কোট, টিলে জুতো আর কাটাছাঁটা টুপি-পর্যায় যে লোকটা ভবঘুরে ভদ্রলোক, স্বপ্নচারী খেলোয়াড়, নির্জন চোর, বাউণ্ডুলে শিল্পী (দ্র. চ্যাপলিন)। বিশেষ দশকে গোল্ডরাশ সহ তাঁর দীর্ঘ ছবিগুলি শৈল্পিক নিরাসক্তি ও সমাজ-চেতনার স্বন্দর উদাহরণ। এই বৈশিষ্ট্য থেকেই কালক্রমে এল পোলাইট কমেডি। কীটনের কমেডি হলো দ্রুততর, চাতুরিও সেখানে বেশি। তাঁর অভিব্যক্তিহীন মুখ আর কল্পনাপ্রবণ মন, আপাত অসহায়তা আর সম্ভাবনা-ক্ষমতা, এদের মধ্যে দ্বিধাসমতার উপাদান লক্ষণীয়। লয়েডের জগৎ ঘরোয়া, মজাদার, উদ্ভেজনার, যা সিচুয়েশন-নির্ভর। তুলনায় ল্যাংডনের কমেডি মন্থর, মুদ্র অমনোযোগ ও স্বাভাবিক আলস্টের। এঁরা ছাড়াও কমেডি ছবি বানায়েন ফ্লেয়ার, দি ইটালিয়ান ফু হ্যাট (১৯২৭)। নিখাদ কৌতুকপূর্ণ ও মজাদার স্ল্যাপটিক কমেডি। পোলাইট কমেডি Ernst Lubitsch-এর মাধ্যমে সেরা কমেডি হয়ে উঠল ত্রিশের দশকে। বুদ্ধিদীপ্ত ও স্লেষাত্মক চিত্রায়ণে যৌনতাকে তিনি স্বাভাবিক ক্রিয়া, মানবিক প্রয়োজন ও উইটের খেলা করে তুললেন। সব মিলিয়ে নির্বাক কমেডি ছিল সিনেমার এক প্রধান অঙ্গ, বিশুদ্ধ অঙ্গও বটে, কেননা কোনো সাহিত্য বা নাটক থেকে তাকে টেনে আনা হতো না, সরাসরি সিনেমার কথা ভেবেই তাকে রূপ দেওয়া হতো আর রূপস্থিতিতে দৃশ্যরসের ওপরই জোর পড়ত সবচেয়ে বেশি। এই বিশুদ্ধির কথা মনে রেখে বলা যায় আউ গার্ডকে কমেডি অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। কমেডির অবনতি শুরু হলো ১৯৪৫ থেকে। শিল্পগুণ ও জনপ্রিয়তা দুইই কমল। পঞ্চাশের দশকে বিলি ওয়াইল্ডারের সংলাপ-প্রধান কমেডি কমেডি ছবিতে আনল ভিন্ন স্বাদ। ক্রমে কমেডি জটিল দৃশ্যবিশ্বাস, প্রতীকী রূপান্তর ও শাব্দিক উইট নির্ভর হয়ে পড়ল। যে প্রদর্শে উডি অ্যালেন উল্লেখযোগ্য। বার্গম্যান বা সত্যজিৎদের মতো পরিচালকরাও কমেডিতে হাত দিলেন। বেনেগাল বানায়েন স্ল্যাক কমেডি—মাণ্ডি। ভিন্নধর্মী ছবির অংশ বিশেষে কমেডির মেজাজ পাওয়া গেল। তৈরি হলো ব্যালেকমেডি বা নিউজিক্যাল কমেডি। আধুনিক কমেডি অভিনেতাদের মধ্যে ওয়াটার্সের ম্যাথু ও জ্যাক লেমন জুটি উল্লেখযোগ্য। কমেডি ছবির বাইরে অ্যানিমেটেড ছবিতেও কমিক রস বহুবার অনবদ্য রূপ পেয়েছে। ইদানিং ছবিতে যৌন রসের সঙ্গে কমিক রসকে সমন্বিত করার প্রয়াসও দেখা যাচ্ছে।

## ॥ কল্পনা ॥

১৯৪৮, ভারত। উদয়শঙ্করের একমাত্র চলচ্চিত্রকর্ম। ভারতীয় নৃত্যকে ভিত্তি করে সাদা-কালোয় ও হিন্দিতে তোলা। ছবিটিকে একই সঙ্গে তথ্যচিত্র, শিল্পবিষয়ক চিত্র ও পরীক্ষামূলক চিত্র বলা যায়। মাদ্রাজের জেমিনি স্টুডিওতে গৃহীত এই ছবিতে উদয়শঙ্করের চলচ্চিত্র মাধ্যমের উপর দখলের স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। তাঁর ছবির চমৎকার কম্পোজিশন ও ফ্রেমের মধ্যে অতি স্বন্দর ভাবে গতিময়তার সৃষ্টি থেকেই তা বোঝা যায়। ভারতীয় চলচ্চিত্রে এসব ছিল তখন সম্পূর্ণ নৌলিক চিন্তাভাবনা এবং তা শৈলীর ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। কল্পনা ছবিতে নৃত্য শুধু কাহিনীর সহযাত্রী বা আকর্ষণের অতিরিক্ত উপাদান হিসেবে আসেনি, তা ছিল ছবির গঠনকাঠামোর এক অপরিহার্য অঙ্গ। বিখ্যাত দক্ষিণ ভারতীয় চিত্র চল্ললেখা (১৯৪৮, এস. এস. বাসন-কৃত) ছিল কল্পনার দ্বারা অনুপ্রাণিত। কল্পনা ছবিতে চিত্রপ্রতিমার ছায়াপ্রতিমা হয়ে যাওয়ার রূপকল্পটিকে উদয়শঙ্কর মঞ্চেও প্রয়োগ করেন। মঞ্চে ত্রিমাত্রিক শরীরী প্রতিমা থেকে রূপান্তর ঘটতো দ্বিমাত্রিক চিত্রপ্রতিমায়। রূপান্তরের এই পরিকল্পনাটি আদতে ছিল উদয়শঙ্করের বন্ধু জাহ্নসম্রাট পি. সি. সরকারের। সত্যজিৎ রায় কল্পনা ছবিটি বার বার দেখেছিলেন।

চিত্রগ্রহণ কে. রামনাথ, সংগীত বিষ্ণুদাস শিরালী, শিল্প নির্দেশনা এ. কে. শেখর, নৃত্য উদয়শঙ্কর, অমলাশঙ্কর, লক্ষ্মীকান্ত, স্বপ্না রাও; কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা উদয়শঙ্কর।

রজত রায়

## ॥ সি. কষ্টা-গাত্রাস ॥

জন্ম ১৯৩৩, গ্রীসে। চলচ্চিত্র নিয়ে অধ্যয়ন, পরবর্তী কর্মজীবন ও বিবাহ ফ্রান্সে, ফলে এখন ফরাসি পরিচালক রূপে পরিচিত। ক্লেয়ার ও দেমির সহকারী পরিচালক রূপে কাজ করার পর ১৯৬৫ থেকে নিজে চিত্র পরিচালনা শুরু করেন। ড্রেড (১৯৬৯), দি কমফেশন (১৯৭০), স্টেট অফ সীজ (১৯৭২), Clair de Femme (১৯৭৯), মিসিং (১৯৮২), ক্যামিলি বিজনেস, হ্যানাক প্রভৃতি ছবির জন্য বিখ্যাত। সাধারণভাবে তাঁকে পলিটিক্যাল থ্রিলার-ছবির ক্ষেত্রে সবচেয়ে সফলদের অগ্রতম বলা হয়। কিন্তু থ্রিলার ছবির মূল স্বর মাসপেন্সকে রাজনৈতিক ঘটনাধারার ছবিতে টেনে এনে তিনি রহস্য / রাজনৈতিকতার দৃষ্টি তৈরি করেন বলে ও বিশেষত ড্রেড-এ (চিত্রগ্রহণ: রাউল কুতার) তাঁর নির্দিষ্ট রাজনৈতিক

দৃষ্টিভঙ্গিও স্পষ্ট। তিনি নিজেই বলেন, a film is a political act as soon as one assumes a responsibility vis-a-vis a situation, a people etc. রাজনৈতিক কারণে ব্যক্তিহত্যা ও সন্ত্রাসের তিনি দবদময়েই বিরোধী। দিকনফেশন সম্বন্ধে পরিচালক ও ইটালিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ফ্রান্সো দলিনাস মন্তব্য করেছিলেন ছবিটি প্রতিক্রিয়াশীল। তবু স্টেট অফ সীজ ছবির চিত্রনাট্য লেখার কাজে গান্ডাসের সঙ্গে তিনি বহু বিষয়েই একমত হন। ফলে গান্ডাসের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে বামপন্থার কোনো মূল বিরোধ নেই, মনে করা যেতে পারে। যদিও তাঁর রাজনৈতিক বিশ্লেষণ কখনোই পুরোপুরি মার্ক্সীয় দৃষ্টিতে করা হয়নি। এবং অরাজনৈতিক ছবিও তিনি করেছেন। তাঁর পরের দিক্কার ছবি হ্যানাক বা ফ্যামিলি বিজনেস নাটকীয় ফ্যামিলি বা পারসোনাল ড্রামা। তবে তাঁর পলিটিক্যাল-থ্রু লার ছবিগুলির প্রভাব যথেষ্ট দূরপ্রসারী হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের বহু ছবিতে এই প্রভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় মিলবে। ছবিতে হিংসা ও সহিংস রাজনীতির প্রয়োগে তিনি নিজে আবার ত্রেখ্‌টের মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত। অতীত ও বর্তমান, প্যাশন ও কমেডি, রাজনৈতিক আহুগতা ও মনস্তাত্ত্বিক আগ্রহ এবং কলাকৌশলগত বিভাজন ও অথও রূপকল্পনা—বিভিন্ন ধর্মের মধ্য দিয়ে ত্রেখ্‌টের এই প্রভাব ধরা পড়ে। তাঁর ছবিতে তথ্যমূলকতারও প্রত্যক্ষ ভূমিকা আছে। যেমন স্টেট অব সীজ ছবিতে লাতিন আমেরিকান গেরিলাদের কার্য-প্রণালী হুবহু দেখানো হয়েছে। বা মিসিং, চিলিতে সংঘটিত সামরিক অভ্যুত্থানের পটভূমিতে, পূর্ববর্তী একাধিক ছবির মতোই একটি সত্য ঘটনাকে ভিত্তি করে চলচ্চিত্রায়িত। এটা বোধহয় স্বাভাবিক যে তাঁর স্ত্রী মিশেল রে একজন দুঃসাহসী সাংবাদিক, যিনি ভিয়েৎ কংদের হাতে বন্দী হন। কষ্ট-গান্ডাস একাধিক ছবিতে অভিনয়ও করেছেন।

॥ কাইয়ে দ্য সিনেমা ॥

চলচ্চিত্র বিষয়ে মননশীল ও বিখ্যাত ফরাসি পত্রিকা। ১৯৪৬ থেকে ৪৯ পর্যন্ত উনিশটি সংখ্যা প্রকাশিত La Revue-এর কাছ থেকে ১৯৫১য় কাইয়ে প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। Revue-র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অঁদ্রে বার্জাঁ, কাইয়েরও তিনি অন্যতম ভারপ্রাপ্ত। সঙ্গে ছিলেন দোনিয়ল-ভালক্রজ ও লো দুকা। ( ড্র. অ্যাত্যর তব )। ফ্রান্সের নিউ ওয়েভ পরিচালকদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ কাইয়ে দ্য সিনেমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। কিংবা বলা যায়, এই পত্রিকার লেখক-

গোষ্ঠীই পঞ্চাশের দশকে এই বিখ্যাত নবতরঙ্গ চলচ্চিত্রের সূত্রপাত করেন ( ড্র. ফ্রান্স )। বাজ'। প্রবর্তিত ভাববাদী নন্দনতত্ত্বকে পরিভ্যাগ করে কাইয়ে কালক্রমে বস্তুবাদী নন্দনতত্ত্বের মুখপত্র হয়ে ওঠে। যে বিবর্তনকে বলা হয়েছে 'অর্থর গলিসি থেকে পোলিটিক্যাল অর্থর।' গদার মন্তব্য করেছিলেন কাইয়েতে লেখা ফিল্ম তৈরি করার সামিল। বস্তুতঃ কাইয়েকে শুধু নামী বা দামি পত্রিকা বললে খুব কমই বলা হবে। কাইয়ে এক প্রতিষ্ঠান। ফিল্ম করা / কেন করা, একটা ফিল্ম কেন ভালো লাগে / খারাপ লাগে ইত্যাদির পেছনের বক্তব্য বা তত্ত্ব উপস্থাপনা করে কাইয়ে একটা তত্ত্বপত্র। ষাটের দশকের শেষাংশে অ্যাণ্ড স্ট্রারিসের সম্পাদনায় কিছুদিনের জন্তু কাইয়ের একটি আমেরিকান সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ( ড্র. চলচ্চিত্র সমালোচনা )

## ॥ কাগেমুশা ॥

আমেরিকা / জাপান যৌথ প্রযোজনা, ১৯৮০। ইংরেজি নাম স্ট্রাডো অব এ ওয়ারিয়র। জাপানি পরিচালক আকিরা কুরোশাওয়ার এই চমকপ্রদ চিত্র ফিল্ম মিখোলজি ও দৃশ্যভঙ্গির এক অনন্য মিশ্রণ। গল্পটি গড়ে উঠেছে বোল শতকের এক অভিজ্ঞাত গোষ্ঠীনেতাকে কেন্দ্র করে, যিনি অকাল মৃত্যুর আগে, শত্রুবংশের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে, নিজের এক ডামিকে খাড়া করে যান। দৃশ্যের পর দৃশ্য ছুড়ে ছবির কাঠামোকে নিয়ন্ত্রিত করেছে একদিকে পরম প্রশান্তি ও অল্পদিকে স্নাত্তি গতি—এই হৈত টানা পোড়েন। সূচনার দৃশ্যট সূদীর্ঘ, জাপানিরা বসে থাকলে যে উচ্চতা হয়, ক্যামেরা সেই উচ্চতায় স্থির, দৃশ্যে প্রশাসনিক বিতর্কে অংশগ্রহণকারী এক দল উপবিষ্ট ব্যক্তি। ঠিক পরের শটে এক দীর্ঘ প্যানে দেখা যায় পর্বতের ঢাল বেয়ে রুতপদে দৌড়ে নামছে এক পতাকাবাহী সৈন্য। সারি সারি সারবন্ধ, নতজানু অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ানো সৈন্যদের মধ্য দিয়ে তার এই দৌড়। প্রসারিত, ধূসর দৃশ্যপট যেন ছবির মতো লাগে, যদিও ঠিক জাপানি চিত্র নয়। ছবির প্রায় মাঝমাঝি দীর্ঘ সময় ধরে অন্তগামী রক্তাক্ত সূর্যকে পর্দায় ধরে রেবে ক্যামেরা ধীরে টিণ্ট ডাউন করে শান্ত অথচ অস্তিত্ব এক সমুদ্রের ওপর—ছবির মতো সমুদ্রের ওপর ছবির মতো আকাশ। ফের টিণ্ট ডাউন—চোখে পড়ে ধূসর বেলা-ভূমিতে অস্বাভাবিক বস্তু সৈন্যদলকে। কলাকৌশলের বৈচিত্র্যের সঙ্গেই উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও সমষ্টিগত কর্মের পর্যায়ক্রমিক উপস্থাপনায় দক্ষতা। একটি দৃশ্যে ক্রোজ আপে দেখা যায় খালি ঘরে একাকী এক ধ্যানমগ্ন মূর্তিকে, ঘরের স্লাইডিং দরজা নিঃশব্দে ঠেলে দেওয়া হয় ও তৎক্ষণাৎ এই মূর্তির পেছনে নতজানু

ও প্রণত খান কুড়ি ব্যক্তি পর্দায় ধরা পড়ে। সহযোগী চিত্রনাট্যকার হিশেবে ফ্রানসিস ফোর্ড কপোলার উপস্থিতি এই ছবির অন্তিম আয়রনির জগ্ন দায়ী, ঐমের দিক থেকে গডফাদারের সঙ্গে কাগেমুশার বহু মিল দেখা যায়। শেষ দৃশ্বে মিড লং থেকে লং লং-য়ে ভেসে আসছে মানুষের শব্দেহ, তার পাশে ভানছে তার গোছির রক্তবর্ণ পতাকা। কাগেমুশা এমন ছবি যা বছদিন ধরে চলচ্চিত্রের ছাত্রদের বারবার দেখানো হবে।

চিত্রগ্রহণ T. Saito, M. Ueda ( কালার ) ; সংগীত S. Ikebe, সম্পাদনা কুরোশাওয়া।

কানে শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কার, ১৯৮০ ॥

অমিয় বসু

॥ কানাডা ॥

আকারে বৃহৎ ও অর্থনীতিতে সম্পন্ন হওয়া দর্শেও কাহিনীচিত্রের প্রযোজক হিশেবে কানাডার ভূমিকা অকিঞ্চিৎকর। এর কারণ প্রথমত ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে আমেরিকার সঙ্গে এর নৈকট্য এবং দ্বিতীয়ত ইংরেজি-ভাষী অঞ্চল ও ফরাসি-ভাষী অঞ্চলের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংস্ক্রির অভাব। অস্ট্রেলিয়ার মতো কানাডার ঐতিহ্য ও মূলত তথ্যচিত্রের, যার সূচনা ১৯০০ থেকে। প্রথম কাহিনী-চিত্র নির্মিত হয় ১৯১৪য়। প্রথম দিককার ছবির মধ্যে দি ভাইকিং উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৯-এ এখানে ফিল্ম বোর্ড স্থাপিত হলো। ১৯৪৫ পর্বন্ত এর দায়িত্ব ছিল প্রখ্যাত তথ্যচিত্র পরিচালক জন গ্রিয়ারসনের হাতে, যার নেতৃত্বে কানাডা তথ্যচিত্র নির্মাণের অগ্রতম কেন্দ্র হয়ে ওঠে। গ্রিয়ারসন বিভিন্ন সংস্থাকে একরকম জোর করেই তথ্যচিত্র প্রযোজনায় বাধ্য করাতেন। তিনি ছিলেন বাস্তববাদী ও প্রবণতার দিক থেকে মননশীল, তাঁর আগ্রহ ছিল তথ্যচিত্রের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রদর্শন-অহুমঙ্গে। কানাডার তথ্যচিত্রগুলির তাই বিশেষ জনসেবামূলক ভূমিকা ছিল। তেমনি নরম্যান ম্যাকলারেনের প্রচেষ্টায় এই দেশ অ্যানিমেশনে চূড়ান্ত সমৃদ্ধি লাভ করে। মেজাজে কাব্যিক ও প্রবণতার দিক থেকে মনস্তাত্ত্বিক এই বিরল শিল্পব্যক্তিত্ব ও প্রকৃত পরীক্ষামূলক শিল্পী ১৯৪১ সাল থেকে জাতীয় ফিল্ম বোর্ডের সঙ্গে যুক্ত। কানাডার ফিল্ম উন্নয়ন সংস্থা স্থাপিত হয় ১৯৬৭-তে। সম্প্রতি এই সংস্থার প্রভাবে কাহিনীচিত্র নির্মাণে প্রসার দেখা দিয়েছে। নতুন পরিচালকদের মধ্যে কটচফ, আলমণ্ড, জুট্রা, শেবিব ও টিল উল্লেখযোগ্য।

## ॥ দি কানাল ॥

পোল্যান্ড, ১৯৫৬। ভাইদার যুদ্ধ বিষয়ক ট্রিলজির দ্বিতীয় ছবি। প্রথমটি ছিল এ জেনারেশন, যার সুর বাঁধা তারুণ্য ও রোমাণ্টিসিজমে। কানালাে আছে পোল্যান্ডের যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতার দুঃসহ চিত্র। ছবির দৃশ্যগঠনে একটি ঐতিহাসিক ঘটনাকে (ওয়ারশ অভ্যুত্থানের শেষ কয়েকদিনে একটি প্রতিরোধ বাহিনীর তীব্র সংগ্রাম) এক দুঃস্বপ্নময় আতংকের সঙ্গে সমন্বিত করা হয়েছে। প্রতিরোধ বাহিনীর বীভৎস পরিণতি ঘটে নর্দমার মরণকান্দে। এই বিবরণীর কোথাও কোথাও হয়তো ট্রাজিক রস বা আবেগ-বাহুল্য দেখা যায় কিন্তু সব মিলিয়ে আবদ্ধ হৃদয় স্থানের দমবন্ধকর আবহাওয়াই প্রধান দৃশ্যরস হয়ে ওঠে। চেম্বার ড্রামার চেয়েও অভিঘাতী এক শিল্পরূপ—claustrophobic drama. (ড. অ্যাশেজ অ্যাণ্ড ডায়মণ্ডস, ভাইদা) চিত্রনাট্য ভাইদা ও J. Stawinski, আলোকচিত্র জে. লিপম্যান ॥

## ॥ ফ্রাঙ্ক কাপরা ॥

(১৮৯৭-১৯৯১)। জন্মস্থানে আমেরিকান না হয়েও আমেরিকান চলচ্চিত্রের একজন অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ শ্রষ্টা এবং আমেরিকান ব্যক্তিগততন্ত্রাবাদী জীবনদর্শনের এক প্রবক্তা। কেদিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক ফ্রাঙ্ক কাপরা ১৯২৩ সালে চলচ্চিত্রের জগতে প্রবেশ করেন। এই সময়ে তাঁর যোগাযোগ হয় হ্যারি ল্যাংডন-এর সঙ্গে। দুজনে মিলে দুটি নির্বাচক কোডুক-চিত্র—‘দি স্ট্রং ম্যান’ এবং ‘লং প্যান্টস্’ তোলেন। চলচ্চিত্রের কারিগরী দিক, বিশেষ করে তার সম্পাদনার ক্ষেত্রে কাপরার, প্রথম থেকেই দক্ষতা ছিল এবং সেই কাজ করতে গিয়ে তিনি সম্পূর্ণ নতুন কয়েকটি পদ্ধতির সাহায্য নেন—যেমন, ‘কুইক কাটিং’, ‘স্ট্রেইট কাটিং’, এবং সংলাপের পিঠে সংলাপ। এর ফলে ছবির গতিবেগ অত্যন্ত বেড়ে যায় এবং তা দর্শকের মনোবোগকে আরো বেশি করে আকর্ষণ করে। প্রায় চল্লিশ বৎসর চলচ্চিত্র পরিচালনার কাজে যুক্ত থেকে তিনি তুললেন মোট ছত্রিশটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কাহিনীচিত্র এবং গোটা বারো তথ্যচিত্র [ যার মধ্যে আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তোলা হোয়াই উই ফাইট-চিত্রমালা, যাতে ভের্তভের কিনো আই তথা ঘটমান মনতাজ তবের বিশেষ প্রয়োগ ঘটেছে। ] আমেরিকান ম্যাডনেস (১৯৩২), ইট হ্যাপেন্‌ড্ ওয়ান নাইট (১৯৩৪), মি: ডীডস্ গোস্ টু টাউন (১৯৩৬), লস্ট হরাইজন্স (১৯৩৭), ইউ কান্ট টেক ইট উইথ ইউ (১৯৩৮), মি: স্মিথ গোস্ টু

ওয়ালিংটন ( ১৯৩৯ ) এবং মিট জন ডো ( ১৯৪১ ) । তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবি সম্ভবত দি বিটার টা অব জেনারেল ইয়েন । তাঁর ছবির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তিনি শিল্পের সঙ্গে প্রমোদ তথা বাণিজ্যের সফল সংমিশ্রণ ঘটাতে পেরেছিলেন । তাঁর জগৎটাকে বলা চলে এক মধ্যবিস্তের জগৎ । মধ্যবিস্তের ধ্যানধারণা, আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়েই তিনি সারাজীবন কাজ করেছেন । সমস্ত জটিল অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান তিনি খুঁজেছেন অতি সরল এক ইউটোপিয়ান পদ্ধতিতে । সামাজিক জীবনে অন্তায় অবিচার দুর্নীতি লোভ দুঃখ দারিদ্র এই সবই তিনি দেখেছেন এবং তাঁর ছবিগুলির মধ্যে তার যথাযথ বাস্তব চিত্রায়ণও করেছেন, কিন্তু সমাধানের পথ বাতলাতে গিয়েই তিনি গোলমাল করে ফেলেছেন । বিখ্যাত ব্রিটিশ চলচ্চিত্র সমালোচক টমাস ওয়াইজম্যান সিনেমা নামে বইটিতে লিখেছেন — ‘কাপরের ছবিগুলি আপাতদৃষ্টিতে প্রগতিশীল এবং সংস্কারকামী বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ( এবং সম্ভবত অনিচ্ছাকৃতভাবে ) সেগুলি ছিল প্রতিক্রিয়াশীল ।’ ১৯৬১-তে তিনি চলচ্চিত্র পরিচালকের কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন । যদিও তারপরও তিনি চারটি ছোটো শিক্ষামূলক তথ্যচিত্র তুলে-ছিলেন ‘বেল টেলিফোন সিস্টেম’-এর হয়ে । তাঁর স্ববৃহৎ আত্মজীবনী ১৯৭১ সালে ‘দি নেম এ্যভাভ দি টাইটেল’ নামে প্রকাশিত হয় । কারিগরী লৈপুণ্যের জ্ঞান তিনি মনোযোগ দাবি করতে পারেন । হলিউডে পরিচালকদের কাজে স্বাধীনতা আদায়ের জ্ঞান তাঁর অবদানও অনেকখানি । [ বস্তুতঃ তাঁর আত্মজীবনীর নামকরণ থেকেই বোঝা যায় তিনি শিল্পীর স্বাধীনতায় ও পরিচালকের নিজস্ব ভূমিকায় কতটা বিশ্বাসী ছিলেন । তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী জীবনদর্শনের প্রতিফলন ঘটেছে ছবিগুলির নামের মধ্য দিয়েও । ] তাঁর ছেলে একজন বিখ্যাত প্রযোজক ।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : D. C. Willis-এর দি ফিল্ম অব ফ্রান্স কাপরা ।

রক্ত রায়

॥ কাবুকিনাট্য ॥

ঐতিহ্যপূর্ণ জাপানি নাট্য-আঙ্গিক । ১৬ শতকের শেষাংশে এর উদ্ভব । জন-প্রিয়তায় জাপানে এর স্থান সর্বাপেক্ষে, এর পরেই পুতুল নাটক ও নো নাটকের স্থান । কাবুকিতে সংগীত, নৃত্য ও অভিনয়ের যথেষ্ট আড়ম্বর ও অলংকরণ থাকে । কিন্তু তা চাপানো নয়, অকৃত্রিম ও জীবন্ত, এবং কখনো কখনো অমোঘ । চলচ্চিত্রের ওপর এর প্রভাব আঙ্গিকগতভাবে ততটাই নয়, যতটা উপাদানগত ও বিষয়গতভাবে ।

যদিও চীন, জাপান ও ফিলিপাইনের কোনো-কোনো ছবিতে আঙ্গিকের অস্থিতম উপাদান হিশেবে কাবুকির প্রয়োগ ঘটেছে অথবা ছবির ভিতর কাবুকি নৃত্যনাট্য হিশেবেই এদেছে—যেমন ভারতীয় ছবিতে আদিবাসী নাচ। আর কাবুকিনাট্যের কাহিনী নিয়ে বহু জাপানি পরিচালক ছবি করেছেন যার মধ্যে ইচিকাওয়া, কিহুগাদা, কুরোশাওয়া ও মিজোগুচি প্রধান। তানকা বা হাইকুর সংহতির পাশে কাবুকির প্রদার ও ব্যাপ্তিও জাপানি সংস্কৃতির একটি দিক। কাবুকির প্রধান খ্যাতি মনতাজ-তর সৃষ্টিতে সে আইজেনস্টাইনকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল ও বিভিন্ন উপাদান সরবরাহ করেছিল বলে। (ড্র. মনতাজ)

॥ আলবার্তো কাভালকাস্তি ॥

( ১৮৯৭-১৯৮২ )। জন্ম ও প্রাথমিক পড়াশুনো ব্রাজিলে। সুইটজারল্যান্ডে গিয়ে আইন ও স্থাপত্য অধ্যয়ন করে তিনি ফ্রান্সে এসে সেট ও শিল্প নির্দেশক হিশেবে কাজ করে প্যারিসের আঁর্ভ গার্দ আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি সেখানে ১৯২৬ সনে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচ ছবি তোলেন—Rien que les heures. ছবিটি একমাস ধরে প্যারিসে তোলা হয়েছিল ও এর বিষয়বস্তু ছিল—নগরজীবনের একদিন। এই ছবি নগরজীবনের বাস্তব প্রেক্ষাপটে দেখায় পথ বনাম মানুষের সংঘাতকে। নগরজীবনের দারিদ্র ও বেকারির কথাও পর্দায় আসে। কাভালকাস্তির এই ছবি তখন ছিল নতুন কিছু। এই ছবির সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে প্রায় সমসাময়িক তোলা জর্মন পরিচালক রুটমানের বালিন ছবির। এই ধরনের চিত্রের সঙ্গে সিনেমায় বাস্তববাদের সম্পর্ক সুস্পষ্ট। এই ছবিদ্বটি ছিল পরবর্তীকালে যা 'বাস্তববাদী' ভঙ্গি বলে পরিচিত হবে তার সূচকস্বরূপ।

ফ্রান্সে তথ্যচিত্রে আন্দোলনের পথপ্রদর্শক কাভালকাস্তি পরে ইংলণ্ডে এসে যোগ দেন ত্রিম্বারসনের জেনারেল পোস্ট অফিস ফিল্ম ইউনিটে। সুবিখ্যাত তথ্যচিত্র নাইট মেইল-এ তিনি ছিলেন আবহবর্ণনার দায়িত্বে। ব্রিটিশ ডকুমেন্টারি ছবির ক্ষেত্রেও অনেক নতুন প্রকরণ ও কলাকৌশল এনেছিলেন তিনি। ১৯৫৫ সনে কাভালকাস্তি তরুণ চলচ্চিত্রকারদের চোদ্দটি উপদেশ দিয়েছিলেন যার অনেকগুলি আজো প্রাসঙ্গিক। যথা—চিত্রনাট্যকে অবহেলা করো না, বর্ণনা-ভঙ্গিতে অস্পষ্ট থেকেো না, অপ্রয়োজনে ক্যানেরা অ্যাঙ্গেল আবিষ্কার করতে যেও না, দ্রুত অজস্র কাটিং, প্রচুর পরিমাণ মিউজিক ও অতিরিক্ত অপটিক্যাল এফেক্ট ব্যবহার করো না, সব সময়ে মনে রেখো প্রতিটি শট একটা সিকোয়েন্সের অংশ ও প্রতিটি সিকোয়েন্স এক সমগ্র অংশ।

১৯৪৯ সনে তিনি ত্রাজিলে ফিরে যান ও ডেরা ক্রুজ প্রোডাকশন গ্রুপে প্রযোজনা বিভাগের প্রধান হিসেবে যোগ দেন। পরে তিনি আবার ইউরোপে ফেরেন ও ব্রেখ্টের (ড্র.) নাটককে অত্যন্ত সাকল্যের সঙ্গে চিত্রায়িত করেন। শেষ জীবনে তিনি ব্রিটিশ ও ফরাসি টিভির হয়ে কাজ করেন ও শিক্ষকতা করেন।  
 রচিত গ্রন্থ : ফিল্ম অ্যাণ্ড রিয়ারলিটি ॥

॥ অঁরি কারটিয়ার-ব্রেসঁ ॥

জন্ম ১৯০৮, ফ্রান্স। জগদ্বিখ্যাত স্থিরচিত্রশিল্পী। সাহিত্য ও চিত্রকলা নিয়ে তিনি কেম্ব্রিজে অধ্যয়ন করেন, তারপর চিত্রপরিচালক রেনোয়ার সহকারী রূপে কয়েক বছর কাজ করে অবশেষে স্থিরচিত্রে মনোনিবেশ করেন। পরিমিত, সংবেদনশীল ও অল্পভূতিগ্রাহ্য আলোকচিত্রের জন্ম তাঁর বিশ্বজোড়া খ্যাতি। সমবায় ফটো-সংস্থা ম্যাগ'নাম ফটোজের অল্পতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে, ফটোসাংবাদিকতা তাঁরই হাতে একটা স্বতন্ত্র শিল্পরূপ পেয়েছিল, তাঁর নিজের ফটোএসেতে হয়তো ব্যাপকতা কম কিন্তু তা অসম্ভব সজীব ও অমোঘ। এই অমোঘতা নির্বাচনে, অর্থ-ব্যঞ্জনার, চিত্রাঙ্গিকে। সমস্ত ঘটনাপ্রবাহকে তিনি দেখতেন, আদি-মধ্য-অন্ত পারস্পর্বে এবং কোন্ মুহূর্তটি বা কোন্ প্রতিমাটি সবচেয়ে বেশি ও সবচেয়ে গভীর তাৎপর্যময় তা অহুধাবন করতে কখনো ভুল করেননি। এই খণ্ড-মুহূর্তটিকে তিনি নাম দিয়েছিলেন চূড়ান্ত বা চরম মুহূর্ত এবং সাচ্চা গোয়েন্দার মতো অসীম আগ্রহ ও বৈধ্য নিয়ে তিনি এই মুহূর্তটির জন্ম অপেক্ষা করতেন। তাঁর অনেক ছবিই বারবার দর্শনের মধ্য দিয়ে আরো আরো ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে, স্বভিতে আঘাত করে, আরো একবার অবলোকন করার বাসনা হয়, অর্থ বা ভাবের আরো একটি নতুন অলুপনের উদয় হয়, আরো একটা নতুন ব্যাখ্যা মেলে। ছবির অনিবার্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জনের জন্ম তাঁর নিরন্তর প্রয়াস। স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত, মিতব্যয়ী চিত্রাঙ্গিক তাঁর ছবির চরিত্রকে সংহত করে আনে, তাঁর আঙ্গিকের শক্তি নকশার সরলতায়, উপাদানের উষ্ণ অন্তরঙ্গতায়। তাঁর ছবিতে নেই সাজানো কম্পোজিশন, কৃত্রিম আলোকসম্পাত, আরোপিত বিষয় বা কলাকৌশলের কারসাজি। তাঁর শাদা-কালো কম্পোজিশন রেখা, তল, মাত্রা ও মূল্যের দৃঢ়, স্ফূর্ত সংগঠনের মধ্য দিয়ে অমোঘ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। তাঁর ছবিতে সহজাত হলেও আঙ্গিকের বিশেষ ভূমিকা, তাঁর ছবি হলো 'পারিপার্শ্বিক জগতের গঠনরূপের অল্পসন্ধান, আঙ্গিকের বিস্তৃত আনন্দে অবগাহন', ফটোগ্রাফি হলো বস্তুজগতের মধ্যে আপাত-

অদৃশ্য ছন্দের চাক্ষুষ প্রমাণ, প্রমাণ যে 'সমস্ত আপাত-বিশৃঙ্খলার মধ্যে রয়েছে শৃঙ্খলা'।

এই শেবোক্ত ধারণা ভাববাদী হয়ে উঠতে পারতো যদি তাঁর অন্য সচেতনতা না থাকতো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নাৎসি-অধিকৃত ফ্রান্সে তিনি প্রতিরোধ বাহিনীর এক সক্রিয় সদস্য ছিলেন, তাঁর তৈরি তিনটি তথ্যচিত্রের বিষয় ছিল যথাক্রমে স্পেনের গৃহযুদ্ধে আহতদের চিকিৎসা, যুদ্ধবিষয়ক তথ্যাদি, যুদ্ধোত্তর পুনর্বাসন। আদলে তিনি ফটোগ্রাফিকে নিতে চেয়েছিলেন এক নতুন ও প্রগাঢ় দর্শনভঙ্গি হিসেবে, যা পরিমিত, বুদ্ধিদীপ্ত ও এমনকি বিজ্ঞানসুলভ হবে। আমি সহজাত আঙ্গিক বনাম আঙ্গিকের মোহ—তাঁর এই দ্বিবোজ্যতাকে অত্যাও কার্যকর দেখি। তিনি মনে করতেন ক্যামেরা চোখ ও মনের সিদ্ধান্তকে ফিল্মে রূপায়িত করে। 'আমার ডান চোখ বাইরের জগতের দিকে দৃষ্টিনির্বেশ করে, বাম চোখ আমার ভেতরের ব্যক্তিগত দৃষ্টিনির্বেশ করে।' 'সমস্ত চিন্তাভাবনা করতে হবে ছবি তোলার আগে ও পরে, কিন্তু কখনোই ছবি তোলার সময়টিতে নয়।' তাঁর ছবি 'স্বাদের দিক থেকে নিও-রিয়ালিজমের ও আদর্শের দিক থেকে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার অনেকটা কাছাকাছি' বললে এই দ্বিবোজ্যতার তালিকার একটা পর্ব শেষ হয়। তাঁর তোলা ছবির একাধিক সংকলন প্রকাশিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : ব্রেসের নিজের ছবিতে ও ভাষ্যে দি ওয়র্ল্ড অব এইচ কারটিয়ার-ব্রেস।

## স্বীমান দাশগুপ্ত

### ॥ কার্টুন ছবি ॥

অনেকের ধারণা অ্যানিমেটেড ছবি মানেই কার্টুন ছবি। কিন্তু আসলে কার্টুন অ্যানিমেশনের বিবিধ পদ্ধতির বিশেষ একটি। কার্টুন ছবি প্রথম নির্মিত হয় ১৯০৬ সাল নাগাদ। পরবর্তী পঁচাত্তর বছরে এর ইতিহাস গেছে বিষয়বস্তু ও কলাকৌশলের বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। কমিক-স্ট্রিপ থেকে শুরু করে বিমূর্ত অন্তর্ভব পর্যন্ত এক বিশাল জগৎ আজ এর আয়ত্তে। অ্যানিমেটেড ছবি থেকে আণ্ডারগ্রাউণ্ড চলচ্চিত্র পর্যন্ত বহু জায়গায় এর যাতায়াত। (ড্র. অ্যানিমেশন)। তথ্যচিত্র, সংবাদচিত্র ও শিক্ষামূলক চিত্রে কার্টুন পদ্ধতির বিশেষ প্রয়োগ ঘটে। কোনো কোনো ছবির পরিচয়লিপি দেখানো হয়েছে কার্টুনের মাধ্যমে।

## ॥ মার্সেল কার্ণে ॥

জন্ম ১৯০৯, ফরাসি পরিচালক। তাঁর বাবা ছিলেন কার্ণের মিস্ত্রি। তিনি কিন্তু পারিবারিক বৃত্তিতে যোগ না দিয়ে চিত্রগ্রাহক হিশেবে শিক্ষানবিশি করেন ও তারপর রেনে ক্লেয়রের ইউনিটে সহকারী পরিচালক রূপে যোগ দেন। এই সময় তিনি চিত্রসাংবাদিক হিশেবেও কাজ করেছেন ও স্বল্প দৈর্ঘ্যের একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছেন। চিত্রনাট্যকার জাঁক প্রেভ্যের ও শিল্প নির্দেশক ব্রাউনারের সঙ্গে এরপর তাঁর দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই জুটি তৈরি করেন *Quai Des Brumes* (38), *Le Jour se Leve* (39) ও *Les Enfants Du Paradis* (45). এর মধ্যে দ্বিতীয় ছবিটি একটি সর্বজনস্বীকৃত ক্ল্যাসিক। যেমন তৃতীয় ছবিটিতে দৃশ্যভঙ্গর ও রোমান্টিক সংরাগের জোরদার মিশ্রণ খুবই মনোগ্রাহী ও অভিব্যাপী হয়েছে। তাঁর ছবিতে নৈরাশ্র, যন্ত্রণা ও বিশ্বযুদ্ধের মেঘ ছায়া ফেলেছিল এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নিয়তিবাদী একথা ঠিক, কিন্তু সেই সঙ্গে সংসাধারণ মানুষের গুণবুদ্ধিতে বিশ্বাসও দেখতে পাওয়া যায় (ড্র. ফ্রান্স)। তিরিশের দশকের শেষভাগ ও চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়ের ফরাসি চলচ্চিত্রে কার্ণে ছিলেন সবচেয়ে দক্ষ পরিচালকদের একজন। তাঁর ধারা বা ঘরানাকে পোয়েটিক রিয়ালিজম আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। পরে প্রেভ্যেরের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি এবং যুদ্ধোত্তর কালের সামাজিক পরিবর্তন ও পরিবর্তিত জনরুচির ফলে কার্ণের জনপ্রিয়তা ও গুরুত্ব কমে যায়। তাঁর অন্ত্যন্ত ছবির মধ্যে আছে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র *দি বাইবেল*।

## ॥ কালচেতনা ॥

চলচ্চিত্র একটি কালাশ্রয়ী মাধ্যম যে সময়কে ধরে রাখতে হয় স্থানের আধারে। বাস্তবে সবকিছু স্থান ও কাল, এই দুয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। চলচ্চিত্রের স্থান ও কাল বাস্তব স্থান-কাল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হলেও, চলচ্চিত্রও কালচেতনা ও স্থানচেতনা উভয়ের দ্বারা চালিত। কাল ও স্থান পরস্পরে সম্পূর্ণ, সংশ্লিষ্ট ও অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, পরস্পরের বিনিময় ও অনুবাদ যোগ্য। বহু ছবিতে কালচেতনা ছবির প্রাণ, যে প্রসঙ্গে আর্ল্যা রেনের ছবি উল্লেখযোগ্য। ফলে কালচেতনার পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণের জন্ম (স্থান-কাল চেতনা দ্রষ্টব্য)। বাস্তব কাল চলচ্চিত্রে এসে পরিবর্তিত হয় ও ভৌত সময়ের মধ্য থেকে চলচ্চিত্রের নিজস্ব বিমূর্ত সময় উঠে আসে। চলচ্চিত্রে সময়কে বিস্তৃত, সংক্ষেপিত, পুনরাবৃত্ত, বিপরীত-

গামী, স্থির, বিভাজিত—যা ইচ্ছে করা যায় (ড. স্লো, কুইক ও রিভার্স মোশন, ফ্রিজ)। সময়ের ভৌত দিক ছাড়াও বেলা বালাজ চলচ্চিত্রে কালের মনস্তাত্ত্বিক ও নাটকীয় অনুঘর্ষের কথা বলেছেন। যদিও ভৌত কালচেতনা, মনস্তাত্ত্বিক কালচেতনা ও নাটকীয় কালচেতনা একে অপরের মধ্যে কিছুটা ডুবে গিয়ে ও কিছুটা ভেসে থেকে চূড়ান্ত ফিল্ম টাইমের জন্ম দেয়। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, চলচ্চিত্রে কাল থেকে কালে যাতায়াতও অবাধ ও স্বচ্ছন্দ (ড. স্ল্যাশ ব্যাক / ফরোয়ার্ড)। মনস্তাত্ত্বিক কালচেতনা চলচ্চিত্রের সংগঠন এবং তার ছন্দ, টেম্পো ও মুডকে প্রভাবিত করে। আর নাটকীয় কালচেতনা কাহিনীচিত্রের ক্ষেত্রে মূল্যবান উপাদান। যদি স্থানচেতনা হয় ছবির শরীর, তো কালচেতনা ছবির মন, বহু ছবিতে, আগেই বলেছি, ছবির প্রাণ। কালভিত্তিক মনতাজ ও ক্যামেরা মুভমেন্টের পরিপ্রেক্ষিতে কালের প্রদর্শনের জ্ঞান (মনতাজ ও ক্যামেরা মুভমেন্ট ট্রষ্টব্য)।

## ॥ কাহিনীচিত্র ॥

চলচ্চিত্রের বাণিজ্যিক কাঠামোকে মুখ্যত টিকিয়ে রাখে কাহিনীচিত্র। কাহিনীচিত্রের অন্তত তিনটে মূল বৈশিষ্ট্য থাকে—১. ছবিতে সাধারণত কমবেশি কাল্পনিক উপাদান থাকবে ২. ব্যবসায়িক প্রদর্শনের জ্ঞান তা নির্মিত হবে ৩. তার ন্যূনতম স্থায়িত্ব হবে তেরিশ মিনিট। এর চেয়ে কম দৈর্ঘ্যের ছবিকে স্বল্প দৈর্ঘ্যের কাহিনীচিত্র বলা হয়। বর্তমানে কাহিনীচিত্রের সাধারণ দৈর্ঘ্য নব্বই মিনিটের কাছাকাছি হয় (এর চেয়ে কম হলে প্রদর্শক ও দর্শকদের অনীহা দেখা দেয়) ও মোটের ওপর তিন ঘণ্টার বেশি হয় না (বেশি হলে সিনেমাহলের সময়ের রুটিনে অনিয়ম দেখা দেয়)। অবশ্য এর ব্যতিক্রম আছে, যেমন জাহুদির অনেক ছবিই এক ঘণ্টার সামান্য এদিক ওদিকে শেষ হয়। প্রথম কাহিনীচিত্র নির্মিত হয়েছিল ১৯০৬ সনে অস্ট্রেলিয়ায়। কাহিনীচিত্রের জ্ঞান সেন্সারশিপের নিয়মকানুন তথ্য বা সংবাদচিত্র থেকে আলাদা। কেননা কাহিনীচিত্র নিজস্ব স্বয়ংসম্পূর্ণ এক বাস্তবতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। কাহিনীচিত্রের সামাজিক প্রভাব ও সাংস্কৃতিক অভিঘাতও তাই অনেক বেশি (ড. চলচ্চিত্রে ভাবনাস্বীতি)। এ বিষয়ে উপন্যাসের সঙ্গে তার তুলনা টানা যেতে পারে। উপন্যাসের মতো কাহিনীচিত্রও আত্মনির্ভর, আবেগমূলক, বিশেষ এক স্বপ্নলোক, উভয়েই ভোক্তাকে (পাঠক বা দর্শক) ব্যাখ্যা করে নিতে উৎসাহিত করে, উভয়ের বিশ্বাসযোগ্যতাই নির্ভর করে 'তার অন্তর্নিহিত সংগতির উপর, তার তাত্ত্বিক ঘনত্বের উপর।'

॥ কিউবা ॥

১৮৯৭-য়ে কিউবায় প্রথম সংবাদচিত্র, ১৯০৮ থেকে নিয়মিতভাবে স্বল্প দৈর্ঘ্যের চিত্র ও ১৯১৩-য় প্রথম কাহিনীচিত্র নির্মিত হয়। প্রারম্ভিক পরিচালকদের মধ্যে Quesada উল্লেখযোগ্য। কিউবার নির্বাক চলচ্চিত্রে সমাজসচেতন ও বিপ্লবাত্মক বিষয়বস্তুর যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল। ১৯৩৭-য়ে প্রথম সবাকচিত্র মুক্তি পাবার পর কিউবার অধিকাংশ ছবি কিন্তু হালকা কমেডি বা সংগীতপ্রধান প্রমোদচিত্র হয়ে উঠল। পরিবর্তন এল কাত্তোর নেতৃত্বে ওই দেশে বিপ্লব সংঘটিত হবার পর। ১৯৫৯-য়ে চলচ্চিত্র বিষয়ে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠিত হলো ও ছবি তৈরিতে এল নতুন উৎসাহ। ইউরোপীয় তথ্যচিত্রের সম্পন্ন ঐতিহ্য ও কিউবার নিজস্ব স্যাটায়াঁর নাট্যের আদর্শ—এই দুই ভাবধারার মিলন ঘটল নতুন ছবিতে। আলভারেজ, আলিয়া, ভেগা, অষ্টাভিয়ো কোর্টাজার ও অষ্টাভিয়ো গোমেজ ও সোলাসের ছবি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেল। জাভাস্তিনি, ক্রিশ মার্কান ও ইভেস কিউবায় গিয়ে সেই দেশের বিপ্লবোত্তর পরিস্থিতি নিয়ে ছবি করলেন। এই দেশের ছবি ক্রমে দেশজ বিষয়কে আন্তর্জাতিক মাত্রায় ব্যাপ্ত করে সমাজতান্ত্রিক চলচ্চিত্রের এক উল্লেখযোগ্য অংশ হয়ে উঠল। এই সব ছবিতে আত্মদমালোচনা ও ইতিহাস-চেতনার স্বন্দর সমন্বয় ঘটেছে। কিউবার আশনাল ফিল্ম স্কুল বর্তমানে 24 Frames Per Second নামে একটি সাপ্তাহিক টিভি অনুষ্ঠান প্রযোজনা করে যা দেশবাসীর চলচ্চিত্র চেতনা বৃদ্ধির কাজে সহায়ক হয়েছে।

॥ দি কিড ॥

আমেরিকা, ১৯২০। এটিই চ্যাপলিনের নিজের লেখায় ও পরিচালনায় প্রথম কাহিনীচিত্র। শৈশবের খিদে ও দুঃখের মুহূর্ত চ্যাপলিনের মনে ছিল, স্মরণে তীক্ষ্ণ হয়েছিল কৈশোরক যন্ত্রণাবিক্ষিতা ( যেমন ডিকেন্স-স্বাক্ষিত শৈশবচিত্র ), কিডে যদিও তারই প্রতিকলন তবু অসংশয় স্বচ্ছতায় তা পেরিয়ে তিনি আসেন, সঞ্চারিত হন হাসিতে, নির্ভার ব্যালোটিক লঘুতায়। তিনি জানেন একটি এক বছরের শিশুকে সাবান ও জলপাত্রে মধ্যে বসিয়ে দিলে কিরকম ফেনিল, উজ্জ্বল ও স্নেহময় সব কাণ্ড ঘটে। তবু শিশুর অন্তর্লীন প্রতিভাটুকু জাগাতে হয়, চ্যাপলিন এভাবেই কিড-এর মূল্যায়ন করেছেন, সব দ্রব অনুভূতির প্রথকে সংহত করেছেন একটি ক্লোজ আপের সংহত স্মৃতিময় আদিকে। শিশুটি যেন ভবঘুরে চার্লিরই এক

স্বদে সংস্করণ, তাদের সম্পর্কের পরিপূরকতা এ ছবির প্রাণ। অমূল্য এই চিত্র ব্যবসায়িকভাবেও অসাধারণ সফলতা পায়।

চিত্রগ্রহণ আর এইচ টথেরো, অভিনয়ে চ্যাপলিন ও কুগান ( শিশুটি ) ॥

বীভশোক ভট্টাচার্য

॥ কিনো-আই ॥

আইজেনস্টাইনের যেমন মনতাজ, চলচ্চিত্র বিষয়ে ভেতরের ধারণা তেমনি কিনো-আই-য়ে বিধৃত। এই দুই ধারণা পরস্পরের বিপ্রতীপ, আইজেনস্টাইন বনাম ভেতরের এই নান্দনিক বিতর্ক ওই সময়ে দূরপ্রসারী হয়েছিল। কিনো-আই শব্দটি ওই সময়ে চিত্রনির্মািতাদের যে গোষ্ঠী এই ধারণার অহুগামী ছিলেন তাঁদের সম্পর্কেও প্রযোজ্য। এই ধারণায় ক্যামেরাকে একটা চোখ হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে, যা স্থানে ও কালে অবাধ বিচরণ ও অনুভবে এবং বর্ণনার-ক্ষমতায়, শালুকের চোখের চেয়ে বেশি সক্ষম ও নিখুঁত। আর তার উদ্দেশ্য কোন রকম হেরফের না করে নির্জলা সত্যকে সিনেমায় তুলে ধরা। এই ভাবধারার ব্যবহারিক ফল হলো কাহিনীচিত্রের ওপর তথ্যচিত্রকে আরোপিত করা। এই ধারণা কালক্রমে পরিত্যক্ত হলেও ( চিত্রগ্রাহক যতটা সম্ভব নিরপেক্ষ থেকে কল্পমূর্তি গ্রহণ করবেন কিন্তু সম্পাদক নিজস্ব ভঙ্গি অহুসারে তাকে সাজাতে পারবেন—এই মতের মধ্যেই অগ্রবিবোধ রয়েছে। ) ওই সময়ে তার প্রভাব ও বিস্তার ছিল যথেষ্ট। ( ড্র. ভেতর্ভ )

॥ বাসটার কীটন ॥

( ১৮৯৫-১৯৬৬ ), মার্কিন কমেডি অভিনেতা ও পরিচালক। তাঁর বাবা ও মা দুজনেই ছিলেন পারফর্মিং আর্টিস্ট। বাসটারও একেবারে ছেলেবেলা থেকেই ক্রীড়া ও অভিনয় কৌশল প্রদর্শনে দক্ষ হয়ে ওঠেন, তাঁর দক্ষতা প্রখ্যাত জাদুকর হ্যারি হুডিনির প্রশংসাও পেয়েছিল। তিনি ক্রমে তাঁর অভিনয়-কৌশলকে ক্যামেরার উপযোগী করে নেন ও সিনেমায় আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর প্রথম ছবি দি বুচার বয় ( ১৯১৭ )। ১৯২০-তে তিনি নিজের কোম্পানি স্থাপন করে ছবি তৈরি শুরু করেন। একে-একে তৈরি হয় ওয়ান উইক ( ২০ ), দি বোট ( ২১ ), আওয়ার হসপিটালিটি ( ২৩ ), শারলক জুনিয়র ( ২৪ ), দি নেভিগেটর ( ২৪ ), দি জেনারেল ( ২৬ ), দি ক্যামেরাম্যান ( ২৮ )। অভিনয়ক্ষমতা, কল্পনাশক্তি ও কমেডি ছবির কলা-কৌশলের ওপর পর্যাপ্ত অধিকার তাঁর নির্বাক কমেডি চিত্রগুলিকে কালোত্তীর্ণ

মাত্রা দিয়েছে। তাঁর কমেডি ছিল তুলনায় দ্রুততর, ভৌতগুণ ও চাতুরিও দেখানে বেশি। তাঁর অভিব্যক্তিহীন মুখ আর কল্পনাপ্রবণ মন, আপাত অসহায়তা আর সম্ভাবনাস্কমতা, এদের মধ্যে বিধানমতের উপাদান লক্ষণীয়। (ড. কমেডি)। নিজের ছবিগুলির মধ্যে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিল 'দি জেনারেল'। পরবর্তীকালে চলচ্চিত্রে শব্দের আবির্ভাব হতে এবং তাঁর স্মারসক্তি ও মানসিক অস্থিরতার ফলে কীটনের শৈল্পিক গুরুত্ব কমে যায়। তবু চ্যাপলিনের লাইমলাইটে তাঁর অভিনয় অরণীয় হয়ে আছে। বাসটার কীটন স্টোরি (৫৭) তাঁর স্ক্রীন বায়োগ্রাফি। আর তাঁর আত্মজীবনীর নাম মাই ওয়াগারফুল ওয়ল্ড অব গ্ল্যাপ্টিক।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : Rudi Blesh-এর কীটন ।

## ॥ স্ট্যানলী কুত্রিক ॥

জন্ম ১৯২৮, আমেরিকার লেখক-প্রযোজক-পরিচালক। কর্মজীবনের সূচনা সাংবাদিক হিসেবে। মাত্র ছুড়ি বছর বয়সে প্রথম ছবি তৈরি করেন, স্বল্প দৈর্ঘ্যের চিত্র। প্রথম কাহিনীচিত্র 'কিলার'স কিং' (১৯৫৫)। পরবর্তী ছবি 'দি কিলিং' (৫৬), 'পাথ্‌স্ অব গ্লোরি' (৫৮) ও 'স্পার্টাকাস' (৬০)। এর পর তিনি আমেরিকা থেকে গ্রেট ব্রিটেনে চলে গিয়ে চিত্রপরিচালনা শুরু করেন : 'লোলিতা' (৬২), 'ড. স্ট্রেঞ্জলাভ' (৬৩), '২০০১—এ স্পেস ওডিসি' (৬৮), 'এ ক্লকওয়ার্ক অরেঞ্জ' (৭১) ও 'ব্যারি লিগুন' (৭৬)। তাঁর ছবির মূল থিমের দুটি ধারা, একটি একক ও অসহায় ব্যক্তির সঙ্গে সহানুভূতিহীন সমাজের নিরন্তর সংঘাত, যাতে ব্যক্তিস্বাধীনতা বিপর্যস্ত হয় ; অল্পটি ব্যক্তিবিশেষকে স্বাধীনতা দিলে সে-ই আবার কীভাবে সহানুভূতিহীন হয়ে উঠে অশ্রের ও সমাজের স্বাধীনতা খর্ব করে। এই থিম মূলত হতাশাবাদী। '২০০১—...' ছবি ছাড়া আর সব প্রধান ছবিতেই তিনি এই হতাশা, বা বলা যায়, তার চেয়েও বেশি, এক ধরনের সচেতন মানব-বিদ্বেষ দ্বারা চালিত। 'স্পার্টাকাস'য়ে দাসবিদ্রোহের মহত্বের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় রোম নগরীর ছর্নীতি, 'ড. স্ট্রেঞ্জলাভ'য়ে সততা, সদর্শকতা, মূল্যবোধ ইত্যাদির চরম অবনমন তুলে ধরা হয়, এইসব গুণাবলীর সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম—পাশবতা, নিবুদ্ধিতা, কুশ্রীতা প্রভৃতিকে এমনকি গ্যামারাইজ করা হয় 'এ ক্লকওয়ার্ক অরেঞ্জ'য়ে। নিজের প্রথম দিককার ছবিতে অমানবিকতার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ জানিয়ে, কুত্রিক পরের ছবিগুলিতে একটু একটু করে তাঁর মানববিদ্বেষ প্রকাশ করতে করতে, 'ড. স্ট্রেঞ্জলাভ'য়ে মানবিকতাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে, পৃথিবী থেকে অস্ত্র জগতে,

মহাশূন্যে সরে গিয়ে সেখানে নিজের মনের মতো কিছু খুঁজে না পেয়ে ফের পৃথিবীতে ফিরে এসে, তাঁরই হাতে নিহত মানবিকতাকে ‘এ ক্লকওয়ার্ক অরেঞ্জ’য়ে পদাঘাত করলেন ; বিদেশি সমালোচকদের এই মত অনেকটাই যুক্তিমুক্ত। ‘ব্যারি লিওন’ এই মতবাদকেই জোরদার করেছে। ধর্মের এই নঞর্থকতা সত্ত্বেও কৃত্রিকের ছবি প্রাণশক্তি, গঠনে স্ফম ঐক্য, কলাকৌশলের ব্যাপক বৈচিত্র্য ও সমালোচকের প্রশংসা/দর্শকদের স্বীকৃতিতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশেষত তাঁর ‘২০০১—....’ চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক অমরীয় সংযোজন। এত বিভিন্ন ও বিচিত্র কারণে ছবিটি গুরুত্বপূর্ণ যে স্বতন্ত্র আলোচনা ছাড়া এর সম্পর্কে কিছুই বলা যায় না (ড্র. ২০০১—এ স্পেস ওডিসি)। শিল্পকর্মে উদ্ভটের প্রতি অদ্ভুত টান থাকলেও (শারলক হোমসের মত ছিল, grotesque থেকে crime-এর দূরত্ব খুব বেশি নয়, যা আধুনিক সভ্যতা সম্পর্কে আরো বেশি প্রযোজ্য), কৃত্রিক এই উদ্ভটকে অর্থবহ ও প্রাসঙ্গিক করে দিতে পারেন, যে জন্ম তার শিল্পকর্ম ও ক্রমবিকাশ এতো প্রভাবশালী হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : আলেকজান্ডার ওয়াকারের স্ট্যানলী কৃত্রিক ডিরেক্টস ॥

॥ আকিরা কুরোশাওয়া ॥

বিশ্বের প্রথম সারির চলচ্চিত্রকারদের অগ্রতন। জন্ম হয়েছিল ১৯১০ সালে টোকিও-র এক প্রাচীন সামুরাই পরিবারে। তদানীন্তন জাপানের রক্ষণশীল সামাজিক প্রথার মধ্যেও তাঁর পরিবারে সিনেমা দেখার রেওয়াজ ছিল। স্কুলে পড়াকালীনই খুব ছোটো বয়সে সিনেমার সঙ্গে কুরোশাওয়ার পরিচয় ঘটে। ছোটোবেলায় দেখা অজস্র ছবির নানা দৃশ্যাংশ কুরোশাওয়ার মনে গেঁথে গিয়েছিল। আত্মকথায় কুরোশাওয়া বলেছেন, ‘প্রাত্যহিক জীবনের একঘেঁয়েমির মধ্যে সিনেমা যে বৈচিত্র্য, আনন্দ ও উদ্দীপনা সঞ্চার করতো তা আমি উপভোগ করতাম।’ মূলত চলচ্চিত্র সম্পর্কে বাবার দৃষ্টিভঙ্গিই সিনেমার প্রতি কুরোশাওয়ার প্রবণতাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। আঁকার প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল বাল্যকাল থেকেই। মাধ্যমিক স্কুল থেকে পাস করার পর চিত্রকলার প্রতি আকর্ষণ আরো বেড়ে যায় এবং আঁকিয়ে হিসেবে সেই সতের বছর বয়সে বেশ প্রতিষ্ঠাও অর্জন করেন। ১৯৩৫ সালে পঁচিশ বছরের যুবক কুরোশাওয়া একটা লোভনীয় কাজের স্বযোগ পেলেন। কাগজের বিজ্ঞাপনে একটি স্টুডিও কিছু সহকারী পরিচালক চাইছে দেখে আবেদন করলেন। বেশ কয়েকটা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চাকরিটা পেলেন।

এই সময় পরিচালক ইয়ামাসানের সহকারীরূপে নিজের ব্যক্তি প্রতিভার উন্মেষ ঘটতে পেরেছিলেন তিনি। বেশ কয়েকটি ছবিতে সহকারীর কাজ করার পর ১৯৪১ সালে দুটি চিত্রনাট্য লিখে পুরস্কৃত হলেন। ততদিনে নবগঠিত চলচ্চিত্র স্টুডিও তোহো কোম্পানির প্রধান পরিচালকে পরিণত হয়েছেন কুরোশাওয়া। অল্প কিছু পরে 'সুগাতা সানশিরো' উপন্যাস নিয়ে একটা ছবি করার সুযোগ পেলেন। ১৯৪৩ সালে ছবিটি মুক্তি পেল। এই ধরনের একটা ছবির জন্ম জাপানি দর্শক অপেক্ষা করেছিল। ছবিটা জনপ্রিয়তা পেল এবং সাংবাদিকরাও ছবিটাকে প্রচুর প্রশংসা করলেন। চলচ্চিত্র পরিচালকরূপে কুরোশাওয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করলেন। ১৯৫০ সালে তৈরি হলো তাঁর অসাধারণ সৃষ্টি 'রশোমন'। ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে ১৯৫১ সালে ছবিটি শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেল। ছবিটির মাধ্যমে কেবল কুরোশাওয়াই নয়, জাপানি চলচ্চিত্র সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। শুরু হলো কুরোশাওয়ার মহৎ শিল্পজীবনের জয়যাত্রা।

তাঁর প্রথম ছবি তৈরি হয়েছিল চল্লিশ দশকের গোড়ায়। তাঁর এতাবৎ শেষ ছবি Not Yet নির্মিত হয়েছে ১৯৯২ সালে। যখন তিনি প্রথম পূর্ণাঙ্গ ছবি করেন সেই ৪৩ সাল এবং তার কাছাকাছি সময়সীমায় বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এমন কিছু ছবি তৈরি হয়েছে যা সিনেমার আঙ্গিক-প্রকরণের দিক থেকে অরণীয় হয়ে আছে। পরবর্তী দু'দশকেও, পঞ্চাশ ও ষাটের মধ্যে সারা বিশ্ব জুড়ে এমন কিছু ভালো ছবি তৈরি হয়েছে যার শিল্পনির্মিত চলচ্চিত্র-ইতিহাসে বিশেষ সম্মানে চিহ্নিত। অথচ কুরোশাওয়ার শিল্প-প্রকরণে তার কোনোরকম প্রভাব চোখে পড়ে না। তাঁর সামগ্রিক শিল্পচেতনা এতই স্বতন্ত্র ও স্বকীয় ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল যে তিনি ছবি তৈরির ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট প্রথা বা তত্ত্ব অনুসরণ করেননি। অথচ সিনেমার আদি শর্ত ও নিয়ত পরিবর্তনশীল আঙ্গিক সম্পর্কে তিনি ভীষণ সচেতন ছিলেন। তিনি নিজের প্রয়োজনমতো পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন এবং পুরোনো প্রতিষ্ঠিত টেকনিককে একেবারে অভিনব প্রণালীতে প্রয়োগ করেছেন তাঁর ছবিতে। এক অর্থে কুরোশাওয়ার প্রতিটি ছবিই তাঁর নিজস্বতার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন। তাঁর সহযোগী চিত্রনাট্যকারদের সঙ্গে তাঁর কাজের এত বেশি সাযুজ্য থাকে যে একাধিক ব্যক্তির চিত্রনাট্য সবেও ছবি থেকে একটা অদ্ভুত সংহতির রূপ ফুটে ওঠে। চিত্রনাট্য, গুটিং ও সম্পাদনা—এই তিনের মধ্যে ছবি তৈরির ক্ষেত্রে তিনি সম্পাদনাকে অগ্রগণ্য মনে করেন। তিনি নিজে একজন দক্ষ চলচ্চিত্র সম্পাদক। ১৯৫২-র পর থেকে নিজের সব ছবির সম্পাদনা তিনি নিজেই করেছেন। এমন

অনেক ছবি আছে যেখানে তিনি একসঙ্গে পাঁচজন চিত্রনাট্যকারকে নিয়ে কাজ করেছেন। যেমন তাঁর ১৯৭০-এ তৈরি ছবি ‘ডোডেস্কাডেন’। ছবির গোড়াতেই তিনি কেন্দ্রীয় চরিত্রদের প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রথমাধি শিল্পরীতির ঝাঁকটা এই দিকেই। তারপর বিভিন্ন সিকোয়েন্সের মাধ্যমে, তাদের নানা আচার-আচরণের ভেতর দিয়ে মূল চরিত্রের তিনি বিবর্তন ঘটান। আসলে কুরোশাওয়া মূল চরিত্রের এক ধরনের ‘টোটালালিটি’তে আগ্রহী। সেই সঙ্গে ছবির বিভিন্ন দৃশ্যশেষনের পূর্ণতাও তাঁর ছবির অপর গুণ। বিভিন্ন সমান্তরাল বা পরস্পরবিরোধী ঘটনার মধ্য দিয়ে মূল চরিত্র কিভাবে বিবর্তনের পথে চারিত্রিক পূর্ণতা লাভ করেছে তিনি সেটাই তুলে ধরেন। তিনি চিত্রনাট্যের বিচার অমুযায়ী, কাহিনীর ক্রম অনুসারে একেবারে গোড়া থেকে পরপর দৃশ্যের ধারা অমুযায়ী গুটিং করেন, তারপরে তাকে সম্পাদনার মাধ্যমে চূড়ান্ত রূপ দেন। তাঁর মতে এতে ছবির গল্পের মূল প্রবাহমানতা অর্থাৎ কাহিনীর নিজস্ব flow বজায় থাকে।

কুরোশাওয়া তাঁর ছবিতে শব্দ ও সংগীত প্রয়োগের ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেন। একটি হলো, সিকোয়েন্সের দৃশ্যকে অর্থবহ করে তোলা ও তার গভীরতা ও গুরুত্বকে প্রয়োজনে অনেক গুণ বাড়িয়ে তোলা। অপরটি হলো, দৃশ্যের বিকল্প রূপ গড়ে তোলা, কোনো কোনো জায়গায় তার এফেক্ট বদলানো। সংগীত প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি কোনো বিশেষ tune বা সংগীতাংশকে ‘রেকারিং থীম’ হিসেবে ব্যবহার করেন। ‘ইকিরু’ ছবির শুরুতে প্রথম নায়ক ওয়াতানবীর অহুহতার সংবাদ দর্শকদের দেবার সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত বিষম স্বর বেজেছে যা গোটা ছবিতে ওয়াতানবীর বিভিন্ন উপস্থিতিতে টুকরো টুকরো ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ‘Lower Depth’ ছবিতে যে কটা লোকগীতি বা গান আছে তার সবগুলোই অভিনেতার নিজেই গেয়েছেন। ছবির বাস্তবতার ক্ষেত্রে সেটা ভীষণ কাজে লেগেছে। ‘ডোডেস্কাডেন’ ছবিতে অপ্রকৃতিস্থ কিশোর যখন বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে তখন একটা বিশেষ স্বর তাকে অনুসরণ করে এবং সে যখন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে আসে ঐ স্বরটা আবার শোনা যায়। কিন্তু গোটা ছবিতে অল্প কোথাও স্বরটা ব্যবহৃত হয়নি। ‘দানশিরো’র final fight sequence-এ যে music আছে তা ছবির আর কোথাও নেই। ‘হাই এ্যাণ্ড লো’ ছবিতে প্রতিটি রহস্যময় আধিকারের সময় একটা বিশেষ স্বর বারবার ফিরে ফিরে ব্যবহৃত হয়েছে। ‘দেরসু উজালা’র একটা ‘থীমসঙ’ আছে যা প্রথম ব্যবহৃত হয় ক্যাম্পফায়ারের সময় আর্সেনিয়েভের সৈন্যদের কণ্ঠে। তাই-ই পরে ঘুরে ফিরে এসেছে ছবিতে।

তঁার অধিকাংশ ছবির অতীতমুখী বিষয়বস্তুই প্রমাণ করে যে শৌর্যবীর্যময় ঐতিহ্যশালী জাপানের মর্যাদা, গৌরব সম্পর্কে তঁার একটা তীব্র নস্টালজিয়া নিয়ত সক্রিয় ছিল। তিনি কারুর কারুর কাজের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু ছবি করেছেন একেবারে নিজস্ব ঢঙে। আবেল গাঁস, জন ফোর্ড, হাওয়ার্ড হক্‌স, জর্জ স্টিভেন্স, ফ্র্যাঙ্ক কাপরা, উইলিয়াম ওয়াইলার প্রমুখ চলচ্চিত্র স্রষ্টার কাজে তিনি অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। নিজের দেশের পরিচালকদের মধ্যে তিনি কেনজি মিজো-গুচিকে শ্রদ্ধা করেন। মিজোগুচির মতোই তঁার ছবিতে দেশজ গৌরব, অতীত, জনগণ এবং সংস্কৃতির প্রতি আস্থা ও মমত্ব ভীষণ চোখে পড়ে। সত্যজিৎ প্রসঙ্গে যেমন সমালোচকের মন্তব্য ‘most Indian-fashioned citizen of the world’, কুরোশাওয়া সম্পর্কেও একইভাবে বলা যায় তিনি জাপানি ঐতিহ্যে লালিত এক প্রথম শ্রেণীর আন্তর্জাতিক স্রষ্টা। আঙ্গিকের দিক থেকে তঁার ছবিতে জাপানিস্থলত বিজ্ঞানের চেয়ে পশ্চিমী ঢঙ অনুসৃত হলেও তঁার ছবির বিষয় ও আত্মা দেশজ-সংস্কৃতির মূলে শিকড় বিস্তার করে আছে। কুরোশাওয়া বলেছিলেন ‘If I ever lost my passion for films, then I myself would be lost...Film is what I am about’। এতে বোঝা যায় চলচ্চিত্র-শিল্প ব্যাপারটা তঁার মজ্জায় মজ্জায় জড়িয়ে আছে।

অধিকাংশ ছবিতেই তঁার লক্ষ্য মানুষের মূল্যবোধ অর্জনের ইতিহাস চিত্রণ। নিছক কাহিনীবিশ্বাসে, চলচ্চিত্রের আধুনিক প্রকরণের চমকে তঁার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই। বক্তব্যকে স্বচ্ছ বিশ্বাসে প্রাঞ্জলভাবে দর্শকদের বোধ ও বুদ্ধির কাছাকাছি পৌঁছে দিতে যেটুকু রীতি প্রকর্ষের প্রয়োজন, সেটাই তঁার প্রাথমিক অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। তঁার শিল্পজগৎ সমুদ্রের মতো বিশাল ও গভীর। গোকি, দত্তয়েভ্‌স্কি, শেক্সপীয়র প্রমুখ মহান সাহিত্যিকদের রচনা তঁার চলচ্চিত্রে নতুন মর্যাদায় চিহ্নিত হয়েছে। ‘দ্য থ্রোন অব ব্লাড’ ছবিতে শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথের ভাষ্য থেকে সরে এসে তিনি মৌলিক যে শিল্পরূপের পরিচয় দিয়েছেন সেখানে তঁার স্বকীয় প্রজ্ঞা দ্বঃসাহসিক শিল্পবোধে স্মরণীয় হয়ে আছে। শেক্সপীয়রের ‘কিং লীয়ার’ অবলম্বনে তৈরি তঁার ‘রয়ান’ ( ১৯৮৫ ) ছবিটিও সমভাবে তঁার বিরল প্রতিভা ও অভিনব নির্মাণ কল্পনার বিরলতাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। ‘দ্য থ্রোন অব ব্লাডের’ তিন বছর পূর্বে তৈরি ‘সেভেন সামুরাই’ ( ১৯৫৪ ) ছবিটি কুরোশাওয়ার নিপুণ ইতিহাস বোধ, সশ্রদ্ধ ঐতিহ্য চেতনা ও অসাধারণ শিল্পদক্ষতার নিদর্শন স্বরূপ জাপানি সিনেমায় অনন্য হয়ে আছে। ১৯৬৩-তে তৈরি ‘হাই এ্যাণ্ড লো’

ছবিতে তিনি সমাজের দুটি প্রতিনিধি চরিত্রের মধ্য দিয়ে সামাজিক পাপবোধ ও নীতিবোধের দৃষ্টিকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। 'রেড বিয়ার্ড' (১৯৬৫) ছবিতে তিনি এক দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রধান চিকিৎসকের মহান কর্তব্যবোধ, প্রবল আত্মবিশ্বাস, স্নেহ-মমতা, অটল মানবতাবোধের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন। 'দেবস্ব উজালা' (১৯৭৫) ছবিতে তিনি বিশাল প্রকৃতির পটভূমিতে প্রকৃতি ও মানুষের পারস্পরিক অবস্থান, দুটি শ্রেণী-চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক, দুটি চরিত্রের ঐক্যতা ও মানবিক বোধের অনবদ্য চিত্র তুলে ধরেছেন। 'কাগেমুশা' (১৯৮০) ছবিতে তিনি আবার ফিরে গেছেন শীর্ষবীর্ষময় জাপানের অতীত ইতিহাসের পর্বে। ব্যক্তিসত্তার বৈপরীত্য, বাস্তব ও কল্পনার সংঘাত, চারিত্রিক অলস, পদদর্শাদা, নীতিহীনতা ও তুচ্ছ মানুষের বৃহৎ প্রকল্পে আত্মোৎসর্গ ইত্যাদি অসংখ্য ব্যাপার তাঁর মহতী শিল্প কল্পনায় বর্ণনায় হয়ে উঠেছে। যেমন 'ড্রীম্‌স্' (১৯৯০) আফ্রিক অর্থেই বর্ণনায় নিগূঢ় স্বপ্নময়তায়।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে তাঁর প্রায় সব ছবিতেই একটা moral ছবির শেষে রেশ রেখে যায়। অতিমাত্রায় আশাবাদী বলেই সব ছবিই শেষ পর্যন্ত একটা উত্তরণের ইংগিতে শেষ হয়। রশোমন, হিডেন ফরট্রেস, সেভেন সামুরাই, ইকিরু, রেড বিয়ার্ড, ইয়াজিষো, মানশিরো, ডোডেস্কাডেন, দেবস্ব উজালা—সব ছবিই আমাদের একটা মানবিক উত্তরণের দিকে আকৃষ্ট করে। প্রচলিত জাপানি ছবির তুলনায় তাঁর ছবির গতি অনেক বেশি dynamic। জাপানি ছবির স্লথ-গন্তীর গতিকে তিনি প্রবল উদ্যমতার মধ্যে মুক্তি দিয়েছেন। সিনেমার গতির ক্ষেত্রে তিনি প্রতীচ্যের ভঙ্গি অনুসরণ করেছেন তবু তাঁর ছবি চিরায়ত জাপানি সংস্কৃতি বিচ্ছিন্ন নয়।

১৯৪৩ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত তিনি ছবি করেছেন তিরিশটি। তাঁর রচিত চিত্রনাট্য অবলম্বনে অত্যাগ্ণ চলচ্চিত্রকার পরিচালিত ছবির সংখ্যা প্রায় বাইশটি। কুরোশাওয়া রচিত ছয়টি চিত্রনাট্য চলচ্চিত্রায়িত হয়নি এখনো।

কুরোশাওয়া এমনই এক মহান চলচ্চিত্র শ্রষ্টা যিনি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার তাবৎ স্বরূপকে বিশ্বজনীন করেছেন। তাঁর জাপান কেবল সুদূর প্রাচ্যের কোন দ্বীপ নয়, সমগ্র বিশ্ব প্রতিফলিত তাঁর কল্পনায়। কাবুকী নাটক, প্রাচীন জাপানি চিত্রকলা, লৌকিক উপকথা, দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, নন্দনতত্ত্ব কোনটাই তাঁর ছবিতে অনুপস্থিত নয়। আত্মীয় বিশিষ্ট জাপানি হয়েও দেশায়তনের বাইরে তাঁর বিশ্বচেতনাকে শিল্পের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন তিনি।

সোমেন ঘোষ

[ তাঁর চলচ্চিত্রের আন্তর্জাতিকতার একটা বড়ো কারণ মানবিকতায় তাঁর বিশ্বাস । তাঁর ছবিতে মানুষের দুর্বলতার মধ্যেই মানবিক গুণের সন্ধান মেলে । যে কারণে তিনি কখনো মানবিকতায় আস্থা হারান না । তাঁর চলচ্চিত্রের বিশ্বজনীন আবেদন এইখানে । তাঁর 'ইকিফ'র মতো এত গভীর আশাবাদী শিল্পনিদর্শন বিশ্বচলচ্চিত্রের ইতিহাসে আর দুটো নেই । তাঁর বহু ছবিই মানুষের প্রত্যয় অর্জনের শিল্পেতিহাস । তাঁর স্বকীয় অভিজাত আন্তর্জাতিক চিত্রাদিকের মধ্যে জাপানি ঐতিহ্যের উপাদানের প্রমাণ বৃত্তরচনা ও পুনরাবর্তনে । বৃত্তগুলি রচিত হয় কখনো বক্তব্যে, কখনো বা রীতিবৈচিত্রে । যেমন রশোমন তোরণ দৃশ্যে শুরু হয়ে সমাপ্তিতে সেখানেই ফেরে । থে'ন অব ব্লাডের প্রথম ফ্রেম কুয়াশা প্রাসাদ ও সমবেতধ্বনি, শেষ ফ্রেমও তাই । একাধিক ছবিতে ঘটে বাস্তবে শুরু হয়ে কালক্রমে তারই ইলুশনে প্রত্যাবর্তন । ]

রচিত গ্রন্থ : সামথিং লাইক অ্যান অটোবায়োগ্রাফি ।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : ডোনাল্ড রিচার দি ফিল্ম অব আকিরা কুরোশাওয়া ॥

॥ ল্যেভ কুলেশভ ॥

( ১৮৯৯-১৯৭০ ) । সোভিয়েত ফিল্ম-তাত্ত্বিক । তিনি ত্রিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে মস্কোয় চলচ্চিত্রবিদ্যা অধ্যাপনা করেছেন । পুদভকিন প্রমুখ ছিলেন তাঁর ছাত্র । রুশ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কয়েকটি প্রজন্মকে তিনি প্রভাবিত করেছেন । দর্শকের উপর চলচ্চিত্র-ভাষার প্রভাবের সম্ভাবনায় তিনি ছিলেন আবিষ্ট । এই প্রসঙ্গে তাঁর বিখ্যাত 'কুলেশভ ইফেক্ট'-এর কথা উল্লেখযোগ্য । সম্পাদনা পদ্ধতির ক্ষমতা কতখানি দেখার জন্তে তিনি একটি পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করেন । পরীক্ষাটি হলো : একটি স্থির মুখের লম্বা শটকে তিনটি খণ্ডে কাটা হয় । এই তিনটি খণ্ডের মধ্যে জুড়ে দেওয়া হয় আরো তিনটি বিভিন্ন শট—এক বাটি সুপ, একটি মৃত স্ত্রীলোক, আর, একটি মেয়ে খেলা করছে । এবার ছয়টিশট এইভাবে পর্দায় দেখানো হলো—সুপ+মুখ+স্ত্রীলোক+মুখ+মেয়ে+মুখ । দর্শকের অভিজ্ঞতা হলো এই যে স্থির মুখটির ভঙ্গি বিভিন্নভাবে পাণ্টে গেল পার্শ্ববর্তী শটের জন্ত । বস্তুত মুখের ভঙ্গি কিন্তু সর্বদা একই ছিল । অর্থাৎ যখন একটি শটের পিছু পিছু আরেকটি শট অনুসরণ করে তখন এমন একটি অর্থ সৃষ্টি হয় যেটি দুটি শটের মধ্যে কোনটিতেই নেই । যদি প্রথম শটটি হয় 'ক' এবং দ্বিতীয়টি 'খ' তাহলে 'ক+খ=গ' অর্থাৎ দুটিতে মিলে তৃতীয় একটি ফিল্ম ইমেজ বা প্রতিক্রমের সৃষ্টি হবে । মনতাজ

তাত্ত্বিকরা এই চিন্তার দ্বারা যথেষ্ট এবং যথার্থ প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। মনতাজ বিষয়ে কুলেশভ-এর অত্যন্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষাও আছে। এ বিষয়ে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যে ফর্মালিজম বা গঠনতাত্ত্বিকতা নিহিত ছিল, তার কারণে রুশ সরকারের সঙ্গে তাঁর বারবার বিরোধ ঘটেছে, তাঁর কর্ম-জীবন ব্যাহত হয়েছে। তবুও তিনি প্রায় মৃত্যু অবধি মস্কো কিন্ন ইনস্টিটিউটে অধ্যাপনা করে গেছেন।

গান্স\* রোবের্জ

॥ প্রিগরি কোজিন্ৎসেভ ॥

১৯০৫-১৯৭৩)। পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়ার ঋপদী চিত্রপরিচালক। প্রাবন্ধিক ও নাট্যপরিচালকও। কোজিন্ৎসেভের চলচ্চিত্রে দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। দি নিউ ব্যাবিলন, ম্যাক্সিম ট্রেলজি প্রভৃতি ছবির অল্পতর বা অল্পতম পরিচালক রূপে তিনি দ্বন্দ্বমূলকতায় ও শিল্প রাজনীতিকে বাদ দিয়ে নয়—এই ধারণায় বিশ্বাসী। ম্যাক্সিম কেন্দ্রিক ছবি তিনটি এক আদর্শ পার্টিকর্মীর জীবন ও অভিজ্ঞতার মাস্ট্রীয় চিত্ররূপ। প্রতিতুলনার জন্য তারকোভ্‌স্কির ইতানের ছেলে-বেলাকে এর পাশে রাখা যেতে পারে। আবার ঋপদী সাহিত্য—ডন কুইকজোট ( ১৯৫৭ ), বা শেক্সপিয়ারের হ্যামলেট ( ১৯৬৪ ), কিং লীয়ার ( ১৯৭২ ) ইত্যাদির চিত্রায়ণে ও তাঁর নির্ধাক যুগের চলচ্চিত্রকর্মে তিনি ইমেজের গভীরতা ও বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের পক্ষপাতী। এই সব ছবিতে শিল্প ও জীবনের, জীবন এবং ইতিহাসের, ইতিহাস আর কালচেতনার অবিরল স্থানবিনিময় আছে। হ্যামলেটের মতো ছবি অবশ্য মূলগতভাবে দ্বন্দ্ববাদীও—‘কোজিন্ৎসেভের হ্যামলেট শুধু বুর্জোয়্যার ঐতিহাসিক সৃষ্টিশীল ভূমিকাটুকুই পালন করে না : পৃথিবীর পান্টানোর চেষ্টায় সে মাস্কের ভাষায় মানবিক মুহূর্তগুলির চিত্রায়ত অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করে, মাস্কের activity, essence ও action-কে সমার্থক বলে প্রমাণ করে।’ বলে বলা যায়, কোজিন্ৎসেভে লক্ষিত ধারা দুটির উৎস কিন্তু এক। তাঁর শেক্সপিয়ার-চিত্রণ সোভিয়েত দিনেমার ‘যুদ্ধ ও শান্তি’ ধর্মী ঋপদী চলচ্চিত্রের অপরিহার্য অংশও।

এক বিশুদ্ধ নান্দনিক রস যা সার্থক সাহিত্য পাঠে বা উচ্চাঙ্গ সংগীত শ্রবণে লভ্য কোজিন্ৎসেভের ছবিতে তার আশ্বাদ মেলে। তাঁর ছবিতে অভিনয় ও সংগীতের বিশেষ ভূমিকা। বিশ্ববিখ্যাত সুরকার সোস্টাকোভিচের সংগীত তাঁর বহু ছবির অল্পতম প্রধান সম্পদ। আমি জোরের সঙ্গে মনে করি, সোভিয়েত

সিনেমার রাজপথটি আইজেনস্টাইন থেকে ভারকোভস্কি পর্যন্ত গেছে কোজিনুৎ-সেভের মধ্য দিয়ে ।

রচিত গ্রন্থ : শেল্পিয়র : টাইম অ্যাণ্ড কনসেন্স ॥

॥ দি ক্যাবিনেট অব ডক্টর কালিগারি ॥

১৯১৯, জারমানি। যে যুগে এই ছবিটি তৈরি হয়েছিল চলচ্চিত্রের ইতিহাসে প্রকাশবাদের যুগ সেটিই। রবার্ট ভিনে (১৮৮১-১৯৩৮) পরিচালিত ৭৫ মিনিটের এই নির্বাক ছবিটি চলচ্চিত্রের ইতিহাসে আজো একটি উল্লেখযোগ্য দিক্‌চিহ্ন। চলচ্চিত্রের প্রয়োগকৌশলের ক্ষেত্রে ছবিটি এমন কিছু রীতি ও পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছিল যা অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। খবরের কাগজে হামবুর্গের একটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনার রিপোর্ট পড়ে চিত্রনাট্যকাররা সেটিকে একটি ট্রিটমেন্টের আকারে দাঁড় করান এবং ভিনে এক্সপ্রেসনিজম বা প্রকাশবাদের স্টাইলকে অনুসরণ করে সেই গল্পটির চিত্ররূপ দেন। সাহিত্যে, ভাস্কর্যে, নাটকে এবং চিত্রকল্পের ক্ষেত্রে এই রীতিটি (ড্র. এক্সপ্রেসনিজম) বেশ কিছুটা ছড়িয়ে পড়লেও চলচ্চিত্রে এর প্রথম প্রয়োগ হয় দি ক্যাবিনেট অব ডক্টর কালিগারি ছবিতেই।

এই অপরাধধর্মী অতিনাটকীয় কাহিনীটির মুখ্য চরিত্র হলেন ড. কালিগারি নামে একজন বিকৃত মনস্তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক। এই লোকটি একটি মাহুসকে সম্বোধিত করে এবং তাকে স্বপ্নচারী করে তার সাহায্যে একের পর এক হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যেতে থাকে। গোটা কাহিনীটা বলা হয়েছিল সত্যাত্মবোধী এক যুবকের দৃষ্টিকোণ থেকে। ছবিতে কিন্তু কালিগারিকে করা হয়েছিল পাগলা গারদের পরিচালক এবং যুবকটিকেই দেখানো হয়েছিল উন্মাদ হিসাবে। যার ফলে ছবিটিতে এমনভাবে দৃশ্যসজ্জা এবং ঘটনার উপস্থাপনা করা হয়েছিল যাতে মনে হয়েছিল দর্শক ঘটনাগুলিকে অনুভব করছেন একজন পাগলের দৃষ্টিকোণ থেকে। একজন উন্মাদের ছঃস্বপ্নের মধ্যে বস্তুজগৎ তার চোখে যেভাবে প্রতিভাত হতে পারে, সেইভাবেই এই ছবির সেট-সেটিংগুলিকে তৈরি করা হয়েছিল। এই ছবির আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রে এক অভিনব স্টাইল। সব মিলিয়ে ছবিটি কিছু পরিমাণে 'ফটোগ্রাফড থিয়েটার'-এর রূপ নিয়েছিল। চিত্রগ্রহণের সময় ক্যামেরাতে লং শট এবং মিডিয়াম শটেই বেশি দৃশ্য নেওয়া হয়েছিল এবং ক্লোজ আপের ব্যবহার করা হয়েছিল খুবই সামান্য। ছবির কোনো কোনো ফ্রেম অস্বাভাবিক দৃষ্টিকোণ থেকেও গ্রহণ করা হয়েছিল। সবকিছুর ফলস্বরূপ ছবিটি

দর্শকের মননক্রিয়ায় রীতিমতো আলোড়ন এনেছিল। ১৯৩০ সনে জার্মানিতে এই ছবির একটি প্যারডি নির্মাণ করা হয়েছিল।

চিত্রনাট্য : এই ছবির অন্ততর চিত্রনাট্যকার কার্ল মায়ার, চিত্রগ্রহণ W. Hameister, শিল্প নির্দেশনা W. Rohrig, W. Reiman, H. Warm ; অভিনয় Krauss, Veidt, Dagover, Feher ।

রুজুত রায়

॥ ক্যামেরা ॥

চলচ্চিত্রকারের প্রধান হাতিয়ার হলো ক্যামেরা। লিখিত চিত্রনাট্যে যা পরি-  
কল্পনার পর্যায়ে থাকে তাকে চলচ্চিত্রে বাস্তবায়িত করার ভৌত দায়িত্ব ক্যামেরার।  
চলচ্চিত্র-ক্যামেরার দুটি দিক আছে, একটা তার টেকনোলজির দিক যা এখানে  
আলোচিত, আর একটা তার শৈল্পিক ও নান্দনিক দিক যার জন্ম ক্যামেরার ভাষা  
ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। ক্যামেরা একটি যন্ত্র, তার পাঁচটি মূল অংশ হলো—১. ইমেজ  
গঠনের জন্ম একটি ছিদ্র বা লেন্স ২. ভিউ ফাইণ্ডার যার সাহায্যে বোঝা যায়  
ফ্রেমে দৃশ্যবস্তুর কতটা ধরা পড়বে ও কীভাবে ৩. ফিল্ম নেগেটিভ ধরে রাখার জন্ম  
হোল্ডার ৪. লেন্সের নির্বাচিত অংশের ভেতর দিয়ে ছাড়া আর কোশোভাবে  
আলো যাতে নেগেটিভের ওপর গিয়ে পড়তে না পারে তার ব্যবস্থা বা ডায়াক্রাম  
ও ৫. এক্সপোজারকে সময়গতভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্ম শাটার। ক্যামেরা যন্ত্রটির  
প্রধান কাজ হলো দুটি—১. নির্দিষ্ট ইমেজকে ক্যামেরার মধ্যে পয়েন্ট অব  
ফোকসে এনে ধরা, ২. সেই ইমেজের ছাপ তুলে নেওয়ার জন্ম সঠিক জায়গায়  
ফিল্ম নেগেটিভকে প্রস্তুত রাখা। চলচ্চিত্র যেহেতু সচল চিত্র তাই কোনো নির্দিষ্ট  
ইমেজ বা কম্পোজিশনের ভেতরই দ্রুত পরিবর্তন ঘটে ও সেই পরিবর্তনকে ধারা-  
বাহিক ধরার জন্ম মুভি ক্যামেরার অভ্যন্তরে নেগেটিভের ধারাবাহিক সরবরাহ  
বজায় রাখতে হয়। ক্যামেরায় ইমেজ গঠনের ব্যাপারটি অর্থাৎ দৃশ্যবস্তু কী  
আকারে, কোন্ দৃশ্যকোণে, কেমন কম্পোজিশনে ধরা পড়বে এটা বিশেষভাবে  
লেন্সের ওপর নির্ভরশীল ( দ্র. লেন্স )। আর মুভি ক্যামেরার অভ্যন্তরে নেগেটিভের  
ধারাবাহিক গতি যে পদ্ধতিতে বজায় রাখা হয় তার নাম ট্র্যান্সপোর্ট পদ্ধতি।  
এর একদিকে একটা স্পুলে থাকে আনু-এক্সপোজড্ নেগেটিভ, অন্তর্দিকে আর একটা  
স্পুলে গোটানো থাকে ও গুটিয়ে যেতে থাকে এক্সপোজড্ নেগেটিভ। দুটি স্পুলের  
মধ্যে মাঝামাঝি জায়গায় থাকে ফ্রেম গেট যেখানে পয়েন্ট অব ফোকসে এনে

ধরা ইমেজকে ফিল্ম নেগেটিভের ওপর এক্সপোজ করা হয়। এক্সপোজ করার অর্থাৎ শাটার খোলার ঠিক আগের মুহূর্তে ফ্রেম গেটের মধ্যে বিশেষ নেগেটিভ-ফ্রেমটি স্থির হয়ে দাঁড়ায় ও পর মুহূর্তে শাটার খুলে গিয়ে ওই ফ্রেমের ওপর ইমেজ এক্সপোজড হয়। এই ফ্রেমটি সরে যায় ও পরের ফ্রেমটি ফ্রেম গেটের মধ্যে মুহূর্তের জন্ত স্থির হয়ে দাঁড়ায়। পুরো ব্যাপারটা চলে এইভাবে—প্রতি সেকেন্ডে ২৫শর্টা করে ফ্রেমের মাধ্যমে। অর্থাৎ নেগেটিভের ধারাবাহিক গতি ছাড়াও আর একটা গতি থাকে সেটা এক্সা-দোক্রা খেলার গতির মতো বা *intermittent motion*। সমস্ত পদ্ধতিটি যান্ত্রিকভাবে চালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এর জন্ত ক্যামেরায় থাকে একটা স্পাইন্ডল বা ব্যাটারি বা বিদ্যুতের সাহায্যে ক্যামেরাকে কার্যকর বা সক্রিয় করে তোলে। ক্যামেরাকে এইভাবে কর্মশক্তির যোগান দেয় যা তার নাম মোটর। যে ভিউ ফাইণ্ডার ফ্রেমে যা ধরা পড়বে ক্যামেরাম্যানকে আইপীসে ঠিক তাই দেখার সুযোগ করে দেয় তাকে বলে রিফ্লেক্স ভিউ-ফাইণ্ডার। এটা তখনই সম্ভব যখন ১. ক্যামেরালেন্স ও আইপীসের দৃশ্যবিন্দু ও দৃশ্যকোণ এক হয় ২. উভয়ের অক্ষরেখা হয় সমান। এই পদ্ধতিতে দৃশ্যবস্তুর আইপীসের পরিপ্রেক্ষিতে ফোকসে থাকলে, নেগেটিভ ফ্রেমের পরিপ্রেক্ষিতেও ফোকসে থাকে। শাটার হলো একটা পাতলা অর্ধবৃত্তাকার চাকতি যা নিজের কেন্দ্রীয় অক্ষের ওপর ঘূর্ণনক্ষম। শাটার টিপলে তা নিজের স্থান থেকে ঘুরে সরে গিয়ে দৃশ্যবস্তু থেকে আগত আলোকে নেগেটিভের ওপর পড়তে দেয় ও তারপর আবার পূর্ববর্তী অবস্থানে ফিরে যায়। সাধারণত শাটার প্রতিটি ফ্রেমের জন্ত  $1/80$  সেকেন্ড করে খোলা থাকে ও প্রতি সেকেন্ডে ২৪টি করে ফ্রেমকে এক্সপোজড করে। ক্যামেরায় আলাদাভাবে লেন্স ও ফিলটার পরানো যায় তার জন্ত লেন্স ও ফিলটার ড্রষ্টব্য। যে মুক্তি ক্যামেরায় ছবি তুলতে গেলে শব্দ হয় অর্থাৎ যাতে সাইলেন্ট শ্যুটিং করতে হয় তাকে সাইলেন্ট ক্যামেরা ও যাতে শব্দ হয় না তাকে সাউণ্ড ক্যামেরা বলে। কেননা এই ক্যামেরায় ধনি ও সংলাপ সহ শ্যুটিং করা যায়। এই ক্যামেরায় বিশেষ ধরনের মোটর থাকে। মুক্তি ক্যামেরা ৮ মি. মি, ১৬ মি. মি, ৩৫ মি. মি, ৭০ মি. মি, নানা ধরনের হয় ও নির্দিষ্ট ধরনের ক্যামেরায় শুধু ওই নির্দিষ্ট ফর্ম্যাটের ফিল্ম নেগেটিভ ব্যবহার করেই ছবি তোলা সম্ভব। অ্যারিস্কোপ এস-এর মতো ভালো ক্যামেরায় জুম লেন্স, ১৬ মি. মি হলে ৪০০ ফুটের স্পুল ও ক্যামেরা বসাবার জন্ত স্ট্যাণ্ড থাকে। আরো দামী অ্যারিস্কোপ ক্যামেরায় আরো সুযোগ সুবিধা ও পরিশীলনের ব্যবস্থা আছে, ৩৫ মি. মি এই ক্যামেরার স্পুল ১০০০

ফুটের। ক্যামেরার সাহায্যে ভালো ছবি তোলা নিঃসন্দেহে ক্যামেরাম্যানের ফিল্ম সেন্সের ওপর নির্ভরশীল, তারই সম্মুখে তা নির্ভর করে Raw film stock-এর মান, ক্যামেরাম্যানের দক্ষতা ( সঠিক ফোকাস করা ও সঠিক এক্সপোজার দেওয়া [ নিখুঁত আলোকপাতে সাহায্য করার জন্য ক্যামেরাম্যান বা তাঁর সহকারীর কাছে থাকে এক্সপোজার মিটার ], ক্যামেরাচালনার সময়ে হাত না কাঁপা, লেন্স ও আলোর সঠিক নির্বাচন, ইত্যাদি ) ও এক্সপোজড্ ফিল্মের নিখুঁত পরিস্ফুটনের ওপর। ( ড. চলচ্চিত্রের টেকনোলজি )

ডবলিউ. এইচ. গ্রাইস

॥ ক্যামেরাকোণ ॥

সিনেমায় যে কোনো শটকে দুভাবে বিশ্লেষণ করা যায়, প্রথমত দৃশ্যবস্তুর থেকে ক্যামেরা কত দূরে আছে তার বিচারে, দ্বিতীয়ত ক্যামেরালেন্সের দৃষ্টিকোণ ( অ্যাঙ্গেল অব ভিশনের ) বিচারে। অর্থাৎ দূরত্ব ও অবস্থান-কোণ, দুটো উপাদানই ক্যামেরার পক্ষে সমান গুরুত্বের। একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব বিবিধ দৃশ্য-কোণের যে কোনোটিকে প্রয়োজন মতো বেছে নিতে পারে এবং দৃশ্যের কম্পোজিশনও দূরত্ব ও কোণ, যে কোনোটি পরিবর্তিত হলেই কম বেশি পরিবর্তিত হয়। অবশ্য বিশেষ ধরনের লেন্সের ব্যবহারে দূরত্ব ও কোণের পারস্পরিক সম্পর্কে, অর্থাৎ দৃশ্যের কম্পোজিশনকেও, কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব ( ড. ক্যামেরা, লেন্স )। ক্যামেরাশৈলীতে ক্যামেরাকোণের ভূমিকা বহুমুখী ও দূরপ্রসারী ( ড. ক্যামেরা-ভাষা )। বিশেষ ক্যামেরাকোণ যেমন বিশেষ দৃশ্যরস সৃষ্টি করতে পারে, তেমনি বিশেষ ভাব বা বক্তব্য বা মন্তব্যও তুলে ধরতে পারে। মাত্রিকভাবে ক্যামেরাকোণের অন্ততঃ তিনটে তল আছে—আই লেভেল, হাই অ্যাঙ্গেল, লো অ্যাঙ্গেল; যেমন গুণগতভাবেও অন্ততঃ তিনটে পর্যায় আছে—অবজেকটিভ (to portray reality as it is), সাবজেকটিভ (involving the spectator in the development of the film), পয়েন্ট অব ভিউ ( প্রথম ছটির মধ্যবর্তী এক পর্যায় )। ক্যামেরাকোণ তাই শুধু পারস্পেক্টিভ নয়, তার চেয়ে বেশি কিছু।

॥ ক্যামেরাভাষা ॥

দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের একটি নির্দিষ্ট অল্পপাতবিশিষ্ট পর্দায় ধারাবাহিকভাবে দৃশ্য পর্যায়ের প্রক্ষেপণের মধ্য দিয়ে ক্যামেরা প্রদর্শিত চিত্রের ঘটনাধারা ও বক্তব্যকে প্রকাশ

করে। পর্দায় দৃশ্যের পরিবর্তন হতে পারে তিন ভাবে—১. দৃশ্যবস্তুর নিজস্ব গতির ফলে, ২. ক্যামেরার গতিশীলতা বা ক্যামেরা মুভমেন্টের দরুন, ৩. সম্পাদনার মাধ্যমে। চলচ্চিত্রে দর্শক স্থির হয়ে থাকছেন, দৃশ্যের যাবতীয় গতি ও ধারাবাহিক প্রবাহ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্যামেরা দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। সুতরাং ক্যামেরা হলো চলচ্চিত্র (চলমান চিত্রের) বাহন। এই ক্যামেরা যেহেতু ত্রিমাত্রিক জগৎকে দ্বিমাত্রিক চিত্ররূপ দেয়, সেহেতু দৃশ্যবস্তুর কীভাবে চিত্রায়িত করা হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে চিত্ররূপের দৃশ্যরস, ভাবব্যঞ্জনা ও অভিধাত। এর জন্য দৃশ্যবস্তু থেকে ক্যামেরার দূরত্ব, তার প্রতি ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ, আলোক-সম্পাত পদ্ধতি, কম্পোজিশন নির্বাচন ও তাতে বিভিন্ন রঙ বা আলো ছায়ার বিভাজন, সমস্তই জরুরি। আর দরকার চিত্রপরিচালকের সঙ্গে আলোকচিত্রশিল্পীর সঠিক যোগাযোগ ও নিখুঁত সময়। কেননা চলচ্চিত্রে দৃশ্যজগৎ শুধুই বাস্তব নয়, শৈলীকৃতও বটে। তাই পরিচালক কোন কলাকৌশলের প্রয়োগে দৃশ্যকে চিত্রায়িত করছেন তা ক্যামেরাশৈলীর অপরিহার্য অঙ্গ। (ড. ক্যামেরাম্যান)।

দৃশ্যবস্তু থেকে ক্যামেরার দূরত্ব ক্যামেরাভাষার ক্ষেত্রে একটি প্রাথমিক উপাদান। বিগ ক্রোজ আপ, ক্রোজ আপ, মিড শট, লং শট ইত্যাদি আসলে অন্তর্ভুক্ত অক্ষে বিভিন্ন ক্যামেরাদূরত্ব। টপ লং, হাই অ্যাঙ্গেল ও লো অ্যাঙ্গেল শটের প্রতিটিই যেমন উল্লেখ অক্ষে বিভিন্ন ক্যামেরাদূরত্ব। বলা বাহুল্য, এই শটগুলি প্রতিটিই দূরত্ব ও কৌণিকতার যৌথ ভিত্তিতে নামাঙ্কিত। (ড. শট ও শটবিভাজন)। ক্যামেরাভাষায় ক্যামেরাদূরত্ব কোনো নিরপেক্ষ উপাদান নয়, সে ক্যামেরাকোণের সঙ্গে যুক্ত ও সম্পৃক্ত। প্যান করা, টিট আপ বা ডাউন করা ও ট্র্যাক করা—সমস্তই কোণ ও দূরত্বের যৌথ প্রয়োগ। ক্যামেরাকোণ তাই শুধু পারস্পেক্টিভ নয়, তার চেয়ে বেশি কিছু। বিশেষ ক্যামেরাকোণ যেমন বিশেষ দৃশ্যরস সৃষ্টি করতে পারে, তেমনি বিশেষ ভাব বা বক্তব্য বা মন্তব্যও তুলে ধরতে পারে। ক্যামেরাদূরত্ব, ক্যামেরাকোণ ও ক্যামেরা মুভমেন্ট একত্রে মিলে যতো কম সময়ের মধ্যে সম্ভব তার ভিতর বিশেষ কোনো দৃশ্যপর্যায়ের রূপ সৃষ্টি করে এবং তার প্রয়োজন, তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনা পূরণ করে। ছবি থেকে ছবিতে, এক যুগ থেকে অন্য যুগে, পরিচালক থেকে পরিচালকে ক্যামেরাভাষার পরিবর্তন হয় (ড. চলচ্চিত্রের শিল্পরূপ)।

একাধিক ক্যামেরা নিয়ে কাজ করা যায়, ক্যামেরাকে নানাভাবে ব্যবহার করা হয়, অপ্রচলিত কোণ / বিশেষ ধরনের ফ্রেমিং ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব আরোপ

করে নির্দিষ্ট জগৎ তৈরি করা যায়, ক্যামেরার কোনো কোনো প্রয়োগকে মোটিফের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয় ( ড্র. মোটিফ )। এর সঙ্গে থাকে দৃশ্যবস্তুকে কৃত্রিমভাবে আলোকিত করার পদ্ধতি, যার নাম লাইটিং। এই পদ্ধতি দৃশ্যকে শিল্পগত ভাবে সমৃদ্ধ করে তোলে। বলা হয়, অত্যাশ্চর্যভাবে নিখুঁত কম্পোজিশনে অতিরিক্ত মাত্রা বা অর্থ নিয়ে আসার জন্মই লাইটিং। যথার্থ এম্পোজারের কারণেই শুধু কৃত্রিম আলোকসম্পাত নয়, দৃশ্যের নাটকীয় ও নান্দনিক প্রয়োজন মেটাতে, দৃশ্যতল, দৃশ্যগঠন ও দৃশ্যগভীরতা যথাযথ করতে, আর ডিটেল / মোটিফ-এর প্রশ্নেও লাইটিং মূল্যবান (ড্র. লাইটিং)। খারাপ লাইটিং একটি ভালো কম্পোজিশনকে নষ্ট করে দিতে পারে, স্বতরাং এর গুরুত্ব আরও বাড়ছে।

একটি টেকনিক্যাল পদ্ধতিকে শিল্পসম্মতভাবেও কার্যকারী করে তোলা হলো ক্যামেরাভাষার কাজ ( ড্র. কালচেতনা, স্থানকালচেতনা )। চিত্রনাট্য ক্যামেরাভাষায় অনুবাদিত ও রূপান্তরিত হয়ে চলচ্চিত্র হয়ে ওঠে। চিত্রায়িত দৃশ্য বা দৃশ্যাংশের থাকে তিনটি দিক : প্রস্তুতি, প্রকৃতি, ব্যঞ্জনা ; ছটি করে অক্ষ : পুরোভূমি, পশ্চাদ্ভূমি ও অনুভূমি, উল্লম্বভূমি ; দুটি ঘনত্ব : একত্রে ও স্থানে স্থানে ; দুটি ক্রম : একই সঙ্গে ও পর পর। সাহিত্যরীতি ও দৃশ্যশিল্পের ভাষা থেকে এই সমস্ত নান্দনিক বৈশিষ্ট্য আহৃত হয়েছে। দৃশ্যগ্রহণ ও দৃশ্যবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এইসব বৈশিষ্ট্য এবং মাত্রাগুলির প্রতিটিই পৃথকভাবে ও তারা একত্রে সম্মিলিতভাবে ক্রিয়াশীল। আর একেকটিতে দৃশ্যগঠন ও দৃশ্যবিজ্ঞান মানেই অনেক সমস্তার সমাধান, অনেকখানি প্রাপ্তি। আমাদের স্বাভাবিক অঙ্গ যেমন প্রায় যে কোনো কাজ করতে পারে ক্যামেরাও এখন তেমনি হাত মুখ পায়ের মতো স্বাভাবিক অঙ্গ, যথার্থই বলা হয়েছে, camera can repeat, prolong, abbreviate, reverse, distort, abstract, split off or join up. হ্যাঁ, ক্যামেরা পুনরাবৃত্ত প্রদারিত সংকুচিত সম্বন্ধ সংক্ষিপ্ত বিপরীতগামী পশ্চাদ্গামী বিকৃত বিমূর্ত সংযোজিত বিভাজিত স্থির গতিময় উল্লম্বনকর—সমস্ত করতে পারে ও করে থাকে।

॥ ক্যামেরা মুভমেন্ট ॥

চলচ্চিত্রের দৃশ্যে পর্যাপ্ত গতিশীলতা আনার এক অত্যন্ত উপায় হলো ক্যামেরাকে গতিশীল করা, অর্থাৎ ক্যামেরা মুভমেন্ট। ক্যামেরা মুভমেন্ট নানাভাবে হতে পারে, প্যান (নিজের অক্ষের ওপর ক্যামেরার অনুভূমিক ঘূর্ণন) বা টির্ট (নিজের অক্ষের ওপর ক্যামেরার উল্লম্ব ঘূর্ণন) করিয়ে, চাকা লাগানো একটা প্ল্যাটফর্মের

ওপর ক্যামেরা বসিয়ে ওই প্র্যাটফর্মকে সচল করে ( যার নাম ডলি শট ), ওই প্র্যাটফর্মকে রেললাইনের মতো ট্র্যাকের ওপর দিয়ে ক্যামেরা সহ ছুটিয়ে ( যার নাম ট্র্যাকিং শট ) ও ক্যামেরাকে ক্রেনের ওপর স্থাপন করে চালনা করে ( যার নাম ক্রেন শট ) । ডলি বা ক্রেন শটের মধ্যেই ক্যামেরাকে প্যান বা টিষ্ট করিয়ে জটিলতর মুভমেন্ট আনাও সম্ভব । কোনো চলন্ত গাড়ি বা উড়ন্ত হেলিকপ্টারে ক্যামেরা রেখেও বিচিত্র মুভমেন্ট তৈরি করা যায় । জুম লেন্স ব্যবহার করে যখন কাছের জিনিশকে দূরে বা দূরের জিনিশকে কাছে আনা হয় তখনও গতি আসে । একটি পূর্ণ দৈর্ঘের ছবিতে ক্যামেরার কয়েকশো মুভমেন্ট থাকে । এই মুভমেন্ট হলো expressive of subjectivity. সমস্ত ক্ষেত্রেই ক্যামেরা মুভমেন্ট যাতে প্রয়োজনে আসে এবং তা পরিপূর্ণ, অর্থযুক্ত ও ব্যঞ্জনাদায়ক হয় তা লক্ষ্য করা দরকার, মুভমেন্টের সর্ব অবস্থাতেই কম্পোজিশন যাতে ফোকাসে থাকে তাও জরুরি । নান্দনিক বিচারে প্যান 'সেন্স অব স্পেস,' টিষ্ট 'সেনজেশন অব হাইট' ও বিশেষ কিছু প্রতি মনোযোগ, ট্র্যাকিং 'ট্র্যান্সফার অব ডাইমেনশনস' (দূরত্ব ও গভীরতার পরিবর্তনকে দৈর্ঘ ও প্রস্থের পরিবর্তন-বিভ্রমে রূপান্তরিত করা ) এবং জুম আকস্মিকতা, অভিঘাত ও নাটকীয়তা এনে দেয় । ক্যামেরা মুভমেন্ট স্থানকে সম্বন্ধ করে ও সময়কে সংক্ষিপ্ত করে । ক্যামেরা উড়ন্ত পাখির মতো, গড়িয়ে পড়া পাথরের মতো, চালিত কুঠারের মতো, নিক্ষিপ্ত ব্যুমেরাং-এর মতো, ছুটন্ত ঘোড়ার মতো বিভিন্ন ধরনের মুভমেন্টের স্রষ্টা । ক্যামেরাদূরত্বের মাত্রাগত দিক ক্যামেরা-কোণের গুণগত দিকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন শটকে যে quantitative-qualitative character দেয়, তার সঙ্গে ক্যামেরা মুভমেন্টের নান্দনিক ব্যঞ্জনা যুক্ত হয়ে শটের চূড়ান্ত quantitative-qualitative momentum গড়ে তোলে, যা মাধ্যম হিশেবে চলচ্চিত্রকে ও বিশেষ কোনো চলচ্চিত্রকর্মকে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট হয়ে উঠতে সাহায্য করে । ক্যামেরা মুভমেন্ট চলচ্চিত্রের ভাষার মূলগত বৈশিষ্ট্য । ওজুর ছবির মতো যে ছবিতে মুভমেন্ট নেই, বা কম, সাধারণ দর্শকের কাছে তা অচলচ্চিত্রীয় বলেই মনে হয় ।

## ১১ ক্যামেরাম্যান ॥

এটা একটা প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা যে ফিল্ম স্টুডিওর অভ্যন্তরে ক্যামেরাম্যান একজন সম্মানপ্রাপ্ত ফটোগ্রাফার ছাড়া আর কিছু নন—অস্তিত্বপূর্ণ বস্তুরমূহের ( যেমন, সেটের সামনে একজন অভিনেত্রী ) চিত্রগ্রহণের জন্মই তিনি দায়ী, এই অর্থে :

অভিনেত্রীর অবয়ব থেকে বয়সের চিহ্নগুলি অপসারণে এবং ফটোগ্রাফিক ইমেজ-  
গুলিতে চাকচিক্য দানের পরিমাণের উপরই তাঁর ক্ষমতা নিরূপেয়। সেটিংয়ের  
বাহ্য সাধুকে ক্যামেরাম্যানের প্রভাবমুক্ত নিয়তি হিশেবেই ধরে নেওয়া হয়।  
কিন্তু এই ধারণা সত্য থেকে অনেক দূরে।

যা আছে তার চিত্রগ্রহণ ছাড়াও পর্দায় একটা এফেক্ট কল্পনা এবং সৃষ্টি  
করারও প্রয়োজন হয় ক্যামেরাম্যানের—এমন একটা এফেক্ট যার ভিত্তি চারটি :  
চিত্রনাট্যের দাবী, পরিচালকের ধারণা, শিল্পনির্দেশকৃত মূল পটভূমি এবং চিত্র-  
গ্রাহকের নিজস্ব কল্পনা। যে বিষয়টি আমরা প্রায়ই ভুলে যাই তা হলো এই যে,  
প্রথম তিনটির প্রভাব যা-ই হোক না কেন—এবং সর্বময় প্রধান—দ্বিতীয়টিকে  
আমরা তুচ্ছ করছি না বা বিস্মৃত হচ্ছি না—চূড়ান্ত সমীক্ষায় দেখা যায় ক্যামেরা-  
ম্যান এই তিনটি প্রভাবে যা ব্যাখ্যা করেন তাই পর্দায় ফুটে ওঠে। ক্যামেরাম্যান  
এই এফেক্টগুলি কীভাবে সৃষ্টি করেন? তিনি একটি বিশাল যন্ত্রের ভারপ্রাপ্ত।  
যেটির একমাত্র উদ্দেশ্য আলোকরশ্মিকে নিয়ন্ত্রণ করা। স্মরণ্য আলোই হচ্ছে  
সেই মাধ্যম যার দ্বারা তিনি চিত্রগুলি তৈরি করেন, আলোই তাঁর বর্ণাধারের  
একমাত্র রং। সেটের বিভিন্ন অংশ আলো এবং ছায়া দিয়ে ব্যঞ্জনাময় করেই  
তিনি তাঁর উদ্দিষ্ট এফেক্ট সৃষ্টি করেন, রচনা করেন দিনরাত্রির স্থূল এবং আলো-  
ছায়ার স্মৃষ্ণ ছন্দ যা আভাসিত করে পরিবেশ ও মুড। স্মরণ্য, কাহিনীভিত্তিক  
ছবির চিত্রগ্রাহকের ( তথ্য ও সংবাদ চিত্রের ক্যামেরাম্যানের বিপরীতে ) ভূমিকা  
কেবল কোনো কিছুর পুনর্নির্মাণই নয়, দৃশ্যবস্তুটি সম্পর্কে তাঁর ধারণা এবং  
কাহিনীর উপযুক্ত মুডে সেটাকে পর্দায় প্রকাশ করাও তাঁর অগতম কর্তব্য। অতএব  
পরিচালক এবং চিত্রগ্রাহকের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন  
—যদি না তাঁরা পরস্পরের কাছে অস্পষ্ট থাকতে চান ( কিংবা পরস্পর বিরুদ্ধা-  
চারী না হতে চান )। কেননা পরিচালকের নান্দনিক চাহিদাগুলিকে প্রকৃতপক্ষে  
শ্যুটিং-এর টেকনিক্যাল সম্ভাবনাগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যে আনতেই হয়। যেহেতু  
বাস্তব প্রয়োজনের স্বাতিরেই পর্দায় ভিসুয়াল পরিণতিটিকে ক্যামেরাম্যানের  
মজির ওপর চূড়ান্তভাবে ছেড়ে দিতে হয়, তাই চিত্রগত গুণগুলিকে বিচার করবার  
মাপকাঠি কী? যেসব চিত্রগ্রাহক একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ও স্তরে (key) কাজ  
করতে সর্বাপেক্ষা ভালো পারেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রতিটি ছবিতে একই  
ধরনের ট্রিটমেন্ট প্রয়োগ করেন, কারণ তাঁরা জানেন যে এর ফলেই ইমেজগুলি  
'দেখতে সুন্দর' হবে। অধিকাংশ আমেরিকান প্রথাভূগত ছবিই এরকম অল্পদৃষ্টি

উপায়ে তৈরি হয়। এই শ্রেণীর ক্যামেরাম্যানেরা 'রয়াল অ্যাকাডেমী'র সেইসব গভীর চিত্রকরদের সঙ্গে তুলনীয় যারা প্রায় একই কম্পোজিশনে, একই বর্ণ-বুনটে, একই রঙে, একই ছবি চিরকাল একে যান, কেবল বিষয়বস্তু মাঝে মাঝে ভিন্ন হয়। এর পরিণতি সফল, ট্রিটমেন্টও দক্ষ। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সৃষ্টিশীল মননের উত্তেজনা থেকে বেদনাদায়কভাবে বঞ্চিত। কিন্তু কয়েকজন চিত্রগ্রাহক আছেন যারা এদের থেকে স্বতন্ত্র, যারা ছবিতে ব্যক্তিগত আরোপ করে কিংবা বিষয়ের সঙ্গে দামঞ্জস্য রাখার জন্য ট্রিটমেন্ট বদল করে যা আছে তার অতিরিক্ত কিছু সৃজনপারগ। যেমন বিটজার, জোসেফ আগস্ট, ডানিয়েল্‌স, চার্লস ল্যাং, হেনরি মিলার, টোল্যাও, K. Struss, গুগার ফিশার, A. Scavarda, G. d. Venanzo, P. de Santis, R. Mate, নিক্‌ভিস্ট, কুতার, Figueroa, স্ত্রুত মিত্র প্রমুখ। দক্ষ ক্যামেরাম্যানের সংগ্রহে থাকে সেই সমস্ত প্রকৃত টেকনিক্যাল উপায় ও সম্ভাবনা যার সাহায্যে তিনি পরিচালকের বিমূর্ত ধারণাগুলিকে বাস্তবে রূপ দিতে পারেন। আর বড়ো ক্যামেরাম্যানদের এই দক্ষতা ছাড়াও থাকে টেকনিক্যাল উদ্ভাবনী শক্তি ও নিজস্ব শিল্পদৃষ্টি।

## ডগলাস স্কোশ্বে

॥ ফ্রেন শট ॥

ফ্রেন হলো একটি বৃহদাকার, চক্রবাহী যান যা একটি কৌণিক লোহদণ্ডকে উত্তোলিত করে রাখে। একটি ভারী ট্রলির উপর বসানো, তার সঙ্গে সংযুক্ত স্বদীর্ঘ কৌণিক রুম, রুমের শেষ প্রান্তে ছোট একটা প্ল্যাটফর্ম, তাতে পরিচালক ও আলোকচিত্রশিল্পীর বসার চেয়ার ও ক্যামেরা রাখার ঘূর্ণনক্ষম স্থান। এই রকম একটা ফ্রেনের সাহায্য নিয়ে ক্যামেরায় গৃহীত শটকে ফ্রেন শট বলা হয়ে থাকে। মাটি থেকে কুড়ি ফুট কি তারও বেশি উঁচুতে ক্যামেরা মুভমেন্ট এইভাবে পাওয়া যায়। জটিল ও কম্পোজিট ক্যামেরা মুভমেন্টে ও বড়ো মাপের দৃশ্য চিত্রায়ণে ফ্রেন শটের প্রয়োজন অনুভূত হয় (ড্র. শট বিভাজন)। ফ্রেন শটে একপ্রকার প্যানোরামিক ভিউ লভ্য। যা হেলিকপ্টার থেকে নেওয়া শটে আরও বেশি পাওয়া যায়।

॥ অঁরি জর্জ রুজো ॥

( ১৯০৭-১৯৭৭ ), ফরাসি পরিচালক। জন্ম থেকেই ভগ্নবাস্থ্য ও ক্ষীণদৃষ্টি রুজোর শৈশবে আগ্রহ ছিল চিত্রকলায়। কৈশোরে নৌ-বাহিনীতে তিনি শিক্ষানবিশিও

করেন। কিন্তু চিত্রকর বা নৌ-অফিসার হওয়া তাঁর হয়নি। নানান অভিজ্ঞতার পর শেষ পর্যন্ত তিনি হন চিত্রপরিচালক। তাঁর ছবি সম্পর্কে ফরাসি নিউ ওয়েভ পরিচালকেরা তীব্র আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে বলেছিলেন, তাঁর ছবি অত্যন্ত ভারী, অপ্রয়োজনে বর্ধিত এবং ক্লাস্তিকর ও প্রচলিত বিধি-বদ্ধ। কেবলমাত্র ফরাসি সমালোচকেরাই নন, পৃথিবীর সর্বত্র তাঁর শিল্পকর্মের মূল্যায়নে সমালোচকেরা নানা মত পোষণ করেছেন। একই ছবি উৎকণ্ঠাময় অভিনাটক হিসেবে সমালোচিত এবং অসাধারণ রোমাঞ্চকর চিত্রায়ণ হিসেবে অভিনন্দিত হয়েছে। চলচ্চিত্র পরিচালক হওয়ার কোন ইচ্ছেই কিন্তু প্রথমে তাঁর ছিল না। কূটনৈতিক বৃত্তি গ্রহণের ইচ্ছায় তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন কিন্তু পরে কূটনীতিবিদ হবার ইচ্ছা ত্যাগ করে, সাংবাদিক হিসেবে কিছুকাল কাঙ্ক্ষকর্ম করেন। ত্রাজিলের উপর তিনি একখানা বই লিখেছিলেন। তাঁর স্ত্রীও ওই দেশেরই মেয়ে। তাঁর একটি একাঙ্ক নাটকও প্রকাশিত হয়, আরও তিনটি নাটকও তিনি লিখেছেন। তিরিশের দশকে জর্মন ছবির ফরাসি ভাষান্তর এবং পূর্ণ দৈর্ঘ্য ছবির চিত্রনাট্য লিখতে আরম্ভ করে তিনি চলচ্চিত্র-জগতে সম্পূর্ণভাবে প্রবেশ করেন। পরবর্তী বছরগুলি ছিল বিচিত্র সব ইমেজ ও চিন্তাভাবনায় ভরা সময়, পুরস্কারপূর্ণ ও সমালোচনা-মুখর, যা নিজের অস্বস্থতা ও ঘনিষ্ঠদের মৃত্যুতে প্রায়শ ব্যাহত।

প্রথম ছবি থেকেই তিনি ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করেন। দ্বিতীয় ছবি *Le Corbeau* থেকে বহু বিতর্কিত পরিচালক হিসেবে চিহ্নিত হন আর তৃতীয় ছবি থেকে পেতে থাকেন ভেনিসে বা কানে স্বীকৃতি, ফরাসি গ্রাঁ পি বা অ্যাকাডেমী পুরস্কার। এই তথ্যসমাহার থেকে বিষয়গত বিচারে এসে আমরা দেখব তাঁর পৃথিবী লোভ এবং বিকৃত মানসিকতার, নির্ভুর স্বযোগ সন্ধান ও আধ্যাত্মিক একঘেয়েমির, ধর্ষকাম ও স্বেচ্ছা-স্বার্থপরতার এমনই একটি জগৎ যা অবিশ্বাস, বিরোধ, দ্বেষ ও অমানবিকতায় বিচ্ছিন্ন। তা কেবল উত্তেজনার নয়, অবিশ্বাসেরও ; রুঢ়তার নয়, ঘৃণারও। এর জন্ম তাঁকে মূল্যও দিতে হয়েছিল। *Les Diaboliques*-এ চিত্রকল্প এবং সেটের কল্পনাবিকার এত আতঙ্কজনক হয়েছিল যে গ্যুটিং চলাকালীন পরিশ্রম ও উত্তেজনায় তাঁর স্ত্রী, যিনি এই ছবির একজন অভিনেত্রীও, গুরুতর ভাবে অস্বস্থ হয়ে পড়েন। যে অস্বস্থ কয়েক বছর বাদে তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

যতই নিরাশাবাদী হোন না কেন তাঁর দক্ষতা ছিল অচিন্ত্যনীয়। তাঁর দৃশ্যরীতি ছিল, আজও লাগে সহজ ও সাবলীল। *Quai des Orfevres*-এ এই রীতি প্রথর বাস্তববাদী এবং পরিস্থিতির বুদ্ধিদীপ্ত উপস্থাপনায় চিহ্নিত। *Les Diaboliques*-এ

যেমন তা সার্বিক মোহমুক্তির, দর্শককে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করতে পেরেছেন। *Le Salaire de la peur* মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে একটি বিখ্যাত ফেবল, এর উপস্থাপনা এমন দক্ষভাবে শারীরিক উত্তেজনার সৃষ্টি করে যে রুজো তাঁর অভিনেতা ও দর্শকদের ঘামের শেষ বিন্দুটুকু পর্যন্ত আদায় করে নেন। *Le Mystere Picasso* তাঁর চূড়ান্ত স্বকীয়তার পরিচয়, অসাধারণভাবে আলোকাঙ্কিত তথ্যচিত্র যা চিত্রকরের অদ্ভুত কৌতুকপ্রিয়তাকে স্পষ্ট করে তুলেছে এবং এই ছবিটি এধাবৎ নির্মিত শিল্পসম্পর্কিত তথ্যচিত্রগুলির অন্যতম শ্রেষ্ঠ। কেবল সার্বিক আঙ্গিকের বিচারে নয়; *La Prisonniere*-এর কলাকৌশলগত সমৃদ্ধি, *Le Corbeau*-এ অবলিক ফ্রেমিংয়ের অপূর্ব ব্যবহার এবং শ্রবণ ও দৃশ্যজাত মনতাজ, *Le Mystere*তে ষ্টপ মোশন ও রিভার্স মোশনের প্রয়োগ ও দ্রুত গতি পরিবর্তন তাঁর সিনেমাটিক শৈলীর স্বকীয়তারও প্রমাণ। বালজাকের দর্শনে বিশ্বাসী বলেই তিনি হয়তো ছিলেন প্রকৃত অর্থে *distortion* প্রেমী। তাঁর সৃষ্ট শিল্প হয়তো মহব্বের কোনো প্রতীক নয় তবু নিজের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি তিনি ছিলেন পুরোপুরি সৎ। এবং নিজের সারা জীবন ধরে তিনি সেই সত্যতার দাম দিয়ে গেছেন। একজন শিল্পীর পক্ষে যা যথেষ্ট।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : F. Chalais-এর H-G Clouzot ।

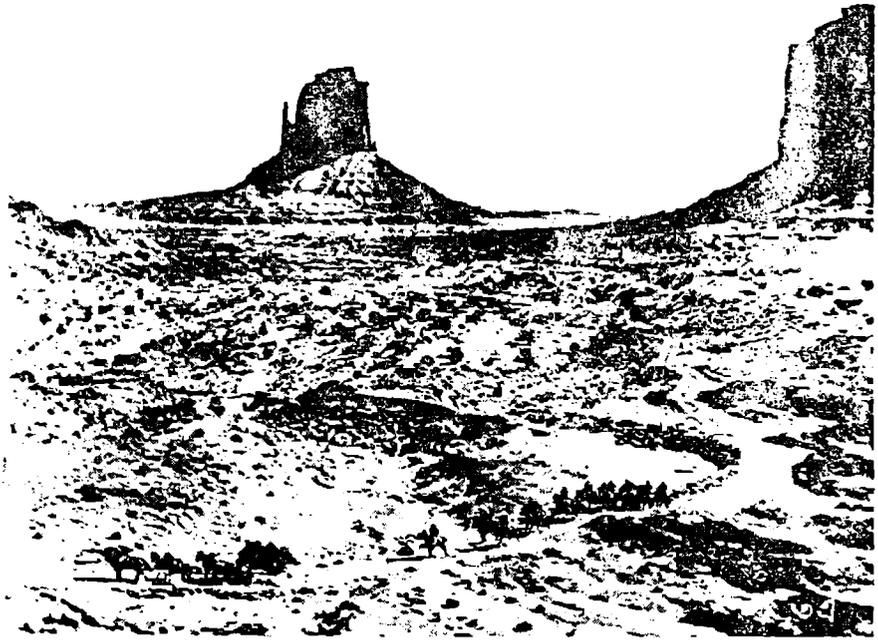
ধীমান দাশগুপ্ত

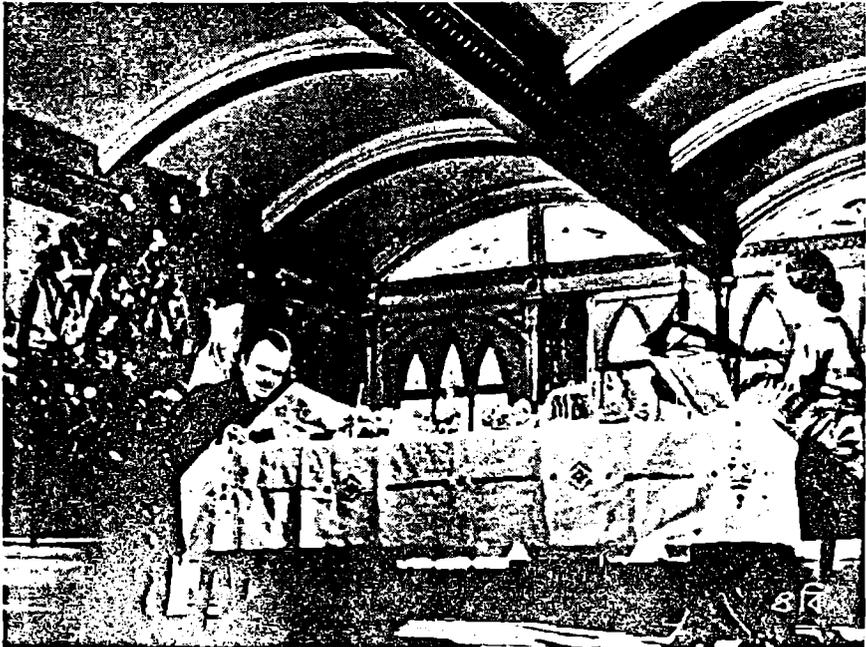
॥ রেনে ক্লেয়ার ॥

( ১৮৯৮-১৯৮১ )। ১৯২৩ সালে তিনি চলচ্চিত্রশিল্পের সঙ্গে পরিচালক হিসেবে যুক্ত হন এবং সেই থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত তিনি সবাক ও নির্বাক এবং ছোট-বড়-মাঝারি মিলিয়ে ছবি তুলেছেন মোট তিরিশটি। এর মধ্যে বেশিরভাগই তোলা হয়েছে তাঁর স্বদেশ ফ্রান্সে। তাছাড়া বিদেশেও কয়েকটি ছবি তুলেছেন—ইংল্যান্ডে দুটি, আমেরিকার হলিউডে পাঁচটি এবং ইতালিতে একটি। ফ্রান্সের বাইরে তোলা তাঁর একটি ছবিও যে সার্থক শিল্পসৃষ্টি হতে পারেনি তার প্রধান কারণ হলো রেনে ক্লেয়ারের প্রতিভার সঙ্গে অস্বিমজ্জায় জড়িয়ে আছে ফ্রান্সের নিজস্ব শৈল্পিক ঐতিহ্য। কেবলমাত্র চলচ্চিত্র পরিচালক নয়, কবি-লেখক-সাহিত্যিক ও সমালোচক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল এবং চলচ্চিত্র বিষয়ক তাঁর অন্তত দুটি প্রবন্ধের বই প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে ‘রিন্কেকুশল অন দি সিনেমা’ উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রকৃত নাম হলো রেনে সোমের। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন

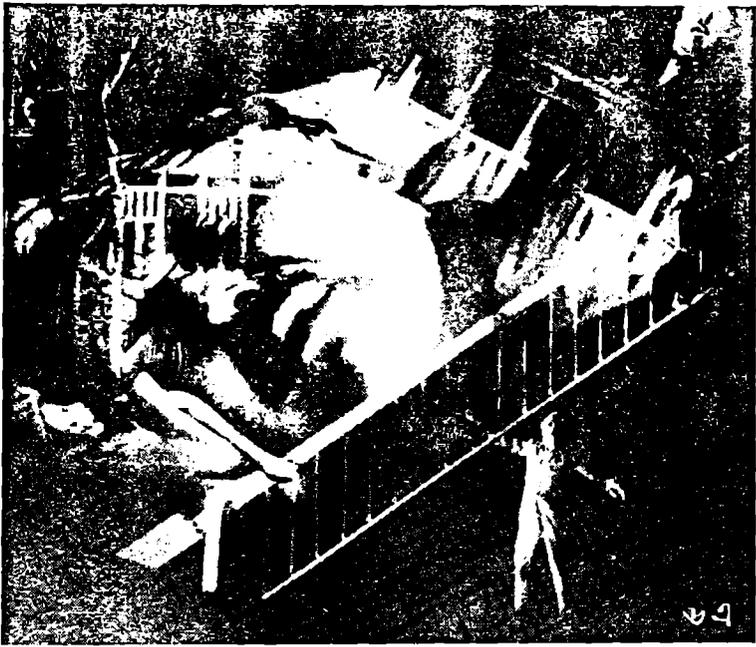
















অ্যাথলেটিক বাহিনীর একজন কর্মী। ১৯১৯ সাল থেকে একটি পত্রিকায় সাংবাদিক হিশেবে তিনি যোগ দেন। বছর দুয়েক পর চলচ্চিত্রে অভিনয় করার স্বযোগ পান। ১৯২২ সালে তিনি সহকারী পরিচালক হিশেবে কাজ করলেন। ১৯২৪ সালে, তিনি Entr'acte নামে যে ছবিটি তুললেন তা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত মূল্যবান সংযোজন। এটি মাত্র কুড়ি মিনিটের ছবি। ছবিটিকে কাহিনীচিত্রও বলা যায় না, আবার তথ্যচিত্রও এটি নয়, বিমূর্ত চিত্রকলার মতোই এই ছবিটিকে বলা চলে একটি 'বিমূর্ত চলচ্চিত্র' যা বাস্তব এবং অবাস্তব, স্বপ্ন ও জাগরণ, উদ্ভট ও কল্পনা ও ভোজবাজি সব কিছু মিলিয়ে। কোনো কোনো সমালোচক এই ছবিটিকে যথার্থ বলেছেন—'ক্লাসিক অব দি অ্যাবসার্ভিটি'। ক্যামেরার কৌশলপূর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ফর্ম নিয়ে কিছু কারিগরী পরীক্ষার জন্ম এই ছবিটি অরণীয়। [ বস্তুত এই সময় থেকেই ক্লেয়ার একদিকে চলচ্চিত্র বিষয়ক পরীক্ষা-নিরীক্ষার শিল্পগত গুরুত্ব অল্পদিকে ব্যবসায়িক চলচ্চিত্রের বিপুল সম্ভাবনা—এই দুয়ের মধ্যে দোলায়িত হতে থাকেন। ] ক্লেয়ারের প্রথম পর্বের অল্প নির্বাক ছবিগুলির নিজস্ব কোনো গুরুত্ব না থাকলেও এগুলি ক্লেয়ারকে চলচ্চিত্রের ভাষার উপরে দক্ষতা অর্জন করতে প্রচুর সাহায্য করেছিল। 'দি ইটালিয়ান স্ট্র হ্যাট' ( ১৯২৭ ) কৌতুকপূর্ণ ও মজাদার ছবি হিশেবে ক্লেয়ারের জীবনের একটি অগ্ৰতম স্ৰেষ্ঠ সৃষ্টি। এতে ফরাসি পেতি বুর্জোয়া সমাজকে মূর্খ কৌতুকপূর্ণ বিদ্রূপ করা হয়েছিল। মূল মহিলা চরিত্রে যিনি অভিনয় করেছিলেন সেই ওলগা নেভভা হচ্ছেন বিখ্যাত রাশিয়ান কথাসাহিত্যিক আন্তন চেখভের ভ্রাতৃপুত্রী। কেবলমাত্র কল্পকাহিনীর ক্ষেত্রেই নয় কোনো ছবির জন্মই রেনে ক্লেয়ার আউটডোর লোকেশান সৃষ্টিং করা একেবারেই পছন্দ করতেন না। স্টুডিওর ভেতরে কৃত্রিম সেট-সেটিং বানিয়ে নিয়ে কাজ করতেই তিনি বেশি ভালোবাসতেন। আর এ কাজে তাঁকে সব চাইতে বেশি সাহায্য করেছেন যিনি তিনি হচ্ছেন প্রতিভাবান শিল্প-নির্দেশক মিরশাঁ। চলচ্চিত্রে শব্দ ও সংলাপের প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্লেয়ার গোড়ার দিকে বেশ কিছুটা রক্ষণশীল ছিলেন। কিন্তু ১৯৩০ সালে যখন তিনি তাঁর প্রথম সবাকচিত্র 'আণ্ডার প্যারিস রুফ টপস' তুললেন তখন দেখা গেল চলচ্চিত্রে শব্দ ও কথা সার্থক ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তিনি সফল হয়েছেন। চিত্রকল্প ও ধ্বনির মধ্যে যে কী করে ভারসাম্য বজায় রাখতে হয় তা ক্লেয়ার সার্থকভাবে দেখাতে পেরেছিলেন এই ছবিতে। ক্লেয়ারের অগ্ৰতম বিখ্যাত সৃষ্টি হলো 'লিবার্টি ইজ আওয়ারস্', ১৯৩১। আধুনিক বস্ত্র-

সভ্যতাকে এই ছবিতে বিদ্রুপ করা হলেও যন্ত্র ও আধুনিক সভ্যতা সম্বন্ধে ক্লেয়ারের দৃষ্টিভঙ্গিটি ছিল একেবারেই ষোঁয়াটে ও ঝাপসা। ১৯৩৬ সালে চার্লি চ্যাপলিন এই ছবিরই থিমটিকে নিয়ে তাঁর অমর ছবি ‘মডার্ন টাইমস্’ তোলেন। কিন্তু চ্যাপলিনের ছবিটিতে বস্তুব্য ছিল অনেক ক্ষুরধার ও ভীক্ষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ গোটা ইউরোপের জীবনযাত্রাকে আমূল বদলে দিলেও এবং ফ্রান্সের উপর দিয়ে হিটলারের ফ্যাসিস্ট বাহিনীর তাণ্ডব বয়ে গেলেও যুদ্ধোত্তর ফরাসি জীবনযাত্রার সংকট ও জটিলতা রেনে ক্লেয়ারের মনে বিশেষ কোনো আলোড়ন আনতে পারল না। ক্লেয়ারের অতীতচারী মন অতীতকে বর্তমানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে দেখাতেও ব্যর্থ হয়। [ ক্লেয়ার তখন পুরোপুরিই কমেডি ছবির জগতের অধিবাসী। সরল ও মজাদার এই সমস্ত ন্যাপটিক কমেডি ক্যামেরা ও দৃশ্যসজ্জার সৌকুমার্যে চিহ্নিত। ] জীবনের শেষ পর্বে ক্লেয়ার ‘গ্র্যাণ্ড ম্যানোভারস’ ( ১৯৫৫ ) ছবিতে প্রথম রঙের ব্যবহার করলেন এবং ছবিতে রং প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁকে বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে দেখা গেল। তাঁর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে কোনো সিরিয়াস বস্তুব্য না থাকলেও ভিহুয়াল গঠনের নৈপুণ্যের জন্ম ছবিগুলি ছিল বেশ উপভোগ্য। আর একটি কারণের জন্ম ভাবীযুগের মানুষ তাঁকে মনে রাখবে, তা হলো চলচ্চিত্রের তত্ত্ব ও রূপরীতির বিষয়ে তাঁর মূল্যবান প্রবন্ধগুলির গভীরতা।

**রুজত রায়**

॥ ক্লোজ আপ ॥

দৃশ্যবস্তু যদি হয় একটা মানুষের শরীর তাহলে যে শটে পর্দায় মানুষের মাথা থেকে মোটামুটিভাবে কোমর অবধি দেখা যাবে সেই শটকে বলা হয় ক্লোজ আপ। এর চেয়েও কম অংশ দেখা গেলে তাকে বিগ ক্লোজ আপ বলা যেতে পারে। কোনো বস্তুকে আনুপাতিকভাবে খুব বড়ো করে দেখানোই ক্লোজ আপ। ক্যামেরাকে দৃশ্যবস্তুর খুব কাছে রেখে ক্লোজ আপ নেওয়া যায়, আবার দূর থেকে বিশেষ লেন্সের সাহায্যে ফোক্যাল লেন্থের অদল বদল ঘটিয়েও ক্লোজ আপ নেওয়া সম্ভব। গ্রিফিথের ছবিতে এর প্রথম সার্থক প্রয়োগ ঘটে। দর্শকের দৃষ্টিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করা, দৃশ্যগঠনে বৈচিত্র্য আনা, খণ্ড খণ্ড উপাদানের মধ্য দিয়ে অখণ্ড রূপ-সৃষ্টি, অন্তর্নিহিত কোনো কিছুকে স্পষ্ট করা ইত্যাদি বিবিধ ও বিচিত্র কারণে ক্লোজ আপের প্রয়োজন হয় ( ড্র. শট ও শট বিভাজন )। আইজেনস্টাইন থেকে বার্গম্যান পর্যন্ত অজস্র বার, ক্লোজ আপের সার্থক মাত্রাগত ও গুণগত ব্যবহার

চিত্রায়িত হয়ে আছে। এই পদ্ধতি অভিনয়কে দিয়েছে বিরল অভিব্যক্ত, কোনো একমুখ প্রক্ষেপ ও আরোপণ ছাড়া দৃষ্টকে করে তুলতে পেরেছে প্রতীকী (ড্র. সিঞ্চল), সযুক্ত করেছে মনতাজকে (ড্র. মনতাজ)। চলচ্চিত্রে ক্লোজ আপ মূলত মুখের হলেও, হাতের ক্লোজ আপও অনেক সময় অত্যন্ত প্রকাশময় ও অভিব্যক্তি-মূলক হয়ে উঠতে পারে।

সাধারণ ভাবে দেখলে, লংশটে যে স্থানচেতনা, ক্লোজ আপে তা স্বভাবতই নেই, ক্লোজ আপ ইমেজকে স্থান-কাল-মাত্রা থেকে অনেকটা আলাগা করে নেয়। কোনো নিম্প্রাণ বস্তুকে পর্দায় ক্লোজ আপে দেখা গেলে দর্শক ওই বস্তুতে নিজের অনুভূতি আরোপ করার প্রবণতা বোধ করেন এবং এইভাবে আইজেনস্টাইনের মতে, একটি প্রতিরূপ আবেগবহ হয়ে উঠে দর্শকের মনে চিত্তার বীজ বপন করতে পারে।

আবেগময় ও নান্দনিক ভূমিকা ছাড়াও, ক্লোজ আপের একটা আঙ্গিকগত ভূমিকাও আছে। সেক্ষেত্রে ক্লোজ আপ চলচ্চিত্রের স্টারের এক অংশের উপাদান। এইভাবে কোনো দৃশ্যের সূচনা ঘটতে ক্লোজ আপের ব্যবহার হয়, ক্লোজ আপ থেকে ক্লোজ আপে ট্র্যানজিশনের মধ্য দিয়ে দৃশ্যের রূপান্তর ঘটতে পারে, ছেদ বা সংযোজন রূপে ক্লোজ আপ প্রযুক্ত হতে পারে, টাইম ল্যাপস্ বোঝাবার জন্য ক্লোজ আপ ব্যবহার করা যায় বা সময়কে ঘনীভূত করার জন্য।

॥ খণ্ডহর ॥

১৯৮৩, হিন্দি, ভারত। অতি সূক্ষ্ম ও প্রচ্ছন্ন ও অসমাপ্ত একটি গল্পের ( প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পটা যে অসামান্য এ সম্পর্কে আমার কোনো সন্দেহ নেই ) সূত্র নিয়ে পরিচালক মৃগাল সেন এগিয়ে এসেছেন এই ছবিতে যামিনী ও তার মায়ের কাহিনীতে। যামিনীর গল্প তো খুবই সামান্য, এক নিরঞ্জন তাকে বিয়ে করবে বলেছিল, করেনি, সে বিয়ে করে স্বখে ঘর করেছে, যামিনী রয়ে গেছে ধ্বংসরূপে তার মার সঙ্গে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাহিনীর উপর বাইরের দিক থেকে যতই পরিচালক নির্ভর করুন না কেন, যামিনী ও তার মায়ের সম্পর্ক, যামিনীর পরিবেশ, সিনেমারই প্রয়োজনে, গল্প থেকে অনেক সরে এসেছে। মাছ ধরা আর গাটোগ্রাফি এই দুই নেশার মধ্যে যতোখানি দূরত্ব, অল্প শিল্পের সঙ্গে সিনেমার পৃথক ঠিক ততোখানি, সিনেমা সিনেমা। খণ্ডহরে এটা সম্ভব হলো সকলে মিলেই,

গল্পকার ক্যামেরাম্যান এডিটর ডিরেকটর আর অভিনেতা অভিনেত্রীরা সকলে মিলে। খুৎহর ছবিতে সিনেমা শুধু সিনেমায়ই শিল্প হয়ে ওঠে।

কেউ মনে করছেন যুগলবাবু এ ছবিতে স্বপ্ন আর ফ্যান্টাসির জগতে পলাতক এক দক্ষ শিল্পীর মতো কাজ করেছেন। এ কথাটা আমি কিছুতেই মানি না। এতোটাই বলতে আমি রাজি, আর কখনো যুগলবাবু জীবনের এত কাছে যান নি। পরিচালক অন্তর ও বহির্জগতের আড়ালটাকে ভেঙে দিতে চেয়েছেন, এবং তা করতে গিয়ে সমাজচেতনার মধ্যে, ইন্ড্রিয়গ্রাহতার মধ্যেই নিয়ে এসেছেন এক তীক্ষ্ণ বোধের উপলক্ষি। আমাদের চেতনার পরিধিও ক্রমশ বিস্তৃত হয়। পরিচালকের চোখটাই যখন ক্যামেরা, তখন এরকম একটা ছবি হয়ে যায়, সিনেমা যখন শুধু পরিচালকের মনের একটা অবস্থা।

চিত্রগ্রহণ কে. কে. মহাজন, সম্পাদনা যুগ্ময় চক্রবর্তী, অভিনয়ে নাসিরুদ্দিন শাহ, শাবানা আজমী, গীতা সেন ॥

প্রলয় শুরু.

॥ জঁ লুক গদার ॥

জন্ম ১৯৩০, ফরাসি পরিচালক গদার পড়াশুনো করেন সুইজারল্যান্ড ও ফ্রান্সে। সমকালীন চলচ্চিত্র দুনিয়ার সবচেয়ে বিতর্কিত এই মালুযটি সম্পর্কে অনেকেই ধারণা তিনি হচ্ছেন তাঁর সময়ের সবচেয়ে বড়ো চলচ্চিত্রকার, কারো মতে তিনি সবচেয়ে খারাপ না হলেও, লোকটা একেবারে অসহ্য, অর্থাৎ অনেকেই যখন তাঁর প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত, কেউ তাঁর ওপর তিক্ত বিরক্ত, কেউ তাঁর ছবিকে সস্তা আমোদের শ্রেণীভুক্ত মনে করেন। জঁ কোলেত, যিনি গদারের ওপর প্রথম বই লিখেছেন, তিনিই বলেছেন, 'the very key to his work lay in his dialectical play between documentary and fiction.' গদার নিজেই বলেছেন, সৌন্দর্য ও সত্যের দুটো দিক রয়েছে, ডকুমেন্টারি ও ফিক্শান। যে কোনো একটা নিয়ে আপনি গুরু করতে পারেন, আমার আরস্তের জায়গাটা হচ্ছে ডকুমেন্টারি। ১৯৫৪-তে তাঁর প্রথম ছবি, ছোটো ছবি, 'Operation Beton', নিজেই ছবিটি সম্পাদনা করেন, তোলেন সুইজারল্যান্ডে। ৫৫-তে একটা ১০ মিনিটের ছবি তোলেন, মোপাসাঁর গল্প থেকে 'Une Femme Coquette', চিত্রনাট্য পরিচালনা ফটোগ্রাফি সম্পাদনা সবই নিজের। এর আগে ১৯৫২ থেকে Hans Lucas এই ছদ্মনামে 'কাইয়ে' দ্বা. সিনেমায় লিখছেন, ৫৬-তে

‘Arts’-এ ছবির সমালোচনা লিখেছেন, ৫৬ থেকে ৫৯ ‘কাইয়ে দ্য সিনেমা’য় নিয়মিত। ৫৭-তে ২১ মিনিটের ছবি করেন, ‘All Boys are Called Patrick’, মিউজিক বাধ্ থেকে বেঠোফেন, এবারে চিত্রনাট্য Eric Rohmer, আলোক-চিত্র, সম্পাদনা অল্প লোক। ৫৮-তে গদারের হোটেলের ঘরে ২০ মিনিটের ছবি তোলা হলো Charlotte et son Jules, চিত্রনাট্য সম্পাদনা পরিচালনা গদার, বেলমন্ডো অভিনয় করেছেন তাঁর ভয়েস দিয়েছেন গদার, ৫৮-তে ক্রফো তুল-ছিলেন Une Histoire d’Eau, ছবিটা ২০ মিনিটের, উঠছিল প্যারিসে। গদার এশে শেষ করলেন। এখানেও চিত্রনাট্য সম্পাদনা ভাষ্যকার গদার নিজেই।

গদারের আরম্ভের জায়গাটা ডকুমেন্টারি, যেখানে তিনি ফিকশানের সত্যটা দেখতে চেয়েছেন। দ্বন্দ্বিক ভূমিকাটি দ্বন্দ্বিক খেলায় রূপান্তরিত। ডকুমেন্টারি ও ফিকশানের মারখানের খেলাটি আসলে গদারের ছবির অসংখ্য দ্বন্দ্বিক উপাদানের অগ্রতম। তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ ছবি ‘Breathless’ প্যারিস ও মারসেলিতে ১৯৫৯-এর আগস্ট সেপ্টেম্বরে তৈরি হয়। ক্রফোর আইডিয়া থেকে এর চিত্রনাট্য গড়ে ওঠে। ৬০ সালে প্যারিসে রিলিজ করে। ৯০ মিনিটের ছবি।

‘Godard is not ‘the Perfect Hegelian’ but rather an artist who has been influenced directly or indirectly by Hegelian notions’. অংশত অপ্রত্যক্ষভাবে। ১৯ বছর বয়সে সোর্বোনে পড়েছেন। চল্লিশ দশকের শেষের দিকটা প্যারিসে অস্তিত্ববাদের চূড়ান্ত উবেজক সময়। সময়ের দার্শনিক টান অনুভব করছেন গদার। বস্তুতঃ গোটা জীবনের সব কিছুর মূলেই আছে পরস্পর বিরোধিতা। সব কিছুর মধ্যেই সত্য নিহিত এবং এমনকি অংশত, ভুলের মধ্যেও। সত্যের জন্ম হয়তো ভ্রমেরও প্রয়োজন আছে। গদার বলেছেন, ‘I believe in dialectics’. এ জাতীয় চিন্তাপদ্ধতি ও বিশ্বাসের বিবিধ কারণ আছে। মাহুঘের চিন্তার চেয়ে তার আচরণ ও action-এ সিনেমা অধিক কৌতূহলী। সব শিল্পের মধ্যে সিনেমাই এর অপরিহার্য উপাদানে সবচেয়ে contradictory সবচেয়ে আত্মবিরোধী অথচ সত্য। সিনেমা একই সঙ্গে বর্ণনা-মূলক ও দৃশ্যগ্রাহ্য শিল্প, সিনেমার প্রথম থেকেই কারো মধ্যে গল্প বলার প্রবণতা, কেউ ভিত্তিয়াল-এ আগ্রহী। অর্থাৎ দুটো দিকই আমরা দেখেছি, কাহিনী বর্ণনায় উৎসাহ এবং আকারগত ও দৃশ্যগত সৌন্দর্য। বাস্তবকে যথাযথ রূপায়িত করার জন্ম, ষাষ্ট্রিকভাবে রূপ দেবার জন্মই মুক্তি ক্যামেরা আবিষ্কৃত হয়েছিল। লুমিয়ের ভাইয়েরা অন্ততঃ তাই ভেবেছিলেন। Melies বাস্তবকে রূপ দিতে চেষ্টা করেননি,

তিনি চেষ্টা করেছেন ফ্যান্টাসির পুনর্নির্মাণে। পরবর্তীকালে ক্যামেরা সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত।

এরপর আমরা আসি তিনটি বিরুদ্ধতায়। দৃশ্য বনাম কাহিনী, ফিক্শান বনাম ডকুমেন্টারি, বাস্তব বনাম বিমূর্ত। গদারই এই তিন বিষয়ে প্রথম সচেতন। গদার বলছেন, 'ক্যামেরা তো শুধু একটা অবিকল প্রতিরূপ নির্মাণের যন্ত্র নয়, সিনেমা হচ্ছে শিল্প ও জীবনের মাঝখানে কিছু একটা।' সাহিত্য ও চিত্রকলা তো শুরু থেকেই শিল্প মাধ্যম। সিনেমাকে ধীরে ধীরে শিল্প হ'য়ে উঠতে হয়েছে। জীবনের প্রতি রোমাণ্টিক দৃষ্টি ও অভিবাস্তব দৃষ্টির মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন গদার, তাঁর ছবিতে ব্যক্তিমানুষ যেমন এসেছে তেমনি এসেছে সমাজ, গোটা সমাজ ও রাজনীতি, খুন জখম থেকে নাও সে ভুঙ্।

স্টাইলটা বিষয়ের বাইরের দিক, স্টাইলের ভিতরটা হচ্ছে বিষয়, মানব শরীরের বাইরেটা এবং ভেতরটার মতো। দুটোকে আলাদা করা যায় না। গদারের ছবির স্টাইল তাঁরই, তাঁর আগে চলচ্চিত্রে এ ধরনের স্টাইলের ছিটে-ফোঁটাও ছিল না, Narration-এর এতদিনকার ভঙ্গিটাকেই গদার ভেঙে দিয়েছেন। পাশাপাশি এতখানি সমকালীন রাজনৈতিক চেতনা খুব কম পরিচালকের ছবিতেই আমরা দেখেছি। সিনেমা ছুনিয়ায় পটিকর্ভো আর কজন? গদার কিন্তু কনটেন্টকে অগ্রাহ করেননি, আবার শুধুই কনটেন্টের ওপর নির্ভরও করেননি, কনটেন্ট আর ফর্মের মধ্যে এতখানি ভারসাম্য আর কেউ রক্ষা করতে পারেননি, কখনো প্রায় দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে নেয়া যায়। রূপ ও বিষয়ের এতখানি সুষমতা আমরা দেখিনি। চলচ্চিত্র-নন্দনতত্ত্বের এতখানি আত্মবিরোধী বৈশিষ্ট্য আমরা অন্য পরিচালকের ছবিতে দেখিনি বলা যায়, এ কথা বলার সময় আন্তর্নিওনি কিংবা রেনের নাম আমাদের মাথায় রয়েছে।

কথাটা ঠিক নয়, গদার আনা কারিনাকে ফটোগ্রাফ করেন, ড্রেয়ার ফালকানেস্তিকে, কারিনার মুখ শুধু একটা মুখ নয়, যা রহস্যময় বিষয়তায় ভরা। গদারে সব কিছু ধূসর নয়। যদি কেউ সেই ধূসরতা চাখেন, তাঁর চাখা উচিত শূন্য দেয়াল ফাঁকা জানালায় সন্ধ্যার কাফেতে তিনি এবং তাঁর বিশ্বস্ত ক্যামেরাম্যান রাউল কুতার দেখেছেন অফুরন্ত রঙ, যে রঙ চলচ্চিত্রের ধূসর পাণ্ডুলিপি রচনা করেও তুলে ধরে নিবে যাওয়া আলোর সামনে বাঁচার নস্ট্যালজিয়া। জীবন ও শিল্পের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, আকাশটা যদি তখন নীল থাকে তাকে তিনি নীলই দেখিয়েছেন। শাদাকালোতেও তাই। 'Vivre sa Vie'-তে যা কালো তা

কালোই। সাদাটা সাদা। অভিনেতার। সবাই যে যার নিজের পোশাক পরে এসেছে, শুধু আনা কারিনার জুতা একটা স্মার্ট আর সোয়েটার কেনা হয়েছিল।

‘আমি চিন্তা করি তাই আমি আছি,’ এই কথা থেকেই তো আমরা চলে আসি ‘কিভাবে সেটা সম্পর্কে আমি খুব নিশ্চিত নই বলেই, আমার অস্তিত্ব বিপন্ন’— ‘আমি কি স্থায়ী ছিলাম, যেহেতু আমি ছিলাম মুক্ত, কিংবা আমি মুক্ত ছিলাম, যেহেতু আমি স্থব্র অমুক্ত করছিলাম’—এই দার্শনিক আলো-অন্ধকারে গদারের ক্যামেরা অস্থির হয়ে ওঠে। পৃথিবী থেকে নিজেকে নুকোনোর জন্তে নয়, ঐ কালো চশমা দিয়ে জগৎটাকে গদার যেভাবে চাখেন চলচ্চিত্রে পৃথিবীর খোলা চোখ সেভাবে চাখে না।

পেশাদার কিংবা অপেশাদার অভিনেতা নিয়ে তিনি কাজ করেছেন অথচ তাঁর ছবিতে কেউ অভিনয় করে না অর্থাৎ অভিনয়ের খুব দরকারই হয় না। চিত্ররপ-ময়তায় তিনি অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন, আন্তর্নিওনির খুব কাছেই তিনি রয়েছেন, তবুও তাঁর ছবিতে কথা শুধু কথায় সব আবেগ অনুভূতি উত্তেজনা ও জাগরণ। কথায় সব ইমেজ তিনি ধরে রাখতে পারেন, এবং তা একেবারেই নাটকীয় নয়, ছবির কনটিনিউটি Visual নয়, Verbal, প্রতিটি কথায় আজকের ছুনিয়ার আদর্শগত দ্বিধা, সারি সারি স্বপ্নের স্মৃতি। নিজ চরিত্রের অনিশ্চয়তাকে যিনি নুকোতে চাননি, তিনিই জঁ লুক গদার।

তাঁর শহর প্যারিস, প্যারিস তাঁর পৃথিবী, এই প্যারিস পরবাসীদের। এই বিদেশে সবই মানায়। বিদেশি, খুনে, বেঞ্জা ও ছাত্রদল, প্রগতি ও কমপিউটার, বুর্জোয়া ও সর্বহারা। এই শহরে সমাজের মাথার উপর রেলের-তার। তাঁর ছবির চরিত্রগুলির সাধারণত সংসার নেই বললেই চলে, বাবা নেই, মা নেই, ভাই নেই, বোন নেই, কখনো হয়তো একজন কাকা কিংবা পিসি আছে। তাঁর বেশিরভাগ চরিত্রই আগন্তুক, যেন অল্প দেশ থেকে এখানে চুকে পড়েছে। কিন্তু তিনি মানুষকে পছন্দ করেন, ভালোবাসেন নারী কিংবা সেই মেয়েকে যে ফরাসি বলে একটু বিদেশি উচ্চারণে।

‘Alphaville’ আজকের প্যারিসে ভবিষ্যতের দুঃস্বপ্নের নগরী। গদারের ছবি শিল্প ও শিল্পতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ, ব্যক্তিগত স্বপ্ন, সামাজিক দলিল, একান্ত দিনলিপি, মাওয়ার চিন্তা। বেঞ্জাবিষয়ক তত্ত্ব ও তথ্যকে তিনি দেশ ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক বিষয়ে পরিণত করেন। নিজেকে তিনি মনে করেন একজন ‘essay writer’, তিনি উপস্থাসের আঙ্গিকে প্রবন্ধ লেখেন, অথবা তিনি উপস্থাস লেখেন

প্রবন্ধের রীতিতে, নিজেই বলেছেন, 'I'm still as much of a critic as I ever was during the time of Cahiers du Cinema. The only difference that instead of writing criticism, I now film it.' গদারের ছবির শিল্প নিজেই নিজের সমালোচক। গদার বলেছেন, 'The whole New Wave can be defined, in past, by its new relationship to fiction and reality'.

ছনিয়ার অনেক কিছুই যা নিয়ে আমাদের এত ভাবনাচিন্তা, সবই শেষ পর্যন্ত আমেরিকার কেনা বেচার মাল। শুধু কি দেহ বিক্রয়ই একমাত্র বেথ্যাবৃত্তি? 'বিদগ্ধ বিপ্লবী' হবার একটাই রাস্তা আছে সেটা হলো বিদগ্ধ হবার বাসনাটা ত্যাগ করা। 'One Plus One' গদারের সেই সফলতার উদাহরণ। গদার যা চেয়েছেন, তা হলো, কালচারের ধারণাটাকেই নষ্ট করে দেয়া। 'Culture is an alibi of imperialism. There is a ministry of War. There is also a ministry of Culture. Therefore Culture is War.' আমাদের সকলেরই খিদে পায়। আমাদের ঋবার জোগাড় করতে হয়, তাই টাকা রোজগার করতে হয়। যে কাজ আমরা করতে চাই না সেই কাজ করেই আমরা অর্থ উপার্জন করি। Alphaville-এ গোটা শহর ও তার বাসিন্দারা দক্ষতা ও অগ্র-গতির ধারণায় নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছে। রাষ্ট্রই বেথ্যাকে লাইসেন্স দেয়। রাষ্ট্রই সত্য মাহুসকে নেশা জুগিয়ে দেয়, 'We are all living more or less in a state of prostitution.'

'La Carabiniers'-এ আমাদের সময়ের একটা বৃহত্তম বিষয়কে তিনি আক্রমণ করেন। সে বিষয়ের নাম 'যুদ্ধ'। যুদ্ধ বিষয়ক অদংখ্য ছবি আমরা দেখেছি। 'La Carabiniers' যুদ্ধ বিরোধী চলচ্চিত্র সম্পর্কিত আমাদের ধারণার সঙ্গে মেলে না। গদার ক্রেডিট টাইটেলে বলতে চেয়েছেন, এ একটা fable, কিন্তু একটা objective fable. যুদ্ধকে তিনি বস্তগত ভাবে দেখাতে চেয়েছেন, আবেগবিহীনভাবে দেখাতে চেয়েছেন। নিজেই বলেছেন, ভয় কিংবা বীরত্ব নিয়ে দেখাতে চাইনি। উদ্দীপনা কিংবা কাপুরুষতাও দেখাতে চাইনি, ক্লোজ আপ ছাড়াই, 'because a close-up is automatically emotional in its effect', গদার সব ছবিতে তাঁর নিজের প্রতিকৃতি এঁকেছেন। গদার ছবি আরম্ভ করেন হয় কোনো সংবাদ, কিংবা কোনো সত্য ঘটনা অথবা গল্প দিয়ে, মোরাভিয়ার 'A Ghost at Noon' জাতীয় উপন্যাস ট্রেন-জার্নির পক্ষে খুব

চমৎকার উপস্থাপন, ভারী উচ্চাঙ্গ ও প্রাচীন সেক্টিমেটে ভরা, কিন্তু এই ধরনের উপস্থাপন নিয়েই একজন অসাধারণ ছবি করতে পারেন। গদার তাঁর ছবির জন্তে শ্রেষ্ঠ কাহিনী কখনো বাছেন না। যদি তাঁর প্রিয় উপস্থাপন হয় 'The Wind Palms' তিনি কিন্তু সে কাহিনী নিয়ে ছবি করতে চান না। দস্তা আমেরিকান খিলার নিয়েও ভালো ছবি করা যায়। ১৯৬৯-এর গ্রীষ্মে ৩০ জন ছাত্র উপ-দেষ্টাকে নিয়ে Cohn-Bendit সহ তিনি Vento dell'est তোলেন। তাঁর পরবর্তী ছবিগুলি যেন স্নট মেশিন বা কমপিউটার থেকে বেরিয়ে আসা কার্ড বা শীট।

সত্তর সালের পর থেকে গদার যেসব ছবি করেছেন নিচে তার একটা তালিকা দেওয়া হলো।

৭১. Vladimir and Rosa : পরিচালনা চিত্রনাট্য ও আলোকচিত্র পরিচালনা Groupe Dziga Vertov (জঁ লুক গদার ও জঁ পিয়ের গোরঁয়া) এতে ছিলেন, অ্যান ওয়াইজ্জেম্‌স্কি, জঁ পিয়ের গোরঁয়া ও জুলিয়েৎ বার্তো।
৭২. Tout va Bien : পরিচালনা চিত্রনাট্য জঁ পিয়ের গোরঁয়ার সঙ্গে। ছিলেন ইভ যঁতো, জেন ফণ্ডা।
৭৩. Letter to Jane : সঙ্গে গোরঁয়া।
৭৪. Ici et ailleurs : পরিচালনা চিত্রনাট্য Anne-Marie Mieville-এর সঙ্গে। ৭০-এর Groupe Dziga Vertov-এর ফুটেজ শট থেকে।
৭৫. Numero deux : চিত্রনাট্য রচনা Anne-Marie Mieville-এর সঙ্গে। পরিচালনা-গদার।
৭৬. Comment Ca va : পরিচালনা চিত্রনাট্য Anne-Marie Mieville-এর সঙ্গে।
৭৭. Six Fois deux / Sur et Sous la Communication : পরিচালনা চিত্রনাট্য সম্পাদনা Anne-Marie Mieville-এর সঙ্গে।
৭৮. Sauve qui Peut (la vie) (Every Man for Himself) চিত্রনাট্য Anne-Marie Mieville, Jean Claude Carriere. পরিচালনা গদার।
৮১. Lettre a Freddy Buache : পরিচালনা চিত্রনাট্য সম্পাদনা : গদার।
৮২. Passion : পরিচালনা চিত্রনাট্য সম্পাদনা : গদার, চিত্রগ্রহণ : রাউল কুতার।

৮৩. Prenom Carmen (First Name : Carmen) পরিচালনা : গদার,  
চিত্রনাট্য : Anne-Marie Mieville, ফটোগ্রাফি : রাউল কুতার, জঁ  
গারসেনট্ ।
৮৩. Petites Notes a Propos du film Je Vous Salue Marie :  
পরিচালনা গদার ।
৮৫. Je Vous Salue Marie (Hail Mary) পরিচালনা চিত্রনাট্য : গদার ।
৮৫. Detective : পরিচালনা গদার ।
৮৬. Grandeur et decadence dun Petit Commerce de Cinema :  
পরিচালনা চিত্রনাট্য : গদার ।
৮৬. Soft and Hard (A Soft Conversation between Two Friends  
on a Hard Subject) পরিচালনা গদার Anne-Marie Mieville-এর  
সঙ্গে ।
৮৬. J.L.G. Meets W. A. : পরিচালনা গদার । ছিলেন উডি এ্যালেন ।
৮৭. King Lear : পরিচালনা চিত্রনাট্য সম্পাদনা গদার ।
৮৭. Soigie ta droite (Keep up your Right) পরিচালনা চিত্রনাট্য  
সম্পাদনা : গদার ।
৮৮. Puissance de la Parole : পরিচালনা গদার ।
৮৯. Histoire (s) du Cinema : পরিচালনা চিত্রনাট্য সম্পাদনা : গদার ।
৮৯. Le Rapport Darty : পরিচালনা গদার, Anne-Marie Mieville-এর  
সঙ্গে ।
৯০. Nouvelle Vague : পরিচালনা চিত্রনাট্য সম্পাদনা : গদার ।
৯১. Allemagne annee 90 neuf Zero (Germany Year 90 nine  
Zero) পরিচালনা চিত্রনাট্য : গদার ।

এবার আমরা অপেক্ষা করে থাকবো সেসব ছবির জন্ম, যেসব ছবির গুটিং  
গদার এখনো আরম্ভই করেননি ।

অতীত ছবি : দি লিটল সোলজার ( ১৯৬০ ), পিয়েরো লো ফু ( ৬৫ ),  
ম্যাসকুলিন ফেমিনিন ( ৬৬ ), যেড ইন ইউ. এস. এ. ( ৬৬ ), লা শিনোয়াজ ( ৬৭ ),  
উইক-এণ্ড ( ৬৭ ), ইত্যাদি ।

রচিত গ্রন্থ : গদার অন গদার ।

সম্পর্কিত গ্রন্থ : রিচার্ড রাউডের জ' লুক গদার ও বাংলায় বাণীশিল্পের সংকলন  
গদার ।

প্রলয় শূন্য

॥ গান্ধী ॥

১৯৮২, ভারত-ব্রিটেন যৌথ প্রযোজনা। রিচার্ড অ্যাটেনবরোর 'গান্ধী' ইতিহাস বিষয়ে ছবি। যতটা না জীবনীচিত্র, তার চেয়ে বেশি কাহিনীমূলক ঐতিহাসিক চিত্র। নির্দিষ্ট তথ্য ও ঘটনা এবং স্ননির্দিষ্ট মতবাদ ও দৃষ্টিকোণ ভিত্তিক। ভারত সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় নির্মিত এই ছবি বিপুল জনপ্রিয়তা ও ব্যবসায়িক সাফল্য এবং সমালোচকদের প্রশংসা ও আটখানা অ্যাকাডেমি পুরস্কার অর্জন করে। স্পীলবার্গের মতে, এ-ছবি ছবির চাইতে বেশি কিছু, একটা আদর্শের প্রতিক্রম, অহিংসার আদর্শ, গান্ধীবাদের আদর্শ। অনেক ভারতীয় সমালোচকের মত হলো, ছবিতে গান্ধীকে মিথ্য করে তোলা হয়েছে, একটা কাণ্ট ফিগার, যেমন মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত বাঙালিদের রামকৃষ্ণ কাণ্ট, ফলে ছবিটি যা করে তা হলো, দর্শকের স্বতিকে কিছু বিশেষ উদ্দেশ্যের দিকে চালিত করা। আর অল্পদাশঙ্করের মতে, আমাদের নৈতিক অধঃপতন এতদূর হয়েছে যে অ্যাটেনবরোর গান্ধী ছবির তাৎপর্য আমরা বুঝিনে, পরমাণু বোমার ভয়ে ভীত পাশ্চাত্য কিন্তু বোঝে। গান্ধীর কার্যসূচি ও কর্মধারা একদিকে ভারতীয় ঐতিহ্যের যুক্তিসঙ্গত পরিণতি, অল্পদিকে ভারতীয় অতীতের সঙ্গে এক বৈপ্লবিক ছেদ—এই মূল কথাটি ছবিতে আবেগ ও অ্যাকশন, হিউমর ও বেদনা এবং ব্যক্তিমাল্লু ও সমষ্টির মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে খুবই ফলপ্রসূত ভাবে বলা হয়েছে।

অভিনয়ে বেন কিংসলে, জন গিলগুড, এডওয়ার্ড ফক্স ও ক্যানডিস বার্গেন; চিত্রনাট্য জে. ব্রিলে, আলোকচিত্র বি. উইলিয়ামস ও আর. টেলর, সম্পাদনা জে. ব্রুম, সংগীত রবিশঙ্কর ॥

॥ গ্রেটা গার্বো ॥

( ১৯০৫-১৯৯০, স্নইডেন )। চিত্রতারকা বলতে আজ যে মোহ ও উন্মাদনার সৃষ্টি হয়, বলা যায়, চিরকুমারী গার্বোই তার জন্মদাত্রী ও চূড়ান্ত উদাহরণ। প্রচলিত অর্থে ততটা স্নন্দরী তিনি নন, দেহের গঠনও চলনসইয়ের চেয়ে বেশি কিছু না, পর্দায় তাঁকে মোহময়ী করে তুলে ধরার জন্য ক্যামেরাকে সতর্ক থাকতে হতো দুর্ভ

ও কোণ নির্বাচনে, বাক্য-উচ্চারণও তত নিখুঁত নয় তাঁর, তাঁর অতি ভীষ প্রেমাভিনয় আজ অভিনাটকীয় বলেই মনে হতে পারে, তবু জনপ্রিয়তা আর সাফল্য আর রহস্যময়তায় আজও গার্বো অপ্রতিদ্বন্দ্বী। দারুণ আকর্ষণী ব্যক্তিত্বে ছবি তৈরির সম্পূর্ণ ইউনিটকে প্রাণবন্ত, স্বজনশীল করে তুলতেন তিনি। আর ক্যামেরার ওপর তাঁর দখল ও অধিকারও ছিল চমৎকার। নির্বাচন যুগের অভিনেতারী অধিকাংশই সবাকচিত্রে এসে ব্যর্থ হয়েছিলেন, হলিউড থমকে দাঁড়িয়েছিল শব্দের সামনে, তারপর হরেক বিচার বিবেচনার পর এম. জি. এম. যেদিন বিজ্ঞাপন দিল 'গার্বো কথা বললেন' বলে, দেখা গেল সবাক যুগে এসেও গার্বো সমান সফল, আরো জনপ্রিয়। গার্বোকে নিয়ে যা ছিল কল্পকাহিনী তা হয়ে উঠল গার্বোকে নিয়ে মিথ।

যদিও আগে কিছু ছোট দৈর্ঘ্যের 'সামান্য ছবিতে কাজ করেছেন, তবু তাঁকে আবিষ্কার করে সার্থক ভাবে কাজে লাগান এম. স্টিলার, দি লিজেণ্ড অব গোস্টা বালিং ছবিতে। এরপর আরও নয়টি নির্বাচন ও চোদ্দটি সবাক চিত্রে অভিনয় করে, বিশ্বযুদ্ধের ফলে যখন পশ্চিম ইউরোপে তাঁর ছবির প্রদর্শন বন্ধ হয়ে গেছে ও শুধুমাত্র আমেরিকায় চললে তাঁর ছবি বাণিজ্যিকভাবে চরম সফল নয়, তখন খ্যাতি, প্রচার ও অভিনয়ের জগৎ থেকে আকস্মিকভাবে স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়ে গার্বো চলে গেলেন অজ্ঞাতবাসে, নিজেকে গুটিয়ে নিলেন গোপনতায়, তৈরি করলেন এক নিগূঢ় রহস্য। আশ্চর্য নয়, কেননা তাঁর অভিনীত চরিত্রগুলির মধ্যেই থেকে গেছে অ্যামবিভালেন্সের উপাদান। গার্বো শেষদিন পর্যন্ত ছিলেন চিত্রজগতের আদর্শ নায়িকা, আপনতম তবু হৃদয় নক্ষত্র। 'প্রেম ও যৌনতার সমস্ত উপাদানে সমন্বিত ভালো-খারাপে মেশানো এক নারীচরিত্র, যে নারী একাধারে মোহিনী ও কুমারী।'

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : Richard Corliss-এর গার্বো ।

॥ ইস্ত্ভান গাল ॥

( জন্ম ১৯৩৩ )। হাঙ্গেরির চিত্রপরিচালক ও সম্পাদক। ইলেকট্রিসিয়ানের পুত্র ইস্ত্ভান বুদাপেস্ট ফিল্ম স্কুল থেকে চলচ্চিত্র-পরিচালনায় স্নাতক উপাধি লাভ করে কলাকৌশলের উচ্চতর শিক্ষা নিতে ইতালিতে যান। কয়েকটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি তৈরি করে প্রথম কাহিনীচিত্র, কারেন্ট পরিচালনা করেন ১৯৬৪তে। অসাধারণ দৃশ্য-সৌন্দর্যে ছবিটি উপভোগ্য। তাঁর এই সংবেদনশীল ও প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মিলেছে রাজনীতি ও সমাজচেতনা। বিশেষত ব্যক্তি বনাম

সমাজ—এই প্রসঙ্গে তাঁর ছবিতে রাজনৈতিক প্রশ্ন উত্থাপনের ও প্রতিবাদের লক্ষণ স্পষ্ট। তাঁর ছবি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ছবি না হলেও রাজনৈতিক পটভূমির তথা রাজনৈতিক চেতনার ছবি। এই বস্তুচেতনার সঙ্গে রোমাণ্টিক চেতনার সংঘাত-সংশ্লিষ্টে এক শক্তিশালী চিত্রশৈলীর জন্ম হয়েছে হাঙ্গেরির সমাজতান্ত্রিক চলচ্চিত্রে যার বিশেষ স্থান ছিল। (ড. হাঙ্গেরি)। একদিকে গালের ছবির ইতিহাস-মুখীনতা কোনো স্মলত অতীত প্রবণতা নয়, তা ইতিহাসচেতনায় সমৃদ্ধ; অন্যদিকে তাঁর শৈলীতে সহজ বুদ্ধিবাদ, বিমূর্ত বুদ্ধিবাদ ও বিশ্লেষণী বুদ্ধিবাদ স্নন্দরভাবে সমন্বিত। এইসব ছবিতে আছে বৈচিত্র্য ও মানবতার স্বাদ, এদের অনেকগুলিরই ভিত্তি সমাজ-বিবর্তন। নিজের ছবির চিত্রনাট্য তিনি নিজেই লেখেন, সম্পাদনাও নিজে করেন।

অন্তান্ত ছবি : গ্রিন ইয়ারস, ব্যাপটিজম, দি ফ্যালকনস, ডেড ল্যাঙ্কস্বেপ, টায়ের্জ, লিগাটো ॥

॥ আবেল গাঁস ॥

১৮৮৯-১৯৮১, ফরাসি পরিচালক ও তাত্ত্বিক। গাঁস চলচ্চিত্র-মাধ্যম নিয়ে ব্যাপক পরীক্ষা করেছেন এবং আবিষ্কার করেছেন 'ট্রাইপিচ' বা ত্রিস্তর পর্দা, বহু-চিত্র পর্দা (নয়টি ছবি পর্যন্ত), ছবির উপর যুগপৎ একাধিক ছবি ফেলার পদ্ধতি এবং স্ট্রিওফোনিক শব্দ। ১৯২৫ সালে 'নাপলিয়' চলচ্চিত্রের জন্ম তিনি ট্রাইপিচ ব্যবহার করেন এবং তাঁর ধারণা হয় চলচ্চিত্র সৃষ্টিতে তখন থেকে এটাই ব্যাপকভাবে ব্যবহার হবে : প্রতিক্রমের সময়সূচী গঠিত এক 'সিস্টেম' বা ঐকতান। এই ধারায় তাঁর 'লা রু' ছবিটি মনতাজ ফিল্মের এক আশ্চর্য উদাহরণ।

আবেল গাঁসকে প্রশংসা না করে কী করে থাকে যান্ন? আবেল গাঁস ছাড়া নব্বই বছরের আর কোন্ চিত্রনির্মাতা, তাঁর কথা বেশ কিছুটা গুরুত্বের সঙ্গেই গৃহীত হবে জেনে, ঘোষণা করতে পারেন যে, ক্রিস্টোফার কলম্বাসকে নিয়ে তিনি একটা ন'ব'টার সুদীর্ঘ ছবি শুরু করতে যাচ্ছেন। ১৯৩০ সনের আগেই তিনি অন্তত তিনটে ছবি নির্মাণ করে ফেলেন যা সিনেমার ইতিহাসে ল্যাঙ্কার বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। কেভিন ব্রাউনলো-র এই অতি প্রশংসাসূচক মন্তব্য, যার সত্যাখ্যান করা সত্যিই মুশকিল, মেনে নিতে হবে এমন কোনো কথা নেই : 'তাঁর নির্বাচন চিত্র জা'কুজ (১৯১৮), লা রু (১৯২২) ও নাপলিয়' (১৯২৮)-র মাধ্যমে তিনি চলচ্চিত্র-মাধ্যমটির যে প্রয়োগ ঘটান তা তাঁর পূর্ববর্তী বা পরবর্তী যে

কোনো প্রয়োগের চেয়ে ব্যাপকতর'। আউনলোর মতো অনেক সমালোচক ধারা গাঁসের প্রশংসা করেন তাঁরা তাঁর ছবির মূল্যায়নে প্রায়ই কলাকৌশলের ওপর খুব বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এর ফলে ছবির আদর্শগত বৈশিষ্ট্য উপেক্ষিত থেকে যায়। যেমন মুজাহিদ শরীফ তাঁর এমনিতে সুরচিত প্রবন্ধ 'চলচ্চিত্রকার আবেল গাঁস'-য়ে একবারই কথা প্রদক্ষে উল্লেখ করেন যে, গাঁসের ছবিতে নেপোলিয়ন একটা নাজী চরিত্রের মতো, কিন্তু তিনি এই বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা রাখেন না। আবার যে মানুষটি 'দিনেরামার ৩০ বছর আগে প্যানোরামিক পর্দা আবিষ্কার করেছিলেন...দিনেমার ভাষার অনেকটাকেই ব্যবহার করেছিলেন...হাতে-ধরা ক্যামেরা, ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স, র‍্যাপিড কাটিং ও ম্যান্টপল স্থপার-ইম্পোজিশনের প্রচার ঘটান এবং ষ্টিরিওফোনিক সাউণ্ড প্রথম ব্যবহার করেন' তাঁকে 'যে মহাপ্রতিভাধর কোনো প্রতিভা ছিল না' বলে বাতিল করা যায় না।

আবেল গাঁস ফ্রান্সে ১৮৮৯-য়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দিনেমাকে সঙ্গে নিয়ে বড়ো হয়ে ওঠেন। দিনেমার আবির্ভাবকে তিনি সেইভাবে স্বাগত জানান, ধর্মীয় লেখকরা যেভাবে জাগতিকতার আগমনকে ঘোষণা করেন। ১৯২৬-য়ে তিনি লিখেছিলেন :

'প্রতিরূপের (ভাবপ্রতিমার) সময় আমাদের আচ্ছন্ন করে...সমস্ত পুরাকাহিনী, সমগ্র পৌরাণিক জগৎ, সমস্ত ধর্ম ও ইতিহাসের প্রধান চরিত্রগুলি, সহস্র বছর ধরে কল্পনার যাবতীয় রূপায়ণ—সব কিছুই এক উজ্জ্বল পুনরুজ্জীবনের জন্তে অপেক্ষা করছে এবং আমাদের দরজায় প্রবেশের জন্তে অপেক্ষা করছেন নায়কেরা। সমগ্র জীবনের স্বপ্ন এবং সমগ্র স্বপ্নের জীবন আলোক-সচেতন ফিল্মের মধ্যে স্থান করে নেওয়ার জন্তে প্রস্তুত এবং বললে হয়তো উগো-র মতো অভুক্তি হবে না যে স্বেযোগ পেলে হোমর ঐ ফিল্মেই তাঁর ইলিয়াড এবং এমনকি তাঁর অডিসি ছাপাতেন।'

গাঁস হলেন চলচ্চিত্রের সিঁদুফাস। খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে ভারী একটা পাথরকে ক্রমাগত ঠেলে ওপরে তোলা শুধু সেই পাথর নিজের ভারে ফের গড়িয়ে পড়ে যাবে বলে, কিম্বদন্তির ওই চরিত্রের এই নিয়তির মতো গাঁসও একক প্রচেষ্টায় দিনেমাকে প্রকাশযোগ্যতার চূড়ান্ত চূড়ায় ঠেলে তুলতে চেয়েছেন যেখান থেকে দিনেমা বারবার গড়িয়ে পড়েছে অগভীর অতিনাটকীয়তার চরম খাদে।

আবেল গাঁসের কথায় আজ একটা মুখ প্রস্তুত : গাঁসের প্রতিভার স্বীকৃতি পেতে এত দেরী হলো কেন ? এবং তাঁর 'নেপোলিয়ন' ছবিকে এখন এত গুরুত্ব-

পূর্ণ মনে হচ্ছে কী কারণে ? প্রশ্ন দুটির একটাই উত্তর, যদিও সেই উত্তরটা জটিল । আসল আবেল গাঁস চলচ্চিত্র-নির্মাতা রূপে অবহেলিত ছিলেন, ও হয়তো এখনও তাই আছেন, কিন্তু তাঁকে একটা মিথ করে তোলা হয়েছে । ‘নেপোলিয়ন মিথ’ সম্পর্কে গাঁসের ছবির কথা বহু আলোচিত । কিন্তু বস্তুত নির্মাতা গাঁসকেই মিথে পরিণত করে তোলা হয়েছে । নেপোলিয়ন নিজে ইতিপূর্বেই মিথ হয়ে গিয়ে-ছিলেন । গাঁসকে নায়ক করে তোলা হয় ও নায়ক গাঁস নেপোলিয়ন নামের এক ন-ঐতিহাসিক, পরম ‘সস্তা’র ( যাকে একদা বিশ্বজয়ের কৃতিত্ব দেওয়া হয় ) সঙ্গে মিশে যান । ১৯৮০-তে আমেরিকার কলোরাডোতে একটি চলচ্চিত্র উৎসবে যখন ‘নেপোলিয়ন’ ছবিটি দেখানো হয় তখন দর্শকরা প্রকৃতপক্ষে ‘তিন নায়কের এক যৌথ সৃষ্টিকে পর্যবেক্ষণ করেন : যে সৃষ্টিকে নেপোলিয়ন অনুপ্রাণিত করেছেন, আবেল গাঁস সৃষ্টি করেছেন ও কেভিন ব্রাউনলো দীর্ঘকাল ধরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন ।’

তঁার অদম্য কল্পনাশক্তি প্রসূত ভাবপ্রতিমাকে গাঁস ঔৎকর্ষের যে চমৎকারিত্বের সাথে ‘পৃথিবীর সমস্ত সিনেমা পর্দায়’ তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, আয়োজনের সেই চমৎকারিত্বই ইতিহাসের বস্তুগত জগৎ থেকে তাঁকে তঁার অনিচ্ছায় সরিয়ে কল্পনার অলীক জগতে নিয়ে যায় । সিনেমা ও ইতিহাস তঁার মানসে কতদূর পর্যন্ত মিলেমিশে গেছিল তার প্রমাণ মিলবে নিজেদের ছবি ‘নেপোলিয়ন’ সম্পর্কে তঁার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে ।

১৯২৪-এর ৪ঠা জুন, ‘নেপোলিয়ন’ ছবির গুটিং শুরু করতে যাবার ঠিক আগে, গাঁস তার ইউনিটের লোকজনদের কাছে এইকটি কথা বলেছিলেন :

‘এই সেই ছবি যা অবশ্যই যেন, অনুগ্রহ করে আমার কথাগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করুন, ইতিহাসের সুবিশাল দরজা দিয়ে শিল্পের মন্দিরে আমাদের প্রবেশকে সম্ভব করে তোলে । এক অনির্বচনীয় উদ্বেগ আমাকে ঘিরে ধরেছে, তা এই কারণে যে, আমার ইচ্ছা ও আমার সারা জীবনের সাধনা ব্যর্থ হয়ে যাবে, যদি না এখন থেকে প্রতিটি মুহূর্তে আপনাদের প্রত্যেকের পূর্ণ সহযোগিতা পাই । এই সহযোগিতার ফলে আমরা বিপ্লব ও সাম্রাজ্যকে পুনরুদ্ভূত করবো । এ এক প্রায় অসম্ভব কাজ । যে তেজ, যে নিরুদ্ভিতা, যে শক্তি ওই সব সৈনিককে প্রাস করেছিল নিজেদের মধ্যে সেই আবেগকে ফিরে পাওয়া চাই... যেন আপনাদের দিকে তাকিয়ে সেই উচ্ছ্বসিত শক্তিকে আমি অনুভব করতে পারি যা সমস্ত যুক্তি বুদ্ধি বিচারক্ষমতাকে ভেঙে চলে যায়, যার ফলে এক সময়ে সৈনিকের

শিরোনামের সাথে তার হৃদয়ের আর কোনো তফাৎ থাকে না...বন্ধুগণ, পৃথিবীর সমস্ত সিনেমা পর্দা আমাদের জন্ত অপেক্ষা করে আছে। আপনাদের সকলের কাছ থেকে আমি চাই, দাবী করি, যে, সমস্ত ছোটখাটো, ব্যক্তিগত ভেদাভেদ সম্পূর্ণ ভুলে যান, এক চরম অদ্বীকার নিয়ে শুরু করুন। একমাত্র তাহলেই আপনারা এক মহৎ উদ্দেশ্যকে গুঁড় ভাবে সেবা করবেন, ভবিষ্যতের সুন্দরতম শিল্পের মহৎ উদ্দেশ্যকে ইতিহাসের অনবদ্য শিক্ষা দিয়ে সেবা।'

এই ভাষণ শুনে এই ধারণাই হয় যে, গাঁস নেপোলিয়নের ভূমিকায় কথা বলছেন...এবং তা-ই তিনি বলছিলেন।

ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রি যে-সব কারণে গাঁসকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়নি, সেগুলো কিছুটা অদ্ভুত কারণ ও যে নিরুদ্ভিতার জন্ত গাঁস ইণ্ডাস্ট্রিকে গালি দিতেন মূলত সেই নিরুদ্ভিতা থেকে কারণগুলোর জন্ম। কেননা, গাঁস ছিলেন ইণ্ডাস্ট্রির পক্ষে অস্বতন্ত্র বাগিজিক সম্পদ, এবং প্রচলিত প্রধান ভাবাদর্শের ( মনে করা যেতে পারে ইণ্ডাস্ট্রির আপন ভাবাদর্শের ) অস্বতন্ত্র শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা। তবুও, গাঁসের অভিযোগ ছিল যে, তাঁকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয় না। 'লা রু' ( চক্র ) ছবির মুক্তি উপলক্ষে তিনি বলেছিলেন,

'ছবি আরম্ভ করার আগে আমাকে আর্থিক চক্রের ঘুরণে পড়তে হয়। ছবি শেষ করার পর আমাকে ব্যবসায়িক চক্রের ঘুরণে পড়তে হয়। দুই চাকার জঁতা-কলে আমি আটকে রয়েছি।'

কলাকৌশলগত সমস্ত বৈশিষ্ট্য ও বেশ কিছুটা 'শৈল্পিক' স্বজনশীলতা সত্ত্বেও, গাঁস আদর্শগতভাবে ছিলেন খুব গোঁড়া। তিনি নিজেকে রাজনীতিবিদ ভাবতেন না, শিল্পী ভাবতেন। তবু তাঁর তিনটে প্রধান ছবিকে রাজনৈতিক বিরূতি হিসেবেই গ্রহণ করা হয়েছিল। 'জা'কুজ'-কে নেতিবাচক ও সামরিককর্মবিরোধী বলে গ্রহণ করা হয় ও সেই অনুসারে গাঁসকে ছবিটি পালটাতে বাধ্য করা হয়। 'লা রু'-কে অদল বদল করতে হয়েছিল এই কারণে যে, ছবির এক ট্রেন-ড্রাইভার চরিত্রকে মাতাল দেখানোয় রেল ইউনিয়ন আপত্তি করেছিল, তাদের বক্তব্য ছিল শ্রমিক-শ্রেণীকে এর ফলে ছোট করা হচ্ছে। আর 'নেপোলিয়ন' বামপন্থীদের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। আইজেনস্টাইনের বিশ্বস্ত বন্ধু লেওঁ মুসিনাক্ ছবিটির বিভিন্ন স্বকীয়তার প্রশংসা করে, আদর্শগত ভূমি থেকে ছবিটিকে নিন্দা করেন :

'এই ছবির বিষয়বস্তুটিই আপত্তিকর এবং তাকে পুরোপুরি বাতিল করা উচিত।... কিন্তু তার মানে এই নয় যে, এক অসত্য ও বিপজ্জনক ভাবাদর্শ

প্রচারের কাজে লাগানো হয়েছে বলে এই ছবির সমস্ত স্বকীয়তা ব্যর্থ হয়ে যায়। তারা সার্থক যেহেতু সিনেমার ভাষাকে তারা এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে।... 'নেপোলিয়ন' ছবিতে গাঁস যে সব নতুন কলাকৌশলের উদ্ভব ঘটিয়েছেন, 'দি ব্যাটলশিপ পটেমকিন'-এর, যা তার জাতের ছবিগুলির মধ্যে একটা মাস্টারপীস, দৃশ্যগুলি যদি সেই কলাকৌশলে সজ্জিত হত, তবে আইজেনস্টাইনের ছবি সম্ভবত আরো শক্তিশালী হয়ে উঠত।'

গাঁস ও আইজেনস্টাইন দুজনেই ছবির সঙ্গে দর্শককে সংশ্লিষ্ট করতে চেয়েছিলেন। দুজনেই ছিলেন শিক্ষামূলক চিত্রনির্মাতা। কিন্তু দুজনের ধরন ছিল যথেষ্ট আলাদা: আইজেনস্টাইনের মনতাজ হলো ব্যাখ্যার পদ্ধতি, গাঁসের মনতাজ হলো প্ররোচিত করার উপায়। 'পটেমকিন' ও 'নাপলিয়ন' বাদ/প্রতিবাদের সূত্রে নিবন্ধ: জনতা/ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বিপ্লব/বিপ্লবী 'চেতনা', ইতিহাসের ঋণীকরণ/ইতিহাসের একত্রীকরণ, ইত্যাদি। আসলে দুজনের রাজনীতি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। 'নাপলিয়ন' তৈরি করার দশ বছর আগেই গাঁসের রাজনীতি বিশেষভাবে কার্যকর হয়েছে 'জ'র্জ' ছবিতে। এই ছবি তৈরি হয়েছিল ১৯১৭-য়, যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হতে যাচ্ছে, যখন রাশিয়ায় বিপ্লবের ফলে জার নিকোলাস ক্ষমতাচ্যুত ও নিহত হয়েছেন, যখন হাজার হাজার ফরাসি শ্রমিক ধর্মঘট করছেন, যখন সারা ফ্রান্স জুড়ে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড়। ১৯১৬-য় ঐরি বারবুস যুদ্ধের আতংককে অভিসম্পাত দিয়ে একটি বই লিখলেন, যার এক লক্ষ কপি অবিলম্বে ফুরিয়ে গেল। গাঁস মূলত এই বই থেকে তাঁর মালমশলা সংগ্রহ করেন। আবার যে সংস্থা ছবিটি প্রযোজনা করছিল সেখানে সবে ১০০০ জন কর্মী ছাটাই করা হয়েছে, ফলে স্বদেশে বিপ্লবের প্রচার বা প্রসারের কোনো ইচ্ছাই ওই সংস্থার ছিল না। এই অবস্থায়, জর্জ সাদুলের মতে,

'গাঁসের ছবিতে কোনো ধর্মঘটী শ্রমিককে দেখা গেল না, কোনো যুদ্ধবিরোধী মিছিল দেখা গেল না। আদতে ছবিটি ছিল 'যুদ্ধের কিছু বিশেষ আতংকের' বিরুদ্ধে এক নাটকীয় প্রতিবাদ, তার বেশি কিছু না। এবং তা মূলত 'জার্মান বর্ধরতার' বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।'

চোখে কী দেখছেন তা নিয়ে গাঁস দ্বন্দ্বিতা ছিলেন না, তিনি মনে মনে কী দেখছেন তাই ছিল তাঁর বিবেচ্য। তাঁর কাছে প্রতিরূপ হলো 'এক যাদুমন্ত্র: বিশেষ এক চেতনা বা আত্মাকে আহ্বান, সেই চেতনা বা আত্মার আবির্ভাব।' গাঁসের কাছে 'নেপোলিয়ন ও কলম্বস দুজনেই হলেন কোনো এক চেতনার প্রকাশ।'

যাদুকর ও রাজনীতিবিদ উভয়েই জগৎকে বদলায়। কিন্তু গাঁস যতটা চান যাদুকর ইতিহাসের সঙ্গে তার চেয়ে বেশি সংশ্লিষ্ট। ভবিষ্যতের ঘটনাকে নিজে মতো করার চেষ্টা করে ভবিষ্যতকে হয়তো প্রভাবিত করা যায়। কিন্তু শুধুই রহস্যীকরণের মাধ্যমে অতীতের ঘটনাকে নিজের মনের মতো করে তোলা যায় না। কিন্তু অতীতের ঘটনা তা যেমন সে-রকম না হয়ে অস্ত্রের মনের মতো হবে কেন ?

প্রাসঙ্গিক চিত্র : কেভিন ব্রাউনলোর *Abel Gance, the Charm of Dynamite* ।

গান্স<sup>৩</sup> রোবের্জ

॥ ইলমাজ গুণে ॥

(১৯৩৭-১৯৮৫), তুরস্কের চিত্রপরিচালক। বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় নায়ক, ঔপন্যাসিক, বামপন্থী রাজনীতিতে গভীরভাবে বিশ্বাসী, জননায়ক, দীর্ঘকাল কারাগারে অন্তরীণ অঞ্চল সততঃ সৃষ্টিশীল, জীবদ্দশায় কিংবদন্তীপ্রায় এবং সর্বোপরি তুর্কী দেশের তথা পৃথিবীর অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক—ইলমাজ গুণে এক বৈচিত্র্যময় ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। বন্দী অবস্থায় চিত্রনাট্য রচনা করে সহযোগীদের সাহায্যে সফল চলচ্চিত্রায়ণের বিরল কৃতিত্বের অধিকারীও তিনি।

অল্প বয়স থেকেই তাঁর ছিল চলচ্চিত্রে অনুরাগ। শ্রমিক হিসেবে কাজ এবং আইন ও অর্থনীতি নিয়ে পড়াশুনার পর ১৯৫৮ সালে পরিচালক আতিফ ইলমাজের (Atif Yilmaz) ছবির চিত্রনাট্যকার, সহকারী এবং অভিনেতা হিসাবে চলচ্চিত্রে জীবন শুরু করেন। ১৯৬১ সালে ‘ইকুয়েশনস উইথ থ্রি স্ট্রেন্জারস্’ (Equations with Three Strangers) উপন্যাস লেখার অপরাধে আঠারো মাসের জেল হয়। ১৯৬৩ সাল থেকে বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের সফল অভিনেতা হিসেবে খ্যাতি অর্জনের পাশাপাশি সমাজ-সচেতন, মানব-দরদী চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনায় গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। এই পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য ছবি—‘মাই নেম ইজ কেরিম’ (My Name is Kerim, 1967), ‘নুরি দি ফ্লি’ (Nuri the Flea, 1968), ‘ব্রাইড অব দি আর্থ সেয়িত্-খান’ (Bride of the Earth Seyyitkhan, 1968), ‘দি হান্গরি উল্ভস্’ (The Hungry Wolves, 1969), ‘অ্যান অ্যাগলী ম্যান’ (An Ugly Man, 1969), ‘হোপ’ (Hope, 1970), ‘দি ফিউজিটিভস্’ (The Fugitives, 1971), ‘দি হোপলেস ওয়ানস্’ (The Hopeless Ones, 1971), ‘পেইন’ (Pain, 1971), ‘এলেজি’ (Elegy, 1971), ‘দি ফাদার’ (The Father, 1971) প্রভৃতি।

১৯৭২ সালে 'দি পুওর ওয়ানস্' (The Poor Ones) ছবি তৈরিকালীন নৈরাজ্যবাদী (Anarchist) ছাত্রদের আশ্রয় দেবার অভিযোগে বিনাবিচারে আটক। ছাষিণ মাস বন্দী থাকার পর মুক্তি পেয়ে 'দি ফ্রেন্ড' (The Friend, 1974) তৈরি করেন। সেই বছরই 'অ্যাঙ্ক্‌জাইটি' (Anxiety) ছবি তৈরিকালীন এক বিচারককে হত্যার অভিযোগে (যা সন্দেহাতীতভাবে কখনো প্রমাণিত হয়নি) গ্রেপ্তার ও উনিশ বছরের জেল-জীবনের সাজা পান। তাঁর অল্পস্থিতিতে অসমাপ্ত দুটি ছবি 'দি পুয়োর ওয়ানস্' (1975) এবং 'অ্যাঙ্ক্‌জাইটি' (1974) যথাক্রমে শেষ করেন তাঁরই দুই ঘনিষ্ঠ সহযোগী, পরিচালক আতিফ্‌ ইলমাজ এবং সেরিফ্‌ গোরেন (Serif Goren)। উপরোক্ত অধিকাংশ ছবির প্রধান চরিত্রে গুণের অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য।

বন্দী অবস্থায় গুণের লেখা চিত্রনাট্য ও বিস্তারিত নির্দেশ অবলম্বনে জেকি ওকটেন্‌ (Zeki Okten) তৈরি করেন 'দি হার্ড' (The Herd, 1978) এবং 'দি এনিমি' (The Enemy, 1980)। ছবি দুটির সাকল্য গুণের বন্দী অবস্থার প্রতি পৃথিবীর দৃষ্টি বিশেষভাবে নিবদ্ধ করে।

১৯৮১ সালের অক্টোবরে জেল থেকে পালিয়ে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন। পরে তিনি লিখেছিলেন যে দেশে ফিরতে পারলে তিনি আরো ভালো ভাবে কাজ করতে পারতেন। ১৯৮২ সালে তাঁরই চিত্রনাট্য ভিত্তিক 'ইয়োল' (Yol/ The Road) ছবির শেষ পর্যায়ের কাজে সেরিফ্‌ গোরেনকে সাহায্য করেন।

১৯৮৩ সালে তৈরি তাঁর শেষ ছবি 'দি ওয়াল' (The Wall)। এই ছবির সম্পাদনা ও শিল্প নির্দেশনাও তাঁরই। তাঁর অছাড়া অনেক ছবির মতোই—'দি ওয়াল'ও আত্মকথনধর্মী। জেলে বন্দীজীবনের নারকীয় যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতির স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী।

গুণের চলচ্চিত্রের মহৎ গুণ তার মানবিকতাবোধ ও সংবেদনশীলতা। শহরের ঐশ্বর্য ও আধুনিকতার পাশাপাশি আবহমান মানসিকতা, দরিদ্র গ্রাম-প্রান্তর, ধনতন্ত্রের বিকাশ সবেও সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণা ও ব্যবস্থার অবস্থান, শোষণ, অত্যাচার, নিপীড়ন, সাধারণ মানুষের অসহায়তা ও সংগ্রাম, প্রেম-বিরহ, গোষ্ঠী ও পারিবারিক দ্বন্দ্বের নিষ্ঠুর পরিণতি—এরকম অনেক বিষয়কে তাঁর ছবির উপাদান করেছেন তিনি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর কারাজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। সর্বদা প্রতিবাদী থেকেছেন তিনি এবং আশা করেছেন যে তাঁর শিল্পকর্ম এক নতুন সমাজ গঠনে সাহায্য করবে। তাঁর প্রথম দিককার ছবিতে নিও-রিয়ালিজমের প্রভাব

রয়েছে। কিন্তু মধ্য পর্বের ও অধিকাংশ ছবি মূলত আচার্যালিষ্টিক বা স্বাভাবিকতা-বাদী। শেষ দিকের ছবিতে আবার অ্যাবসার্ভিটর লক্ষণ কিছু-কিছু খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রতিকূল অবস্থায় তৈরি তাঁর অধিকাংশ ছবি। তা সত্ত্বেও চলচ্চিত্রানুগ অসাধারণ নাট্যমুহূর্ত তৈরির ক্ষমতা, স্পর্শা অভিনয়, প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিক-বস্তুবোয় সঙ্গে একাত্ম করার দক্ষতা যে কোনো ক্রটিকে তুচ্ছ করে তোলে। তাঁর ছবি দেখা হয়ে ওঠে এক বিরল অভিজ্ঞতা।

মিহির সেনগুপ্ত

॥ গুপ্তী গাইন বাঘা বাইন ॥

ভারত, ১৯৬৯। হেমিংওয়ে মার্ক টোয়েনের হাকলবেরি ফিন সম্বন্ধে বলেছিলেন, এটি সমস্ত পরিবারের উপযোগী উপন্যাস ও উপন্যাস হিসেবে সার্থক সাহিত্য। সত্যজিতের গুপ্তী গাইন বাঘা বাইন সম্পর্কেও সেরকম বলা যায়, এটি সমস্ত পরিবারের উপযোগী ছবি ও চলচ্চিত্র হিসেবেও সার্থক সৃষ্টি। এর গল্প রূপকথা, তাতে ফ্যান্টাসির ছাপ, এর সাফল্য গল্পকে ছাপিয়ে চলে যাওয়ায়, সেখানে ফেব্‌লের হোঁয়া, এটুকু বললেই যথেষ্ট হয় না, সেখানে অদ্ভুত রস, স্বাদ ও আবেদন, মহাজাত স্বতঃস্ফূর্ততা, বিচিত্র কল্পনাপ্রবণতা ও ক্রপদী মহত্বের অনুরণন। স্থান ও কাল নিরপেক্ষ এই মিউজিক্যাল ছবিতে সময়, সমাজ ও দেশের জরুরি এক প্রাসঙ্গিকতা আছে, যা ভূতদের নৃত্যদৃষ্টির রূপকতা বা গানের কথা বা আর্কি-টাইপ মুখের ব্যবহারে স্পষ্ট। গু গা বা বা-য় কলাকৌশলের বিচিত্র প্রয়োগ ও সংগীতের সার্থক পরীক্ষা-নিরীক্ষা রয়েছে। কিন্তু সবকিছুই একক প্রয়োজনীয়তাকে অতিক্রম করে ছবির সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মিশে যেতে পেরেছে। ছবির সংগীতে লোক-সংগীত ও রাগসংগীত—হিন্দুস্থানী ও কর্ণাটকী উভয়ই, এবং বিদেশি অর্কেস্ট্রেশন—সবকিছুর সুন্দর সংমিশ্রণ হয়েছে, যার সঙ্গে রয়েছে প্রতিমায় ও চিত্রকল্পমালায় আলোছায়ার বুননিতে দৃশ্যসংগীত। গুপ্তী ও বাঘার দশ বছর পরের আর এক অ্যাডভেঞ্চারের সাংগীতিক চিত্রায়ণ হীরক রাজার দেশে।

অভিনয়ে তপেন চট্টোপাধ্যায় ( গুপ্তী ), রবি ঘোষ ( বাঘা ) ; আলোকচিত্র সৌমেন্দু রায়, সম্পাদনা হুলাল দত্ত, শিল্প বংশী চন্দ্রগুপ্ত, সংগীত সত্যজিৎ রায়, কাহিনী উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ॥

## ॥ আত্মর গোপালকৃষ্ণন ॥

জন্ম ১৯৪১। জন্ম, পড়াশুনা ও চিত্রনির্মাণ কেলায়ায়। কথাকলি নৃত্যকলার সঙ্গে যুক্ত পরিবারে তিনি বড়ো হয়েছেন, শৈশব থেকেই অভিনয় করেছেন, পরে নাটক লিখেছেন ও মঞ্চস্থ করেছেন। চিত্রপরিচালনায় স্নাতক হয়েছেন পুনে থেকে (১৯৬৫)। মালয়ালাম চলচ্চিত্রকে ভারতীয় চলচ্চিত্রের একেবারে প্রথম সারিতে এনে দিয়েছেন ষাঁরা, গোপালকৃষ্ণন তাঁদের অন্ততর। অন্ত জন হলেন অরবিন্দন। কিন্তু আত্মরের এই পরিচয়টুকু মোটেই যথেষ্ট নয়। বস্তুতঃ সত্যজিতের পর তিনিই সবচেয়ে প্রতিভাবান ভারতীয় চিত্রপরিচালক রূপে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে স্বীকৃত। কেলায়ায় চিত্রলেখা কিন্ন কো-অপারেটিভ স্থাপন করেন তিনি, এর প্রধান হিশেবেও তিনি দীর্ঘকাল কাজ করেছেন। মালয়ালাম চলচ্চিত্রে নবযুগের আবির্ভাবের পিছনে এই সংস্থার অবদান অবিস্মরণীয়। সংগঠক হিশেবে আত্মরের বিশেষ দক্ষতা আছে, এন. এফ. ডি. সি.-র বোর্ড ডিরেক্টরও ছিলেন তিনি।

একেবারে প্রথম দিককার ছবি থেকেই [ স্বয়ম্ভরম (৭২) ও কোদিয়েত্তম (৭৭) ] আত্মর গোপালকৃষ্ণনের মৌলিকতা ও নিঙ্গমতা প্রমাণিত। যে বৈশিষ্ট্যের মধ্য পড়ে স্মৃগতীর বাস্তবতাবোধ ও শৈল্পিক অন্তর্দৃষ্টি। প্রথম দুটি ছবির স্মৃষ্-জটিল কিন্তু মূলত বহিঃ বাস্তবতা ( আত্মরের ভাষায়, স্বয়ম্ভরম হলো 'a trip from illusion to reality' ) আত্মরের তৃতীয় ছবি এলিপ্সাথাইয়াম ( দি র্যাট ট্র্যাপ )-এ ( ৮২ ) এসে অন্তর্বাস্তবেও ডুব দেয়। অসাধারণ ইতিহাসচেতনা ও প্রতীকীয়তায় চিহ্নিত এই ছবি। ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র উন্নি উত্তরাধিকার সূত্রে পিতৃপুরুষদের কাছ থেকে পেয়েছে সামন্ততান্ত্রিক স্বৈচ্ছাচারের সেই অধিকার যাকে টিকিয়ে রাখা যায় শুধুমাত্র সামাজিক শোষণ ও অত্যাচারের মধ্য দিয়েই। পুরনো সংস্কার আর আধুনিক কাল এই সংঘাতের শিকার হয় সে, নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না, এক অদ্ভুত উদাসীনতা এসে গ্রাস করে তাকে। ছবির শেষে তার ভোত অথবা আত্মিক মৃত্যুই ঘটে। ছবিটি সারা বিশ্ব জুড়ে নন্দিত হয়েছে ( যার মধ্য আছে ব্রিটিশ কিন্ন ইনস্টিটিউটের পুরস্কার )। বস্তুতঃ ভারতের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ছবিগুলির একটি দি র্যাট ট্র্যাপ ( দ্র. )। এর ষীম উত্তরাধিকারের চেয়ে বেশি কিছু, দায়ভাগের চেয়েও অধিক কিছু, তা হলো সংস্কৃত অর্থে ঝকুথ। গোপালকৃষ্ণনের ছবিতে ক্রমেই সমাজচেতনা, মনস্তাত্ত্বিক চেতনা ও রাজনৈতিক চেতনা মিলেমিশে গিয়ে তৈরি হতে থাকে সেই নান্দনিক বুনট যা নির্দিষ্ট স্থান ও কালের

অঙ্কে এবং রূপের কাঠামোয় ও রসের আভাসে আবদ্ধ হয়েও হয়ে উঠতে পারে একই সঙ্গে দেশোত্তীর্ণ ও কালোত্তীর্ণ, রূপোত্তীর্ণ ও রসোত্তীর্ণ। যেমন মুখমুখম (৮৪) ছবিতে তিনি বিশেষ রাজনৈতিক পটভূমি ও পরিস্থিতির বিচার ও বিশ্লেষণ করেন সমালোচনামূলক (যা একই সঙ্গে আত্ম-সমালোচনামূলকও বটে) সেই ভঙ্গিতে যা একত্রৈখিক ও একমাত্রিক বর্ণনার বদলে উপস্থিত ও উপস্থাপিত করে এক বহুমাত্রিক ভাষ্য, যার ফলে ছবিটি নানা স্তরে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। টম্যান আলিয়ার যেমোরিজ অব আণ্ডারডেভেলপমেন্ট ছবির সঙ্গে এই ছবির দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ মিল আছে। বামপন্থী চলচ্চিত্রের তালিকায় ছবিটি (এই ছবির উদ্দেশ্য হলো, তাঁর ভাষায়, 'object-image relationship against the background of leftist politics in Kerala' দেখানো ও সেই সম্পর্কের বিচার-বিশ্লেষণ করা) একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

প্রথম থেকেই গোপালকৃষ্ণন এমন সব চরিত্র বেছে নিয়েছেন যা নৈতিক আচরণ ও মনস্তত্ত্বের বিচারে টাইপ চরিত্র নয় এবং তাদের দিয়ে সেই সব ঘটনা রচনা করেছেন যা as a matter of fact ধরনের নয়। এমনকি প্রখ্যাত মালয়ালম লেখক মুহম্মদ বশীরের জীবনকে ভিত্তি করে তোলা তাঁর মথিলুকল (৯০) ছবি সম্পর্কেও এ-কথা সত্য। যথারীতি এ-ছবিতেও আত্মর সংক্ষিপ্ত একটি কাল-পর্বের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর কাল, দেশ ও ভাবকে ধরেন। তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সন্ত্রাসবাদী বশীরের জেলজীবনটা বাছেন। বন্দী হলেও তিনি কিন্তু চরম মুক্তির প্রতীক—জেল থেকে তাঁর মুক্তি, বিদেশি শাসন থেকে দেশের মুক্তি ইত্যাদি হয়ে এই প্রতীকতা সমস্ত বন্ধন, যাবতীয় সীমাবদ্ধতা থেকে মানবমনের মুক্তি পর্যন্ত বিস্তার পেয়ে যায়। যে মুক্তির একটা প্রধান উপায় হলো প্রেম (কারাকফের দেয়ালের ওপারে প্রেমিকার কণ্ঠস্বরের বিমূর্ত উপস্থিতি), যা মানুষকে যুগে যুগে মুক্ত ও মহান করে। ছবিটি দেখতে দেখতে কখনো ত্রেসঁর কথা মনে পড়ে যায়। আত্মর এই ছবিতে মুক্তির প্রতীকের বিভিন্ন স্তরগুলিকে স্বন্দ্রপ্রবণ করেন যা ছবিটিকে কাঙ্ক্ষিত আধুনিকতা দেয়। একদিক দিয়ে দেখলে এই ছবির ধীম প্রত্যয় বনাম প্রেমও। বশীরের অভিজ্ঞতার যথাযথ চিত্রায়ণ নয়—এই বলে ছবিটি নিয়ে বিতর্ক তোলা হয়েছিল।

যে বিতর্ক আরো জোরালো হয়েছে তাঁর সাম্প্রতিক ছবি বিদেহনকে ঘিরে। অভিযোগকারীদের মত, মূল কাহিনীর বক্তব্য ও লেখকের ভাবধারাকে ছবিতে যথাযথ অন্তর্দারণ করা হয়নি। চাকলতা নিয়ে অনুরূপ বিতর্কের কথা এ-প্রসঙ্গে

মনে পড়ে। নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বিভিন্ন প্রসঙ্গ-অঙ্কন ছবিতে থাকলেও এ-ছবিটি অন্তর্গত যুক্তি ও প্রয়োগের অন্তরঙ্গতার বিচারে আঙ্গুরের কোনো-কোনো ছবির তুলনায় দুর্বল। তবু এখানেও বহু দৃশ্যে পরিচালকের অসাধারণ সংবেদনশীলতা এবং একাধিক মুহূর্তে চিত্তাকর্ষক রসবোধের পরিচয় মেলে।

সত্যজিতের মতো গোপালকৃষ্ণনও একজন টোটাল ফিল্ম-মেকার। অসাধারণ চিত্রনাট্য লেখক তিনি, চিত্রপরিচালক রূপেও তিনি রূপদী ধীম ও পরিশীলিত ট্রেটমেন্টের শিল্পী, তাঁর কোনো-কোনো ছবির গল্পও নিজেই লিখেছেন তিনি। তাঁর শিল্পকর্ম ব্যক্তি বনাম সমষ্টি এবং সময় বনাম সিচুয়েশনের দ্বন্দ্বিক রূপারোপে সমৃদ্ধ, মানবিক চেতনা ও ড্রাম্যাটিক প্লেবের এক শিল্পিত সহাবস্থান সেখানে। তাঁর ছবির শুদ্ধতা, সৌন্দর্য ও ভারসাম্য কাহিনীগত ও গঠনগত উভয়ত। কাহিনী বিষয়-কাঠামোর বিচারে প্রায়ই দুটি প্রধান বিপরীত বা বিপ্রতীপ উপাদান বা শক্তির দ্বন্দ্বিক ফলাফল। কাহিনীর সঙ্গে গঠনকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য তাঁর ছবির গঠন-কাঠামো তাই ক্রিয়া/প্রতিক্রিয়া, ধ্বনি/প্রতিধ্বনি, বাদ/প্রতিবাদ-এর সূত্রে নিবদ্ধ। কাহিনীর মূল শ্রেণী একটি, হয় তার পাশাপাশি চলেছে এক বা একাধিক শাখা-শ্রেণী, সময়ে কাহিনী-সঙ্গমে এসে মিলবে, নয়তো মূল শ্রেণীর গভীরে নিচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে কোনো চোরা টান, সময়ে যা ঘূর্ণির রূপ নেবে। প্রথম ক্ষেত্রে কাহিনীর ক্রমবিকাশ প্রস্তুতি—প্রকৃতি—ব্যঞ্জনা, এই ভাবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রকাশ—বিকাশ—বিস্ফোরণ, এই ভাবে। মূলতঃ এই পদ্ধতি সাহিত্যের পদ্ধতি শুধু নয়, ডিকেন্স, বালজাক ও কিছু পরিমাণে তলস্তয়ের মহোপন্যাসের পদ্ধতি। কিন্তু আঙ্গুরের কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি এক সমৃদ্ধ সাহিত্যিক ঐতিহ্যকে আধুনিক চিত্রভাষার কাঠামোয় অদ্বিত ও সংশ্লিষ্ট করতে পেরেছেন। রাধাকৃষ্ণন সম্পর্কে যে-কথা বলা হয় তা অনেকটা গোপালকৃষ্ণন সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য—সত্যিকার দক্ষিণী ও সাচ্চা ভারতীয় বলেই ( অর্থাৎ deeply rooted বলেই ) তিনি হতে পেরেছেন প্রকৃত অর্থে আন্তর্জাতিক। কাহিনী ও গঠনের বিবিধ দ্বন্দ্ব তাঁর ছবিতে অনিবার্য ভাবে যে চূড়ান্ত টেনশন সৃষ্টি করে সেই টেনশন তাঁর সিনেমাকে আবশ্বিকভাবে আধুনিক সিনেমাও করেছে। তাঁর ছবিতে যে সমাজতাত্ত্বিক/মনস্তাত্ত্বিক সংঘাত লভ্য তা ওই আধুনিকতা ও আন্তর্জাতিকতার মাত্রা পেয়ে একটা নান্দনিক শক্তি-ই হয়ে ওঠে। এক স্পন্দমান দীপ্তিময় শক্তি।

গোপালকৃষ্ণনের ছবি সত্যজিতের ছবির তুলনায় জটিল এবং সত্যজিতের

ছবির মতো অতটা দৃষ্টিস্বয়ংকর নয়। তাঁর ছবিকে ভালো লাগতে গেলে ও সঠিক উপলব্ধি করতে হলে চাই শিক্ষা, জ্ঞান, কৃতি (ইংরেজি টেস্ট অর্থে নয়, সংস্কৃত জ্যোতি অর্থে), বোধ ও আধুনিক মানস। যে অর্থে তাঁর ছবি শুধু ভারতীয় চলচ্চিত্রের নয়, ভারতীয় সংস্কৃতিরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। খুব কম চিত্রপরিচালক সম্পর্কেই এ-কথা বলা যাবে।

মৌলিক নাটক রচনা করা ছাড়াও আদুর নাট্য ও নাট্যকার বিষয়ে একাধিক গ্রন্থের রচয়িতা। চলচ্চিত্র বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধাবলীর একটি সংকলনগ্রন্থও প্রকাশিত ও পুরস্কৃত হয়েছে। বহুসংখ্যক তথ্যচিত্রও নির্মাণ করেছেন তিনি। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য And Man Created, Guru Chengannur, The Myth, Yakshagana, Chola Heritage, Krishnanathan, The Ganges ইত্যাদি। তথ্যচিত্রগুলির নাম ও বিষয় থেকেই বোঝা যায় ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ে তিনি অতীব আগ্রহী ও সম্যক ওয়াকিবহাল। যে সংস্কৃতির আজ তিনি, আগেই বলেছি, অপরিহার্য অংশ।

॥ গোল্ডরাশ ॥

আমেরিকা, ১৯২৫। চ্যাপলিন জানতেন নাটকীয়তা সবকিছু তৈরি করে, খুব শাদাসিধে জিনিসও ঝলমলে এবং জমকালো হয়ে জলে ওঠে হঠাৎ—ছিমছাম প্রযুক্তিতে জলে, পরিলক্ষন এ্যানিটিলিনের আভা দেয় : সিগারেট ধরায় হয়তো কেউ, বই খোলে, বই বন্ধ করে আবার, সহসা কেঁদে ওঠে—এই, এইসবই নিয়ে তো অভিনয়ের কবিতা, এমনি স্তব্ধতায় সম্ভব কিছু না নিয়ে কিছু রচনা, শব্দহীন কাটুম ফুটুম। তাই হলো চ্যাপলিনের ছবি, এক আলো-ছায়ার পাষণ-ভাঙ্গা, এ-ই নীরবতায় বিনা প্রয়োজনের বীণা বাজানো। গোল্ডরাশও তাই, সেই সপ্রতিভ অসহায়তার ছবি, সেই ট্রাজিক কৌতুক, সার-রিয়ালিস্ট চিত্রশালা যেন একটি, যেখানে স্প্যাঘেত্তি মনে করে জুতোর ফিতে খান চ্যাপলিন, মাংসের হাড় মনে করে কামড় বসান মকাসিনের পেরেকে, আর তাঁর সঙ্গীর ক্ষুধার্ত চোখের প্রলাপে নিজেই হয়ে ওঠেন ডক্ষ্য, নধর মুরগি একটি। এই অপমানিত বর্ম আদলে এক ধরনের তীক্ষ্ণ প্রতিরোধ, এমন অসহায়তার মুখের ওপর দিনে দুপুরে হেসে ওঠা, এ বস্তুত সৃষ্টিকর্মের বিনীত ও আন্তরিক স্পর্ধা। না হলে শোপেনহাউএরের মতন স্বথ তো তাঁর কাছে একটি নেতিবাচক সংজ্ঞা হয়ে থাকত, দুঃখ হত মর্ষকামনার

ব্যাপার মাত্র, ছবির গরিবিয়ানা হত নিছক দারিদ্র-বিলাস। তা যে নয় গোল্ডরাশ তারই প্রমাণ। পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ছবিগুলির একটি।

অভিনয়, চিত্রনাট্য, পরিচালনা, প্রযোজনা চ্যাপলিন; চিত্রগ্রহণ টখেবো।

এই নির্ধাক চিত্র ১৯৪২য়ে চ্যাপলিন প্রদত্ত আবহ সংগীত ও ধারাবিবরণী যুক্ত হয়ে পুনর্মুক্তি পায়।

বীতশোক ভট্টাচার্য

॥ গ্যরনিকা ॥

ফ্রান্স, ১৯৫০। আল্যা রেনে চিত্রজীবনের সূচনায় বিভিন্ন চিত্রশিল্পীকে নিয়ে কয়েকটি সাক্ষাৎকারচিত্র তৈরি করেন। এই অনুরাগ তাঁকে পেশাদারী প্রযোজনা হিশেবে তিনটে স্বল্প দৈর্ঘের চিত্রনির্মাণে নিয়োজিত করে—ভ্যান গণ, গঁগা, ও গ্যরনিকা। শেষোক্তটির বিষয়বস্তু পিকাসোর ওই নামের দেয়ালচিত্র। এই দেয়ালচিত্রকে প্রথমত গণমাধ্যম যুগের চিত্র এবং দ্বিতীয়ত এর ব্যাপ্তি, আকারের বিশালতা ও অনুভব সৃষ্টির ক্ষমতার দরুন একে গণমাধ্যমসুলভ চিত্র বলা হয়েছে। পিকাসোর এই ছবির বিবিধ ডিটেলকে অস্বাভাবিক ছবি ও ভাস্কর্য, আর আলোকচিত্র ও সংবাদের হেডলাইন এবং ধারাবিবরণীর সঙ্গে একত্রে গেঁথে রেনের যুদ্ধবিরোধী এই ছবি নির্মিত হয়। পিকাসোর ছবির পেছনে শিল্পীর যে দায়িত্ববোধ ও ক্রোধ এবং সমসাময়িক বাস্তবতা ক্রিয়াজীবন রেনে তাকে ক্রটিত্বের সঙ্গে ফুটিয়েছেন। তুলেছেন শিল্পে বাস্তবতা-অবাস্তবতার জরুরি প্রসঙ্গ। রেনের ভাষায়, পিকাসোর বিমূর্ত ক্রোধ, প্রতিবাদ, চেতনা দেয়ালচিত্রের ঈষৎ বিকৃত ও তারই ফলে বলিষ্ঠ ও অভিঘাতী, রূপ পেয়েছে। পটকে এখানে দুঃস্বপ্ন থেকে পৃথক করা যায় না, যেমন যায়নি দি কানাল ছবিতে। গ্যরনিকার দুঃস্বপ্নের দৃশ্যরূপ ব্যক্তিগত হয়েও যুগোপযোগী ও কালোত্তীর্ণ। রেনের ছবির প্রচলিত ধরন থেকে এই ছবির সমাজচেতনা মাত্রায় হয়তো আলাদা, কিন্তু ক্যামেরা ও কাঁচির ছান্দিক সাফল্য ও দৃশ্য-প্রাঞ্জলতা রেনের উজ্জ্বল ভবিষ্যতেরই ইঙ্গিতবাহী।

চিত্রনাট্য ও সহযোগী পরিচালক রবার্ট হেসেন, সম্পাদনা রেনে, ভাষ্য পল এনুয়ার ॥

॥ গ্রিড ॥

আমেরিকা, ১৯২৩-২৫। সমসাময়িক ক্যালিফোর্নিয়ার পটভূমিকায় ফ্রান্স নরিসের Mctague উপগ্রাস অবলম্বনে, উপগ্রাসের প্রায় প্রতিটি অধ্যায়, ঘটনা ও চরিত্রের

যথায়থ চিত্ররূপ দেওয়ার মানসে এগ্রিক ডন স্ট্রাইম ৪২ রিলের এই ছবি তৈরি করেন। এমন স্ত্রীত্ব আবেগ সহকারে কাজ করেছিলেন তিনি যে মৃত্যু উপত্যকায় গৃহীত চূড়ান্ত দৃশ্যের চিত্রায়ণ কলাকুশলী ও শিল্পীদের অনেককে অতিরিক্ত পরিশ্রমে বিধ্বস্ত করে হাসপাতালে ভর্তি হতে বাধ্য করে। এই স্বদীর্ঘ ছবি তাঁর ও পরে তাঁর অমতে অল্পদের দ্বারা সংক্ষেপিত হয়ে যথাক্রমে ২৪ ও ১৮ রিল এবং অবশেষে ১০ রিলে দাঁড়ায়। স্ট্রাইমের মূল ছবির বিভিন্ন উপাদান এমন ভাবে সংযোজনপ্রবণ ও পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত ছিল যে সম্পাদনার একটা বিশেষ পদ্ধতিই কার্যকারী হতে পারে। ফলে সংক্ষিপ্ত ছবিতে ক্রমবিকাশ ব্যাহত হয়, বহু অধ্যায় অসম্পূর্ণ থেকে যায়, অনেক ঘটনার ছিন্ন স্মৃতি বেরিয়ে থাকে এদিক ওদিক। ভবু এই কাটা-ছেঁড়া অবস্থাতেও গ্রিডের শক্তি অনুভব করা যায়, তা হলো এপিকের শক্তি, বিষয়বস্তুর বলিষ্ঠতা। এই ক্রমবিকাশে দর্শককে এক সক্রিয় অংশীদার হয়ে পড়তে হয়। তার অনুভব ও প্রতিক্রিয়া চরিত্রচিত্রণ বা দৃশ্য-পরিবেশের মতোই জরুরি হয়ে ওঠে। লালসা ও মানবিক অবনতির এই অভিযান্ত্রিক চিত্রে স্ট্রাইমের সাধারণ বৈপরীত্যগুলি পুরো মাত্রায় উপস্থিত: অভিনাটক ও স্বাভাবিকতা, রোমান্স ও নিরাশা; কিন্তু তারই পাশাপাশি দ্বিধাসমতার উপাদানও লক্ষণীয়: ধ্রুপদী দৃষ্টিকোণ আর মানসিক অনুপস্থিতি, যেমন বিস্তার তেমনি পরিমিতি। চলচ্চিত্রের ছাত্রদের এই ছবি দেখানো হয়ে থাকে বারবার।

প্রযোজনা এম জি এম, চিত্রগ্রহণ রেনল্ডস, ড্যানিয়েল; শিল্প নির্দেশনা স্ট্রাইম, আর. ডে; অভিনয়ে Gowland, Pitts, Hersholt।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ: এইচ. জি. ভিয়েনবার্গের দি কম্প্লিট গ্রিড।

॥ ডেভিড ডবলিউ গ্রিফিথ ॥

(১৮৭৫-১৯৪৮)। আমেরিকার চিত্রপরিচালক ও প্রযোজক। চলচ্চিত্রের আদি পথপ্রদর্শকদের অগ্রতম। বোধহয় শ্রেষ্ঠতম। লিফটবয়, বইয়ের দোকানের কর্মী, গ্রন্থবিক্ষেতা ইত্যাদি কাজের পর তিনি সহকারী সাংবাদিক ও নাট্যকার/অভিনেতা রূপে শিল্পজীবন শুরু করেন। মঞ্চে মোটামুটি ব্যর্থ হয়ে ১৯০৮য়ে তিনি চলচ্চিত্রে মনোনিবেশ করেন, ওই বছরেই তাঁর প্রথম ছবি দি অ্যাডভেঞ্চারস অব ডনি মুক্তি পায়। পরবর্তী ছয় বছর ধরে প্রায় সাড়ে চারশো স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি গ্রিফিথ তৈরি করেছিলেন। এইসব ছবির প্রযোজনা, অভিনয় ও ক্যামেরা-শৈলীতে বাস্তবতার লক্ষণ ছিল। কিন্তু তারই সঙ্গে ছিল তাঁর স্বভাবমূলক অতি-

নাটকীয়তা। দি বার্থ অব এ নেশন নির্মাণ করে ১৯১৫-য় তিনি চলচ্চিত্রে, বলা যায়, নতুন যুগের সূচনা করলেন। এর আগে পর্যন্ত চলচ্চিত্র ছিল সরলভাবে বর্ণনাত্মক। গ্রিফিথ বর্ণনারীতিতে বিভিন্ন স্তরের প্রচলন করেন, কাহিনীকে ছোট ছোট দৃশ্য-পর্যায়ে ভাগ করে নেন, দৃশ্যশেষের সমবায় ও বিভ্রাসের ক্ষেত্রে গল্প, নাটকীয়তা ও বক্তব্যের ওপর গুরুত্ব দেন, অভিনয়কে চলচ্চিত্রস্থলভ করার চেষ্টা করেন; দৃশ্যের পুরোভূমি, পশ্চাদভূমি ও পার্শ্বভূমির ওপর মনোযোগ ও ক্যামেরার প্রয়োজনমতো স্থান পরিবর্তন তাঁর ছবিকে চিত্রধর্নী করে তোলে। দি বার্থ... যদিও অসাধারণ শৈল্পিক ও ব্যবসায়িক সাফল্য পায় তবু তাকে নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্কও কম হয় না। গ্রিফিথ নিজেকে অন্ডায় ও অদহযোগিতার শিকার মনে করেন ও নতুন ছবি ইনটলারেন্স-এর কাজে হাত দেন। ১৯১৬-য় মুক্তিপ্রাপ্ত এই ছবি চলচ্চিত্রকে একটি শিল্পমাধ্যম হয়ে ওঠার পক্ষে আর যে কোনো ছবির চেয়ে হয়তো বেশি সাহায্য করেছে (ড্র. ইনটলারেন্স)। কিন্তু এর ব্যবসায়িক ব্যর্থতাও চমকপ্রদ।

আমেরিকার নাট্যশিল্পের বিভিন্ন রীতি ও প্রকরণ আহরণ করে গ্রিফিথ তাদের চলচ্চিত্রোপযোগী করে নিজের ছবিতে কাজে লাগিয়েছিলেন। এই প্রয়োগ নিতান্ত আহরণ না হয়ে, হয়ে উঠতে পেরেছিল নতুন মাধ্যমের উপযোগী এক সংশ্লেষণ, এই কারণেই তাঁর গুরুত্ব আজও স্বীকৃত। অগ্নির ছবিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন কৌশল বা বিশেষ পদ্ধতিকেও তিনি নিজের ছবিতে আরও বেশি সার্থক ও শৈল্পিকভাবে কাজে লাগান। সম্পাদনার শক্তি ও সম্ভাবনা তিনিই প্রথম অন্ভব করেন ও তাঁর মাধ্যমে সম্পাদনা হয়ে ওঠে চলচ্চিত্রের প্রধান অঙ্গ। পোর্টার থেকে গ্রিফিথের অগ্রগতি এই তিনভাবে—১. গ্রিফিথ ক্যামেরাকে এক সক্রিয় ও সচেতন পর্যবেক্ষক করে তুলেছিলেন, ক্যামেরা মুভমেন্ট ও তৎজনিত টেম্পো তাঁর ছবিতে এক মূল্যবান উপাদান ২. তিনি দেখান গল্পের অন্তর্নিহিত নাটকীয় ভাবনা কীভাবে দৃশ্য-নির্বাচন, দৃশ্যকল্পনা, শটের স্থায়িত্ব ও শটের বিভ্রাসকে প্রভাবিত করে। পুদভকিনের ভাষায়, তাঁর ছবিতে the inner dramatic content of the action and a masterly employment of external effort (dynamic tension) are unforgettably combined. ৩. তাঁর শিল্প-প্রয়াস চলচ্চিত্রের দুটি দূরপ্রসারী প্রভাবের উৎস, একটা আইজেনস্টাইনের সম্পাদনা-প্রধান-পদ্ধতি, অন্টটা ফ্রুহাইম রেনোয়ার দৃশ্যরস-ও অভিনয়-প্রধান-পদ্ধতি। আইজেনস্টাইন তাঁর রচনায় বারবার গ্রিফিথ থেকে উদাহরণ দিয়েছেন।

ইনটলারেন্সের পর গ্রিফিথ আরও পনেরো বছর চিত্র পরিচালনা করেছেন, কিন্তু তাঁর মূল খ্যাতি দি বার্থ...ও ইনটলারেন্স ছবির জন্ম। ১৯২৩-য়ে লেনিন তাঁকে রাশিয়ায় এসে রাশিয়ার চলচ্চিত্র বিষয়ক সমস্ত দায়িত্বের নেতৃত্ব দিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। গ্রিফিথের সহকারীরা সকলেই পরে চিত্রপরিচালক হন, আর গ্রিফিথের শেষ তিন দশক কাটে ইনটলারেন্স ছবির জন্ম তাঁর যে অর্থস্বর্ণ হয়েছিল তা শোধ করতে। চলচ্চিত্রে আমরা যা পাই তা হলো স্থান ও কাল। বলা হয়, নির্বাক চলচ্চিত্র স্থানকে নিজের অধিকারে এনে সমৃদ্ধ হয়, আর সবাক চলচ্চিত্র সম্পন্ন হচ্ছে সময়কে বশ মানিয়ে। নির্বাক যুগে গ্রিফিথ যে তাঁর দি ফ্যাটাল আওয়ার ( ১৯০৮ ) ছবিতে ফ্ল্যাশব্যাক ব্যবহার করে গেছিলেন তা যেন নির্বাক যুগে তাঁর সাফল্য ও সবাক যুগ পর্যন্ত তাঁর প্রভাবের ধারাবাহিকভাবেই ইঙ্গিত করে। তিনি নিজের সম্পর্কে একবার কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন এইভাবে—

**D. W. Griffith**

**Revolutionizing Motion Picture Drama**

**and Founding the Modern Technique of the Art.**

আজ এত বছর পরেও এ বিবৃতি সমান সত্য বলে মনে হয়।

অত্যাশ্চর্য ছবি : ড্রিম স্ট্রীট ( ১৯২১ ), ড্রামস অব লাভ ( ১৯২৮ ), আব্রাহাম লিংকন ( ১৯৩০ ), দি স্ট্রাগল ( ১৯৩১ )।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : H. M. Geduld সম্পাদিত Focus on D. W. Griffith ।

॥ জন গ্রিয়ারসন ॥

( ১৮৯৮-১৯৭২ )। গ্রিয়ারসন তথ্যচিত্রের এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ও বিশেষত ব্রিটিশ তথ্যচিত্রের জনক। উস্টরেট অব ল উপাধি লাভ করে তিনি সাহিত্য দর্শন এবং রাষ্ট্র ও সমাজবিজ্ঞানে উচ্চতর অধ্যয়ন, গবেষণা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ক্রমে চলচ্চিত্র সমালোচনা ও তথ্যচিত্রের সম্ভাবনায় প্রতি গ্রিয়ারসন আগ্রহী হন। তাঁর ধারণায় তথ্যচিত্র হলো বাস্তব-সম্মত পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবতার সৃজনশীল প্রকাশ (the creative treatment of actuality) যা দর্শকের কল্পনা, যুক্তি ও চেতনাকে প্রভাবিত করতে পারে। এই ধারণার প্রত্যক্ষ প্রকাশ তাঁর ড্রিফটার্স ( ১৯২৯ ) তথ্যচিত্রে, যার বিষয় ছিল সমুদ্রে গিয়ে জেলেদের মৎস্য-শিকার। চমৎকার চিত্রগ্রহণ ও ছান্দিক সম্পাদনা ছবিটিতে নিখাদ বাস্তবতার

পাশাপাশি এক অসাধারণ স্বয়ংক্রিয় নিয়ে আসে। এর আগে থেকেই গ্রিয়ারসন তথ্যচিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্বে ও এবার ভরূণতর তথ্যচিত্র পরিচালকদের অনুশীলন ও চিত্রনির্মাণের জন্ত এক ফিল্ম ওয়ার্কশপ স্থাপনে হাত দিলেন, যে ওয়ার্কশপ বেসিল রাইট, পল রোথা প্রমুখ প্রথম শ্রেণীর তথ্যচিত্রনির্মাতার জন্ম দিল। ১৯৩১-য়ে ইংল্যান্ডে নিয়ে এসে ক্ল্যাফোর্টকে দিয়ে তিনি ছবি করালেন [ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্রিটেন (৩৩) ], ১৯৩৯য়ে কানাডার জাতীয় ফিল্ম বোর্ডের দায়িত্ব পেয়ে ছয় বছরের মধ্যে ওই দেশে তথ্যচিত্রের এক উল্লেখযোগ্য ধরানা তৈরি করে দিলেন। তথ্যচিত্র, শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনের প্রয়োজনে যখন যে দেশে দরকার হয়েছে গিয়ে প্রশাসনিক পদ গ্রহণ করেছেন গ্রিয়ারসন। মারী সীটনের ভাষায়, বহুলাপী ও ঈষৎ হঠকারী স্কটিশ জন গ্রিয়ারসন সম্ভাব্য প্রযোজকদের জোর করে তথ্যচিত্র প্রয়োজনায় বাধ্য করাতেন। তাঁর এই বাস্তব বিচক্ষণতার সঙ্গে মিলেছিল মননশীল প্রবণতা। জনমাধ্যমকে কাজে লাগাবার ও তথ্যচিত্রের জনসেবামূলক ভূমিকার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন প্রগতিশীলতা ও আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী।

রচিত গ্রন্থ : গ্রিয়ারসন অন ডকুমেন্টারি ॥

## ॥ দি গ্রেট ডিস্ট্রিক্ট ॥

আমেরিকা, ১৯৪০। চ্যাপলিনের প্রথম সবাকচিত্র যাতে শব্দের বিহীন ব্যবহার আছে। এই ছবিতে চ্যাপলিন হিটলার ও নাৎসিবাদকে ব্যঙ্গ করেছেন, হিটলার ও মুসোলিনির নকল করেছেন অসাধারণভাবে, কিন্তু একদল লোকের মতে মূলত কমেডি, গ্লেশ ও ব্যঙ্গ-প্রধান হওয়ায় এ ছবির রাজনৈতিক তাৎপর্য সামান্য। ওই তাৎপর্য বাড়তে আবেগ, ক্রোধ ও বক্তব্যের যে সমস্ত উপাদান ছবিতে মাঝে মাঝে আনা হয়েছে তা ছবির মেজাজ ও কাঠামোর সঙ্গে যায়নি। বহু ইমেজ ও দৃশ্যকল্পে যদি মূলত নির্বাক চলচ্চিত্রের রীতিকেই অতিরিক্ত অনুসরণ করা হয়েছে তো ছবির শেষাংশে সহনশীলতা, মানবিকতা, শান্তি ও স্বাধীনতার সপক্ষে দর্শকের উদ্দেশে দীর্ঘ রাজনৈতিক বক্তৃতায় আবার বাগাতিশয়া ঘটে গেছে। আর একদল লোকের মতে, ষাঁদের মধ্যে আছেন স্বয়ং আইজেনস্টাইন, এ ছবির রাজনৈতিক গুরুত্ব ও চলচ্চিত্রগত সাফল্য অসাধারণ। আর বক্তৃতাটি তো অপরিহার্য। চ্যাপলিনের এতদিন অবধি নির্বাক ও সংগীতময় পর্দা থেকে অবশেষে ভেসে আসে তাঁর স্বকণ্ঠ বাণী। আঙ্গিকবিশ্বাসী ও কলাবিলাসীরা তো এ-জন্ত তাঁকে তিরস্কার

করবেনই, তাঁদের কাছে শৈলী যে মানবিক আবেদনের চাইতে বেশি দরকারি। আসলে এই ছবি মোটের ওপর মজার ছবি, অসহায়তার মুখের ওপর দিনে-দুপুরে হেসে ওঠা, দানবকে নিয়ে ভয়ে কাঠ হাসির দারুণ ছবি বানানো। রাজনৈতিক আক্রমণ হিশেবে এ ছবির আঘাত নারীস্বলভ, যতটা আবেগ ও প্রবৃত্তিজাত ততটা মনন ও চেতনা উৎসারিত নয় আর ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এ ছবি অস্বতম প্রধান রাজনৈতিক হাতিয়ার—এই দুই সম্পূর্ণ বিপরীত মতের মাঝখানে রয়ে গেছে এই ছবির সঠিক মূল্যায়নের চাবিকাঠি।

প্রযোজনা / চিত্রনাট্য / পরিচালনা / সংগীত / অভিনয় (টোমানিয়ার শাসক রূপে) চ্যাপলিন, আলোকচিত্র টথেরো, সম্পাদনা ডবলিউ নিকো, অভিনয়ে জে. ও (য়া) কি (মুসোলিনির চরিত্রে) ॥

॥ গ্রেট ব্রিটেন ॥

১৮৯৬য়ে লুমিয়েরদের ছবি দিয়ে গ্রেট ব্রিটেনে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের সূচনা। এর এক বছর আগেই এদেশে প্রথম সংবাদচিত্রটি তোলা হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে স্বল্প দৈর্ঘ্য চিত্রের সংখ্যা নিয়মিত বাড়তে থাকে। ফিল্ম সেন্সর বোর্ড স্থাপিত হয় ১৯১২-য়। এর এক বছর পর এই দেশের নাগরিক চ্যাপলিন ছবির কাজ করতে চলে যান ও দীর্ঘ সময় ধরে থেকে যান আমেরিকায়। পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কাহিনীচিত্র তৈরি করা ততদিনে শুরু হয়েছে। প্রারম্ভিক চিত্রপরিচালকদের মধ্যে সিসিল হেপওয়ার্থ, জর্জ পিয়ারসন ও মরিস এলভি উল্লেখযোগ্য। ১৯২৫য়ে রাজধানী লণ্ডনে ফিল্ম সোসাইটি স্থাপিত হতে চলচ্চিত্র বিষয়ে অহুসীলন ও অহুসঙ্কিৎসা বৃদ্ধি পেল। প্রথম সবাকচিত্র ব্ল্যাকমেল ১৯২৯ সালে মুক্তি পেল, যার পরিচালক ছিলেন হিচকক। তাঁর ও আলেকজান্ডার কোর্ডার প্রচেষ্টায় ব্রিটেনের চলচ্চিত্রে বিভিন্ন কলাকৌশলগত উন্নতি, শৈল্পিক সমৃদ্ধি ও ব্যবসায়িক সাফল্য দেখা গেল। জন গ্রিয়ারসনের প্রচেষ্টায় যেমন তথ্যচিত্রের ক্ষেত্রেও উন্নতি হলো। ব্রিটেনের চলচ্চিত্রশিল্পে অর্থনৈতিক সংকট ও অস্বাভাবিক টেকনিক্যাল সমস্যা প্রথম থেকেই ছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যা জটিলতর হয়ে উঠল। ক্যারল ব্রিড, ডেভিড লিন ও লরেন্স অলিভিয়ার এই সময়ে পূর্ণোচ্চমে ছবি করছেন, কিন্তু ব্রিটিশ চলচ্চিত্রের নিজস্ব স্বতন্ত্র ও জাতীয় কোনো সত্তা তখনও গড়ে ওঠেনি। লিওনে অ্যানডারসন প্রমুখের উদ্যোগে ১৯৪৭য়ে চলচ্চিত্র বিষয়ে উন্নত মানের পত্রিকা সিকোয়েন্স স্থাপিত হয়। পরে প্রকাশিত হতে থাকে সাইট অ্যাণ্ড সাউণ্ড পত্রিকাও। ১৯৪৯য়ে

স্থাপিত হয় রাষ্ট্রীয় ফিল্ম ফিড্যান্স করপোরেশন। পঞ্চাশের দশকের শেষভাগ থেকে ব্রিটেনে নবাধারার ছবি নির্মিত হতে লাগল, যেমন, জ্যাক ক্রেটনের 'রুম এট দি টপ', ক্যারল রেইজের 'স্চার্চারডে নাইট অ্যাণ্ড সানডে মনিং', টনি রিচার্ডসনের 'লোনলিনেস অব দি লং ডিসট্যান্স রানার', বা জন স্লেসিংগার ও অ্যানডারসনের ছবি। এই সমস্ত ছবিতে বিষয়বস্তুকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে ও কাহিনীর স্বাদ ও মেজাজ প্রায়শই ভীষণভাবে ত্রিটশ। এই প্রসঙ্গে ফ্রী সিনেমা আন্দোলনের কথাও আসে। আঙ্গিকের ওপরও সমান গুরুত্ব দেওয়ায় অ্যানডারসনের 'ইফ' বা 'ও লাকি ম্যান' এত উল্লেখযোগ্য ছবি। পিটার ব্রুকের সাহিত্যগুণমণ্ডিত ছবি থেকে অ্যানডারসনের নস্টালজিক ফিল্ম দি হোয়েলস অব আগস্ট (৮৭) পর্যন্ত-ও এখানে উল্লেখ করার মতো। সবশেষে সাম্প্রতিক আর যে কটি ঘটনার কথা বলতে হয় তা হলো ১৯৭১য়ে জাতীয় ফিল্ম স্কুলের উদ্বোধন, এ দেশের স্টুডিওতে স্টার ওয়রস ও সুপারম্যানের মতো ছবির চিত্রগ্রহণ, কৃত্রিক, পোল্যানস্কি, সিডনি লুমিট প্রমুখ বিদেশি পরিচালকের ব্রিটেনে এসে ছবি নির্মাণ, লিনের বড় মাপের স্পেকট্যাকল্ ছবিগুলির আন্তর্জাতিক সাফল্য, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিশ্ব-বিখ্যাত পরিচালকদের স্বীকৃতি এবং সমস্ত সবেও ব্রিটিশ চলচ্চিত্রে গতিজ্ঞাড়ের অভাবের কথা। ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও নান্দনিক সমস্ত বিচারেই এই চলচ্চিত্র আমেরিকার ও পশ্চিম ইউরোপের চলচ্চিত্রের মাঝামাঝি কিছু। এই মধ্যপন্থা ও জাজের ক্ষেত্রে কানাডার সঙ্গে ব্রিটেনের মিল লক্ষিত হয়।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : আইভান বাটলারের সিনেমা ইন ব্রিটেন।

॥ গ্রেডিং ॥

এক্সপোজারের নির্বাচন যত সযত্নই হোক না কেন, আলোর তারতম্য, লেন্সের পার্থক্য ও বিভিন্ন স্টকের ফিল্ম নেগেটিভ ব্যবহারের দরুন শট থেকে শটে আলোছায়া ও রঙের টোনে ও ঘনত্বে তারতম্য দেখা যায়। এই অবস্থায় সমস্ত ফ্রেম একই তীব্রতার প্রিন্টার-লাইটে প্রসেস করলে কিছু কিছু অংশ ওভার-এক্সপোজড্ ও অস্বাভাবিক অংশ আণ্ডার-এক্সপোজড্ হয়ে যায়। গ্রেডিং বা টাইমিং হলো প্রত্যেকটি নেগেটিভ ফিল্ম ফ্রেম বা বৃহত্তর অর্থে প্রতিটি পৃথক শটের রঙ ও ঘনত্বের মধ্যে সমতা আনয়নের পদ্ধতি। এর ফলে প্রাপ্ত পজিটিভ প্রিন্টের ঔজ্জ্বল্যে ও টোনের বন্টনে এক সার্বিক একতা পরিলক্ষিত হয়। গ্রেডিং-এর কাজের কিছুটা চোখে দেখে আর বাকিটা মনিটর যন্ত্রে ফেলে করা হয়ে থাকে

এবং তাঁর ফলাফল টুকে রাখা হয় একটা পাঞ্চ করা টেপে। প্রয়োজনমতো এতে কিছু হেরফেরও করা যেতে পারে। ভবিষ্যতের সমস্ত পজিটিভ প্রিন্ট তৈরি হয় গ্রেডিং-এর এই চূড়ান্ত ফলাফল অনুসারে।

## ॥ গ্র্যাণ্ড ইল্যুশন ॥

ফ্রান্স, ১৯৩৭। জঁ রেনোয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ নেন। তাঁর এক বন্ধুও অংশ গ্রহণ করে জরমনদের হাতে বন্দী হয়ে বন্দীশিবির থেকে সাতবার পলায়ন করেন। সেই অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে তৈরি হয় গ্র্যাণ্ড ইল্যুশন। যদিও ছবির মূল তিন চরিত্র তিনজন ফরাসি যুদ্ধবন্দী তবু এই ছবির নায়ক কোনো ব্যক্তি বিশেষ নয়, বরং আন্তর্জাতিক শান্তি ও সৌভ্রাতৃত্বের এক ভাবনা। ছবির খলনায়ক যেমন যুদ্ধ। বন্দী জীবনের বাস্তবধর্মী চিত্ররূপ ও ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলির স্বচ্ছন্দ বিচার (যেমন জাতীয় কর্তব্যের অঙ্কুহাতে ফ্রেস্‌নে ও স্ট্রাইইম অভিনীত চরিত্র-দ্বটির বন্ধুতা কীভাবে নষ্ট হয়ে গেল), দুয়ের সংমিশ্রণ ছবিটিকে দিয়েছে এক ধরনের নম্রতা যা জাতির প্রতি অমুরাগ বনাম আন্তর্জাতিক শ্রেণীচেতনা, এই বৃহত্তর প্রশ্নের উত্থাপনে দৃঢ় হয়ে ওঠে। নানা প্রসঙ্গের উত্থাপনে ছবি যুদ্ধ-বিরোধিতার মূল বক্তব্য থেকে সরে এসেছে কিনা এই বিতর্কে ক্রফোর মত ছিল এই যে, বিভিন্ন স্তরে গ্রহণযোগ্যতার দরুনই গ্র্যাণ্ড...এত সার্থক, কী দৃশ্যকল্পনায় কী শব্দপ্রয়োগে এটি দি রুলস অব দি গেম-এর চেয়েও আরও যেন দরকারি চলচ্চিত্র। বাক্সে খাবার আছে ভেবে প্রচণ্ড উৎসাহে বাক্স খুলে ফেলতে বেরিয়ে এল বই বই আর বই—ছবির এই দৃশ্যটি বিদ্যৎ-চমকের মতো ক্রফোকে ছুঁয়ে গেছিল, তাঁর ফারেনহাইট ৪৫১ ছবির আদি বীজ ছিল নাকি ওই বিদ্যৎস্পর্শই। চমৎকার কাঠামোয় গড়া ও অনবচ্ছিন্ন পরিমিতিতে সংহত গ্র্যাণ্ড রেনোয়ার কালজয়ী সৃষ্টি। ছবিটি এমনকি ফ্রান্সেও এক সময়ে নিষিদ্ধ হয়েছিল, জরমনদের হাতে যথেষ্ট কাটাকুটিতে ক্ষতিগ্রস্তও হয়, প্রায় কুড়ি বছর পরে রেনোয়ার তত্ত্বাবধানে একে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়।

অভিনয়ে ফ্রেস্‌নে, গ্যাবিন, স্ট্রাইইম; আলোকচিত্র C. Matras, সংগীত জে. কসমা ॥

## ॥ ঘটনা ॥

‘আজ সকালে নদীর ধারে একটা ঘাঁড় কিটিকে তাড়া করেছিল’, এই বিবৃতিতে ‘আজ সকালে’ হলো কাল-নির্দেশক, ‘নদীর ধারে’ হলো স্থান-নির্দেশক, ‘একটা

বাঁড় কিটিকে তাড়া করেছিল' হলো বিবৃত ঘটনা। শ্রোতার উপর এই বিবৃতির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে সশঙ্কিত উদ্বেগ। বাঁড়ের বদলে একটা ছাগল তাড়া করলে অবশ্য ওই প্রতিক্রিয়া পরিবর্তিত হতো কৌতুকে। যেমন বাঁড় কিটির বদলে একজন মাতাদোরকে তাড়া করলে ওই প্রতিক্রিয়া পরিবর্তিত হতো কৌতুহলে। ফলে ঘটনার প্রতিক্রিয়া, মাত্রা ও অভিঘাত বস্তু বা পদার্থ বা পাত্রপাত্রীর উপরও নির্ভরশীল।

চলচ্চিত্র মূলত যে দুটিকে আশ্রয় করে এগিয়ে যায় তারা হলো চরিত্র ও ঘটনা— কারণ যে কোনো গল্পই হলো কিছু ঘটনার ধারাবাহিকতা বা অহুঙ্কম (ঘটনার মধ্যে স্থান-কাল-বিবেচনাও অন্তর্ভুক্ত)। একদিকে ঘটনা যেমন চরিত্রকে আধার করে গড়ে ওঠে, অপরদিকে চরিত্রও তেমনি ঘটনার মধ্য দিয়ে অর্থ, ব্যঞ্জনা ও পরিণতি পায়। চলচ্চিত্রের বর্ণনা, বিশ্লেষণ, বক্তব্য সবকিছুতেই ঘটনার অবদান অনস্বীকার্য। ছবির বিষয়বস্তু কী, আঙ্গিক কী রকম, কোন্ ধরনের ছবি—তিনটের ওপরই ঘটনার ধারা ও ধরন নির্ভর করে। নিও-রিয়ালিস্ট ছবির ঘটনা থেকে আগারগ্রাউও ছবির ঘটনা ধরনে ও ধরনায় নিশ্চয়ই আলাদা। ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের তারতম্যের কারণেও ঘটনার তারতম্য ঘটে থাকে। ফলে ঘটনার গ্রহণযোগ্যতা একাধিক স্তরে। বস্তুত দ্ব্যর্থবোধকতা ও বিভিন্ন স্তরে গ্রহণ-যোগ্যতা হলো যে কোনো শিল্প বা মনস্তাত্ত্বিক অহুঙ্কমের স্বভাবলক্ষণ। স্থান কাল ও ঘটনা তিনের সংমিশ্রণে ও সংশ্লেষণে ইমেজ গড়ে ওঠে এবং বিকাশের মধ্য দিয়ে দৃশ্য ও দৃশ্য-পর্যায়ের রূপ পায়। চলচ্চিত্রের সামাজিক/সাংস্কৃতিক প্রভাব প্রতিপত্তি ও সফল/কুফল অনেকটাই ঘটনা ও ইমেজের কারণে।

## ॥ চলচ্চিত্র ॥

চলচ্চিত্রকে বলা যায় বিংশ শতাব্দীর শিল্প-মাধ্যম। এটি আশ্রয়প্রকাশের সবচেয়ে আধুনিক, কনিষ্ঠতম ও বর্তমানে সবচেয়ে ব্যাপক মাধ্যম, সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার অন্ততম অঙ্গ। টিভি বা ভিডিওকে বলা যায় চলচ্চিত্রেরই একপ্রকার প্রসারণ (extension)। চলচ্চিত্রে যদিও নেই সংগীতের বিমূর্ত শিল্পগুণ, নেই উপস্থাপনের বিশ্লেষণ ক্ষমতা, নেই নাটকের ত্রিমাত্রিক রূপারোপ তবু সংগীতের চন্দ, চিত্রকলার দৃশ্যতা; আলোকচিত্রের বাস্তবতা, স্থাপত্যের গঠন, উপস্থাপনের বর্ণনা, নাটকের অভিনয়, নৃত্যের গতি—সমস্ত নিয়েই চলচ্চিত্র, মৌলিক মাধ্যম নয় বলে অগ্র সব মাধ্যম থেকে অরূপণভাবে আত্মসাৎ করে তবে চলচ্চিত্র আত্মস্থ হয়েছে। এর

ফলে প্রতিটি মাধ্যমের গুণ ও স্ববিধা যেমন এসে চলচ্চিত্রে যুক্ত হয়েছে তেমনি প্রতিটি মাধ্যমের দোষ ও অস্ববিধাও। তাই চলচ্চিত্র মাধ্যমে কাজ করা একই সঙ্গে সবচেয়ে সহজ ও সবচেয়ে কঠিন। এই জটিল ও যন্ত্রচালিত মাধ্যমটির কিছু স্পষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত কত কিছুই তো ঘটছে, তার সব তো আমরা দেখি না, যেটায় আমাদের আগ্রহ ও কৌতূহল থাকে ততটুকুই দেখি আমরা। কাজেই বাস্তবে আগ্রহ সক্ষম দৃষ্টিকে প্রভাবিত করে। চলচ্চিত্রে হয় ঠিক বিপরীত। চলচ্চিত্রে যা ঘটতে দেখি ধীরে ধীরে তাতে আগ্রহ জন্মায়, ভালো না লাগলে হল ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি। অর্থাৎ এখানে সক্ষম দৃষ্টি আগ্রহকে পরিচালিত করে। তা থেকে আবেগানুভূতির জন্ম হয়। চলচ্চিত্রের দর্শক স্থির, দৃশ্যের ধারাবাহিক প্রবাহের জ্ঞান হয় দৃশ্যবস্তুকে গতিশীল হতে হয়, আরও বেশি ক্যামেরাকে গতিশীল হতে হয়। চলন্ত ছবি বলে ক্যামেরা যা দেখায় তা আসলে স্থিরচিত্র। অবস্থানের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিবর্তনশীল স্থিরচিত্র অতি দ্রুত পর্দায় ফেলে এই গতিশীলতার বিক্রম আনা হয়। কত দ্রুত? প্রতি সেকেন্ডে চক্ষিগণি করে। স্মরণ্য ক্যামেরাই হলো চলচ্চিত্রের বাহন।

চলচ্চিত্রের একদিকে নির্বাচন ও সম্পাদনা এবং এমনকি নির্বাচনেও সম্পাদনা — অনেক সম্ভাব্য থেকে একটিকে বেছে নেওয়া; অন্যদিকে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ। সংগীত তার উপাদান, ধ্বনি ও স্বর, বাস্তব থেকে সংগ্রহ করেও সেই বাস্তবকেই যতখানি অতিক্রম করে যায় তা চলচ্চিত্রের সাধ্যাতীত। তবু ছন্দ গতি বৈপরীত্য সম্মেলন দ্বিধাসমতা সংঘাত, এ সবই হলো চলচ্চিত্রে বাস্তবাতীত এক অবস্থার রূপায়ণে জরুরি উপাদান। এই সমস্ত নান্দনিক অল্পস্বপ্নের পাশাপাশি রয়েছে প্রদর্শিত চিত্র থেকে নির্গত ভৌত প্রভা ও ধ্বনি। স্থান থেকে স্থানে ও কাল থেকে কালে চলচ্চিত্রের অনায়াস যাতায়াত, আর দৃশ্য ও শব্দের ধীর ও ধারাবাহিক সমস্ত মূর্ত প্রয়োগের মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্র আমাদের নিয়ে যায় এক অখণ্ড, বিমূর্ত, প্রয়োগ-নিরপেক্ষ চেতনায়। যে কোনো শিল্পমাধ্যমের মতো চলচ্চিত্রেও শিল্পী আসেন নির্বিশেষ থেকে বিশেষে (এক্ষেত্রে রস থেকে চিত্ররূপে), দর্শক যান বিশেষ থেকে নির্বিশেষে। বিমূর্ত থেকে মূর্ত হয়ে ফের বিমূর্ত।

সমাপ্তিতে চলচ্চিত্রের তিনটে কন্সট্যান্টের কথা বলতে হয় : অনুভবের মেরু থেকে বিজ্ঞানের মেরু পর্যন্ত চলচ্চিত্রের যাতায়াত, প্রথমত। এই শিল্পমাধ্যমটি কালাশ্রমী, যে সময়কে ধরে রাখতে হয় স্থানের আধারে, দ্বিতীয়ত। অবজেক্টের রিয়্যালিটিতে যা সাবজেক্টের এক্সপ্রেশন নিয়ে আসে, তৃতীয়ত। চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে

যে তিনটি বৈপরীত্যের কথা গদ্য বলছিলেন তা হলো : visual versus narrative, fiction versus documentary, reality versus abstraction. সেই চলচ্চিত্রের বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়, প্রদঙ্গ ও দিক এবং ব্যাপক ও বিবিধ প্রয়োগ ও প্রভাব নিয়ে বর্ণাহুক্রমিক আলোচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থে ।

## ॥ চলচ্চিত্রের ইতিহাস ॥ .

চলচ্চিত্রের ইতিহাস একশো বছরের কম পুরনো বা একশো বছরের মতো পুরনো । তার স্বীকৃত জন্মসন ১৮৯৫ । চলচ্চিত্রের ইতিহাসে আমরা যদি সময়ের কয়েকটা পর্যায় ভাগ করে নিই, তাহলে চলচ্চিত্রের ক্রমবিবর্তনের ঐতিহাসিক রূপরেখাটি দাঁড়াবে এরকম—

১৮১৫-৯৫ : উৎসকাল — প্রস্তুতিপর্ব ও জন্ম । স্থিরচিত্রের পর্যায়ক্রমিক বিখ্যাসেই প্রথমে গতির সৃষ্টি হয়েছিল । ছায়ানাটক ও চলচ্চিত্র— দুটি শিল্পরূপই আলোর উপর নির্ভরশীল । কিন্তু দুটির বিকাশের মধ্যে রয়েছে কয়েক শতাব্দীর ব্যবধান । শার্ভো থিয়েটার, ম্যাজিক ল্যান্টার্ন এবং উনিশ শতক থেকে প্লেটোর কেনাকিট-স্কোপ, স্যেত্রিজের জুগাইরোস্কোপ, লিংকনের জিওট্রোপ, রেনোভের প্রাক্সিনোস্কোপ, জুল ম্যারের ফটোগ্রাফিক গাম ও গতি সংক্রান্ত অত্যন্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে ধারাবাহিকভাবে প্রতিচ্ছবি আলোকচিত্রিত করা সম্ভব হলো । এডিসন, ইস্টম্যান, লুমিয়ের, মেলিয়েস প্রমুখ গবেষকের চেষ্টায় চলচ্চিত্রের জন্ম প্রয়োজনীয় বিভিন্ন যন্ত্র আবিষ্কৃত হলো— ক্যামেরা, ভিউয়ার, প্রজেক্টর ; প্রচলন হলো নেগেটিভ ও পজিটিভ ফিল্মের ; পরীক্ষা-নিরীক্ষা হলো টেবল-টপ-সেটের সাহায্যে চিত্রগ্রহণের পদ্ধতি নিয়ে ; আয়ত্ত্ব হতে থাকলো চিত্র নির্মাণের নানান কলাকৌশল । ১৮৯৫ সালের ২৮শে ডিসেম্বর লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয় প্যারিসে প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শন করে দেখালেন ।

১৮৯৬ থেকে ১৯০৭ সন পর্যন্ত ফ্রান্স ইংল্যান্ড আমেরিকা ও আরো দু-একটি দেশে স্বল্প দৈর্ঘ্যের চিত্র, সংবাদচিত্র বা প্রামাণিক চিত্র নিয়মিতভাবে তৈরি ও দেখানো হতে থাকলো । প্রারম্ভিক চিত্রনির্মাণীদের মধ্যে জর্জ মেলিয়েস ছাড়াও, সেদিল হেপওয়ার্থ, রবার্ট পল, এডউইন পোর্টার ও লুই ফাইয়াদ উল্লেখযোগ্য ।

১৯০৮-১৮ : নির্বাক যুগের সূচনা । পোর্টার-এর 'দি গ্রেট ট্রেন রবারি' (১৯০৩) নামের বিখ্যাত ছবিটি চলচ্চিত্রে সম্পাদনার গুরুত্ব অনুধাবন করিয়েছিল । গ্রিফিথের হাতে সেই চিত্রসম্পাদনা একটা পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি হয়ে উঠল । চলচ্চিত্র-

ভাষা গড়ে তোলার কাজে তাঁর অবদান অবিখ্যরনীয়। একটি নিজস্ব চিত্রশৈলী উপস্থাপিত করতে পেরেছিলেন ফ্যাইয়াদ-ও। এই সময়ে প্রথম ফ্যান ম্যাগাজিনের আবির্ভাব ঘটে।

১৯১৯ থেকে পরবর্তী এক যুগকে নির্বাক ছবির স্বর্ণযুগ বলা চলে। এই যুগটিকে আবার কয়েকটি পৃথক ধারায় ভাগ করতে হয়। যেমন জর্মন এক্সপ্রেশ-নিজমের ধারা, হলিউডে কমেডির ধারা এবং ডে মিলে, ভন স্ট্রাইম, আবেল গাঁসের অভিধাতী ও ব্যক্তিগত শৈলীতে রূপায়িত স্পেকট্যাকলের ধারা। চলচ্চিত্র শিল্পে এই সময় থেকে তারকা প্রথা বা স্টার সিস্টেমেরও প্রচলন ঘটে। কমেডির বিবর্তনের সঙ্গে তারকা প্রথার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। কেননা এই ধরনের ছবি অনেকাংশে ছিল এক বা একাধিক অভিনেতার ওপর নির্ভরশীল। যেমন কীটন, লয়েড, ল্যাংডন, ফিল্ডস এবং অবশ্যই চ্যাপলিন।

চলচ্চিত্রের ইতিহাসে বিশেষ দশকটি সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের দশক। এই বাস্তববাদ ছিল জর্মন এক্সপ্রেশনিজমের এক অবশ্যস্তাবী অ্যাণ্টিথেসিস। এলেন আইজেনস্টাইন, পুদভকিন, দভবেঙ্কো, ভের্তভ। এঁরা তাঁদের ছবি ও লেখালেখির মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রের ভাষা ও তত্ত্বকে প্রভূত পরিমাণে সমৃদ্ধ করেছিলেন। এই সমস্ত সোভিয়েত চিত্র ছিল একই সঙ্গে শিল্পসমৃদ্ধ, প্রচারমূলক ও শিক্ষাবাদী। বিষয়ের গভীরতা, আঙ্গিকের সমৃদ্ধি ও সমাজবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সহাবস্থান ঘটেছিল এইসব ছবিতে।

এদিকে বিশেষ দশকের মাঝামাঝি প্যারিস ছিল শিল্পগত ভাবে সাররিয়ালিজমের তাজা বসায় উজ্জ্বলিত। বুহুয়েল ও দালির মাধ্যমে চলচ্চিত্রেও তার প্রভাব পড়ল। সিনেমা বিষয়ে সিরিয়স পত্রিকার প্রকাশও ঘটে গেছে এর কাছাকাছি সময়ে। সাররিয়ালিজমের মধ্যে চলচ্চিত্রকাররা পেয়েছিলেন নশাং করার ক্ষমতা, স্বাধীনতার অন্ত্র।

চলচ্চিত্র তখন পর্যন্ত ছিল নির্বাক। ছবিতে সংলাপ তখনও আসেনি। যদিও বহু নির্বাক ছবির সঙ্গেই আবহ সংগীত থাকত। তা হলো প্রেক্ষাগৃহের অর্কেস্ট্রায় বাজানো উপযুক্ত বা নির্দিষ্ট আবহ সংগীত। ১৯২৭ সনে সবার্ক চিত্রের সূচনা হলো দি জ্যাজ সিঙ্গার ছবি দিয়ে। সবার্ক চিত্রের প্রারম্ভে প্রথমে একেই সাউণ্ড এবং পরে গান ও সংলাপ ছবিতে এসেছিল। পরবর্তী প্রায় দু-দশক ধরে সবার্ক চিত্রের ক্রমবিকাশ ঘটল শৈল্পিক ও প্রায়ুক্তিক ভাবে। শব্দ গ্রহণ পদ্ধতির ও শব্দের ব্যবহারে উন্নতি হলো এবং আইজেনস্টাইন, চ্যাপলিন, ক্লেয়ার, রেনোয়া, হিচকক,

ওয়েলস, ফোর্ড ও আরো অনেক পরিচালকের মাধ্যমে সবাক চলচ্চিত্র স্বধর্ম ও নিজস্ব ভাষা পেল।

চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে, বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইতালিতে চলচ্চিত্রের একটি নতুন ঘরানার আশ্রয়প্রকাশ ঘটল। যা নিও-রিয়ালিজম বা নব্যবাস্তববাদ নামে পরিচিত। এই চলচ্চিত্রচিন্তা উঠে এসেছিল রাজনৈতিক-সামাজিক-মানবিক সচেতনতা থেকে। ভিসকন্ডি, রোজেলিনি, ডে সিকা এই ঘরানার শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও প্রবক্তা। ইতালিতে নয়াবাস্তবতার চেয়ে বেশি কিছু, অন্তর্বাস্তবতার শিল্পী হয়ে এলেন ফেলিনি ও আন্তনিওনি।

পঞ্চাশের দশকের শেষ ভাগে আর একটি নতুন ধারা বা ঘরানা আশ্রয়প্রকাশ করল, এবার ফ্রান্সে, যা নিউ ওয়েভ বা ফরাসি নব্য তরঙ্গ নামে পরিচিত। এই গোষ্ঠীর প্রধান সদস্যরা হলেন গদার, ক্রফো, শাব্রল প্রমুখ। নবতরঙ্গ ছবিতে বিষয়বস্তুর পরিবর্তনের পাশাপাশি এসেছিল আঙ্গিকগত পরিবর্তন। ফ্রান্সেও অন্তত দুজন চিত্রপরিচালক ছিলেন যারা তৎকালে সক্রিয় দেশীয় ধারা বা ঘরানার বাইরে, কিন্তু যাদের প্রভাব দূরপ্রসারী ও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। রেনে ও ব্রেসঁ। পঞ্চাশের দশকে চলচ্চিত্র জগতে জাপান ও ভারতের স্থান লাভও ঘটে। ১৯৫১-য় ভেনিদে কুরোশাওয়ার রশোমনের ও ১৯৫৬-য় কানে সত্যজিৎের পথের পাঁচালীর সাফল্য জাপানি ও ভারতীয় চলচ্চিত্র সম্পর্কে বিশ্বের দৃষ্টি আকৃষ্ট করল।

পঞ্চাশের ও ষাটের দশকের মতো সত্তরের দশকটিকেও চিহ্নিত করা যায় বিশেষ একটি ধারা বা ঘরানা দিয়ে। তা হলো নুতন জর্মন চলচ্চিত্রের ধারা। ষাটের দশকের গোড়ায় ওবারহাউজেন ম্যানিফেস্টো নিয়ে আশ্রয়প্রকাশ করা এই পরিচালকগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ফাসবিণ্ডার, শ্লোয়েনডর্ফ, হ্যারজগ্, প্রমুখ। পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তরের দশকে সমাজতান্ত্রিক বিভিন্ন দেশেও চলচ্চিত্র দৃষ্টিভিত্তি ও গভীরমূল পায়। আশির দশককে তো বস্তুত বলা যায় চীনা চলচ্চিত্রের বিশ্বজয়ের দশক।

ইতোমধ্যে চলচ্চিত্র প্রযোজনার ক্ষেত্রে অর্থনীতি হয়ে উঠেছিল প্রধান নিয়ন্ত্রক, যদিও অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর ধরনটা গেছিল পার্টে (ড্র. আমেরিকা); রডিন চলচ্চিত্রের প্রসার বেড়েছিল; কমেডি / মিউজিক্যাল / নাট্যধর্মী ছবির পরিবর্তে মর্যাদা বেড়েছিল চলচ্চিত্রের বিভিন্ন আন্দোলনের ও বিবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার; গুরুত্ব পেয়েছিল পরিচালনার ব্যক্তিগত শৈলী (যে প্রদক্ষে এখনও অনুল্লিখিত বার্গম্যান, ব্রুয়েল, তারকোভ্‌স্কি, স্পিলবার্গ প্রমুখের নাম করা

জরুরি); বিশেষ ও স্বল্প সংখ্যক দর্শকের জন্য বিশেষ ধরনের ছবির প্রচলন হয়েছিল। প্রযোজনা ও প্রযুক্তির দিক থেকে বিপ্লবাত্মক যেসব পরিবর্তন সম্প্রতি সাধিত হয়েছে তার ফলে একদিকে চলচ্চিত্রে অভীতের জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে বর্তমানে আন্তর্জাতিকতার প্রাধান্য, অন্যদিকে প্রায়ুক্তিক কারণে টিভি ও ভিডিওর জনপ্রিয়তা বেড়ে যাওয়ায় সিনেমার প্রয়োজনের উত্তরোত্তর হ্রাসপ্রাপ্তি।

জনশতাব্দী লগ্নে দাঁড়িয়ে চলচ্চিত্র এখন এক সংকটের মুখোমুখি। এই সংকট শুধু বাইরের নয়, ভেতরেও। আধুনিক চলচ্চিত্রে আন্তর্জাতিকতা বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে যেমন বেড়েছে প্রযোজনার গুণ ও মাউন্টিংয়ের মান, তেমনি কমেছে শৈল্পিক গভীরতা ও নান্দনিক মান। চলচ্চিত্র শিল্প আজ বোধহয় এক ব্যাপক পালাবদলের অপেক্ষায়।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : পিটার কাউই-র এ কনসাইজ হিস্ট্রি অব দি সিনেমা ॥

## ॥ চলচ্চিত্রের টেকনিক ॥

যে কোনো শিল্পমাধ্যমের মতো চলচ্চিত্রেরও দুটি দিক রয়েছে— প্রসঙ্গ ও পদ্ধতি। চলচ্চিত্রের আঙ্গিক / পদ্ধতি / প্রকরণ টেকনিক ও টেকনোলজি দুয়ের সাথেই জড়িত। আবার চলচ্চিত্রের ইতিহাস চলচ্চিত্রের কলাকৌশলগুলি ধীরে ধীরে আয়ত্ত করার ও কাজে লাগাবার ইতিহাস। ফলে চলচ্চিত্রের টেকনিক তার শিল্পরূপ ও টেকনোলজির সঙ্গে বনিষ্ঠ ও অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট। চলচ্চিত্রের মতো একটি জটিল, যন্ত্রচালিত, প্রযুক্তিনির্ভর, তবুও শৈল্পিক, মাধ্যমের পক্ষে এটা স্বাভাবিক।

চলচ্চিত্রের মৌল কলাকৌশলগুলো সর্বত্র এক, কিন্তু তাদের ব্যবহার অগ্ণাচ্চ বিষয়ের সঙ্গে প্রসঙ্গের ওপরও নির্ভর করে। প্রসঙ্গের ভিত্তিতে চলচ্চিত্রকে কয়েকটা শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : ১. কাহিনীচিত্র ( যার মধ্যে আবার বহু বিভাজন—সামাজিক, ঘরোয়া, নাট্যপ্রধান, কমেডি, অপেরাধর্মী, অ্যাকশন-প্রধান, মিউজিক্যাল, রহস্য/অ্যাডভেঞ্চার, সায়েন্স ফিকশন, ব্যালে, রাজনৈতিক ) ২. তথ্যচিত্র ৩. সংবাদচিত্র ৪. শিক্ষামূলক চিত্র ৫. বিশেষ কলাকৌশল নির্ভর শিল্প, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি-চিত্র ৬. অ্যানিমেটেড ছবি। চলচ্চিত্রের প্রারম্ভিক টেকনিক্যাল নির্বাচন তাই যথাক্রমে কোন্ প্রসঙ্গের ছবি, সাদা কালো না রঙিন চিত্র, আর সেই অনুসারে ফর্মাট বা ফিল্ম ফ্রেমের আকার ঠিক করা। ফর্মাট বলতে ১৬, ৩৫ না ৭০ মি. মি.-র ছবি এবং ফ্রেমের প্রস্থ ও উচ্চতার অনুপাত। সাম্প্রতিক

ছবি ৩৫ মি. মি. ও ১'৮৫ : ১ অনুপাতে অথবা ৭০ মি. মি. ও ১'৮৫ : ১/২'১৫ : ১ অনুপাতে বেশি তৈরি হয়। আগেকার ১'৩৩ : ১ অনুপাতের তুলনায় আজকের অনুপাতে প্রয়োজন হয় আরো প্রসারিত পর্দার। সিনেমাস্কোপের—বড়ো বাজেটের ছবির ক্ষেত্রে যা প্রচলিত ফিল্ম ফর্ম্যাট—ক্ষেত্রে প্রয়োজন আরও প্রসারিত পর্দার—২'৩৫ : ১ অনুপাতের। অবশ্য সর্বাধুনিক ফিল্ম ফর্ম্যাট IMAX-য়ে এই অনুপাত এসে দাঁড়িয়েছে ১'৪৩৫ : ১-য়ে, অর্থাৎ পুরনো অনুপাতের অনেকটা কাছাকাছি। কিন্তু এই ফিল্ম ফ্রেমের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ৭০ মিমি ও ৪৯ মিমি বলে (প্রতিটি ফ্রেমে আছে ১৫টি করে পারফোরেশন) সাধারণ ৭০ মি. মি. ফ্রেমের তুলনায় এর ক্ষেত্রফল তিন গুণ বেশি। এই ফিল্মে গৃহীত চিত্র কোনো রকম কণাময়তা ছাড়া স্রবিশাল পর্দায় (৮০ ফুট X ১১০ ফুট পর্যন্ত) প্রক্ষেপ করে দেখানো সম্ভব। পর্দার তলের অবস্থান অনুসারে আইম্যাক্স ফিল্ম ইমেজ আমাদের দৃষ্টি ক্ষেত্রের ৬০ থেকে ১২০° পার্শ্ব ও ৪০ থেকে ৮০° উল্লম্ব অঞ্চল অধিকার করতে পারে। ক্যামেরা থেকে র ফিল্ম, প্রজেক্টর থেকে পর্দা, এবং হল বা প্রদর্শনগৃহ পর্যন্ত আইম্যাক্স একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, সমন্বিত প্রায়ুক্তিক ব্যবস্থা। খুবই ব্যয়সাপেক্ষ হলেও এই ফর্ম্যাটের সম্ভাবনা অসীম। লুকাস ও স্পিলবার্গের মতো পরিচালকরা ভবিষ্যতে এই ফর্ম্যাটে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

ফর্ম্যাট নির্বাচনের পর টেকনিক ধাপে ধাপে ও বিভিন্ন পর্যায়ে প্রযুক্ত হতে থাকে। চলচ্চিত্রের নিজস্ব ও স্বতন্ত্র কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে; গতি, গতির মাধ্যমে প্রাপ্ত ক্রমপরিবর্তন ও ধারাবাহিকতার সময়, বাস্তবতার বিভ্রম, প্রদর্শিত চিত্র থেকে নির্গত ভৌত প্রভা ও ধ্বনি। যেসব বৈশিষ্ট্য চলচ্চিত্রের মৌল উপাদান-সমূহকে নিয়ন্ত্রিত করে। প্রধান মৌল উপাদান কী কী? কম্পোজিশন (যা রেখা, আকার, আয়তন ও মুভমেন্টের ওপর নির্ভরশীল), ইমেজ (যা একই সঙ্গে স্রুতীত্র ও অন্তরঙ্গ, নির্বিশেষ ও স্রনির্দিষ্ট, নিরপেক্ষ ও পক্ষপাতী), ও মনতাজ। আগেই বলেছি, চলচ্চিত্রে বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমের কৌশল ও অঙ্গস্ব নিজস্ব কলাকৌশলের প্রয়োজন হয়, যাদের তিনটে পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট করা যায়। এখানে আরো বলা দরকার, সিনেমার যে কোনো টেকনিক চলচ্চিত্রের শিল্পরূপের ক্রমবিকাশে প্রধানত তিনটে পর্বের মধ্য দিয়ে গেছে—১. যখন তা ছিল নিতান্ত এক কারিগরি কৌশল, ২. যখন তার ব্যবহারে এসেছে বিশেষ বিশেষ এফেক্ট বা মুড, ৩. যখন তা চিত্র-ভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়ে অনেকটা বিমূর্ত চরিত্র পেয়েছে।

যাই হোক, চিত্রপ্রযোজনায় প্রথম পর্যায় ক্যামেরা-পূর্ব পর্যায় যা চিত্রনাট্য,

অভিনেতা / তাদের পোশাক পরিচ্ছদ / সাজসজ্জা ও লোকেশন / সেট নির্বাচন ও প্রস্তুতি এবং প্রযোজনীয় যন্ত্রপাতি ও ফিল্ম স্টক সংগ্রহ সংক্রান্ত। দ্বিতীয় পর্যায়ে শ্যুটিং পর্যায় যেখানে ক্যামেরা হলো প্রধান। এই সময়ে প্রধানত visual material নিয়ে কাজ করা হয় যা ক্যামেরা দূরত্ব / উচ্চতা ও ক্যামেরাকোণ, ক্যামেরা মুভমেন্ট, লাইটিং প্রভৃতির মাধ্যমে নির্দিষ্ট রূপ পায়। চলচ্চিত্রের ক্ষুদ্রতম উপাদান হলো ফ্রেম, বহু ফ্রেমের সংযোগে গড়ে ওঠে একটা শট, শটের যে কোনো ক্ষুদ্র অংশে ফ্রেমের overall arrangement-ই কম্পোজিশন। এই কম্পোজিশন ক্যামেরার স্থানিক মুভমেন্ট ও লেন্সের ব্যবহারে ক্রমপরিবর্তন পায়। ক্যামেরার মুভমেন্ট—প্যান, টিপ্ট, ডলি, ট্র্যাক, ক্রেনশট—নানা ধরনের হয়। লেন্স ক্যামেরা-কোণ ও মুভমেন্ট দুটোকেই নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। লাইটিং আলোর তীব্রতা, আলোর পরিমাণ ও কোন্ মাধ্যমের মধ্য দিয়ে আলোকে এনে সেটে ফেলা হচ্ছে তার ওপর নির্ভরশীল। লেন্স ও লাইটিং উভয়ের ক্ষেত্রেই আবার ফিল্টারের ভূমিকা রয়েছে। শ্যুটিং পর্যায়ে sound material-এর কিছু অংশ নিয়েও কাজ করা হয়। সংলাপ ও স্বাভাবিক / এফেক্ট সাউন্ড এর মধ্যে পড়ে। তাদের একটা পৃথক ও স্বতন্ত্র চৌম্বক ট্র্যাকে ধরে রাখা হয়। তৃতীয় ও শেষ পর্যায়টি হলো ক্যামেরা-উত্তর পর্যায়। এতে যা শ্যুটিং করা হলো তার প্রেসেন্সিং ও প্রিন্টিং, প্রাথমিক সম্পাদনা, ডাবিং ও সংগীত/আবহ সংগীত, চূড়ান্ত সম্পাদনা ও স্পেশাল এফেক্টের কাজ, গ্রেডিং ও রিলিজ প্রিন্ট তৈরি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এই পর্যায়ে সম্পাদনা প্রধান। সম্পাদনা visual ও sound মেটেরিয়ালগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন ও সময় প্রতীকী করে। বিভিন্ন শটের দৈর্ঘ্য, ছন্দ ও টেম্পোকে শিল্পসম্মত ও অভিব্যক্তি করে একত্রে গেঁথে নেওয়াই সম্পাদনার কাজ। ডাবিং হলো অঙ্গভঙ্গি, অভিব্যক্তি ও চৌম্বকের নড়াচড়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে অভিনেতার সংলাপ পুনর্গ্রহণ করা।

বিভিন্ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ও প্রায়শই পরস্পরের সম্পূরক ও পরিপূরক এই সব টেকনিকের মধ্য দিয়েই চলচ্চিত্রের শিল্পরূপের প্রকাশ ও তাতেই টেকনিকের টেকনিকোত্তর সার্থকতা। তাই চলচ্চিত্রের টেকনিককে চলচ্চিত্রের ভাষার সাথে মিলিয়ে ভাবতে হয়। আবার, বিকাশ যে-পথেই হোক না কেন, চলচ্চিত্রের টেকনিকের জন্ম চলচ্চিত্রের টেকনোলজি থেকে। ফলে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর চলচ্চিত্রে চিত্রপরিচালককে চলচ্চিত্রের টেকনোলজি সম্পর্কেও সম্যক ওয়াকিবহাল হতে হবে।

টি. ল্যালা

## ॥ চলচ্চিত্রের টেকনোলজি ॥

চলচ্চিত্রের টেকনোলজি বলতে বোঝানো হয় ১. কাঁচা মাল : যার ওপর ছবি তোলা হয়—রিভারসাল ফিল্ম ও সাদা-কালো বা ব্লুইন নেগেটিভ ফিল্ম এবং যাতে শব্দ গ্রহণ ও পরিষ্কৃটন করা হয়—ম্যাগনেটিক টেপ বা/ও সাউণ্ড নেগেটিভ এবং যাতে দৃশ্য পরিষ্কৃটন করা হয়—সাদা কালো বা ব্লুইন পজ্জিটিভ ফিল্ম  
২. যন্ত্রপাতি : যে যন্ত্রের সাহায্যে নেগেটিভ ফিল্মের ওপর ছবি তোলা হয় অর্থাৎ ক্যামেরা, যে যন্ত্রের সাহায্যে সম্পাদনার কাজ করা হয়—মুভিওলা বা স্টেইনবেক এবং টেপ রেকর্ডার, অপটিক্যাল প্রিন্টার প্রভৃতি যন্ত্র যা ৩-এর সঙ্গে যুক্ত  
৩. প্রসেসিং, ডাবিং, রি-রেকর্ডিং, স্পেশাল এফেক্ট, গ্রেডিং, প্রিন্টিং প্রমুখ বিভিন্ন Chemico-mechanical পদ্ধতি।

এদের সম্পর্কে যথাস্থানে পৃথক পৃথক আলোচনা করা আছে। এরা আবার চলচ্চিত্রে তিনটে বিভিন্ন পর্যায়ে কাজে লাগে বা প্রযুক্ত হয়। শ্যুটিং-পূর্ব পর্যায়, শ্যুটিং পর্যায়, ও শ্যুটিং-উত্তর পর্যায়ের কোনটিতে এরা কে কীভাবে প্রযুক্ত হয় তা পরের পাতার রেখাচিত্রে দেখানো হয়েছে।

যেমন জিনিশ নিয়ে কাজ করতে হয় টেকনোলজি তা হাতে তুলে দেয়, তাদের কীভাবে কাজে লাগাতে হয় তা বলে দেয় টেকনিক, আর কী কাজে লাগাতে হয় সেটা চলচ্চিত্রের শিল্পরূপের অন্তর্গত। অর্থাৎ প্রযুক্তি থেকে কলাকৌশল থেকে নন্দন। এটা বিবর্তনের একটা দিক। আবার প্রযুক্তিও তার নিজস্ব বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং চলচ্চিত্রের ওপর তার গভীর, দূরপ্রসারী ও দীর্ঘস্থায়ী ছাপ পড়ছে।

যেমন ৩৫ মি.মি. থেকে ৭০ মি.মি. থেকে ৭০ মি.মি. সিনেমােস্কোপ থেকে অবশেষে আইম্যাক্স ফিল্ম। শুধু দৃশ্যগুণই নয়, শব্দগুণও বৃদ্ধি পেয়েছে এর ফলে। এতদিন ফিল্মের চূড়ান্ত প্রিন্টের ওপর একটা ফালিতে শব্দ ধরা থাকতো, কিন্তু আইম্যাক্স ফিল্মে শব্দ ধরা থাকে একটা পৃথক ৩৫ মি.মি. ম্যাগনেটিক ফিল্ম ট্রাকে, ছ'টা চ্যানেলে। শব্দের এই ফিতে দৃশ্যের ফিতের সঙ্গে সমন্বিত করে চালানো হয় এবং ধ্বনি, সংগীত ও এফেক্ট ছবি-চলাকালীন স্বয়ংক্রিয় ভাবে মিক্সড হয়ে গিয়ে শোনা যেতে থাকে।

যেমন সাদা-কালো থেকে মনোক্রোম থেকে মাল্টিলেয়ার ফিল্ম থেকে বিশেষ-ভাবে অবদ্রবিত ফিল্মে চিত্রগ্রহণ। সাদা-কালোয় ছবি আর এখন তোলাই হয় না বলতে গেলে।

টেকনোলজি→ পর্যায় ↓	কাঁচামাল			যন্ত্রপাতি		Chemico-mechanical পদ্ধতি		
	নেগেটিভ ফিল্ম	ম্যাগনেটিক টেপ/স্লাইডও নেগেটিভ	পজিটিভ ফিল্ম	ক্যামেরা	মুভিওলা/ স্টেইমবেক	স্পেশাল এফেক্ট	৩-য়ে উল্লিখিত অস্ত্রাঙ্গ পদ্ধতি	স্টেরিও স্কোপিং
ভ্যাটিং-পূর্ব পর্যায়								
ভ্যাটিং পর্যায়	✓	✓		✓		✓		✓
ভ্যাটিং-উত্তর পর্যায়		✓	✓		✓	✓	✓	

সবক'টি প্রায়ুক্তিক আবিষ্কার অবশ্য সমান প্রভাবশালী হয়নি। যেমন দ্বি-মাত্রিক (2-D) থেকে ত্রিমাত্রিক (3-D) ফিল্মে রূপান্তরের ব্যাপারটি জনপ্রিয় ও বহুল-প্রচলিত হয়নি। দ্বিমাত্রিক রূপারোপেই, কিন্তু আরও প্রসারিত ও আরও বড়ো পর্দায়—আধুনিক চিত্রপ্রযুক্তির এটাই হচ্ছে লক্ষ্য।

সর্বাধুনিক তিস্ত্রয়াল টেকনোলজির বিস্তারকর অগ্রগতি ও তার অভিঘাত আমাদের দৃষ্টি ও দর্শনের ধারা ও ধরনকে দিচ্ছে সম্পূর্ণরূপে পাশ্টে। আমাদের অস্ত্রভাবে দেখতে বাধ্য করছে, চোখ দিয়ে ছাড়া অস্ত্র উপায়েও দেখতে শেখাচ্ছে।

ডিজিটাল মাধ্যমের তথা ডিজিটাল প্রযুক্তির 'আগ্রাসন' আলোকচিত্র, চলচ্চিত্র, ভিডিও প্রভৃতি পুরনো মাধ্যমগুলির স্থানির্দিষ্ট শিল্পবৈশিষ্ট্যকে ভেঙেচুরে তচনচ করে দিচ্ছে। সম্পূর্ণ গাণিতিক ও প্রায়ুক্তিক ভাবে প্রকল্পিত রূপকল্পের ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের নন্দনতরু-ই বা কতটা প্রযুক্ত হব—এ প্রশ্নও উঠেছে।

যেমন ছ ফ্রেমড্ রজার র্যাবিট বা জুরাসিক পার্কের মতো ছবিতে কম্পিউটার গ্রাফিক্সের যে প্রয়োগ ঘটেছে তারপর চলচ্চিত্রে বাস্তবতা প্রসঙ্গে ও চিত্রপ্রতিমার নান্দনিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আসতে বাধ্য।

মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্র আজ দুটি সম্ভাবনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ১. চলচ্চিত্র-শিল্প, অধিকাংশ শিল্পই, পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে যাবে। ২. তিস্ত্রয়াল টেকনোলজির সাহায্য নিয়ে চলচ্চিত্র ক্রমাগত সমৃদ্ধ ও অধিকারী হয়ে অধিকাংশ শিল্পকে তার আওতায় নিয়ে আসবে। প্রযুক্তির দরুন চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ আজ এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে।

টি. ল্যালি

॥ চলচ্চিত্রের শিল্পরূপ ॥

গুরুটা হয়েছিল চলমান ছবি দিয়ে গল্প বলার একটা চেষ্টায়। ভদ্রলোকের নাম পোর্টার। ছবিটার নাম 'দি গ্রেট ট্রেন রবারি'।

গুধু গল্প বলাটাই যদি তার একমাত্র কাজ হতো চলচ্চিত্র শিল্প হয়ে উঠতে পারতো না। কারণ গল্প মানুষ অনেক আগে থেকেই শুনে আসছিল। তাহলে কোথায় এই শিল্পের নতুনত্ব? পোর্টার যা সামান্য বুঝেছিলেন গ্রিফিথ তার পুরোটা বুঝতে চাইলেন। ছবির মূল উপাদান, ছবি গঠনের মূল কথা হচ্ছে 'শট'। এই 'শট' থেকেই ছবি একটা নতুন শিল্পরূপ লাভ করে। দৃশ্যের গোটা গঠনটাকে মাথায় রেখেই Final arrangement-এর কথা ভেবেই তিনি একটা

দৃশ্যের প্রত্যেকটা অংশের ছবি তুলতে পারেন, এটা তার মনে হলো। ডিটেল-গুলো আলাদা আলাদাভাবে তোলা যায়। ডিটেলগুলো পর্দায় পর পর সাজানো যায়। দর্শক ডিটেলগুলোর সম্বন্ধ আন্দাজ করে নিতে পারবে। গ্রিফিথ ক্যামেরা এগিয়ে নিয়ে এলেন closer shot-এর জন্ম। তিনি অতিরিক্ত শট নিতে শুরু করলেন চারপাশটার ছবি তোলার জন্মে, পরিবেশ ফুটিয়ে তোলার জন্মে। যোগ করলেন extremely wide-angle shot. গ্রিফিথ সেই টেকনিক প্রয়োগ করলেন যার দ্বারা দেখানো যায় তাঁর ছবির চরিত্রগুলো কি ভাবছে, কিসের স্বপ্ন দেখছে।

ছবি তোলা আর ছবির সম্পাদনা এমন একটি শিল্পের জন্ম দিল যে শিল্প অতি দ্রুত শক্তি সঞ্চয় করে সমস্ত শিল্পের প্রতিযোগী হয়ে উঠল। লুই জ্যাকব বলছেন, গ্রিফিথের অবদান আরো বেশি চলচ্চিত্রের সম্পাদনা কর্মে। শটগুলির নির্বাচন ও সজ্জায় তাঁর কারুকার্য, যেখানে তিনি ধরতে চাইছেন tempo, pace, rhythm and emotion. গ্রিফিথ cross-cutting অথবা parallel editing — এই টেকনিক ব্যবহার করলেন। ব্যবহার করলেন inter cutting. চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষা তাকে শিল্প করে তোলে।

চলচ্চিত্র সম্পূর্ণ নতুন মাধ্যম হিসেবে রূপ লাভ করছে। যারা ছবি করতে এলেন তাঁরা বুঝতে চেষ্টা করলেন একটা দৃশ্যকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ক'রে দেখাতে হবে। পরিচালক যিনি তাঁকে ঠিক করতে হবে দৃশ্যের কোন্ বিশেষ অংশটা তিনি দেখাবেন। Long med close শটগুলো থেকে একটা দৃশ্যপর্ষায় তৈরি ক'রে নিতে হবে। পর্দায় ঘটনা যেমন ঘটবে, চারপাশটাকে তেমনি দেখাতে হবে। সোভিয়েত চলচ্চিত্রকারদের ওপর যে ছবিটি প্রভাব বিস্তার করল তার নাম Intolerance. ১৯১৬ সালে তৈরি। নির্বাকযুগে সিনেমার কাঞ্চনজঙ্ঘা। বিপ্লবের ঠিক পরেকার রাশিয়ায় Intolerance-এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল। আইজেনস্টাইন তো এই লোকটার কাছেই তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন। আইজেনস্টাইনই যদি ঋণী হন আর কে বাকী থাকেন এই শিল্পে? তফুনি স্বীকার করেন পুদভকিনও। 'ইনটলারেন্স'-এর আধুনিক গল্প ১৯২৪-এর Strike ছবির সামনে শিক্ষালাভ করার একমাত্র উদাহরণ। ২৬-এর Mother-এর কাছেও তাই। গল্পের গভীর আবেগ, মানবিক অভিনয়, হাসি আর চোখের জল এই নিয়ে তৈরি হলো যে শিল্প তার নাম চলচ্চিত্র।

একটা উপায় বার করতে হবে, একটা পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হবে, কিসের

ওপর গড়ে উঠবে সব জিনিসটা? তাই মনতাজ। চলচ্চিত্রবিদ মনতাজ ব্যাখ্যা করলেন, এক ছবি থেকে দৃশ্যান্তরে যাবার পদ্ধতিসাপেক্ষ, স্থানসাপেক্ষ, উপাদানের সম্পর্কসাপেক্ষ, কালসাপেক্ষ উপায়। আইজেনস্টাইন বললেন, মনতাজের ভিৎ গড়েছে আমেরিকার ফিল্ম কালচার কিন্তু এর পরিপূর্ণ সচেতন ব্যবহার ও পৃথিবী-জোড়া এর স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমাদের ছবির দ্বারা।

ভাবপ্রকাশের মধ্যে একটা ছন্দ থাকতে হবে, সমসাময়িক ঘটনাবলীকে দেখাতে হবে, বক্তব্য ফুটেবে দ্বন্দ্বিক প্রয়োগে, সময়ের সামঞ্জস্যবিধান করতে হবে। **In the realm of art the dialectic principle of dynamics embodied in conflict is the fundamental principle for the existence of every art and every form.** মনতাজের প্রথম আবিষ্কারে গ্রিফিথের নাম জড়িত, গ্রিফিথের এডিটিংয়ের স্বত্বই মনতাজ রীতি প্রবর্তিত হয়েছে। কিন্তু গ্রিফিথ-পদ্ধতি রাশিয়ায় ব্যবহৃত হলো না, বিপরীত পদ্ধতিতে মনতাজের সেখানে ব্যবহার।

একই দৃষ্টিকোণ থেকে গেল না। একই দৃষ্টিকোণ থেকে ছবির সব দৃশ্যগুলি দেখানো হয় না। টুকরো টুকরো ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি অল্প দৃষ্টিকোণ থেকে দেখানো হয়। এই হলো একালের গতিশীল আর্ট। স্বকীয় বিশেষ এক ভাষায় সে আত্মপ্রকাশ করল, আইজেনস্টাইন বললেন, চলচ্চিত্র-ভাষা।

প্রত্যেক পুরুষে মানুষ যেমন তার পূর্বতন সমস্ত পুরুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উত্তরাধিকার পায় চলচ্চিত্রও তেমনি পেয়েছে সংগীত চিত্রকলা সাহিত্য থেকে। ভাস্কর্যের স্বেতিক প্রসারতা, সাহিত্যের সর্বব্যাপক গতিশীলতা, সংগীতের গতিময় বিমূর্ততা, এবং প্রত্যেকটির বিশিষ্ট গুণগুলোর যোগফল হিসেবে নয়, একত্রিত এক সত্তায়, চিত্রপ্রতিমার আপন সম্পূর্ণতায় চলচ্চিত্রে একই সঙ্গে উপস্থান নাটকের আঞ্চল সংঘাত, কবিতার চিত্রকল্প, প্রবন্ধের স্বচ্ছতা, সংগীতের হৃদয়স্পর্শীতা, স্থাপত্যস্থলত ঘনত্ব থেকে সেজান মাতিস কিউবিজম সুররিয়ালিজমের দ্বারা চিত্রবর্ণও একই সঙ্গে স্থান লাভ করে কিন্তু খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্নতায় কোনোটিরই মূল্য নেই, একটা সমগ্রতায় চলচ্চিত্র তার প্রথম ফ্রেম থেকে দৃশ্য দৃশ্যান্তরে শেষ ফ্রেমটি পর্যন্ত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি শিল্প, যার নাম চলচ্চিত্র, ইংরেজিতে সিনেমা, সকল শিল্পের আত্মীয়তা স্বীকার করতে তার গৌরব কিছুমাত্র কমে না।

**The first task is the creative breaking up of the theme into determining representations, and then combining these represen-**

tations with the purpose of bringing to life the initiating images of the theme. And the process whereby this image is perceived is identical with the original experiencing of the theme of the image's content. চলচ্চিত্রেই আমরা দেখেছি একটি পরিচিত মুহূর্তে এসে ঘটনার অন্তর্লীন বিরোধ বৈশিষ্ট্য সংঘাত আপন চরিত্রে ফুটে উঠছে স্বপ্রকাশিত হচ্ছে মহিমময় সাবলীলতায়। শিল্পে আমরা ঘাত প্রতিঘাত চাই, বর্ণনা চাই, সুষমা চাই, ছন্দ চাই, গতি চাই। এর সবটাই আমরা পেয়ে যাই চলচ্চিত্র নামক এই নবীন শিল্পে। [ চলচ্চিত্রের কর্ম পদ্ধতিটি সংঘাত ভিত্তিক। অনুভূমিক অক্ষের সঙ্গে উল্লম্ব অক্ষের, পুরোভূমির সঙ্গে পশ্চাদ্ভূমির, আকার ও আয়তনের, মাত্রা ও ঘনত্বের, ক্যামেরা দূরত্ব ও ক্যামেরা কোণের। স্থিতি ও গতির, গতি ও ছন্দের, ছন্দ ও টোনের, টোন ও ওভারটোনের। অর্থাৎ সংঘাত দৃশ্যগ্রাহ্য বা অনুভূতিগ্রাহ্য যে কোনোটি হতে পারে। ]

কার্ল ড্রেয়ারের *The Passion of Joan of Arc* দেখুন। সেই কোন্ কালের ছবি। দেখে মনে হবে এই সেদিন যেন ছবিটা তোলা হয়েছে। মহৎ শিল্পের এই গুণ। পৃথিবীর সর্বকালের অন্ততম শ্রেষ্ঠ ছবি 'ব্যুটলশিপ পটেমকিন'। ব্যুটলশিপ দেখেই আমরা বুঝতে পারি চলচ্চিত্রে ধ্বনি আসতে বাধ্য। ছবি সবাক হবেই। এই একটা ছবিই যেন চলচ্চিত্রে কোনো একদিন শব্দ নিয়ে আসবে। সে দিন খুব দূরে নয়। ধ্বনি এল। ধ্বনি চলচ্চিত্রকে বাস্তব জীবনের আরো অনেক কাছে নিয়ে এল। কারণ এখন দৃশ্য ও ধ্বনির সমন্বয়ে একটা বিশেষ ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হলো। চলচ্চিত্র কাহিনী বর্ণনা করতে এগিয়ে চলল। জাগিয়ে দিল মানুষের আবেগ অনুভূতিকে। এর জন্ম দৃশ্য যেমন চাই, তেমন চাই শব্দ। চলচ্চিত্র যা চায় তা পেয়েও যায়। সাহিত্যে যা বলা সম্ভব, চলচ্চিত্র তার নিজস্ব রীতিতে এই নতুন শিল্পে তার সবটাকেই সমস্ত দিক থেকে সম্ভব করে তুলল নিজস্ব প্রকাশভঙ্গিতে। উগুরু চলচ্চিত্রের ক্ষেত্র, যে কোনো সীমাকে সে অতিক্রম করতে পারে। তার ধ্বনি, তার আলো, তার অঙ্ককার, তার বিস্তৃতি, তার দূরত্ব, তার বিস্তার, তার কথা যে কোনো পরিধিকে ছাড়িয়ে যায়। সাহিত্য সংগীত চিত্র কোনো শিল্পের উপরই সে নির্ভরশীল নয়। গড়ে উঠছে অজস্র দৃশ্যের সমন্বয়ে এক অখণ্ড রূপ। একাধারে স্থানিক, সংগীতকে বাদ দিয়ে একমাত্র শিল্প-মাধ্যম যা কালাত্মী। আইজেনস্টাইনের মতে চলচ্চিত্র পূর্বতন সমস্ত শিল্পের নির্ধারিত, আর আমাদের মতে তখন তার প্রমাণ 'আইভান গু টেরিবল'। *City*

Lights-এর শেষ ক্লোজ আপ চলচ্চিত্র ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত। চ্যাপলিনের হাতে একটা গোলাপ। গালের কাছে গোলাপটা। মুখের কাছে ডাঁটি। ঠোঁটের ওপর আঙ্গুল। ঠোঁটের কোণে মুদ্র হাসি। চোখে এক আশ্চর্য চাউনি। কী তার অর্থ আজও কেউ তা স্পষ্ট করে বলতে পারে না। হুনিয়া-ছোড়া সেই বিখ্যাত হাসিটি যেমন চিত্রকলায়, চলচ্চিত্রে তেমনি City Lights-এর শেষে চ্যাপলিনের মুখ। চিত্র ও কাব্য মিশে যায় Earth-এ। ডভঝেক্সোর Earth ছবিতে ভ্যাসিলির মৃতদেহ চলেছে আপেলের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে। আবারও একটা ক্লোজ আপ। আপেলটা ছুঁয়ে দেয় ভ্যাসিলির গাল।

অরসন ওয়েলসের Citizen Kane চলচ্চিত্র ভাষায় রীতিমতো এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়ে দিল। চলচ্চিত্র সরাসরি জীবনের ছবি তুলতে চাইল। পৃথিবীর অস্বস্তম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার আন্তনিওনি। আন্তনিওনি একটা ঘটনা বলছেন। তাঁর মুখেই শুধু : জীবনে প্রথম আমি ক্যামেরায় লুক খুঁ করেছিলাম একটা পাগলা গারদে। আমরা জায়গা মতো ক্যামেরা বসলাম। লাইটগুলো ঠিক করে নিলাম। প্রথম দৃশ্যের প্রয়োজন অনুযায়ী রুগীদের ঘরের মধ্যে যার যার জায়গায় দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো। তারা মনোযোগ দিয়ে আমাদের নির্দেশগুলো শুনলো। দেখে ভালো লাগছিল সব একেবারে ঠিক ঠিক হচ্ছে। এবার শট নেবো। আমি আলোগুলো জালিয়ে দিতে নির্দেশ দিলাম। মুহূর্তের মধ্যে চোখ ধাঁধানো আলোয় ঘরটা ঝলসে ওঠে। রুগীরা অনড়, ভয়ে অসাড়। তারপর একটা অবর্ণনীয় ঘটনা ঘটে যায়। সেই পাগলেরা উন্মাদের মতো ঘর থেকে পালাতে চাইছে। যেন কোনো প্রাগৈতিহাসিক জন্তু তাদের আক্রমণ করেছে। তাদের মুখ যা ছিল শান্ত ঠাণ্ডা মুহূর্তে তা বদলে গিয়ে প্রবল আক্ষেপে বিক্ষুব্ধ। এরপর আমাদের ভয় পাবার পালা। ক্যামেরাম্যান তার ক্যামেরা বন্ধ করার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, আমারও নির্দেশ দেওয়ার মতো মুখ থেকে কিছু বেরোচ্ছে না। শেষ অব্দি উন্মাদ আশ্রমের ডিরেক্টর চিৎকার করে উঠলেন : ‘বন্ধ করো, আলো নিভিয়ে দাও’। সেই আধা অন্ধকার ঘরে এক ঝাঁক দেহ যেন যত্নের শেষ যত্নগায় তখন বিকৃত হয়ে পাক খাচ্ছে, ছমড়ে কঁকড়ে যাচ্ছে। আপনি বলবেন, এ ঘটনাই তো প্রমাণ করে যে চলচ্চিত্র বাস্তব জীবনের ছবি তুলতে পারে না। আর আমি এ ঘটনাটা এখানে উল্লেখ করেছি এইজন্যে যে চলচ্চিত্র জীবনের নির্মম ছবি তোলার জন্তু কোথায় না যেতে পারে, কী না করতে পারে? আন্তনিওনি বলছেন : It’s a scene I’ve never forgotten. It was then, though without being

aware of it, that we began to talk of Neo-realism. বাস্তব জীবনের ঐ ছবি যা সেদিন আন্তনিওনি তুলতে পারেননি, তা পরে শিল্পের এক আশ্চর্য সার্থক রূপ লাভ করে 'ওয়ান ফু ওভার দি ক্লক্জ নেস্ট' ছবিতে।

চলচ্চিত্রকার অপার রহস্যের স্রষ্টা। জয়েস বলেছিলেন, 'সাহিত্য সর্বাঙ্গীণ মননশীল শিল্পরূপ'। কিন্তু কোনো মননশীল বক্তব্যের যথাযোগ্য স্থায়ী বাহন এখন আর শুধু সাহিত্য নয়, চলচ্চিত্র আজ এতই শক্তিশালী মাধ্যম। কতো অজস্র দিকে যেতে পারে এই শিল্প, জীবনের কতো অসংখ্য রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারে এই শিল্প 'গোল্ডরাশ' থেকে 'রশোমন' পর্যন্ত রয়েছে তার অনেক উদাহরণ, 'পথের পাঁচালী' থেকে 'সেভেন্থ সীল', 'পিয়েরো লো ফু' আর 'প্যাসেঞ্জার' এই শিল্প প্রতিদিন রূপ দিচ্ছে জীবন মৃত্যুর নানা রূপ।

প্রলয় শুর

॥ চারুলতা ॥

রবীন্দ্রনাথের বড় গল্প নষ্টনীড় অবলম্বনে সত্যজিৎ রায়ের ছবি ( ১৯৬৪ )। মূল গল্পের ঘটনা, সংলাপ ও চরিত্র এবং ফলে গল্পের খীম ও সত্যজিতের ছবিতে কম-বেশি পরিবর্তিত হয়েছে। তাঁর নিজের মতে মূল গল্পে প্লট গোপ, তার প্রধান সম্পদ হলো মূল চরিত্রগুলির মনোভাব ও পারস্পরিক সম্পর্কের সূক্ষ্ম দরদী বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণের কেন্দ্রবিন্দুটি চারুলতার মানসিক বিবর্তনের ওপর স্থাপ্ত, তার প্রকাশ অমলের প্রতি চারুর অবদমিত প্রেমাকাঙ্ক্ষায়। এই বর্ণনা ও বিশ্লেষণের চলচ্চিত্রোপযোগী দৃশ্যরূপ দেওয়ার প্রয়োজনেই মূল গল্প থেকে ছবি দরকার মতো আলাদা। চারুলতা অবশ্যই একটা মেয়ের ব্যক্তিগত কাহিনী নির্ভর ছবি নয়, দেশ কাল ও দেশকালজাত সমাজ সংস্কার এ ছবিতে শরীর, মন, বুদ্ধি ও আত্মাসহ উপস্থিত। এই প্রাসঙ্গিকতা চারুলতার প্রথম বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য মাধুর্য ও প্যাশন সত্যজিতের আর কোনো ছবিতে এমন সার্থক সহবাস করেনি। আর তৃতীয়ত এই সমস্তই অজিত হয়েছে একেবারে চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষার মাধ্যমে। ঘটনা বা সংলাপের দ্বারা আরোপিত হয়ে নয়। কাহিনী ও গঠনের বিবিধ দৃশ্য এই ছবিতে অনিবার্যভাবে এক চূড়ান্ত টেনশনের সৃষ্টি করে এবং ছবি হয়ে ওঠে অসাধারণ সৌন্দর্য, তারসাম্য ও টেনশনের ফিল্ম।

বস্তুত এই ছবি ধ্রুপদী রীতি ও আধুনিক প্রসঙ্গের সময়ের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যা ছবিকে একই সঙ্গে দিয়েছে অমোঘতা, অভিধাত ও ব্যঙ্গনা। দৃশ্যগঠন, দৃশ্য-

বিজ্ঞান, সংগীত ও আবহ ধ্বনি, অভিনয়—সমস্ত ও সম্মিলিত বিচারে চারুলতাকে সত্যজিতের শ্রেষ্ঠ ছবি বললেও অত্যাক্তি হয় না। তাঁর শিল্পলোকে এই ছবির modal তাৎপর্য রয়েছে। ( দ্র. সত্যজিৎ )। লাভেন্দুরার সাফল্যকে যেমন বলা হয় অনেকটা মনিকা ভিস্তিরও সাফল্য, চারুলতার কৃতিত্ব তেমনি অনেকটা মাধবীরও কৃতিত্ব।

অভিনয়ে মাধবী মুখোপাধ্যায় ( চারু ), সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায় ; চিত্রগ্রহণ স্ত্রুত মিত্র, সম্পাদনা হুলাল দত্ত, শিল্প নির্দেশনা বংশী চন্দ্রগুপ্ত, সংগীত সত্যজিৎ রায়।

বালিনে শ্রেষ্ঠ পরিচালনার রৌপ্য ভানুক পুরস্কার, ১৯৬৫ ॥

## ॥ চিত্রকল্প / দৃশ্যকল্প ॥

বাংলায় চিত্রকল্প শব্দটি দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়— ১. ইমেজ, ২. সিকোয়েন্স ( একাধিক দিন বা দৃশ্যের সময় )। সাহিত্যের ইমেজ হলো বাংলা প্রতিশব্দে বাকপ্রতিমা, সেক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের ইমেজকে দৃশ্যপ্রতিমা বলা যেতে পারে ( দ্র. চলচ্চিত্রের শিল্পরূপ )। সিকোয়েন্সের প্রতিশব্দ হিসেবে চিত্রকল্প শব্দটির চাইতে দৃশ্যকল্প শব্দটা আমার বেশি পছন্দ। ভাষার ক্ষেত্রে যেমন বর্ণ থেকে শব্দ, শব্দ থেকে ফ্রেজিং, চলচ্চিত্রে ওই ক্রম অনুসরণেই ফ্রেম থেকে শট, শট থেকে দৃশ্য। চলচ্চিত্রে একটি দৃশ্য বা দৃশ্যাংশ দেখানো হয় পরের কোনো দৃশ্য দেখানো হবে বলে। প্রতিটি দৃশ্যের থাকে একটি একক physical value, অঙ্কটি সমগ্র ছবির পরিপ্রেক্ষিতে তার structural value. একাধিক দৃশ্যাংশ বা দৃশ্য মিলে গড়ে ওঠে একটা দৃশ্যচিত্র বা দৃশ্যরস বা দৃশ্যগত মনস্তব্য। একাধিক বাক্যের সংযোগে যেমন একটি অনুচ্ছেদ, তেমনি একাধিক দৃশ্য নিয়ে একটি দৃশ্যপর্যায়। অনুচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ, তেমনি সিকোয়েন্স থেকে কখনো কখনো এপিসোড। উল্লেখযোগ্য ছবির মুদ্রিত চিত্রনাট্য পাঠ করলে এই বিভাজন স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে, যা চলচ্চিত্র অনুশীলনে দরকারি। ফ্রেম চলচ্চিত্রের ক্ষুদ্রতম ভৌতিক উপাদান, আর সিকোয়েন্স তার প্রাথমিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ শৈল্পিক উপাদান।

## ॥ চিত্রকলা ও চলচ্চিত্র ॥

পশ্চিমের অধিকাংশ মানুষের কাছে সিনেমা দেখতে যাওয়ার অপরাধ নাম হলো 'ছবি' দেখতে যাওয়া। ( ভারতবর্ষের নানা অংশে, যদিও, লোকে সিনেমাকে বলে

‘বই’।) অনেক ভাবিকই জোর দিয়ে বলেছেন যে চলচ্চিত্রের নির্ধারিত হলো ছবি ; এখানে শব্দ হলো গৌণ। বস্তুত, ফিল্ম-এর মৌলিক উপাদান হলো দেখা আর শোনা—অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থেকে। স্মরণ্যে এতে বিশ্বের কিছু নেই যে চলচ্চিত্রে প্রতিরূপের বিচারে পরিচালকরা স্বতই চিত্রের নান্দনিক নিয়মকানুনকে অস্বীকার করেন। চলচ্চিত্রের নন্দনতত্ত্বের বিভিন্ন ধারণাতেও চিত্রাঙ্কন থেকে বিবিধ পারিভাষিক শব্দ ও মতবাদ গৃহীত হয়েছে। বাস্তববাদ, স্বাভাবিকবাদ, সমাজবাস্তবতা, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা, পরাবাস্তববাদ, প্রকাশবাদ, অতিশয়িত স্বাভাবিকবাদ—এসবের অনেকগুলিই চিত্রাঙ্কন জগৎ থেকে ধার করা।

প্রতিরূপের ক্ষেত্রে ফটোতে যে প্রতিরূপ আমরা দেখি তা স্বভাবতই আমাদের দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতকে অবলম্বন করে ; পাশ্চাত্য জগতের শিল্পকলায় বাস্তবের প্রতিফলনে পরিপ্রেক্ষিতের পট প্রায় সর্বত্র স্বীকৃত। সিনেমার পর্দাকে বহুদিন পর্যন্ত চিত্রাঙ্কনে ইতিমধ্যেই ব্যবহৃত ‘স্বর্ণ ক্ষেত্রভাগ’ নিয়মে তৈরি করা হতো। তাছাড়া অনেক প্রতিভাবান পরিচালক, মেলিয়ে থেকে গুরু করে আজকের চলচ্চিত্র শ্রষ্টা পর্যন্ত প্রতিটি শটকে এমনভাবে সাজান, যাতে মনে হয় তাদের প্রত্যেকটি যেন এক একটি চলমান নাটকীয় দৃশ্য। প্রতিরূপের বিচার নিয়ে ভাবনার অর্থ এই নয় যে প্রতিটি শটকে স্থিরচিত্র হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ, প্রতিটি শটের যেমন নিজস্ব অর্থপূর্ণ পাঠ আছে তেমনই আছে প্রতিবেশী শটগুলির সঙ্গে তার সায়ুজ্য। বস্তুত, যে আইজেনস্টাইন তাঁর প্রতিটি শটকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সাজাতেন তিনিই আবার ‘মনতাজ’-এর অগ্ৰতম সৃষ্টিকর্তা। তাঁর ‘আলেকজান্ডার নেভস্কি’ ছবির একটি দৃশ্য বিশ্লেষণ করে আইজেনস্টাইন দেখিয়েছেন যে সেখানে প্রত্যেকটি শট ঘনিষ্ঠভাবে তার আবহ সংগীতের সঙ্গে যুক্ত। এইভাবেই তিনি দেখিয়েছেন প্রতিরূপ-বিচার ও সংগীত-বিচারের মধ্যে গতিময় যোগসূত্র, দেখিয়েছেন ফ্রেমের ভিতরের (এবং ফ্রেম থেকে ফ্রেমে) বিচলন এবং সংগীতের সম্পর্ক। ঐ অংশটির বিষয়ে আইজেনস্টাইন লিখেছেন : ‘সংগীতের বিচলন ও বস্তুরেখার বিচারের উপর দিয়ে চোখ বোলাবার মধ্যে একটি নিখুঁত সায়ুজ্য আমরা খুঁজে পেয়েছি। আরেক ভাবে বলা যায়, বস্তুর কাঠামো ও সংগীতের কাঠামোর যুগে রয়েছে একই গতি। আমি বিশ্বাস করি এই গতিকে আবেগাশ্রিত গতির সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে’। আইজেনস্টাইন আরো ব্যাখ্যা করে বলেছেন : ‘যে শ্রষ্টা রেখার কোনো বিচার সৃষ্টি করেন তিনিই সঠিক পথে, নির্ধারিত ক্রমে, বস্তুচিত্রের বিচারের উপর দিয়ে দর্শকের দৃষ্টিকে পরিচালিত করেন। এই শর্তটি যেমন চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে ক্যান-

শাসনের উপর দিয়ে দর্শকের দৃষ্টিচালনার প্রতি প্রযোজ্য, তেমনই চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে পর্বীর উপর দিয়েও দৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য'।

আইজেনস্টাইন অঙ্কিত চিত্র ও ফিল্ম-শটের সম্বন্ধকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকলেও, তিনি শটকে শুধুমাত্র ঝাঁকা ছবি হিসেবে ধরেন নি। তিনি ভালো-ভাবেই জানতেন যে অপূর্ব শট থেকে একটি স্থিরচিত্রকে বিচ্ছিন্ন করে আনলে সেটা একটি অপূর্ব ফটো নাও হতে পারে, আবার ঝাঁকা-ছবির তুলনায় তা হয়ত অনেক নিচু মানের। এর কারণ এই যে স্থিরচিত্র বা ঝাঁকা-ছবি এক একটি বন্ধ-ক্ষেত্র, যার অন্তঃস্থ নিজস্ব গতি নির্ভর করে তার ভিতরের অংশগুলির নির্দিষ্ট সম্পর্ক এবং ফটোর ফ্রেম বা ছবির ক্যানভাসের ওপরে। অপরদিকে ফিল্ম-এর স্থির-চিত্রের প্রাণ বা বেগ যেন প্রবাহের মতো সেই স্থিরচিত্রের মধ্য দিয়ে বইছে, এবং এক ফ্রেম থেকে অল্প ফ্রেমে ও এক শট থেকে অল্প শটে প্রবাহিত হচ্ছে। এই থেকেই বোঝা যায় চলচ্চিত্র থেকে স্থিরচিত্র বেছে নিয়ে কেন তাকে চলচ্চিত্র বিশেষের প্রচারের কাজে ব্যবহার করা হয় না। বিজ্ঞাপনের জন্ত ছবি তোলার সময় আলাদা স্থিরচিত্র গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

সিনেমা নিঃসন্দেহে প্রতিকল্প-শিল্প বা দৃশ্য-শিল্প, তবে একমাত্র প্রতিকল্প-শিল্প নয়। কিন্তু যেহেতু নাটক ও উপন্যাসকেও চলচ্চিত্রে রূপায়িত করা হয়, সেহেতু চলচ্চিত্র-শিল্পে দুটি মৌলিক লক্ষ্য বা লক্ষণের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। একটি হলো চলচ্চিত্রে প্রতিকল্পকে দ্বিমাত্রিক চিত্র হিসেবে গণ্য করার প্রবণতা এবং তাকে চিত্রাঙ্কনের নীতি অনুসারে প্রতিকল্পিত করা; আর একটি হলো নাটক ও উপন্যাসের স্বভাবোচিত ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্রের সমতুল্য দৃশ্য হিসেবে কল্পনা করা। এই দুই ধরনের প্রয়োগদৃষ্টি দেখা গেলেও এদের মধ্যে একটি অপরের চেয়ে বেশি চলচ্চিত্র-সম্মত এমন কথা বলা যায় না। যখন আর. গেসনার বলেন যে 'নাটক বা সাহিত্য-অনুপ্রেরিত দর্শক স্বভাবত ফিল্মের দৃশ্যগুলি মনে রাখে এবং চলচ্চিত্রে তন্নিষ্ঠ দর্শক মনে রাখে শটের খুঁটিনাটি...চলচ্চিত্র-মনস্ক লোকেরা শট-সচেতন'—তখন তিনি নিজস্ব পছন্দকে একটি নিয়ামক আইনে দাঁড় করাতে চাইছেন। বস্তুত, যারা যথার্থ সিনেমা-মনস্ক তাঁদের মধ্যে চলচ্চিত্রের এই দুটি দৃষ্টিকোণই সক্রিয় থাকে। কার্টুন থেকে শুরু করে নরম্যান ম্যাকল্যারেন এবং অগ্ৰাণদের পরীক্ষামূলক ছবি ও আইজেনস্টাইনের সুগঠিত বস্তুনির্ভর চলচ্চিত্র পর্যন্ত অনেক সিনেমায় অনেক ফিল্ম-প্রতিকল্পই খুঁজে পাওয়া যাবে যা চ্যাপ্টা, দ্বিমাত্রিক এবং ঝাঁকা ছবির মতো। অপরদিকে নাটকোচিত চলচ্চিত্রে বহুক্ষেত্রেই ত্রিমাত্রিক ফিল্ম-প্রতিরূপের সাধাৎ

পাওয়া যায়। আসলে সার্থক চলচ্চিত্রে প্রতিরূপের এই দুই রীতির স্বর্ছ সমন্বয়ই লক্ষ্য করা যায়। সিনেমায় দর্শক যেমন একদিকে 'ভালো ফটোগ্রাফি' উপভোগ করে তেমনই উপভোগ করে 'ভালো গল্প'।

ফিল্ম এবং চিত্রের সম্পর্কের আরেকটি দিক আছে; সেটি উভয়ের বৈশিষ্ট্যকে আরো প্রকট করে তোলে। ঝাঁকা ছবি নিয়ে যে কয়েকটি চলচ্চিত্র তোলা হয়েছে পরিচালকের মেজাজ অল্পযায়ী কমপক্ষে তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে। একট পদ্ধতি মতে পরিচালক চিত্রশিল্পীর কর্মকে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে চলচ্চিত্র মাধ্যম সম্পূর্ণভাবে চিত্রাঙ্কন-মাধ্যমের দাস। ঝাঁকা ছবিগুলিকে সামগ্রিক ভাবে কিছুক্ষণের মধ্যে দর্শকের সামনে উপস্থিত করার উদ্দেশ্যে এক্ষেত্রে চলচ্চিত্র-মাধ্যমকে একটি পূর্ণাঙ্গ 'রেকর্ডিং' বা সংরক্ষণের উপায় হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ফলে, এই জাতীয় ফিল্মের দলিল-চিত্র হিসেবে অনেক মূল্য থাকলেও ফিল্ম শিল্পের বিচারে তারা অনাকর্ষণীয়। এবং যে চিত্রাঙ্কন-শিল্পকে এই ধরনের চলচ্চিত্র মহিমায়িত করতে চায় আসলে শেষ পর্যন্ত তার অপকারই হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে চলচ্চিত্র পরিচালকের লক্ষ্য হলো যশস্বী চিত্রশিল্পীর কাজকে ব্যাখ্যা করা এবং দর্শককে ঐ শিল্পীর ব্যক্তিত্ব বুঝতে সাহায্য করা। এখানে চলচ্চিত্রের মালমশলাকে ঐ উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করা হয়। ক্যামেরা ছবির চারপাশ ঘুরে ঘুরে দেখে, এগিয়ে এসে কোনো বিশেষ অংশের ওপরে মনোনিবেশ করে; পিছু হটে গিয়ে সমগ্র ছবিটা দেখতে থাকে, কখনো কখনো দর্শকের চোখের মতো ছবির প্রাণবন্ত রেখাগুলি অনুসরণ করে, সংগীত ও ভাস্কর্য দর্শককে চালিত করে; ফলে 'মনতাজ' দ্বারা তুলনামূলক বা দ্বন্দ্বিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

এই দ্বিতীয় শ্রেণীর চলচ্চিত্রে পরিচালকের ব্যক্তিত্ব ফিল্মে প্রতিফলিত হয় এবং এমনও হতে পারে যে, যে চিত্রকর্মগুলির বিশ্লেষণে চলচ্চিত্রটি নিয়োজিত তাদের চেয়ে চলচ্চিত্রটিই শিল্পকর্ম হিসেবে অধিকতর আকর্ষণীয় হয়ে উঠল। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতায় দর্শক ঝাঁকা-ছবির যতটা গভীরে প্রবেশ করতে পারত তার চেয়ে অনেক গভীরে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে; এবং এই ক্ষেত্রে পরিচালকের সমস্যা হলো ছবিটিকে আকর্ষণীয় করার জগ্রে ঝাঁকা ছবিকে কতখানি তিনি নিজের চলচ্চিত্রে ব্যবহার করতে পারেন। তৃতীয় শ্রেণীর চলচ্চিত্রে এই সমস্যাটিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ করা হয়। এখানে পরিচালক কোনো ঝাঁকা উপাদান অবলম্বন করে একটি ফিল্মজাত গঠন বা 'ফিল্মিক ফর্ম' তৈরি করতে চান। সেই কাজ করতে গিয়ে—নান্দনিকভাবে—পরিচালক প্রথম চিত্রকলাটিকে বিনষ্ট করে

তাকে শিল্পে নবরূপ দান করেন। তিনি ঝাঁকা ছবিটির ফ্রেম—যা না থাকলে ছবিটি স্বপ্নদ্রুত হতো না—তাকেই ভেঙে ফেলেন। তিনি ছবির বিজ্ঞানকে পুনর্বিজ্ঞান করেন এবং মূল চিত্রকর ছবিতে যে উপাদানগুলিকে গুরুত্ব দেননি পরিচালক তাদের বড়ো করে দেখাতে পারেন। সময়-মাত্রার সংযোজনের সঙ্গে সঙ্গে পরিচালক ঝাঁকা ছবিকে আমূল পরিবর্তিত করে দেন, সেটিকে ফিল্ম-রূপ দেন। কারণ ঝাঁকা ছবির কোনো পরম্পরা নেই। ক্যানভাসে রেখা, গড়ন, রং ইত্যাদির বিজ্ঞানে ঝাঁকা ছবির মধ্যেও গতিময়তা এসে যায়, কিন্তু তা ফ্রেমের মধ্যে আবদ্ধ। এই তৃতীয় শ্রেণীর চলচ্চিত্র দর্শককে যে-অভিজ্ঞতা এনে দেয় তা ঝাঁকা-ছবি দেখার অভিজ্ঞতা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। অসতর্ক দর্শক মনে করতে পারে যে, সে শিল্পীর ঝাঁকা ছবিটাই দেখছে। কিন্তু আসলে সে যা উপভোগ করে তা হলো চলচ্চিত্র পরিচালকের সৃষ্টি। চলচ্চিত্র ও চিত্রকলা নিয়ে এতক্ষণ যা বলা হলো সেগুলি ভাস্কর্য ও নৃত্য-বিষয়ক চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যদিও এই শিল্পগুলির সঙ্গে চলচ্চিত্রের সহাবস্থানের সমস্যা ভিন্ন প্রকারের।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : ভ্লাদিমির নিলসেন-এর দি সিনেমা অ্যাজ এ গ্রাফিক আর্ট ॥

গান্স্ট রোবের্ট

॥ চিত্রনাট্য ॥

অনেকে বলেন চলচ্চিত্র 'নির্মাণ' করা হয়। যেমন অনেকেই বলেন 'মূর্তি নির্মাণ'। রবীন্দ্রনাথ শিল্পকলার ক্ষেত্রে নির্মাণ শব্দটিকে উপযুক্ত মনে করেননি। স্থাপন গঠন ইত্যাদির থেকে নির্মাণ বেশি কিছু অর্থবহ না, যদি না নির্মাণে সৃষ্টির ইংগিত থাকে। সে ক্ষেত্রে রচনা শব্দটিই উদ্দেশ্যের সঠিক অনুগামী। চলচ্চিত্র যখন শিল্প তখন তা রচনার বিষয়। রচনা তাকেই বলে যা রূপে গুণে রসে ভাবে বিশিষ্ট, যার নির্দেশ শিল্পের দিকে। সব রচনারই একটা অহুচ্চিন্তা থাকে। সেই অহুচ্চিন্তাকে মেলাতে হয় পূর্ব চিন্তার সঙ্গে। পূর্ব চিন্তার সঙ্গে প্রসঙ্গ, প্রসঙ্গের সঙ্গে নানা অহুষ্ক ও উপাদান। সবটাকে মেলাতে হয় অহুচ্চিন্তামূলে ও প্রাগভাবে। এই কাজের জ্ঞান চাই পরিকল্পন। চলচ্চিত্র রচনার আগে তা একটা লিখে নেন অনেকে। কেউ কেউ লেখেন না, শুধুই ভেবে নেন। লিখে নেওয়া হলে, বিস্তারিত অহুপুঙ্খ পরিকল্পনকে বলা হয় চিত্রনাট্য। তা-ও এক রচনা যা হতে পারে রূপে গুণে রসে ভাবে শিল্প সম্ভাবনার আকর।

চিত্রনাট্য মূলত চিত্রের মধ্যে নাট্য, চিত্রের সাহায্যে নাট্য, এমনকি নাট্য-

চিত্রও। নাট্য-উপাদানের চিত্র বা চিত্র-উপাদানের নাট্য হলেও চিত্রনাট্যের চিত্রই যেন বাহন, নাট্য যা বাহিত। চিত্র তার রূপ, নাট্য তার রস। চিত্র তার শরীর, নাট্য তার প্রাণ। চিত্র তার ঘোষ উপস্থিতি, নাট্য তার অঘোষ ক্রিয়া। চিত্র তার প্রতিকৃতি, নাট্য তার অল্পভূতি। চিত্রেই তার ভাষা, নাট্যে তার ভাব। চিত্রে সে মূর্ত, নাট্যে সে বিমূর্ত। চিত্রে তার আবদ্ধতা, নাট্যে তার মুক্তি।

বলা বাহুল্য, চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যের শুরুে চিত্র সম্ভাব্য রূপের ইংগিতমাত্র—বর্ণমালায় চিত্রমালা। চলচ্চিত্রায়িত হওয়ার আগের চিত্রকল্প বা দৃশ্যকল্প। এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক বিচারে মনে হবে চিত্রনাট্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের সম্পর্ক ততটাই যতটা পাঠ্য নাটকের সঙ্গে অভিনীত নাটকের। অথচ নাটকের পাঠ্য ও অভিনীত পর্ষায়ের মধ্যে আকার-প্রকার-স্বভাব-গুণের তফাৎ যতটা, চিত্রনাট্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের সেই পার্থক্য অনেক বেশি। কারণ, নাটকের পাঠ্য ও অভিনয়ের মধ্যে নাট্যভাষাগত ব্যবধান কম। লক্ষণীয়, সংলাপ নাটকের ভাষা না। সংলাপ সংবাদ মাত্র। সংবাদের ক্রিয়া প্রকাশের ও প্রয়োগের রীতির মধ্যে থাকে নাটকের ভাষার সূত্র। চিত্রনাট্যের ক্ষেত্রেও সংলাপ আচরণগত প্রেক্ষিতগত অল্প-ঘটকী সংযোজনমাত্র। সংলাপ হতে পারে চলচ্চিত্রের ভাষার রসে নিষিক্ত। চলচ্চিত্রের ভাষা চিত্রক্রিয়ায়, চিত্রের মিথক্রিয়ার প্রায়োগিক দিকে। চিত্রনাট্যের ভাষা চলচ্চিত্রের ভাষার আঙ্গাবহ।

নাটক সাহিত্যের অন্তর্গত—এবং সাহিত্য, চিত্রনাট্য সাহিত্যনির্ভর, কিন্তু সাহিত্য নয়। নাটকের মঞ্চস্থ রূপের যত ইংগিত থাকে তার লিখিত রূপে, চলচ্চিত্রের সম্পূর্ণ রূপের অনেক কম সংকেত থাকে তার চিত্রনাট্যে। কারণ নাটক শিল্পকলার এক নির্দিষ্ট রূপ, চলচ্চিত্র তার মিশ্র রূপ। নাটক ও চলচ্চিত্রের মধ্যে প্রায়োগিক ও প্রায়ুক্তিক ভিন্নতা, সৌষ্ঠবের বিভিন্নতা অনেক—ব্যবধান যেন বোলকলার সঙ্গে চৌষট্টিকলার। চিত্রনাট্য নাট্যক্রিয়ার নিরিখে চলচ্চিত্রের বহু-দূরবর্তী—প্রায় প্রাথমিক একটা ধাপ মাত্র।

প্রাথমিক হলেও, চিত্রনাট্য প্রথম ধাপ নয়। অনেকেই, যারা চিত্রনাট্য লিখে নিয়ে চলচ্চিত্র রচনার কাজ শুরু করেন, প্রথমে লিখে নেন সিনপসিস। সিনপসিস থেকে বিস্তারিত, ট্রিটমেন্ট। ট্রিটমেন্টের আরও প্রসারিত রূপ, সিনারিও। চূড়ান্ত রূপ শুটিং স্ক্রিপ্ট লেখা সম্ভব লোকেশন ও সেট-ডিজাইন নির্ধারিত হওয়ার পর। কারণ চিত্রনাট্যের নাট্যক্রিয়ার সঙ্গে তার চলচ্চিত্রায়িত পূর্ণ রূপের সার্থকতার সম্পর্ক ক্যামেরার সূচিভিত্তিক শিল্পিত ব্যবহারে—ফ্রেম ডিমনশন অ্যাঙ্গেল কম্পোজিশন,

ডেফথ অফ ফিল্ড, দৃশ্যবস্তুর ও ক্যামেরার স্থিতি ও গতিশীলতার সঙ্গে । আর সম্পর্ক সম্পাদনার । সম্পাদনার কাজ শুধু চিত্রগ্রহণের পরে না, এই কাজ শুরু হয় শুরু থেকেই—অর্থাৎ মূল ভাবনা থেকে । বিষয় বিকাশের ও পরিবেশ রচনার প্রতিটি স্তরে । প্রতিটি স্তরের বিচারসঙ্গে চলচ্চিত্রের কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত রাখার জ্ঞান । চিত্রনাট্য রচনায় এই সম্পাদনাবোধের সম্পাদন প্রয়োজন । চিত্রনাট্য রচনার সময় সম্পাদনার কাজ শটে থেকে শটে, দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাবার ব্যবহারিক সম্ভাব্যতা বিচার করা, অপটিক্যাল জার্ক ডিমনশন জার্ক ব্যাকগ্রাউণ্ড জার্ক ইত্যাদি এড়িয়ে শটের ও দৃশ্যের পরস্পরা রক্ষা করা, শটের সঙ্গে শটের মিথস্ক্রিয়া, দৃশ্যের সঙ্গে দৃশ্যের অভিব্যক্তি ও ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করা, সংলাপ রচনার শটের মধ্যে বা শটের পর শটে সংক্ষিপ্ত সাবলীল কার্যকরী অপরিহার্যতা ও কেন্দ্রমুখিতা বজায় রাখা, চলচ্চিত্রের সামগ্রিক বিচার ও গঠনে দৃষ্টিনন্দন শিল্পিত রূপ আরোপ করা । এ ছাড়াও, চূড়ান্ত চিত্রনাট্যে থাকে ধ্বনি ও নৈঃশব্দ্যের সম্ভাব্য ব্যবহারের ইংগিত যা সম্পর্কিত চলচ্চিত্রায়িত রূপের অংশের ও সমগ্রের বাহ্য ও আন্তর গতি ও আবেদনের সঙ্গে ।

গুটিং স্ক্রিপ্ট একটি চলচ্চিত্রের সর্বাধিক লিখিত রূপ । সর্বাধিক, কিন্তু সম্পূর্ণ না । কারণ চিত্রনাট্যে তার চলচ্চিত্রায়িত রূপের সবটা লেখা যায় না । লেখা যায় না গতি দ্রুতি স্থিতি সরণ স্থাপন চলন বলন অভিনয় নাভিনয় আবেগ নিরাবেগ সুর ছন্দ লয় নুড সাসপেন্স ইত্যাদির সবটা । তবুও চিত্রনাট্য হতে পারে এমন যা চলচ্চিত্রের প্রায় প্রতিরূপ লিখিতরূপে । তার থাকতে পারে পাঠযোগ্যতা—পাঠে রসসঞ্চারী সম্ভাবনা । তার থাকতে পারে চিত্রনাট্য হিসেবে অনপেক্ষতা ও সাহিত্যধর্মিতা—যেমন আইজেনস্টাইনের চিত্রনাট্য । এমন চিত্রনাট্য ছাপা হয়েছে অনেক । চিত্রনাট্য প্রথম ছাপা হয়েছে জার্মান ভাষায় । পরে, ইংরেজি ফরাসি রাশিয়ান, এমনকি বাংলায়ও ।

চিত্রনাট্যের ও চলচ্চিত্রের মধ্যবর্তী তথ্যভিত্তিক ও প্রায়োগিক নির্দেশের ঘাটতি কমিয়ে আনার জ্ঞান অনেকে ছবি এঁকে নিয়েছেন, যেমন আইজেনস্টাইন, কুরোশাওয়া, সত্যজিৎ । অনেকে ছবি তুলে নিয়েছেন লোকেশনের, তার ভিত্তিতে লিখে নিয়েছেন কিছু পরিকল্পনার কথা কিংবা লেখ ও রেখক—যেমন গদার, মৃগাল সেন । অবশ্য এঁদের দুজনের কেউই আগে থেকে চিত্রনাট্য লিখে নেননি সবসময় । এঁদের চিত্রনাট্য লেখা সম্পূর্ণ হয়েছে ছবি তৈরির পরে ।

চিত্রনাট্যে সাহিত্যের চিত্র ও বর্ণনা, নাটকের অভিনয়, নৃত্যের তাল ও ছন্দ,

সংগীতের সুর ও গতি, ফটোগ্রাফির বাস্তবতা, চিত্রকলার ফ্রেম কম্পোজিশন রং, ডান্সের গঠন ইত্যাদি নানা মাধ্যমের উপাদান ও ভাবানুভবের কথা লেখা থাকে, হয়তো লেখা থাকে বিস্তৃত বাক্যবিছাসে। কিন্তু তা আসলে কতকগুলি ইংগিত-বহু সাংকেতিক নির্দেশ। যেমন চিত্রনাট্য শুধু লিখে নেওয়া না, এঁকেও নেওয়া যেতে পারে ছবি ও লেখচিত্রের সাহায্যে। চিত্রনাট্য তুলনীয় হতে পারে স্বর-লিপির সঙ্গে, যেমন বলেছেন পল রোথা। এই তুলনা বেশি মেলে পাশ্চাত্য উচ্চাঙ্গ সংগীতের— বিশেষত সিমফনির স্বরলিপির সঙ্গে। কারণ ভারতীয় উচ্চাঙ্গ বা রাগ সংগীতের স্বরলিপি তুলনায় পাশ্চাত্য স্বরলিপির মধ্যে নির্দেশিকা বেশি থাকে। স্বরলিপি সঠিক সুর ছন্দ লয় ধ্বনি গতি দ্রুতি ও ছেদ ইত্যাদি অনুযায়ী বাজলে সৃষ্টি হয় ঐকতান। কিন্তু যেমন একই স্বরলিপি ভিন্ন কনডাকটরের হাতে পড়লে ঐকতানের মধ্যে আবেগে মাদুর্যে রসে ভাবে বিভিন্নতা দেখা যায়, তেমনি একই চিত্রনাট্য ভিন্ন পরিচালকের হাতে সামগ্রিক শৈল্পিক প্রকাশে ভিন্ন হতে পারে।

চলচ্চিত্রের উদ্দেশ্য শুধু ঐকতান সৃষ্টি না। ঐকতানের ভাববিভোরতা না। একদেশদর্শিতা না। বরং হয়তো বহুদর্শিতা। বিষয় বিশেষে উদ্দেশ্যমুখিনতা ও বহু মাত্রিকতা একই সঙ্গে কখনো। বিষয়ের নিরিখে তার কালনির্ভরতা, ইতিহাস-চেতনা, মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব, নান্দনিক উৎকর্ষ ইত্যাদি চিত্রনাট্যের আয়ত্বাবীন। চিত্রনাট্যের লক্ষ্য বিষয়ের সঠিক প্রতিস্থাসের পথে, উপযুক্ত শৈলী ও আঙ্গিকের মধ্য দিয়ে, অতল রস-গভীরতা, ভুঙ্গ তাব-উচ্চতা। এই লক্ষ্যের সন্ধানে কোনো স্থনির্দিষ্ট পথ নেই, কিন্তু স্চিত্তিত পরিক্রমা আছে। এই পরিক্রমা যেন বৃত্তাকার। কেন্দ্রের চারদিকে বৃত্ত, সেই বৃত্তের চারদিকে আরও বৃত্ত নানা তলে, নানা কক্ষ-পথে যা বিষয়ের মাধ্যাকর্ষণে ও বৃত্তগুলির পরিধির পারস্পরিক ছেদ ও সংঘাতে পাণ্টে পাণ্টে যায়— এক বিষয়ের জগৎ এক রকম, অগ্নি বিষয়ের জগৎ আর। চিত্রনাট্যের অভীষ্ট লাভের পথে এক নির্বন্ধ ও এক অনুবন্ধ আছে। নির্বন্ধ হলো : উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্যের অনুসারী বিষয়, বিষয়ের অনুসারী কাহিনী বা বিজ্ঞান, কাহিনী বা বিজ্ঞানের অনুসারী পটভূমি, পটভূমির অনুসারী পরিবেশ। আর তার অনুবন্ধ হলো সমগ্রের মধ্যে এক অনিবার্য, অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক সূত্র। চিত্রনাট্য রচনায় যদি এই নির্বন্ধের ও অনুবন্ধের সঠিক প্রয়োগ থাকে তবে একটা ভাবের পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে। চিত্রনাট্যের চলচ্চিত্র-সম্ভাবনা, সেই চলচ্চিত্রের শিল্প-সম্ভাবনা থাকে, তবে, ঐ চিত্রনাট্যে।

॥ চীন ॥

প্রথম চিত্র-প্রদর্শন ১৮৯৬-য়ে। প্রথম কাহিনীচিত্র 'টিং-চুন মাউন্টেন' ( ১৯০৮ )। দেশের দশকে সংবাদচিত্র, তথ্যচিত্র ও শিক্ষামূলক চিত্র বেশ কিছু নির্মিত হয় ও জনশিক্ষার কাজে তাদের ব্যবহার ঘটে। ১৯৩১-য়ে দেশের প্রথম সবাকচিত্র মুক্তি পায়। তৎকালীন চিত্রপরিচালকদের মধ্যে Tsai Chusheng উল্লেখযোগ্য। বিশের দশকে গৃহযুদ্ধ, ত্রিশের দশকে জাপানি আক্রমণ ও চল্লিশের দশকে গণ-প্রজাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার পূর্বাবস্থা—প্রতিটি দশকের ছবিতে সেই সময়ের নির্দিষ্ট ছাপ পড়েছে। ১৯৪৯-য়ে চলচ্চিত্রশিল্পের জাতীয়করণের পর গণ-প্রজাতান্ত্রিক চীনদেশের প্রথম ছবি পরের বছর মুক্তিপ্রাপ্ত 'ভিক্টু অব দি চাইনীজ পিপল'। ষাটের দশকে লিও শাও চী-কে সামনে রেখে বুর্জোয়ারা পার্টির তেতরে ও বাইরে সমস্যা সৃষ্টির চেষ্টা করলে, তাইওয়ান প্রদেশে চিয়াং কাই শেকের দুর্বৃত্তবাহিনী ব্যর্থভাবে মূল ভূখণ্ডের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালালে, ও বিদেশে সাম্রাজ্যবাদ, সংশোধনবাদ ও সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি চীনবিরোধী জিগির বাড়িয়ে তুললে, দেশের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়ে চিত্র প্রযোজনার কাজ ব্যাহত হয়। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পর নির্মিত ছবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পিকিং অপেরার সংশোধিত কাহিনী অবলম্বনে 'দি হোয়াইট হেয়ারড্ গার্ল', ও শ্রমিক শ্রেণীর কৃতিত্বে, তাচিংয়ে দেশের প্রথম বড়ো তৈলখনির সৃষ্টি বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ রঙিন চলচ্চিত্র 'পাইয়োনায়ারস'। চীনের ছবিতে শ্রেণীসংগ্রামকে মূলমন্ত্র ধরে, বিপ্লবী বাস্তবতা ও বিপ্লবী রোমাণ্টিসিজমের সমন্বয় ঘটিয়ে ছবিকে সাংস্কৃতিক হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করার প্রবণতা স্পষ্ট। দেশের বিশাল সংখ্যক দর্শক এই সব ছবির বিচারক। আশির দশকে চীনের চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে একটা বিরী অগ্রগতি ঘটে। এই দেশের ছবি বিদেশে নিয়মিত দেখানো হতে ও স্বীকৃতি পেতে থাকে। যদি পঞ্চাশের দশককে ইতালির নিও-রিয়ালিজম, ষাটের দশককে ফ্রান্সের হুভেল ভাগ ও সত্তরের দশককে নতুন জর্মন চলচ্চিত্রের দশক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, তবে আশির দশককে চিহ্নিত করতে হবে চীনা চলচ্চিত্রের বিশ্বজয়ের দশক রূপে। আধুনিক চীনা পরিচালকদের মধ্যে সবচেয়ে

বিখ্যাত Zhang Yimou, তাঁর উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে আছে Red Sorghum, Jǔdǒu, Raise the Red Lantern, The Story of Qiu Ju ও Huozhe । সমসাময়িক অত্যন্ত পরিচালকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য Xie Fei, Chen Kaige, Ning Ying ।

এই দেশে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন এখন ক্রমেই জোরদার হচ্ছে এবং চীনা চলচ্চিত্রকাররা এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে গিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে ধরছেন ।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : Jay Leyda-র Dianying : Electric Shadows.

## ॥ চেকোস্লোভাকিয়া ॥

চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে চেক শারীরবিজ্ঞানী J. Purkinje-র বিশেষ অবদান ছিল। চেকোস্লোভাকিয়ায় প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় ১৮৯৮-য়ে। প্রথম চিত্র নির্মিতও হয় ১৮৯৮-য়ে। দেশজ চলচ্চিত্রের নিজস্ব লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এই দেশ নাৎসিদের অধিকারে চলে যাওয়ায় তখন দীর্ঘদিন ধরে চলচ্চিত্র প্রযোজনা ব্যাহত হয়। ১৯৪৬-য়ে চলচ্চিত্র-শিল্পের জাতীয়করণের পর তথ্যচিত্র, অ্যানিমেটেড ছবি ও পাপেট চিত্রের, বিশেষত শেষ দুটির, অসাধারণ সমৃদ্ধি ঘটে। তৎকালীন কাহিনীচিত্রের মধ্যে Stekly-র দি স্ট্রাইক, Kraska-র দি গুন ওভার দি রিভার এবং প্রারম্ভিক পরিচালক জুটি কাদার ও রুসের কিডন্যাপ উল্লেখযোগ্য। ওই সময়ের ছবিতে সমসাময়িক বাস্তবতা, নাটকীয় কম্পোজিশন, প্রাকৃতিক পটভূমির ব্যবহার ও জাতীয় লোকগাথার চিত্রায়ণ রয়েছে। ১৯৬০ সাল নাগাদ এই দেশে তরুণ চলচ্চিত্র পরিচালকদের একটা বড়ো গোষ্ঠী আত্মপ্রকাশ করে ও নতুন ধারার চলচ্চিত্র নির্মাণের সূচনা হয়। এই ধারায় নির্মিত ছবির বাস্তবতা একদিকে যেমন প্রত্যক্ষ জীবন থেকে নেওয়া, সরাসরি পরিবেশে গিয়ে অপেশাদার অভিনেতাদের নিয়ে তোলা, তেমনি বাস্তবাতীত এক কবিত্বময়তা ও চিত্রে প্রদর্শিত ঘটনাধারার সঙ্গে দর্শকের সংযোগের প্রয়োজনীয়তাও সেখানে পরিলক্ষিত। তথ্য নয়, তথ্যানির্ভর কিন্তু তথ্যাতিরিক্ত ভাব-ই এই সব ছবির বৈশিষ্ট্য, শক্তিশালী প্রকাশ পদ্ধতি, চূড়ান্ত রূপকতা, তবু মানবিক/সামাজিক সম্পর্কের বাস্তব অর্থানুসন্ধান, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে যারা বহু পুরস্কার ও প্রশংসা পেয়েছে। Bocan, Brynych, Chytilova, Crombacova, Forman,

Jasny, Jures, Menzel, Nemeč, Schorm, Solan, Vavra ও Zeman এই নতুন ধারার পরিচালকদের অগ্রতম। এঁদের মধ্যে বিশেষত মেনজেল ও ফোরম্যানের ছবিতে লিওসে অ্যানভারসনের ভাষায়, অদ্ভুত বৈচিত্র্য, অসাধারণ পৌরুষ, আধুনিকতা ও নিজস্বতার সংমিশ্রণ ঘটেছে। যেমন চাইটলোভার ছবিতে আছে বিভিন্ন উপাদানের জটিল, শক্তিশালী ও অনবগত সংমিশ্রণ এবং Schorm-এর ছবিতে মননশীলতা ও দার্শনিক আগ্রহের সমন্বয়। আবার নেমেক আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্ম বিখ্যাত। শিশুদের জন্ম তৈরি ছবির ক্ষেত্রেও চেকোস্লোভাকিয়ার অনবগত ভূমিকা রয়েছে। দেশে আশির দশকে প্রতি বছর ৩০টির বেশি কাহিনীচিত্র নিমিত্ত হতো, সিনেমা হলের সংখ্যা ছিল ৪,০০০-এর কাছাকাছি। পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতনের পর এখন চেকোস্লোভাকিয়া, ইয়োগোস্লাভিয়ার মতন, একাধিক রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে গেছে। চেক রাষ্ট্র ও স্লোভাক রাষ্ট্রে।

প্রামাণিক গ্রন্থ : L. Dewey-র আউটলাইন অব চেকোস্লোভাকিয়ান সিনেমা ॥

## ॥ চেম্বার ছবি ॥

বার্গম্যানের সো ক্লোজ টু লাইফ, ভারতীয় চিত্র শান্ততা কোর্ট চানু রহে, বা বাংলা ছবি অবতারে অনিল-মাধবীর দৃশ্যপর্যায়গুলি, চেম্বার ছবির স্বন্দর উদাহরণ। এই ধরনের ছবি সাধারণত কোনো আবহ স্থান বা সেটের মধ্যে সীমায়ত থাকে, ফলে দৃশ্যগুলি হয় ক্লোজড্ কম্পোজিশন নির্ভর ; সংলাপ, অভিনয় ও ক্লোজ আপের ওপর জোর পড়ে ; ক্যামেরা মুভমেন্ট থাকে অপেক্ষাকৃত কম ; ফলে বৈচিত্র্য ও গতি আনতে মুড, রঙ ও আবহ সংগীতের তারতম্য বা নাটকীয়তা প্রাধান্য পায়। এ রকম ছবি যে চলচ্চিত্র হিসেবে অত্যন্ত সার্থক হয়ে উঠতে পারে বার্গম্যানের চেম্বার ড্রামা পর্যায়ের ছবিগুলি তার প্রমাণ, অটাম সোনাটায় যে বৈশিষ্ট্য চরমে পৌঁছেছে। (ড্র. নাটক ও চলচ্চিত্র, বার্গম্যান)। চেম্বার ছবির আবহতা দমবন্ধকর অবস্থায় পৌঁছেছে দি কানাল বা ক্যামেরাদৃশ্যফট ছবিতে।

## ॥ নিকোলাই চেরকাসভ ॥

(১৯০৩-১৯৬৬, রুশ নাট্য ও চিত্র অভিনেতা)। দীর্ঘ কাঠামো ও স্বগভীর কণ্ঠস্বরের জন্ম এপিক হিরো রূপে চিহ্নিত। লেনিনগ্রাদ থিয়েটার ইনস্টিটিউট থেকে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ১৯২৬ সনে মস্কো অবতীর্ণ হন ও পরের বছরই চলচ্চিত্রে

আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর অভিনয়ে ছিল ব্যাপক বিস্তার ও বৈচিত্র্য এবং গভীর মননশক্তি। বহু বিখ্যাত সোভিয়েত ছবিতে তিনি বলিষ্ঠ প্রত্যয় ও ঋপদী গান্ধীর সঙ্গ অনবদ্য অভিনয় করেছেন। যেমন ব্রাল্টিক ডেপুটি, আলেকজাণ্ডার নেভস্কি, লেনিন ইন অক্টোবর ও আইতান দি টেরিবল্ ( ১ম ও ২য় পর্ব )। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে আছে পিটার দি গ্রেট, ব্যাটল অব স্টালিনগ্রাড, ইতান পাতলভ, দন কিখোভে ও লিগাসি। চলচ্চিত্রে অভিনেতার ভূমিকা নিয়ে আইজেনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর নান্দনিক বিতর্ক ছিল। মঞ্চাভিনয়, চিত্রাভিনয় ও বেতারাভিনয় নিয়ে বহু প্রবন্ধ তিনি রচনা করেছেন। তাঁর নোটস অব এ সোভিয়েট অ্যাক্টর বিখ্যাত বই। তিরিশের দশকের শেষার্ধ্বে তিনি স্বপ্রিয় সোভিয়েতে ডেপুটি হিসেবে নির্বাচিত হন। নিকোলাই পি. চেরকাসভ নামে আর একজন সোভিয়েত অভিনেতা ছিলেন, যিনি পুডভকিনের জেনারেল স্ভভোরোভ ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেন।

॥ চার্লস চ্যাপলিন ॥

( ১৮৮৯-১৯৭৮, গ্রেট ব্রিটেন )। প্রযোজক, অভিনেতা ও পরিচালক। কমেডির সবসেরা স্রষ্টা। তাঁর পরিচালিত অধিকাংশ ছবিই আমেরিকায় নির্মিত।

না, তাঁর তো বিশ্বাস ছিল না চরিত্রের নিহিত জীবনে গিয়েই নিয়ে আসতে হবে গহন অভিনয়, লেখকের ধারণায়ুষের বাইরেও নতুন ধরনের কোনো ভাব-মণ্ডল তো তিনি চাননি : তবু আত্মজীবনী রচনা করলেন কেন তিনি—জীবনে কীর্ণ করে দিতে চাইলেন শিল্পের মাত্রা, আয়তন ! স্টানিস্লাভস্কি একদিন অভিনেতার আন্তরিক সত্যে উপনীত হওয়ার কথা বলেছিলেন, চ্যাপলিন কী ভাবলেন তা কেবলি তাঁর আত্মপ্রক্ষেপ, শুধুই তাঁর অহুচিত্তার ফল ? আসলে শিল্পের মতো সত্য তো আপেক্ষিক, ক্যামেরার অবস্থানের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিপ্রেক্ষিত যে দ্রুত বিশ্বয়করভাবে পালটে যায়, দৃশ্যগট বদলে ফিরে আসে। ফরাসি কমেডির ঋপদী ভঙ্গি যেমন সে মুহূর্তে সত্য, তেমনই ইবসেনের নাটকীয় বাস্তবতাও অনূতভাষণ নয় ; কেন না ছুটি দৃশ্যই তখন শিল্পের একান্ত উপস্থিত, ছুটি দৃশ্যই সমান বাস্তবতার বিদ্রম। প্রতিটি সত্যেই তাই সহজ মিথ্যার বীজ উগ্ঠ। আর অভিনয় কেবল বিশ্বাস নয় তাহলে, প্রেম দেওয়া নয় শিল্পকে, বরং ভালোবাসা নিজেকেই, ছোঁ-কাবুকির মুখোশের আড়ালে যে মানুষ, তাকে। এই পররতিময় আত্মকৌড়া চ্যাপলিন ছাড়া আর কার জীবনে, কার অভিনয়ে অথবা। এবং

আত্মজীবনীর প্রচ্ছদ তো এ জগত্ই, রঙিন ছবি ভালোবাসেন না বলেই তাঁর বর্ণিত জীবনে বারবার ফিরে ফিরে আসা।

তবু সে অভিনয় কখনো রীতিমতো শিখতে হলো না চ্যাপলিনকে, শৈশব থেকে অভিনয়ের প্রসারিত হাওয়ায় গাঢ় বড়ো নিঃশ্বাস নিয়েছেন তিনি, প্রাণ ভরে, আর কী চাই : আরও আঙ্গিক চান তিনি, প্রতিভার সমান্তর স্বীকৃতি দেন শিক্ষাকে। কেন না অমনস্কতা অর্ধমনস্কতায় নিজেকে নিয়ত নতুন করে তোলা শিল্পের বড়ো কথা, সেই একশো মজার একুশে আইন তিনি মেনেছেন সারা জীবনে। তাহলেও জগৎজোড়া বা ছড়ানো তাতো অনুভব এবং অনুভব এবং অনুভব, যাকে তিনি দেখেছেন বোকা মানুষের অভিনয়; স্বরচিত আত্মহত্যা কমেডিআনের। মনে আছে মার্ক কনেলিকে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন : অভিনয়ের সামগ্রিক আবেদন হৃদয়ের দিকে, বুদ্ধিদীপ্তির স্থান যেখানে গৌণ। আর হার্ট জেন 'চ্যাপলিনেস্ক' বলে একটি কবিতায় লিখেছিলেন : যদি হৃদয় বেঁচে থাকে তাহলে আমাদের দোষ দিয়ে লাভ কী। নির্জন গলিপথে চন্দ্র এক-পাত্র হাসিতে উপছে পড়ে, একটি শিশুর হারিয়ে যাওয়া কান্না শোনা যায়, অজস্র উচ্ছল সান্ত্বনার মধ্যেও শুরু হয় আমাদের যুক বোঝাপড়া।

এই অবাক শর্তস্বাপন, এই বোবা সন্ধি চ্যাপলিনের নিঃশব্দ কাজ, কর্ম তাঁর, কৃত্য। তিনি জানেন নাটকীয়তা সব কিছু তৈরি করে, খুব শাদাশিধে জিনিশও ঝলমলে এবং জমকালো হয়ে জলে ওঠে হঠাৎ। তাই হুইটম্যানের উচ্চ উচ্চারণ তাঁকে বিরক্ত করে, ভালোবাসার এমন উষ্ণ উৎসার যেন শ্বাসরুদ্ধ করে আনে তাঁর, যেন মরমি ধোঁয়াশার আক্রমণ ঘটে। আর এজগত্ই শেক্সপিয়র আশ্চর্য রকম নিরুৎসাহ করেন তাঁকে, তাঁর অলংকৃত বাগ্মিতায় চালি স্বস্তি পান না, তাঁর কবিত্ব, তাঁর মনস্তত্ত্ব ছাপিয়েও সীমারেখা স্পষ্ট হয়ে থাকে—ডেনমার্কের রাজপুত্রের সমস্তার সঙ্গে একজন সমাধুনিকের দৈনন্দিন জিজ্ঞাসার সেই অবিমিশ্র ভেদ। তবু তা নিয়ে টলস্টয়ের মতো স্পিষ্ট হন না তিনি, শেভিয়ান ব্যপ্তে ক্ষুরধার হন না তাহলেও, কেবল লরেন্স অলিভিয়র তাঁর ধবল টাই নিয়ে তৃতীয় রিচার্ডের রাজত্বে ফিরে গেলে ঐতিহাসিকতা তাঁর বিশুদ্ধ হাস্যোদ্বেগ করে। আইজেনস্টাইনের কবিতাঘন ঐতিহাসিক রস তাঁর যে বিশেষ স্বাদ লাগে না তাও হয়তো এজগত্ই।

শিল্পে প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিচ্ছবি চান তিনি, ইচ্ছে করেন বাস্তবতার বিচ্ছুরণ ধরে রাখতে। গগনময় ধ্রুপদী থিয়েটারের মুক্ত মঞ্চে পাদপ্রদীপের আকস্মিক ঝলকানি তাই তাঁর চোখ ধাঁধায় ; বরং প্রতিক্রিয়াশীল স্বনিকার স্নগ্ধ

প্রধানমন্ত্রীর যে অবিস্থান সম্বন্ধে তাকে তিনি ঠাঁকড়ে ধরেন, কিন্তু কখনোই বিশ্বাসের অক্ষপাত করেন না জ্যামিতিক বিশ্বাসের রুঢ়তায়। তবু আইজেনস্টাইনের মতোই চ্যাপলিন জ্ঞানের ভারি সময়সীমিত তিনি : তাই দ্রুত কাট করে তাঁর ছবি, ক্ষিপ্ৰভাবে দৃশ্য মিলিয়ে যায়। এমন কী সময়ময়ের আন্দোলনকে পর্যন্ত সেই গণ্ডি-জ্যাডো অস্বীকার করতে চান তিনি, কারণ তাঁর প্রাতিশ্রুতিক শিল্পচিন্তা তাঁর বিশিষ্ট অবধারণ সেখানে ব্যক্তিগত এবং সার্বিক, শব্দহীন তবু অবাধ অভিঘাত নিয়ে আসে : দর্শকের দিকে উদাসীন পিঠ ফিরিয়ে বসে থাকে তাঁর ছবির অতিথিরা, নিজেদের মনে স্ফুট খায় ; ওদিকে সোনাটা বেজে ওঠে ভায়োলিনে, তারই ফাঁকে ফাঁকে কোনো মাতাল মানুষের নাক ডাকে। সময় হলো, ওঠা যাক : একজন বলে ; হ্যাঁ, ওঠা যাক : বলে সবাই। আন্তে আন্তে ঘর খালি হয়ে যায়, নিচের গলিতে নেমে যায় গানের শব্দ। গায়ক এক এক করে সব আলো নিবিয়ে দেয়, তারপর সিগারেট ধরায় একটি। মাঝখানের জানালা ভেঙে জ্যোৎস্না নেমে আসে ঘরে, বাইরে গানের স্বর শীর্ণ হয়ে হয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়, পর্দা নেমে আসে ধীরে ধীরে... এই তো চ্যাপলিনের ছবি, এ-ই আলো-ছায়ার পাষণভাঙা, এ-ই নীরবতায় বিনা প্রয়োজনের বীণা বাজানো।

শিল্প নামক শব্দটির ক্লাস্তিকর বন্ধন থেকে তাই তাঁর জীবনের আলোয় আলোয় মুক্তি, নির্বিবোধ রৌদ্রের দিনে বিদেশি ভ্রমণকারীর মতন তাই তাঁর ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে অপর্বাণ্ড পর্বটনে বেরিয়ে পড়া, যেন লাফকাডিয়ো হার্নের বই পড়ে একবার পাক দিয়ে আসা প্রকীর্ণ প্রাচ্যকে। হলিউডের প্রতিস্পর্ধী চিত্রতারকারা যখন পারস্পরিক শীতোত্তাপ বিনিময় করেন তখন প্রক্ষিপ্ত চালি আবার ফেরেন ক্যালিফোর্নিয়ায়, কেন না কাজই আপাতত নতুন তাঁর কাছে, কাজই শেষ পর্যন্ত অভিনব, আর সবই ছায়াময় মরীচিকা। কাজ...সে যেন অষ্টপ্রহর-জাগা সাত্তীর ধারাবাহিক আকাজ্জক একাকী-নিবিড় কিছু দৃশ্য ফিরে পাওয়া : কোনো স্বর্গাস্তের স্বর্ণকণা তা হয়তো, কম্পন হয়তো কোনো অকথিত নক্ষত্রের, শান্ত অবসরের মধ্যে বয়ে-বাওয়া হয়তো কিছু শিল্প-শিহরন। উন্নত অধ্যবসায়ের সেই প্রাপ্তি, উদ্বিগ্ন প্রার্থনায় তার প্রত্যাহার, অপ্রতিহত সহিষ্ণুতায় আবার নির্বাচন : এই ক্রমাগত সঞ্চয় ও ক্রমশ ত্যাগ, এই উৎসাহের আঘাত ও ক্লাস্তির গুস্তধ্বা—বৎসরে বাহান্ন সপ্তাহ এমন আসা ও ফিরে যাওয়া, যেন গিঁট বাঁধা ও জটখোলা কেবলই, যেন প্রবেশ ও প্রস্থান তাঁর বিপন্নবিস্মিত নায়কের। সেখানে বুদ্ধি নির্বোধের ছন্দবেশ, জরুরি অপ্রয়োজনের প্রতিধ্বনি সেখানে। এরকম বৈপরীত্যের সূত্রটিকে তিনি

বিশ্বৃত করেন ট্র্যাম্প চরিত্রে : তোলা প্যান্ট আর আটোপাঁটো কোট, টিলে জুতো আর কাটাইটা টুপি পরা যে মঞ্চ টোকে সে তাই ভবঘুরে ভদ্রলোক, স্বপ্নচারী পোলো খেলোয়াড়, নির্জন চোর, বাউণ্ডলে সংগীত রচয়িতা একজন। তাঁর ছবিও তো সেই সপ্রতিভ অসহায়তার ছবি, এই অপমানিত বর্ম আসলে এক ধরনের তীক্ষ্ণ প্রতিরোধ, এ বস্তুত প্রতিটি সৃষ্টিকর্মের বিনীত ও আন্তরিক স্পর্ধা। না হলে শোপেনহাউএরের মতন স্ব স্ব তো তাঁর কাছে একটি নেতিবাচক সংজ্ঞা হয়ে থাকতো, দুঃখ হতো মর্ষকামনার ব্যাপার মাত্র, ছবির গরিবিমানা হতো নিছক দারিদ্র্য-বিলাস। কিন্তু স্বন্দরও তো তিনি কিছু দেখেছেন, দেখেছেন টেনিস-মাঠে মহিলার ক্ষিপ্র, লাভণ্যময়, সংযত ও সুস্থ যৌনআবেদনময় সঞ্চরণ; লক্ষ্য করেছেন ক্র্যাণ্ডারের ধ্বংসস্থূপের উপর চাষীদের আমূল নিরাসক্ত হাল চালানো; মনে রেখেছেন সেলিনির শিল্পকর্মে লাভণ্যকুক্ষিত বেদনামহিমা। আর তাই তাঁরই পক্ষে সম্ভব সময়ের এমন উন্মোচন, এরকম জীবনের উদ্ঘাটন এতো কৌতুক-সঙ্গত, সুখ এতো সহজ সরল অতি-স্বাভাবিক। কারণ শিল্প তো তাঁর সম্মোহনের ভান, তিনি যে চিত্রাঙ্কিত চ্যাপলিন, ভাঁড়ামো থেকেই যার শীলিত শ্লেষের সূত্রপাত। বাস্তবতার বোধ আর নিরাসক্ত দৃষ্টি দুটোই ভাঁড়ামোতে প্রাথমিকভাবে দরকারি। শ্লেষ মিথকে ব্যাখ্যার সহায়তা করে। কাফকার উপস্থানে আয়রনির যে কাজ চ্যাপলিনের ছবিতেও সেই ট্রাজিক আয়রনি। চ্যাপলিনের ছবি আপাতদৃষ্টিতে অপ্রত্যাশিত যোগাযোগের ফল, তুলনামূলক উদ্দেশ্যহীনতার পরিণাম, বা অপরিণামী সংকল্পের ছবি। একমাত্র আয়রনিক মিথ হিসেবে ব্যাখ্যা করলেই এর গঠনগত দিকটি সরল ও সংবদ্ধ রূপ পায়।

হাসির উৎস কখনো ফুরোয় না। আরিস্তোফেনিস যেখান থেকে মিলিটারি নিয়ে কমেডির মজা বানানোর উপকরণ পেয়েছিলেন চ্যাপলিন সেখান থেকে গ্রেট ডিস্টেক্টর-এর প্রেরণা সঞ্চয় করেছেন।

চ্যাপলিন বা তাঁর ছবির নামককে ALAZON এই একটি শব্দে চেনানো যায়। ALAZON হলো এক প্রত্যারক বা আত্মপ্রত্যারিত চরিত্রের টাইপ, যে কমেডিতে এবং স্টাটাআরে বিদ্রূপের বিষয় কিন্তু ট্র্যাগেডির নামকও বটে।

চ্যাপলিনের ছবিতে সরলীকরণের একটি সূত্র প্রযুক্ত হয়েছে। অপেরায় যেমন মূর্ছনাকে ভেঙে ভেঙে সহজ করে সাজানো হয়, চলচ্চিত্রেও এটা দরকার। চ্যাপলিন তা প্রথম বুঝেছিলেন। চ্যাপলিনের দৃশ্য পরম্পরা থেকে তা স্পষ্ট। এই সরলীকরণের জন্য তাঁর ছবি কিছুটা পুতুলনাচের লক্ষণে আক্রান্ত।

চ্যাপলিন পৃথিবীর সবচেয়ে আলোচিত চলচ্চিত্রশিল্পী। পুরস্কার, সম্মান (নাইটছড অর্ডার), বিতর্ক—সবকিছুতেই তিনি শিরোনামে। উল্লেখযোগ্য ছবি : দি কিড (২০), দি গোল্ডরাশ (২৫), সিটি লাইটস (৩১), মডার্ন টাইমস (৩৬), দি গ্রেট ডিক্টেটর (৪০), মিসিয়ে ভেদু' (৪৭), লাইমলাইট (৫২), এ কিং ইন নিউইয়র্ক (৫৭), এ কাউন্টেস ফ্রম হংকং (৬৬)।

রচিত গ্রন্থ : মাই অটোবায়োগ্রাফি, মাই লাইফ ইন পিকচারস্।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : থিয়োডোর হাফের চার্লি চ্যাপলিন।

## বীভূশোক ভট্টাচার্য

॥ ক্রিস্তফ জাহুসি ॥

(জন্ম ১৯৩৯, পোল্যান্ড)। ১৯৫৫ থেকে ৫৯ পর্যন্ত ওয়ারশ বিশ্ববিদ্যালয়ে জাহুসি ছিলেন পদার্থবিদ্যার ছাত্র। এই সময় থেকেই তিনি চলচ্চিত্রে শিক্ষালাভ করেছেন, ৫৯ থেকে ৬২ ক্রাকোতে দর্শন পড়েছেন। ৬০ সালে স্টেট ফিল্ম স্কুল লোজ্-এর পরিচালনা বিভাগে যোগ দিয়েছেন। ৬ বছর পরে Death of the Provincial ছবি করে তিনি ডিপ্লোমা পেয়েছেন। ঐ ২৮ মিনিটের ছবিটা ভেনিস ম্যানহাইমে পুরস্কৃত হয়েছে। ইতিমধ্যে বার্গম্যানের ছবি লোজ্ ফিল্ম স্কুলের এই স্বাতন্ত্র্যকে উদ্দীপিত করে তোলে। ৬৭ সালে টেলিভিশনের জন্ম জাহুসি একটা ২৫ মিনিটের ছবি করলেন Face to Face. ৬৮-তে একটা ২৮ মিনিটের ছবি Attestation- তাঁর প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি 'দি স্ট্রাকচার অব ক্রিস্টাল' ৬৯ সালের ছবি। ৭৭ মিনিট। তাঁর এর পরেকার ছবিগুলো নিচে উল্লেখ করছি—

১৯৭০	মাউন্টেনস্ এন্ড ডান্স	২৭ মিনিট : টিভি.
১৯৭১	ফ্যামিলি লাইফ	৯২ মিনিট
১৯৭১	রোল	২৮ মিনিট : টিভি.
১৯৭১	বিহাইণ্ড দি ওয়াল	৫৮ মিনিট : টিভি.
১৯৭২	হাইপোথিসিস	২৮ মিনিট : টিভি.
১৯৭৩	ইলুমিনেশন	৯১ মিনিট
১৯৭৪	ক্যাটাওয়াউট কিলিং	১২০ মিনিট
১৯৭৫	ছ ব্যালাঙ্গ	৯৮ মিনিট
১৯৭৭	ক্যামোফ্লেজ	১০৬ মিনিট
১৯৭৮	স্পাইরাল	৮৬ মিনিট

‘ডেথ অব দি প্রভিনশিয়াল’ ও ‘দি কাটামাউন্ট কিলিং’ ছবি দুটি ছাড়া ১৯৭৮ পর্যন্ত তাঁর নির্মিত সব ছবিই প্রযোজনা করেছেন ফিল্ম পোলস্কির পক্ষে ‘টর’ ফিল্ম ইউনিট। পোলাগে চলচ্চিত্রের নবজাগরণের ক্ষেত্রে এই ইউনিটের দান অসামান্য। পরীক্ষামূলক বহু বিতর্কিত ছবি এই ইউনিট প্রযোজনা করেছে।

জানুসি বলেছেন, ‘ওয়ারশ অভ্যুত্থানের সময় আমার বয়স মাত্র পাঁচ বছর। ওই সময়ের কোনো কথা আমার মনে নেই। আমার থেকে বয়সে কিছু বড়ো বন্ধুদের মধ্যে ওই সময়ের কিছু ছাপ রয়ে গেছে—কিন্তু আমার নয়।’ ‘স্ট্রাকচার অব ক্রিস্টাল’ই পোলিশ চলচ্চিত্রে এক নতুন শক্তিরূপে জানুসিকে প্রতিষ্ঠিত করে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় চিত্রিত জানুসির চলচ্চিত্রের দৃশ্যাবলী। এরিক রোহ্মের প্রসঙ্গের সীমানা যেখানে সাহিত্যিক, সেখানে জানুসির জ্যামিতিক। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর সময়ে তাঁর দেশের বৈজ্ঞানিকেরা যেসব সমস্যা সংকটের মুখে দাঁড়িয়েছেন জানুসি সেগুলোই তুলে ধরেছেন। ব্যক্তিজীবনে বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়েই জানুসির সমাজ চেতনার বিকাশ। ‘স্ট্রাকচার অব ক্রিস্টাল’ বাকসংঘমে চেতনাকে মনে পড়িয়ে দেয়। ভাইদার উত্তরাধিকার থেকে এক সূনির্দিষ্ট দূরত্বে জানুসি পোলিশ চলচ্চিত্রে ঋজু বিষয়বস্তুর পরিধি বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর এই প্রথম ছবিতেই।

মারেক এবং ইয়ান দুজনে কলেজে বিজ্ঞানের সহপাঠী ছিল। আজ দুজনেরই বয়স বেড়েছে। বয়সের সঙ্গে বেড়েছে জীবন সম্পর্কিত তাদের আদর্শগত ব্যবধান। তুষারানুত এক বিচ্ছিন্ন শহরতলির দূর উচ্চ স্তূমিতে বিবাহিত ইয়ান আবহাওয়া-বিশারদের কাজ করে। স্ত্রী এয়ানকে নিয়ে সে সহজ জীবনযাপন করে। বন্ধু মারেক এখন পদার্থবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক, নিজের গাড়ি চালিয়ে উঠে আসে ইয়ানের বাড়ি। ইয়ান ধীর স্থির গভীর কর্তব্যপরায়ণ অতিথিবৎসল, বিজ্ঞানের প্রতি নৈতিক দায়িত্বে আবদ্ধ। চরম পেশাদারী সততায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী মারেক অর্থনৈতিক সফলতাকেই বড়ো করে চাখে। এয়ানের কাছে বহির্বিষয়ের গতি ও উত্তেজনা নিয়ে আসে মারেক। একটা স্থানীয় স্কুলে মারেককে পরিচিত করান হয়। মারেক তার ভাষণে জানায়, আমরা এখন ডায়মণ্ড তৈরি করছি। একটা সময় আসবে যখন আমাদের তৈরি জুয়েলারীই লোকে ব্যবহার করবে। অবশ্যই যা কৃত্রিমভাবে তৈরি। সেদিন মানুষ ছাড়িয়ে যাবে প্রকৃতিকে। খাঁটি ও কৃত্রিম ক্রিস্টালের বৈপরীত্য যেন সমান্তরাল মারেক ও ইয়ানের অবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গি। স্বাধীনতা সম্পর্কে একটা তুল ধারণার ওপর দাঁড়িয়ে আছে মারেক। বড়ো বেশি-

ব্যস্ত খ্যাতির প্রতিযোগিতায় নিজেকে টিকিয়ে রাখতে। ইয়ান ঐ শূন্যতায় কাজের জগতে জীবনের অর্থ খুঁজে বেড়ায়। এই জগতের বাইরে এমন সব জগৎ আছে যাদের আলো দূরবীণ দৃষ্টির অতীত। সান্ত সসীম ও অনন্ত অণীমের আলোচনায় মিলছে না দুজনের কোথাও মিলছে না।

অসাধারণ জ্ঞানুসির সাংগঠনিক ক্ষমতা। মাত্র চার বছর সময়ের মধ্যে জাহ্নুপি ওয়ারশ এবং লোজ্-এর চলচ্চিত্রে সংশ্লিষ্ট সমস্ত লোকদের বিস্মিত করে পোলাগের চলচ্চিত্র জগতের অল্পতম পুরোধা হয়ে ওঠেন।

তঁার চলচ্চিত্রে বারবার দেখেছি আমরা বিজ্ঞানের প্রতি তঁার প্রবল আকর্ষণ। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, আমার জীবনের অভিজ্ঞতাই তো সীমাবদ্ধ। বলা যায় এই বিশেষ সামাজিক শ্রেণী অন্ধি। অল্প শ্রেণীর কথা বলার চেয়ে যা জানি এটা বর্ণনা করাই আমার কাছে অনেক বেশি স্পষ্টের। যেহেতু আমি খেটে খাওয়া মজুর নই সেজন্তে ভ্রমজীবী মানুষ নিয়ে আমার ছবি করাটা হাঙ্গর হয়ে যাবে, ওটা একটা সৌখিনতা একটা ভ্রমগবিলাস ছাড়া আর কিছু নয়। বুদ্ধিগত এবং আবেগগত দু দিক থেকেই এতে তাদের অপমান করা হয়। নিজেকে তো বটেই। যেসব লোককে আমি সত্যিকারের চিনি তাদের মধ্যেই আমি নিজেকে সীমিত রেখেছি।

১৯৭৮-এর পরও অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য ছবি করেছেন তিনি, 'দি কনস্ট্যান্ট ফ্যাকটর', 'কনট্র্যাকট ড্রাম এ ফার কান্ট্রি', 'হোয়ারেভার ইউ আর', 'দি সাইলেন্ট টাচ'।

জাহ্নুপি বিশ্বাস করেন বিজ্ঞানীদের। সাধারণের চেয়ে তাঁদের জ্ঞান, তাঁদের বোঝার ক্ষমতা, তাঁদের দায়িত্ববোধ অনেক উঁচুতে। জাহ্নুসির চিন্তাজগতে তাঁরা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মনে প্রবল জাগে, শিল্পীর জীবন, খেলোয়াড়ের জীবনের সঙ্গে একজন বৈজ্ঞানিকের জীবনই কি সবচেয়ে আকাজক্ষিত নয়? তবুওলোই যদি ভুল হয়ে যায়, পদার্থবিজ্ঞানে লম্বা একটা কেরিয়ার কখনই বানানো যায় না। ক্ষমতাবান বন্ধু-বান্ধব মামা-কাকারাও তা করে দিতে পারে না। প্রতিভার পরিচয় দিতেই হবে, চারিত্রের পরিচয় দিতে হবে। সেজন্তেই বিজ্ঞানীরা সমাজে একটা মর্যাদাপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছে। তাঁর স্বদেশবাসী তাঁর ছবিতে জাহ্নুসির বিষয় খুঁজে পেলে তিনি খুশিই হন। 'নীতি' একটা প্রচণ্ড শব্দ, একটা অতীব কার্যকর শব্দ। জাহ্নুসি দেখতে চান মানুষ কিভাবে শ্বাস প্রশ্বাস নেয়, কি করে তারা তাদের আদর্শকে উপলব্ধি করে। জাহ্নুসি মনে করেন, আমাদের স্বাধীনতার

অধিকার আমরা যতটা ভাবি তার চেয়ে অনেক সীমিত। ভুল আন্দোলনে আমাদের সবচেয়ে বেশি দাম দিতে হয় আত্মকবচের জগত। যদি আশা আছে, জীবনের মানে আছে, যদি কেউ এই আশাটা হারিয়ে ফ্যালে জীবনটাই দিশাহারা হয়ে যায়। ‘পরম’ শুধু একটা মনস্থিতার লক্ষ্য মাত্র নয়, একটা বাস্তব লক্ষ্যও হতে পারে, যদিও সেই অতীষ্ট সাধন অসম্ভব, সেই পরম সিদ্ধি আসে না।

একদা এক সাংস্কারে ‘ইলুমিনেশন’ ছবিতে একজন নন-প্রফেশনাল ব্যবহার করার কথা ওঠাতে জানুসি যা বলেছিলেন, সেখানেই রয়েছে জানুসির ছবির গভীরতর উপলব্ধি। জানুসি বলছেন, সে ছিল আমার ছবির চরিত্রটার সঙ্গে একেবারে একরকম। আরো বিস্ময়কর হচ্ছে, ব্যক্তিগত জীবনে সে তার জীবন শেষ করছে নাটকীয়ভাবে। ছবির গুটিংয়ের সময় পাহাড়ে চড়া ওকে পেয়ে বসে। ছবি ঘিরে যে-মিথ্ সে তৈরি করেছে, তারও সে আংশিক শিকার হয়। পোলাণ্ডের হিমালয় অভিযাত্রী দলে যোগ দিয়ে সে মারা যায়।

অদ্ভুত সব ঘটনা আছে এর মধ্যে। বড়ো বিষয় বড়ো অস্থির করে দেয়। আবার কি একটা জেগেও ওঠে। ওর হিমশীতল কঠিন মৃতদেহটি পাওয়া যায়। অভিযাত্রী দলের অগোচর তার দেহটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। তারা দেখতে পায়, ওর শেষ সিদ্ধান্ত, শেষবার ও যে-দিকটা নিশানা করে এগোতে যায়, তাতে মনে হয় সে আর একজনের তার নিজের কাঁধে নিতে চাইছিল যে কয়েক মিটার আগে কোথাও আটকে গেছে। যখন তাদের বাকি দুজন উঠছে, ও, মোটেই দক্ষ পর্বতারোহী নয়, মাত্র কিছুদিন হলো ও এসব শিখছে, হঠাৎ ঝুঁকি নিয়ে নিল, বলল, ‘ওর কি হলো দেখতেই হবে’ ওর সঙ্গী ওকে বলল, ‘এরকম বোকামি করো না’ কিন্তু সে তো ছাড়বে না, সে শক্ত হয়ে উঠল, সে যা করার করবেই, করলও, নিজের জীবনের মূল্যে এটা তাকে করতে হলো। তবু এর মধ্যে একটা আশা রয়েছে। আমি কল্পনা করছি, একটা লোক ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে, তার দম বন্ধ হয়ে আসছে, সে মৃত্যুভয়ে সন্ত্রস্ত, প্রাণভয়ে ভীত জন্তুর মতো তার আচরণ করার কথা, এবং নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্তে যে কোনো রকমের কাজ করার কথা, কিন্তু ওর ঘটনাটা থেকে মনে হয়, ও এসব কিছুই করেনি। কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থেকে আমরা এরকম অনেক ঘটনা জানতে পারি যেখানে কিছু লোক শুধু তাদের নিজেদের মর্যাদাই রক্ষা করেনি, গোটা মানব জাতির মর্যাদা বাঁচাতে চেয়েছে, একটার পর একটা কাজের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, শ্যাম নীতির কথা ভেবেই। এসবগুলোই প্রমাণ করে এভাবেই আমরা এগিয়ে আসছি। খালি খালি ওর কথা মনে পড়ে।

মৃত্যুর প্রতি ওর কোঁতুহল, সম্ভবত: জাহ্নসিরও কোঁতুহল, সবই সত্যি হয়ে  
ষায় সিনেমায় ও জীবনে ।

প্রায় শূন্য

## ॥ জাপান ॥

জাপানে ১৮৮৬-তে স্লাইড শো ও ১৮৯৩-তে কিনেমাটোগ্রাফ শোর প্রচলন, এবং  
১৮৯৬য়ে এডিনবের কাইনেটোস্কোপ যন্ত্রের আবির্ভাব হয়। এর পরের বছর  
লুমিয়ের-চলচ্চিত্রের প্রদর্শন শুরু হয় এখানে। যে প্রদর্শনীতে একবার দেশের  
রাজকুমার নিজে উপস্থিত ছিলেন। এইসব নির্বাক ছবির কাহিনীসূত্র বর্ণনার মধ্য  
দিয়ে দর্শকদের বুঝিয়ে দেবার জ্ঞান ঘোষক ও প্রয়োজন মতো আবহ সংগীত তৈরি  
করতে বাদকদের সাহায্য নিত সিনেমা হলগুলো। ক্রমে জাপানে চলচ্চিত্র নির্মাণ  
শুরু হলো, শুরু করলেন Shibata, ১৯০৮য়ে প্রথম ফিল্ম স্টুডিও স্থাপন করলেন  
Kawaura। Umeya-র ছবিতে কাহিনীসূত্র পরিচয়লিপির মাধ্যমে প্রকাশ  
করার চেষ্টা দেখা গেল। জাপানের প্রারম্ভিক ছবিগুলোকে এই দুই ভাগে ভাগ  
করা যায়, বাস্তব ও তথ্যের যথাযথ চিত্রায়ণ, আর গল্প বা নাট্যশৈলী নির্ভর চিত্র।  
উভয় ধরনের ছবিতেই ক্যামেরার কোনো মুভমেন্ট থাকত না, সম্পাদনার নিজস্ব  
রীতিও ছিল অজানা। ক্যামেরা ও সম্পাদনার ভাষাকে আয়ত্ত করে প্রথম পূর্ণাঙ্গ  
পরিচালক হয়ে উঠলেন Makino যার দি লয়াল ফোর্টসেভেন রনিন (১৯১৩)  
ছবিটি উল্লেখযোগ্য। ক্রমে ছবিতে ক্লোজ আপ, বিশেষ ধরনের কাটিং, তথাকথিত  
ক্ল্যাশ ব্যাক ও ফ্রেমগুলিকে রঙের মাধ্যমে টিণ্ট করার প্রচলন দেখা দিল। প্রথম  
বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী বছরগুলিতে জাপানি চলচ্চিত্রে বিষয়বস্তু ও কলাকৌশলের  
প্রদারতা এল, তলস্তয়ের রেজারেকশন অবলম্বনে ছবি নির্মিত হলো, দেশের  
প্রথম চলচ্চিত্র পত্রিকা ফিল্ম রেকর্ড ও চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ দি প্রোডাকশন  
অ্যাণ্ড ফটোগ্রাফি অব মোশন পিকচার ড্রামা প্রকাশিত হলো। প্রকাশিত হলো  
আরও একটি সিনেমা পত্রিকা কিনেমা জাম্পো। আমেরিকা থেকে চলচ্চিত্রের  
কলাকৌশল সম্পর্কে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত বেশ কিছু জাপানির স্বদেশে  
প্রত্যাবর্তন প্রযোজনার মান উন্নত করল। সব মিলিয়ে জাপানে ধীরে ধীরে কিন্তু  
স্বনিশ্চিতভাবে জাতীয় সিনেমার উন্মেষ ঘটলো। প্রেক্ষাপটে আবির্ভূত হলেন  
মিজোগুচি। এতদিন জাপানি চলচ্চিত্রে দুই ধরনের বিষয়বস্তুর প্রাধান্য ছিল—  
বিশেষ যুগের কাহিনী ও আধুনিক কালের গল্প। ১৯২৩য়ে টোকিওয় বিকসংসী

ভূমিকম্পের পর যখন প্রায় নতুন করে আবার চলচ্চিত্রশিল্পের যাত্রা শুরু হলো তখন আধুনিককালের অর্থনৈতিক ও সামাজিক দমস্কা বেশি গুরুত্ব পেতে লাগল। এই ধরনের ছবির নাম হলো টেনডেনসি ফিল্ম। এ ছাড়াও এল বাস্তবধর্মী কমেডি। এলেন কিহুগাশা; বাস্তব ও বিভ্রমের চমৎকার সংমিশ্রণ ধীর ছবিকে অল্প স্বাদ ও শক্তি দিল। সামাজিক-রাজনৈতিক তথ্যচিত্রের ও টেনডেনসি ফিল্মের প্রগতিশীল রাজনৈতিক মতবাদের প্রভাব এর প্রায় চল্লিশ বছর পর চূড়ান্ত সৃষ্টিশীল রূপ পাবে। তিরিশের দশকে চলচ্চিত্রে শব্দের আগমন হতে, প্রথম উল্লেখযোগ্য সবাকচিত্র দি নেবার'স ওয়াইফ অ্যাণ্ড মাইন। নির্বাক যুগ থেকে সবাক যুগে আসার কালে ও কাজে শোচিকু কামাতা স্টুডিওর বিশেষ ভূমিকা ছিল। এই সংস্থা বহু নতুন ছবি প্রযোজনা করল, নতুন নতুন পরিচালকের আবির্ভাব ঘটল, তারকাদের জন্ম দিল। এলেন ওজু, শিমাছু, তোরািজিরো, হিনোসুকে। এই দশক ওজুর আবির্ভাবের কাল। যেমন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কুরোশাওয়ার আবির্ভাব হলো। যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ভেনিসে রশোমনের সাফল্যে (১৯৫১) ও কানে কিহুগাশার মুঞ্চকর রঙিন ছবি গেট অব হেল-এর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভে (১৯৫৪) জাপানি চলচ্চিত্র সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী আগ্রহ দেখা দিল। কুরোশাওয়ার ছবির রূপদী শক্তি ও চেতনা, যিজোজির ছবির চিত্রশিল্পময়তা, ওজুর ছবির ধীর স্থির শান্ত, আনন্দ ও দুঃখ সমাকীর্ণ পারিবারিক জগৎ, ইচিকাওয়ার ছবির অসাধারণ আত্মবিশ্বাস ও বলিষ্ঠ প্রত্যয় জাপানি চলচ্চিত্রের চূড়ান্ত সৃষ্টির প্রমাণ। যে সমৃদ্ধি সত্তরের দশকে এসে সহযাত্রী হিসেবে পেল বামপন্থী রাজনৈতিক কমিটমেন্টকে। ওশিমার ছবিতে সেই সমাজচেতনা ও সমৃদ্ধ শিল্পিতার সবচেয়ে সুষম দময়য় ঘটেছে। যে কথা আগেই বলেছি টেনডেনসি ফিল্মের ভাবধারার নবজীবন ঘটল এইভাবে: নবতর প্রজন্মের পরিচালকদের (যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইনাগাকি, কোবায়ামাশি, হানি, শিন্দো, তেশিগাহারা, শিনোদা) সৃষ্টির মধ্য দিয়ে জাপানি চলচ্চিত্রের সৃষ্টিশীলতা ও জাতীয় স্বাতন্ত্র্য আজও অক্ষুণ্ণ আছে। ওশিমার একটি ছবির নামকরণের মধ্য থেকেই যেন বর্তমান অবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে—*The Man who Left his Will on Film*. [জাপানি চলচ্চিত্রের মর্মেদঘাটন করতে গিয়ে সত্যজিৎ জাপানি শিল্পের অগ্নিগর্ভ প্রশান্তির উল্লেখ করেছিলেন। এই দ্বিধাসমতা ও উভযোজ্যতার ব্যাপারটি জাপানি চলচ্চিত্রে বিশেষভাবে বর্তমান। যেমন জাপানি টেলিভিশন ও সিনেমায় আর্কিটাইপ নায়ক-চরিত্র হলো তোরা-সান, এক ভবঘুরে ফেরিওলা। দ্বামাদা মোজি-স্ট্র এই

চরিত্রটিকে নিয়ে অসংখ্য টিভি সিরিয়াল ও ফিল্ম নির্মিত হয়েছে এবং দারুণ ব্যবসায়িক সাফল্য পেয়েছে। এই জনপ্রিয়তার মূল কারণ হলো ওই চরিত্রটির মধ্যেই রয়ে গেছে বিপ্রতীপতার উপাদান, তার কাহিনীগুলিতে ঘটেছে দুঃখ-বেদনা ও হাশ্বরসের অনবচ্ছিন্ন সহাবস্থান।]

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : ডোনাল্ড রিচার জাপানিজ সিনেমা : ফিল্ম স্টাইল অ্যাণ্ড ক্র্যাশনাল ক্যারেকটর ।

মৃগাঙ্কশেখর রায়

## ॥ জার্মানি ॥

জার্মানিতে সর্বপ্রথম দর্শনী নিয়ে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়েছিল বেলিনে— ১৮৯৫ সনের ১লা নভেম্বর। উদ্বোধনা ছিলেন মাক্স এবং এমিল স্ক্‌লাদানভ্‌স্কি ভ্রাতৃদ্বয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, এর বেশ কয়েক সপ্তাহ পরে পারীতে লুমিয়ের আয়োজিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৯৬ সন থেকেই জার্মানিতে চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হয় অস্কার মেস্টার-এর উদ্বোধনে। ১৯১০ সন নাগাদ তাঁর এবং পাউল দাভিডজোনের প্রযোজনা সংস্থা দুটি জার্মানিতে নিয়মিতভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণ করত। ১৯১৩ সনে দাভিডজোনের সংস্থায় এসে যোগ দিলেন ভিয়েনার বিখ্যাত নাট্যপরিচালক মাক্স রাইনহার্ট। এঁদের দুজনের যোগাযোগ জার্মান চলচ্চিত্রের ইতিহাসের প্রথম যুগের একটি অরণীয় ঘটনা এবং এঁদের যৌথ প্রয়াস জার্মান চলচ্চিত্রকে বেশ কিছু দূর এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। ১৯১১ সনে দাভিডজোনের আমন্ত্রণে ডেনমার্কের অভিনেত্রী আর্স্টা নীলসেন এবং তাঁর স্বামী চলচ্চিত্র পরিচালক উরবান গাড্‌ বেলিনে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। এই সময়ের আর একজন বিখ্যাত অভিনেত্রী হেনী পোর্টেন। জার্মান চলচ্চিত্রের প্রথম যুগের ইতিহাসে এঁদের প্রত্যেকের অবদান রয়েছে।

এ যুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে স্টেলান ক্যাই-এর 'ডেয়ার স্টুডেন্ট ফন প্র্যাগ' ( ১৯১৩ ), পাউল হেগেনার ও হেনরিক গালেনের 'ডেয়ার গোলেম' ( ১৯১৪ ) এবং অটো রিপার্ট-এর 'হোমুনকুলুশ' ( ১৯১৬ ) অত্যন্তম।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলো ১৯১৪ সনে। ১৯১৬ সনে তৎকালীন জার্মান সরকার-এর উদ্বোধনে স্থাপিত হলো 'ডয়লীগ' এবং 'রুফা' নামে দুটি চলচ্চিত্র প্রযোজনা সংস্থা—উদ্দেশ্য জার্মান সমরান্ধিয়ান-এর পক্ষে জনমত গড়ে তোলা ও প্রচার চালানো। ১৯১৭ সনের নভেম্বর মাসে উপরোক্ত দুটি সংস্থা এবং আরো অনেক

ছোট বড়ো চলচ্চিত্র প্রযোজনা সংস্থা-কে এক করে গড়া হলো 'উফা' যা বিশ এবং তিরিশের দশকে জার্মানিতে চলচ্চিত্র প্রযোজনার ক্ষেত্রে একটি অবিস্মরণীয় ভূমিকা নিয়েছিল।

১৯১৮ সনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলো। জার্মানি পরাজিত। কিন্তু সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী এক দশকে জার্মানির অবদান অস্বাভাবিক — ফিল্ম-ও এর ব্যতিক্রম নয়। ১৯১৯ সনে রোবার্ট হিনে-র ছবি 'দাস্ ক্যাবিনেট দেস্ ডক্টর কালিগারি' জার্মান-চলচ্চিত্রকে বিশ্ব চলচ্চিত্রের দরবারে চিরস্থায়ী আসন এনে দিল। বস্তুতঃ এই ছবিটি দিয়েই জার্মান চলচ্চিত্রের স্বর্ণ যুগের শুরু। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, চলচ্চিত্র মাধ্যমের ক্ষেত্রে 'এক্সপ্লেসিভিভিস্'-এর সার্থক ও সফল প্রয়োগের দৃষ্টান্ত এই ছবিটি। 'ডক্টর কালিগারি' থেকে যে ধারার শুরু সেই ধারাই ১৯২৪/২৫ সন পর্যন্ত—এমনকি তার পরেও—জার্মান চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রধান ধারা হিসেবে বিদ্যমান ছিল।

এই ধারার সরণী দিয়েই জার্মান চলচ্চিত্রকে উত্তরোত্তর সার্থকতার দিকে নিয়ে গেছেন যেসব চলচ্চিত্রকার তাঁদের মধ্যে অত্যন্ত হলেন ফ্রিড্‌রিখ্‌ হিল-হেলম্‌ মুরনাউ, ফ্রিৎস্‌ লাঙ, পাউল লেনি, লুপু পিক, এভাল্ড আন্ড্রে ডুপন্ট, কার্ল গ্রুনে এবং আর্টুর রবিনজোন। এ যুগের কালজয়ী চলচ্চিত্রের মধ্যে মুরনাউ-এর 'নসফেরাট্টু' (১৯২২/২৩) এবং 'ডোয়ার লেংজ্‌টে মান্' (১৯২৪), লাঙ-এর 'ডোয়ার ম্যুডে টোড' (১৯২১), 'ডক্টর মারুজে' (১৯২২), এবং 'মেট্রপোলিস' (১৯২৭), লেনি-র 'হ্যান্স্‌ফিওরেন্‌ কাবিনেট' (১৯২৪) উল্লেখ্য।

এই ধারার পাশাপাশি থেকেও আপন বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ ছিলেন আর দুজন চলচ্চিত্রকার—এর্নস্ট লুবিৎশ আর গেরগ হিল্‌হেলম্‌ পাব্‌স্ট। ১৯১৯ সনে লুবিৎশ-এর তোলা ছবি 'মাদাম দুবারী' 'ডক্টর কালিগারি'-র সাথে জার্মান চলচ্চিত্রকে বিশ্বদায় আসন পেতে সহায়তা করেছিল। পাব্‌স্ট জার্মান চলচ্চিত্রে যে ধারার অত্যন্ত স্রষ্টা সেই ধারাকে গুস্তাফ হার্টলাউফ্‌ নাম দিয়েছেন 'নয়া বাস্তবতা'। এঁর তোলা নির্বাক ছবিগুলির মধ্যে অত্যন্ত হলো 'ডী ফ্রয়েডলোজে গাসসে' (১৯২৫)। এই ধারার সম্পর্কে বলতে গিয়ে অবশ্যই আর দুটি ছবি-র কথা আসবে—হ্যান্স্‌টার রস্ট্‌মান্-এর ডকুমেন্টারি ধরনে তোলা 'বেলিন—ডী সিম্ফোনি আইগার প্রোস্টাড্‌' (১৯২৭) এবং রোবার্ট জিয়াডমাক্‌-এর 'মেন্‌শেন্‌ আম্‌ জন্টাগ্‌' (১৯২৮)।

বিশ দশকের শেষেই জার্মান চলচ্চিত্রের গরিমাময় দিনগুলো শেষ হয়ে

আসছিল। জার্মানির সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাও ক্রমশঃ অশান্ত হয়ে উঠছিল। জার্মানির রাজনৈতিক অস্থিরতাকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতা দখলের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন আডল্ফ্ হিটলার এবং তাঁর নাৎসি দল।

এমনি অস্থির অশান্ত দিনগুলোতে, যখন জার্মান চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে তাঁটার যুগ, তখন জার্মান চলচ্চিত্রে শুরু হলো শব্দ ও ধ্বনির ব্যবহার। সবাকযুগের জার্মান চলচ্চিত্রের অগ্রতম হলো য়োজেফ্ ফন্ স্টেয়ার্নবের্গ-এর 'ডেয়ার রাউয়ে এঙ্গেল' (১৯৩০), লাঙ্-এর 'এম্' (১৯৩১) এবং পাব্ স্ট-এর 'হেস্ট্ ফ্রন্ট ১৯১৮' (১৯৩০), 'কায়েরা দশাফট্' (১৯৩১) এবং 'ডী ড্রাইথ্রোশেন্ ওপ্যার' (১৯৩১)।

১৯৩৩ সালের ৩০শে জানুয়ারি জার্মানির ভাগ্যানিয়ত্তা হলেন আডল্ফ্ হিটলার। জার্মান চলচ্চিত্র হয়ে পড়লো পুরোপুরি ভাবে হিটলার-এর প্রচারসচিব য়োজেফ্ গ্যোবেল্-এর করত্ববাহী। তার গরিমাময় যুগ শেষ হলো।

নাৎসি আমলে, ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫ সন পর্যন্ত, জার্মান চলচ্চিত্রের ইতিহাস সম্পর্কে বিখ্যাত সমালোচক রোজার মানভেল্ বলেছেন যে কেবলমাত্র দুটি ছবি লেনী রিফেনস্টাল্-এর 'ডেয়ার টিউম্ দেস্ স্লিলেন্' (১৯৩৫/৩৬) এবং 'ওলিম্পিয়াড' (১৯৩৮) ছাড়া আর কিছু মনে রাখার মতো নেই। চলচ্চিত্র মাধ্যমকে ব্যবহার করে যা হয়েছে তা কেবলমাত্র নাৎসি প্রচার ছাড়া আর কিছু নয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলো ১৯৪৫ সনে। জার্মানি পরাজিত এবং পূর্ব ও পশ্চিমে দুটি রাষ্ট্রে দ্বিধাবিতক্ত। চলচ্চিত্র শিল্প অল্পদিনের মধ্যেই পুনর্গঠিত হলো পূর্ব জার্মানিতে। ১৯৪৬ সনে সরকারি উদ্যোগে স্থাপিত হলো চলচ্চিত্র প্রযোজনা সংস্থা 'ডেফা'। সোভিয়েত যুনিয়ন থেকে ফিরে এসে বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার জুঁটান ডুডভ যোগ দেন 'ডেফা' সংস্থাতে। যুদ্ধের ঠিক পরবর্তী বছরগুলিতে জার্মান চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একমাত্র উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল 'ডেফা'-র ছবিগুলির, যার মধ্যে অগ্রতম হচ্ছে হবল্ফ্ গাদ্ স্টাউটে-র 'ডী মারডার জিণ্ট উণ্টার উনস্' (১৯৪৬), কুর্ট স্যোচজিক্-এর 'এয়ে ইম্ শাটেন্' (১৯৪৭) এবং এরিখ্ এঙ্গেল-এর 'আফোরেরে রুম্' (১৯৪৬)। পূর্ব জার্মানির দ্বিতীয় প্রজন্মের পরিচালকদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন কনরাড্ হবল্ফ্, এগন গুস্কার এবং ফ্রাঙ্ক বায়ার। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে কনরাড্ হবল্ফ্-এর পরিচিতি বহির্বিধে অপেক্ষাকৃত বেশি। হবল্ফ্-এর সবচেয়ে পরিচিত ছবিগুলির মধ্যে অগ্রতম 'প্রোফেসর মামলক্' (১৯৬০/৬১) এবং 'ডেয়ার গেটাইল্টে হিম্মেল' (১৯৬৩/৬৪)। পূর্ব জার্মানির

এই ছবিগুলিতে প্রাধান্য পেয়েছিল সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা, নাৎসি বিরোধী আন্দোলনের কথা, নাৎসি আমলের ইহুদী নির্যাতন আর কখনো কখনো দুই ভাগে বিভক্ত জার্মানির সাধারণ মানুষের মর্মবেদনার কথা ।

এ তুলনায় পশ্চিম জার্মানিতে চলচ্চিত্রের ইতিহাস, অন্তত: ১৯৫৮ সন পর্যন্ত, অকিঞ্চিৎকর বললেও অত্যুক্তি হয় না । খুব সম্ভবত: একমাত্র ব্যতিক্রম বেয়ার্নহার্ট হিবকী-র 'ডী ক্রকে' ( ১৯৫৯ ) । কিন্তু এর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই—১৯৬২ সনে—ওবারহাউজেন মানিফেস্টো নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন তরুণ পরিচালকদের একটি গোষ্ঠী—যার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আলেকজান্ডার ক্লুগে, এডগার রাইৎজ্, পেটার এবং উলরিখ্ শার্মোনী, জ' মারী স্ট্রাউব, হিম্ম হেগার্স, ফোস্কার স্লোয়েনদর্ফ, রাইনার হেন্নার ফাসবিগার এবং হেন্নার হোরজগ্ । এঁদের মধ্যে সর্বাঙ্গী পরিচিত হলেন শেষোক্ত তিনজন । যে পরিচিতি তাঁরা পেয়েছিলেন সত্তরের দশকে । ওই দশকের শেষাংশে আরও এলেন রাইনহার্ড হাউফ ও মার্গারেট ফন টোটা ।

চলচ্চিত্র সমালোচক জেরাল্ড ক্লার্ক-এর মতে পঞ্চাশের দশককে যদি চিহ্নিত করতে হয় ইতালির 'নিও-রিয়ালিজম্' প্রভাবিত চলচ্চিত্রের দশক হিসেবে, ষাট-এর দশক যদি চিহ্নিত হয় ফ্রান্সের 'নুভেল ভাগ' চলচ্চিত্রের দশক হিসেবে, তবে সত্তর দশক চিহ্নিত হবে পশ্চিম জার্মানির 'নূতন জর্মন চলচ্চিত্রের' দশক হিসেবে ।

[ আশির দশকে একটা বিরাট পরিবর্তন এল । পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতন হলো । দুই জার্মানি এক হয়ে গেল । পূর্ব জার্মানির বহু নিষিদ্ধ ছবি নানা-দেশে প্রদর্শিত হলো । দেশভাগের মর্মবেদনা, মিলনের স্বপ্ন ও মিলনের পর আশাভঙ্গ সব মিলিয়ে জার্মানির ছবিতে এখন একটা অদ্ভুত অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা চলছে । বর্তমান জর্মন চলচ্চিত্রে দেখা যাচ্ছে কেমন যেন অবক্ষয় ও জাডোর লক্ষণ । এই অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় ভরবেগ জর্মন চলচ্চিত্রের ঐতিহ্যের মধ্যেই নিহিত আছে । ]

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : Sigfried Kracauer-এর ক্রম কালিগারি টু হিটলার ॥

বর্গজিৎ রায়

॥ জুম্ ॥

জুম্ লেন্স হলো এমন একটি লেন্স যার মধ্যে অনেকগুলি লেন্সের [ স্বাভাবিক ফোকস দৈর্ঘ্যের, স্বল্প ফোকস দৈর্ঘ্যের ও দীর্ঘ ফোকস দৈর্ঘ্যের লেন্সের ] স্মৃতিধা ও

ব্যবহারবিধির সমাবেশ ঘটেছে। এতে পঁচিশ থেকে একশো পঁচিশ, অনেক সময় দেড়শো দুশো পর্যন্ত লেন্সের ( ড্র. লেন্স ) ক্ষমতা ও কার্যাবলীর সমন্বয় পাওয়া যায়। এই লেন্স ব্যবহার করে যে শট নেওয়া হয় তাকে জুম্ শট বলে। জুম্ শটে ক্যামেরার স্থান পরিবর্তিত না করে ও বস্তু বা পাত্তপাত্তীদের আপন আপন জায়গায় অপরিবর্তিত রেখে, শুধু মাত্র লেন্সের সহায়তায় এক নিমেষে ক্লোজ শট থেকে লং শটে বা লং থেকে ক্লোজে চলে যাওয়া যায়। ব্যাকগ্রাউণ্ড সমেত গোটা দৃশ্যটি দর্শকের সামনে অতি দ্রুত এগিয়ে যায় বা পেছিয়ে আসে বলে দৃশ্যের পারস্পেকটিভ যায় বদলে। ট্রলি শটের ব্যবহার সর্বত্র সম্ভব নয়, যান্ত্রিক কারণে তার দ্রুততাও সীমাবদ্ধ। তাই জুমের ব্যবহার ক্রমেই বাড়ছে। ড্রামাটিক মুভমেন্ট জোরদার করতে, ছোট অংশ থেকে ধীরে ধীরে অল্প অল্প প্রকাশ করে কোনো দৃশ্যের বিশালতায় পৌঁছে যেতে ও দৃশ্যের আণ্ড পিছুতে দর্শকের মনে গুৎসুক্য সৃষ্টি করতে জুম্ শট বিশেষ সহায়তা করে থাকে। [ রঙিন ছবিতে এই শট শিল্প-গত ভাবেও বিশেষ ফলপ্রদ হয়ে থাকে। ]

ধীরেশ ঘোষ

॥ জুল অ্যাণ্ড জিম ॥

১৯৬১, ফ্রান্স। ফ্রঁসোয়া ত্রফোর দুই প্রিয় চিত্রপরিচালক হিচকক ও বেনোয়া তাঁদের ছবির মধ্য দিয়ে হয়ে উঠেছিলেন ত্রফোর অন্ততম উপদেষ্টা। বেনোয়ার মতো ত্রফোও তখন ছবি করতেন ব্যক্তি-সম্পর্কে বিষয় করে, জুল অ্যাণ্ড জিম যার অবিস্মরণীয় উদাহরণ। এই ছবির বিষয়বস্তুই শুধু প্রেম ও বিভিন্ন ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে নয়, চলচ্চিত্রের সঙ্গে ত্রফোর প্রেম ও ব্যক্তিগত হৃদয়তার এক স্বতঃ-স্ফূর্ত প্রকাশও ঘটেছে এই ছবির আঙ্গিকের মধ্য দিয়ে। যেভাবে এই ছবির ক্যামেরা ল্যাণ্ডস্কেপের ওপর দিয়ে বিশাল ছন্দশীল জ্যায়ে আন্দোলিত হয়; প্যান করে, গতি বৃদ্ধি করে, আকস্মিক ফ্রিজ হয়ে যায়; সেই গতি, প্রাণ, উচ্ছলতা, উন্মাদনার মধ্যে ত্রফোর সহজাত সারল্য, স্বাচ্ছন্দ্য ও ম্যাজিকের ছাপ আছে। তাই মূল কাহিনীর আপাত জটিলতা ছবিতে অদ্ভুত সহানুভূতি ও সময়মিতায় সার্বজনীন ও মানবিক আবেদনে রূপান্তরিত। ছবির দুই নায়ক চরিত্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে, প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগে তোলা সেই যুদ্ধের সংবাদ-চিত্রকে সিনেমাস্কোপের ফর্ম্যাটে বিস্তৃত করে ত্রফো যুদ্ধের শটে এমন এক বিকৃতি ও আলো ছায়ার ভূভূড়ে প্রক্ষেপ নিয়ে আসেন যে ছবিতে তা সামাজিক

প্রাসঙ্গিকতা পায়। এই ছবির অভিনয়, সাজসজ্জা, আলোকচিত্র, সম্পাদনা, সংগীত সর্বত্র এক সহজ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রকাশ রয়েছে যা গ্রেট ফিল্মে থাকে।

মূল উপস্থাপন H-P. Roche, আলোকচিত্র R. Coutard, সম্পাদনা C. Bouche, সংগীত G. Delerue, অভিনয়ে J. Moreau, O. Werner, (ছল), H. Serre (জিম)।

॥ এমিল জেনিংস ॥

(১৮৮৬-১৯৫০, জার্মান অভিনেতা)। জন্ম নিউইয়র্কে কিন্তু শৈশব ও পরবর্তী জীবন কেটেছে জার্মানিতে। তিনি মাক্স রাইনহার্ট-এর কাছে শিক্ষালাভ করেন ও ভ্রাম্যমাণ নাটকের দলে কিশোর চরিত্রে অভিনয় করে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। মঞ্চ থেকে তিনি চলচ্চিত্রে আসেন ও সুনাম অর্জন করেন তাঁর বহু চিত্রপরিচালক লুবিত্শ-এর মাধ্যমে। তাঁর জন্মদন ও জন্মস্থান নিয়ে বিতর্ক আছে, তাঁর অভিনীত অনেক চরিত্রও বিতর্কিত বা সেগুলির মধ্যে রয়ে গেছে বিতর্কের উপাদান। যেমন পঞ্চদশ লুই, অষ্টম হেনরি, দাঁত বা পিটার দি গ্রেটের চরিত্র। বিখ্যাত সাহিত্যের চলচ্চিত্ররূপেও অভিনয় করেছেন তিনি। যেমন ওথেলো, ক্লয়ো ভ্যাডিস, তাত্তু'ফ, ফাউস্ট। অভিনয় করেছেন গ্রাম্য পর্যটকের নিরন্তর ও নিষ্ঠুর ভ্রমণ বৃত্তান্তে, যেমন Vaudeville, The Last Laugh, The Blue Angel এসব ছবিতে। সর্বশ্রেষ্ঠ জার্মান চিত্রাভিনেতা রূপে বহুদিনই পরিচিত ছিলেন তিনি, হলিউডে এসে প্যারামাউন্টের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবার পর তিনি সারা পৃথিবীর অসংখ্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতা রূপেও স্বীকৃত হন, প্রথম বর্ষের অ্যাকাডেমি পুরস্কারেই অস্কারে ভূষিত হন তিনি। কিন্তু তাঁর হলিউড-পর্ব স্বদীর্ঘ হয়নি। তিনি জার্মানি ফিরে যান, নাৎসিদের অভ্যুত্থানের পর সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ও সরকারি পদ লাভ করেন এবং জার্মান প্রচারমূলক ছবিতে সোৎসাহে অংশগ্রহণ করেন, যার ফলস্বরূপ মিত্রপক্ষ তাঁর ছবি বয়কট করে। শুধু ট্রাজিক অভিনেতা রূপে তিনি অবিস্মরণীয় নন, তাঁর জীবনের মধ্যেও ট্রাজেডির এই জাতীয় অনেক উপাদান রয়ে গেছে, তাঁর আত্মজীবনীতেও বারবার বেজেছে বিষাদের স্বর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নিঃসঙ্গ অবস্থায় অস্ট্রিয়ায় তাঁর মৃত্যু ঘটে।

॥ হামফ্রে জেনিংস ॥

(১৯০৭-৭০, গ্রেট ব্রিটেন)। তথ্যচিত্র পরিচালক জেনিংসের উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে আছে 'লিস্‌নু টু ব্রিটেন', 'ফায়ারস ওয়্যার স্টার্টেড', 'দি এইট ডেজ', 'এ

ডায়েরি ফর টিমথি', 'ডিম নিটল আইল্যাণ্ড'। একটি পাপেট ফিল্মও তিনি তৈরি করেন। এই সব ছবির অনেকগুলিই যুদ্ধের সময়ে তৈরি। তাঁর ছবিতে সাহিত্য, চিত্রশিল্প ও মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন উপাদানের উপস্থিতি তথ্যচিত্রে এক নতুন মাত্রা ও স্বাদ এনে দিয়েছে। 'লিস্‌নু টু ব্রিটেন'য়ে ধ্বনি ও ইমেজের চমৎকার সংমিশ্রণ, 'ফায়ারস ওয়্যার স্টার্ভেড'-এ সরলতা ও সৌন্দর্যের প্রামাণ্য সমন্বয় ও প্রায় ছবিতে তথ্যমূলকতাকে তথ্যোত্তর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার সাফল্য জেনিংসের ছবিকে একই সঙ্গে দিয়েছে শক্তি ও সুষমা। মারী সীটন তাঁর অনবদ্য তথ্যচিত্রগুলির মধ্যে পেয়েছিলেন এক ধরনের প্রাণবন্ততা, দেখেছিলেন স্বাধীন, বিস্কন্ধ ও মননগতভাবে স্বজনশীল এক শিল্পায়াম। নিছক বর্ণনাত্মক রীতি নয়, বর্ণনার সঙ্গে মন্তব্যাত্মক ও বিশ্লেষণাত্মক ইমেজ স্মিদিষ্ট ভাবে ব্যবহার করে ও ধারাবিবরণীকে এই রীতির এক পরিপূরক উপাদান করে নিয়ে তথ্যচিত্রকে তিনি যেভাবে সমৃদ্ধ করে যাচ্ছিলেন দুর্ঘটনায় তাঁর আকস্মিক ও অকাল মৃত্যুতে সে কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

॥ হ্রাস্কো জেফিরেল্লি ॥

(জন্ম ১৯২৩, ইতালি)। তিনি স্থাপত্য নিয়ে পড়াশুনা করেন। তারপর মঞ্চে সেট ডিজাইনার, অভিনেতা ও বহু অপেরা-নাট্যের পরিচালক রূপে কাজ করে জেফিরেল্লি চলচ্চিত্রে আসেন মঞ্চ থেকে। তাঁর চিত্রজীবন শুরু হয় আন্তনিওনি, ডে সিকা, ভিদকতি, রোজেলিনি প্রমুখর সহকারী রূপে। চিত্রপরিচালক হিসেবে তিনি 'দি টেমিং অব দি স্ট্র' ও 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট' নির্মাণ করে আন্তর্জাতিক স্তরে পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা পান (দ্র. চলচ্চিত্রে শেক্সপিয়ার)। দৃশ্য ও কলা-কৌশলের আড়ম্বরের সঙ্গে আশ্চর্য নাট্যকল্পনার মিলন ঘটেছে এই দুটি ছবিতে। সাধারণভাবে তাঁর ছবি দর্শক মনোরঞ্জনের দিকে বেশি নজর দেওয়ায় কখনো কখনো শিল্পাভিষাতে টান পড়ে কিন্তু শক্তিশালী বর্ণনারীতি ও অসাধারণ দৃশ্যরস (যার মধ্যে আছে বিশেষ সময়ের পরিবেশ ও অল্পপুঞ্জের পুনর্নির্মাণে অসাধারণ দক্ষতা) ছবিকে মনোগ্রাহী করে তোলে। এ ব্যাপারে ডেভিড লিনের সঙ্গে তাঁর তুলনা টানা যায়। অপেরা ফিল্মের স্রষ্টা হিসেবেও তিনি বিখ্যাত। তাঁর ভেদি-রচিত ত্রাভিয়াতা অপেরা অবলম্বনে লা ত্রাভিয়াতা (৮৩) ছবি নৃত্য পরিকল্পনা, দৃশ্যসজ্জার সৌন্দর্য ও চলচ্চিত্রাভূগ গতিময়তায় খুবই উল্লেখযোগ্য।

অন্যান্য ছবি : আদার সান, সিস্টার মুন (৭৩), জেনাপ অব নাজারেথ (৭৮), দি চ্যাম্প (৭৯) ॥

## ॥ লিউইস জ্যাকবস ॥

( জন্ম ১৯০৬, আমেরিকা ) । জ্যাকবস মূলত চিত্রসমালোচক হিশেবে খ্যাতিমান । চলচ্চিত্রের ইতিহাস নিয়ে যেমন তিনি বই লিখেছেন—দি রাইজ অব দি আমেরিকান ফিল্ম ( বইটির ভূমিকা লিখেছিলেন মার্টিন এস ডোয়রকিন ) তেমনি নিজের ও অন্তের লেখা নিয়ে চলচ্চিত্রের শিল্পরূপ সম্পর্কেও বই প্রকাশ করেছেন —দি এয়ারজেস অব ফিল্ম আর্ট, দি ডকুমেন্টারি ট্র্যাডিশন । এক্সপেরিমেন্টাল সিনেমা নামে একটি স্বল্পস্থায়ী পত্রিকার তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক । তাঁর প্রথম বইটিতে আমেরিকার পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্র নিয়ে একটি অধ্যায়ও ছিল । চিত্রনাট্যকার ও পরীক্ষামূলক ছবির পরিচালক হিশেবেও জ্যাকবস কাজ করেন । তাঁর স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবির মধ্যে ‘সিনক্রোনাইজেশন’, ‘লিঙ্কন স্পিকস এন্ড গোটসবার্গ’ উল্লেখযোগ্য । তাঁর ছবিতে অ্যাকাডেমিক প্রতিষ্ঠাসের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা এই ছবিগুলিকে চলচ্চিত্রের ছাত্রদের অনুশীলনযোগ্য করে তুলেছে । চিত্র-সমালোচনায় তিনি মূলত সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতির অবলম্বন করেছেন, এই মতবাদ অনুসারে যে সমাজে একটি ছবি প্রযোজিত হয়, ছবিটি সেই সমাজকেই প্রতি-ফলিত করে ।

## ॥ জ্যাজ ॥

জ্যাজ হলো আমেরিকান সংগীতের এক বিশেষ ও জনপ্রিয় শৈলী । প্রথম উল্লেখ-যোগ্য সবার্গ চিত্র ‘দি জ্যাজ সিঙ্কার’ ( ১৯২৭ )-য়ে ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র ছিল এক জ্যাজ সংগীতশিল্পী । ‘ক্রীতদাসদের দ্বংসের বারোমাস্তাকে উপজীব্য করে গড়ে ওঠা নিগ্রো লোকসংগীত জ্যাজ পরবর্তীকালে হয়ে উঠল খেতাবদের অবসর বিনোদনের নিত্যসঙ্গী, উত্তেজনার খোরাক ।’ আধুনিক জ্যাজ তাই চরিত্রভ্রষ্ট এক শিল্পরীতি । হলিউডের বহু মিউজিক্যাল ছবিতে অবশ্য জ্যাজের বিশুদ্ধ ও প্রত্যক্ষ ব্যবহার ঘটেছে, ‘কেবিন ইন দি স্কাই’, ‘ফর্টি সেকেন্ড স্ট্রীট’, ‘এ সং ইজ বর্ন’, ‘নিউ অরলিয়ানস’ প্রভৃতির নাম করা যায় । ষরোয়া ও সামাজিক নাটকীয়তার ছবিতে আবহ সংগীত দেওয়ার সময়ও জ্যাজ সংগীতের বিভিন্ন উপাদান ও স্বরলিপি ব্যবহৃত হতো, ‘শ্রাভোজ’, ‘এ স্ট্রীট কার নেমড ডিজায়ার’, ‘ডিয়্যারেস্ট লাভ’ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । জ্যাজের পটভূমিতে উল্লেখযোগ্য বব ফসির, ‘অল দ্যাট জ্যাজ’ । স্বল্প দৈর্ঘ্যের চিত্র ও তথ্যচিত্রে জ্যাজ সংগীত ও জ্যাজ শিল্পীদের চিত্রায়ণ প্রামাণিকতা

পেয়েছে, এই প্রসঙ্গে 'সিম্ফনি ইন ব্ল্যাক', 'জ্যাজ অন এ সামার'স ডে', 'জ্যাজ ড্যান্স' প্রভৃতি ছবির নাম করা দরকার। শেখোক্ত ছবিতে জ্যাজ-ভক্তদের সম্মিলিত উদ্ভাসনার রূপ সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে। আইজেনস্টাইন দেখিয়েছেন, ফ্রপদী নান্দনিকতা থেকে বিশেষ ভাবে স্বতন্ত্র যে আধুনিক নান্দনিকতা তার একটা স্বভাবসুলভ প্রকাশভঙ্গি পাওয়া যায় জ্যাজের আঙ্গিকে, তার সাংগীতিক উপাদান ও গঠনরূপের মধ্যে। (ড্র. শব্দ ও সংগীত)। ফ্রপদী শিল্প ও নান্দনিকতার সঙ্গে ফ্রপদী সংগীতের যে সম্পর্ক, আধুনিক চিত্রকলা, মঞ্চসজ্জা, চলচ্চিত্র, কবিতা ও নগর-স্থাপত্যের সঙ্গে জ্যাজের সেই সম্পর্ক।

### ॥ জ্যাত্ৰিস্কি পয়েন্ট ॥

১৯৭০। আন্তনিওনির আমেরিকায় গিয়ে তোলা এই ছবির কাহিনী সরল হলেও বক্তব্যের জটিলতার ভঙ্গ ও রাজনৈতিক কারণে ছবিটি বিতর্কিত। আন্তনিওনির মতে আমেরিকা হলো এমন একটি দেশ যেখানে আধুনিক যুগ ও সভ্যতার কিছু চরম সত্য ও বৈপরীত্য মৌলিক ও চূড়ান্ত ভাবে উপস্থিত। হিংস্রতার রাজনৈতিক/প্রশাসনিক/সামাজিক/মনস্তাত্ত্বিক অনুঘটের বিশ্লেষণে এই ছবির পটভূমি হিসেবে তাই আমেরিকাকে বেছে নেওয়া। ছবি শুরু হয় ছাত্রদের রাজনৈতিক বিতর্কসভার দৃশ্য দিয়ে, সেখান থেকে ক্যামেরা নায়ককে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে এসে তাকে অনুসরণ করে, বিপ্লবাত্মক মনোভাবসম্পন্ন ছাত্রদের স্বাভাবিক জাতব প্রাণ-শক্তির পাশে তাকে বিচ্ছিন্নতার শিকার বলেই মনে হয়, চুরি করা পেন্সে তার আকাশ ভ্রমণের দৃশ্যে তাকে মাটি প্রায় স্পর্শ না করে আমেরিকার এক বৃহৎ অংশ অতিক্রম করে যেতে দেখলে তার বিচ্ছিন্নতার, শিকড়হীন জীবনের, পলায়ন-লিপ্সার আরো প্রমাণ মেলে। আন্তনিওনির ভাষায়, বাস্তব এক দুর্ভেদ্য রহস্য সেখানে, আজকের তরুণদের স্বভাব হলো নিষ্ক্রিয় ভাবে সেই রহস্যের কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়া নয়, আবার বাস্তবের সেই স্বীকৃত ও গৃহীত ধারণাকে যেনে নেওয়াও নয়, বরং তাকে নিজের মতো করে চ্যালেঞ্জ জানানো।

জ্যাত্ৰিস্কির বক্তব্য এই। তাকে অনুভব, ধারণা, কল্পনা ও যুক্তিতে সমৃদ্ধ করে পরিচালক কাব্যিক ও বিমূর্ত পর্যায়ে নিয়ে যেতে চেয়েছেন, ছবির অন্তিম দৃশ্যে কাল্পনিক বিস্ফোরণের দৃশ্যপ্রতিমাটি যার প্রমাণ। রঙের নাটকীয় ও মনস্তাত্ত্বিক প্রকাশযোগ্যতা ও গুণাবলীর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ায় এই ছবি বিশুদ্ধ অর্থে রঙিনচিত্র (ড্র. রঙের ব্যবহার)। গদার ছবিটিকে প্রতিক্রিয়াশীল বলেছিলেন,

বলেছিলেন নেহাতই কাল্পনিক বিশ্লেষণ। আন্তর্নিওনি ছবিটিকে বিপ্লবাত্মক বলেন না, শুধু বলেন আজকের কল্পনাই আগামী কালের বাস্তব।

প্রযোজনা এম জি এমের পক্ষে কার্লো পণ্টি, আলোকচিত্র এ. কনটিনি, সংগীত দি পিন্ডি ফ্লয়ড, মেট্রোকালার।

## ॥ টাইপেজ ॥

আইজেনস্টাইন উদ্ভাবিত তথ্য বা বিধি। টাইপেজ বলতে বোঝায়, টাইপ-ভূমিকায় অপেশাদার (অভিনেতা নন এই অর্থে) অভিনেতা নির্বাচন এবং আরো সূক্ষ্ম-ভাবে বললে, এই সমস্ত অভিনেতার সাজসজ্জাবিহীন মুখাবয়ব ও অভিব্যক্তির ব্যবহার।

মন্তাজের ক্ষেত্রে শট যেমন প্রধান উপকরণ, টাইপেজের ক্ষেত্রে প্রধান উপকরণ তেমনি ক্লোজ আপ। ক্লোজ আপের এই স্বযোগ সোভিয়েত চলচ্চিত্রে ব্যক্তিনায়ককে সরিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিল সমষ্টি-নায়ককে। চলচ্চিত্র হয়ে উঠেছিল 'উপযুক্ত বিষয়, উপযুক্ত কার্য, উপযুক্ত পাত্র, উপযুক্ত মুখাকৃতি ও উপযুক্ত পরিণতি'-র সমন্বিত রূপ। আবার ক্লোজ আপের ব্যক্তিগত তীব্রতা ও ক্যামেরার এই সন্নিবিষ্ট-বর্তিতার ফলে সমষ্টির অন্তর্গত ব্যক্তিসত্তাও অস্তিত্ব পেল।

আইজেনস্টাইন ও পুদভকিনের বহু ছবি ও ছবির অংশবিশেষ, ডেয়ারের 'প্যাশন অব জেয়ান অব আর্ক'-এর বিশেষত বিচারদৃষ্টি, ডে সিকার 'মিরাকল ইন মিলান'-এর নীলামদৃষ্টি প্রভৃতি টাইপেজের অনবগু উদাহরণ, দৃশ্যের সংবেদন ও অল্পভূতি ঘনীভূত হয়েছে টাইপেজ মুখের সারিতে।

টাইপেজের এই বাস্তব মুখমণ্ডল বাছাইয়ের জ্ঞান পরিচালককে কখনো শত সহস্র মানুষকে পরীক্ষা করে দেখতে হয় এবং এইভাবে নির্বাচিত সাধারণ অভিনেতাটি সম্ভাবনা ও বিশ্বাসযোগ্যতায় অনেকসময়ই বিখ্যাত চিত্রতারকাকে ছাড়িয়ে যায়। কেননা অচেনা ব্যক্তির মূর্তিটি প্রথম উপস্থাপনাতেই নিজেকে স্বতীক্ষণ ও সম্পূর্ণভাবে চিত্রিত করতে পারে এবং চরিত্রের ভাবমূর্তি অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠা পায়।

কোনো অভিনেতার অভিনয় ফিল্মের ভিতরে একটানা অভঙ্গুর অবস্থায় থাকে না। কারণ পরিচালক খণ্ড খণ্ড করে বিভিন্ন কোণ থেকে অভিনেতার শট নেন। শটের সব টুকরোগুলোকে একত্রিত করে দর্শকের মনে অভিনয়ের প্রসঙ্গের এক ভাবমূর্তি সৃষ্টি করানো হয়। আরো গভীরভাবে বলতে গেলে, অভিনেতা তাঁর

অভিনয়কে সাজিয়ে-গুছিয়ে কেমনভাবে তৈরি করবেন তার উপরই নির্ভর করে তাঁর অভিনয় নিতান্ত প্রতিনিধিত্বমূলক না প্রকৃত ভাবমূর্তিধারক কোনটি হবে। এই কাজে টাইপেজ তত্ত্বের বিশেষ ভূমিকা আছে।

॥ টিটিং ॥

শাদা কালো ছবিকে কৃত্রিমভাবে ও বাইরে থেকে রঙ করার পদ্ধতির নাম টিটিং। ফ্রেমের যে অংশে শাদা রঙের প্রাধান্য তা টিটিং-এর মাধ্যমে ও যে অংশে কালো রঙের প্রাধান্য তা টোনিং-এর মাধ্যমে রঙ করা হয়। নির্বাক যুগে ও সবাক যুগের প্রথমার্ধে এই রীতির বিশেষ প্রয়োগ ঘটেছে। গ্রিফিথ এই রীতির মাধ্যমে বর্ণ প্রয়োগ করে ছবিতে প্রতীকী মাত্রা আনতে পেরেছেন। এখনও শৈল্পিক প্রয়োজনে কখনো এই রীতির ও সিপিয়া প্রিন্ট, অ্যামোনিয়া প্রিন্টের ব্যবহার দেখা যায়। লেনুশের একাধিক ছবিতে এর উদাহরণ আছে। টিটিংয়ে রঙের ভল্যুম পাওয়া যায় না, পরিবর্তে মেলে ওয়াশের এফেক্ট।

॥ এডওয়ার্ড টিশে ॥

১৮৯৭-১৯৬১, সোভিয়েত চিত্রগ্রাহক। স্কইডিশ পিতা ও রুশ মাতার সন্তান। চিত্রকলা নিয়ে পড়াশুনো করে তিনি রুশ বিপ্লবের সময় নিউজরীল ক্যামেরাম্যান বা সংবাদ চিত্রগ্রাহক হিসেবে কাজ করেন। এরপর তিনি ভের্ডের কিনোগাজ গোষ্ঠীতে যোগ দেন ও তারপর আইজেনস্টাইনের নিয়মিত চিত্রগ্রাহক রূপে বিশ্ব-জোড়া খ্যাতি লাভ করেন। আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্রের অসাধারণ দৃশ্যগুণের পেছনে টিশের অবদান অপরিমিত। স্ট্রাইক, পটেমকিন, অক্টোবর, ওল্ড অ্যাণ্ড নিউ, ক্য ভিত্তা মেক্সিকো, আলেকজান্ডার নেভস্কি ও আইভান দি টেরিবল্—একটির পর একটি ছবিতে টিশের ক্যামেরাশৈলী আইজেনস্টাইনকে ঈর্ষিত ফল অর্জনে সাহায্য করেছে। তিনি ছিলেন লাইটিংয়ে, কম্পোজিশনে ও লেন্সের ব্যবহারে ওস্তাদ। আইজেনস্টাইনের আমেরিকা ভ্রমণে তিনি তাঁকে সঙ্গ দেন। টিশের কর্ম-পদ্ধতি সম্পর্কে আইজেনস্টাইন লিখেছেন, 'আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্যামেরাম্যানদের উৎকৃষ্ট সমস্ত কাজে রঙের ব্যঞ্জনা পরিশুদ্ধ। এটা সত্যি যে রঙের বিশ্বাস শুধু শাদা, ধূসর ও কালোতে সীমাবদ্ধ কিন্তু সেগুলিকে কখনো নিছক 'ত্রিবর্ণ' বলে মনে হয় না। টিশে, মস্কভিন ও কস্‌ম্যাটোভের মতো বড়ো শিল্পীদের কম্পোজিশন এত বর্ণমণ্ডিত ছিল যে তাতে কালো, ধূসর ও শাদা রঙগুলি কখনোই বর্ণহীন বলে

মনে করা হয়নি, বরং তারা রঙের এমন একটি বিজ্ঞানকে ধরে রেখেছে যা শুধু ছবির রঙের দৃশ্যগত ঐক্যের ক্ষেত্রে নয়, সামগ্রিক ভাবে ছবির বিষয়গত ঐক্য ও গতিময়তার ক্ষেত্রেও বিদ্যমান ছিল। পটেকমকিনে প্রধান রঙ ছিল ধূসর। অক্টোবরকে নানান টোনের কালো রঙে তোলা হয়েছিল। ওল্ড অ্যাণ্ড নিউতে মূল রঙ ছিল শাদা। আর আলেকজান্ডার নেভস্কিতে, ভগবান জানেন কেমন করে এবং কোন্ প্রায়ুক্তিক উপায়ে, কিন্তু স্থানিচিতভাবেই, টিশে রঙের একটি অত্রান্ত বিলম্ব সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন।' তিনি অত্রান্ত সোভিয়েত পরিচালকদের সঙ্গেও কাজ করেন। *Frauennot-Frauengluck* ( ৩০ ) ও *The Immortal Garrison* ( ৫৬ ) এই দুটি ছবির তিনি ছিলেন অত্রতর পরিচালক।

## ॥ 2001-এ স্পেস ওডিসি ॥

১৯৬৮, গ্রেট ব্রিটেন। কুত্রিকের এই ছবিটি সাম্প্রতিক কালে, সমালোচক ও দর্শক উভয় মহলে, সর্বাধিক বিতর্কিত ছবি। কারো মতে ছবিটি বিজ্ঞানভিত্তিক কল্পকাহিনী, তাতে দার্শনিকতার প্রলেপ লাগাতে গিয়ে অস্পষ্টতা এসেছে। কারো মতে ছবিতে প্রদর্শিত মহাশূন্য অভিযান আসলে প্রযুক্তিসমৃদ্ধ, মাদক-আসক্ত মানব সমাজের অনতিদূর ভবিষ্যতের মধ্য দিয়ে এক psychospacial যাত্রা, এই ভবিষ্যৎ-দর্শন মূল্যবান, মননশীল ও প্রয়োজনীয়। কুত্রিকের অত্রান্ত বহু ছবির তুলনায় ২০০১...এ মানবস্বীতির লক্ষণও অনেক বেশি, মানুষের আবহমান অনুসন্ধিৎসা ও সমস্ত বিপত্তি বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে তার উত্তরাধিকার রেখে যাওয়া ( যা সারভাইভ্যালের নামান্তর )—এই দুই প্রধান মানবিক ধর্মে কুত্রিক আশ্বাস রেখেছেন। অনন্তসাধারণ চিত্রপ্রতিমা, গভীর দৃশ্যরস ও অনবদ্য প্রায়ুক্তিক দক্ষতা ( বিশেষত বিশেষ ধরনের ইমালশনে তৈরি রঙিন নেগেটিভের ব্যবহারে ও স্পেশাল একেট-এর প্রয়োগে ) এই ছবিকে বিজ্ঞাননির্ভর কাহিনীচিত্র হিসেবে যে ধ্রুপদী করেছে শুধু তাই নয়, একে এই যুগের এক কলাকৌশলগত ভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও নান্দনিকভাবে প্রাসঙ্গিক চিত্রও করে তুলেছে।

কাহিনী আর্থার ক্লার্ক, আলোকচিত্র জি. আনস্‌ওয়ার্থ, সংগীত আর. ও জে. স্ট্রাউস, মেট্রোকালার।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : জে. এগেল-এর দি মেকিং অব কুত্রিক'স ২০০১ ॥

## ॥ টেকনিকালার ॥

রউন নেগেটিভ ফিল্মের ক্রমবিবর্তনে টেকনিকালার ফিল্ম হলো এক মধ্যবর্তী ও সাময়িক পর্যায়। রউন ছবি তোলায় এই পদ্ধতি ১৯১৫/১৬ নাগাদ প্রথম প্রচলিত হয়। এই ফিল্ম তখন তিনটি মৌলিক রঙের মধ্যে লাল ও সবুজ এই দুটির প্রতি সংবেদনশীল ছিল। ১৯৩২য়ে অপর মৌলিক রঙ নীল এই পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হলো। ১৯৪১ পর্যন্ত বিশেষ ভাবে নির্মিত টেকনিকালার ক্যামেরায় আলোকরশ্মিকে তিনটি মৌলিক বর্ণের আলোয় বিভাজিত করে প্রতিটি বর্ণের জন্ম পৃথক নেগেটিভ ইমেজ গ্রহণ করা হতো। তারপর একই নেগেটিভে তিনটি মৌলিক বর্ণের প্রতিটির প্রতি সংবেদনশীল একটি করে ইমালশন লেয়ার অন্তর্গত করে এই পদ্ধতিকে সহজ করা হলো। ১৯৪৯য়ে এর চূড়ান্ত ও সমৃদ্ধতম রূপ প্রকাশ পেল নতুন ইস্টম্যানকালার নেগেটিভ ফিল্মের প্রচলনে। ( ড. শাদা কালো ও রউন নেগেটিভ ফিল্ম )।

## ॥ টেলিভিশন ॥

এককালে সবচেয়ে আধুনিক ও সম্ভবত সবচেয়ে জনপ্রিয় শিল্পমাধ্যম চলচ্চিত্রকে বিগত তিন দশক ধরে যার কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে তা কোনো স্বতন্ত্র শিল্পমাধ্যম নয়, একটি যন্ত্র—টেলিভিশন। কীরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা তা নিচের উদাহরণ থেকে বোঝা যাবে—একজন আমেরিকান ছাত্র উচ্চতর বিদ্যালয়ের অব্যয়ন শেষ করে যখন কর্মজীবনে প্রবেশ করেন তখন তাঁর ১০০০ ঘণ্টার বেশি চলচ্চিত্র দেখার ও ১৫,০০০ ঘণ্টার বেশি টিভি দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছে। মাধ্যম হিসেবে টিভি চলচ্চিত্রেরই একটা স্বতন্ত্র ফর্ম্যাট (পর্দার প্রস্থ ও উচ্চতার অনুপাত ৫ : ৪)।

প্রযুক্তিগত ভাবে টেলিভিশন হলো আলোককে বৈদ্যুতিক সংকেতে রূপান্তরিত করে দূরদেশে প্রেরণ এবং সেইস্থানে বৈদ্যুতিক সংকেত থেকে আলোর পুনর্সৃষ্টি। বিদ্যুতের সাহায্যে চিত্র-প্রেরণের চেষ্টা প্রায় বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফের মতোই প্রাচীন। প্রথমে স্থিরচিত্র, তারপরে গতিশীল চিত্র বা দৃশ্য এবং অবশেষে দৃশ্য রঙে, প্রেরণের ব্যবস্থা করা গেছে। যে ইমেজটির দূরদর্শন করাতে হবে তার স্থানিং করা হলো প্রথম কাজ। এই ইমেজের সমগ্র ও সমস্ত অংশ আলোর একটি উৎসের সাহায্যে প্রতিটি বিন্দু ধরে পরিক্রমণ করিয়ে, আলোছায়ায় বিভিন্ন মাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে যে বৈদ্যুতিক সংকেতসমূহ পাওয়া যায়, সেগুলিকে ক্রমান্বয়ে ও

ধারাবাহিক ভাবে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। আমাদের দৃষ্টান্তের শারীরতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে সমগ্র ইমেজটি ১২০ সেকেন্ডের মধ্যে পরিক্রমণ করানো চাই। এইভাবে প্রেরিত ইমেজ টিভি-সেটের পর্দায় অসংখ্য ক্ষুদ্র বিন্দুর সমন্বয়ে পুনর্গঠিত হয়। শাদা-কালো ইমেজের ক্ষেত্রে এই বিন্দুর মোট সংখ্যা হলো ৩৬৭,০০০।

এই অতিক্ষুদ্র অসংখ্য বিন্দুগুলি বহুসংখ্যক সূক্ষ্ম রেখার মধ্য দিয়ে ইমেজ পুনর্গঠন করে থাকে। এই রেখাগুলোকে বলা হয় স্ক্যানিং লাইন। টিভি চিত্রের স্পষ্টতা নির্ভর করে স্ক্যানিং লাইনের সংখ্যার ওপর। টিভির আধুনিক পদ্ধতিতে ও আমাদের দেশে দূরদর্শনের সম্প্রচারে ৬২৫ স্ক্যানিং লাইনের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু ৩৫ মিমি ফর্ম্যাটের উপযুক্ত সম্প্রচারের জন্য দরকার ১১২৫ লাইন। সুতরাং ৩৫ মিমি ফর্ম্যাটের অল্পরূপ মান ভিডিও প্রযুক্তিতে অর্জনের জন্য প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। এখানে বলা দরকার চলচ্চিত্রে সাধারণত সেকেন্ডে ২৪টি ফ্রেম তোলা হয়, কিন্তু টিভিতে প্রতি সেকেন্ডে ২৫টি করে ফ্রেম তোলা হয়ে থাকে। ফলে কোনো ফিল্মে তোলা ছবি যদি টিভির মাধ্যমে দেখানো হয় তাহলে দেখা যাবে যে সময় কম লাগল, কেননা সেকেন্ডে ১টা করে ফ্রেম কমে যাচ্ছে।

টিভি পর্দা আকারে অনেক ছোট বলে টিভির জন্য তৈরি ছবিতে ক্রোজ আপ ও মিড শটের সংখ্যা বেশি থাকে, লং শটের ব্যবহার ঘটে কম, ক্যামেরাকোণের দ্রুত পরিবর্তন আর কাট / কুইক কাটের মাধ্যমে দ্রুত দৃশ্য-পরিবর্তনের ওপর নির্ভর করতে হয়। লং শট থেকে প্রাপ্ত panoramic reality তাই টিভি ছবিতে বেশ দুর্লভ। টিভিতে ছবি দেখার সময় মনোযোগের প্রয়োজনও অনেক কম। এই সমাজতাত্ত্বিক / মনস্তাত্ত্বিক অনুশঙ্গে এবার আসা যাক।

একথা একেবারে ঠিক যে মানুষের ব্যক্তিগত গুরুত্ব দিন দিন কমছে। যন্ত্র-সভ্যতার বাহুল্য, আয়োজন ও আড়ম্বরের পাশে কোনো একক ব্যক্তিই এখন আর অনিবার্য ভাবে প্রয়োজনীয় নয় এবং দেশ, সমাজ ও যে কোনো সংস্থাও গঠনতন্ত্রের আধুনিকতম কম্পোজিট স্ট্রাকচারের দরুন যে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বাদ দিয়েই এখন সম্পূর্ণ ও কার্যকারী। নিজস্ব গুরুত্ব এইভাবে কমেতে থাকায় ব্যক্তি মানুষের হীনমত্যতা না জাগাই অস্বাভাবিক।

এই হীনমত্যতা অনেকটা কাটতো নিজের সংসার বা পরিবারের ভিতর মানুষের অধিকার বা মালিকানা যদি আগের মতই বজায় থাকতো। কিন্তু পুরুষ নিজের সংসারেও আগের মতো ছড়ি ঘুরিয়ে নিজের গুরুত্ব আর অনুভব করতে পারছে না।

শিশুকে যেমন খেলনা দিয়ে তুলিয়ে রাখা হয় ব্যক্তি-মানুষকে তেমন গুরুত্বহীন করে তাকে তুলিয়ে রাখা হচ্ছে খেলনা দিয়ে। যন্ত্রসভ্যতার সেই প্রথম খেলনাটি ছিল মোটর গাড়ি। তোমার ভাজা নতুন সঙ্গিনী—বিজ্ঞাপনে বলা হতো।

ক্রমে দেখা গেল সকলেরই গাড়ি আছে। ফলে গাড়ির জন্ম নিজেকে আর ইম্পর্ট্যান্ট ভাবা যাচ্ছে না। খেলনাটাও পুরনো হয়েছে।

তখন নতুন খেলনা এলো, যন্ত্রসভ্যতার নতুন লজেনচুস, টেলিভিশন। এটা ঘরের ভিতরের জিনিশ। বাইরে না বেরিয়েও এটা নিয়ে খেলা যাবে। এমনিতেই বাইরে তুমি বহুর মধ্যে এক সেখানে নিজেকে অকিঞ্চিৎকর মনে হবেই। এতোদিন ছবি দেখতে হলে পাবলিক হলে যেতে হতো, লাইন দিয়ে টিকিট কেটে ভেতরে ঢোক, পাঁচশ জনের সঙ্গে বসে ছবি দেখ, ছবি তোমার ভালো লাগছে কি না লাগছে তাতে কারো কিছু এসে যাবে না, মাঝখানেই হল ছেড়ে চলে এলেও কেউ তাকিয়ে দেখবে না এমন।

আর টিভি ? এটা ঘরের ভেতরের জিনিশ। খাবার বা শোবার ঘরে বসে এটা দেখতে পারো, এ. সি. মেশিন চালিয়ে বা বন্ধ করে, গ্লাসে পানীয় বা প্লেটে খাবার নিয়ে, ম্যাগাজিনের পাতা নাড়তে নাড়তে বা ফোন করতে করতে এটা দেখতে ও শুনতে পারো। তেমন চনমনে দৃশ্য হলে সঙ্গিনীকে নিয়ে সটান চল যেতে পারো বিছানায়। এক চ্যানেল থেকে অল্প চ্যানেলে সরে যেতে পারো, নব ঘুরিয়ে রঙিন দৃশ্যে রঙের অদল বদল ঘটাতে পারো, ইচ্ছে মতো ভলিউম কমাতে বাড়াতে পারো। বুদ্ধিমান ও প্রতিভাবান মানুষের ওপর সাধারণ মানুষের এক বিজাতীয় আকোশ ও বিদ্রোহ আছে, ফলে জটিল ও নিরীক্ষামূলক কোনো ছবি টিভিতে চলছে তো তা বন্ধ করে দিতে পারো, এতে ঝাঁতেল সেই শিল্পীকে এক আচ্ছা চপেটাঘাত দেওয়া গেল। আবার হালকা ও খেলো কোনো ছবি চলছে তো তাও বন্ধ করে দিতে পারো। এতে নিজের রুচি ও বুদ্ধি উন্নত মানের বলে আত্মপ্রসাদ পাওয়া গেল।

ফলে টিভি এক টিলে তিন পাখী মারছে। এক. যন্ত্রটা পুরোপুরি আমার, দুই. যখনই চাইবো এটা আমোদ ও কৌতূহলের উপকরণ জোগাবে, তিন. এটা আমার ইগো স্যাটিসফাই করবে। কাজেই টিভি সেটের চালনা সাংঘাতিক জটিল না হয়ে পড়া পর্যন্ত (এবং অল্প ভবিষ্যতে তার কোনো সম্ভাবনাও নেই। কেননা যান্ত্রিক গ্যাজেটগুলোর মূল লক্ষ্যই হলো যত সহজ সরল ভাবে সম্ভব সেগুলো চালাবার ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা) যন্ত্রসভ্যতায় গুরুত্বহীন ব্যক্তিমানুষ নিজের

কৃত্রিম গুরুত্বের উপলব্ধি হিসেবে টিভির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবেই। দিনেমার জনপ্রিয়তা কমতে থাকা ও টেলিভিশনের প্রয়োজন উত্তরোত্তর বেড়ে যাওয়া এ হলো অনিবার্য। মূলত একটা যন্ত্র হলেও টিভি কিন্তু শুধুই যন্ত্র নয়, তা একই সঙ্গে যন্ত্র, সঙ্গ, সম্পদ, মাধ্যম ও জীবনযাপন প্রণালীর একটা অংশ।

টিভি অনুষ্ঠানের যে তথ্যমূলক আর প্রমোদমূলক ধরন, তা শিক্ষা ও সংস্কৃতির মুখ্য উপায় হলে সচেতন দায়িত্ববোধ ও প্রকৃত শিল্পবোধ জন্ম নিতে পারে না। শিক্ষা, বিকাশ ও সামাজিক ফললাভের কাজে টিভিকে যথাযথ ভাবে ব্যবহার না করার ফল হলো, গান্ট রোবের্জ-এর মতে—

এক. একরাশ অপ্রাসঙ্গিক তথ্য যোগানো, যে তথ্য, সংবাদ ও ঘটনা সম্পর্কে সচেতন ও দায়িত্বশীল হয়ে কিছু করা দর্শকের পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

দুই. বিজ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে ধনতন্ত্রকে জোরদার করা, ভোগবাদী সমাজের প্রতিষ্ঠাকে দৃঢ়তর করা ও ব্যক্তি-মানুষকে আরও গুরুত্বহীন করে তোলা।

তিন. দেশবাসীকে বিদেশি প্রভাবের সামনে উন্মুক্ত করে দিয়ে তাদের এমন একটা সামাজিক-অর্থনৈতিক-সংযোগ ব্যবস্থার মুবোমুখি এনে ফেলা যা আমাদের দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : Sam Ewing-এর Don't Look at the Camera ! Shortcuts to TV Photography & Film Making ও ধীমান দাশগুপ্তের টিভি প্রযোজনা ও টেলিভিশন।

ধীমান দাশগুপ্ত

॥ টোকিও অলিম্পিয়াড ॥

১৯৬৫, জাপান। ১৯৬৪-র টোকিও অলিম্পিকস নিয়ে কন ইচিকাওয়ার রঙিন তথ্যচিত্র। ১৩৫টি অ্যারিফ্লেক্স ক্যামেরা ব্যবহার করে এই ছবির জন্ত ৬৮ ঘণ্টা স্থায়ী বিপুল পরিমাণ দৃশ্যাবলী গ্রহণ করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ক্রীড়াবিদদের স্বস্থ ও প্রাণবন্ত প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে ইচিকাওয়া এই ছবিতে তাঁর নিজস্ব দর্শনকে (ড্র. ইচিকাওয়া) সরস ও সহানুভূতি-শীল রূপ দিয়েছেন। দেখিয়েছেন, কঠোর পরিশ্রম, শৃঙ্খলা ও আন্তরিকতার বিনিময়ে মানুষ খেলার মাঠে যা পায় ও যা পায় না দুইই human achievement এবং খেলা নিছক কোনো একটা ক্রিয়া নয়, তা এক প্রকার জীবনধর্মই। নিজেই সম্পাদনা করে ইচিকাওয়া বিপুল দৃশ্যাবলীকে তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে নিয়ে আসেন।

প্রযোজনা টোকিও অলিম্পিক ফিল্ম অ্যাসোসিয়েশন, শিল্প নির্দেশনা কামেকুরা, সংগীত তোশিরো মায়ুজুমি, ইস্টম্যানকালার ।

## ॥ প্রোগ টোলাণ্ড ॥

( ১৯০৪-১৯৪৮ ) । হলিউডের স্বনামধন্য ক্যামেরাম্যান । প্রায় প্রত্যেকটি ছবিতেই তাঁর ট্রিটমেন্ট ভিন্ন প্রকারের । প্রথম পর্ষায়ের ছবিগুলির মধ্যে 'টাগবোট অ্যানি', 'নানা' এবং 'লে মিজেরাবল্' প্রভৃতিকে ফটোগ্রাফির দিক দিয়ে 'মোটামুটি' শ্রেণীর মধ্যে সর্বোত্তম বলা যেতে পারে । এদের 'মোটামুটি' বলার কারণ এই যে সমকালীন প্রচণ্ড দক্ষ ও শিল্পগতভাবে সক্ষম যে সব ক্যামেরাম্যান হলিউডের সর্বোৎকৃষ্ট ছবি তৈরি করেছিলেন তাঁদের থেকে টোলাণ্ডের ছবিগুলিকে কোনো অর্থেই স্বতন্ত্র বলা যায় না । টোলাণ্ড ১৯৩৯-এর পর থেকেই পরপর কয়েকটি 'মুড' প্রধান কাজে আত্মনিয়োগ করেন যেগুলিতে তিনি স্বপ্রতিভা কাজে লাগাতে পেরেছিলেন সম্পূর্ণভাবে । এই শ্রেণীর প্রথম ছবি উইলিয়াম ওয়াইলার পরিচালিত 'ওয়াদারিং হাইটস' । টোলাণ্ড ত্রুটির উপস্থানের মৌল রোমাঞ্চিক সুরটি ধরতে পেরেছেন বিরট প্রসারতা, নরম দীপশিখা, দীর্ঘ সজীব ছায়া, শীতল আবর্তিত কুয়াশা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে । জন ফোর্ডের পরিচালনায় টোলাণ্ডের ফটোগ্রাফিসমূহ দুটি ছবির তিতর 'দি লঙ ভয়েজ হোম' এমন একটা ছবি যার মধ্যে পরিবেশ বা অ্যাটমস্ফিয়ার-ই প্রধান । ক্যামেরার স্থবিরতা এবং স্বেসংবদ্ধ কম্পোজিশন সেই অ্যাটমস্ফিয়ারকে তুলে ধরেছে । 'দি গ্রেপস্ অব র্যাথ' ছবিতে টোলাণ্ড কোনো মেক আপ, ক্যামেরার কোনো প্রসারণ (diffusion) ব্যবহার করেননি, আকাশের অধিকাংশ শটও ফির্টার করা হয়নি । নৈরাশ্রের মরুভূমির মধ্য দিয়ে দারিদ্রপীড়িত এক পরিবারের যাত্রার মধ্যে সৌন্দর্যের কোনো বালাই ছিল না । ছবিটি তীক্ষ্ণ এবং নিষ্করণ । মুখগুলির মধ্যে এমন একটা কর্কশতা ছিল যা পটভূমির ধূসর আনন্দহীনতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেছে । 'সিটিজেন কেন' নামক ছবিটিতেও টোলাণ্ড কর্কশতার এই বৈশিষ্ট্যটির সদ্যবহার করেছেন । তবে অন্ত কারণে । অরসন ওয়েলস নিঃসন্দেহে টোলাণ্ডের ডীপ ফোকাস সংক্রান্ত গবেষণায় মুগ্ধ হয়েছিলেন ( ছবির ফাঁকে ফাঁকে তিনি ওয়াইড অ্যান্ডল ও সুপারস্পীড লেন্স নিয়ে গোল্ডউইনের সংশ্লিষ্ট বিভাগে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বেশিরভাগ সময় কাটাতেন ), এবং তাঁকে তাঁর প্রতীক্ষিত স্বেযোগদানের সিদ্ধান্ত করেছিলেন । দুই থেকে দু'শ ফিট দূরে অবস্থিত বস্তু বা ব্যক্তি থেকে স্পষ্ট ফোকাস উপাদানক্ষম যে

১৫ ডায়াল পদ্ধতি টোলাও ওয়াইড অ্যান্ডল লেন্স দ্বারা সম্ভব করেছিলেন তার বিশ্বয়-  
 কর ফল অধুনা এত পরিচিত যে তা নিয়ে আলোচনা এখানে নিশ্চয়োজন।  
 'সিটিজেন কেন' ছবিতে টোলাওয়ের অবদানের গুরুত্ব নিঃসন্দেহে যথেষ্ট। সামগ্রিক-  
 ভাবে ছবি থেকে তার ফটোগ্রাফিকে আলাদা করা সম্ভবই কষ্টকর। কিছু  
 অপরিণতি ও টেক্সচারের অভাব, যা থেকে মনে হতে পারে যে টোলাও তাঁর  
 পদ্ধতিকে ব্যবহারযোগ্য সীমার মধ্যে রাখতে পারেননি, থাকা সত্ত্বেও যথার্থ  
 ক্ষমতাময় কম্পোজিশন এবং নাটকীয় লাইটিং এফেক্ট এ ছবিতে লভ্য। 'কেন'-এর  
 ক্রটিগুলি অর্থাৎ গ্রেডিংয়ের অসঙ্গতি, সর্বস্বক সমান তল ও নিয়ন্ত্রিত বৈপরীত্যের  
 অভাব এবং অতি পরিমাণ আলো ব্যবহারের অস্থবিধা এগুলি শুধরে নিয়ে  
 টোলাও স্টাইলটিকে নিখুঁত ও প্রসারিত করেছিলেন 'দি লিটল্ ফকস্' নামক  
 ছবিতে। টোলাও এতদিনে 150 amp. স্পটের, বিশেষতঃ ছায়ানিয়ন্ত্রক আলোর  
 প্রয়োগ শিখে নিয়েছেন। তার ফলে 'কেন'-এর কাঠিঙ ও ধূসরতার বদলে আমরা  
 পেয়েছি পূর্ববর্তী ছবির আনন্দদায়ক সজীবতা যেটি নমনীয় উৎসজাত আলোর  
 সাহায্যে সৃষ্ট হয়েছিল। মৃদু স্তরের (low key) চিত্রগ্রহণে উগ্র স্তরের (high  
 key) চিত্রগ্রহণ অপেক্ষা অনেক বেশি দক্ষতার প্রয়োজন হয়, এইটাই সাধারণ  
 ধারণা। তবে আমার মনে হয় অধিকাংশ ক্যামেরাম্যানই স্বীকার করবেন যে উগ্র  
 স্তরের ফটোগ্রাফিতে উচ্চমানের শিল্পগুণ বজায় রাখতে গেলে মৃদু স্তর অপেক্ষা  
 অধিকতর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দরকার। 'দি বেট ইয়ার্স অব আওয়ার লাইভস্'-এ  
 কোনো অস্বাভাবিক ক্যামেরাকোণ, আরোপিত পারস্পেকটিভ বা অসাধারণ  
 আলোকক্ষেপণের ব্যবহার করা হয়নি। আগাগোড়া ডীপ ফোকাস রাখা হয়েছে  
 (বাস্তবিক সর্বাপেক্ষা গভীর), কিন্তু তার ব্যবহার এত স্বাভাবিক যে দর্শক সে  
 সম্পর্কে অচেতনই থাকেন। আমার কাছে এটিই টোলাওয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।  
 চলচ্চিত্র গ্রাহকের প্রাথমিক কর্তব্য—বিশ্বাসযোগ্য পদ্ধতিতে হৃন্দর করে গল্প বলা  
 —সরল ও সৎভাবে তিনি পালন করেছেন এ ছবিতে। প্রত্যেকটি ছবিতে  
 আলাদা মুহুরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য স্টাইল ও ট্রেটমেন্টের আমূল পরিবর্তন  
 টোলাও প্রায়ই করেছেন বটে কিন্তু কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সব ছবিতেই উপস্থিত।  
 অনিবার্য নিপুণ পদ্ধতি ও ইমেজের গুণ ছাড়াও টোলাওয়ের ছবি দৃঢ়সংবদ্ধ, এরকম  
 আবদ্ধ দৃশ্যরচনার স্টাইল ও সম্মুখবর্তী মাথা, প্রত্যঙ্গ কিংবা অত্যন্ত খুঁটিনাটির  
 ওপর অধিক গুরুত্বদানের জন্য বিশিষ্ট। তাঁর আলোকক্ষেপণের পরিণতিও অপরি-  
 বর্তনীয়ভাবে সাধারণ ও অনাড়ম্বর : আলোর কয়েকটি মোটা ধারা এবং বড়ো

স্পষ্ট ছায়ায় সময়। সমুখ ও পশ্চাদভাগের ছন্দগত বিভাগ দর্শনীয় করে তুলেছেন টোলাও, যাতে বিভিন্ন তল নিখুঁত বৈপরীত্য পেয়েছে। টোলাও চলচ্চিত্রকলার ইতিহাসে নিজের ছাপ রাখতে সক্ষম হয়েছেন এবং ইউরোপে ও হলিউডে তাঁর প্রভাব ক্রমশঃ স্পষ্ট ভাবে অনুভূত হচ্ছে। হ্যামলেটের ক্যামেরাম্যান ডেসমণ্ড ডিকিন্দন টোলাওের পথ প্রদর্শনের কাছে সশ্রদ্ধ ঋণ স্বীকার করেছেন। টোলাওের ছবি সমস্ত সৃজন প্রয়াসী ফিল্ম-ক্যামেরাম্যানের কাছে নতুন দৃষ্টিতে প্রত্যেকটি ছবি দেখার একটা পাঠ্যক্রম। মুভি ফটোগ্রাফি, ফিল্ম কম্পোজিশন ও কম্পোজিশনে গতির ভূমিকা নিয়ে বহু গ্ল্যাবান নিবন্ধও তিনি লিখেছেন।

## ডগলাস স্নকোম্বে

### ॥ ডলি ॥

চাকা লাগানো প্ল্যাটফর্মের ওপর ক্যামেরা বসিয়ে ও ক্যামেরাম্যানকে রেখে চলন্ত সেই প্ল্যাটফর্ম থেকে শট নেওয়া হলে তাকে বলে ডলি শট। ক্যামেরা মুভমেন্টে যাতে ঝাঁকুনি না আসে তার জ্ঞান চাকায় সাধারণত সফট টায়ার লাগানো হয়। চলন্ত প্ল্যাটফর্মটি সরলরেখা, বক্ররেখা, ও বৃত্তাকার রেখা প্রয়োজনমতো যে কোনো গতিভঙ্গিতে চলাফেরা করতে পারে। ডলি শটে ফ্রেমের মবো দ্রুত পরিবর্তনশীল স্পেস সম্বন্ধে ধারণা জন্মায়, ফলে এই শটের দৃশ্যমূল্য যথেষ্ট। রেল লাইনের মতো কোনো ট্র্যাকের ওপর দিয়ে ডলি চালনা করে শট নেওয়া হলে তাকে বলে ট্র্যাকিং শট। (ড্র. ক্যামেরা মুভমেন্ট)। '1942' ছবিতে ডলি শটের অসাধারণ ও বিচিত্র সব ব্যবহার আছে, যা ক্রেন শটের সঙ্গে মিলে ব্যবহৃত হয়ে অসাধারণ নান্দনিক অভিঘাত সৃষ্টি করেছে।

### ॥ ডাবিং ॥

দৃশ্যগ্রহণ হয়ে যাবার পর গৃহীত দৃশ্যের প্রজেকশন দেখে অভিনেতার অঙ্গভঙ্গি, অভিব্যক্তি ও চৌঁটের নড়াচড়া অনুসারে তার সংলাপ শব্দগ্রহণের স্টুডিওতে সাউণ্ড ট্র্যাকে পুনর্গ্রহণ করার নাম ডাবিং। শব্দহীন ক্যামেরায় গুটিং করা সব সময় সম্ভব নয় বলে, সম্ভব হলেও লোকেশনে অন্যান্য শব্দের উপদ্রব থাকায় ও কখনো কখনো সংলাপ ও কণ্ঠস্বরে কিছু পরিবর্তন সাধন প্রয়োজনীয় হওয়ায় ডাবিং একটা দরকারি পদ্ধতি। এক ভাষার ছবিকে অন্য ভাষায় অনুবাদিত করার সময়েও মাঝে মাঝে সাব টাইটেলের পরিবর্তে ডাবিং ব্যবহৃত হয়। যে যন্ত্রের সাহায্যে

ডাবিং-এর কাজ সম্পন্ন করা হয় তার নাম Dubber. ডাবিং ও রি-রেকর্ডিং একটি ও একই কাজের দুটি পর্যায়। যে কাজটার নাম হলো মিক্‌সিং ( ম্র. )।

### ॥ ডায়নামিক ফ্রেম ॥

সমস্ত ছবি ধরে ফ্রেমের ফর্ম্যাট ( প্রস্থ ও উচ্চতার অনুপাত ) একই না রেখে কম্পোজিশনের চাহিদা ও শৈল্পিক প্রয়োজন অনুযায়ী ফ্রেমের নির্দিষ্ট অংশ-বিশেষকে কাজে লাগানোর ধারণাকে ডায়নামিক ফ্রেম নাম দেওয়া হয়েছিল। এই প্রক্রিয়ায় দৃশ্য কর্বনো পর্দার বেশি অংশ জুড়ে ও কখনো কম অংশ জুড়ে প্রদর্শিত হতো। মূলত এই ধারণা ছিল তাত্ত্বিক ভাবে উপস্থাপিত ধারণা। একাধিক ছবিতে এর ভৌত প্রয়োগ ঘটলেও শেষ পর্যন্ত এই ধারণা পরিত্যক্ত হয়।

### ॥ ডিউপ ॥

মূল নেগেটিভ থেকে প্রাপ্ত পজিটিভ প্রিন্ট থেকে মূল নেগেটিভের ডুপ্লিকেট কপি তৈরি করা হলে তাকে ডিউপ বা ডুপ্লিকেট নেগেটিভ বলে। ডিউপ নেগেটিভের মান শাদা কালো আলোকচিত্রের ক্ষেত্রে বেশ ভালো ও রঙিন আলোকচিত্রের ক্ষেত্রে চলনসই হয়ে থাকে। সম্প্রতি রঙিন নেগেটিভ ফিল্মের সমৃদ্ধির ফলে মূল নেগেটিভ থেকে সরাসরি ডিউপ নেগেটিভ তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে। এই ছবছ একই রকমের নকল নেগেটিভ পেতে হলে সেন্সিটোমেট্রিক পদ্ধতির প্রয়োজন। এই পদ্ধতিতে কখনো কখনো আসল নেগেটিভকে প্রয়োজনে ইচ্ছে করে অন্তরূপ করে নেওয়াও যায়। স্পেশাল এফেক্ট, পরিচয়লিপি স্থপার ইম্পোজ করা, স্টক থেকে শট বা দৃশ্য গ্রহণ প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে ডিউপের ব্যবহার ঘটে। এইসব কাজে প্রয়োজন ডুপ্লিকেটিং নেগেটিভ ছাড়াও অতি-ফাইন-গ্রেণ মাস্টার পজিটিভ।

### ॥ ওয়ান্ট ডিজনি ॥

( ১৯০১-৬৬, আমেরিকা )। বসন্ত ডিজনি হলেন কার্টুন আঁকিয়ে, অ্যানিমেটেড ছবির পরিচালক ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারের যোগফলের চাইতে বেশি কিছু, আমেরিকার যন্ত্রচালিত ও প্রদর্শনপ্রিয় সমাজব্যবস্থার ( যা উপযোগ ও শিল্পকে সমান গুরুত্ব দেবার ভান করে ) এক প্রায়িক বা নমনীয় প্রতীক। ১৯২৮য়ে মিকি মাউস কার্টুন চিত্রমালা, ৩৬য়ে ডোনাল্ড ডাক চিত্রমালা, ও মধ্যবর্তী সময়ে

সিলি সিম্ফনি সিরিজের ছবি দিয়ে ডিজনি যখন তাঁর যাত্রা শুরু করেছিলেন তখন তাঁকে বিরল ব্যক্তিত্বের শিল্পী বলেই মনে হয়েছিল। এমনকি আইজেনস্টাইন তাঁকে আমেরিকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিচালক বলে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁর ছবি সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। চল্লিশের দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ডিজনির এই স্বীকৃতি অব্যাহত ছিল। তারপর ক্রমে তার আরো ছবি [ পূর্ণ দৈর্ঘ্য কাটুন চিত্র : স্নো হোয়াইট অ্যাণ্ড দি সেভেন ডোয়ার্‌স্‌ ( ৩৭ ), ফ্যান্টাসিয়া ( ৪০ ), সিণ্ডেরেলা ( ৫০ ), অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যান্ড ( ৫১ ), পিটার প্যান ( ৫৩ ), দি স্লিপিং বিউটি ( ৫৯ ), দি জাংগল বুক ( ৬৭ ), রবিনহুড ( ৭৩ ) ; বাস্তব অভিনেতা-অভিনীত কাহিনী-চিত্র : ট্রেজার আইল্যান্ড ( ৫০ ), টুয়েন্টি থাউজ্যান্ড লিগস আণ্ডার দি সী ( ৫৪ ), মেরি পপিন্স্‌ ( ৬৪ ) ; প্রকৃতি বিষয়ক তথ্যচিত্র : দি লিভিং ডেজার্ট ( ৫১ ) এবং অগ্নাত্ত ওয়েস্টার্ন, অ্যাডভেঞ্চার, কমেডি, সংগীতনির্ভর কল্পচিত্র ] নির্মিত হতে আর ডিজনির ( চিড়িয়াখানা ও যাদুঘর ও প্রমোদ-উদ্যান ও গ্যাজেট-কেন্দ্রের এক দর্শনীয় সম্মেলন ) স্থাপিত হতে ( ক্যালিফোর্নিয়ায় ৫৫-য় ও ফ্লোরিডায় ৭১-য়ে ) তাঁকে পূর্ণাঙ্গ শিল্পীর তুলনায় জনপ্রিয় প্রকল্পের নির্মাতা বলেই বেশি মনে হলো। ছবিতে গল্প বলার ক্ষমতা তাঁর ছিল, কিন্তু সে গল্প বহু সময়ে হয়ে পড়ত অকিঞ্চিৎকর, তাঁর বর্ণনারীতিকে বলা হয়েছে বলিষ্ঠ কিন্তু তাঁর অধিকাংশ পূর্ণ দৈর্ঘ্য কাটুনচিত্র কি আসলে ছোট কয়েকটি কাটুনচিত্রের সমষ্টি মাত্র নয়, তাঁর ছবির অমলিন হাশুরসের ঠিক পাশেই রয়েছে শিল্প সম্পর্কে তাঁর সিনিক মন্তব্যের ও জীবন সম্বন্ধে উদ্ভট রসবোধের প্রমাণ, প্রকৃতি-চিত্রের বিজ্ঞানস্বলভ পর্যবেক্ষণের পাশেই ঐতিহাসিক তথ্যের অদ্ভুত পরিবর্তন, সব মিলিয়ে সদা সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ও নিজস্ব দৃষ্টিকোণে এক অগোছালো ও অস্পষ্ট ভাব কলাকৌশলগতভাবে সমৃদ্ধ ডিজনিকে চিহ্নিত করেছে। যে প্রসঙ্গে তাঁর অ্যানি-মেশন রীতির নিজস্বতা ও চিত্রপ্রতিমার স্বতঃস্ফূর্ত গতিময়তার কথা উল্লেখযোগ্য। স্বস্বতা ও স্থূলত্ব, কবিত্ব-সৌন্দর্য-কল্পনা ও বাহ্যিক-অতিরঞ্জন, প্রায়ুক্তিক কৃতিত্ব ও ধীরে ধীরে শীর্ণতা—ডিজনির ছবিতে এদের অদ্ভুত সহাবস্থান, যা স্বাভাবিক ; কেননা আমেরিকা হলো সহাবস্থানের দেশ, যা একই সঙ্গে চমৎকার ও তেমন-কিছু-না। এই সাযুজ্যই আমেরিকায় তাঁর জনপ্রিয়তা, যার গ্রাফ্য প্রমাণ তাঁর অসংখ্যবার অ্যাকাডেমি পুরস্কার প্রাপ্তিতে। যাকিন সভাতায়, ডিজনির ছবিতে ও সাধারণভাবে অ্যাকাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত অধিকাংশ ছবিতে এই অদ্ভুত সহাবস্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাজতাত্ত্বিক-মনস্তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ। ( ড্র. অ্যানিমেটেড ফিল্ম ও চলচিত্র

পুরস্কার)। তাঁর যত্নের পরও তাঁর নামাঙ্কিত স্টুডিও বা সংস্থা নিয়মিত চিত্র-প্রযোজনা করে যাচ্ছে।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : ক্রিস্টোফার ফিঞ্চের দি আর্ট অব ওয়ান্ট ডিজনি।

## ॥ ডিজলভ ॥

একটি শট মিলিয়ে যেতে যেতে পরের শটের উদ্ভাস হয়ে গেলে মুহূর্তের জন্য একাধিক ইমেজের ওভারল্যাপিং হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে শট বা দৃশ্যের পরিবর্তনকে ডিজলভ বলে। প্রিন্টার অ্যাপারচারকে প্রথম শটের শেষাংশে ধীরে ধীরে বন্ধ করে দেওয়া হয় ও দ্বিতীয় শটের সূচনায় আবার ধীরে ধীরে উন্মুক্ত করা হয়। ফলে একটা ধীর ও ধারাবাহিক ডাবল এক্সপোজারের ফল পাওয়া যায়। কতক্ষণের জন্য ওভারল্যাপিং হলো সেটাই ডিজলভের দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করে। এই দৈর্ঘ্য ১৬, ২৪, ৩২, ৬৪ বা ৯৬ ফ্রেমের যে কোনটা হতে পারে। কাট করে এক শট থেকে অন্য শটে গেলে যে তীক্ষ্ণতা (sharpness) মেলে, ডিজলভে তা থাকে না, পরিবর্তে মেলে এক ধরনের smoothness। স্থান ও সময়ের বিশেষ পরিবর্তন বোঝাতে ডিজলভের ব্যবহার ঘটে থাকে। এর অত্যাশ্চর্য ব্যবহারও আছে। (ড. সম্পাদনা)

## ॥ ডিটেল ॥

ডিটেল এককথায় খুঁটিনাটি জিনিশের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ। পরিচালনাকে বা বাস্তব ও ভীক্ষ করে। পরিবেশকে ফুটিয়ে তোলে। পরিচালককে বাস্তববাদী হতে হবে, পরিবেশকে নিখুঁত করতে হবে। neatest বা cleanest নয়, নিখুঁত। স্বপ্ন, তীক্ষ্ণ ও পরিবেশানুযায়ী বাস্তবতার অধিকারী হলে পটভূমি সৃষ্টিতে সক্ষম স্তরেরাং প্রাথমিক দায়িত্বটুকু সম্পন্ন। ডিটেল জিনিশটাকে একেবারে আলাদাভাবে বিচার করা অর্থহীন। জলের উপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে একটা গঙ্গা ফড়িং-এর আর একটার কাছে যাওয়া, বৃষ্টির পর মরা ব্যাঙ, সিন্ত কুকুরের গা ঝাড়া দেওয়া, বেতের ঝুপড়ি থেকে আরশোলার বেরিয়ে আসা, পূর্বপুরুষের তৈলচিত্রের পাশে মাকড়শার আল, কাঞ্চনজঙ্ঘার প্রতিটি চরিত্রের আলাদা পোশাক সমস্তই সংগীত, পরিচালনা বা সিঁদুলের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ছোট ছোট উপকরণ ও উপাদানগুলোকে গোঁথে বড়ো একটা কিছু সৃষ্টি। তাই ডিটেলকে আর স্বতন্ত্র কিছু বলে ভাবা হচ্ছে না, তাকে অন্তদের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যেমন সিঁদুল। সিঁদুলটাকে ডিটেলের সঙ্গে মিশিয়ে ডিটেল কাম সিঁদুল রূপে ভাবা হচ্ছে। ডিটেল হলো এমন

একটা জিনিশ যা ছবিতে যে কোনো স্থর বা রস নিয়ে আসতে পারে, পরিবেশকে, চরিত্রকে, মুহূর্তকে বিশ্বাস্ত করে। যে ডিটেল পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্যবহৃত হয় তাকে অ্যাটমসফিয়ারিক ডিটেল ও যে ডিটেল চরিত্রের অভিব্যক্তি বা চরিত্রের বিবর্তন প্রকাশের কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করার জন্য ব্যবহৃত হয় তাকে বিহ্যাভিয়রিস্টিক ডিটেল বলা হয়ে থাকে। **animated** ছবিতে অনেকে ডিটেলের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর দিতে চান না, কিন্তু মনে হয় দিলে এগুলো আরো গভীর ও সৃষ্টিশীল হয়ে ওঠে। ব্যঙ্গনা আনার জন্য ছবির প্রয়োজনে এমনকি ভাববিরোধী, চরিত্রবিরোধী ও পরিবেশবিরোধী ডিটেলও ব্যবহার করা যায়। একে বলে কনট্রাডিকটরি ডিটেল। পরিচালকের সব সময়ই সমান দৃষ্টি রাখা উচিত সংলাপ ও ধ্বনির ডিটলেও। মজুমদার বানান তোমরা কী লেখ, J না Z (মহানগর), মনে রেখে দেব (নায়ক) ও এটা ভালো না খারাপ (সীমাবদ্ধ) অন্ততঃ এই তিনটি বাক্যাংশ সংলাপে ডিটেলের সার্থকতম প্রয়োগ। আর সংগীতের একটি বিরাট অংশ এখন যেহেতু effect sound-এর দখলে তখন ধ্বনির ডিটেলকে আর অস্বীকার করি কী করে! ধ্বনির ডিটেলের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অসাধারণ মূল্যবান। কেউ হাসলো, sound track-এ ধরা পড়লো কান্না, সংলাপ বা ধ্বনির কোন অংশ ইচ্ছাকৃত ভাবে দ্রুত করে দেওয়া হলো বা মৃদু, ইত্যাদি। এইভাবেই রাত্রির গভীর নীরবতা বোঝাতে তাই শুধু আর ঝিঝির ডাকই যথেষ্ট নয়, একই সঙ্গে দরকার দূরগত শেয়ালের থেমে থেমে ডাক ও অস্পষ্ট চাশা ফিস্ ফিস্ স্বরে কোনো তন্দ্রাতুর বুড়োর, 'ঘুমো, খোকা, ঘুম'। নিঃস্বপ্নতার পুরুরে শব্দের ছোট্ট একটি টিল ফেলে অনেক বেশি নীরবতা এনে দেওয়া। ডিটেলটাই এখানে প্রথম ও প্রধান জিনিশ। ঘরোয়া জীবনের ট্রিটমেন্টে, তীক্ষ্ণ অনুভূতির গল্পে, পিরিয়ড পিসের চলচ্চিত্রে ও documentary ভিত্তিমূলক ছবিতে এর ভূমিকা আরও বিশিষ্ট। ডিটেলকে অবজেকটিভ, সাবজেকটিভ, সাজেসটিভ, স্ট্রাকচারাল প্রভৃতি ভাগেও ভাগ করা হয়েছে।

## ॥ ডিপ ফোকাস ॥

ক্যামেরার নিকটতম বিন্দু থেকে দূরতম বিন্দু পর্যন্ত যে ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত দৃশ্যবস্তু স্পষ্ট ফোকাসে থাকে সেই অঞ্চলকে ক্যামেরার ডেপথ্ অব ফিল্ড বলা হয়। ডিপ ফোকাস হলো সেই ধরনের আলোকচিত্র যাতে ডেপথ্ অব ফিল্ড খুব বেশি হয় এবং নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সমস্ত দৃশ্যবস্তুই সমান স্পষ্ট থাকে। দুই থেকে

হুশো ফিট দূরে অবস্থিত বস্তু বা ব্যক্তি থেকে স্পষ্ট ফোকাস উৎপাদনক্ষম যে চূড়ান্ত পদ্ধতি গ্রেগ টোলাও ওয়াইড অ্যান্ড লেন্স দ্বারা সম্ভব করেছিলেন তার বিশ্বয়কর ফল ডিপ ফোকাস আলোকচিত্র বহু ছবিতে বহুবার সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত। লেন্সের সঙ্গে এর সংযোগ প্রত্যক্ষ। চরম ডিপ ফোকাসের জন্য প্রয়োজন সুপার-স্পীড ওয়াইড অ্যান্ড লেন্স। ( ড্র. লেন্স )

### ॥ ডিফিউশন ॥

আলোকসম্পাতের উৎসে বিশেষ ধরনের translucent পদার্থের আবরণ ব্যবহার করে দৃশ্যবস্তুর ওপর এসে পড়া আলোকে নরম ও নমনীয় করার পদ্ধতিকে ডিফিউশন বলা হয়। এর ফলে দৃশ্যবস্তুতে আলো ও ছায়ার টোনাল পার্থক্যের তীব্রতা হ্রাস পায় ও দৃশ্যবস্তুর কিছু কিছু ডিটেল তত প্রকট থাকে না। ক্যামেরা লেন্সের সঙ্গে ডিফিউশন ফিল্টার ব্যবহার করেও ইমেজকে এই নমনীয়তা দেওয়া যায়। এই পদ্ধতির ব্যবহারে অনেকটা সফট লাইটিং-এর এফেক্ট আসে—দৃশ্যে মূলত মিডিয়াম শ্যাডোর উপস্থিতি। ( ড্র. লাইটিং )

### ॥ ডিরেক্ট সিনেমা ॥

সিনেমা তেরিভের আমেরিকান ঘরানা ডিরেক্ট সিনেমা বা লিভিং সিনেমা নামে পরিচিত। পঞ্চাশের দশকের শেষভাগ থেকে এর সূচনা। বাস্তবের তাৎক্ষণিক ও স্বতঃস্ফূর্ত রূপকে কোনো রকম অতিরঞ্জন বা অলংকরণের মধ্য দিয়ে বিকৃত না করে চলচ্চিত্রে ফুটিয়ে তোলাই এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। পূর্ব নির্ধারিত চিত্রনাট্য, বিশেষ ভাবে নির্বাচিত অভিনেতা, কৃত্রিম স্টুডিও, যন্ত্রপাতি ও কলাকৌশলের আড়ম্বর, বর্ণনাত্মক ও মন্তব্যাত্মক রীতি, প্রভৃতিকে অস্বীকার করা ডিরেক্ট সিনেমার বৈশিষ্ট্য। তথ্যচিত্র ও কাহিনীচিত্রের মাঝামাঝি একটি আঙ্গিক নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিদর্শন আছে এই সিনেমায়। সিনেমা তেরিভের সঙ্গে এর পার্থক্য হলো এই যে প্রথমটিতে যেখানে ক্যামেরার ব্যবহার অলুৎচকের মতো, বাস্তবতার মধ্য দিয়ে বাস্তব অতিরিক্ত কোন সত্যের প্রকাশ, এটি সেখানে ক্যামেরাকে বাস্তবতার নীরব সাক্ষী হিসেবে গ্রহণের পক্ষপাতী। কিনো আই-র ( ড্র. ) সঙ্গে উভয়ের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যও লক্ষণীয়। রিচার্ড লিকক, রবার্ট ড্রু, ডি. এ. পেনবেকার প্রমুখ চিত্রনির্মাতা এই আন্দোলনের প্রধান ফসল।

## ॥ মারলিন ডীট্রিশ ॥

১৯০২-১৯৯২, জর্মন গায়িকা-অভিনেত্রী। দীর্ঘকাল আমেরিকায় কাটান। পাব্‌স্টের প্যাণ্ডোরা'স বক্স ছবিতে নায়িকা হিশেবে অভিনয় করলেও ফন স্টার্নবার্গের দি ব্লু অ্যাঞ্জেল ছবিতে লোলা-লোলার ভূমিকায় অভিনয় করেই তিনি চলচ্চিত্রের গ্যামার কুইন হয়ে ওঠেন। ভয়ঙ্কর শ্রেমিকার রূপকল্পে যৌনতার মিশেল দিয়ে স্টার্নবার্গ তাঁর যে প্রতিমা গড়ে তোলেন ( মরক্কো, সাংহাই এক্সপ্রেস, স্কারলেট এক্সপ্রেস ইত্যাদি ছবির মধ্য দিয়ে ) তা ডীট্রিশকে অচিরে নিখে পরিণত করে তোলে। বহু অনুল্লেখযোগ্য ছবি করলেও তাঁর জনপ্রিয়তা বহু বছর অক্ষুণ্ণ ছিল। স্টার্নবার্গের সঙ্গে তাঁর কর্মসূত্র ছিন্ন হয়ে গেলে স্টার্নবার্গেরই পরিচালক হিশেবে চাহিদা কমে যায়। হলিউডে এম. জি. এমের গ্রেটা গার্বোর সবচেয়ে বড়ো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন প্যারামাউন্টের মারলিন ডীট্রিশ। তাঁর অভিনয়ে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিং ছাড়াও ছিল পরিশীলিত উইট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি মার্কিন নাগরিক হিশেবে ফ্যাসিবাদের সক্রিয় বিরোধিতা করেন। লুইৎশ, বিলি ওয়াইন্ডার ও ফ্রিংস ল্যাণ্ডের ছবিতেও তিনি অভিনয় করেছেন। পঞ্চাশের দশকে চিত্রাভিনেত্রী হিশেবে তাঁর চাহিদা কমে থাকলে তিনি নর্তকী ও গায়িকা হিশেবে অনাধারণ জনপ্রিয়তা পান। তাঁর জীবন, বিশেষত প্রথম জীবন ছিল রহস্যে ভরা। তাঁর আত্মজীবনী 'মাই লাইফ স্টোরি' দেই রহস্যেই আরো ইন্ধন যোগায়।

## ॥ মার্গেরিৎ ডুরাজ ( ডুরাজ ) ॥

( জন্ম ১৯১৪, ইন্সট্রাটানে জন্ম, ফরাসি নাগরিক )। ডুরাজ একই সঙ্গে উপস্থাসিক, নাট্যকার, চিত্রনাট্যকার ও চলচ্চিত্র পরিচালক। গণিত, আইন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে তিনি সর্বোদম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। তাঁর প্রথম উপস্থাস ১৯৪৩-এ প্রকাশিত হয়, নাটক ১৯৫৫-র প্রথম মঞ্চস্থ হয়। বিভিন্ন মাধ্যম ও ফর্ম্যাটের মধ্য দিয়ে তিনি একই বিষয়কে বিভিন্ন রূপ দেন। যেমন একই বিষয়বস্তু নিয়ে উপস্থাস, নাটক ও চিত্রনাট্য। কালচেতনার অনুসন্ধান আর ব্যক্তিগত সম্পর্কের উদঘাটন, এই হলো তাঁর লেখার প্রধান দুই মোটিফ। তাঁর অনেকগুলি রচনা Clement, রিচার্ডসন ও অন্তদের দ্বারা চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। কাহিনীকার ডুরাজকে রেনে চিত্রনাট্যকার করে নিয়ে আসেন। রেনের হিরোশিমা মন আমুর ছবির চিত্রনাট্যকার ও সংলাপ রচয়িতা হিশেবে প্রশস্তি অর্জনের পর ডুরাজ নিজেই চিত্র

পরিচালনার কাজে হাত দেন। তাঁর চিত্রপরিচালক হয়ে ওঠার পেছনে অনেকটা কৃতিত্ব তাই বেনের। উভয়ের শিল্পদর্শন ও দৃষ্টিকোণের মধ্যে বিশেষ মিলও রয়েছে। তিনি শুধু পরিচালনাই করেননি, ছবিতে অভিনয়, সম্পাদনা ও সংগীত পরিচালনাও করেছেন। সবদিক মিলিয়ে তাঁকে বলতে হয় পূর্ণাঙ্গ শিল্পী। (ড. ফ্রান্স)

তাঁর পরিচালিত ছবির মধ্যে আছে Destroy She Said, India Song, Days in the Trees, Baxter—Vera Baxter. এর মধ্যে India Song ছবিতে ভিস্ক্যালের সঙ্গে সাউণ্ডের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটানো হয়েছে।

## ॥ ডেথ ইন ভেনিস ॥

১৯৭১, ইতালি। শিল্প হলো অস্থায়ী, যা স্বাভাবিক নয়, যা অপ্রকৃতিস্থ, শিল্প তা-ই : এই ছিল টমাস মানের বিধান। তাঁর 'ভেনিসে মৃত্যু' গল্পের খ্যাতিনামা প্রৌঢ় লেখক আশেনবাখ, ঋীর নির্মমভাবে নিয়মিত ধ্রুপদী ধাঁচের লেখা পাঠকমানে রোমাণ্টিক আবেগ ও প্রেরণা সম্পর্কে শ্রদ্ধা জাগানোর জন্তই রচিত একদিন ক্লান্ত হয়ে বেরিয়ে আসতে চান শিল্পের আঙ্গিক থেকে জীবনের শৈলীতে, এবং আবার সমুদ্রের পটভূমিকায় এক নবকিশোরের শরীরের ধ্রুপদী সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন তিনি, আর ঢলে পড়েন তটস্থ মৃত্যুতে। স্বল্প শিল্পচর্চার মধ্যে নিহিত আছে যে মহান বিনষ্টির বোধ শিল্পীকে এমনি করে তার স্বীকৃতি দিতে হয়। মূল কাহিনীর সংলাপের বিরলতা, তব্বের প্রবণতা, সংরক্ত সূক্ষ্মতা ও তীক্ষ্ণ সংবেদনশীলতা ভিসকস্তির ছবিতে স্বাভাবিক ভাবে ততটা নেই, দুঃস্থ মানকে বোধ্য করে তোলার প্রয়োজনে পরিচালক কিছু কিছু জিনিস সহজ করে নিয়েছেন, আশেনবাখও লেখক থেকে ছবিতে পরিবর্তিত হয়েছেন স্বরকারে, তবু এ ছবি মূল উপস্থানের অত্যন্ত ব্যক্তিগত ও অন্তরঙ্গ চিত্ররূপ : স্ফুটিত সংগীত, বলিষ্ঠ অভিনয় ও রঙের মননশীল ব্যবহারে যা অমোঘতা পেয়েছে।

অভিনয়ে Dirk Bogarde, আলোকচিত্র P. De Santis, সংগীত Gustav Mahler, টেকনিকালার।

এই ছবিকে উপলক্ষ করে ১৯৭১য়ে কানে ভিসকস্তিকে বিশেষ 'পঁচিশতম বার্ষিকী পুরস্কার' দেওয়া হয় ॥

বীভশোক ভট্টাচার্য

## ॥ ডেনমার্ক ॥

যদিও ১৮৯৮য়ে ডেনমার্ক চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে তবু নিয়মিত চিত্র প্রযোজনা এদেশে শুরু হয় ১৯০৬ থেকে। এর চার পাঁচ বছরের মধ্যে এখানে চিত্র নির্মাণের বার্ষিক সংখ্যা একশো পেরিয়ে যায়। প্রারম্ভিক পরিচালকদের মধ্যে V. Larsen, A. Blom, B. Christensen ও অভিনেতাদের মধ্যে Asta Nielsen উল্লেখযোগ্য। ডেনমার্কের কাছ থেকেই হলিউড ভ্যাম্প (শৈরিণী নায়িকা)-র রূপ ও চরিত্রের ইমেজটি গ্রহণ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এ দেশের চলচ্চিত্রশিল্পে অবনতি দেখা দেয়। বিশেষ দশকের অধিকাংশ ছবিই ছিল হয় হালকা কমেডি নয়তো কল্পনারহিত নাট্যচিত্র। প্রথম পূর্ণাঙ্গ সবাকচিত্র ১৯৩০য়ে মুক্তি পাবার পর ভাষাগত দুরূহতার জন্তু ডেনমার্কের অধিকাংশ ছবি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জনপ্রিয়তা হারায়। ড্রেয়ারের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ছিল এর প্রধান ব্যতিক্রম। ক্রমে এখানে সংবাদচিত্র, অ্যানিমেটেড চিত্র ও বিশেষ করে তথ্যচিত্র নির্মাণের প্রবণতা বাড়ে, যে প্রসঙ্গে Lauritzen Roos, Henning-Jensen প্রমুখর নাম করা দরকার। ১৯৬৫তে সরকারি ফিল্ম ফাউন্ডেশন ও ১৯৬৬তে জাতীয় ফিল্ম স্কুল স্থাপনের পর নতুনতর পরিচালকের আবির্ভাব হয়, যেমন Carlsen, ১৯৬৯য়ে এখানে ছবি সেন্সর করার নিয়ম তুলে দেওয়া হয়। বর্তমানে ডেনমার্ক বছরে প্রায় পঁচিশটি কাহিনীচিত্র, বহু তথ্য ও স্বল্প দৈর্ঘ্যের চিত্র এবং বিভিন্ন দেশে রপ্তানীর জন্তু অল্পশ্রম যৌনচিত্র নির্মিত হয়। সর্বাধুনিক পরিচালকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য J. Roos, P. K-Schmidt প্রমুখ।

## ॥ ভিত্তোরিয়ো ডে সিকা ॥

(১৯০১-৭৪, ইতালি)। মঞ্চের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা দীর্ঘদিনের। সেখানে তিনি সার্থক কমেডিয়ান। তারপর চলচ্চিত্রে। সেখানে তিনি মহিলা সমাজের প্রিয় তারকা। ম্যাটিনি আইডল। পরিচালনায় প্রথম হাতেখড়ি ১৯৪০-এ। বছর দেড়েক পরে জাভান্তিনির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। জাভান্তিনির বন্ধুত্বই বদলে দিল ডে সিকাকে। জাভান্তিনি বছরদিন থেকে বহু চিত্রনাট্যের রচয়িতা। মন ভরেনি তবুও। তিনি চাইছিলেন আঁকাড়া জীবন। চাইছিলেন এমন ছবি, যা মানবতায় মণ্ডিত। ‘Utile a’ L’homme’, অর্থাৎ ‘films of value to humanity’। তাঁর এই মন্ত্র ইতালির চলচ্চিত্রকে দিয়েছিল নতুন জীবন। ইতালিয় চলচ্চিত্রে তিনিই সেই সন্মানিত মানুষ, যাকে শ্রদ্ধা জানানো হয়, he set the standard.

ডে সিকার জীবনেও জাভাস্তিনির প্রভাব কাজ করল অলৌকিকভাবে। জাভাস্তিনির সান্নিধ্য ডে সিকার হালকা সৃষ্টিতে ছুঁইয়ে দিল মানবতার এবং রাজনৈতিক চেতনার গভীর স্পন্দন। ডে সিকা মুখ ফিরিয়ে নিলেন সস্তা সেক্টিমেন্টের ভেজাল দিয়ে বানানো গল্প এবং বস্তাপচা বাস্তব থেকে। তাঁর জন্মে জাভাস্তিনি লিখতে বসলেন চিত্রনাট্য। ছবির নাম 'দি চিলড্রেন আর ওয়াচিং আস'। এক অবহেলিত শিশুর চোখ দিয়ে দেখালেন তার মা-বাবার দাম্পত্য জীবনের ফাটল এবং ধ্বংস। আসলে দেখালেন বুর্জোয়া সমাজের আপাতঃ বলমলে পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকে কতখানি দুর্বল ক্ষত এবং সবল পাপ। চলচ্চিত্রে এল নতুন আদিক। এল বাস্তবের জীবন যেমন, তারই প্রতিচ্ছবি। শোনা গেল ভিন্ন এক আগামীকালের আগমনী।

কিন্তু সমালোচকদের উষ্ণ সম্বর্ধনা সত্ত্বেও, পয়সা পেল না ছবি। জনতা দেখতে চাইছেন না তাঁদের দেখা-জীবন। মন দমে গেল ডে সিকার। তবু ঘাড়টাকে রাখলেন সিঁধে করে। আবার মিললেন দুই বন্ধু। আবার নতুন ছবির চিত্রনাট্য। ছবির জন্ম আবার ধার দেনা। ছবির জন্মেই এদিক-সেদিক এলোমেলো অভিনয় করে টাকা রোজগার। ছবি হলো। কিন্তু মুক্তি পেল না। আপত্তি জানাল ভার্টিকান-রা। ১৯৪৪-এ তোলা। মুক্তি পেয়েছিল চার বছর পরে ১৯৪৮-এ। তাও স্বদেশে নয়। প্যারিসেই প্রথম।

১৯৪৫। রোজেলিনির হাতে জন্ম নিল, রোম, ওপেন সিটি। এক ছবিতেই সাদা তুললেন পৃথিবীর। ওপেন সিটি হয়ে উঠল নিও-রিয়ালিজমের আদর্শ। তার পরতে পরতে বিদীর্ণ জীবনের নিঃশাস-প্রশ্বাস, মায়ামমতা, উদ্বেগ-আতঙ্ক এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা।

ওপেন সিটির সাহস এবং সাফল্য থেকে ডে সিকা শুষ্ক নিলেন নিজের জন্মে অনেকখানি প্রাণশক্তি। হাত দিলেন নতুন ছবিতে। সু-সাইন। নজর নামালেন সমাজের নিচের তলার অবক্ষয়ের, পোকা পড়া ঘায়ের দিকে। সু-সাইন এবং ওপেন সিটি এক সঙ্গে দেখানো হলো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। বিশ্বের সম্মান মাথায় নিয়ে এঁরা দুজনেই হয়ে উঠলেন ইতালিয় চলচ্চিত্রের নেতা। তারপর ১৯৪৮।

তারপর বাইসাইকেল ধীভস্। ডে সিকার জীবনের অদ্বিতীয় সৃষ্টি। কোনো ইতালিয়ান প্রযোজকই পয়সা ছোঁগাতে রাজি হননি এ ছবিতে। তার পিছনে নিয়তি অথবা ইতিহাসের নির্মম পরিহাস। নিও-রিয়ালিজম নিয়ে সারা পৃথিবী

যখন আলোচনায় মুখর, খোদ ইতালিতে সে তখন সতীনের ছেলে। প্রযোজকরা যে এগিয়ে আসতে গররাজী, তার পিছনে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের হুমকী-মেশানো নির্দেশ। রোজেলিনি, জাভান্তিনি এবং ডে সিকার উপর সরকারি নজর তখন বড় কড়া। কারণ এই লোকগুলো যে জাতের ছবি বানাচ্ছে, তা ইম্মরাল। এই ইম্মরালটির অপরাধেই স্ক-সাইন ১৯৪৬-এ পাঠানো হলো না কান ফেষ্টিভালে। ইতালিতে তখন আমেরিকান প্রযোজকদের আনাগোনা খুবই। ডে সিকাকে টাকা জোগাতে রাজি হলেন ডেভিড ও সেলজোনিক। তাঁর শর্ত কেবল একটাই। প্রধান চরিত্রে চাই একজন নামডাকওয়ালা অভিনেতা। তিনি নাম করলেন ক্যারী গ্রাণ্টের। ডে সিকা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন সেই মনোরম প্রস্তাব।

যেমন করে এসেছেন চিরকাল, তেমনি করেই, অর্থাৎ মঞ্চ এবং চলচ্চিত্রে অভিনয় করে জোগাড় করলেন ছবি তোলায় রসদ। বাইসাইকেল ঋতু তৈরি হলো। চিত্রতারকাহীন। প্রধান চরিত্রে কারখানার একজন মজুর। তার শিশু সন্তানের ভূমিকায় ফুটপাতে কাগজ বিক্রি করা একটি ছেলে। কান-এ পুরস্কৃত হলো এ ছবি। কিন্তু স্বদেশের জনতা ভুলে গেল মালা গাঁথতে। কারণ, 'What the Italian wanted was the glitter, the glamour, the romance of the Hollywood movies after their years of misery and privation.' বাইসাইকেল ঋতু-এর পর মিরাকল ইন মিলান। বাস্তব এবং কল্পনা, রক্ত গন্ধ এবং রম্য পদ্য ছটো মিশিয়ে। ১৯৫১-য়। ১৯৫২-য় আমবাট্টো ডি। ১৯৫৩-য় ইনডিসক্রিশন অব এ আমেরিকান ওয়াইফ। প্রযোজক সেই একদা প্রত্যাখ্যাত সেলজোনিক। প্রধান চরিত্রে প্রখ্যাত দুই চিত্রতারকা। জেনিফার জোনস এবং মন্টেগোমেরী ক্লিফট। আমেরিকান সংস্করণে ডে সিকাকে না জানিয়েই প্রচুর কাটা-ছাঁটা বলতে গেলে নতুন করে সম্পাদনা করা। ১৯৫৬-য় IL TETTO. সামাজিক সমস্যার সঙ্গে কিছুটা হালকা রসের ভিয়েন। ১৯৬০-এ অস্কার জয়। টু-উওমেন-এর জন্মে। নিও-রিয়ালিষ্ট ধারার শেষ ছবি তাঁর হাতে।

তারপরেও তিনি খেমে থাকেন নি। কিন্তু কিছুটা যেন ম্লান। যেন ক্লান্ত। যেন মৃত আশ্রয়গিরি। উত্তাপ আছে হয়তো বা ভিতরে। বাইরে উদ্গীরণ নেই। হয়তো চান পুনরায় ঝাঁপ দিতে সেই মানুষের জীবনে, যাদের সর্বদা কাঁটা আর কাঁদা। কিন্তু পারেন না। এই পরিণাম কি শুধু একা ডে সিকার? না নিও-রিয়ালিষ্ট আন্দোলনের সকল নায়কেরই?

বামপন্থী সমালোচকদের মতে নতুন রাজনীতি, যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি, নতুন

সেপারশিপ্, ক্রিস্টিয়ান ডেমোক্রাটদের প্রাধান্য ইত্যাদিই হলো নিও-রিয়ালিষ্ট  
খান্দেলনের পতনের কারণ। নিও-রিয়ালিজম-এর মৃত্যুর কারণ ছিল আরও।  
ডে সিকা জানতেন সেটা। এবং স্বীকারও করেছেন।

‘The crisis of neo-realism is due precisely to the fact that  
we have exhausted in particular reality which characterized  
the German occupation and the postwar period,...which is  
totally inadequate to represent the new reality.’

সামাজিক দারিদ্র এবং বঞ্চনা, সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত দারিদ্র এবং বঞ্চনা,  
ক্রমাগত এই দুয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ডে সিকা যে একদিন নিজে  
নিঃশেষিত বোধ করবেন, সেটাও খুব অস্বাভাবিক নয়। এবং এই রকম দুর্বল  
মুহূর্তে, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং স্বথ-স্বাচ্ছন্দ্যের আকাঙ্ক্ষা যে তাঁকে চিরাচরিত  
অথবা তার চেয়েও বেশি রোমাঞ্চকরতার কাছে আত্মসমর্পণে বাধ্য করবে, সেটা  
অস্বাভাবিক নয় খুব। তাই হয়েছিলেন তিনি।

বাস্তবতার প্রতি, জীবনের গভীরতর অস্বথ-বিস্বথের ~~প্রতি~~ <sup>পুনরায়</sup> এবং বার  
বার মনোযোগ দিতে গেছেন তিনি। কিন্তু সে-ছবির সর্বদা কি করে যেন  
কেবলই ফুটে উঠেছে, ‘elegant glossiness and a growth in the senti-  
mentality.’

এমনটা যে ঘটবে এটা যেন আগে ভাগেই টের পেয়েছিলেন পরবর্তীকালের  
পরিচালকেরা। তাঁরা জানতেন বাস্তবের অথবা জীবনের উপরকার শুকনো  
চামড়াকে মূলধন করে দীর্ঘজীবী করা যাবে না চলচ্চিত্রকে। এটা আগাম অহুর্ভব  
করেছিলেন বলেই ডে সিকাদের দুই প্রতিভাধর উত্তরাধিকারী, ফেলিনি এবং  
আন্তনিওনি, তাকিয়েছিলেন চামড়া ভেদ করে মানুষের গভীর মর্মমূলের দিকে।

যুদ্ধোত্তর যুরোপের জটিল মানসিকতা, অন্তরের ভিতরে অন্তর্ধাতী অবক্ষয়  
এবং ধ্বংস-এর কাছাকাছি থেকেও ডে সিকার পক্ষে সম্ভব হলো না, তাকে চেনা।  
এবং নিজের এই অক্ষমতাকে তিনি প্রকাশ করেন নির্দিধায়।

‘After the terrible war, myself and my colleagues try to  
change a little this horrible distance between human-human  
being, I don’t understand this period. Criminality is too much  
for my soul. I can’t describe the violence like Kubrick. But  
my artistic possibility, for this horrible life, this horrible

relationship between human being, I can't...I like poetry, I like women, I am not a moralist, but I don't like to see women in pornographic picture, like animals...my goal in pictures is poetry and humanity, humanity and poetry.'

ডে সিকা চরিত্রবান। তাই তাঁকেই সাজে এমন অকপট স্বীকারোক্তি। ডে সিকা হৃদয়বান। তাই তাঁকে বিচলিত করে একালের রক্তাক্ত ক্ষত। ডে সিকা মানবিক। তাই মানুষের ভিতরকার অস্থিমজ্জার ভাঙচোরের চেয়ে তাঁকে বেশি কাঁদিয়েছে মানুষের ওপরকার বেদনা এবং বিপন্নতা। তাঁকে বিচার করবো ঠিকই কিন্তু যেন না ভুলি স্মৃষ্ণ এবং সৎ চলচ্চিত্র, স্মৃষ্ণ এবং সৎ পৃথিবী নির্মাণের জগ্গে স্বচ্ছল এবং খ্যাতিমাখানো মঞ্চ থেকে কিভাবে একদিন তিনি নেমে এসেছিলেন এক বর্বর যুগের নখদন্তময় অন্ধকারে! কিভাবে পুড়েছিলেন সৃষ্টির স্মৃষ্ণে এবং সর্বনাশে। ( দ্র. নিও-রিয়ালিজম )

অশ্রান্ত ছবি : দি কনডেমড অব অ্যালটোন ( ৬২ ), ম্যারেজ ইটালিয়ান স্টাইল ( ৬৪ ), ইয়েস্টারডে টুডে টুম'রো, মানফ্রাওয়ার।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : তাঁর একাধিক ছবির চিত্রনাট্য গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে — যেমন বাইসাইকেল থীভস্, মিরাকল ইন মিলান, ইত্যাদি ॥

পূর্ণেন্দু পত্রী

॥ কার্ল থিয়োডোর ডেয়ার ॥

( ডেনমার্ক, ১৮৮৯-১৯৬৮ )। ১৯২৮ সালে তাঁর তৈরি 'দি প্যাশন অব জোয়ান অব আর্ক' নামে স্মরণীয় ছবিটির জন্ম কার্ল থিয়োডোর ডেয়ারের নাম বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। সারা জীবনে যে চৌদ্দটি পূর্ণ দৈর্ঘ্য এবং সাতটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি তুলেছেন তা ইউরোপের পাঁচটি দেশে তোলা — ডেনমার্ক, সুইডেন, জার্মানি, নরওয়ে এবং ফ্রান্স।

তিনি সাংবাদিকতাকে তাঁর পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন এবং প্রায় ছয় বৎসর বিভিন্ন দৈনিক ও সাময়িক পত্রে ফিচার লেখকের কাজ করেন। ১৯১৩ থেকে ১৯১৮ সালের মধ্যে বিভিন্ন চিত্র পরিচালকের জন্ম তিনি কয়েকটি উপস্থানের কাহিনী অবলম্বনে অনেকগুলি চিত্রনাট্য লিখে দেন।

তাঁর প্রথম নির্বাচক চলচ্চিত্র — 'দি প্রেসিডেন্ট' ( ১৯১৮ )। ছবির সেট-নির্মাণের বাস্তবতা এবং ছোটখাট একমুদ্রা চরিত্রে ও টাইপ অল্পযায়ী অভিনেতা

নির্বাচনে ড্রেয়ার বিশেষ পারদর্শিতা দেখান। দ্বিতীয় ছবি ‘পেজেস্ ফ্রম স্টাটানস্ বুক’ ( ১৯১৯-২১ ) গ্রিকিথের বিখ্যাত ‘ইনটলারেন্স’-এর অল্পসরণে সৃষ্ট হয়। এই ছবিতেও ‘ইনটলারেন্স’-এর মতই ছিল চারটি স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন গল্প। বিভিন্ন যুগে ‘শয়তান’ কিতাবে মানুষকে অসং কাজে প্ররোচিত করে তাই বলতে চাওয়া হয়েছিল চারটি আলাদা আলাদা গল্পের মধ্য দিয়ে। এই ছবির বিষয়বস্তুতে যেমন ছিল ঘোরতর প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারা, তেমনি শিল্পী হিশাবেও ড্রেয়ার গ্রিকিথের কল্পনাশক্তির ধারকাছ দিয়েও যেতে পারলেন না। ড্রেয়ার অবশ্য এই ছবিতে ‘ক্লোজ আপ’-এর ব্যবহার এবং সম্পাদনার কাজে কিছুটা নিপুণতা দেখিয়েছিলেন। তাঁর তৃতীয় ছবি ‘দি পারসনস্ উইডো’ ( ১৯২০ ) একটি কোঁচুককর ও মজার ঘটনা নিয়ে গঠিত। এই কাহিনী নিয়ে ড্রেয়ার অনেকটা গীতিকবিতাধর্মী একটি দলিলচিত্রের মতো করে এই ছবিটি তোলেন। সুইডেনের গ্রাম্য পরিবেশে তোলা এই ছবিটির বাস্তবতা এবং অভিনয়ের মান ছিল যথেষ্ট উচ্চ শ্রেণীর। ‘লাভ ওয়ান অ্যানাদার’, ‘ওয়ান্স আপন এ টাইম’, ‘মাইকেল’, ‘দাও স্টাল অনার দাই ওয়াইফ’, ‘ব্রাইড অব গ্লোমডাল’ তাঁর অন্ত্যস্ত উল্লেখযোগ্য ছবি।

১৯২৮ সালে ফ্রান্সে তোলা হলো ড্রেয়ারের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ছবি—‘দি প্যাশন অব জোয়ান অব আর্ক’। এই অসাধারণ ছবিটি সৃষ্টি করে কার্ল থিয়োডোর ড্রেয়ার এবং ছবির নায়িকা রেনী ক্যালকনেস্তি আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী হলেন। এই ছবিতে বহির্জগতের বাস্তবতার চাইতেও মানুষের মনোজগতের বাস্তবতার উপরে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি চরিত্রের অভিনয়ে অভিনেতাদের সঠিক মানসিকতা ফুটিয়ে তোলার জন্য পরিচালক যে পদ্ধতিটি নিলেন তা স্বরণ করিয়ে দেয় এরিখ ফন স্ট্রাইমের রীতিকে। এই ছবিতে জোয়ান এক সরল গ্রাম্য বালিকা। তাঁর জীবনের পুরো ঘটনা না দেখিয়ে কেবলনাঈ তাঁর বিচারের দৃশ্যটি নিয়ে এই ছবিটি রচিত। মানবিক দুর্বলতা এবং সত্য ও সত্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিপর্যস্ত জোয়ানকে দেখান হয়েছিল অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য ও মনোস্তভাবে। ‘ক্লোজ আপ’-এর অসামান্য প্রয়োগ এবং মানুষের মুখের ছবি দেখিয়েই যে কতো রকমের ভাব প্রকাশ করা চলে তা এই ছবিটি না দেখলে ধারণা করা অসম্ভব।

সংলাপহীনতার প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও জোয়ানের মানবিক আকুলতা, মৃত্যু-ভয় এবং তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্ব শুধুমাত্র মুখের ভাব, চোখের চাহনি, চোঁটের কম্পন এবং শ্রীবার মৃদু সঞ্চালনের মাধ্যমে যে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে প্রকাশ করা হয়েছিল তা এক

অবিশ্বরণীয় ঘটনা। দর্শক এই ছবিতে জোয়ানের বেদনাকে তাঁর নিজের বেদনা বলে অনুভব করতে পারেন অভিনয় ও প্রয়োগ কৌশলের সাফল্যের জন্ত। এই ছবির প্রত্যেকটি দৃশ্য-গঠন এবং জোয়ান, রাজককুল, সৈন্যদল ও জনতার প্রতিটি অভিব্যক্তির ‘ক্লোজ আপ’ বাস্তবতার অন্তর্নিহিত সত্যকে তীব্র আকারে তুলে ধরেছিল। বিষয় ও জুর মুখের নির্ভূর চিত্রায়ণ দর্শককে বিশ্বাসে স্তম্ভিত করে দেয়।

১৯৩২ সালে ড্রেয়ার তাঁর প্রথম সবাক ছবি ‘ভ্যান্স্পায়ার’ তুললেন। অসাধারণ ভিস্যুয়াল সৌন্দর্যে ছবিটি সমৃদ্ধ ছিল। সম্ভবত এই ছবিটি ড্রেয়ারের সবচাইতে চিত্রকল্প-সমৃদ্ধ ছবি। এরপর চলচ্চিত্রের জগৎ থেকে ড্রেয়ার প্রায় দশ বছরের মতো বিরতি নেন। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৪ এই নয় বছরে কোনো পূর্ণ-দৈর্ঘ্য ছবি তিনি তুললেন না। তার বদলে তুললেন ছয়টি স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র। তাঁর সর্বশেষ ছবি ‘জেরস্টুড’ (১৯৬৪) দর্শক এবং সমালোচক মহলে খুব বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। ছবিটিতে থিয়েটারী ঢঙকে কিছুটা প্রাধান্য দেওয়ায় এটি একটি সংলাপ-প্রধান চলচ্চিত্র হয়ে রইল। স্ত্রী-চরিত্রের মনস্তত্ত্বকে ফুটিয়ে তুলতে ড্রেয়ারের যে অসাধারণ দক্ষতা ছিল, তা তাঁর এই শেষ ছবিতেও বলিষ্ঠভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

ড্রেয়ারের ইচ্ছা ছিল যীশু খ্রীষ্টের জীবনী নিয়ে একটি বড়ো ছবি তুলবার। এই ছবির চিত্রনাট্যও রচনা শেষ হয়ে গিয়েছিল। ছবিটি তৈরির কাজ নিয়ে যখন তিনি ব্যস্ত এমন সময়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

চলচ্চিত্রের তাস্তিক দিক নিয়েও তিনি চিন্তাভাবনা করেছেন বিস্তর। চলচ্চিত্র বিষয়ে যে কয়েকটি লেখা তাঁর পাওয়া যায় তা যথেষ্ট মূল্যবান। এর মধ্যে রঙ সংক্রান্ত আলোচনাটি খুবই উল্লেখযোগ্য।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : T. Milne-র দি সিনেমা অব কার্ল ড্রেয়ার ৷

রজত রায়

## ॥ তথ্যচিত্র ॥

তথ্যচিত্র হলো ডকুমেন্টারির বাংলা প্রতিশব্দ। চলচ্চিত্র হলো বাস্তব জীবনের প্রতিবিম্ব; এই মতবাদ থেকেই ডকুমেন্টারির জন্ম, শব্দগত অর্থ ধরলে যে কোনো ধরনের তথ্যচিত্র বা সংবাদচিত্রকেই ডকুমেন্টারির কোঠায় ফেলতে হয়। কিন্তু সংবাদচিত্র শুধুমাত্র বিবরণ, শুধু বাস্তব দৃশ্যাবলীর সম্পাদিত সমাবেশ, এক রকমের ক্যামেরা-রিপোর্টাঁজ। ডকুমেন্টারিতে আমরা পাই বাস্তব জীবনের বিভিন্ন উপা-

দানের শিল্পসম্বন্ধ সংগঠন ও তার সামাজিক ব্যাখ্যা ; প্রখ্যাত ডকুমেন্টারি তাত্ত্বিক গ্রীয়ারসন যাকে বলেছেন 'the creative treatment of actuality' । কিন্তু শুধুমাত্র যদি বাস্তব জীবনের চিত্রণই ডকুমেন্টারির লক্ষণ হয়, তবে সে দাবি বহু নামকরা কাহিনীচিত্রেরও। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে, ডকুমেন্টারি হচ্ছে বাস্তবের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া এবং কাহিনীচিত্রে জীবনের রূপ অপ্রত্যক্ষভাবে শিল্পরসোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত ডকুমেন্টারিতে চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাত বা মানবমনের অন্তর্লীন দৃষ্টির প্রক্ষেপণ অল্পপস্থিত। তৃতীয়ত ডকুমেন্টারিতে সাধারণত কোনো কেন্দ্রচরিত্রের স্থান নেই এবং সমস্ত মানুষের সমবায়ে গঠিত জীবনসত্তার অন্বেষণই ডকুমেন্টারির লক্ষ্য। ডকুমেন্টারির উপাদান, কাহিনী, চরিত্র, সবই বাস্তব জীবনের পরিবেশ থেকে গ্রহণীয়। স্টুডিওজাত বাস্তবের অল্পকৃতি বা পেশাদারী অভিনেতার অভিনয়কৌশল এখানে অচল। ডকুমেন্টারির বিশেষ কোনো বাঁধাধরা চিত্রনাট্য না থাকলেও চল কারণ চিত্রগ্রহণের সময় এমন অনেক ঘটনা ঘটে যে-গুলোর অন্তর্ভুক্তি ছবির বাস্তবতা বাড়িয়ে দেয়। এই প্রত্যক্ষ জীবনসত্যের উপলব্ধি ও তার অভিব্যক্তিই ডকুমেন্টারির অল্পতম প্রধান উদ্দেশ্য। এখানেই কাহিনী-চিত্রের সঙ্গে তার একটা বড়ো পার্থক্য। দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরা যাক, একটি বিখ্যাত কাহিনীচিত্র ও বিখ্যাত ডকুমেন্টারির কথা: আইজেনস্টাইনের 'ব্যটেলশিপ পট্টেমকিন' ও ইয়োরিস ইভেনস্-এর 'স্প্যানিশ আর্থ'। প্রথমটি ১৯০৫ সালের রাশিয়ার বিদ্রোহের সময় জার-সৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে ওভেসার জনতা ও পট্টেমকিন যুদ্ধজাহাজের সম্মিলিত সংগ্রামের কাহিনী। আর দ্বিতীয়টি স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময়কার প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রায় প্রামাণ্য চিত্র (যদিও পরে কিছু অভিনীত দৃশ্য এই ছবিতে নেওয়া হয়)। দুটিই বিদ্রোহী সংগ্রামের ছবি। কিন্তু প্রথম চিত্রটির নায়ক-নায়িকা কেউই বাস্তব জীবনে সেই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেনি বা চিত্রোক্ত ঘটনাগুলোও তাদের জীবনে সত্যি সত্যি ঘটেনি। কিন্তু দ্বিতীয় চিত্রটিতে যে সৈনিকেরা যুদ্ধ করছে, যে যুদ্ধরত সৈন্যরা গুলি খেয়ে মরে যাচ্ছে, তারা সত্যিকারের সৈনিক এবং চিত্রোল্লিখিত ঘটনাগুলি তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারই চিত্ররূপ। কিন্তু পরিবেশ বা চরিত্রের সততা রক্ষা ছাড়াও ডকুমেন্টারির আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। ধরা যাক ঋতুসমস্তা নিয়ে একটি ডকুমেন্টারি তৈরি হবে। পরিচালক কী নীতি অনুসরণ করবেন? এখানে পরিচালক ঋতুসমস্তার বিষয়টির বাস্তব রূপ দেবার জন্তু যে উপাদান প্রয়োজন সেগুলি নির্বাচন করে সমস্তাটির সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কারণ ও ফলাফল বিশ্লেষণ করবেন

এবং দরকার মনে করলে সমস্ত সমাধানের ইঙ্গিতও দিতে পারেন। এখন প্রশ্ন হলো, কী করে এই উপাদানগুলির শিল্পরূপ দেওয়া সম্ভব? একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে সমস্ত জিনিসের মধ্যেই স্বকীয় একটা ছন্দ আছে এবং বিশিষ্ট আঙ্গিকের সাহায্যে ঐ ছন্দের মর্মোদ্ঘাটনেই থাকে শিল্পত্ব। ঝাঁরা লোহার ব্যবহার নিয়ে তোলা ভারত সরকারের ডকুমেন্টারিটি কিংবা ইংলণ্ডের রোনাল্ড রীলের 'স্টীল' ছবিটি দেখেছেন, তাঁরা বুঝবেন কিভাবে ক্যামেরা-সংস্থান, যথোচিত আলোক-সম্পাত এবং সম্পাদনার সাহায্যে কারখানার যন্ত্রপাতি এমনকি লৌহ-পিণ্ডগুলিকেও জীবন্ত রূপ দেওয়া হয়েছে। আবার হ্যারি ওয়াটের 'নাইট মেল' ছবিতে শব্দের সার্থক সমাহার (ফ্রেনের চাকার শব্দের সঙ্গে নেপথ্যভাষ্যে অডেন পঠিত কবিতার ছন্দ-বন্ধ সঙ্গতি) আমাদের চোখ এড়ায় না। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে বিষয়বস্তুর ছন্দ বা তার বাইরের দৃশ্যসৌষ্ঠবের সঙ্গে তার অন্তর্নিহিত অর্থ, তাঁর সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্থান এবং তার বাস্তব প্রয়োজনের দিকটাও যেন অবহেলিত না হয়। এই জন্ত ডকুমেন্টারির ভঙ্গি হবে সরল। চলচ্চিত্রের আদিয়েগে জীবনের নানা ক্ষেত্র থেকে উপাদান সংগ্রহ করে সেগুলির চিত্রবিবরণী জনসাধারণের কাছে উপস্থাপিত করা হত। এই প্রসঙ্গে লুমিয়ের-এর চিত্রগুলি (১৮৯৫), রাগী ভিক্টোরিয়ার হীরক জুবিলী (১৮৯৭) ও তাঁর শবযাত্রার দৃশ্য (১৯০১) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই সময় থেকেই নিয়মিত ভাবে সংবাদচিত্র নির্মাণ শুরু হয়। এর মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কিছু পরেই মুক্তিপ্রাপ্ত যুদ্ধক্ষেত্রে তুলে রাখা দৃশ্যাবলীর ক্রম উলফ কর্তৃক সম্পাদিত এক সংস্করণ, ডাঃ আর. জি. কাণ্টির জীবকোষ সম্পাদিত চিত্র (১৯২৪), হার্বার্ট পলিং-এর 'ওয়াইল্ড স্ট ইন দি অ্যান্টার্কটিক' (১৯১০) ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। ঐতিহাসিক ও শিক্ষা-মূলক দিক থেকে মূল্যবান হলেও এদের শিল্পমূল্য অকিঞ্চিৎকর। এই অসম্বন্ধ চিত্রসমাবেশকে শিল্পবস্তুতে পরিণত করবার জন্ত ধীরে ধীরে এক আন্দোলন গড়ে ওঠে। এর উৎস ছিল ইংলণ্ড এবং পুরোধা ছিলেন জন গ্রীয়ারসন। সমুদ্রে হেরিং শিকার নিয়ে তৈরি গ্রীয়ারসনের ছবি 'ড্রিফটার্স' (১৯২৯) ডকুমেন্টারির ক্ষেত্রে এক নতুন দিগদর্শনের সূচনা করল। 'ড্রিফটার্স'-এর পরেই উল্লেখযোগ্য বেসিল রাইট-এর 'সং অব সিলোন' (১৯৩৫), সিংহল-জীবনের বর্ণনায় সমৃদ্ধ এই ছবিটির কাব্যগুণ অতুলনীয়। তিরিশের দশককে ইংলণ্ডের ডকুমেন্টারির স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। ডকের জীবনযাত্রার চিত্র পল রোথার 'শিপইয়ার্ডন' (১৯৩৫), আর্থার এলটন ও এডগার অ্যান্দের গৃহসমস্টার চিত্র 'দি হাউসিং প্রবলেমস'

( ১৯৩৫ ), হ্যারি ওয়াট ও বেসিল রাইটের 'নাইট মেল' ( ১৯৩৬ ), এডগার অ্যান্‌স্টের ষাণ্মসম্ভার ছবি 'এনাফ টু ইট' ( ১৯৩৬ ) এবং 'কোলকেন', 'দি ফেস অব ত্রিটেন' ইত্যাদি চিত্রগুলি যে শুধু বিষয়বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ তাই নয়, শিল্পরসাবিভ সমাজ চেতনায় উদ্ভূত। সোভিয়েত রাশিয়ায় জিগা ভের্তভ-এর নেতৃত্বে ক্যামেরার বাস্তব-অন্বেষণের এক নতুন ধারা আরম্ভ হয়। এবং তাঁর তৈরি 'দি ম্যান উইথ দি মুন্ডি-ক্যামেরা' ( ১৯২৩ ) নতুনভাবে জীবনকে চিনতে শেখাল। হল্যান্ডের ডকুমেন্টারি আন্দোলনের অগ্রগামী ছিলেন ইয়োরিস ইভেন্স এবং তাঁর ছবিগুলির মধ্যে 'স্প্যানিশ আর্থ', 'রেইন', 'সী মিটস্‌ প্যারিস' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। স্পেনে লুই বুল্‌য়েল নিমিত্ত 'ল্যাণ্ড উইদাউট ব্রেড' ( ১৯৩২ ) দারিদ্রপীড়িত বাস্তব অবস্থার এক নিষ্ঠুর চিত্র। আমেরিকাতে পিয়ের লোরেঞ্জ-এর 'দি প্রাউ ডাট ব্রোক দি প্লেনস' ( ১৯৩৬ ) ও 'দি রিভার' ( ১৯৩৮ ) ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। ডকুমেন্টারির সাধারণ মনোভাব থেকে ভিন্ন দৃষ্টি নিয়ে জীবনকে চিত্রায়িত করলেন রবার্ট ফ্ল্যাহার্টি। তাঁর চরিত্রগুলি এক স্বপ্নময় পরিবেশের মাহুয়, এই মাটির পৃথিবীর সঙ্গে তাদের যোগসূত্র যেন খুবই অল্প। সেই পরিবেশের মধ্যে তাদের অন্তরঙ্গ অনুভূতির বিকাশই ফ্ল্যাহার্টির বিষয়বস্তু। তাঁর তৈরি 'নালুক অব দি নর্থ', 'মোয়ানা', 'টারু', 'ম্যান অব আরান,' 'লুইসিয়ানা ষ্টোরি' প্রভৃতি চিত্রনাট্যের আঙ্গিক, পরিবেশের চিত্রণ এবং কাব্যগুণের বিচারে নিঃসন্দেহে সার্থক সৃষ্টি। যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডে হ্যারি ওয়াট রুত 'টার্গেট ফর টু নাইট' মিত্র পক্ষের ফ্যান্সী-বিরোধী অভিযানের এক সার্থক শৈল্পিক রূপায়ণ। যুদ্ধকালীন ইংলণ্ডের সাধারণ মাহুয়ের জীবন নিয়ে রচিত হামফ্রে জেনিংস-এর 'ফায়ারস ওয়ার ষ্টার্টেড' এবং 'এ ডায়েরি ফর টিমথি' জনগণের মনোবল অক্ষুণ্ন রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া আমেরিকার 'মার্চ অব টাইম' চিত্রমালা, জন হাঈন-এর 'দি ব্যাটল অব সান পিয়েরো', সোভিয়েত রাশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রের ছবিগুলি তৎকালীন বাস্তব অবস্থার প্রতিফলনে সমৃদ্ধ। যুদ্ধের পর ডকুমেন্টারিতে এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়। ইংলণ্ডের 'ফ্রি সিনেমা' আন্দোলন দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যকে চিত্রায়িত করতে সাহায্য করে। ফ্রান্সে 'সিনেমা ভেরিতে' ও আমেরিকার লীক্‌-রোগোসিন-নেতৃত্বে 'ভিরেষ্ঠ সিনেমা' আন্দোলনে হাত-ক্যামেরা এবং সরাসরি শব্দগ্রহণের মাধ্যমে চলচ্চিত্রে বাস্তবের এক নতুন মাত্রা আবিষ্কৃত হয়। হল্যান্ডের বার্ট হানস্ট্রার গভীর মানবতাবোধে উদ্ভূত কাব্যচিত্রগুলি এবং থর্নডাইক-দম্পতির আধুনিক জার্মানির ইতিহাস এবং রুশবিপ্লব সম্পর্কিত ছবিগুলিও সাম্প্রতিককালে

ডকুমেন্টারির এক নতুন পথের নিশানা এনে দিয়েছে। ভারতবর্ষে Paul Zils-এর একাধিক ছবি, 'খাজুরাহো', 'কোনারক' ( হরিনাধন দাশগুপ্ত কৃত ), 'ভাকরানাঙ্গাল', 'দি ভ্যানিশিং হ্রাইব', 'আনন্দ কুমারস্বামী' ( চিদানন্দ দাশগুপ্ত কৃত ) ইত্যাদি ছবিতে ডকুমেন্টারির বিশিষ্ট শিল্পরীতির ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে F. Billimoria বা J. Bhownagary-র ছবির কথাও উল্লেখযোগ্য। স্বহৃদেবের 'অ্যাণ্ড মাইলস্ টু গো' বা 'ইণ্ডিয়া ৬৭', বিহারের ছুভিক্ষের ওপর 'রিপোর্ট অন ড্রট' কিংবা প্রতাপ শর্মার 'ফ্রেমওয়ার্ক অব ফেমিন', ভারতীয় গণতন্ত্রের ভূমিকা নিয়ে বহু বিতর্কিত 'ফেস টু ফেস' ( আব্রাহাম ও চারি পরিচালিত ) এবং 'ট্র্যানজিশন', 'হাংরি অটাম' ( গৌতম ঘোষ কৃত )—এই ধরনের ছবিগুলিতে ও তরুণতর পরিচালকদের নতুন-নতুন ছবিতে দায়িত্বশীল সামাজিক চেতনার সঙ্গে শিল্পচাতুর্যের মিশ্রণে এক নতুন রসের সৃষ্টি হয়েছে। ( ড. নূতন-ও চলচ্চিত্র )

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : W. H. Baddeley-র দি টেকনিক অব ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রডাকশন, পল রোথার ডকুমেন্টারি ফিল্ম ।

### মৃগাক্ষশেখর রায়

[ মারী সীটনের ভাষায়, তথ্যচিত্রকে একটা নির্দিষ্ট ও স্বতন্ত্র ধারা করে তোলার কাজে, এই বিশেষ চিত্রশৈলীর প্রতি সরকারি ও প্রাতিষ্ঠানিক এবং জনগণের স্বীকৃতি আদায়ের জন্ত লেখা, বলা ও সংগ্রাম করার মানসিকতায় সারা পৃথিবী জুড়ে কত মানুষ যে একজোট হয়েছেন ! প্রথম থেকেই তথ্যচিত্রের ভিত্তিভূমি ছিল এক ধরনের প্রাণবন্ততা; যার পিছনে সক্রিয় স্বাধীন, শোষণবাদী ও মননগতভাবে সৃজনশীল এক যৌথ আয়াস। আর প্রায় সমস্ত দেশেই তথ্যচিত্র আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল স্বাধীন ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রচার।

বিশের দশকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ সিনেমায় বাস্তবতা ও বাস্তববাদ সম্পর্কে প্রথমে সচেতন হয়ে ওঠে পটেমকিন ছবির মাধ্যমে। বস্তুত আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্র বিষয়ক তাত্ত্বিক মতবাদ তথ্যচিত্রের নির্মাণকর্মকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। রোথা তখনই বুঝেছিলেন, জোরালো সামাজিক উদ্দেশ্য বিশিষ্ট এই ছবি এমন এক শৈলীতে রূপায়িত যা নিজেই বাস্তবতার ধারক ও বাহক।

দীর্ঘকাল ধরে কত বিচিত্র ধরনের ছবি তথ্যচিত্রদর্শনকে পরিপুষ্ট করার কাজে সাহায্য করেছে। তার মধ্যে (যে সমস্ত নাম এখনো করা হয়নি) আছে আঞ্জিলের আলবার্তো কাতালকাস্তির ফ্রান্সে তোলা গুরুত্বপূর্ণ নির্বাক ছবি 'Rien que les heures' ( ১৯২৬ ), প্রায় একই সময়ে জার্মানিতে ওয়ালথার রুটমানের তৈরি

নগরজীবনের শিক্ষণি 'বালিন', প্রাকৃতিক ও জীববৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে ইংলণ্ডে তোলা পাদি শ্বিথ-এর আনুভৌক্ষণিক চিত্র 'সিক্রেটস অব নেচার', ফ্রান্সের Jean Painleve-এর মাছ নিয়ে চমকপ্রদ ছবি, সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আসা ভিক্টর তুরিন-এর প্রভাবশালী তথ্যচিত্র 'ভুক্সিব', প্রখ্যাত মার্কিন আলোকচিত্রী পল স্ট্রাণ্ডের মেক্সিকোতে গিয়ে করা পূর্ণ দৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র 'দি ওয়েভ', ফ্রি সিনেমা ধারার ছবি 'মমা ডোন্ট অ্যালাও' ও 'টুগেদার', এবং অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালে রেনে ক্লেই-র 'Batail du Rail', অসাধারণ কল্পনাসমৃদ্ধ ফরাসি চিত্র 'দি হিষ্টি অব দি গোল্ডেন ফিশ', সুইডেনের আর্নস্টক্লডফ-এর 'দি গ্রেট অ্যাডভেঞ্চার' ও 'দি ফুট অ্যাণ্ড দি য়ারো', তথ্যচিত্রসম জাপানি চিত্র 'চিল্ড্রেন অব হিরোশিমা'. মানসিকভাবে সঙ্কটাপন্ন এক নিগ্রো বালককে নিয়ে তোলা মার্কিন চিত্র 'দি কোয়াইট ওয়ান', ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে তিনটি অবিষ্মরণীয় কাহিনীচিত্রও; যার প্রতিটিই তথ্যমূলকতায় চিহ্নিত, উল্লেখনীয় : আইজেনস্টাইনের 'পটেমকিন', পাবস্ট-এর 'কামেরাদ্‌শাফট' ও ডে সিকার 'বাইসাইকেল থীভস'। রোজেলিনির 'ওপেন সিটি'র কথাও উল্লেখ করা যায়। চলচ্চিত্রের ইতিহাসে তথ্যচিত্র স্থলভ রীতির প্রভাব এত জোরদার হয়েছে যে বহু দেশে আধুনিক কাহিনীচিত্রের মধ্যে ক্রমেই আরো বেশি করে তথ্যচিত্রীয় উপাদানের প্রবেশ ঘটছে। এটা স্বাভাবিক, কেননা তথ্যচিত্র ধরতে পারে সমকালের স্পন্দনকে, কোনো স্থানের বৈশিষ্ট্যকে, কর্মকাণ্ডের প্রকৃতিকে, আর জনগণচরিত্রকে।

পল রোথা তথ্যচিত্র সম্পর্কে তাঁর বইয়ের পরিশিষ্টে বলছেন, যতদিন পর্যন্ত ক্যামেরা ও ফিল্ম স্থলভ থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তথ্যচিত্রের জ্ঞান প্রয়াস বজায় থাকবে। কিন্তু এর সঙ্গে আরো দরকার হবে অন্তর্নিহিত শিল্পগুণের, ফলাফলের কথা ততটা না ভেবে কাজ করার মানসিকতার ও সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার। সর্বোপরি দরকার হবে উদ্দেশ্য সততার এবং মানুষের সহানুভূতি ও সহনশীলতার ক্ষমতা সম্পর্কে বিশ্বাসের। বহু দেশের বহু ব্যক্তির তথ্যচিত্রে অতীতে এ-সমস্তই সম্ভব হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে।]

॥ তথ্যচিত্রায়ণ ॥

'সুন্দর শাদা গোলাপ।' বললে তথ্যের অতিরিক্ত বলা হয়। কারণ শাদা গোলাপ সুন্দর কিনা—বিবেচ্য।

একজন সাংবাদিক বলবেন, 'শাদা গোলাপ'। কারণ ওইটুকুই সংবাদ। অহং-বর্জিত সাহিত্যেও 'সুন্দর' কথাটা বাদ যাবে। কিন্তু সংবাদ পরিবেশন সাহিত্যের কাজ না। তাই 'সুন্দর' কথাটা থাকতে পারে 'শাদা' কথাটার মোড়কে—অমুক্ত, গভীরে। অর্থাৎ শাদা কথাটা প্রসঙ্গের মধ্যে পড়ে একটা নাটকীয়তা রচনা করবে যার মধ্যে লুকিয়ে থাকবে 'সুন্দর' কথাটা। শিল্পের ক্ষেত্রেও শাদা গোলাপ মতব্যে সুন্দর নয়, সুন্দর যদি হয় তবে তা শাদা গোলাপের নাটকীয়তায়, ক্রিয়ায়—রূপান্তরে।

সংবাদে সাহিত্যে শিল্পে তথ্যের ব্যবহারিক ভিন্নতা তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন জাগাতে পারে। মাধ্যমভেদে তথ্যের মূল্য-মান কি অবিকৃত থাকবে না? লক্ষণীয় যে সকল তথ্যেরই দ্বিস্তর সত্য থাকে : বাইরের এবং ভেতরের। তথ্যের বাইরের সত্য নিয়ে সংবাদের কাজ। সাহিত্যে শিল্প কাজ করে তথ্যের ভেতরের সত্যকে নিয়ে।

'ঘটে যাহা তাহা সত্য নহে। সেই সত্য যাহা রচিবে তুমি।' রবীন্দ্রনাথের এই কথার মধ্যে সাহিত্যে শিল্পে তথ্যের সত্য নির্ণয়ের নির্দেশিকা রয়েছে। কারণ ঘটনার রচনার মধ্যে আসে দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্দেশ্যের প্রশ্ন। একই বস্তু বা বিষয় বিভিন্ন উদ্দেশ্যে দৃষ্টিকোণে ভিন্ন তাৎপর্য ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। দৃষ্টিভেদে, স্থানভেদে, প্রাণে, রূপে তা বহু সত্যের একতা পায়। তবেই তা শিল্পের সত্য হয়ে ওঠে। বিচ্ছিন্ন সত্য সত্য নয়—শিল্পের ক্ষেত্রে মোটেই নয়। বহুস্তর সত্যের একতা পেলে তা বিশ্বনিয়মের সঙ্গে মেলে। বিশ্বনিয়মের সঙ্গে না মিললে কোনো কিছুই সত্য নয়—শিল্পের ক্ষেত্রে তো নয়ই।

তথ্য ও উপকরণের সমন্বয়ে একটা রচনা তৈরি হতে পারে। তা শিল্প হয়ে উঠতে পারে। ঐ রচনা বা শিল্প সত্য হয়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে তথ্যের প্রয়োজন হতে পারে এবং তা তথ্যভিত্তিক হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু শুধু তথ্যই যে ক্ষেত্রে প্রতিপাদ? যখন তথ্যচিত্রে নির্মাণের প্রশ্ন আসে?

তথ্যচিত্রও রচনা / নির্মাণ করতে হয়। তথ্যের সংকলন ও পরিবেশনে দৃষ্টি-ভঙ্গির ও উদ্দেশ্যের প্রশ্ন জড়িয়ে যায়। রচয়িতা বা নির্মাতার নিজস্ব বা পরস্ব দৃষ্টি-ভঙ্গিতে ও উদ্দেশ্যে তথ্যে যে মাত্রা বা মূল্য আরোপিত হয় তার মধ্যেই তথ্যচিত্রের তথ্যের সত্যের স্থান। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, এই সত্যই ঘটনার রচনার মধ্যকার সত্য রূপ।

একজন সাংবাদিক যেমন শাদা গোলাপ বলে নিরপেক্ষ সংবাদ দিতে পারেন ;

চিত্রনির্মাণ তা পারেন না। কারণ শাদা গোলাপের নিরপেক্ষ ছবি তোলা যায় না। শাদা গোলাপের ছবি স্নন্দর কিংবা অস্নন্দর ( অথবা অল্প বিশেষণায়ক ) হয়ে উঠবেই। কারণ ছবি তোলার, আঁকার কোনো নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ হয় না। চিত্রনির্মাণের নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ নেই। তথ্যচিত্র নির্মাণও নেই। তাঁর ছবি শিল্প বা অশিল্প পর্যায়ভুক্ত হতে পারে। কিন্তু শিল্পে নিরপেক্ষতা বলে কিছু হয় না। অশিল্পে তো হয়ই না। শিল্পে উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হবেই। শিল্পী থাকেন ঐ উদ্দেশ্যের সপক্ষে। ইয়োরিস ইভেন্স কোনো ঘটনাকে তার সংবাদমূল্যে বিচার করতে চাননি। তুচ্ছ বৃহৎ সব ঘটনাকে বিচার করেছেন বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ দিক হিশেবে—এবং তা দিয়ে দর্শককে জিয়াশীল করে তোলার কথা বলেছিলেন।

চলচ্চিত্রের শিল্প সম্ভাবনার মধ্যে একটা নির্বন্ধ ও একটা অনুবন্ধ আছে। সেই নির্বন্ধ এই রকম : উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্যের অনুসারী বিষয়, বিষয়ের অনুসারী বিশ্বাস বা কাহিনী, বিশ্বাস বা কাহিনীর অনুসারী পটভূমি, পটভূমির অনুসারী পরিপ্রেক্ষিত, পরিপ্রেক্ষিতের অনুসারী পরিবেশ, পরিবেশের অনুসারী পরিমণ্ডল। তার অনুবন্ধ হলো : উদ্দেশ্য থেকে পরিমণ্ডল পর্যন্ত একটা অনিবার্য, অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কসূত্র। এই নির্বন্ধ ও অনুবন্ধ সর্বত্র সঠিক হলে একটা ভাবের আবহ গড়ে ওঠে। চলচ্চিত্রে শিল্পের স্থান ঐ আবহের মধ্যে।

উপরোক্ত সম্পর্ক অনিবার্য বলে তা নিজের নিয়মে গড়ে উঠতে চায়। আবার সেই সম্পর্ক রচনা করতে হয় বলে তাকে অনিবার্য পথে চালনা করতে হয়। অর্থাৎ শিল্পী, শিল্পের নিয়মের মধ্যে একপ্রকার স্বাধীনতা বোধ করেন—নিয়মানুবর্তী স্বাধীনতা। প্রয়োজনে বা ইচ্ছায় নিয়ম গড়ে তোলার স্বাধীনতা। সেক্ষেত্রে বিষয় নির্বাচনেই তাকে সতর্ক হতে হয়। এমন কোনো বিষয়ই হয়ত নির্বাচিত হয় যা চলচ্চিত্র মাধ্যমেই শিল্পসম্মতভাবে প্রকাশ করা যায়—সংগীতে, চিত্রে, স্থাপত্যে না। এমন বিষয়ই হয়ত নির্বাচিত হয় যার স্বভাব, গতি-প্রকৃতি, ধর্ম-নিয়তি প্রয়োজন মতো পরিবর্তন করা যায়। ঐ অনিবার্য সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্মই করা যায়। অর্থাৎ স্বাধীনতা, এখানে, তৈরি করে নেওয়া যায়।

তথ্যচিত্রের ক্ষেত্রে, এক্ষেত্রে, কিছু সমস্যা আছে। এখানে স্বাধীনতা খোঁজ করে নিতে হয়। একমাত্র সুযোগ থাকলেই স্বাধীনতা অর্জন করে নেওয়া যায়। অথবা স্বাধীনতা লাভের সুযোগ থাকলেই বিষয়কে তথ্যচিত্রের জন্ম গ্রহণ করা যায়। তবে তথ্যচিত্রের ক্ষেত্রেও ‘সম্পর্কসূত্র’ কাজ করে। তাই ক্ল্যাটার্টিকে যখন ইউনাইটেড স্টেটস-এ ‘চাষের জমির অপব্যবহার ও সেই কারণে কৃষি শ্রমিকের

বেকারত্ব' বিষয়ে ছবি করতে পাঠান হয়, তিনি রচনা করে বসেন জমি ও মাছের সম্পর্কের এক চিত্র-কবিতা। 'কৃষি শ্রমিকের বেকারত্ব' হয়ে যায় 'কৃষি শ্রমিকের সংখ্যার ঘাটতি'। পল রোথার ভাষায়—যে ছবিতে 'The land goes beneath the surface to the timeless essentials of the relation of man to the earth.'

কাহিনীচিত্রে যদি বিষয় আগে এবং তথ্য পরে অর্থাৎ নির্ধারিত বিষয় অনুযায়ী তথ্য অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয়, তবে তথ্যচিত্রের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাটা সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে তথ্য আগে, বিষয় পরে—তথ্য থেকে বিষয়ের সন্ধান। তথ্য থেকে বিষয় গড়ে উঠলে, সেই বিষয় অনুযায়ী তথ্য ও উপকরণের সন্ধান শুরু হয়। ইয়োরিস ইভেন্স বলেছেন তিনি একটা কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্যের কথা মনে রেখে ঘটনার সন্ধান করেন। অর্থাৎ তথ্য থেকে বিষয় সৃষ্টি হলেও ওই বিষয়টাই হয়ে ওঠে নিয়ামক ও নির্বাচক। বিষয়ের নিরিখেই হয় তথ্য নির্বাচনের কাজ। 'বিষয়ের নিরিখে নির্বাচিত হয় বলে তথ্যগুলি একটা সম্পর্কস্থলে গাঁথা হয়ে যায়। সম্পর্কস্থলের মধ্যে না পড়লে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও অপ্রয়োজনীয়। একজন মৎস্যজীবীর জীবন নিয়ে তথ্য-চিত্রে 'জাল' বা 'ফাৎনা'-র সংজ্ঞাও অপ্রাসঙ্গিক হতে পারে যদি না ওই 'জাল' বা 'ফাৎনা' ছবির কেন্দ্রীয় বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়। মৎস্যজীবীর জীবন যদি জালে আবদ্ধ মাছের মতো বা ফাৎনার মতো ভাসমান হয়—বা ঐ প্রকার কোনো গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত যদি ছবিতে থাকে, তবেই জাল বা ফাৎনার প্রসঙ্গ সুপ্রযুক্ত হয়ে ওঠে। কেন্দ্রীয় বিষয়ের দিকে তাকিয়ে তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহের প্রকৃষ্ট উদাহরণ বার্ট হানস্টার কাঁচ বিষয়ক ছবি দুটি। একটির বিষয় কাঁচের দৈনন্দিন ব্যবহারের সঙ্গে সম্পর্কিত, অল্পটির কাঁচের রূপান্তরের সঙ্গে। একটিতে কাঁচ যেন দৈনন্দিন জীবনের চারদিক ঘিরে রেখেছে; অল্পটিতে কাঁচ যেন জীবনের মতো বৈচিত্র্যময়।

তথ্যচিত্রের বিষয় ও তথ্যাবলীকে কাহিনীচিত্রের প্রবান ও পার্শ্চরিত্রগুলির সঙ্গে তুলনা করা চলে। কাহিনীচিত্রে প্রধান চরিত্র যেমন এমন সব পার্শ্চরিত্রের সংস্পর্শে আসে যারা প্রবান চরিত্রের গঠন ও উদ্দেশ্যকে সাহায্য করে; তথ্যচিত্রে বিষয়ের গঠনে ও উদ্দেশ্যে সাহায্য করে তথ্যাবলী। তবে কাহিনীচিত্রের walk-on characters যেমন প্রধান চরিত্রের পরিবেশ ও মানসিকতায় তাৎক্ষণিক ক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে, তথ্যচিত্রে কোনো তুচ্ছ তথ্যও তা পারে না। তথ্যচিত্রের সবটাই থাকে কেল্লের সাথে সম্পর্কিত। কাহিনীচিত্রে প্রতীকের ব্যবহার যেমন সমগ্র বা অংশকে প্রভাবিত করতে পারে, তথ্যচিত্রে ঐ প্রভাব শুধুই সমগ্রের ওপর।

তাই পল রোথার ভাষায় ক্ল্যাফার্টের ছবিতে machine cutting corn হয়ে যার machine cutting lives এবং তা ছবিতে সমগ্র উদ্দেশ্যের ওপর প্রভাব ফেলে। স্মৃতিস্তম্ভের ছবিতে জেলখানায় পাখির যাওয়া-আসাও কাজ করে ওইভাবে।

তথ্যের সংবাদমূল্যের চেয়ে জরুরি তার ভেতরের মূল্যটুকু গ্রহণ করে, তথ্যের ভেতরের মূল্য থেকে বিষয়ের সৃষ্টি করে, বিষয় অনুযায়ী তথ্যসংগ্রহ করে এবং বিষয়ের সম্পর্কসূত্রে তথ্যাবলীকে গঁথে যে নাটকীয়তা রচিত হয় তথ্যচিত্রের সার্থকতা দেখানে। মৃগাল সেন যেমন বলেছেন dramatisation of actuality বা ক্রীয়ারসন যাকে বলেছেন cinematic treatment of actuality, তথ্যচিত্রের সার্থকতা দেখানে। ওরই মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'রচনার সত্য' বিকশিত হয়। তথ্যচিত্রের সত্য শিল্পের সত্যের দিকে যায়।

শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁর 'শিল্প জিজ্ঞাসা'য় বলেছেন, বস্তুপিণ্ডকে রূপান্তরিত করার দাবি থেকে দেখা দিয়েছে শিল্পরূপ। রূপান্তরের জন্ত একথণ্ড মোমের স্পর্শের আঙুলের চাপ, ও উত্তাপের কথা বলেছেন। সমগ্র শিল্পের ক্ষেত্রেই তা প্রয়োজন—ভাবের সঙ্গে কলাকৌশল, নির্মাণ পদ্ধতি।

তথ্যচিত্রের নির্মাণ পদ্ধতি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। একটা সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য হাতে নিয়ে ছবি তৈরির কাজ শুরু হতে পারে। একটা চিত্রনাট্য ছাড়াও শুরু হতে পারে—একটা উদ্দেশ্য ঠিক করে। এমন বিষয় নিয়ে যদি ছবি হয় যার সম্পর্কে তথ্য কাগজে কলমে পেলো, তথ্যের চিত্ররূপ সম্পূর্ণত আগেভাবে জানা যায় না—শুটিং স্পটে যাবার আগে, তবে চিত্রনাট্য আগে লেখা হবে কী করে? সেক্ষেত্রে মানুষ না বাদর—কী গড়া হবে জানা থাকলে মোমের তালে উত্তাপ ও আঙুলের চাপ দিতে হয় শুটিং-এর সময়। তৈরি চিত্রনাট্যের ক্ষেত্রেও আসতে পারে পরিবর্তন—প্রয়োজন বোধে, বাধ্যতা বোধে বা ঘটনার আকস্মিকতায়। বালজাকের মনুমেন্টাল হেড-এর ছবি যদি লো-অ্যাঙ্গেল শটে নেবার পরিকল্পনা থাকে এবং কার্যক্ষেত্রে যদি মনে হয় আই-লেভেল শট বা রাউণ্ড ট্রলিতে মাথার পেছন থেকে সামনে পর্যন্ত একবারে দেখাতে পারলে লাভ বেশি, তবে হয়ত পূর্বাপর শটগুলিরও পরিবর্তন ঘটতে পারে। তখন প্রশ্ন : মোমের তালে উত্তাপ দেব কতটা, আঙুলের চাপ কোন দিকে।

চাপ ও তাপ সম্পর্কিত সম্পাদনার সঙ্গে। চলচ্চিত্রে সম্পাদনার মূল কাজ শুরু হয় বিষয়ের প্রাথমিক ধারণা থেকে। তারপর সম্পাদনা চলে অবিরাম—প্রতিটি স্তরে। তথ্যচিত্রের সম্পাদনাও একই নিয়মে চলে। তবে কাহিনীচিত্রে সম্পাদনার

সৃষ্টিমূলক কাজটা হয়ে যায় চিত্রনাট্যে—যে সম্পাদনা আইজেনস্টাইনের কথায় দৃশ্যসমূহের মধ্যকার মিথস্ক্রিয়া। বাকি থাকে সম্পাদনার বহিরঙ্গের কাজ—যা রোথার ভাষায় *technical accomplishment by determining rhythm, angle and dimension etc.* তথ্যচিত্রে সম্পাদনার শুধু সম্ভাব্য দিকগুলি মাথায় রেখে গুটিং করা যেতে পারে, চিত্রনাট্য রচিত হতে পারে। সম্পাদনার সৃষ্টিমূলক কাজ ও বহিরঙ্গের চাকচিক্য দৃষ্টিনন্দন করে তোলায় কাজ উভয়ই হতে পারে সম্পাদকের টেবিলে। সে কারণেই বোধহয় এমন একটা কথা চালু আছে যে ফিল্ম তৈরি হয় সম্পাদকের টেবিলে।

তথ্যচিত্রে তথ্য থেকে বিষয় গড়ে তোলা, বিষয় অনুযায়ী তথ্য ও উপাদান নির্বাচন, তথ্য ও উপাদান অনুযায়ী গুটিং ও এডিটিং, গুটিং ও এডিটিং-এ প্রয়োজন-বোধে, বাধ্যতাবোধে বা ঘটনার আকস্মিকতায় পরিকল্পনার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন—সমগ্রের মূলে এক সম্পর্কস্থত্র, সম্পর্কস্থত্রের মধ্যকার ক্রিয়াশীলতা, নাটকীয়তা ও রূপান্তর-ধর্মিতার মধ্যে কাজ করে এক নির্দেশ। তথ্যচিত্র শিল্প হয়ে উঠলে, ঐ নির্দেশের স্থান হয় শিল্পের মধ্যে।

ঈশ্বর চক্রবর্তী

॥ জাক তাতি ॥

( ১৯০৮-১৯৮২, ফরাসি চিত্রপরিচালক )। ছায়াচিত্র নির্মাতা হিসেবে জাক তাতি সারাজীবন চেষ্টা করেছেন কমেডির মধ্যে বাস্তবতাবোধকে ধরে রাখতে। চেষ্টা করেছেন ভাঁড়যাত্রা এবং সার্কাসের ট্রাডিশনে যে বঙ্গাধীন আভিষ্য থাকে তাকে সাধারণ পর্যবেক্ষণ এবং স্বল্পকথনের মধ্য দিয়ে কমিয়ে আনতে।

ইতালিয় নব্য বাস্তববাদীদের ধ্যানধারণার একদিকের প্রসার আমরা দেখি আন্তনিয়োনির শিল্পকর্মে, অগ্রদিকের প্রসার আমরা পাই তাতির কাজের মধ্যে। তাতির শিল্পকর্মে আমরা সেই প্রকৃত বাস্তবালুগ কমেডিকে দেখি যা ইতালির নব্য বাস্তববাদী সিনেমার মধ্যে একেবারেই প্রকাশ পায়নি।

জাক তাতির সঙ্গে ইতালিয়দের এইরকম তুলনার যৌক্তিকতা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তাদের সঙ্গে তাতির প্রভেদগুলিও মনে রাখা দরকার। প্রথমত স্টুডিয়ার গভীর মধ্যে বাস্তবের রূপায়ণে ফরাসি ঐতিহ্যের যে ধারার পরিচয় পাওয়া যায় মার্সেল কার্ণের *Quai des Brumes* অথবা রেনে গের্মের *Gervaise*-এ তাতি সেই ধারার নিকট উত্তরাধিকারী। এইভাবে স্টুডিও-সেট বানানো ইতালিয় নব্য বাস্তব-

ধারীদের ধারণা বহির্ভূত। নব্য বাস্তববাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাজনৈতিক চেতনাও  
তাঁদের ছবিতে অনুপস্থিত। বরং আধুনিকতাবাদী রব-গ্রিয়ের সঙ্গে তাঁর এদিক  
থেকে মিল আছে যে তিনি রাজনৈতিক মত দেবেন না, তিনি দেখবেন কিন্তু  
বিশ্লেষণ করবেন না, বা সামাজিক ব্যবহারের কোনো মূল্যায়নের দিকে যাবেন না।

ফরাসি কৌতুক নাট্যের ট্র্যাডিশন ছিল প্যারিসের রাস্তার ঝিলিক লাগানো শ্লেষ  
বা ফার্নান্দেলের মতো গ্রাম্য রসিকতার ট্র্যাডিশন—তাঁদের বিবর্তন সেই ধারায়  
হয়নি। রেনাতো কাস্তেলানির মতো চিত্রপরিচালকরা বা জাভাভিনির মতো  
লেখকরা সোজাহাজি অবলোকন বা রাস্তায় দেখা জীবন থেকে অনুপ্রেরণা পেতেন,  
তাঁরা সেই ধারাই অনুসরণ করেছেন। কিন্তু সেই অবলোকনকে ছবিতে ব্যবহারের  
ব্যাপারে তাঁরা অনেক বেশি দুঃসাহসী। সেজন্য ইতালিয় চিত্রনির্মাতাদের চেয়েও  
তিনি নব্য বাস্তববাদী কমেডির তব্ব অনেক ভালোভাবে পরিধারণ করতে  
পেরেছেন। ১৯৩০-এর দশকে রেনোয়ার Toni এবং ১৯৪২-এ ভিস্কুভির  
Osessione-এর মতোই তাঁদের ছবি ইয়োরোপীয় ছায়াচিত্রের ইতালিয় এবং  
ফরাসি এই দুই প্রধান ঐতিহ্যের মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে। সিনেমার  
এই দুই পৃথক কারু-ঐতিহ্যের তিনি যেভাবে সমন্বয় ঘটিয়েছেন এবং তাঁদের থেকে  
সিনেমার কখনশৈলী সম্বন্ধে যে পাঠ তিনি উদ্ধার করেছেন, তাতে তাঁর সিনেমা-  
শিল্পে আধুনিকতার ধারকদের মধ্যে স্থান ঠিক হয়ে গিয়েছে। একই কারণে  
মুক্কাভর কালের সবচেয়ে মৌলিক এবং দুঃসাহসী পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলোর মধ্যে  
তাঁর ছবিগুলোকেও ধরতে হয়।

অধিকাংশ আধুনিক শিল্পীর মতো তাঁরাও তাঁর শিল্পের ঐতিহাসিক বাতাবরণ  
সম্বন্ধে সচেতন। ছায়াচিত্রে কমেডির ইতিহাসের অনুধাবন করে তিনি দেখতে  
পেয়েছেন এক ধরনের 'গণতন্ত্রের' ক্রমবিকাশ। প্রথম কৌতুকচিত্রগুলি নিছক  
Music hall-এর নাটক, সেগুলিকে শুধু ক্যামেরার সাহায্যে ধরে রাখা হয়েছে।  
কোনো একজন অভিনেতার একক বহুধা বিচ্ছুরিত প্রচেষ্টার সাক্ষ্য যে কৌতুকচিত্র  
তার শ্রেষ্ঠ বিকাশ পাই আমরা কীটন এবং চ্যাপলিনের ছবিতে। তারপর এল  
দলগত প্রচেষ্টায় তৈরি কমেডি—লরেল হার্ডির দ্বৈত অভিনয় অথবা মার্জ  
থ্যাটারদের চতুর্দিকব্যাপী লগুভগু-রুত্যা। এই বিবর্তন চলতে থাকলে আমরা পাব  
সিনেমার প্রত্যেক অভিনেতার মাধ্যমেই কৌতুকরসের নিঃসরণ। কৌতুকসিনেমার  
গোটা বিবর্তনের ব্যাখ্যা এভাবে হয় কিনা বলা না গেলেও ১৯৪২ থেকে শুরু  
করে তাঁদের কাজে আমরা যে ক্রমবর্ধমান দৃষ্টিপ্রসার পাই তাঁর ব্যাখ্যা এতে মেলে।

তাতির প্রথম পাঁচটি ছবিতেই উচ্চমানের কারু কৃতিত্বের প্রকাশ আছে। অথচ যে কোনো কমেডির মতোই এই কৃতিত্বের মূলে আছে দেখার ক্ষমতা। কিন্তু তাঁর যে ছবিগুলো পুরনো ছাঁচের কমেডি, সেগুলিতে উঁচুদরের কৌতুক কল্পনার ছাপ আছে কিন্তু তা দিয়ে কমেডি সম্বন্ধে আমাদের ধারণার সম্প্রসারণ ঘটে না। তাতির কমেডি বৈপ্লবিক চরিত্র লাভ করে এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে—যে সিনেমা হলো জীবনের দিকে জানালা খুলে দেওয়া। তাতি এই সোজা দেখা জীবনকেই ছবিতে রূপ দিয়েছেন—যেমন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ছবি *Playtime* ( ১৯৬৭ ) এ।

তাতির শিল্পকর্মের পরিধি যত বেড়েছে, তাঁর কারুশিল্পও তত পরিশীলিত রূপ পেয়েছে। *Jour de Fête* ( ১৯৪১ )-এর কালো-সাদার জায়গায় আমরা পাই *Playtime*-এর রঙিন বাহার, ৭০ মিলিমিটার ফিল্ম এবং ত্রিমাত্রিক শব্দ। বড়ো পর্দার ব্যবহারের প্রতি তাতির মনোভাব সম্পূর্ণ তাঁর নিজের। তাঁর মতে ছোট ঘটনা বড়ো পর্দাতেই সবচেয়ে ভালো দেখানো যায়। সিনেমার বিশাল পর্দা এবং পূর্ণরংকার ত্রিমাত্রিক শব্দের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ব্যবহার হবে যখন তাই দিয়ে একটা আলপিন পড়া দেখানো হবে। তাতির কাছে সিনেমা একেবারেই সাহিত্যধর্মী শিল্প নয়। সিনেমা হলো প্রতিরূপ দিয়ে ভাবপ্রকাশের উপায় এবং চোখে দেখা ব্যাপার দিয়েই তার নির্মাণ। ফীটনের *General*-এর পরে তাতির মতো সুন্দর কমেডি বোধহয় সিনেমায় কেউ দেখাতে পারেনি, কিন্তু একই সঙ্গে তিনি বাস্তবায়ন কমেডি তৈরির দিকে ক্রমশই বেশি মনোযোগ দিয়েছেন—যার ফলে এমন একটা কৌতুকের জগৎ তৈরি হয়েছে যেখানে এক বিশেষ ব্যক্তি-মানসের পরিচয় মেলে। জীবনধারণের গ্লানি থেকে পলায়নের উপায় না হয়ে তাতির কমেডি হয়ে ওঠে সমকালীন জীবনের ওপর এক অতিনিবিষ্ট আলোকপাত।

অত্যাচ্ছ ছবি : *Les Vacances de Monsieur Hulot, Mon Oncle, Traffic Parade*, ইত্যাদি।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : *A-J. Cauliez*-এর *Jacques Tati*।

রয় আর্নস্ট

॥ ঔদ্রে তারকোভ্‌স্কি ॥

( ১৯৩২-১৯৮৬, সোভিয়েত রাশিয়ার চিত্রপরিচালক )। পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচালকদের একজন বলে স্বীকৃত এবং বার্গম্যানের মতে, বিরল স্বপ্নদ্রষ্টা ও কাব্যিক অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী রূপে ফেলিনি, বুল্‌য়েল ও কুরোশাওয়ার সঙ্গে

ধূলনীয়। মস্কোর এক সংস্কৃতিমনা পরিবারে তাঁর জন্ম হয়, বাবা আর্দেনেই  
 তারকোভস্কি ছিলেন কবি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ বছরগুলিতে অর্দ্রে ও তার  
 বোনের শৈশব কাটে ও স্কুলশিক্ষা ঘটে রাজধানী থেকে অনেক দূরে গ্রামাঞ্চলে।  
 পরে এই পটভূমিকেই অর্দ্রে বেছে নেন তাঁর ইভান'স চাইল্ডহুড ছবির প্রেক্ষাপট  
 হিসেবে। উচ্চতর বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে তিনি ইনস্টিটিউট অব সিনেমাটো-  
 গ্রাফি থেকে স্নাতক হন (১৯৬১)। তিনি ছিলেন মিখাইল রমের বিখ্যাত  
 স্টুডিওর সঙ্গে যুক্ত। ছাত্রাবস্থায় তাঁর প্রথম ছবি তৈরি করেই তিনি মনোযোগ  
 আকৃষ্ট করেন। ছবিটি ছিল হেমিংওয়ের গল্প অবলম্বনে তৈরি। তাঁর ডিপ্লোমা-  
 চিত্র, স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি, দি স্ট্রিমরোলার অ্যাণ্ড দি ভায়োলিন দেখেই বোকা  
 গেছিল একটি নতুন প্রতিভার ও এক বিশেষ প্রতিভার আবির্ভাব ঘটেছে।  
 ইভান'স চাইল্ডহুড তাঁর যাত্রাপথে প্রথম বৃহৎ ও এক প্রধান পদক্ষেপ। দশ বছর  
 বয়সের একটি শিশুর যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতা নিয়ে এই ছবি। তার প্রাপ্তমনস্কতা ও  
 কর্তব্যবোধ, সাহস ও ঘৃণা, বীরত্ব ও উন্মাদনা এবং এর চিত্ররূপ ছিল এতই মৌলিক  
 ও অভিঘাতী যে দর্শকের ওপর এর প্রভাব হয় অসামান্য। ছবিতে যুদ্ধকে দেখানো  
 হয়েছিল উন্মত্ততা ও মনুষ্যত্বের বিনাশকারী হিসেবে। ছবিটি ৬২তে ভেনিসে  
 সর্বোচ্চ পুরস্কার পায়। সার্জ বলেন, এই যুদ্ধচিত্রের শিশু-নায়ক ইভান যুদ্ধের  
 মতোই উন্মত্ত। অগ্নাশ্রু যুদ্ধচিত্রের চেয়ে তারকোভস্কির এই ছবি এগিয়ে ছিল  
 প্রথর কালচেতনায়।

এই ছবিতে এমন কিছু ভাবনা, গল্পাংশ ও উপাদানের দেখা মেলে যার পূর্ণতর  
 পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর পরবর্তী ছবিগুলিতে। যেমন দি মিরর (৭৫)-য়ে।  
 ছবিটিতে আছে এক তিস্ত সচেতনতা, একাধিক জোরালো আত্মজৈবনিক মোটিফ।  
 কালচেতনার চেয়েও বেশি কিছু এই ছবির প্রাণ, ইতিহাসচেতনা।

ভবিষ্যৎকে অনুধাবন করার জগুই অতীতকে বিশ্লেষণ করতে হয়। গ্রহণ  
 করতে হয় ইতিহাস থেকে। ৬৫তে প্রকাশিত হয় অর্দ্রেই রুবলেভ নামে একটি  
 ঐতিহাসিক চিত্রনাট্য, যার অগ্নতর চিত্রনাট্যকার তারকোভস্কি। ঐতিহাসিক  
 এই কারণে যে একজন ঐতিহাসিক পুরুষ এই ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র। নয়তো  
 একই সঙ্গে কাহিনীচিত্র, জীবনীচিত্র ও ঐতিহাসিক চিত্র—এ ছবির ঘরানা নির্দেশ  
 করা কঠিন। একই সঙ্গে কাব্যিক, কল্পনাময় ও তাত্ত্বিক এই ছবির মধ্য দিয়ে  
 তারকোভস্কি চলচ্চিত্রকার হিসেবে তাঁর সামাজিক ও ঐতিহাসিক কর্তব্য পালন  
 করেছেন। পনেরো শতকের (যখন রাশিয়া ছিল তাতার-মোগল শাসনাধীন)

মহান দেওয়ালশিল্পী রুবলেভ ছিলেন ম্যুরালিস্টের চেয়ে বেশি, আইকন-পেণ্টার, ষাঁর 'ট্রিনিটি' জগদ্বিখ্যাত চিত্রশৃষ্টি। ছবিতে ক্যামেরা হলো রুবলেভের চোখ, না তারও অধিক, রুবলেভের ভিশন। এ ছবি তাই দর্শন ও অনুভূতির বিভিন্নতা বিষয়েও। ছবিতে রুবলেভ ও থিয়োফেনস নামে একজন গ্রীক নিজ-নিজ শিষ্টা-সম্বন্ধীয় কথাবার্তার মাধ্যমে দৃষ্টিভঙ্গি ও বোধশক্তির পার্থক্য প্রতিপাদন করেন। সাদা-কালোয় আলোকচিত্রিত এ ছবির শেষ দৃশ্যে রঙের ব্যবহার তাই শুধু দৃষ্টির নয়, বোধেরও, উত্তরণ ঘটায়। এ বোধ একই সঙ্গে নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও আবি-বিতক। এই গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক মূল্যের জন্মই তারকোভ্‌স্কির ছবি একই সম্ভায় সমসাময়িক ও চিরকালীন।

তঁার মতে সিনেমার গুট বৈশিষ্ট্য নিহিত তার কালচেতনায়। এই সময় হলো তাঁর ভাষায়, 'time expressed through facts' বা 'photographed time'. তাঁর নিজের ছবিগুলিই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

তঁার ছবির মোট সংখ্যা দশেরও কম, কিন্তু প্রতিটি ছবিই সত্য ও হৃদয়ের উদ্দেশ্যে শিল্পীর যাত্রাপথে এক-একটি মাইলস্টোন। সংকট, সমস্যা ও বিরোধের যুগে তারকোভ্‌স্কি বারবার সাম্য ও চারিত্রশক্তির জন্ম প্রয়াস করেন, ফলে শিবত্বের জন্মও তাঁর আকুলতা রয়েছে।

সিনেমার লক্ষ্য ও আন্তর্জাতিক ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল। তিনি সবসময়ে মনে করতেন আধুনিক মানুষের পক্ষে সিনেমা সেইরকম গুরুত্বপূর্ণ যেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল ট্র্যাজেডি পুরাকালের মানুষের ও উপন্যাস উনিশ শতকের শিক্ষিত মানুষের কাছে। চলচ্চিত্র তাঁর কাছে ছিল যতটা না পেশাদার কর্ম তার চাইতে বেশি নৈতিক কর্ম। শিল্প মানুষের কাছে জীবনের মুখোমুখি হবার জন্ম একটা উপায়। আর শিল্পকর্ম হলো সত্য সম্পর্কে শিল্পীর নিজস্ব ধারণার অন্তরঙ্গ প্রকাশ।

'He looks upon that planet/As if the starry sky/Is, an important object/Of his midnight concern'. পাস্তেরনাকের কবিতার এই ক'টি পংক্তি দিয়ে তারকোভ্‌স্কির দর্শনকে বর্ণনা করা যায়। যদিও তিনি সোলারিস (৭২) ও স্টকার (৮০)-র মতো কল্পবিজ্ঞানচিত্র নির্মাণ করেছেন, তবু এগুলি একই সঙ্গে আধ্যাত্মিক ও আধিবিদ্যকও বটে। এগুলির সময়কাল কোনো কাল্পনিক ভবিষ্যতে হলেও, এগুলি একই সঙ্গে ভীষণভাবে সমকালীনও, কেননা বর্তমান সময়ের অত্যন্ত জরুরি ও তীক্ষ্ণ কিছু নৈতিক সমস্যা নিয়ে এরা কথা

বলেছে। অশ্রুই রুবলেভের মতো এই দুই ছবিও মানবজীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষের চিরন্তন দার্শনিক জিজ্ঞাসার অপরিহার্য অংশ।

বাস্তব ও বাস্তবাতীতের, নিরিকাল ও এপিকের, বিশ্বজগৎ ও মনোজগতের মিলন ও সমন্বয়ে তারকোভ্‌স্কির চিত্রলোক এক অপূর্ব ও অসামান্য জগৎ—যার মর্ম ও তাৎপর্য সঠিক উপলব্ধি করা তৎকালীন শোভিত্যে কর্তৃপক্ষের পক্ষে সহজ ছিল না। তাঁর বহু নতুন ছবির প্রস্তাব কর্তৃপক্ষ একের পর এক বাতিল করেন (এর মধ্যে ছিল দস্তয়েভ্‌স্কির দি ইডিয়ট উপন্যাসের তারকোভ্‌স্কি-কৃত সম্পূর্ণ প্রথা-বিরোধী এক চিত্রনাট্য)। একটি ছবি থেকে আরেকটি ছবির মধ্যে দীর্ঘ বিরতি তারকোভ্‌স্কির আবেগপ্রবণ, অন্তর্মুখী ও সংরক্ত মানসিকতার পক্ষে ছিল খুবই ক্ষতিকর।

তাঁর শেষ দুটি ছবি নস্টালজিয়া (৮৩)—যার নায়ক এক আধুনিক সন্ত ও দি স্ক্রিকফাইস (৮৬)—যার নায়ক এক ক্রান্তদর্শী লেখক বিদেশে তোলা। কিন্তু এই ছবি দুটিও তাঁর পূর্ববর্তী ছবিগুলির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, তাঁর বিবর্তনের পথে স্বাভাবিক অগ্রগতি।

কিন্তু পাশ্চাত্য চলচ্চিত্র জগৎও তাঁর কাজের পক্ষে যথোপযুক্ত ছিল না। তাঁর বিপ্লবাত্মক ভাবনাচিন্তা তাদের কাছে ছিল ছুপ্পাচা। আসলে মাধ্যমগত, বৃত্তিগত এবং রাজনৈতিক কোনো মাপকাঠি দিয়েই এই কিংবদন্তীমূলক প্রতিভাকে মাপা যায় না। তাঁর তুলনা তিনি নিজে। যে কথা তাঁর অকালমৃত্যু সম্পর্কেও প্রযোজ্য। ফুৎফুসের ভয়ংকর ক্যান্সারে তাঁর মৃত্যু হয়, আসন্ন যে মৃত্যুর কথা বারবার এসেছে তাঁর শেষ দুটি ছবিতে।

বেঁচে থাকলে ১৯৮৭-র ৪ঠা এপ্রিল তাঁর বয়স হত ৫৫। ওই দিন মস্কোয় ফিল্ম-মেকার্স' ক্লাব তাঁর সমস্ত ছবির দশদিন ব্যাপী একটি রেট্রোস্পেক্টিভ শেষ করে। দেশবাসী সেই প্রথম উপলব্ধি করে তারকোভ্‌স্কির 'চিত্রায়িত কাল' বা শাস্ত্র কালের অপূর্ব ও অসামান্য জগৎটিকে। এইভাবে, একদিক দিয়ে দেখলে, কালসচেতন তারকোভ্‌স্কি (তাঁর রচিত গ্রন্থের নামকরণের মধ্য দিয়েও এই চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে) কালকে অতিক্রম করে চলে যান।

রচিত গ্রন্থ : স্কার্‌ট্‌স ইন টাইম এবং টাইম উইদিন টাইম ॥

এন. জোরকায়া

॥ ফাঁসোয়া ক্রফো ॥

( ১৯৩২-১৯৮৪, জন্মস্থান ও কর্মস্থল ফ্রান্স )। সিনেমায় তাঁর আগ্রহ অল্পবয়স থেকেই। ছোটখাটো কাজকর্ম ও স্বল্প সাময়িক জীবনের মধ্য দিয়ে গিয়ে তিনি চলচ্চিত্রের কাজে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন—প্রথমে চিত্রসমালোচনায়, পরে চিত্রপরিচালনায়। ক্রফোর কথা উঠলে তিনটে ইমেজ আমার মনে আসে : একটা শিশুকে যেন নতুন একটা ট্রাইসাইকেল কিনে দেওয়া হয়েছে, সগু বিবাহিত এক যুবক যেন নব পরিণীতা স্ত্রীকে নিয়ে হনিগুনে গেছে, দক্ষ এক শিল্পীর হাতে যেন সবে তুলে দেওয়া হয়েছে ক্যামেরা, এই রকম উৎসাহ, উত্তেজনা ও আমোদ (entertainment) ক্রফোর সৃষ্টিতে। এই ইমেজগুলো সমস্তই সম্পর্কের (relationship) ইমেজ—শিশু ও তার খেলা, পুরুষ ও তার প্রেম, শিল্পী ও তার শিল্প। এবং ক্রফোও সম্পর্কের চিত্রপরিচালক, his theme is that of relationship, মানুষের সঙ্গে মানুষের ( জুল অ্যাণ্ড জিম-৬১ ), গ্রন্থের সঙ্গে পাঠকের ( ফারেন-হাইট ৪৫১-৬৬ ), শিল্পের সঙ্গে শিল্পীর বা বাস্তবের সঙ্গে বিভ্রমের ( ডে ফর নাইট-৭০ ), পৃথিবীর সঙ্গে বহির্বিশ্বের ( ক্লোজ এনকাউন্টারস অব দি থার্ড কাইণ্ড—ক্রফো অভিনীত )। নিঃসঙ্গ ও অস্থায়ী কেটেছে তাঁর শৈশব, তাঁর দি ফোর হানড্রেড ব্লোজ ( ৫৯ ) ছবির কিশোর নায়কের ( Leaud অভিনীত ) মতো, স্তব্ধতা বন্ধুতা ও আনুগত্য, গোপনতা কিন্তু অন্তরঙ্গতা, ভাষা ও আবেগের মূল্য পুরোপুরি বোঝেন তিনি। তাঁর ছবির শব্দ ও সংলাপ সচেতন ও নিয়ন্ত্রিত তাই, ও এই ভাষা তো শুধু ভাষায় নয়, শরীরের ভঙ্গিতে, পোশাকের ডিজাইনে, আসবাবের বিস্তারিত ( মিসিসিপি মারমেড-৬৯ )। ফরাসি নব্য তরঙ্গের ছবিতে সমালোচক হিসেবে তিনি যে সব বৈশিষ্ট্য পেয়েছিলেন তাদের অনেকগুলোই তাঁর ছবিতে উপস্থিত—ease, grace, charm, attraction, wit. এর সঙ্গে যুক্ত হবে সংবেদনা, বিনয়, জাহির না করার প্রবণতা, ব্যক্তিগত ভালো লাগার অসঙ্কোচ প্রকাশ, elegance ( দি ওয়াইল্ড চাইল্ড-৬৯/৭০-য়ে )। এই বৈশিষ্ট্যগুলো তিনি বিপ্রতীপ দুই পরিচালকের প্রতি ব্যক্তিগত প্রেম থেকে সংগ্রহ করেছেন, রেনোয়া ও হিচকক। গুট দি পিয়ানো প্লেয়ার ( ৬০ ), দি ব্রাইড ওয়র গ্যাক ( ৬৭ ), মিসিসিপি মারমেড ইত্যাদি যদি হয় হিচককের প্রতি নিবেদন, দি ফোর হানড্রেড ব্লোজ, জুল অ্যাণ্ড জিম ইত্যাদি তবে ভিগো ও রেনোয়া-গামী। কাকে তিনি বিয়ে করবেন হিচককের মেয়েকে না রেনোয়ার ভাইঝিকে, এই প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে ক্রফো বিয়ে করেন

তৃতীয় আর একজনকে, এক প্রযোজকের কথা। তার অর্থ তাঁকে নিজের প্রযোজনা সংস্থা খুলতে সাহায্য করে, যে সংস্থা শুধু তাঁর নিজের নয় তাঁর বন্ধুদের (ককতো গদার রোহমের রিভেং) ছবিও প্রযোজনা করেছে। হিচককের প্লট আর রেনোয়ার ধীম এই দুই যেক্টর মধ্যে ধারাবাহিক ষাড্রায় তিনি কখনো তৃতীয় (হয়ত মধ্য) বিন্দুতে এসেও দাঁড়ান, যা তাঁর নিজস্ব অতীত, ফোর হান্‌ড্রেড-এর পরের অংশগুলি—স্টোলেন কীসেস্, বেড অ্যাণ্ড বোর্ড, লাভ অন দি রান (সেই Leaud অভিনীত), বা নিজস্ব অবসেশন (ফারেনহাইট)। এইভাবে হিচকক ও রেনোয়া নবেও তিনি জীবনে ও শিল্পে নিজস্ব অবস্থানও পান।

ভাবনায় ও প্রকাশে দুর্বলতা ও অসঙ্গতি তাঁর ছবিতে খুঁজে পাওয়া হয়ত কঠিন নয়, কিন্তু ছবির সৌন্দর্য ও স্বঘমা, আন্তরিকতা ও প্রাণশক্তিই শেষ পর্যন্ত জিতে যায়। এক ধরনের শৈল্পিক তারুণ্য এটা (তাঁর ছবিতে প্রোচ় মাহুয়ের ভৌত উপস্থিতিও লক্ষণীয় ভাবে কম)। গল্প ও টেকনিক, এক ধরনের গল্পে বুদ্ধি ও আবেগ, অল্প ধরনের গল্পে দাসপেন্স ও হিউমার, টেকনিকে মুভমেন্ট ও কাটিং, চরিত্রে সম্পর্ক আর বিচ্ছিন্নতা, ধীমে বাস্তব ও বিজ্ঞম, ক্রফোয় এই মিলন দক্ষ, আন্তরিক, ও ঈষৎ উৎকেন্দ্রিক। এই সব গুণের সমাহারেই তাঁর আকর্ষণীয়তা। ফারেনহাইটে দুই ভাই একই সঙ্গে বলে ওঠে, আমি অসুটিনের প্রাইড অ্যাণ্ড প্রেজুডিস। তারপর যোগ করে, একজন : আমার ভাই খণ্ড এক; অগুজন : আমার ভাই খণ্ড দুই। ক্রফোকে নিয়ে আমি যদি কোনোদিন ছবি করতাম ছবির শেষ দৃশ্বে ক্রফো চরিত্রের অভিনেতা Leaud ও বাস্তবের ক্রফোকে পাশাপাশি রাখতাম যে অবস্থায় দুজনে একসঙ্গে বলে উঠতেন, আমি হলাম ক্রফো, তারপর যোগ করতেন, Leaud : উনি হলেন শিল্পের ক্রফো ; ক্রফো : উনি হলেন বাস্তবের ভাই। ক্রফো হয়তো শিল্পের ক্রফোর বদলে 'ক্রফো, the surrogate' ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন, আন্তনিওনি যেমন interlocutor-এর কথা বলেন। নামকরণ যাই হোক সম্পর্কটা কিন্তু একই থাকে। উভয় সত্তা মিলে গড়ে ওঠে আসল সত্তা, সেটা কী বিশ্লেষণ না করতে চাইলে হয়ত কখনো অল্পভব করা যায়। বিশ্লেষণ যে সব কিছুই নাগাল পায় না, কাইয়ে দ্ব্য সিনেমার এই অল্পতম মুখর সমালোচক ছবি করতে এসে তা বুঝেছিলেন। judgement-টা বড়ো কথা নয়, communication-ই আসল। এর জগু ডে ফর নাইটের পরিচালককে পরে নিতে হয় হিয়ারিং-এও। আর তার স্রষ্টাকে ? উত্তরে বলতে হয়, ক্রফো যেন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনের সঙ্গে সংযোগসাধন করলেন। মাহু চলে গেলেও যেমন মানব

থেকে যায়, ক্রফো চলে গিয়েও রয়ে গেলেন। কেননা মাইকেলএঞ্জেলোর মতো ক্রফোকে গড়েও পৃথিবী তার সৃষ্টিকে দ্বিগুণ করেছিল বলা যায়।

অস্তান্ত কাজ : একাধিক স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি, ব্রেথলেসের চিত্রনাট্য, দি স্টোরি অব অ্যাডেল এইচ ( ৭৫ ), দি লাষ্ট মেট্রো ( ৮০ )।

রচিত গ্রন্থ : হিচকক, দি ফিল্মপ ইন মাই লাইফ।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : ডন অ্যালেন-এর ফ্র'সোয়া ক্রফো ॥

## ধীমান দাশগুপ্ত

॥ ইনগ্রিড থুলিন ॥

( জন্ম ১৯২৯, সুইডেন )। যক্ষ থেকে থুলিন চলচ্চিত্রে আসেন। উনিশ বছর বয়স থেকে তাঁর চিত্রাভিনেত্রী জীবন শুরু হলেও সুইডেনের অগ্রতম সেবা অভিনেত্রী রূপে স্বীকৃতি ও আন্তর্জাতিক পরিচিতি পান তিনি বার্গম্যানের ছবিতে অভিনয় করে। উলম্যানের সমসাময়িক তিনি কিন্তু তাঁর অল্প ধরনের মুখশ্রী ও সংলাপ উচ্চারণের নিজস্বতা, আর অভিব্যক্তি ও নীরবতার স্বয়ম মিশ্রণ তাঁর অভিনয়ে এনে দিয়েছে এক ভিন্ন স্বাদ, এক ঘরোয়া বহুতা। একই সঙ্গে রুক্ষ ও সূক্ষ্ম, সপ্রতিভ ও স্বতঃস্ফূর্ত, প্রতিশোধপর ও অধীনতাপ্রিয় নায়িকা-ইমেজ তাঁর। স্বদেশে তাঁর উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে আছে : Foreign Intrigue ( ৫৫ ), ওয়াইন্ড স্ট্রবেরিজ ( ৫৭ ), সো ক্লোজ টু লাইফ ( ৫৮ ), দি ফেস ( ৫৯ ), দি ম্যাজিসিয়ান ( ৬১ ), উইণ্টার লাইট ( ৬২ ), দি সাইলেন্স ( ৬৩ ), Cries and Whispers ( ৭২ )। তিনি আমেরিকান চলচ্চিত্র, রেনের The War is Over ( ৬৬ ) ও তিসকন্ডির The Damned ( ৬৯ )-য়েও অভিনয় করেছেন। সম্প্রতি তিনি চিত্রনির্মাণের কাজেও আত্মনিয়োগ করেছেন। পরিচালিত ছবি—ডিভোশন, ওয়ান অ্যাণ্ড ওয়ান, ব্রোকেন স্কাই।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : আত্মজীবনী ॥

॥ মার্ক দনস্কোয় ॥

( ১৯০১-৮১, সোভিয়েত চিত্রপরিচালক )। দনস্কোয়ের স্বপ্ন ছিল কবি হওয়ার। মাত্র ১৪ বছর বয়সে তাঁর প্রথম কবিতা বই বের হয়। পরে ভাবলেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ হবেন। এক বছর মেডিসিন নিয়ে পড়াশোনা করলেন। তারপরে দেখলেন উকিল হওয়াই সবচেয়ে ভালো। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন পাশ করলেন। সেই ২৪ বছর বয়সে বন্দী জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে লিখলেন গল্প বই

‘বন্দীরা’। হোয়াইট গার্ডরা যখন জিমিয়া অঞ্চল দখলে রেখেছিল দনস্কোয়  
তাদের হাতে বন্দী হয়ে জেলে ছিলেন।

সিনেমা যখন দনস্কোয়কে আকৃষ্ট করল, তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন একেবারে  
শেকড় থেকে শুরু করবেন। ইয়ালতা স্টুডিও-তে গেলেন। চাইলেন যে কোনো  
ছবিতে যে কোনো কাজ। কিন্তু ভদ্রভাবে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করল ইয়ালতা  
স্টুডিও। দমবার পাত্র না। মস্কোর থার্ড ফিল্ম ফ্যাক্টরিতে থাকার সময় ‘শেষ  
আশ্রয়’ নামে যে চিত্রনাট্য লিখেছিলেন তা নিয়ে এলেন। জিমিয়া অঞ্চলে আত্ম-  
গোপনকারী বিপ্লবীদের কাজকর্মের ওপর ভিত্তি করে লেখা চিত্রনাট্য।

কিন্তু তিনি প্রথম ‘বেশা’ ( ১৯২৬ ) ছবিতে ছোট একটা রোলে অভিনয় করে  
চলচ্চিত্র জীবন শুরু করেন। ১৯২৭-এ ‘মহান ধর্মান্তার’ ছবিতে সহকারী  
সম্পাদকের কাজ করেন এবং ‘জীবন’ নামে একটি ছোট ছবি পরিচালনা করেন  
( ছবিটি এখন আর পাওয়া যায় না )। এর পরেই ‘বড়ো শহরে’ ছবির চিত্রনাট্য  
লেখেন। এ-সময় লেলিনগ্রাদ স্টুডিও-র প্রতিনিধিরা নতুন প্রতিভার সন্ধানে  
মস্কো এলে দনস্কোয়-এর জীবনের মোড় ফিরে যায়। কোজিনৎসেভ, ব্রাউবার্গ,  
এর্মলার, ভাসিলিয়েভ ভাইদের মতো বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালকদের সঙ্গে কাজ  
করার সুযোগ ঘটে। লেনিনগ্রাদ স্টুডিও-তে তিনটি ছবি তৈরি করে মস্কো ফিরে  
আসেন। তখন তিনি অভিজ্ঞ পরিচালক।

দনস্কোয় নিজের প্রথম সবাক ছবি ‘সুখের গান’ ( ৩৪ ) তৈরির সময়  
আমেরিকান ছবি ‘অদৃশ্য মানুষ’ এর ডাবিং সম্পন্ন করেন। কিন্তু তাঁর যে ছবিগুলি  
আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দিয়েছে তা হলো গোর্কির ত্রয়ী উপন্যাস : ‘শৈশব’ (৩৮),  
‘শিক্ষানবীশির কাল’ ( ৩৯ ) ও ‘আমার বিশ্ববিদ্যালয়’ (৪০)। এছাড়া গোর্কির ‘মা’  
( ৪৬ ), নিকোলাই অল্ডোভ্‌স্কির ‘ইস্পাত কী করে শক্ত হলো’ ( ৪২ ), নাৎসি  
অত্যাচারের বিরুদ্ধে কবিতার মতো ছবি ‘রামধনু’ ( ৪৩ ), ‘গ্রামের শিক্ষক’ ( ৪৭ ),  
‘মায়ের হৃদয়’ ( ৬৬ ) ও ‘নাদেব্দা’ ( ৭৩ ) বিখ্যাত।

গোর্কির আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস ত্রয়ী নিয়ে ছবি তৈরির আগে গোর্কির  
মতামত চেয়েছিলেন। তাঁর জীবিত অবস্থায় তাঁকে নিয়ে ছবি হোক গোর্কি  
চাননি। ফলে বিধায় পড়ে যান দনস্কোয়। পরে নিজ সঙ্কল্পে অটল থেকে তৈরি  
করেন গোর্কির ‘শৈশব’। ১৯৩৮-এ ছবিটি শেষ হয়। গোর্কি তখন মারা গেছেন।  
দনস্কোয় সচেতন ছিলেন ছবিটি যাতে গোর্কির নিছক জীবনী না হয়ে, ১৮৭০-এর  
রুশ সমাজজীবনের গতিপ্রবাহ প্রতিফলিত করে। তিনি গোর্কির এই ট্রেলজির

মধ্য দিয়ে রুশ সমাজজীবনকে যেভাবে ধরেছেন তা আর অন্য কোনো শিল্পী পারেন নি। জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাত সংঘাতে মানুষগুলি ছুঁড়ে মুচড়ে গেলেও—অন্ধকারে দাঁড়িয়ে জীবনের ভালো যাকিছু ও সৌন্দর্য তারা যে দেখতে পায় গোর্কির লেখার এ আবহ সংগীত দনস্কোয় স্ননিপুণভাবে প্রয়োগ করেছেন। আদর্শ, মূল্যবোধ ও আবেগের দিক থেকে দনস্কোয় গোর্কির কাছের জগতের শিল্পী ছিলেন। গোর্কির ‘মা’ ও ‘ফোমা গোর্দেয়েভ’কেও তাই তিনি মার্থক চলচ্চিত্রের রূপ দিতে পেরেছিলেন।

সোভিয়েত সাহিত্যের বিখ্যাত উপন্যাসগুলিকে অবলম্বন করেই প্রধানত তিনি ছবি করতেন। কিন্তু একই সঙ্গে জানতেন সাহিত্যের ভাষা ও চলচ্চিত্রের ভাষা কখনই এক হতে পারে না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাকে কেন্দ্র করে দনস্কোয়-এর বিখ্যাত ছবি ‘রামধনু’, তান্দা ভাদিলেভস্কার ছোট গল্প অবলম্বনে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা সাধারণ মানুষের জীবনে যে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট এনে দিয়েছিল তা এ ছবিতে দীর্ঘ কবিতার ফ্রেমে ধরা হয়েছে। জীবন অদম্য। তার সামনে কোনো অশুভ শক্তি দাঁড়াতে পারে না। এক অসাধারণ ছবি। রামধনু ছবি দেখে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এমন অভিভূত হয়েছিলেন যে দনস্কোয়কে টেলিগ্রাম করে জানান, কোনো রকম অনুবাদ ছাড়াই হোয়াইট হাউসে ছবিটি দেখান হয়েছে এবং সবাই তা বুঝতে পেরেছে। আমেরিকার জনগণকেও ছবিটি দেখান হবে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে। দনস্কোয়-এর ‘রামধনু’ ছবির প্রভাব আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রে গভীর দাগে পড়ে। অনেকেই মনে করেন ইতালির নিও-রিয়ালিজম-এর প্রেরণা আসে দনস্কোয়-এর ‘রামধনু’ থেকে।

দনস্কোয়-এর পরের ছবি ‘অপরাজেয়’ রামধনু ছবির-ই ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে। এ ছবিতে দুটো শবযাত্রা-র দৃশ্য আছে। একটি ইউক্রেনের শ্রমিকদের নাৎসিরা যে খুন করেছে তার শবযাত্রা এবং অন্যটি ইহুদীদের বাবী ইয়ারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গুলি করে মারার জন্ত। (এফতুশেংকোর বিখ্যাত ‘বাবী ইয়ার’ কবিতার কথা সবাই জানেন)।

‘গ্রামের শিক্ষক’ দনস্কোয়ের আরেকটি কবিতাধর্মী কাজ। ১৪ বছর বয়সে কবিতা বই প্রকাশ করে কবি হওয়ার যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন তা পুঁথিয়ে নিয়েছেন একের পর এক কবিতার মতো ছবি করে।

লেনিন-কে নিয়ে দনস্কোয় যখন ছবি তৈরির কাজ শুরু করেন—লেনিন

বিষয়ে অনেক বিখ্যাত ফিল্ম তখন তৈরি হয়ে গেছে। তবু তাঁর তৈরি 'মায়ের হৃদয়' ও 'মায়ের আলুগতা' (৬৭) ছবি লেনিন বিষয়ে ছবিতে নতুন মাত্রা এনেছে।

লেনিন সিরিজ শেষ করেন দনকোয় যে বিখ্যাত ছবির কাজে হাত দিয়ে তা লেনিনের সহধর্মিণী নাদেঝ্‌দা জুপস্কায়াকে কেন্দ্র করে। এ ছবিতেও উঠে এসেছে বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়ার সমাজ। প্রেম-ভালোবাসা এবং জীবনসংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানুষের স্বপ্নের অব্বেষণ।

দনকোয় সোভিয়েত চলচ্চিত্র জগতে প্রথম ব্যক্তি যিনি দেশের সর্বোচ্চ সম্মান 'সমাজতান্ত্রিক শ্রমবীর' খেতাব পান। এ ছাড়া ১৯৫৬-তে ইউনেস্কো ২৯ জন শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র পরিচালকের যে তালিকা তৈরি করে আইজেন-স্তাইন, পুদভকিন ও দভঝেকোর সঙ্গে দনকোয়-এর নামও সেখানে ছিল। (ড্র. সোভিয়েত রাশিয়া)

বিপ্লব মাজী

॥ আলেক্সান্দর পেত্রোভিচ দভঝেকো ॥

(১৮৯৪-১৯৫৬, সোভিয়েত চিত্রপরিচালক)। দভঝেকোর বাবা-মা ছিলেন কৃষক। ১৯১৪-য় তিনি বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক হন। ইউক্রাইনের শিক্ষা বিভাগে কাজে যোগ দেন। ১৯২১ থেকে ১৯২৩ জার্মানি ও পোল্যান্ডে ডিপ্লোম্যাটের কাজ করেন। মিউনিখে পেইন্টিং-এর ওপর পড়াশোনা করেন। ১৯২৬-এ সিনেমা জগতে প্রবেশ করেন চিত্রনাট্য লেখক হিসেবে। চিত্রনাট্যটি লেখেন ওদেসা ফিল্ম ফ্যাক্টরির জন্ম। নাম 'রিফর্মার ভাসিয়া'। এরপর পরিচালনা করেন 'ভালোবাসার চেয়িকল' ছবি। এ দুটো ছবিতে কাজ করার সময় দভঝেকো চলচ্চিত্রের ভাষা শিখে ফেলেন। ১৯২৭-এ পরিচালনা করেন 'ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ'। ছবিতে বিশের দশকের সোভিয়েত ডিপ্লোম্যাটিকের বীরত্বের কাহিনী ও শ্রমিকদের বৈপ্লবিক সংহতির কথা বলা হয়েছে।

দভঝেকোর প্রতিভার প্রথম পূর্ণ প্রকাশ দেবা যায় 'জেভ'নিগোরা' (১৯২৮) ছবিতে। মহাকাব্যধর্মী পুরাণ-কথার সঙ্গে ইউক্রেনের ইতিহাস ও ১৯১৮-২০-র গৃহযুদ্ধের পটভূমিতে ছবিটি তৈরি। ছবির প্রধান বিষয়বস্তু দু'ভাই-এর মধ্য আদর্শগত সংঘাত। ইউক্রেনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি দভঝেকোর নিবিড় ভালোবাসা ছবিতে কবিতার মতো প্রতিফলিত হয়েছে। দভঝেকোর ছবির এটাই বৈশিষ্ট্য—চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তিনি কবিতা লিগতে

চেয়েছেন। এ ছবি নিয়ে তিনি মস্কো আসেন। পরে তাঁর স্মৃতিকথায় আইজেন-স্তাইন লেখেন : ছবি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমবেত দর্শক উঠে দাঁড়িয়ে দভঝেক্সোকে শ্রদ্ধা জানান। যিনি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। তাঁরা বুঝতে পারেন একজন নতুন চিত্রপরিচালক তাঁদের মধ্যে এসে গেছেন। জাতীয়তাবাদী-বুর্জোয়া গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে ১৯১৭-তে কিয়েভ অস্ত্রাগারে যে বিদ্রোহ ঘটে তা নিয়ে দভঝেক্সো ‘আর্সেনাল’ ছবি তৈরি করেন। ছবিতে অস্ত্রাগার বিদ্রোহ ছাড়াও জারের আমলে কৃষকদের দুঃবস্থা ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকে ফ্রন্টে বিপ্লবী আন্দোলন কী রকম দানা বাঁধছিল তা দেখানো হয়েছে। এ ছবি থেকে দভঝেক্সো নিজের পরিচালিত ছবির চিত্রনাট্য নিজেই লিখতে শুরু করেন। এর পর তাঁকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি।

১৯৩০-এ দভঝেক্সো তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবি ‘পৃথিবী’ তৈরি করেন। এ ছবি তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দেয়। মার্টিন মিশেল ‘পৃথিবী’ সম্পর্কে বলেন : ‘পৃথিবী’-তে দভঝেক্সোর আপেল-এর ক্লোজ আপ যে দেখেনি—সে কখনো কোনো আপেল দেখেনি। ১৯৫৮তে ব্রাসেলস ফিল্ম উৎসবে উপস্থিত সমালোচকরা এবং ফিল্মবোর্ড ঘোষণা করেন : ‘পৃথিবী’ সর্বকালের সর্বজাতির ২২টি শ্রেষ্ঠ ছবির মধ্যে একটি। বিপ্লবের পর ইউক্রেনের কৃষকদের কী ভাবে সমবায় খামারে আনা হচ্ছিল— ছবির কেন্দ্রীয় বিষয়। একটা গ্রামে কী ভাবে কৃষি-সমবায় গড়ে উঠল নানা বাধা বিপ্লবের মধ্যে শুধু তা দেখানো দভঝেক্সোর উদ্দেশ্য ছিল না। যে বিরাট ঘটনা সারা দেশ জুড়ে ঘটে চলেছিল, যে সামাজিক পরিবর্তন মানুষের জীবনধারা বদলে দিচ্ছিল— দভঝেক্সো তার দার্শনিক পটভূমি কবিতার মতো করে বলতে চেয়েছেন। ছবিতে তখন শব্দ এসে গেছে। দভঝেক্সো শব্দের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন। চলচ্চিত্র কীভাবে কবিতা হয়ে ওঠে ‘পৃথিবী’ না দেখলে বোঝা যাবে না।

অক্টোবর বিপ্লবের ১৫তম বার্ষিকীতে দভঝেক্সো তৈরি করেন ‘ইভান’ (৩২)। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্ততম বৃহৎ এক শিল্প-সমাহারকে কেন্দ্র করে এ ছবি। কেন্দ্রীয় চরিত্র কৃষক বালক ইভান। এই বিশাল কনস্ট্রাকশনের পরিবেশ ও আবহাওয়া সম্পূর্ণ নতুন তার কাছে।

ইভান শেষ করে দভঝেক্সো দূরপ্রাচ্যে যান। ১৯৩৫-এ তৈরি করেন ‘এয়োরে-গ্রাদ’ ছবি। ভবিষ্যতের এই নতুন ভূ-খণ্ড, তার প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানুষের জীবন-স্পন্দন এ ছবিতে তুলে ধরেছেন। সেইসঙ্গে যে লড়াই বাকি আছে তার কথাও অরণ্য করিয়ে দিয়েছেন।

দভঝেক্কোর পরবর্তী ছবি গৃহযুদ্ধের পটভূমিতে এপিকধর্মী বীরগাথা ওন্দরস (৩৯)। এখানে জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে ইউক্রেনের কৃষকদের সংগ্রামের কথা, জর্মন আগ্রাসকদের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই ও রুশ জনগণের সঙ্গে মিতালির কথা বলা হয়েছে। 'আর্সেনাল'-এর মতো এ ছবিটিও দভঝেক্কোর বড়ো কাজ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ফ্রন্টে দাঁড়িয়ে কাজ করেছেন। যুদ্ধের ছবি ও রিপোর্ট পাঠাতেন পত্র-পত্রিকায়। 'আমাদের সোভিয়েত ইউক্রেনের যুদ্ধ' (৪৩) নামে একটি ডকুমেন্টারি ছবি তৈরি করেন। ১৯৪৫-এ আরেকটি ডকুমেন্টারি ছবি: 'ইউক্রেনের দক্ষিণতীরে বিজয়'। ১৯৪৩-৪৪ ফ্রন্টে যে লড়াই চলেছিল তার দৃশ্য বরা আছে দ্বিতীয় ছবিতে। সমস্ত ফ্রন্ট থেকেই ক্যামেরায় ছবি তুলে আনা হয়েছিল ছবিটির জন্তে। যুদ্ধের ডকুমেন্টারি ছবিও কত শিল্পিত হয়ে উঠতে পারে দভঝেক্কো তা দেখিয়েছেন।

১৯৪৯-এ 'মিচুরিন' ছবিটি তৈরি করেন। বিজ্ঞানে যে প্রথাগত ধ্যানধারণা ও কুসংস্কার ছিল তার বিরুদ্ধে উৎসর্গিতপ্রাণ মিচুরিনের সংগ্রামের বিষয় ছবিটি। দভঝেক্কো সবসময় একটি করে নতুন শহরের স্বপ্ন দেখতেন। এখানেও তিনি একটি বাগানখেরা শহরের স্বপ্ন দেখেছেন। ইকোলজিক্যাল সমস্যা নিয়ে এখন আমরা চিন্তিত। প্রকৃতিকে ধারা ভালোবাসেন তাঁদের এ ছবিটি বারবার দেখা উচিত।

১৯৪৯-৫১ এবং পরে ১৯৫৫ থেকে দভঝেক্কো স্টেট ফিল্ম ইনস্টিটিউটে শিক্ষকতার কাজ করেছেন। জীবনের শেষ বছর 'সমুদ্রের কবিতা' ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন। কাকভকা জলাধার গড়ে তুলেছিল যে স্থপতিরা তাদের শ্রমের জয়গাঁথা এ ছবি। জলাধারটি ইউক্রেনের গ্রামগুলিতে যে পরিবর্তন ও সবুজের লাভন্য এনেছিল তাও দেখানো হয়েছে। এই চিত্রনাট্যের জন্ম হুত্যা পরবর্তী লেনিন পুরস্কার পান তিনি। দভঝেক্কো আরো দুটি ছবির চিত্রনাট্য লেখেন 'অগ্নিশিখার বছরগুলির গল্প' এবং 'সংগীতমুখর দেশনা'। এই তিনটি ছবি পরিচালনা করেন তাঁর স্ত্রী ও সহযোগী পরিচালক ইউলিয়া সলনুংসেভা। দভঝেক্কোর প্রভাব শুধু সোভিয়েত চলচ্চিত্র শিল্পীদের না, নানা দেশের চিত্রপরিচালকদেরও প্রভাবিত করেছে। সোভিয়েত চলচ্চিত্রে আইজেনস্টাইন, পুদভকিনের সঙ্গে তাঁর নাম উচ্চারিত হয়। জীবনের শেষ পনেরো বছর ধরে রাখা ব্যক্তিগত ডায়েরিতে তিনি স্বদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও বিশেষত সেন্সার সংক্রান্ত বিভিন্ন নিয়ম সম্বন্ধে ফোভ প্রকাশ করেছিলেন। যে কিয়েভ স্টুডিওর তিনি

ছিলেন প্রধান পরিচালক, তাঁর যত্নের পর সেই স্টুডিওর নতুন নামকরণ করা হয়েছে তাঁর নামানুসারে ।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : A. Barthelemy-র দত্তবেষ্ণো ।

বিপ্লব মাজী

॥ সালভাদর দালি ॥

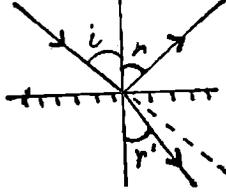
( ১৯০৪-৮৯, স্পেন )। দালির প্রধান প্রসিদ্ধি দক্ষ চিত্রশিল্পী ও অধিবাস্তববাদের অন্ততম প্রবক্তা হিসেবে ( ড. সাররিয়ালিজম )। বুল্‌য়েলের দুটি স্বতন্ত্র ধরনের ছবিতে—Un Chien Andalou ( ২৯ ) ও L' Age D' Or ( ৩০ )—তিনি সহযোগী রূপে কাজ করেন । কিন্তু দুজনের মনোবৃত্তি ছিল যথেষ্ট আলাদা । দালি যখন পিঁপড়ের স্বপ্ন দেখতেন, বুল্‌য়েল জানতে চাইতেন সেই পিঁপড়েরা মিছিল করে কিনা । বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে যে সমস্ত স্বনামধন্য স্প্যানিশ শিল্পী স্বদেশ ত্যাগ করে অন্তর্দেশে চলে যান ( বুল্‌য়েল, নেরুদা, পিকাসো প্রমুখ ) দালি তাঁদের একজন । তিনি যান ফ্রান্সে, ১৯৩৯য়ে তিনি সেই দেশও পরিত্যাগ করেন । ৪৫য়ে হলিউডে হিচককের স্পেলব্যাউও ছবির স্বপ্নদৃশ্যটি তাঁর পরিকল্পনায় গৃহীত হয় । চলচ্চিত্রের সঙ্গে দালির যোগাযোগ অল্প ও মাঝে মাঝে । পিকাসোর মতো তিনি ছবিও স্বশৃঙ্খল ভাবে ও শেষ দিন পর্যন্ত অজস্র আঁকলেন না । মনে হয় তাঁর প্রতিভার, উৎকেন্দ্রিক প্রতিভা যদিও, সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়নি । দালির শিল্পচারিত্রকে সবচেয়ে ভালো ধরেছিলেন সম্ভবত ফটোগ্রাফার ফিলিপ হলসমান । দালি অনেকগুলি নরকঙ্কালের মুখের ছবি দিয়ে যুদ্ধের মুখের ছবি এঁকেছিলেন । আর তাঁর প্রতিকৃতি তোলার সময়ে হলসমান দালির ছবির পাশে নরকঙ্কালের মুখের এক বৃহদাকার কম্পোজিশন স্থাপন করেন, করোটির যে কম্পোজিশন গড়ে উঠেছে সাতটি নগ্ন নারীকে বিচিত্র ভঙ্গিতে সাজিয়ে ।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : দালি বাই দালি, ওপেন লেটার টু সালভাদর দালি, দি সিক্রেট লাইফ অব সালভাদর দালি, ডায়েরি অব এ জিনিয়াস ।

॥ দৃক্‌বিজ্ঞান ( বা ফটোগ্রাফিক অপ্‌টিক্স ) ॥

নিউটনের সমসাময়িক পদার্থবিজ্ঞানী হয়গেন্স প্রথম আলোকে কণা বা তরঙ্গ হিসেবে উল্লেখ করেন । তরঙ্গতত্ত্ব আলোর বিচ্ছরণকে কীভাবে সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারে তা তিনি গণনা করে দেখান । ম্যাক্সওয়েলের আলোর বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তত্ত্ব এই ধারণাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে । আলোর এই তরঙ্গ রূপের জন্মই

আলোর কোনো উৎস-বিন্দুর প্রতিবিম্ব নির্খুঁত লেন্সের মাধ্যমে গৃহীত হলেও একটি বিন্দু না হয়ে একটা অতি ক্ষুদ্র আলোকছোপ হয়ে ওঠে। ফটোগ্রাফিক অপটিকসের আলোচনায় আমরা অবশ্য আলোকে আলোকরশ্মি হিসেবে গ্রহণ করব। এক মাধ্যম থেকে আলোকরশ্মি যখন নতুন আর এক মাধ্যমে এসে পতিত হয় তখন তা নতুন মাধ্যম থেকে প্রতিফলিত, বা নতুন মাধ্যমের মধ্য দিয়ে প্রেরিত, বা দুইই হতে পারে। প্রতিফলনের ক্ষেত্রে পতনকোণ (i) প্রতিফলনকোণ (r)-এর



সমান হয়। আর নতুন মাধ্যমের মধ্য দিয়ে প্রেরিত আলোকরশ্মির গতিপথ পরিবর্তিত হয় (গতিবেগও), এই পরিবর্তন নির্ভর করে নতুন মাধ্যমের ঘনত্বের ওপর। ছবিতে প্রতিসরণ কোণ ( $r'$ ) নতুন গতিপথ নির্দেশ করেছে। যদি প্রথম মাধ্যমটি বাতাস হয় তবে প্রতিসরণাঙ্ক ( $n$ )=বায়ু মাধ্যমে আলোর গতিবেগ/নতুন মাধ্যমে আলোর গতিবেগ। যেহেতু গতিবেগ=দূরত্ব/সময়, ফলে  $n=da/dn$ , যখন একটা নির্দিষ্ট সময়  $t$ -তে আলোকরশ্মির বায়ুমাধ্যমে অতিক্রান্ত দূরত্ব হলো  $da$  ও  $n$  প্রতিসরণাঙ্কের মাধ্যমে অতিক্রান্ত দূরত্ব হলো  $dn$ ।  $dn$ -এর পরিপ্রেক্ষিতে  $da$ -কে বলা হয় অপটিক্যাল ডিসট্যান্স।

আলোর প্রতিসরণের কথা যা বলা হলো বিশেষ ধরনের কাঁচে তৈরি লেন্সের সাহায্যে তাকে কাজে লাগিয়েই ক্যামেরার অভ্যন্তরে ফটোফিল্মের ওপর দৃশ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করা হয় (ড্র. ক্যামেরা, লেন্স)। ফটোগ্রাফিক অপটিকসের অধিকাংশ শাস্ত্র এই লেন্স-ভিত্তিক। বিভিন্ন ধরনের লেন্সের সাহায্যে দৃশ্যবস্তুকে পরিবর্তিত, ক্ষুদ্রায়ত, নির্খুঁতভাবে অনুকৃত ও প্রয়োজনমতো বিকৃত করা যায়, চিত্র-গ্রাহিত্য আনা যায় হেরফের। লেন্সের সঙ্গে ব্যবহার করা যায় ফিল্টার, ফিল্টারের ওপর পতিত আলোর কিছুটা প্রতিফলিত হয়ে যায়, কিয়দংশ ফিল্টার কর্তৃক শোষিত হয় ও বাকিটা লেন্সের মধ্য দিয়ে প্রেরিত হয় প্রতিবিম্ব গঠনের জন্ত (ড্র. ফিল্টার)। চলচ্চিত্র মূলত একটি দৃষ্টিগ্রাহ শিল্পরূপ, স্তরতাং দৃকবিজ্ঞানগত প্রসঙ্গের উপস্থাপনা এখানে বারবার। এমনকি শব্দকে প্রস্ফুটিত করা হয় অপটিক্যাল

প্রিটিং পদ্ধতিতে । এ ছাড়াও দ্রষ্টব্য এফেক্ট এবং সাদা-কালো ও রঙিন নেগেটিভ ফিল্ম ।

ডবলিউ. এইচ. প্রাইস

॥ লা দোলচে ভিতা ॥

১৯৬০, ইতালি । আধুনিক রোমের প্রসারিত পটভূমিকায় লা দোলচে ভিতা পাশ্চাত্য জীবনের সামাজিক ও ধর্মীয় অবক্ষয়ের এক প্রত্যক্ষ ও প্ররোচনামূলক চিত্ররূপ । যে নিও-রিয়ালিজমের মধ্য থেকে ফেলিনির উদ্ভব এই ছবির শ্লেষ; তিজ্ঞতা, জটিল দৃশ্যকল্পনা, আঙ্গিকের ভিন্নতা, প্রতীক-নির্ভরতা ইত্যাদি ওই নয়া বাস্তববাদের সম্পূর্ণ বিপরীত । ছবিতে এমন এক সমাজের কথা বলা হয়েছে যেখানে ঘটনার প্রাচুর্য আছে কিন্তু জীবনের গভীরতা আর ক্রমবিকাশ নেই । যে জীবন যাচ্ছেতাই ভাবে চমৎকার, বীভৎস মজায় ভরপুর । লা দোলচে-র বিরোধীরা বলেন, ফেলিনি এখানে মূল্যবোধের অবনমন দেখিয়েছেন তার নিন্দা না করে, ফলে অবক্ষয়কে তিনি গ্ল্যামারাইজ-ই করেছেন । ফেলিনি নিজে বলেন, এই ছবি নিয়ে অনেক কাণ্ড হয়ে গেছে, পুলিশ আমার পাসপোর্ট কেড়ে নিতে চেয়েছে, আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছে, জেলে পুরতে চেয়েছে । আমি যা বলতে চেয়েছিলাম ছবির নামের মধ্যে তার উশ্টোটাই প্রতিফলিত হয়েছে । আমি হৈ-ছল্লোড় মার্কী জীবনের কথা বলতে চাইনি, বলতে চেয়েছিলাম জীবনের মাধুর্যের কথা । হাল ছেড়ে না দেবার কথা । এর বিষয়বস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যে বিতর্ক-ই হয়ে থাক না কেন, শৈল্পিক সাফল্য ও প্রভাবের দিক থেকে এই ছবি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।

অভিনয়ে মার্চেল্লো মাস্ত্রোইয়ানি, আলুক এইমে, অনিতা একবার্গ; আলোক চিত্র O. Martelli, সংগীত এন. রোটা ।

॥ সিনেমায় ধারাবাহিকতা ॥

সিনেমায় খণ্ড খণ্ড অংশের আলাদা আলাদা চিত্রগ্রহণের সময় যে প্রথম সমস্তা দেবা দেয় সেটা হলো ধারাবাহিকতা । সিনেমাতে ধারাবাহিকতা বলতে আমরা বুঝি পর পর দুটি শটের মধ্যে : (1) Continuity of action. (2) Continuity in exit and entrance. (3) Continuity of position. (4) Continuity of look. (5) Continuity of movement. (6) Continuity of costumes, properties and lighting.

**Continuity of action :** বেশির ভাগ সময়েই পর পর দুটি শটের মধ্যে এ্যাকশানের ধারাবাহিকতা অবশ্যই রাখতে হবে। প্রথম শটের শেষ এ্যাকশান ও পরবর্তী শটের গুরুত্ব এ্যাকশান যদি সম্পূর্ণ এক হয়, যদি এ্যাকশন দুটির গতি ও সময় সমান হয়, তাহলে শট দুটি পরস্পর জোড়া দিতে কোনো অস্ববিধা হবে না। এটাকে বলা হয় ম্যাচ কাট। আবার এ্যাকশান দুটির মধ্যে গরমিল হলে শট দুটি ম্যাচ করবে না। এটা এড়াবার সহজ উপায় হচ্ছে দ্বিতীয় শট গ্রহণের সময় প্রথম শটের শেষ এ্যাকশানটি দ্বিতীয় শটের শুরুতে আবার নেওয়া। সম্পাদনার সময় ঋণ কাট সম্ভব হয় যদি শট গ্রহণের সময় প্রতিটি শটের আরম্ভে কোনো না কোনো এ্যাকশন কিংবা গতি থাকে—সেটা যত সামান্য হোক না কেন। হলিউডের চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকের ছবিগুলিতে অর্ধ ঋণ কাট ব্যবহৃত হয়েছে। এর ফলে ছবির গতি হয় স্বচ্ছন্দ ও দর্শক সহজেই দৃশ্যটি বুঝতে পারেন। ঋণ কাটের সঙ্গে এ্যাকশানের ধারাবাহিকতার এমনি সম্বন্ধ যে একটা ছাড়া অতটা হয় না। এর বিপরীত হল শার্প কাট। সময় সময় দর্শকের চোখে এটা যান্ত্রিক ধাক্কা দেয়। এর ত্রুটিকাও গুরুত্বপূর্ণ। এর ব্যবহারে দারুণ নাটকীয় প্রভাব পাওয়া যায়।

**Continuity in exit and entrance :** প্রথম শটে শিল্পীর প্রস্থান ও পরবর্তী শটে শিল্পীর প্রবেশ—এই দুটোর মধ্যে দিক ভুল হলে চলবে না। একটা ধারাবাহিক দৃশ্যে ধরে নেওয়া যাক যে প্রথম শটে শিল্পী ক্যামেরার বাম দিকে প্রস্থান করলেন। তাহলে পরবর্তী দ্বিতীয় শটে শিল্পীকে অবশ্যই ডান দিক থেকে ঢুকতে হবে। নয়তো দর্শকের মনে অযথা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে।

**Continuity of position :** সিনেমার প্রাথমিক নিয়মানুযায়ী একটি চরিত্রকে যদি ফ্রেমের ডানদিকে প্রথম থেকেই উপস্থাপন করা হয়, সেই চরিত্র যদি হেঁটে চলে ঐ স্থান পরিবর্তন না করে অথবা ক্যামেরা মুভমেন্টের সাহায্যে চরিত্রটির স্থানান্তর না দেখান হয় তাহলে ঐ দৃশ্যে তাকে সব সময় ঐ স্থানে আছে দেখাতে হবে। ধরা যাক প্রথম শটে দুই বন্ধু ঘরের ভিতর কথা বলছে। দ্বিতীয় শটে ক্যামেরার কোণ এবং অবস্থান পাণ্টাবার সময় যেন দুজনের অবস্থান পালটাপালটি হয়ে না যায়। :

**Continuity of look :** প্রত্যেকটি চরিত্রের অবস্থানের মত শট থেকে শটে দৃষ্টির ধারাবাহিকতাও বজায় রাখতে হবে। এই দৃষ্টি যদি উল্টো হয়ে যায় (বিনা কারণে) শট দুটি কিছুতেই মেলানো যাবে না এবং দর্শকের মনে অযথা একটা

বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে। পাত্রপাত্রীর দৃষ্টি নিয়ে বেশি বিভ্রান্তি ঘটে যখন এক এগটি দৃশ্যে বেশ কয়েকজন পাত্র-পাত্রী থাকে। ক্যামেরা অবস্থান মোটামুটি নির্দেশ করা থাকলে অনেক মারাত্মক ভুল থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। প্রত্যেক শট টেক হওয়া যাবার পর শটটির বিস্তারিত বিবরণ লিখে রাখা দরকার। ধারাবাহিকতা লিখনা আলাদা শীট থাকে।

**Continuity of movement :** আমরা জানি সিনেমাতে তিন রকমের মুভমেন্ট হয়। পাত্রপাত্রীর হাঁটা-চলা, ক্যামেরাকে সামনে পিছনে নিয়ে যাওয়া ও ক্যামেরাকে ভাইনে বাঁয়ে প্যান করা এবং পাত্রপাত্রী ও ক্যামেরার সম্মিলিত মুভমেন্ট।

পাত্রপাত্রীর মুভমেন্টের ক্ষেত্রে দুই শটে মুভমেন্টের গতি যদি সমান না হয় শট দুটি ম্যাচ করা শক্ত। একজন অভিনেতা যে গতিতে প্রথম শট থেকে প্রস্থান করলেন, পরবর্তী শটে তাঁকে তৎক্ষণাৎ প্রবেশ করতে হলে, দুটি শটের প্রস্থান ও প্রবেশের গতি সমান হতে হবে। বিশেষ করে এটা যদি একটা অর্থও এ্যাকশান হয়। পরবর্তী শট চালু হবার বেশ কিছুক্ষণ পরে সেই অভিনেতা যদি শটে প্রবেশ করেন তাহলে প্রস্থান ও প্রবেশের গতি সমান না হলেও ক্ষতি নেই। তবে যেখানে কেবল প্রয়োজনীয় গতি তৈরি করা প্রধান উদ্দেশ্য সেখানে এসব নিয়ম বড় খাটে না। একটা মুভমেন্ট শট ও একটা নিশ্চল শট ম্যাচ করবে না। টুলি কিংবা প্যানিং শটের মাঝখানে অনেক চিত্র সম্পাদক কাটতে চান না। কারণ কোনো মুভমেন্টের ওপর কাটলে একটা বিলম্বী ধাক্কা দেয়। তবে পর পর দুটি মুভমেন্ট শট হলে এবং মুভমেন্টে গতি একেবারে সমান না হলেও দুটি শট ম্যাচ করতে অস্ববিধা হয় না এবং দুটি মুভমেন্টের যোগাযোগে কাটের ধাক্কা বিশেষ বোঝা যায় না।

**Continuity of costumes, properties and lighting :** লাইটিং-এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ক্যামেরাম্যানের কাজ। তবুও পরিচালককে কিছু কিছু বিশেষ দৃশ্য বা শটের কথা মনে রাখতে হবে যেখানে লাইটিং একেই সমান না হলে শটের মূল্য বা বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে। পোষাক পরিচ্ছদেও এক এক সময় মারাত্মক ভুল দেখা যায়। এই রকম ভুলভ্রান্তি দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে হলে দোষের হয় না। কারণ দুই দৃশ্যের মধ্যে কিছুটা সময় চলে গেছে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তবে পর পর দুটি ধারাবাহিক শটে পোষাকের ভুল হলে খুবই দৃষ্টিকটু হবে।

আসবাবপত্রের স্থান হঠাৎ বদলে যাওয়াও সেরকম দৃষ্টিকটু। কাহিনীচিত্রে সমস্ত কাজের ধারাবাহিকতার প্রয়োজনকে অবহেলা করা যায় না। কোনো কাজকে সম্পূর্ণ না দেখিয়ে প্রথম কেবলমাত্র কাজের শুরু—তারপর একটা উপযুক্ত কাট-ওয়ে—পরের শটে কাজটি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে—এই রকম রীতি সিনেমাতে বহুদিন থেকে প্রচলিত। এতে ধারাবাহিকতার প্রশ্ন ওঠে না—প্রয়োজনও হয় না।

ধীরেশ ঘোষ

॥ লা নন্তে ॥

১৯৬১, ইতালি/ফ্রান্স। আন্তনিওনির প্রিয় বিষয়—সম্পর্কের বিশ্লেষণ—লা নন্তেরও কেন্দ্রীয় বিষয়। পরিচালক এখানে এক মাঝবয়সী ঔপন্যাসিক ও তাঁর স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্কের বিচ্ছিন্নতা, শূন্যতা ও শীতলতাকে বিশ্লেষণ করে দেখেছেন। ছবিতে হুড়ি ঘণ্টা সময়ের মধ্যে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা ও ঘটনাহীনতা, সংলাপ ও উদাসীনতা, দুই মূল্যবান পার্শ্ব চরিত্র—এক মুয়ুঁ বন্ধু ও এক উচ্ছল নবাগতা, সৃচনায় এক সম্ভ পরিচিত নার্গের সঙ্গে ঔপন্যাসিকের আকস্মিক সঙ্গ ও সারারাত ব্যাপী পার্টির পর কনকনে প্রত্যুষে পার্কে বসে স্বামী-স্ত্রীর স্বীকারোক্তি আর অভ্যস্ত আবেগের মধ্য দিয়ে পরিচালক অভিজ্ঞতার এমন এক টুকরো কেটে তুলে ধরেন যা থেকে আধুনিক জীবনের ও মূল চরিত্রগুলির অনেক ভান ও বিভ্রান্তি কালক্রমে থসে পড়ে। কেন এই বিভ্রান্তি, বিরক্তি, একাকীত্ব, বন্ধাত্ব, সোভিয়েত রাশিয়ার সমালোচকরা বলেছিলেন, তাদের দর্শকরা তা বুঝে উঠতে না পেরে হাসবে। তাঁর অল্প ছবির চরিত্ররা যদি প্রকৃতি কি প্রযুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে অসহায় তো এই ছবির চরিত্ররা 'reduced in relation to architecture' (ড. আন্তনিওনি)। ফলে আন্তনিওনির ক্রমবিকাশের মধ্যবর্তী পর্যায় হিসেবেও লা নন্তে মূল্যবান।

অভিনয়ে মার্চেল্লো মাস্ত্রোইয়ানি, জানু মরো, মনিকা ভিন্তি; আলোকচিত্র G. D. Venanzo, সম্পাদনা ই. ডি. রোমা, সংগীত G. Gaslini।

॥ নাজারিন ॥

১৯৫৮, মেক্সিকো। নাজারিনের কেন্দ্রীয় চরিত্র এক আদর্শবাদী, খ্রিস্টান ধর্মযাজক ঠার বিশ্বাস ও শুভবুদ্ধি প্রণোদিত সমস্ত কাজ নিজের ও অশ্চর্য শুধুই বিপদ বা ক্ষতি ডেকে এনেছে। Persecution of the fool—এই হলো এ-ছবির থীম।

আধুনিক জগতে খ্রীস্টের প্রতীক হয়ে জীবন ধারণ শুধু যে অসম্ভব নয় ব্যক্তিগত সমাজ উভয়ের পক্ষে ক্ষতিকরও, এই বক্তব্য নাজারিনে জুলে ধরে ব্রুয়েল গর্ভ বিশ্বাসে আঘাত হেনেছেন বলা যায়। ধর্মযাজক যখন ছবির সমাপ্তিতে আদর্শে বেদী থেকে বাস্তবের মাটিতে নেমে আসেন ততক্ষণ পর্যন্ত সংগীতহীন ছবিতে গুণা শেষদৃশ্যে আকস্মিক হাজার দামামা বেজে উঠে অদ্ভুত ছোতনা ও উদ্দাদনা এনে দেয় যা একধরনের রেজারেকশনের কাজ করে ( ড. ব্রুয়েল )। ছবিটি অমোঘতা পায় শুইখানে। স্বর্ষিকের মতে এ-ছবি একটি সভ্যতার মিথ্যাচরণের চরম দলিল। এবং এক তীব্র ঘৃণা এর প্রেরণার উৎস। নাজারিনের ধীমকে পরিবর্ধিত করে পরে ব্রুয়েল বানান 'ভিরিদিয়ানা'।

অভিনয়ে F. Rabal ও Lopez, আলোকচিত্র G. Figueroa, প্রযোজনা M. B. Ponce ।

## ॥ নাটক ও চলচ্চিত্র ॥

সিনেমার আদি যুগে তাকে বলা হত 'পেটিং উইথ লাইট'। কিন্তু সিনেমা বিমূর্ত গতি ও বিশুদ্ধ আকার নির্ভর হয়ে পড়ে থাকল না। গতি ও আকারের সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্রের অগ্ৰাণ্য উপাদানের উপর ভর দিয়ে মানুষ ও মানুষের জীবনের নাটকীয় রূপায়ণই হয়ে উঠল তার প্রধান লক্ষ্য; নাটকীয়তা—সক্রিয়তা প্রত্যক্ষতা তাৎক্ষণিকতা ও অভিধাত-অর্থো। নাটক ও চলচ্চিত্রের মধ্যে এই মিথক্রিয়ায়, চলচ্চিত্রের নাটকীয় শিল্পরূপ—টেকনোলজি, টেকনিক ও মনস্তত্ত্ব সমস্ত বিচারেই—মঞ্চশিল্পের রূপ ও রীতি থেকে বহু জায়গায় উল্লেখযোগ্যভাবে আলাদা। এই পার্থক্যের কারণ কিছুটা চলচ্চিত্র-মাধ্যমের একেবারে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যের দরুন, কিছুটা আরো বহু মাধ্যমের সঙ্গে সংযোগের ফলে চলচ্চিত্রের যেসব যৌগিক বৈশিষ্ট্য তৈরি হয় তার জন্য।

চলচ্চিত্র ও চিত্রকলা দুয়েই ইমেজের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। সিনেমায় ইমেজ আবার চরিত্র ও কাহিনীর, অর্থাৎ এক ধরনের নাটকীয়তারই বাহন। সিনেমায় যখনই দৃশ্যগত ভাবে কিছু ঘটছে, দর্শকের কাছে তা ঘটছে 'বর্তমানে'। এই ঘটমানতা (presentness) নাটক ও চলচ্চিত্র উভয়ের স্বভাব-লক্ষণ। নাটকে ঘটমানতা ঘটনার বর্তমান কাল ও অভিনেতাদের দৈহিক উপস্থিতি, উভয়ত। অভিনেতা যখন কোনো একটি চরিত্র বা ঘটনা অভিনয় করে দেখান, বাস্তববাদী নাটকে তখন অভিনেতা ও চরিত্রকে সম্পৃক্ত করে নেবার, যা আসলে কাল্পনিক

তাকে বাস্তব হিশেবে গ্রহণের, প্রলোভন থাকে। বাস্তব ও কল্পনার, অভিনেতা ও চরিত্রের এই যোগাযোগ নন্দ্রিয়ালিঙ্গিক নাটকে আরো জটিল, আরো উত্তেজনার। সেখানে এটা যে বাস্তব নয়, নাটক, এই সচেতনতা থেকে যায়। কাল্পনিক ঘটনার অভিনয় বাস্তবতার যে বিভ্রম নিয়ে আসে চরিত্রের বাইরে অভিনেতার নিজস্ব সত্তা দ্বারা সেই বিভ্রমকে ভেঙে দেবার এই ধরনের প্রমাণ গদ্য প্রমুখের চলচ্চিত্রেও রয়েছে।

চলচ্চিত্রে ক্ল্যাশ ব্যাকের মুহূর্তটিও বর্তমান মুহূর্ত। সময় ও স্থানের বৃহত্তর নমনীয়তার দরুন যে কোনো গঠন ও স্থায়িত্বের ক্ল্যাশ ব্যাকই সিনেমায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। দ্রুতি ও গতির দরুন সিনেমা অতীত ও ভবিষ্যতের বিভিন্ন মুহূর্তকে যেভাবে ও যতটা ফলপ্রসূ করে নিজের মধ্যে ধারণ করতে পারে নাটকের তা সাধ্যাতীত। ফলে চলচ্চিত্রের সময়চেতনা ও ঘটমানতা দুটিই উন্নততর। নাটকীয় ঘটমানতা নাট্যশিল্পের যে মৌল উপাদানটির সঙ্গে জড়িত তা হলো exteriorization. এই পরিপ্রেক্ষিতেও নাটক ও চলচ্চিত্র কিছুটা এক ও অনেকটাই ভিন্ন। চলচ্চিত্রে অভিনেতার উপস্থিতি সশরীরে নয়, প্রতিবিম্ব। তবু প্রতিবিম্বের উজ্জ্বল্য, আকার ও কোণের নির্বাচন ও তাদের ক্রমাগত পরিবর্তন, সানুপুঙ্খ উত্থাপন ইত্যাদির জগ্ন চলচ্চিত্রের রূপারোপ প্রতিবিম্বই নাটকের চেয়েও বেশি অভিধাতী। এর প্রমাণ সিনেমা অভিনেতাদের ব্যাপক জনপ্রিয়তায়। আবার নাটকে তার পটভূমি ও পরিবেশ যত বাস্তবসম্মত ভাবেই তৈরি করা হোক না কেন তাকে বাস্তব হিশেবে পুরোপুরি নেওয়া যায় না কিন্তু চলচ্চিত্র যথেষ্ট অবাস্তব ইমেজ ও সেটিকেও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার ক্ষমতা রাখে। কারণ নাটক আজও ইমেজের চেয়ে সংলাপকে অধিক গুরুত্ব দেয়। সিনেমা-ইমেজের বৈচিত্র্য, প্রকার ও অবিরাম ধারাবাহিকতা তার ক্ষেত্রে অসম্ভব। পুনর্নির্মাণে সম্পূর্ণতার পরিমাণ বা মাত্রা চলচ্চিত্রে নিশ্চয়ই বেশি। প্রারম্ভিক ভাবে নাটক বেশি বাস্তব অবস্থা থেকে শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত চলচ্চিত্রেই কিন্তু sense of identity / reality বেশি।

নাটক ও চলচ্চিত্রের সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য ও যোগাযোগ নিয়ে বহু লেখা হয়েছে। আমার নিজেরও একটি বই আছে—দি ড্রামাটিক আর্ট অব দি ফিল্ম। এই আলোচনায় আমি শুধু মূল উপাদানগত প্রসঙ্গগুলির উল্লেখ করলাম। প্রকৃতিগত ভাবে কিছু কিছু ছবি অনেক সময়ই নাট্যধর্মী, তার আবেগ সংলাপ সেট-আপ নাটকের বেশি কাছে। কিন্তু তা যে পুরোদস্তর ছবি হয়ে উঠতে পারে তার প্রমাণ

বার্গম্যানের বহু ছবিতে। আর যা বলার আছে তা হলো চলচ্চিত্রে বিভাজন করে নিয়ে চিত্রগ্রহণের পর চিত্রিত ইমেজসমূহকে সম্পাদনার মাধ্যমে সংযোজন ও গুণন করে যে চলচ্চিত্র স্থূলত রূপ দেওয়া যায় তা চিত্রসম্পাদনার juxtaposition-quality-র জন্ম, একাত্তই চলচ্চিত্রের নিজস্ব গতি-ছন্দ-টেম্পো ও মনতাপ যা থেকে উঠে আসে।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : পার্কার টাইলারের দি থ্রু রেসেস্ অব দি ফিল্ম : দি আর্ট, দি ড্রামা, দি কাণ্ট ॥

## আলান ক্যাস্ট

॥ নানুক অব দি নর্থ ॥

১৯২০-২২, আমেরিকা। স্মেরক অঞ্চলের অধিবাসী, উত্তর কানাডার, এক্সিমোদের জীবন নিয়ে রবার্ট ফ্ল্যাহার্টের প্রামাণ্য চলচ্চিত্র তথা লিরিক্যাল ডকুমেন্টারি। ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র নানুক ছিল এক বাস্তব ব্যক্তি। কানাডার তুষারাবৃত অঞ্চলে অনেক সমস্যা-অসুবিধার মধ্যে গুটিং করে এবং গুটিংয়ের শেষে অনেক বাধা-বিপত্তির পর, ফ্ল্যাহার্ট ছবিটি শেষ করতে ও দেখাতে সমর্থ হন। তথ্যচিত্রের ইতিহাসে নানুক অব দি নর্থ আজো একটা মাইলস্টোন হয়ে আছে (ড. তথ্যচিত্র, ফ্ল্যাহার্ট)। ছবিটি একই সঙ্গে বাস্তবতা, কাব্যময়তা ও অন্তরঙ্গতার ক্লাসিক চিত্র-রূপ। শৈল্পিক স্বীকৃতি ছাড়াও এর দর্শকমহলে জনপ্রিয়তার কথাও বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। নৃতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ হিশেবেও এই ছবি মূল্যবান (ড. নুভব ও চলচ্চিত্র)। ফ্ল্যাহার্ট ছিলেন প্রাণচঞ্চল, জীবনপ্রেমিক, মেজাজে কাব্যিক ও প্রবণতার দিক থেকে আবেগমূলক; তাঁর আগ্রহ ছিল তথ্যচিত্রের মানবিক প্রসঙ্গ-অনুসঙ্গে। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যেরই দেখা মিলবে নানুক অব দি নর্থ। ফ্ল্যাহার্ট অনুভব করে-ছিলেন সমস্ত প্রতিকূলতা ও সংগ্রাম সত্ত্বেও নানুক স্বথী ও স্বাধীন। ছবিতে সেই ধারণাই প্রকাশ পেয়েছে। ছবিটি নির্মিত হয়েছে এক্সিমোদের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা থেকে, তাদের সঙ্গে তাঁর গভীর মানবিক সম্পর্ক থেকে। তিনি উপর থেকে, উঁচু থেকে, তাদের দেখতে চাননি, তাদের একজন হয়ে দেখতে চেয়েছেন। তাঁর স্ত্রীও এই ছবির কাজে অংশগ্রহণ করেন। ছবিটি নিয়ে ফ্ল্যাহার্টের নিজের চিন্তাকর্ষক লেখা আছে।

প্রযোজনা ফ্রান্সের একটি বৃহৎ পশম ব্যবসায়ী সংস্থা, চিত্রনাট্য আলোকচিত্র পরিচালনা ফ্ল্যাহার্ট, প্রদর্শনকাল এক ঘণ্টা ॥

## ॥ নিও-রিয়ালিজম্ ॥

১৯৪৪ সাল। ইতালির বেশ কিছুটা অংশ জুড়ে জার্মানদের তাণ্ডবলীলা চলছে। মিত্রবাহিনীর আফ্রিকা জয়ের পর্ব প্রায় সমাপ্ত। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা, ফ্যাসিবাদী মুসোলিনী ফ্যাসিষ্ট কাউন্সিলের সমর্থন হারিয়েছেন, ইতালির স্বদেশী যোদ্ধাদের সঙ্গে ফ্যাসিষ্ট সমর্থকদের বিবাদ তখন চরমে। এই অবস্থায় মুসোলিনী পরাজিত, গৃহযুদ্ধের তুণুলকাণ্ডে পর্য়দন্ত অবস্থায় মুসোলিনী ইতালি পরিত্যাগ করলেন। অল্পদিকে ঠিক এই সময় এই রকম রাজনৈতিক অস্থিরতার অন্তরালে জন্ম নিল চলচ্চিত্রের এক মহান শিল্পমন্ত্র—‘নিও-রিয়ালিজম্’। চলচ্চিত্রের ইতিহাসে তৎসংগত কারণে এই নিও-রিয়ালিজম্ দীর্ঘকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এটি মূলতঃ একটি শিল্পদর্শন। চলচ্চিত্রের ইতিহাসে চল্লিশ দশকের শেষে উন্মোচিত এই শিল্পধারার পরিচালকদের মূল স্লোগান ছিল ‘Take the camera out into the streets’। জীবন যেমন, তাকে সেইভাবে যথাযথ ছবির পর্দায় তুলে ধরলেন পরিচালকেরা। সেই সঙ্গে যুক্ত হলো শিল্পীর সহজাত মানবিকতা, ছায় ও সত্যের মূল্যবোধ, জীবন নিবিক্ত ভালোবাসার সহজ সরল গভীর প্রতিচ্ছবি। বিভিন্ন বিস্তারিত ব্যক্তি চেতনার জাগ্রত প্রকাশ, মানুষের প্রাত্যহিক উত্থান পতন, বিচ্ছিন্নতাবোধ, উৎকেন্দ্রিকতা, মানবিক মূল্যবোধের নবমূল্যায়ন, এই সবই ইতালিয় সিনেমার নয়া বাস্তবতার অবদান। ইতালিয় নিও-রিয়ালিষ্ট চলচ্চিত্রকারদের শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে ছবিতে সমাজ সচেতনতার ছাপ পড়লো। যুদ্ধের বিধ্বংসী তাণ্ডবলীলায় ইতালির স্টুডিওগুলো ভেঙে চূরমার হয়ে গিয়েছিল। অবশ্যস্তাবী পরিণতি স্বরূপ শিল্পীরা স্টুডিওর কৃত্রিম চয়র ছেড়ে, সমস্ত রকম মেকী আধুনিকতার ফ্যাশন পরিত্যাগ করে যুদ্ধোত্তর ইতালির পথের ধূলায় নেমে পড়লেন। উদ্দেশ্য একটাই—দরিদ্র, নিপীড়িত, লাঞ্চিত জনসাধারণের মুখের মিছিলে জীবনের বাস্তব রূপটির সন্ধান করা। উনিশ শতকী যুক্তিবাদী যে সব লেখকবৃন্দ যেমন গিওভান্নি ভারগা, লুইগি কাপুয়ানা, আন্তনিও ফোগাজ্জারো, এডমণ্ডো ডি আমিকি প্রমুখেরা যে বাস্তবসম্মত শিল্পধারার প্রচেষ্টায় তাঁদের সাহিত্যের আন্দোলন অসমাপ্ত রেখে গিয়েছিলেন, সিনেমার নিও-রিয়ালিজম্ সেই স্তাবধারারই এক ধরনের নব অভ্যুত্থান।

যদিও রোজেলিনির Rome, Open City ছবিকেই এই আন্দোলনের প্রথম অস্তিত্বব্যক্তিরূপে চলচ্চিত্র সমালোচকেরা গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু নিও-

রিয়্যালিজম্ সংজ্ঞাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন ইতালিয় ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, চলচ্চিত্র পরিচালক উমবার্তো বারবারা ভিসকন্তি পরিচালিত ‘Osessione’ ছবিটি প্রসঙ্গে। এ ছবিতে সমাজ বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মনস্তাত্ত্বিক গভীরতা। যা পরিচালকের ত্রিতল অভিজ্ঞতার দ্বারা বিধৃত। ছবিটি ১৯৪২ সালে তৈরি হলেও সর্ব সমক্ষে প্রদর্শিত হয় ১৯৪৬ সালে। কান চলচ্চিত্র উৎসবে ১৯৪৬ সালে রোজেলিনির রোম, ওপেন সিটি, ব্লাসেস্তির Un Giorno nella Vita এবং লাভুয়াদার Il Bandito ছবিগুলির সঙ্গে এটি প্রদর্শিত হয়।

অঙ্কের হিসেব কষলে দেখা যাবে যে ইতালির এই ‘নিও-রিয়্যালিজম্’ বা ‘নয়াবাস্তবতা’র আন্দোলনটি চলচ্চিত্রের ইতিহাসে টিকে ছিল বছর ছয়-সাত। সমালোচকদের মতে ১৯৪৫-এ রোজেলিনির ‘রোম, ওপেন সিটি’ থেকে শুরু করে ১৯৫১ সালে তৈরি ভিক্তোরিও ডেসিকার ‘উমবার্তো ডি’ ছবি পর্যন্ত বিস্তৃত এর সময়সীমা। এই সীমিত সময় পর্বে পরিচালকেরা যে কটি ছবি বিশ্ব দর্শকদের দান করেছেন, তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শিল্প প্রভাব অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক। এই আন্দোলনের বহু ছবি চলচ্চিত্র নির্মাণের বিশিষ্ট এক শিল্পদর্শ হিসেবে আজও আলোচিত হয়। ডেসিকার ‘বাইসাইকেল থ্রিৎস’, ‘গুসাইন’, ‘উমবার্তো ডি’, ডি স্পাণ্ডিসের ‘Tragic Hunt’, লুইজি জাম্পার ‘To Live in Peace’, ‘Angelina’ ভিসকন্তির ‘The Earth Trembles’, রোজেলিনির ‘ইওরোপা ফিফটি ওয়ান’ ইত্যাদি এই আন্দোলনের অগ্রতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে চিহ্নিত। এই আন্দোলনের গোড়ার দিকে শিল্পীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী একটা প্রবণতা ভীষণ সক্রিয় ছিল। মানুষের অস্তিত্বের লড়াই, যুদ্ধ আর শান্তি এই ত্রিবিধ বিষয়ের পরিক্রমায় যুদ্ধ, নৃশংসতা আর ধ্বংস এবং পরিবেশচেতনার অনুসন্ধানই চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে বেশি মাত্রায় কাজ করেছিল। পরের দিকে শিল্পীরা বাস্তব জীবনের পটভূমিতে ব্যক্তি মানুষের দুঃখ, দুর্দশা, আত্মিক সংকট, মনস্তত্ত্ব, নির্দিষ্ট পারিবারিক ঘটনা-কেন্দ্রিক উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে আধুনিক সমাজজীবনের ছবিটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে নিও-রিয়্যালিস্ট আন্দোলনের সবচেয়ে মহৎ অবদান মানবিক দয়া, এর নিষ্ঠা ও স্টাইলের কঠোর শিল্প সংযম। অসংখ্য ছবির দুখকল্প যুদ্ধোত্তর মানুষকে সত্য ও স্নায়, মানুষের জীবননিগূঢ় ভালোবাসার প্রতি এগিয়ে দিয়েছে। এই ইতিবাচক দিকটা সিনেমার ইতিহাসে বিশেষ মর্যাদায় চিহ্নিত। জীবনের গভীর সত্য প্রত্যক্ষ করে নিও-রিয়্যালিস্ট স্রষ্টারা জীবন যৌবন, তার উচ্ছল প্রকাশ, স্বপ্ন হাশ্বরস, সমাজের প্রতি বুদ্ধিদীপ্ত

ব্যদ আর চরিত্রের কাব্যিক মেজাজকেও তুলে ধরেছেন পাশাপাশি। প্রসঙ্গতঃ লাভুয়াদা নির্মিত 'The Mill on the River' রেনাটো কার্শ্চেলানির 'Sotto il Sole di Roma', 'Springtime', এবং 'Two Penny Worth of Hope' — ইত্যাদি ছবির নাম উল্লেখ্য।

নিও-রিয়ালিস্ট ভাবধারার ছবিগুলোর কাহিনী সহজ সরল ভঙ্গিতে তার প্রতিপাঠ বিষয়টুকু প্রকাশ করতো, ছবিগুলোও তোলা হত ডকুমেন্টারী ভঙ্গিতে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অপেশাদার অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং একেবারে সাধারণ স্তরের মানুষদের নিয়ে তৈরি হত। সিনেমা টেকনিকের কোনোরকম চমক ছিল না ছবিতে। কোনো flash back পদ্ধতি ব্যবহৃত হত না। এমনকি কোনো জাঁকজমকপূর্ণ দৃশ্যাবলীও পরিহার করা হত। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে লঙ শট গৃহীত হত। স্থান কাল ঘটনাগত এক অদ্ভুত প্রামাণিকতা কাহিনী ও চরিত্রের চূড়ান্ত বাস্তবতাকে দর্শকদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিত। সিনেমা যে 'director's medium' এ তবুটি তখন থেকেই প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করে।

এক অর্থে নিও-রিয়ালিজম্ চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একটি শিল্প আদর্শের জন্ম দিয়েছিল। 'This is the way things are' অর্থাৎ এই-ই আমাদের জীবন, এই তার চলমান ধারা। এরই মধ্যে আমাদের অস্তিত্বের নিত্য উপাদান অজস্র ভঙ্গিতে ছড়িয়ে আছে। তাকেই ধরতে হবে, অনুভব করতে হবে, গভীর জীবন মমত্বে এই জীবনের সত্যকার স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে হবে। চলচ্চিত্রকারেরা এই রকম আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। যুদ্ধোত্তর সিনেমার ইতিহাসে এই নয়া বাস্তবতার ধারা আধুনিক ইওরোপীয় জীবনের নানা অভিঘাত ও বৈচিত্র্যের পালাবদলে ক্রমশঃ খিতিয়ে পড়লেও অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালেও এর প্রভাব অলঙ্কিত নয়। ১৯৫৪-তে তৈরি ফেলিনির বিখ্যাত ছবি 'লাস্টোদা', ১৯৬০-এ তৈরি ভিসকন্ডির 'রোকো এ্যাও হিজ ব্রাদার্স', এবং আরো পরবর্তী সময়ে তৈরি তুরস্কের বিতর্কিত ছবি 'কংকারাস্ অফ দ্য গোল্ডেন সিটি' নিও-রিয়ালিস্ট শৈলীর ধারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। ব্যক্তিগত জীবনযন্ত্রণার অগ্ন্যতম শিল্পী আন্তনিওনির ১৯৫৭-তে তৈরি 'ইল গ্রিদো' ছবিতেও 'নয়াবাস্তবতা'র স্পর্শ আছে।

১৯৫২-তে ফরাসি পত্রিকা 'Films et Documents'-এ 'নিও-রিয়ালিজম্'র মৌলিক দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে দশটি সূত্রের উল্লেখ করা হয়েছিল। (ক) বস্তুবা, (খ) সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকোণ-কেন্দ্রিক সামাজিক সমস্যা প্রতিক্ষেপন, (গ) প্রামাণিকতা, (ঘ) সূক্ষ্ম-সংবেদনশীল রীতির আশ্রয়ে বাস্তবতার প্রকাশ,

(ঙ) স্বতঃস্ফূর্ত জনগণের কর্মকাণ্ড ক্যামেরায় বিদ্যুত করা, (চ) অভিনেতা তথা চরিত্রের সত্যকে উপলব্ধি করা, (ছ) দৃশ্যগত প্রামাণিকতা ও স্টুডিও বর্জন, (জ) কৃত্রিম আলোকসম্পাৎ ব্যতিরেকে স্বাভাবিক আলোক উৎসের সত্যকে তুলে ধরা, (ঝ) ফটোগ্রাফির রিপোর্টধর্মী স্টাইল এবং (ঞ) ক্যামেরার চূড়ান্ত স্বাভাবিক গতিভঙ্গি অনুসরণ এবং দৃশ্যগ্রহণ পরবর্তী সিংক্রনিজম।

এই শিল্প আন্দোলনের প্রায় দুই দশক পরে ১৯৭৪ সালে ইতালিয় চিত্র-সমালোচক নিও-রিয়ালিজম্ সম্পর্কে মূল্যবান ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, নয়-বাস্তবতা আন্দোলনটি মূলত: ‘an ethics of aesthetics’। বস্তুত: এই ধারার পরিচালকেরা আঙ্গিকের দিক থেকে নৃস্ববিচারে প্রায় সকলেই একে অপরের থেকে ভিন্ন ছিলেন, কিন্তু শিল্প-নৈতিকতার প্রশ্নে তাঁদের সকলের মধ্যে এক অদ্ভুত সাদৃশ্য ছিল। ফলত: প্রত্যেক শিল্পী একই মহতী শিল্পাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে শানা বর্ণের একাধিক বাস্তবধর্মী ছবি উপহার দিয়েছিলেন। সেগুলি আজো হীদকথণ্ডের মতো সিনেমার ইতিহাসে বিরাজ করছে। নিও-রিয়ালিস্ট আন্দোলনে একা কেবল পরিচালকই নন, তাঁদের সঙ্গে সমান পারদর্শিতায় জাভাঙ্গিনির মতো খাঁটি চিত্রনাট্যকারেরাও হাত মিলিয়েছিলেন।

পূর্ব ইউরোপীয় চলচ্চিত্রের আধুনিক ক্রমবিকাশে এই আন্দোলনের বিশেষ ভূমিকা স্বীকৃত। হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়ার চলচ্চিত্র শ্রষ্টারা এর দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন। ফেলিক্স মারিয়াসে, জোলভান ফাব্রি, এলমার ক্লজ, ইয়ান কাদার, আন্দ্রে ওয়াজদা, আন্দ্রে মুস্ক, জেরী কাণ্ডম্বারেরেউইজ্ প্রমুখ শ্রষ্টাদের শিল্পকর্মে এর স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বিখ্যাত রুশ পরিচালক মিখাইল রমণ রাশিয়ান চলচ্চিত্রে নিও-রিয়ালিস্ট প্রভাবের কথা বলেছেন। এ ছাড়াও ফ্রান্সের পরিচালক ক্লেমঁ, কায়েৎ, ক্লুজো, গোদার এবং ক্রফো, জাপানের কিনোশিটা, ইচিকাওয়া এবং ওশিমার শিল্পকর্মেও এই ধারা প্রতিফলিত। সত্যজিৎ রায়ের ‘পথের পাঁচালী’ নির্মাণের পেছনেও নয়বাস্তবধর্মী শিল্প শৈলীর প্রেরণা বিশেষ সক্রিয় ছিল। স্বদূর মার্কিন মূলকেও চলচ্চিত্র নির্মাণে প্রগতিশীল সমাজবাদী শ্রষ্টার কাজে এই শিল্পাদর্শের ছায়া পড়েছিল। মার্কিন পরিচালক এলিয়া কাজানের Boomerang, Panic in the Streets, On the Waterfront, A Face in the Crowd প্রভৃতি ছবি এই প্রসঙ্গে অরণীয়।

কেবল যুদ্ধোত্তর ইতালির চলচ্চিত্র ইতিহাসের বৈপ্লবিক শিল্প আন্দোলন হিসেবে নয়, নিও-রিয়ালিস্ট সিনেমার ভাবধারা পরবর্তী যুগের এবং আগামী

প্রজন্মের চলচ্চিত্র প্রগতির ক্ষেত্রে গভীর শিকড় বিস্তার করে গেছে। ১৯৫৬-১৯৫৯-এর ত্রিটিশ ফ্রী সিনেমা, ১৯৫৮-৫৯-এ উদ্ভূত ফ্রান্সের 'নবতরঙ্গ' আন্দোলন, যাটের দশকের 'direct cinema' ইত্যাদি 'নয়াবাস্তবতা' শিল্পশৈলীর প্রত্যক্ষ উত্তরসূরী হিসেবে বিচার্য।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : রয় আর্মদ-এর প্যাটার্নস অব রিয়ালিজম : এ স্টাডি অব ইটালিয়ান নিও-রিয়ালিস্ট সিনেমা ॥

### সোমেন যোষ

॥ স্মেন্ নিকভিষ্ট ॥

( জন্ম ১৯২২/২৩, সুইডেন )। তাঁর বাবা ও মা ছিলেন খ্রিস্টান মিশনারি যাদের বেশির ভাগ সময় আফ্রিকায় কাটত বলে স্মেন্ বড়ো হয়েছিলেন আত্মীয়দের বাড়িতে। তিনি সহকারী চিত্রগ্রাহক রূপে সুইডিশ সিনেমায় যোগ দেন। বার্গম্যানের বহু ছবির সফল ক্যামেরাম্যান হিসেবে কালক্রমে নিকভিষ্ট স্বনামধন্য হয়েছেন। বার্গম্যানের প্রায় কুড়িটি ছবিতে তিনি ক্যামেরা চালিয়েছেন, তার মধ্যে দি ভার্জিন শ্রিং, থু এ গ্লাস ডার্কলি, দি সাইলেস, পারসোনা, শেম, প্যাশন অব অ্যানা, টাচ, ক্রাইজ অ্যাণ্ড হুইস্পারস, সীন্স ফ্রম এ ম্যারেজ, ফেস টু ফেস, দি সারপেন্ট'স এগ, অটাম সোনাটা, ফ্যানি অ্যাণ্ড আলেকজান্ডার প্রভৃতি খুবই উল্লেখযোগ্য। আলো ছায়ার অনবদ্য বণ্টন, ভীষণ প্যাশনেট পরিবেশ চিত্রণ, ব্যাকগ্রাউণ্ড ও ফোরগ্রাউণ্ডের সার্থক স্থানবিনিময়, অত্যন্ত অভিঘাতী করে ক্লোজ আপ গ্রহণের ও কম্পোজিশন নির্মাণের ক্ষমতা এবং রঙিন ছবিতে রঙের চিন্তাশীল প্রয়োগ ও সংবেদনশীলতা তাঁকে ঋপদী চিত্রগ্রাহক করে তুলেছে। বার্গম্যানের ছবি অভিনয়ের জগৎ যেমন তেমনি তাঁর চিত্রগ্রহণের ( নিখুঁত কম্পোজিশন ও ক্যামেরা মুভমেন্ট, গভীর চিত্রগ্রাহতা, শৈল্পিক সারল্য ও রহস্য ) জগৎও অমোঘতা পেয়েছে। আমেরিকায় ও ইউরোপের অগ্রাঙ্গ দেশের ছবিতেও নিকভিষ্ট আলোক-চিত্র পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন, ভারতে আলোকচিত্রিত কনরাড রুকসের সিক্কার্থ ছবিতেও। একাধিক স্বল্প ও পূর্ণ দৈর্ঘ্য ছবিও পরিচালনা করেছেন তিনি। তার মধ্যে গরিলা ( ৫৬ ) ও দি ভাইন ব্রীজ ( ৬৫ ) উল্লেখযোগ্য।

॥ নিগ্রো ॥

বছর ত্রিশ আগে চিত্রসমালোচকেরা হলিউডের দেখানো বর্ণ বৈষম্যের 'দুঃসাহসী' প্রতিফলনকে সহজভাবে মেনে নেওয়া খুব একটা সাহসের কাজ বলে ভাবতেন।

কিন্তু, পরবর্তীকালে বর্ণবৈষম্যকে কেন্দ্র করে যে হিংসার আগুন জলেছে তার কাছে সেই সব ছবির প্রতিফলনকে কতই না মৃদু কতই না সরল মদিচ্ছাপ্রণোদিত মনে হয়। বস্তুতঃপক্ষে, আজকে মার্কিন নিগ্রো জীবনের যে দৃশ্য তার ছবিকে মঞ্চে বা পর্দায় সার্থকভাবে নাট্যরূপ দেওয়া আগের চাইতে অনেক শক্ত, কারণ বহুদিনের অবিচারে তাদের পুঞ্জীভূত ক্রোধ আজ অনেক তীব্র হয়ে উঠেছে। আমার 'Beije, Brown or Black' ( ফিল্ম কোয়ার্টারলী, ফল ১৯৫৯ ) নামক প্রবন্ধে আমি দাবি জানিয়েছিলাম যে পর্দায় নিগ্রোমানুষকে—যে যেমনটা তেমনটি ভাবে দেখান হোক। এ দাবি আমি তুলেছি এই কারণে যে নিগ্রোমানুষের সামাজিক অবিচারকে বুঝে নেবার ভান করে বহু ছায়াছবি হয়েছে যেগুলি আসলে নিগ্রো বনাম শ্বেতাঙ্গ এই উত্তেজক বিষয়বস্তুকে ভাঙিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছে। ১৯৬০ সাল থেকে আমেরিকার শহরগুলিতে ক্রমবর্ধমান বর্ণবৈষম্যকেন্দ্রিক বিক্ষোভ আন্দোলন, Congress of Racial Equality (CORE) এবং এরই পরিপূরক জংগী সংগঠন Student Non-violent Co-ordinating Committee (SNCC)-র বিস্তারশীল প্রভাবের ফলে এটা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল যে নিগ্রো নেতারা এবং শেষ অবধি নিগ্রো অভিনেতারা একদিন না একদিন হলিউড চিত্র-শিল্পকে আক্রমণ করে বসবেন। এই সময়ে পর্দা এবং টেলিভিশন চিত্র প্রযোজক-দের ওপর সংগঠিত ভাবে চাপ পড়ে, ফলে তাঁরা অধিকতর সংখ্যায় এবং বেশ সাফল্যের সঙ্গেই নিগ্রো অভিনেতাদের নিয়োগ করেন। এ সময়কার ধারাবাহিক টেলিভিশন চিত্রগুলিতে নিগ্রো-অভিনেতৃত্ব অতীতপূর্ব ভাবে বিভিন্ন চরিত্রের রূপায়ণ করেছেন—যেমন, ডাক্তার, নার্স, আইনজীবী, শিক্ষক, বিমানচালক, অফিস কর্মকর্তা ইত্যাদি। Stepin Fetchit, Mountain Moreland, Willie Best-এর যুগ থেকে স্বেচ্ছায় সরে গিয়ে আমেরিকার টেলিভিশন জেনেগুনেই চিত্র কাহিনীকে প্রতিদিনের মানুষ নিগ্রোর দৃশ্য দিয়ে সুন্দরভাবে সম্পূর্ণ করে তুলেছে। যদিও বর্ণবৈষম্য দূর করার ব্যাপারে এবং শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গের মাঝে বোঝাবুঝির আবহাওয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই প্রচেষ্টা বৈপ্লবিক নয় তাহলেও এই প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য। এটা মনে রাখতেই হবে যে মার্কিন চলচ্চিত্রে আজো বিভিন্ন বর্ণের মানুষের (শ্বেত-কৃষ্ণ) বিবাহ সম্পর্কে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখা হয়। একটি ছবিকে (One Potato Two Potato) এই বিষয়ের অবতারণার জন্য বিরূপ সমালোচনা লাভ করতে হয়েছে। ইদানিং কাল অবধি হলিউডের স্টুডিও-গুলি শ্বেত-কৃষ্ণাঙ্গের বিবাহ সম্পর্কের কাহিনী নিয়ে প্রায় খেলা খেলা করেছে।

যেমন Paris Blues ছবির পেছনে রয়েছে আজকের দিনের চালাক-চতুর, পরিচ্ছন্ন ভাষায় কথা বলা, সৌখীন পরিচ্ছন্দে ভূষিত এবং স্বকীয় ব্যক্তিবৃত্তি ঐতিহ্যের জ্ঞান গবিত নিগ্রোদের পর্দায় হাজির করার একটা ইচ্ছা; এ ছবির যে ব্যর্থতা তা আসে নিগ্রো অভিনেতাদের দিয়ে তাদের সংস্কারকে নিজমুখে স্বীকার করিয়ে নিতে না পারার দুর্বলতা থেকে। নিগ্রো পুরুষ যৌনতার প্রতীক এই ব্যাপারটাতে হলিউডের আন্তঃবর্ষ রোমাণ্টিসিজমের বড়ো ক্রটি ধরা পড়ে। বিগত চল্লিশ বছর ধরে হলিউড একটা নির্দিষ্ট টাইপেরই নিগ্রো অভিনেতা বেছে নিয়েছে—সেই নিগ্রো মানুষ যে নৃতত্ত্ব অনুযায়ী 'Negroid' সংজ্ঞার সব রকম বৈশিষ্ট্যের খাঁটি প্রতিভূ। সব ভূমিকায় তাদের খেতাব মুখ্য অভিনেতৃবৃন্দের পরে গৌণ স্থান দেওয়া হয়েছে এবং সেটা যেখানে হয়নি সেখানে নিগ্রো অভিনেতাদের মাঝারি ধরনের শিক্ষিত ভাবলেশহীন চরিত্রে দেখান হয়েছে, যেমন আর্নেস্ট হেগারসন, কানাডা লী, কিংবা জুয়ানো হার্গাঙেজ অথবা দেখান হয়েছে যুদ্ধোত্তর কালের স্নায়ুহীন, রুক্ষচিত্ত Jazz বাজনায়ে ক্ষিপ্ত মানুষের চেহারায়ে, জেমন্ এডওয়ার্ডসের মতন। নিগ্রো সম্পর্কে ধ্যান-ধারণার যে পরিবর্তন মার্কিন চলচ্চিত্রে ষাটের দশকে ঘটে তার নিদর্শন হলো সিড্‌নী পয়টিয়ারের বলিষ্ঠ হাঙ্কা বন্ধুত্বাবাপন্ন ব্যক্তিত্ব। এই শিল্পী আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করেছেন Academy Award প্রাপ্ত প্রথম 'শ্রেষ্ঠ অভিনেতা' হিসাবে। সেইদিক থেকে দেখে আশ্চর্য হতে হবে যে কীভাবে তাঁর অভিনীত প্রতিটি চরিত্রে যৌনতার বাড়াবাড়িকে ছেঁটে বাদ দেওয়া হয়েছে। মার্কিন নিগ্রোকে বাস্তবে 'যে যেমন তেমন' ভাবে দেখানোর একটা উদাহরণ হচ্ছে রাল্ফ নেলসনের দ্বিতীয় চিত্র, 'Lilies of the Field', অবশ্য 'যে যেমন তেমন' কথাটা একটা শ্লোগান যা সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয় টিলেটাল ভাবে। প্রকৃতপক্ষে নিজের দেশের সাধারণ নাগরিক হিসেবে সে যে কী তার অনুসন্ধান মার্কিন নিগ্রো আজো ব্যস্ত, তার অনুসন্ধান আজো সম্পূর্ণ হয়নি। মার্কিন দেশে নিগ্রো মানুষ সম্ভাব নিয়ে খেতাবদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে এই কথাটা স্পষ্টভাবে জানাবার ইচ্ছা Lilies of the Field ছবিতে প্রকাশ পেয়েছে; স্বাভাবিকভাবেই কাহিনীতে যে দৃঢ় সিদ্ধি প্রকাশ করা হয়েছে তার ফলে এই ছবিটি হয়ে পড়েছে বিদ্বেষভরা The Cool World ছবির একেবারে উর্পেটা জিনিশ। Lilies of the Field ছবিতে বর্তমান আমেরিকান জীবনের ছুটি অনস্বীকার্য সামাজিক সমস্যাকে ( নিগ্রো এবং ক্যাথলিসিজম ) সিদ্ধিময় বিবেকী আন্তরিকতার সঙ্গে যুক্তভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। এটা খুবই

উল্লেখযোগ্য। [ ১৯১৪য় গ্রিফিথ যখন দি বার্থ অব এ নেশন-য়ে নিগ্রো-বিরোধী মনোভাবের পরিচয় দিলেন তখন থেকেই নিগ্রো দর্শকদের জ্ঞান নিগ্রো শিল্পীরা তাঁদের নিজস্ব ছবি তৈরি শুরু করলেন। খেতাপদের তৈরি বিভিন্ন প্রখ্যাত ছবির পুনর্নির্মাণ করে ক্লফার্স নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিলেন ও বহু নতুন নিগ্রো অভিনেতা অভিনেত্রীর আবির্ভাব ঘটালেন। এঁদের মধ্যে পল রোবসনের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। ১৯৭২-এ সমস্ত নিগ্রো চরিত্র নিয়ে চিত্রায়িত কাহিনীচিত্র ষ্টিফট সমস্ত শ্রেণীর দর্শকের কাছে জনপ্রিয় হওয়ার পর ও ১৯৭৭-য়ে অ্যালেক্স হেলি-র রুটস উপন্যাস অবলম্বনে ধারাবাহিক টিভি চিত্রমালার অসাধারণ সাফল্যের ফলে আজ নিগ্রো শিল্পীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির ও ছবিতে প্রদর্শিত নিগ্রো চরিত্রের বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনায় যথেষ্ট পরিবর্তন এসেছে। এ ব্যাপারে স্পীলবার্গের একাধিক ছবির বিশেষ ভূমিকা আছে। আজ নিগ্রো শব্দের বদলে ব্যবহার করা হচ্ছে ক্লফার্স শব্দটি। White Africa and Black America-র মতো ব্যঞ্জনাময় বাগর্থেরও দেখা মিলছে। ]

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : এডওয়ার্ড ম্যাপ-এর ব্ল্যাক্‌স্ ইন আমেরিকান ফিল্মস : টুডে অ্যাণ্ড ইয়েষ্টারডে।

## আলবার্ট জনসন

### ॥ মুভেল ভাগ ॥

পঞ্চাশের দশকে ফ্রান্সে চলচ্চিত্র অনুশীলনের ক্ষেত্রে পরপর কয়েকটা ঘটনা ঘটেছিল, যেমন ফ্রান্সের ফিল্ম স্কুল IDHEC থেকে চলচ্চিত্র অধ্যয়ন শেষ করে বহু নতুন কলাকুশলী ও শিল্পী বেরিয়ে আসছিলেন, ল্যাংলোয়ার সিনেমাথেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নির্বাচ ও সবার চিত্রগুলি আগ্রহী দর্শকদের জ্ঞান বারবার প্রদর্শিত হচ্ছিল, চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্রিকা কাইয়ে দ্ব্য সিনেমায় নানা ধরনের ছবি ও পরিচালকদের নিয়ে নিয়মিত তাত্ত্বিক আলোচনা চলছিল, বেশ কিছু তরুণ শিল্পী অত্যন্ত মৌলিকতার সঙ্গে স্বল্প দৈর্ঘ্যের চিত্র নির্মাণ করছিলেন, আর এর সঙ্গে ফরাসি প্রযোজকরা দেখছিলেন যে প্রচলিত ধরনের ছবি প্রায়ই আর ব্যবশায়িক সফলতা পাচ্ছে না। এই অবস্থায় ফ্রান্সে (ড্র.) দুটি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত কিছু লেখক যেমন একদা আউ-গার্দ ধারার সূচনা করেছিলেন প্রায় তেমনভাবে কাইয়ে দ্ব্যর সঙ্গে জড়িত সমালোচকরা তাত্ত্বিক আলোচনা থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণে এসে নতুন ধরনের ছবি তৈরি শুরু করে নবতরঙ্গ চলচ্চিত্রের সূত্রপাত করলেন।

এই রকম ছবি কম খরচে তৈরি হচ্ছিল ও জনপ্রিয়তা পাচ্ছিল বলে প্রযোজকরা এগিয়ে আসেন। ১৯৫৭/৫৮ থেকে পরের পাঁচ/ছয় বছর ধরে তৈরি করা নতুন ফরাসি পরিচালকদের এই সমস্ত ছবিকে একত্রে হুভেল ভাগ বা ফরাসি নিউ ওয়েভ বা নতুন রীতির চলচ্চিত্র বলা হয়। এই পরিচালকদের মধ্যে শ্চাবল, ক্রফো, গদার, রিভেং, রোহ্মের, নুই মাল ও আল্যা রেনে, এবং ভার্দা, দেমি, মার্কোর উল্লেখযোগ্য। এই আন্দোলনের অন্তর্গত ছবির মধ্যে রয়েছে Orfeu Negro, হিরোশিমা মন আমুর, Les Cousins, Breathless, Les Quatre Cents Coups, Cleo de 5 a 7, ইত্যাদি।

হুভেল ভাগকে কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞাবদ্ধ ধরানা বলা যায় না, এটা কোনো বিশেষ শৈলীর প্রমাণও নয়, বরং কিছু বৈশিষ্ট্যের পরিচয় যেমন, নিজস্ব অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে বিষয়বস্তু গ্রহণ, লোকেশন শুটিং, অপেশাদার অভিনেতাদের নিয়ে কাজ করা, ইম্প্রোভাইজেশনের প্রবণতা ইত্যাদি—যে সব বৈশিষ্ট্য যে কোনো দেশের নতুন রীতির চলচ্চিত্র আন্দোলনে লভ্য। এই 'personal, informal, candid' ছবিগুলির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ক্রফোর বক্তব্য, এতে থাকত না কোনো 'extras, theatrical intrigues, expensive sets, explanatory scenes', এদের প্রধান গুণ 'simplicity, grace, lightness, modesty, elegance, speed', প্রধান দোষ 'frivolity, naivete, lack of conscience (নৈতিক ও সামাজিক বিচারের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হত দর্শকদের ওপর)'। বলা যায়, গদারের ত্রেথলেস হুভেল ভাগের প্রতিনিধিস্থানীয় উদাহরণ। গল্পের বর্ণনা ও বর্ণনার আদি-মধ্য-অন্ত পারস্পর্ষ কম, অভিজ্ঞতা ও অহুতবের ভাষান্তর বেশি। ছবিতে বিষয়বস্তুর নতুনত্বের পাশাপাশি আঙ্গিকগত নতুনত্বও।

প্রখ্যাত ফরাসি নৃতাত্ত্বিক ড. জঁ রুশ আফ্রিকায় তাঁর গবেষণা-চিত্র নির্মাণের সময় যে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেছিলেন—হান্ডা ওজনের হ্যাণ্ড-হেল্ড ক্যামেরা, ক্ষুদ্র আকারের মাইক্রোফোন, সহজে বহনযোগ্য টেপ রেকর্ডার ও অতিরিক্ত আলো ছাড়াও ইনডোর শুটিং করা যায় এমন নেগেটিভ; হুভেল ভাগে তাদের ব্যাপক ব্যবহার ঘটেছিল। হুভেল ভাগে ক্যামেরাম্যানদের, বিশেষত, রাউল কুতার ও জঁরি ডিকে এই দুই চিত্রগ্রাহকের অবদানও যথেষ্ট। যেমন দর্শনের অস্তিত্ববাদ ও সাহিত্যের হুভো রোমঁ দ্বারা এই আন্দোলন কম বেশি প্রভাবিত। গ্রিকিথের পরবর্তী কালে চলচ্চিত্র রীতিতে দুটি ধারা দেখা গেছে; একটি আইজেনস্টাইন চালিত ঋণ খণ্ড উপাদানের মনতাজ সম্মত সংশ্লেষণের রীতি,

অন্তটি স্ট্রাইম অহুপ্রাণিত অথও plan-sequence রীতি। আইজেনস্টাইনের রীতি তথ্যমূলকতা ও কমিটমেন্টের দিকে গেছে, অন্তটি স্ট্রাইম থেকে রেনোয়া থেকে নিও-রিয়ালিজম থেকে হুভেল ভাগ—এই ভাবে ক্রমবিবর্তন পেয়েছে। ফলে হুভেল ভাগকে যে নিও-রিয়ালিজমের পরিশীলিত ফরাসি রূপান্তর বলা হয় তা নেহাত বেঠিক নয়। এবং এর সাফল্য ও গুরুত্বও নিও-রিয়ালিজমের চেয়ে কম নয়। এর অন্ততম শিল্পী রেনের ছবিতে পূর্বোক্ত দুই রীতিকে একত্র করার প্রয়াসও দেখা যায় (ড্র. রেনে)। অন্তান্ত দেশের নতুন রীতির চলচ্চিত্রকেও কখনো কখনো এই নামে অভিহিত করা হয়েছে। ফ্রান্সে নবতরঙ্গ আন্দোলন আজ আর নেই। কিন্তু নবতরঙ্গের টেউ ফরাসি চলচ্চিত্রকে যে প্রাণশক্তি দিয়ে গিয়েছিল তার জের এখনো চলছে।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : পিটার জন গ্রাহাম-এর দি নিউ ওয়েভ : ক্রিটিকাল ল্যাঙমার্কস।

## ॥ নৃতত্ত্ব ও চলচ্চিত্র ॥

আমাদের মনে দৃঢ় এক ধারণা আছে যে ফিল্মের বই এবং চলচ্চিত্র অবশ্যই নৃতত্ত্বের প্রথম শ্রেণীর উৎস। কারণ মানুষের ইতিহাসে মানুষ সম্বন্ধে এত প্রচুর তথ্য ও অভিজ্ঞতা আর কোথায় লিপিবদ্ধ হয়েছে! চলচ্চিত্রকে নৃতত্ত্বের উৎস হিসাবে ভাবতে হলে মনে রাখা দরকার যে, একজন পর্দায় যা দেখে থাকে চলচ্চিত্র তার চেয়ে অনেক বড়ো বিষয়। এককথায় চলচ্চিত্র ব্যক্তির জন্ত এক মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশের সৃষ্টি করে। বর্তমানে চলচ্চিত্র ও মানুষ একে অপরের সাথে এই রকম আভ্যন্তরীণ ও অঙ্গাঙ্গিতাবে যুক্ত। চলচ্চিত্র সহজাত ভাবে নৃতত্ত্ববিষয়ক। চলচ্চিত্র একশো বছর ধরে একটি বিষয় নিয়ে ভেবে এসেছে, মানুষ; মানুষ এবং তার যন্ত্রপাতি, মানুষ এবং তার পারিপার্শ্বিকতা। লক্ষ লক্ষ চলচ্চিত্র-দর্শনার্থী মানুষকেই পর্দায় দেখতে চায়। অতএব এর মধ্যে কোনো বিস্ময় নেই যে নৃতাত্ত্বিকরা চলচ্চিত্রের দিকে ঝুঁকবেন ও চলচ্চিত্রের চিত্রকল্পগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিশ্লেষণ করে দেখবেন। নৃতাত্ত্বিকেরা এর ফলে মানুষ সম্বন্ধে কী জানতে পারেন? একদিকে যে মানুষকে আমরা পর্দায় দেখি, আর একদিকে মানুষ বলতে যে চলচ্চিত্র-দর্শক কিছু সময়ের জন্ত ছবি দেখতে গিয়ে প্রদর্শনীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। যাইহোক একজন নৃতত্ত্ববিদ চলচ্চিত্রে আগ্রহী শুধু তা শিক্ষাগ্রহণের ব্যাপারে যথেষ্ট পছন্দসই বলেই নয়, তিনি দেখতে পান তা অহুসন্ধান ও গবেষণার ক্ষেত্রে

এক সাহায্যকারী উপায়ও বটে। গত কয়েক দশক ধরে দায়িত্বশীল নৃত্ববিদেরা ঠাঁদের পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করার জ্ঞান ও ওই তথ্যের বৃহত্তর বিশ্লেষণের জ্ঞান চলচ্চিত্র মাধ্যমকে ব্যবহার করেছেন, এঁদের মধ্যে Margaret Mead, Gregory Bateson, Jean Rouch প্রমুখ সুপরিচিত। চলচ্চিত্র নির্মাতাদের মধ্যেও অনেকে আছেন যারা পেশায় নৃত্ববিদ না হয়েও মানুষকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পর্যবেক্ষণে ও তার নানা অভিজ্ঞতা ও আচরণের চিত্রণে আগ্রহী। Robert Flaherty হলেন এই ধরনের চিত্র-নির্মাণে পথ-প্রদর্শক। মনুষ্য জীবনের প্রতি এইভাবে আগ্রহী ক্ল্যাফোর্ট ও আরও কেউ কেউ, ঠিক কথা, যতটা শিল্পী ততটা বৈজ্ঞানিক নন, কিন্তু Teilhard de Chardin ও Claude-Levi Strauss কি ঠাঁদের কবিষের জ্ঞানই আবার বিজ্ঞানী হয়ে ওঠেন নি? চলচ্চিত্র নিছক জীবন-পঞ্জী নয়। তা একটা শিল্পভাষা। তাই যে নৃত্ববিদ ফিল্ম মাধ্যম বেছে নেবেন ঠাঁকে পুরোদস্তুর শিল্পী হতে হবে বই কি! শুধু মানুষের চিত্রায়ণই যথেষ্ট নয়। এমন কি একজন নৃত্ববিদ যদি শুধু ব্যক্তি বা বস্তু মধ্যেই সীমিত করতে চান ঠাঁর কাজকে, তাহলেও তাঁর হাতিয়ার ও প্রবণতাই তাঁকে বাধ্য করবে সীমানা চাড়িয়ে যেতে।

ফিল্মের শ্রেণীবিভাজন :

চলচ্চিত্রে আগ্রহী হয়ে, নৃতাত্ত্বিক আবিষ্কার করেন মানুষের এক বর্ণাঢ্য ও সম্পন্ন iconography. প্রযোজিত ফিল্মের সংখ্যা ও ধরন এত বেশি যে চলচ্চিত্র সংক্রান্ত বিষয় ও উপাদানগুলির শ্রেণীবিভাজন অনিবার্য হয়ে পড়ে। আমি বিভাজনের দুটি পদ্ধতির কথা বলব, একটি খুবই যুক্তিসংগত মনে হলেও আমি তা প্রত্যখ্যান করছি এবং দ্বিতীয়টি নমনীয় হলেও, আমি তা গ্রহণ করছি। এই পদ্ধতিতে প্রথম এবং সর্ববৃহৎ শ্রেণীতে সেই সব ফিল্ম থাকবে যা 'বিশুদ্ধ' প্রমোদ চিত্র। এই ফিল্মগুলি সাধারণ ভাবে গল্প বলে মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্য নিয়ে। সামান্য সময়ের জ্ঞান হলেও দর্শক প্রদর্শিত ফিল্মের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠেন, এবং তিনি যা উপভোগ করলেন নৃতাত্ত্বিক তাকে দর্শকের স্বপ্ন হিসেবে গ্রহণ করে উপযুক্ত সতর্কতার সঙ্গে তার মনোবিশ্লেষণ করতে পারেন। তাহলে ফিল্ম ও ফিল্ম-দর্শক দুয়েরই বিশ্লেষণ হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীতে থাকবে যথেষ্ট সংখ্যক সেই ধরনের ঠাঁবি ক্ল্যাফোর্টের ছবির মতো যা মানুষ এবং তার জীবন, আচরণ ও অল্প মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বিষয়ে আরও তথ্য জানতে ও যা জানা গিয়েছে তাকে অল্পদের কাছে প্রকাশিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে নির্মিত। এই শ্রেণীতে আরও এক ধরনের

ছবি পড়বে যে সব ছবির উপস্থিতি বৈজ্ঞানিক মানসিকতা সম্পন্ন সমালোচনা পক্ষে অসম্ভব। মানুস-কেন্দ্রিক ওই পোয়েটিক সিনেমা এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি প্রতি নিবেদিত। এর প্রতিনিবিশ্বাসীয় কয়েকটি উদাহরণ হলো জ' ডিগোয়া 'documented point of view', ক্রিশ মার্কোরের 'impassionate objectivity', রিচার্ড লিককের 'committed objectivity' ইত্যাদি। হাংগেরির চিত্রনির্মাতা Andras Kovacs বলেছেন, 'আমরা যারা প্রত্যক্ষভাবে স্বীকার করি যে আমরা কমিটেড শিল্পী তাদের কাছে কমিটমেন্ট ও অবজেক্টিভিটি কোনো বৈপরীত্য নয়। বরং সমাজতন্ত্রের প্রতি আমাদের বিশ্বাসই আমাদের শিথিয়েছে বাস্তবকে প্রত্যক্ষ, আন্তরিক ও অনুকম্পাহীন ভাবে গ্রহণ করতে।' তৃতীয় শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হবে ethnographic films, ঐ ধরনের ফিল্মের সংখ্যা খুব বেশি নয়, কিন্তু কয়েকটি অসাধারণ তথ্যচিত্র যেমন : Herbert Ponting কৃত ( ১৯১০-১৩ ) Scott's Antarctic Expedition যা প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক অভিযানের বিষয়ে প্রারম্ভিক প্রধান তথ্যচিত্রগুলির অত্যন্ত এবং Grass ( ১৯২৬ ) Merian C. Cooper এবং Ernest B. Shoedsach কৃত ; পারশ্বের বক্তব্যবিদদের ছাগলের জন্তু খাবার অর্থাৎ কচি ঘাস খুঁজতে ছয়মাসের জন্তু দেশান্তরী হওয়ার চিত্র এই শ্রেণীর অন্তর্গত : এই ধরনের বহু ছবির বৈশিষ্ট্যই দ্বিতীয় শ্রেণীতে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। প্রভেদ ও পার্থক্যের পরিমাণ তত বেশি নয়। নৃত্যবিদদের দৃষ্টিভঙ্গিতে তাহলে, চলচ্চিত্র অর্থাৎ কিনা এ পর্যন্ত যত ফিল্ম তৈরি হয়েছে, সেগুলিকে অনান্যসে তিনভাগে ভাগ করা যায় ( ফিল্ম তৈরির উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে ) (ক) প্রমোদভিত্তিক ; পৌরাণিক, জনপ্রিয়, অধিকাংশ চলচ্চিত্র, যা সবসময়ই দর্শকদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও উদ্বেগ-উত্তেজনাকে প্রতিফলিত করে। (খ) কাব্যিক ; কমিটেড, নির্বাচিত, সংখ্যালঘু চলচ্চিত্র যা মানুষের জীবনের বিভিন্ন প্রসঙ্গের অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করে চলে (গ) বিজ্ঞানভিত্তিক ; বাস্তব, টেকনিক্যাল, সংখ্যালঘু চলচ্চিত্র যা নৃত্যবিদদের পর্যবেক্ষণের পরিচয় তুলে ধরে। যখন নাকি কাব্যিক এবং বিজ্ঞানভিত্তিক এই দুই শ্রেণীকে যথেষ্টভাবে পৃথক করা যায় না, যেন তারা একই ধারাবাহিকতার দুই প্রান্ত, স্তরবাং তিন ভাগে ভাগ করার বিষয়টাকে ছোট করে দুই ভাগে ভাগ করে নেওয়া যায় যথা : প্রমোদভিত্তিক ও নৃত্যিক, পরেরটা কাব্যিক হলেও বিজ্ঞানভিত্তিকও বটে। এই বিভাজন আবার মিলিত হয় যে চলচ্চিত্রের উদ্দেশ্য শুধু আনন্দ দেওয়া এবং যে চলচ্চিত্র যেন আরও কিছু হয়ে উঠতে কিংবা করে উঠতে চায় ১৮৯৫

১৯৫৫ প্রচলিত চলচ্চিত্রের এই দুই প্রভাব ও লক্ষ্যের সঙ্গে। জাতিবিজ্ঞানীরা ও ঐতিহাসিকদেরা পুরনো, প্রথাগত, চিত্তবিনোদনকর চলচ্চিত্রের বিপরীতে এক নতুন চলচ্চিত্রের সৃষ্টি করে গেছেন। ১৯৬০ সালে ethnographic ফিল্মের প্রথম আন্তর্জাতিক উৎসবে সমাজবিজ্ঞানী, নৃতাত্ত্বিক এবং চলচ্চিত্র প্রমুখ Edgar Morin, যে সমস্ত ছবি সেখানে দেখানো হলো তাদের ‘Cinema Verite’ বলে বর্ণনা করেছিলেন। যে প্রসঙ্গে আরও ওঠে kino-pravda এবং free cinema, cinema direct, lived cinema, living cinema, candid eye, spontaneous cinema প্রভৃতির কথা। এখন একজন নৃতাত্ত্বিক নৃতত্ত্ববিষয়ক ও চিত্তবিনোদনকারী এই দুই ধরনের ফিল্ম কী ভাবে বিচার করবেন এই প্রশ্ন ওঠে।

প্রমোদমূলক চিত্র :

নৃতাত্ত্বিক Edgar Morin একটি গ্রহণযোগ্য উপায়ের কথা বলেছেন। চলচ্চিত্রকে সামাজিক প্রতীতি হিসেবে নিয়ে তিনি এর একটি বিশেষ দিকের অন্বেষণ করেছেন, তা হলো স্টার সিস্টেম। এ ছাড়াও তিনি আলোচনা করেছেন দর্শকের মনে সিনেমার গতি প্রকৃতি নিয়ে। তাঁর দুখানি বই The Stars এবং The Cinema ( অথবা The Imaginary Man ) এই বিষয়ের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। কানাডার বিশেষজ্ঞ Yves Lever স্ট্রীকচারালিজমের কাছ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে ফ্রেঞ্চ কানাডায় চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপন ও প্রচার পদ্ধতির চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর Cinema et societe quebecoise গ্রন্থে। বিশেষ কিছু ফিল্মকে বিশ্লেষণ করেও নৃতত্ত্ববিদরা অসাধারণ প্রয়োজনীয় কাজ করে থাকেন। স্ট্রীকচারালিজমের পদ্ধতি ও প্রতিস্থানকে বিশেষ বিশেষ চলচ্চিত্রের বিশ্লেষণে প্রয়োগ করে হামেশাই চিন্তাকর্ষক ফল পাওয়া যায়। আমি পেশাদার নৃতত্ত্ববিদ কিংবা সমাজ-বিজ্ঞানী না হয়েও চেষ্টা করেছিলাম Sholay নিয়ে এক ধরনের মনো-বিশ্লেষণ করতে যা আঁগ্রহের।

নৃতাত্ত্বিক চিত্র :

এখানে চিত্রনির্মাতার উদ্দেশ্য হয় সূত্র কোনো স্থানের অপরিচিত লোকজনের জীবনের কথা তুলে ধরা ( যেমন নাহুক অব দি নর্থ ) কিংবা পরিচিত কোনো ব্যক্তি বা ঘটনার বিশেষ কোনো প্রসঙ্গের যতদূর পারা যায় নির্খুঁত রূপায়ণ ( যেমন জন এফ কেনেডির নির্বাচন সম্পর্কে লীককের ছবি প্রাইয়ারি )। জীয়ারসন ও রাইটের মতো প্রারম্ভিক তথ্যচিত্র নির্মাতাদের সময় থেকেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ভিত্তিক চিত্র নির্মাণের প্রবণতা দেখা গেছে, রীতি বা প্রতিস্থানের দিক থেকে এই

সমস্ত ছবির মধ্যে বিভিন্নতা ছিল। কিন্তু উদ্দেশ্য প্রতি ক্ষেত্রেই ছিল অভিন্ন—তা এই যে সেই বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সম্বন্ধে অতীতের আগ্রহ ও প্রীতি জাগ্রত করা। কামু যেটাকে একজন লেখকের সামাজিক দায়িত্ব বলে উল্লেখ করেছিলেন—যাদের হয়ে কেউ বলার নেই সেই নীরব মুক মুখে ভাষা জোগানোর কথা—নব্য রীতিঃ তথ্যচিত্র আজ তাই করে উঠছে। এই ভাবে তাদের কথা ও স্বর ভাষা পেতে তাদের অস্তিত্ব ও আত্মপরিচয় আরো বেশি সনাক্ত হয়ে উঠছে। যে মানুষকে নিয়ে নৃত্বের অধ্যয়ন ও গবেষণা তা এমনি করে সেই মানুষের প্রত্যক্ষ উপকারে আসছে। বিজ্ঞানের বিশেষ কোনো শাখা এর চেয়ে কার্যকারী হতে পারে আর কী ভাবে? অবশ্যই সমস্ত নৃত্বিক চিত্রনির্মাতা হবেন না, চিত্রনির্মাতারাও সকলে নৃত্বের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অধিকারী হবেন তা সম্ভব নয়! ফলে নৃত্ববিদ ও চিত্রনির্মাতার মধ্যে আরো বেশি পারস্পরিক সহযোগিতা ও বিষয়গত পরিপূরকতা বাঞ্ছনীয়। নিঃসন্দেহে এই শ্রেণীবিভাজনের ভালো দিক আছে, কিন্তু এর সীমাবদ্ধতাও লক্ষণীয়। ফিল্ম সমালোচনার সনাতন আদর্শে ফিল্ম রচয়িতা ও তাঁর উদ্দেশ্য বা দৃষ্টিভঙ্গির ওপর জোর পড়ে। কিন্তু আলোচনার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত রচিত ফিল্মটিই। কেননা একটা ফিল্ম যাই হোক না কেন দর্শক তা অনুভব ও উপলব্ধি করবেন তাঁর পূর্ব-উপলব্ধ উপলব্ধি বা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, এর পরিচালক কী উপলব্ধি করিতে চেয়েছেন তার ভিত্তিতে নয়। যারা ফিল্মের মাধ্যমে সংগ্রাম করতে চান তাঁরা এই বিবাস্তির শিকার হয়ে পড়েন। এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো ব্যাটলশিপ পটেমকিন যা নাকি প্রগতিশীল বিপ্লবী ও বুর্জোয়া রসগ্রাহী উভয়ের দ্বারাই প্রশংসিত। যে সমস্ত দেশে মাস মিডিয়ায় চূড়ান্ত প্রসার ঘটেছে সেখানে অতি আধুনিক চিত্র-মানুষের কল্পনা আজ মিশে গিয়েছে ব্যক্তি কল্পনার কাল্পনিক জগতের সঙ্গে : ইতিহাস ( যেন অতীতের কল্পনা ), মিথ ( যেন বর্তমানের কল্পনা ), ফিউচারোলজি ( যেন ভবিষ্যতের কল্পনা )।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : রবার্ট এডমন্ডের অ্যান্থ্রপোলজি অন্ ফিল্ম, K. G. Heider-  
এর Ethnographic Film ।

গান্ধী রোবের্জ

॥ নো-নাট্য ॥

পাঁচশতাধিক বৎসরের সুপ্রাচীন জাপানি গীতিনাট্য। বৌদ্ধধর্মীয় বিভিন্ন অনুশাস্তিই নো-নাট্যের আত্মা। বৌদ্ধধর্মের মতো এ-নাট্যের বিষয়বস্তুও হিংসা ও রক্তক্ষরণের

পরিবর্তে মানুষের জীবনে শায়পরায়ণতার বোধকে স্ফূট করে। জাপানি ভাষায় নো-র আক্ষরিক অর্থ নৈপুণ্য, তা আত্মিক ও শারীরিক যৌথ ভাবে। নো-নাট্য বৃত্ত্য মাইম অভিনয় সাহিত্য ও সংগীতের মিশ্র রূপ। নাটকের জন্তু নক্ষ তৈরি হয় খুব নিরাভরণভাবে। অভিনেতা অভিনেত্রীর অভিনয়-মঞ্চে প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্তু কোনো পথ রাখা হয় না। সব চরিত্রে পুরুষরাই অভিনয় করেন অবিকৃত কণ্ঠস্বরে। পুরুষের স্ত্রী ভূমিকার অভিনয়ে বেশ বিস্তার বাদে বাচনভঙ্গি পুরুষের মতো। হ্যাণ্ড টেবল, হ্যাণ্ড ড্রাম ও উচ্চনাদের বাঁশি মুখ্যতঃ এই তিন ধরনের বাজ্য বাজানো হয় নো-নাট্যে। রীতিকরণের দিকে নো-নাট্যের ঝোঁক থাকে। কিন্তু মাত্রা ছাড়ানোর প্রশয় নেই বলে, কোনোখানে অতিরঞ্জন হয়েছে বলে মনে হয় না।

ধীরেশ ঘোষ

॥ পথের পাঁচালী ॥

(ড. অপু-ত্রয়ী)

॥ জি(গি)ল্লো পল্টিকর্ভো ॥

(জন্ম ১৯১৯, ইতালি)। তাঁর দাদা হলেন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ক্রনো পল্টিকর্ভো। তিনি নিজেও প্রথমে বিজ্ঞান বিবয়ে স্নাতক হন ও পরে সাংবাদিক রূপে কাজ করেন। সহকারী পরিচালক হিসেবে তাঁর চিত্রজীবন শুরু হয়, পরে কিছুদিন তথ্যচিত্র নির্মাণ করে তিনি কাহিনীচিত্র পরিচালনা শুরু করেন। তাঁর প্রধান খ্যাতি দি ব্যাটল অব আলজিয়ার্স (৬৫) ছবির জন্তু (ড.)। রাজনৈতিক পটভূমিতে রাজনৈতিক চেতনার এই ছবি একই সঙ্গে ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক। কাপো, দি ওয়াইড ব্লু রোড, বার্ন/কুইনাদা, অপারেশন ওগ্রো প্রভৃতি তাঁর অগ্ণা ছবি। ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম তাঁর ছবিতে সহানুভূতি ও সমর্থন পেয়েছে। তিনি চলচ্চিত্রের অগ্ণতম শ্রেষ্ঠ সেট ডিজাইনিং নির্দেশক। শুধু মতাদর্শের দিক দিয়ে নয়, শৈলীর দিক দিয়েও তাঁকে বলা হয়েছে প্রগতিশীল। তিনি তথ্যচিত্রশৈলীর, বিশেষত সিনেমা ভেরিভের সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন কাহিনীচিত্রে।

॥ পরিচয় লিপি ॥

সাধারণত ছবির সূচনায় বা সমাপ্তিতে ছবির নাম ছাড়াও, প্রযোজক, অভিনেতা-অভিনেত্রী, পরিচালক ও অগ্ণা কলাকুশলীর নাম ও পরিচয়ের যে তালিকা

পর্দায় দেওয়া হয় তাকে পরিচয়লিপি বলে। চলচ্চিত্রের প্রারম্ভিক পর্বে কণা কুশলীদের পরিচয় ভেতন দেওয়া হতো না, তা দেওয়া শুরু হয় অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে। বর্তমানে একটি ছোট দৃশ্যকল্প দিয়ে ছবি শুরু হওয়ার পর পরিচয়লিপি দেখানোর প্রবণতা এসেছে। পরিচয়লিপির মধ্যে শটের ইনসার্ট বা দৃশ্যের অংশ বিশেষ অন্তর্ভুক্ত করার প্রবণতাও দেখা যাচ্ছে। অনেক সময় শট বা দৃশ্যাংশের ওপর পরিচয়লিপি স্থাপন-ইম্পোজ করা হচ্ছে। মূল পরিচয়লিপিগুলি ছবি শুরুতে দেখিয়ে বাকি পরিচয়লিপিগুলি ছবির শেষে দেখানোর রীতিও প্রচলিত। পরিচয়লিপির সঙ্গে প্রায় সব সময়েই থাকে এফেক্ট সাউন্ড, আবহ সংগীত বা ধারাভাষ্য। ছবির মেজাজ ও বক্তব্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে এখন পরিচয়লিপি ক্রমেই স্টাইলাইজড, দক্ষ ও শিল্পগুণমণ্ডিত রচনা হয়ে উঠছে, বস্তুত তা এখন কমানিউয়াল আর্টের অন্তর্গত। এই প্রসঙ্গে সল বাসের ও ডিক উইলিয়ামসের (অ্যানিমেশনের মাধ্যমে পরিচয়লিপি) নাম উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি পরিচয়লিপি কমানিউয়াল আর্ট থেকে কম্পিউটার গ্রাফিক্সের অন্তর্গত হয়ে পড়ছে। ফারেনহাইট ৪৫১ ছবিতে পরিচয়লিপির বদলে ছিল পরিচয়ভাষ্য।

## ॥ পরিচালক ॥

ছবির বিষয় ও আঙ্গিক, কলাকৌশলের দিক ও স্বজনশীলতা, বক্তব্য ও মতাদর্শ— সব কিছুর জন্মই দায়ী পরিচালক। তিনি ছবির বিভিন্ন শাখা ও বিষয়ের সাথে জড়িত ব্যক্তির কে কীরকম কাজ করছে শুধু তাই দেখবেন না, তাঁর অভিনেতা ও অভিনেত্রী এবং টেকনিক্যাল সহকর্মীদের দিয়ে সর্বোত্তম কাজ করিয়ে নেবেন ও প্রাপ্ত স্বযোগ সুবিধার শ্রেষ্ঠ সদ্যবহার করবেন। ছবির প্রতিটি পর্দায়ে পরিচালকের নির্দিষ্ট ভূমিকা ও দায়িত্ব থাকবে। গ্যুটিং-পূর্ব পর্যায় প্রযোজক-পরিচালক-লেখক/সেট ডিজাইনারের। গ্যুটিং পর্যায় ক্যামেরাম্যান-পরিচালক-অভিনেতাদের। গ্যুটিং-উত্তর পর্যায় সম্পাদক-পরিচালক-সংগীতনির্দেশকের। এমনকি ছবি মুক্তি পাবার আগে তার প্রচারেও পরিচালক অনেক সময় পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

একটা সময় ছিল যখন পরিচালক ছিলেন ছবির সঙ্গে জড়িত আর দশজনের একজন। অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রথম জন নন। স্টার অভিনেতা বা অভিনেত্রীর ভূমিকা ও মর্যাদা ছিল তখন তাঁর চেয়ে বেশি। সেই সময়ে নিজস্ব প্রতিভায় যে সমস্ত পরিচালক ছবিতে অবিসম্বাদিত প্রভাব ফেলেছিলেন তাঁরা হলেন গ্রিফিথ, চ্যাপলিন, ফোর্ড, হিচকক। ধারা প্রভাব ফেলতে গিয়ে চলচ্চিত্রের ব্যবসায়িক পদ্ধতির শিকার

হয়েছিলেন তাঁরা হলেন স্ট্রাইম ও ওয়েলস। ক্রমে পরিচালকদের কাজে বিশিষ্ট সৃজনশীলতা ও ব্যক্তিগত শৈলীর প্রমাণ পাওয়া যেতে লাগল। যে প্রসঙ্গে আইজেন-স্টাইনের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। দর্শকদের ফিল্ম দেখে আগের তুলনায় বুদ্ধি পাওয়ায় ও চলচ্চিত্র গুরুত্বের সঙ্গে অনুশীলনযোগ্য এক শিল্পমাধ্যমের প্রতিষ্ঠা পাওয়ায় পরিচালকদের শুধু যে মানবুদ্ধি হলো তাই নয়, কোন্ পরিচালকের ছবি তাও ছবির সাফল্যের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক ও জরুরি হয়ে উঠল। রেনোয়া বুনুয়েল বার্গম্যান ফেলিনি আন্তনিওনি সত্যজিৎ কুরোশাওয়া তারকোভ্‌স্কি স্পীলবার্গদের মাধ্যমে পরিচালকের গুরুত্ব ও প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর হলো। তবুও আজ প্রযোজকের স্বাধীনতার পাশে একজন সাধারণ আমেরিকান পরিচালকের ক্ষমতা ইউরোপের জনৈক স্বয়ংশাসিত পরিচালকের তুলনায় নিশ্চয়ই সীমিত। লাতিন আমেরিকার পরিচালকরা আবার নিজেদের শৈল্পিক ও রাডনৈতিক স্বাধীনতার জ্ঞান প্রায়ই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংগ্রামরত।

যদিও চিত্রনির্মাণের প্রতিটি পর্যায়ে কিছু কিছু পরিবর্তন অবশ্যস্তাবী তবু বিভিন্ন পর্যায়ের বিস্তারিত ও সানুগুঞ্জ পরিকল্পনা পরিচালককে আগেই করে রাখতে হয়। পরে বাধ্যতামূলক পরিবর্তনের সময়ে যে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে হয় তাতেই পরিচালকের ক্ষমতা ও কৃতিত্বের পরিমাপ। শিল্পসম্মত ছবি ও পার্গোনাল ফিল্মের ক্ষেত্রে পরিচালক সৃষ্টির শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সৃজনশীল উত্তেজনার মধ্য থাকেন। যাদের নিয়ে পরিচালক কাজ করেন তাদের সঙ্গে তাঁর নিখুঁত সমঝোতা থাকা দরকার, তাদের মধ্যে টেকনিক্যাল সহকর্মীরা যত সহজে তাঁর আধিপত্য মেনে নেন, বিশেষত স্টার অভিনেতারা তত তাড়াতাড়ি তাঁর প্রভাব মেনে নিতে চান না, ব্যক্তিত্বের এই সংঘাতটা আগ্রহকর। একজন পরিচালক, আমার ধারণা, কাজ করেন কাহিনী ও আঙ্গিক নিয়ে নয়, বরং শিল্প ও বিজ্ঞান নিয়ে ( ড্র. আন্তনিওনি ), এবং ছবির পক্ষে প্রয়োজনীয় সেল উঠে আসে শিল্প ও বিজ্ঞান-এর সঙ্গে তৃতীয় এক সত্তা থেকে, যেমন আইজেনস্টাইনের ক্ষেত্রে তা নান্দনিকতা, বার্গম্যানের ক্ষেত্রে তা দর্শন, গদারের ক্ষেত্রে রাজনীতি, আন্তনিওনির ক্ষেত্রে মনস্তত্ত্ব। পরিচালনার বিভিন্ন রীতি, পরিচালকের বিবিধ দৃষ্টিভঙ্গি ও নিজস্ব জগতের জ্ঞান দ্রষ্টব্য বিভিন্ন পরিচালক বিষয়ক রচনা।

॥ গেয়র্গ হিল্‌হেল্ম্‌ পাব্‌স্ট ॥

( ১৮৮৭-১৯৬৭ ), অস্ট্রিয়ান-জর্মন চলচ্চিত্রকার। জীবন শুরু করেছিলেন নাট্য-অভিনেতা ও নাট্যপরিচালক রূপে। থিয়েটারের থেকে ফিল্মকে শক্তিশালী মাধ্যম

মনে হওয়াতে ফিল্মের জগতে আসেন। প্রথম ছবি 'ডেয়ার শাট্‌স' (১৯২৩/২৪), দ্বিতীয় ছবি 'থ্রেফিন ডোনেলী' (১৯২৪)। তৃতীয় ছবি 'ডী ফ্রয়েডলোজে গাস্‌সে' (১৯২৫) তাঁকে বিশ্বচলচ্চিত্রের দরবারে প্রতিষ্ঠা এনে দিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই ছবিতেই পরবর্তীকালের বিশ্ববিখ্যাত অভিনেত্রী গ্রেটা গার্বো নায়িকার ভূমিকায় প্রথম অভিনয় করেন। বিশেষ দশকের ভিয়েনা শহরের মুদ্রাস্ফীতি ও সামাজিক নৈরাজ্য কবলিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আত্মিক ও আর্থনৈতিক ক্রমিক অবক্ষয়ের দর্শন এই ছবিটি। ইংল্যান্ডে ছবিটির প্রদর্শন নিষিদ্ধ হয়েছিল। ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া এবং ইতালিতে এই ছবিটি প্রদর্শিত হয় খুব বেশিরকমভাবে সেন্সর করার পর।

এক্সপ্ৰেশনিজম্ ও কান্দারস্পীল ফিল্ম-এর ধারার পর এই ছবিটি জর্মন চলচ্চিত্রের ইতিহাসে পালাবদলের সূচনা করল। এই ছবিতে পাব্‌স্ট যে ধারার প্রবর্তন করলেন সেই ধারা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে নয়া বাস্তবতা নামে পরিচিত। এক্সপ্ৰেশনিজম্ প্রভাবিত কল্পিত অতিপ্রাকৃত এবং অলৌকিকতার জগতের এবং কান্দারস্পীল ফিল্মের কয়েকটি চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের জটিলতা ও বিশ্লেষণ-এর গভীকে দূরে সরিয়ে রেখে এই ধারা জর্মন চলচ্চিত্রে নিয়ে এলো বাস্তবকে, এমনকি নগ্ন, কুৎসিত ও নির্মম বাস্তবকেও। এই ধারার চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে পথিকৃৎ হিসেবে স্বীকৃতি পাবেন পাব্‌স্ট। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে, যে গুস্তাফ হার্টলাউফ, ফ্রিংস্‌ স্যালেনবাখ্‌ এবং জিগ্‌ফ্রীড ক্রাকাউয়ার-এর মতে পাব্‌স্ট প্রবর্তিত 'নয়া বাস্তবতাবাদ' মূলত মানসিক অসাড়ত্ব, চরম হতাশা ও নৈরাজ্যবোধ এবং জীবনবিমুখতার দর্শন মাত্র। ক্রাকাউয়ার উল্লেখ করেছেন, বাস্তবতার চিত্রণ করতে গিয়েও পাব্‌স্ট অতিনাটকীয়তা এনেছেন এই ছবিতে।

'ডী ফ্রয়েডলোজে গাস্‌সে'-র পর পাব্‌স্ট 'মান্‌ স্পীলট্‌ নিখট্‌ ডেয়ার লীবে' ছবিটি করেন ১৯২৬ সনে। চলচ্চিত্র সমালোচকদের মতে উল্লেখযোগ্য ছবি নয়। তাঁর এর পরের ছবি, ঐ বছরেই তোলা 'গেহাইম্‌নিসসে আইচ্চার জেলে'— ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে তোলা। ফ্রয়েডের দুজন সহযোগী ডাঃ হান্স জাখ্‌স্‌ এবং ড. কার্ল আত্রাহাম এই ছবিতে পাব্‌স্টের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছিলেন, যদিও ফ্রয়েড নিজে ছবিটি দেখার পর বিরক্ত হয়েছিলেন। তাঁর পরবর্তী ছবি 'ডী-লীবে ডেয়ার য়েনী নে' (১৯২৭) সোভিয়েত ঔপন্যাসিক ইলিয়া এহরেণবুর্গের একটি উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনে। বিশেষ দশকের প্যারিস শহরে ফরাসি বুর্জোয়া সমাজের মেয়ে য়েনী আর সোভিয়েত কমুনিষ্ট পার্টি সদস্য আন্দ্রেয়ান-এর প্রেম এই ছবির উপজীব্য বিষয়, যদিও এই কাহিনীর চিত্ররূপ দিতে

গিয়ে পাব্‌স্ট প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ইয়োরোপ-এর ইতিহাসের প্রায় সম্পূর্ণ পট-  
 ভূমিকেই এনেছেন চলচ্চিত্রে। এর পরবর্তী তিনটি ছবির—‘আব্‌স্‌হেগে’ (১৯২৮)  
 এবং ‘ডী ব্যুক্‌সে ডেয়ার পাণ্ডারা’ (১৯২৮/২৯) এবং ‘টাগেবুখ্‌ আইন্টার  
 ফোয়ারলোরেনেন্’ (১৯২৯)—মূল উপজীব্য সামাজিক অবক্ষয় ও আঙ্গিক  
 রিক্ততা। তিনটি ছবিতেই পাব্‌স্ট ব্যবহার করেছেন যৌনতাকে, ইতিবাচক অর্থে  
 নয়, নেতিবাচক অর্থে। তিরিশের দশকে পৌঁছে পাব্‌স্ট প্রথম ছবি করলেন  
 ‘স্‌স্ট্‌ফ্রন্ট ১৯১৮’ (১৯৩০)। জার্মানির রাজনৈতিক জগতে তখন নাৎসিদল ও  
 হিটলারের অভ্যুত্থান ঘটছে। পাব্‌স্টের মানসিকতাও মোড় নিয়েছে অশুভ দিকে।  
 সচেতনভাবে তিনি যুদ্ধবিরোধী ও নাৎসিবাদ বিরোধী বামপন্থী গণতান্ত্রিক  
 শিবিরে যোগ দিলেন। বামপন্থী নাট্যকার এরহিন্‌ পিস্কাটোর, প্রগতিশীল  
 ঔপন্যাসিক হাইনরিখ্‌ মান, আলোকচিত্রশিল্পী কার্ল্‌ ফ্রয়েড, বেলা বালাজ এবং  
 আরো অনেকের সাথে ইতোমধ্যে গড়ে তুলেছেন চলচ্চিত্রকর্মীদের গণতান্ত্রিক  
 সংস্থা। প্রচণ্ড আক্রমণ এলো নাৎসিদের কাছ থেকে, কারণ—‘স্‌স্ট্‌ফ্রন্ট ১৯১৮’  
 ছবির আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির সপক্ষে বক্তব্য ও যুদ্ধবাজদের বিদ্ধারবাণী নাৎসিদের  
 ক্ষিপ্ত, উন্মত্ত করে তুলেছিল! পাব্‌স্ট-এর পরবর্তী দুটি উল্লেখযোগ্য ছবি বের্টোল্ট্‌  
 ব্রেখ্ট-এর কাহিনী অবলম্বনে তোলা ‘ডী ড্রাইগ্রোশেনওপ্যার’ এবং ‘কামেরাদ্-  
 শাফট্’। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য প্রথম ছবিতে স্মর সংযোজনার দায়িত্বে ছিলেন কুর্ট  
 স্‌হাইল। ইতোমধ্যে জার্মান চলচ্চিত্রে শব্দের ব্যবহার শুরু হয়েছে। পাব্‌স্ট  
 ‘স্‌স্ট্‌ফ্রন্ট ১৯১৮’ ছবি থেকেই শুরু করেছেন এই নূতন সম্ভাবনাময় মাধ্যমকে  
 ব্যবহার করতে। ‘স্‌স্ট্‌ফ্রন্ট ১৯১৮’ এবং ‘কামেরাদ্‌শাফট্’ দুটি ছবিতেই ফরাসি  
 এবং জার্মান-ভাষা সংলাপে ব্যবহার করেছেন পাব্‌স্ট স্বাভাবিক বাস্তবতাকে  
 রূপায়িত করতে, যা থেকে মনে হয় শব্দ যে চলচ্চিত্রের ভাষা ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে  
 একটি নূতন মাত্রা সংযোজন করেছে এই বৈপ্লবিক তাৎপর্যকে সচেতনভাবে গ্রহণ  
 করেই তিনি চলচ্চিত্রে শব্দের ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন। পাব্‌স্ট-এর পর  
 বেশ কিছু ছবি করেছেন, যার মধ্যে ফ্রান্সে তোলা ‘ডন কিথোতে’ (১৯৩৪) এবং  
 হলিউডে তোলা ‘এ মডার্ণ হিরো’ (১৯৩৯)-র নাম করা যেতে পারে। কিন্তু  
 পাব্‌স্ট যেন তাঁর ক্ষমতা ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলার  
 সময় তিনি নাৎসি অধিকৃত অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনার উপকণ্ঠে বাস করেছেন  
 এবং এই সময় তিনটি ছবি করেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পাব্‌স্টের প্রথম ছবি ‘ডেয়ার প্রোৎজেস্’ (১৯৪৮)

শ্রেষ্ঠ পরিচালনার জন্তু ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হয়েছিল। এই ছবিতে পাব্‌স্ট দিক্কার দিয়েছেন নাৎসি আমলের অমানবিক ইচ্ছাদী বিরোধিতাকে। ১৯৫৫ সনে পাব্‌স্ট হিটলার-এর জীবনের শেষ অঙ্কের ঘটনা নিয়ে 'ডেয়ার লেংঙ্টে আষ্ট্' ছবিটি করেন।

বিখ্যাত চলচ্চিত্র ঐতিহাসিক ও সমালোচক লটে আইজনার পাব্‌স্টকে স্ববিরোধিতায় আক্রান্ত বলেছেন। তাঁর কোনো কোনো ছবি, যথা 'ডী ড্রাই-গ্রোশেনুওপ্যার' বা 'ডী ব্লুক্‌সে ডেয়ার পাগোরা' দেখে মনে হয় চলচ্চিত্রকার হিসেবে তিনি অসাধারণ, আবার তাঁর অল্প কিছু ছবি আমাদের সম্পূর্ণ নিরাশ করে। বস্তুতঃ জর্মন চলচ্চিত্রের দুটি বা তিনটি প্রধান ধাঁচ যথা তথ্যচিত্রের ভঙ্গিতে বাস্তবকে চিত্রায়িত করা, অতিনাটকীয়তার উপর জোর দেওয়া এবং অবচেতন ও নিজ্জান মনের সংঘাতকে তুলে ধরা—এই প্রত্যেকটি ধাঁচই পাব্‌স্টের ছবিতে পরিলক্ষিত হয়। সব কিছুর পরও বলতে হবে পাব্‌স্টকে বাদ দিয়ে জর্মন চলচ্চিত্র তথা বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়। কোনো কোনো সমালোচকের মতে সাম্প্রতিক জর্মন চলচ্চিত্রেও পাব্‌স্টের প্রভাব ক্রিয়াশীল। এঁদের মতে সত্তর দশকের জর্মন চলচ্চিত্রকার রাইনার ফাসবিগারও পাব্‌স্ট প্রবর্তিত 'নয়া বাস্তবতা'-র ধারা অনুসারী।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : B. Amengual-এর G. W. Pabst ॥

রুগজিৎ রায়

॥ পারসোনা ॥

১৯৬৬, সুইডেন। দুই বা ততোধিক ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের যে দ্বন্দ্বধরু ও দ্বন্দ্ববিধুর রূপায়ণ বার্গম্যানের প্রিয় বিষয় পারসোনা-র তা এক অসাধারণ, অমোঘ ও অভিঘাতী রূপ পেয়েছে। জন্মিকা অভিনেত্রী ও রোগিনী ( হয়ত রোগটাও তাঁর অভিনয় ) এবং তাঁর গুঞ্ঝাকারী নার্স, এই দুই ব্যক্তির সম্পর্কের পারস্পরিক নির্ভরতা, গভীর অন্তরঙ্গতা ও সাময়িক কিন্তু অপরিহার্য বিদেহ ছবিতে শুধু মনস্তাত্ত্বিক নয়, ফিজিক্যাল রূপ পেয়েছে। অভিনেতাদের সঙ্গে বার্গম্যানের চমৎকার ব্যক্তিগত সমঝোতায় প্রধান দুই অভিনেত্রীর অভিনয়ে এসেছে অনবচ সংবেদনশীলতা। অভিনেত্রীর স্বামীর সঙ্গে নার্সের সাক্ষাৎ ও আলিঙ্গনের দৃশ্যটি থেকে মূল দুই চরিত্রে সত্তার যে ধীর ও ধারাবাহিক বিনিময় ঘটতে থাকে তা একই সঙ্গে বিষন্ন, তুন্দর ও হিম-উষ্ণ। এই ছবি সম্পর্কে বলা হয়েছে, ছবিটি

দেখলে আত্মা পরিশুদ্ধ হয় ও বার্গম্যানের নিজেদের মতে, এটা এমন একটা ছবি যা এর অষ্টকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। কমিউনিকেশনের সমস্যা ও প্রয়োজন পারসোনার কীম যা অটাম সোনাটায় আরো পরিবর্তিত হয়েছে। এই ছবির আঙ্গিক ঠিক বর্ণনাত্মক নয়, বরং কনসেপচুয়াল।

অভিনয়ে লিত উলম্যান ( রোগিনী ), বিবি অ্যাণ্ডারসন ( নার্স ); চিত্রনাট্য বার্গম্যান, চিত্রগ্রহণ নিকভিষ্ট, সম্পাদনা U. Ryghe ।

॥ পিয়ের পাওলো পাসোলিনি ॥

( ১৯২২-১৯৭৫, ইতালি )। পাসোলিনির বাবা ছিলেন প্রাচীন অভিজাত বংশের সন্তান, মা এসেছিলেন কৃষক পরিবার থেকে, সব মিলিয়ে তাঁদের বলা হত পেতি-বুর্জোয়া। পাসোলিনি বাবার সামরিক বৃত্তি ও ফ্যাসিবাদের প্রতি অহুরাগকে ঘৃণা করতেন, বদলির চাকরিতে বাবার সঙ্গে তাকেও ঘুরে বেড়াতে হত এ শহর থেকে ও শহর, স্থিতি ও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হত মাঝে মাঝে মামাদের গ্রামে এসে, গ্রামের কৃষকদের সঙ্গে। এই যোগাযোগ তাকে মার্ক্সীয় বিশ্বাসের দিকে ঠেলে দিতে থাকে। বোলোগ্‌না বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সময়ে তিনি সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে প্রবেশ করলেন। তিনটি কবিতার বই প্রকাশিত হতে তিনি রাজধানী রোমে চলে এলেন, দিনগুলো ছিল প্রথর দারিদ্রের, তাঁকে বাস করতে হত ছেনাল বেস্টা চোর দালাল অধ্যুষিত গরীব অঞ্চলে। তাঁর ফাসিস্ত ও বুর্জোয়াদের প্রতি ঘৃণা আর মধ্যবিস্তার হিপোক্রিসি সম্বন্ধে বিদ্রোহ জোরালো হলো। ক্রমে ঔপন্যাসিক ও চিত্রনাট্যকার হিসেবে তিনি কাজ করার সুযোগ পেলেন, ১৯৫৪-র পর থেকে ফেলিনি, রসি প্রমুখের জ্ঞান চিত্রনাট্য লিখতে লিখতে বুঝলেন পুরোপুরি স্বাধীনভাবে কাজ করতে হলে তাঁকেও চিত্রপরিচালক হতে হবে। কবি দার্শনিক প্রাবন্ধিক ঔপন্যাসিক নাট্যকার চিত্রনাট্যকার পাসোলিনি ( প্রকাশিত গ্রন্থ : ২৬ ) একদিন চিত্রপরিচালক হিসেবেও সফল হলেন।

প্রথম দিককার ছবি Accattone ( ৬১ ), Mamma Roma ( ৬২ ) নিচু-তলার মানুষদের নিয়ে, চোর বেস্টা, তাদের সমস্যা ও পদাঙ্কলন, প্রেম জীবিকা ও অস্বাভাবিক যুক্তি নিয়ে। তুলনায় একের তেতর চার Rogopag-য়ে তাঁর অংশটি, La Ricotta ( ৬২ ) প্রত্যয় ও চিত্রভাষা উভয় দিক থেকেই আগের ছবি দুটির চেয়ে অনেকটা অগ্রগতি। এর নায়ক এক অনাহারক্রিষ্ট ফিল্ম এক্সট্রা, বিষয় অনাহার, বঞ্চনা, বেস্টাবৃত্তি ও উচ্চ মহলের অনৈতিকতা। শাদা কালো ছবির

মধ্যে কোথাও কোথাও রঙের ইনসারশন দিয়ে, মাঝে মাঝে স্তম্ভীক আঘাৎ, দর্শককে বিম্বৃত করে, প্রায়ই কাঁঝালো মন্তব্য ও সমালোচনায় গল্পকে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত করে তুলতে পেরে পাসোলিনি ছবিটিকে বিভিন্ন শৈলীর সফল মিশ্রণ করে তুলেছেন। তাঁর ৬৪-র ছবি গদপেল অ্যাকরজি টু দেণ্ট ম্যাথু ধর্মীয় বিষয় নিয়ে তোলা অন্যতম শক্তিশালী চিত্র। মাক্সবাদের প্রতি বিশ্বাস ও খ্রীষ্টীয় সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ, তাঁর এই ছবি দিকের মধ্যে কোনো স্ববিরোধিতা আছে কিনা এ ছবি ঐতিহাসিক পটভূমিতে ও যীশুখ্রীষ্টকে মূল চরিত্র করে তার বিশ্লেষণ। অনেকের মতে দ্বন্দ্বিক বিশ্লেষণ, যীশুকে এখানে অনেক অলংকরণ ও অতিরঞ্জন থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। নূতন অভিনেতাদের ব্যবহার করে, বিরল ল্যাণ্ডস্কেপ-সমূহকে অসাধারণ ভাবে কাজে লাগিয়ে, ফলপ্রদ ক্লোজ আপ ও চমৎকার ট্যাবলো দৃশ্য—একটার পর আরেকটাকে সাজিয়ে তিনি সরল ও ধ্রুপদী চিত্রটি সম্পূর্ণ করেন। দেশে বিদেশে ছবিটা অসংখ্য পুরস্কার পায়, পাসোলিনি, সজ্জা-নির্দেশক Donato, ও চিত্রগ্রাহক Colli পান তার অনেকগুলো। পরের ছবি বিগ বার্ডস্ অ্যাঁও লিটল বার্ডস্ বাবা ছেলে ও একটা বাকপটু কাককে নিয়ে আধুনিক ফেবল যার সাফল্য সম্পর্কে সমালোচকরা দ্বিমত। সমালোচকরা দ্বিমত তাঁর অপেরা ফিল্ম Medca নিয়েও। এরপর অয়দিপাউস রেক্স (৬৭) (ড্র.)। গদপেলের মতো এখানেও প্রাগৈতিহাসিক পটভূমি, বিগ বার্ডসের মতো অতীত ও বর্তমান দুয়ের উপস্থাপনা, বিচিত্র রঙিন আলোকচিত্রে সমৃদ্ধ এ ছবি পারনোনাল ফিল্ম বলে অভিহিত। নিজের উপল্লাস অবলম্বনে থিয়োরেম ভিন্নধর্মী চিত্র, এক ধনী বুর্জোয়া পরিবারকে নিয়ে, যে বাড়ির প্রতিটি অধিবাসী এমনকি নিজের আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের প্রতিও কমিটেড নয়। এক আগন্তুক এসে তাদের প্রত্যেকের আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে দিতে সমগ্র পরিবারটি কীভাবে ভেঙে বিনষ্ট হয়ে গেল এ ছবি তারই স্বন্দর মর্মান্তিক রহস্যময় রূপায়ণ।

তাঁর ছবি ইতিমধ্যে ধীরে ধীরে morose হয়ে উঠছে, কমিক অলুপন নেই, খুব বেশি হলে আছে র্যাক হিউমার, স্বন্দর ও আতঙ্ক সহাবস্থান করছে, কিন্তু গঠনগত ভাবে ছবি হয়েছে আরও শক্তিশালী। অতীত ও বর্তমানের একত্র উপস্থাপনা ও প্রতিতুলনা Il Porcile (৬৯)-য়ে অনবদ্য রূপ পেয়েছে। তিন্ত এই চিত্ররূপের বর্তমান যুগের কাহিনীতে গদার ও বেঞ্জোচ্চিয়োর ছাপ আছে। এই সময় নাগাদ তাঁর বয়সী চিত্রপরিচালকদের মধ্যে তাঁকেই সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য বলে মনে করা হচ্ছে। এরপর এল অবনতি, শুধু মানে বা উৎকর্ষে নয়,

চিত্রেও। বোকাচ্চিয়ো, চসার, অ্যারাবিয়ান নাইট, ডি সাদের কাহিনী নিয়ে যে ছবিগুলো এবার তিনি তুললেন তাতে নগ্নতা বীভৎসতা হিংস্রতা যৌনবিকৃতি পাশবিকতার চূড়ান্ত প্রাচুর্য। পাসোলিনির এই পর্যায়কে হজম করতে ও বুঝে উঠতে গেলে অসাধারণ সহশক্তি দরকার। সমালোচকরা কে কী বলেন তা আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করার। আমার নিজের কাছে ৬৯ পর্যন্ত তাঁর শিল্পসৃষ্টিই যথেষ্ট মনে হয়। যার প্রভাব নতুন পরিচালকদের ওপর অনেকদিন ধরে থাকবে। কেননা অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তিতে ও অদ্ভুত জটিলতায় তাঁর ছবির প্রতিদ্বন্দ্বী আর কে? ১৯৭৫-এর ১ বা ২ নভেম্বর এক রহস্যজনক পরিস্থিতিতে তিনি নিহত হন।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : ও স্ট্যাক সম্পাদিত পাসোলিনি অন পাসোলিনি ॥

ল্যাংডন ডিউই

॥ পিয়েরো লো ফু ॥

১৯৬৫, ফ্রান্স। ছবির নায়ক ফার্দিনান্দ তার শিশু সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত মারিয়েন নামে যে কিশোরীকে তার ক্ল্যাটে আনে ছবিতে অল্পক্ষণ পরে তারই সঙ্গে তাকে নিজের জীবন ছেড়ে পালাতে দেখা যায়। ক্রমে মারিয়েনের অতীত (বর্তমান?), তার ও ফার্দিনান্দের পল ভার্জিনির আদলে প্রকৃতির সঙ্গে ও মধ্যে নিভৃত জীবনযাপন, তার বিশ্বাসভঙ্গ ও আরেক ব্যক্তির সঙ্গে পলায়ন, পশ্চাদ্ধাবন করে ফার্দিনান্দের তাদেরকে হত্যা ও নিজের আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে গদার মানবিক অস্তিত্বের নিরাপত্তাহীনতা এবং বিশ্বাস ও প্রেমের ব্যর্থতায় মানুষের চিরন্তন ট্রাজেডি স্পষ্ট করে তোলেন (ড্র. গদার)। পিয়েরো বনাম ফার্দিনান্দ এই দ্বৈত ও দ্বন্দ্বিক বৈপরীত্য প্রসঙ্গে লক বনাম রবার্টসন-প্রসঙ্গ এসে যায় (ড্র. বিচ্ছিন্নতা)। উভয় ছবিতে হিংস্রতাকে স্টাইলাইজ করাও হয়েছে। ছবিতে পিয়েরো বলে, আমরা স্বপ্নের মানুষ, এই স্বপ্নময়তা ছবিতে রঙিন আলোকচিত্রের স্মরণ ও প্রতীকী চিত্রময়তার রূপান্তরিত হয়েছে। এই স্বপ্ন-সম্ভাবনা দৃশ্য সাজানোর রীতিতেও লভ্য।

অভিনয়ে বেলমনদো, আনা কারিনা ; চিত্রনাট্য গদার, চিত্রগ্রহণ আর. কুতার, সম্পাদনা F. Collin, সংগীত A. Duhamel, ইস্টম্যানকালার ॥

॥ ভি আই পুডভকিন ॥

(১৮৯৩-১৯৫৩, সোভিয়েত রাশিয়া)। যুগন্ধর প্রতিভা আইজেনস্টাইনের সম-সাময়িক হয়েও পুডভকিন তাঁর চলচ্চিত্র-রীতিতে আইজেনস্টাইনের প্রভাব এড়িয়ে যে নিজস্ব স্বতন্ত্র একটি রূপরীতির প্রচলন করতে পেরেছিলেন তা তাঁর শক্তি ও

কমতার পরিচয়বাহী। পুদভকিন ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র, মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নশাস্ত্র নিয়ে তিনি উচ্চতর অধ্যয়ন করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে তিনি সেনাবিভাগের একটি ল্যাবরেটরিতে রাসায়নিকের চাকরি করতেন। ১৯২০র ১লা মে তারিখে তিনি মস্কোর স্টেট ফিল্ম স্কুলে নিউজরীল ক্যামেরাম্যান এবং অভিনেতা হিসেবে কাজ শুরু করেন। কিছুদিনের মধ্যেই কুলেশভের ওয়ার্কশপ, স্টেট স্কুল অব সিনেমাটোগ্রাফিতে তিনি যোগ দিলেন, সেখানে কুলেশভের হাতে তাঁর চলচ্চিত্র-বিজ্ঞানের হাতেখড়ি হয়। এরপর কয়েকটি ছবির চিত্রনাট্য লিখলেন তিনি, যেমন, 'হাঙ্গার...হাঙ্গার...হাঙ্গার' (২১), কুলেশভ পরিচালিত 'দি ডেথ রে' (২৫)—এই ছবিতে শিল্পনির্দেশকের কাজও করলেন তিনি। তাঁর পরিচালিত প্রথম ছবি একটি বিজ্ঞানধর্মী তথ্যচিত্র, 'মেকানিক্স অব দি ব্রেন' (২৫-২৬), এর বিষয় ছিল পাত্ভলভ-এর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। পরের ছবি ২৫-এর নভেম্বরে অহুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক দাবা প্রতিযোগিতার ওপর 'চেস ফিভার', ছবিটির মধ্যে কোঁতুক এবং মৃদু বিদ্রূপের স্পর্শ ছিল এবং সম্পাদনার ক্ষেত্রে কুলেশভ প্রবর্তিত কৌশলকে পুরোপুরি কাজে লাগানো হয়েছিল।

২৬য়ে গোকির অমর উপস্থাস মাদারকে অবলম্বন করে পুদভকিন তুললেন তাঁর জীবনের প্রথম কাহিনীচিত্র। ১৯০৫-এর বিপ্লবের পটভূমিকায় রচিত গোকির শিখিল গঠন উপস্থাস থেকে চিত্রনাট্যকার নাথান জার্ধি যে ভাবে একটি ঋজু ও ক্লাসিক গঠনের চিত্রনাট্য দাঁড় করিয়েছিলেন তা চলচ্চিত্রের দিক থেকে ছিল সম্পূর্ণভাবেই উপযুক্ত। মাদার ছবির মূল থীম ছিল নিপীড়িত শ্রমজীবী শ্রেণীর একজন দরিদ্র নিরক্ষর মায়ের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ। নিজের সন্তানের বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপের প্রভাবে এই মা হয়ে ওঠেন একজন সক্রিয় বিপ্লবী কর্মী। ছবির থীমটিকে গড়ে তোলা হয়েছিল অত্যন্ত সরল রীতিতে এবং এর প্রধান আবেদন দর্শকের বুদ্ধির কাছে না রেখে রাখা হয়েছিল তার হৃদয়ের কাছে। ছবিটির মানবিক আবেদন, আবেগ ও কাব্যসুধমা পুদভকিনকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে বিপুল খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা এনে দিল।

২৭ সালে সোভিয়েত বিপ্লবের দশম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে তাঁর ও আইজেন-স্টাইনের উপর অক্টোবর বিপ্লবের বিষয়ে ছবি করার দায়িত্ব পড়ল। পুদভকিন লেনিনগ্রাদ শহরে তোলা আরম্ভ করলেন 'এণ্ড অব সেট পিটার্সবার্গ'। গ্রাম থেকে শহরে আসা একটি অশিক্ষিত কৃষকের উপরে ১৯১৭-এর ঘটনাবলীর প্রতিফলন দেখানই ছিল ছবির মূল উদ্দেশ্য। ছবিতে ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ নির্বাচনে

অশ্লীল বুদ্ধিমত্তা ও শিল্পবোধের প্রকাশ দেখা গিয়েছিল, যেভাবে একের পর এক টিউকল্প গড়ে তোলা হয়েছিল তা শিল্পস্বষ্মার দিক থেকে ছিল অনবদ্য। ছবিটি আর্থিক ও শৈল্পিক, দু' দিক থেকেই প্রচণ্ড সাফল্য অর্জন করে। পরবর্তী ছবি 'স্টর্ম ওভার এশিয়া' (২৮) তাঁর শেষ নির্বাক ছবি। এটি ইংরেজ অধিকৃত মঙ্গোলিয়ায় ১৯২০র পটভূমিতে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বীরত্বের কাহিনী নিয়ে গঠিত। ছবিটির ডিস্ক্রিপশন মৌলিক ছিল অসাধারণ। এই ছবিতে ইতিহাস এবং রাজনীতিকে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল, প্রাকৃতিক পটভূমি বর্ণনা ও ঋতু পরিবর্তনের দৃশ্যগুলিকে যে দক্ষতার সঙ্গে তোলা হয়েছিল তা পরিচালকের কবি-প্রতিভার সাক্ষ্য বহনকারী। বিভিন্ন চরিত্রের মানবিক অনুভূতির বর্ণনায় এবং স্মৃতিস্মরণ ডিটেলেস চিত্রণেও তাঁর নৈপুণ্য বিস্ময়কর। ছবিটি মুক্তি পাবার পর এর রাজনৈতিক বক্তব্যের জন্য বিভিন্ন দেশে প্রতিবাদ দেখা যায়। ৫০য়ে ছবিটি পুনর্সম্পাদিত এবং শব্দ ও সংলাপ যুক্ত হয়ে পুনর্মুক্তি পায়। এর পর তিনি অল্প পরিচালকদের বেশ কিছু ছবিতে অভিনেতার কাজ করেন।

পুদভকিন পরিচালিত প্রথম সবাক ছায়াছবি 'লাইফ ইজ ভেরি ডুড' (৩১-৩২), শব্দ ও ধ্বনি প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই ছবিতে তিনি শিক্ষণীয় কল্পনাশক্তি ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। ৩৩য়ে তিনি তুললেন 'ডেজার্টার', ছবিটিতে প্রায় তিন হাজার শট ব্যবহার করা হয়েছিল। এই সময় নাগাদ তিনি সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন ও ৩৫য়ে তাঁকে অর্ডার অব লেনিন উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ক্রমেই দেখা যাচ্ছিল, স্রষ্টা হিসেবে তিনি তাঁর সামাজিক কর্তব্য সফলতার আরও বেশি সচেতন হয়ে উঠছেন। 'দি হ্যাপিয়েস্ট ওয়ান' বা 'ভিক্টরি' (৩৮), 'মিনিম অ্যাণ্ড পোজারকি' (৩৯) ও 'স্বভোরড' (৪০) হলো তাঁর পরবর্তী কয়েকটি কাহিনীচিত্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তিনি সংবাদচিত্র ও তথ্যচিত্র নিয়ে বিস্তারিত পরীক্ষা করার সুযোগ পান। যুদ্ধের পর তিনি ঐতিহাসিক ঘটনা নির্ভর 'অ্যাডমিরাল নাখিমভ' ও রঙিন চিত্র 'দি রিটার্ন অব ভ্যাসিলি বোর্টনিকভ' পরিচালনা করেন। চিত্রজীবনের প্রথম থেকেই পুদভকিন চলচ্চিত্রের তাৎকালিক দিক [ চিত্রনাট্য, পরিচালনা, সম্পাদনা, অভিনয় ইত্যাদি ] নিয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ লেখেন যা তাঁর দুটি গ্রন্থ ফিল্ম টেকনিক এবং ফিল্ম অ্যাকটিং-য়ে অন্তর্ভুক্ত হয়। চলচ্চিত্রের রীতি বিশেষত মনতাজ বিষয়ে আইজেনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির দীর্ঘস্থায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল।

সম্পর্কিত গ্রন্থ : J. ও L. Schnitzer-এর Vsevolod Pudovkin ।

রঞ্জিত রায়

## ॥ চলচ্চিত্র পুরস্কার ॥

জাতীয় স্তরে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য চিত্র ও চিত্রের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের ( যেমন অভিনেতা, পরিচালক, চিত্রনাট্যকার, চিত্রগ্রাহক, সংগীত/শিল্প নির্দেশক, গায়ক, সম্পাদক, অস্থায়ী কলাকুশলী ) পুরস্কৃত করার রীতি বহু দিনের । এই পুরস্কার বিভিন্ন রূপে দেওয়া হয় ( ড. চলচ্চিত্র উৎসব ) । কখনো কোনো শিল্পীর সমগ্র সৃষ্টিকর্মের স্বীকৃতিতেও দেওয়া হয়ে থাকে, যেমন ভারতবর্ষের নাদাশাহেব ফালকে পুরস্কার । জাতীয় পুরস্কারের মধ্যে আমেরিকার অ্যাকাডেমি পুরস্কার ( অস্কার ) সবচেয়ে নাম করা, যদিও জাঁকজমকপূর্ণ ছবিতেই তা বেশি দেওয়া হয় বলে অনেকের অভিযোগ । আমাদের দেশেও জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে । পুরস্কার ছবিতে প্রশংসা, সম্মান ও প্রচার এনে দেয় । আবার চলচ্চিত্র পুরস্কার নিয়ে রাজনৈতিক ও শৈল্পিক বিতর্কেরও শেষ নেই ।

## ॥ আর্থার পেন ॥

( জন্ম ১৯২২, আমেরিকা ) । পেন চলচ্চিত্রে আসেন থিয়েটার ও টেলিভিশন থেকে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে । এই যোগাযোগ পেন-পরিচালিত অধিকাংশ ছবিতে একদিকে নাটকীয়তার, বিশেষত নাটকীয় টানাপোড়েনের ও স্ববিরোধিতার আর তথ্যমূলকতার, বিশেষত ঐতিহাসিক পারিপাশ্বিকতার প্রাধান্য চিহ্নিত করেছে । প্রসঙ্গের এই বৈশিষ্ট্য পদ্ধতির যে বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলিত হয়ে তাঁর ছবিতে তীক্ষ্ণতা এনে দিয়েছে তা হলো মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রবণতা । তাঁর চলচ্চিত্রকর্মকে আধুনিক আমেরিকার সামাজিক পটভূমিতে ফেলে বিচার করতে হবে । সত্যজিৎ রচিত বহু গল্পে যেমন পেনের বহু ছবিতে তেমনি হিংসা ও হাঙ্গামে একই সঙ্গে ও পাশাপাশি উপভোগ করা অস্বস্তিকর হয়ে পড়ে । ‘দি চেজ’, ‘লিটল বিগ ম্যান’, ‘নাইট মুভস’, ‘দি মিরাকল ওয়ার্কার’, ‘মিকি ওয়ান’, ‘অ্যালিস’ সেরটোর্যান্ট’, ‘দি মিশোরী ব্রেকস’, ‘ফোর ফ্রেণ্ড্‌স্’ ইত্যাদি বহু ছবির পরিচালক হলেও তাঁর মূল খ্যাতি ‘বনি অ্যাণ্ড ক্লাইড’ ( ১৯৬৭ ) ( ড. )-এর জন্ম । পেশাদারি দক্ষতার সঙ্গে আধুনিক চলচ্চিত্রের বিভিন্ন ধারার নির্ধারিত একত্র করে পেন নিজেকে এক ব্যক্তিগত পরিচালক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন ।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : রবিন উডের আর্থার পেন ॥

॥ এডউইন এস পোর্টার ॥

আমেরিকার পরিচালক (১৮৭০-১৯৪১)। তাঁর নির্বাক ছবি 'দি গ্রেট ট্রেন রবারি' (১৯০৩)-র খ্যাতি আজ সমগ্র পৃথিবীময়। পোর্টার তাঁর চলচ্চিত্র-জীবন অরম্ভ করেছিলেন এডিসন কোম্পানির ক্যামেরাম্যান হিসাবে। চলচ্চিত্র-সম্পাদনার প্রাথমিক রীতিগুলি প্রধানত তাঁরই আবিষ্কার। তাঁর অগ্ৰাণ্ড উল্লেখ-যোগ্য ছবিগুলি হলো 'সাহুলার প্যানোরামা অব ইলেকট্রিক টাওয়ার' (১৯০১), 'জ্যাক অ্যাণ্ড দি বীনষ্টক' (১৯০২), 'রেসকিউড ফ্রম অ্যান ঈগল'স নেষ্ট' (১৯০২), 'গে স্ক ক্লার্ক' (১৯০৩), 'দি লাইফ অব অ্যান আমেরিকান ফায়ারম্যান' (১৯০৩), 'দি ড্রিম অব এ রেক্সারবিট ফীণ্ড', 'দি ক্রেস্টোম্যানিয়াক,' 'দি এঞ্জ কনভিক্ট' এবং 'দি ইটার্নাল সিটি' (১৯১৫)।

এডউইন পোর্টারই প্রথম ক্যামেরাকে বিভিন্ন দূরত্বে বসিয়ে অথবা ডাইনে-বঁয়ে ঘুরিয়ে কিভাবে চলচ্চিত্রে গতিশীলতা বাড়িয়ে দেওয়া যায় সে জিনিসটি চমৎকারভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। 'দি গ্রেট ট্রেন রবারি' ছবিতে পোর্টার সম্পাদনার মাধ্যমে নাটকীয়তার আয়দানি করলেন। চলচ্চিত্রে কিভাবে কাহিনীকে সাজাতে হয় সেই কায়দাটা পোর্টার বেশ ভালোভাবেই রপ্ত করে-ছিলেন। যিয়েটারে যেখানে গোটাকয়েক সীমাবদ্ধ দৃশ্যের মধ্য দিয়েই গোটা কাহিনীটা বলতে হয়, চলচ্চিত্রে সেখানে ঘটনাগুলিকে বহু ছোট ছোট দৃশ্যে ভাগ করে নিলে তা বেশি কার্যকরী হয়। বিভিন্ন স্থান বা লোকেশনে দৃশ্যগুলি তুলে নিয়ে তারপর সেগুলিকে সুসংবদ্ধ ভাবে সম্পাদিত করলে গল্পটি অনেক বেশি হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে। 'দি গ্রেট ট্রেন রবারি' আঙ্গিকগত এবং বাণিজ্যিক দু দিক থেকেই প্রচুর সাফল্য নিয়ে এসেছিল। [ এই ছবি চলচ্চিত্রের ইতিহাসে প্রথম ওয়েস্টার্ন ফিল্মও বটে। ]

দৃষ্টিকোণ পরিবর্তনের মাধ্যমে গল্প বলার যে কায়দা পোর্টার চালু করে দিলেন তাই চলচ্চিত্রের নিজস্ব আঙ্গিক ও শিল্পরীতির জন্ম দিল। তার উপরে ছবি সম্পাদনার ক্ষেত্রেও তিনি নিয়ে এলেন নাটকীয় সাসপেন্স। সামাজিক সমস্যা পর্দার গায়ে তুলে ধরার বিষয়েও তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। 'মানবিকতার মুহূর্ত' সৃষ্টির দক্ষতায় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা চার্লস ডিকেন্সের সমধর্মী। ১৯১৫ সালেই পোর্টারের চলচ্চিত্র পরিচালকের জীবনের সমাপ্তি। এরপর তিনি নিজেকে আর কোন ছবি তোলেননি, কেবলমাত্র ক্যামেরার ব্যবসা করেছেন।

রাজত রায়

## ॥ রোমান পোলানস্কি ॥

বিশ্ববিখ্যাত পোলিশ চলচ্চিত্র পরিচালক। ১৯৩৩ সালে প্যারীতে জন্ম। তিন বছর বয়সে বাবা মার সঙ্গে তিনি পোল্যান্ডে ফিরে যান। আট বছর বয়সের সময় তাঁর বাবা-মাকে নাৎসিরা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠায় এবং সেখানেই তাঁর মারা যান। এর ফলে যুদ্ধকালীন সময়ে তিনি বিভিন্ন পরিবারের আশ্রয়ে মানুষ হন এবং অল্প বয়সের এই অভিজ্ঞতা—একাকী, অসহায়তা, মাতৃস্নেহের অভাব—তাঁর চরিত্রের গঠনে এবং সমাজ ও জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গিতে এক নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। ১৯৭৯ সালে টমাস্ হার্ডির উপস্থান অবলম্বনে তৈরি ‘টেস্’ (Tess) ছবির পূর্ববর্তী সব সৃষ্টিতেই মানুষ, প্রকৃতি ও সমাজের সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাধারায় মানব মনের অন্ধকার দিকের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। ১৯৬৯ সালে নিজস্ব বিশেষ এক ধর্মে বিশ্বাসী গোষ্ঠী তাঁর স্ত্রী স্মারন টেট (Sharon Tate) কে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে। এর প্রভাবও পোলানস্কির ওপর তাঁর ছবিগুলির মধ্য দিয়ে লক্ষণীয়। তিনি চোদ্দ বছর বয়সে নাটকে অভিনয় শুরু করে পরে চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেন যেমন আন্দ্রে ভাইদার ‘এ জেনারেশন’ (A Generation), ‘লোতনা’ (Lotna), ‘ইনোসেন্ট সোর্সারার্স’ (Innocent Sorcerers) প্রভৃতি। তাঁর নিজের পরিচালিত ‘ডান্স অব দি ভ্যাম্পায়ার্স’ (Dance of the Vampires, 1967) এবং ‘দি টেনেন্ট’ (The Tenant, 1976) ছবিতে প্রধান ভূমিকাভিনেতা ছিলেন। চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য, রেখাঙ্কন ইত্যাদি বিষয়ে পড়াশুনা করার পর পাঁচ বছর লোড্‌স (Lodz) ফিল্ম স্কুলের ছাত্র ছিলেন। এই সময়ে তৈরি অল্প দৈর্ঘ্যের ছবি ‘টু মেন অ্যাণ্ড দি ওয়ার্ডরোব’ (Two Men and the Wardrobe, 1958) তাঁকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এনে দেয়। ‘দি ফ্যাট অ্যাণ্ড দি লীন’ (The Fat and the Lean, 1961) এবং ‘দি ম্যাম্মাল্‌স্’ (The Mammals, 1962) নামক স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবিদুটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। ত্রিকোণ প্রেম ও কামনার সম্পর্ককে নতুন ধারায় বিশ্লেষণ করে তাঁর প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি ‘নাইফ ইন দি ওয়াটার’ (Knife in the Water, 1962) রসিক মহলে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে। এর পর তিনি নিজের দেশ ছেড়ে গিয়ে প্রথমে ইংলণ্ডে এবং পরে আমেরিকায় একের পর এক ছবি তৈরি করতে থাকেন। এই সময়কার সব কটি ছবিতেই মাধ্যমের ওপর তাঁর দখলের স্বাক্ষর পাওয়া যায় কিন্তু ‘টেস্’ পূর্ববর্তী তাঁর সব ছবির জগৎই অপ্রাকৃত, জাদু, আবির্ভৌতিক যার

যথো মর্বিডিটি, সেক্সুয়াল রাইভাল্রি, ডিসগাস্ট, ডিস্টর্টেড মাইণ্ড ইত্যাদির দ্বারা  
 পশ্চাৎবাহিত চরিত্রের উপস্থিতি খুবই বেশি। 'রিপালশান' (Repulsion, 1965)-এ  
 একটি মেয়ের পুরুষ সম্বন্ধে যৌন বিতৃষ্ণা, 'ক্যাল ডু স্যাক' (Cul-de-Sac, 1966)-এ  
 যৌন সম্পর্কের উদ্বেগহীনতা, 'রোজমেরীজ বেবি' (Rosemary's Baby, 1968)  
 ছবিতে উইচক্র্যাফটের প্রভাব, 'ম্যাকবেথ' (Macbeth, 1971)-এ অত্যধিক  
 রক্তপাত—ভিন্ন ধরনের গল্পেও অন্তর্নিহিত এক বিশিষ্ট স্রোত যা 'ড্যান্স অব দি  
 অ্যাম্পায়ার্স', 'হোয়াট?' (What? 1972), 'চায়না টাউন' (China Town,  
 1974), 'দি টেনাণ্ট' ইত্যাদিতেও লভ্য। চরিত্র বা ঘটনার ছব্ব উপস্থাপনায়  
 তিনি বিশ্বাসী নন, এবং এই প্রসঙ্গে 'সারিয়্যালিজম' এবং থিয়েটার অব দি  
 অ্যাবসার্ভের প্রভাবও তাঁর উপর যথেষ্ট। অবশ্য 'টেস্ট' ছবির কাব্যময়তা, চরিত্র ও  
 ঘটনার বাস্তব উপস্থাপনা তাঁর সৃষ্টিতে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসে। এরপর  
 তিনি পাইরেট (১৯৬৬)—পিরিয়ড পীস, ফ্রান্টিক (১৯৬৮)—সাইকো থ্রিলার  
 এবং বিটার মুন (১৯৯২)—রোমান্স তৈরি করেছেন। এই সমস্ত ছবিতে উদ্ভাস্ত  
 সময়ের মধ্যে বিভ্রান্ত মনের শান্তি-সন্ধানের প্রয়াস রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : আইভান বাটলারের দি পিনেমা অব রোমান পোলানস্কি ॥

মিহির সেনগুপ্ত

॥ পোল্যাণ্ড ॥

সম্পন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দেশ পোল্যাণ্ডে ১৯০২ সনে Proszynski প্রথম স্বল্প  
 দৈর্ঘ্যের কাহিনীচিত্র নির্মাণ করা শুরু করেন। ১৯১০ থেকে চিত্র-প্রযোজনার কাজ  
 ব্যাপক ও নিয়মিত হতে থাকে। এর আট বছর পর পোল্যাণ্ড স্বাধীনতা লাভ  
 করে ও দু বছরের মধ্যে দেশের প্রথম ফিল্ম স্টুডিও স্থাপিত হয়। প্রারম্ভিক পরি-  
 চালকদের মধ্যে Hertz, Bieganski, Boleslawski উল্লেখযোগ্য। যদিও  
 শব্দের আবির্ভাবে কারিগরি ও অত্যাশ্চর্য সমস্তার সৃষ্টি হয়েছিল তবু তিরিশের দশকের  
 মাঝামাঝি নাগাদ পোল্যাণ্ডের চলচ্চিত্র-শিল্পে স্থিতি এল। সামাজিক ভাবে  
 প্রয়োজনীয় ছবির আদর্শ নিয়ে Start নামে একটি গোষ্ঠী গঠিত হলো, এর সদস্যদের  
 মধ্যে ছিলেন Jakubowska, Bossak, আলেকজান্ডার ফোর্ড প্রমুখ। ১৯৪৫য়ে  
 চলচ্চিত্রশিল্পের জাতীয়করণ হলো, নতুন ব্যবস্থায় নির্মিত প্রথম ছবিগুলির বিষয়বস্তু  
 ছিল যুদ্ধ ও নাৎসিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। এই সমস্ত ছবিতে সামগ্রিক ব্যঙ্গনা  
 ছাপ বীরত্বের। ক্রমে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার ভাবধারা প্রসারিত হলো, পরি-

চালকদের প্রিয় বিষয়বস্তু হয়ে উঠল সাধারণ মানুষ, তার সততা নিষ্ঠা বুদ্ধি। মানবিক দোষগুণ নিয়ে। পঞ্চাশের বছরগুলিতে সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা, দেখা গেল, ব্যক্তি মানুষের সমস্যা ও মনস্তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত হতে শুরু করেছে। এল রাজনৈতিক পরিস্থিতির জটিল বিশাল ধূসর ক্যানভাসে ভাইদাঃ যুদ্ধ বিষয়ক ট্রেলজি—এ জেনারেশন, কানাল, অ্যাশেজ অ্যাণ্ড ডায়মণ্ডস; মুঙ্ক-এর আয়রনিপ্রধান প্যাসেঞ্জার, Eroica ও স্ববিধাবাদ সম্পর্কে তির্যক গবেষণা ব্যাংলাক; Kawalerowicz-এর রহস্যময় Mother Joan of the Angels, এঁরা অগ্রাণু ছবিতেও এপিক ও অন্তর্দৃষ্টির স্বপ্ন মিলন ঘটেছে। এঁরা প্রত্যেকেই এক একটি স্বতন্ত্র শিল্প-ব্যক্তিত্ব, কিন্তু তাঁদের আদর্শ মূলত এক, তা হলো মুঙ্ক-এর ভাষায় ‘film about Poles for Poles’। ততদিনে পোল্যাণ্ডে আধুনিক স্মরণ-স্ববিধা যুক্ত অনেক স্টুডিও স্থাপিত হয়েছে, বহু সংখ্যক ফিল্ম ক্লাবের মাধ্যমে যোগ্য দর্শক ও সার্থক জনমত তৈরি হচ্ছে, Lodz-এ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উৎকৃষ্ট ফিল্ম স্কুল। ফলে শুধু কাহিনীচিত্রে নয়, তথ্যচিত্রে, স্বল্প দৈর্ঘ্যের চিত্রে, অ্যানিমেটেড ও পরীক্ষামূলক ছবিতেও সমৃদ্ধি এল। ষাটের দশকে বিস্ফোরক ভাবনা নিয়ে ছবির জগতে এলেন পোলানস্কি ও Skolimowski I. Borowczyk অ্যানিমেটেড ছবিতে আনলেন যুগান্তর। ১৯৬৮তে ছাত্র আন্দোলনের অশান্তির পর এই দেশের ছবিতে মতুন স্বাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এলেন জাহুসি। পোল্যাণ্ডের চলচ্চিত্রে আমরা সব পেয়েছি, মধুর গীতিকবিতার মতো সৃষ্টি থেকে চারুকীর মতো নির্ময় রচনা, মহাদান ব্যাপ্ত মহৎ পরিবেশনা থেকে মনস্তাত্ত্বিক বৈপরীত্যের আলুপাঙ্খিক পর্যবেক্ষণ পর্যন্ত নানান ধারা ও বিষয়। সমাজতাত্ত্বিক চলচ্চিত্রের যথার্থ এবং শিল্প-সফল উদাহরণ হিসেবে পোল্যাণ্ডের ছবির খ্যাতি ও স্বীকৃতি ছিল সারা পৃথিবীতে। এ দেশের বহু প্রসিদ্ধ পরিচালক এখন বিদেশে গিয়ে ছবি করলেও পূর্ব ইউরোপের সংকটের প্রভাব অগ্রাণু সমাজতাত্ত্বিক দেশের তুলনায় পোল্যাণ্ডে অপেক্ষাকৃত কম পড়েছে বলে এ দেশে চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা আশাপ্রদ। তরুণতর পরিচালকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিয়েজলোস্কি।

## ॥ প্যান ॥

নিজের অক্ষের ওপর ক্যামেরার অনুভূমিক ঘূর্ণন (ড্র. ক্যামেরা মুভমেন্ট)। এর ফলে একই জায়গায় ক্যামেরা রেখে ক্যামেরার দৃষ্টিকে পাশাপাশি ঘোরানো যায়। এক পাশ থেকে আর এক পাশে ক্যামেরার এই রকম ঘূর্ণনে কীরকম সচলতা ও

গতিময়তার সৃষ্টি হয় তা ইয়াকো প্রমুখের ছবি দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায়। মনো-  
যোগ আকর্ষণে ও বিশেষ কোনো ডিটেলের ওপর জোর দিতেও প্যানিংয়ের  
ব্যবহার ঘটে (ড্র. ক্যামেরাভাষা)। ক্যামেরা মুভমেন্টের নান্দনিক বিচারে প্যানের  
মধ্য দিয়ে পাওয়া যায় সেন্স অব স্পেস।

॥ প্যাশন অব জোয়ান অব আর্ক ॥

( ১৯২৮, ফ্রান্স )। ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় নারী চরিত্র জোয়ান ( ১৪১২-১৪৩১ ) কে  
নিম্নে কার্ল ড্রেয়ারের বহু আলোচিত ছবি ( ড্র. ড্রেয়ার, দিষল )। এই ছবির  
বিভিন্ন দৃশ্য-টাইপেজের, টোনাল মনতাজের, ক্লোজ আপের সার্থক উদাহরণ। বলা  
হয়েছে, ড্রেয়ার এই ছবিতে যা করেছেন তা হলো ফালকানেস্তিকে চিত্রায়িত করা।  
তার মুখ শুধু একটা মুখ নয়, একটা সময়, একটা কমপেস্ট, একটা প্রতীক। এই  
চরিত্র নিয়ে রবার্ট ব্রেন্সের 'দি ট্রায়াল অব জোয়ান অব আর্ক' ( ১৯৬২ ) নামে  
একটি ও বিভিন্ন নামে বিভিন্ন পরিচালকের আরও বহু ছবি আছে। ইনগ্রিড  
বার্গম্যান এই চরিত্রটিকে দুবার পর্দায় রূপ দিয়েছেন।

অভিনয়ে ফালকানেস্তি ( জোয়ান ), চিত্রগ্রহণ R. Mate, শিল্প নির্দেশনা  
এইচ ওয়র্ম, জে ছগো ৷

॥ প্রচারমূলক ছবি ॥

প্রচারমূলক ছবি হলো সেই সমস্ত ছবি যা জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনে, বিশেষ  
কোনো দর্শন বা রাজনীতির প্রচারে, বা কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা বা মতবাদের সপক্ষে  
বা বিরোধিতায় সচেতন ভাবে নির্মিত ও ব্যবহৃত। হয় তারা পুরোপুরি প্রামাণ্য  
চিত্র, নয়তো বিভিন্ন প্রামাণ্য দৃশ্যের সাহায্যে কাঠামোয় ও বক্তব্যে পুনর্গঠিত। এই  
শকার চিত্রের আদি উদাহরণ 'টিয়ারিং ডাউন দি স্প্যানিশ ফ্ল্যাগ' ( ১৮৯৮ )।  
পঞ্চম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এর প্রচলন বাড়ল। জার্মানি/অস্ট্রিয়া, আমেরিকা, ফ্রান্স,  
ব্রিটেন সমস্ত দেশই তখন প্রচারমূলক ছবি প্রয়োজনা করেছে। কখনো এগুলো  
দৃশ্যচিত্র, কখনো জাতীয় মনোবল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নির্মিত, কখনো শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে  
আক্রমণ। কখনো এরা প্রচারসর্বশ্ব, কখনো তথ্যমূলক। এমনকি কাহিনীচিত্রের  
মধ্যেও কখনো এই প্রচার-উদ্দেশ্যের প্রয়োগ ঘটেছে, যেমন গ্রিফিথের 'হার্টস অব দি  
নর্থ' ( ১৯১৮ ) ছবিতে। প্রচারমূলক হয়েও কিছু কিছু ছবি কিন্তু সার্থক শিল্প-  
শক্তি, যেমন আইজেনস্টাইনের দি জেনারেল লাইন বা অক্টোবর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের

আগে প্রচারধর্মী ছবির আবার কদর বাড়ল। জার্মান ছবি ট্রান্স্ফ্‌ অব দি উৎপ ( ৩৫ ), অলিম্পিয়া ( ৩৮ ) ও গ্যোবেল্‌সের তত্ত্বাবধানে তৈরি ছবিগুলির বিপরীতমুখে ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার সরকার প্রযোজিত মার্ক্সবাদী তথ্যচিত্রসমূহ এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইভেন্‌স, বুল্‌য়েল বা রেনোয়ার তৈরি একাধিক চিত্র। ওই সময়কার সোভিয়েত চলচ্চিত্র একই সঙ্গে প্রচারবাদী ও শিক্ষামূলক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এই প্রকার ছবির ব্যবহার ঘটল সামগ্রিক শিক্ষার কাজেও। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে আছে জার্মানির ব্যাপটিজম অপফায়ার ( ৪০ ), ভিক্ট্রি ইন দি ওয়েস্ট ( ৪১ ), দি ইটার্নাল জু ( ৪০ )। আমেরিকার দি মার্চ অব টাইম চিত্রমালা, কাপরার হোয়াই উই ফাইট চিত্রমালা। ব্রিটেনের যুদ্ধ-সংবাদচিত্র ( টার্গেট ফর টুনাইট ইত্যাদি ) ও দেশবানীর জন্ম নিমিত্ত ছবি ( ফায়ারস্ ওয়ার স্টার্টেড ইত্যাদি )। আমেরিকা / ব্রিটেন যৌথ প্রযোজনা দি টু গ্লোরি। রাশিয়ার ফাইটিং ফিল্ম অ্যালবাম সিরিজ। কোর্ড, হার্টন, কোর্ডা, জেনিংস, ক্যারল রীড, ডেভিড লীন, ডিকিনসন, দত্তবেঙ্কো, কোজিনৎসেভ, গেরাসিমভ সকলেই, এমনকি ডিজনিও ( আংশিক বাস্তব আংশিক অ্যানিমেশন ভিক্ট্রি থু, এয়ার পাওয়ার (৪৩) ) তখন প্রচারমূলক ছবি বানিয়েছেন। যুদ্ধের পর রেনের গ্যরনিকায় ও কারটিয়ার ব্রেসের ছবিতে যুদ্ধ বিরোধী ভাবনা ও যুদ্ধোত্তর পুনর্বাসনের সাক্ষাৎ মিলল। বন্দীশিবিরে কী ঘটেছিল তা নিয়ে মিত্রপক্ষ নির্মাণ করল Welt in Film ( ৪৫-৫১ ) চিত্রমালা। নাৎসি-বিরোধী ভাবনা এমনকি জার্মানি-বিরোধী ভাবনা হয়ে জাঁকিয়ে বসল নানা দেশের কাহিনীচিত্রে, হলিউডের ছবিতে এই বিরোধিতা কয়েক বছর পরে কম্যুনিষ্ট বিরোধিতার রূপ নিল। স্পেনের গৃহযুদ্ধ, কিউবা কোরিয়া ও ভিয়েতনামের যুদ্ধ এবং আরব-ইস্রায়েল যুদ্ধ নিয়েও প্রচারমূলক ছবি হয়েছে। প্রচারমূলক চিত্র প্রসঙ্গে শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের কথা আসে, আসে প্রচারকর্মে শিল্প ও অশিল্পের মধ্যে দ্বন্দ্বের কথাও। ( ড. সমাজ ও চলচ্চিত্র )

॥ প্রফেসর মামলক্ ॥

১৯৩৮ সনে রাশিয়ায় নাৎসিবাদ বিরোধী দুটি উল্লেখযোগ্য ছবি নির্মিত হয়— আলেকজান্ডার নেভস্কি ও প্রফেসর মামলক্। দ্বিতীয় ছবিটির সময়-কাল ত্রিশের দশকের প্রথমার্ধ, পটভূমি জার্মানির বেলিন নগরী, নায়ক এক ইহুদী শল্য-চিকিৎসক। নাৎসিদের হাতে তাঁর লাঞ্ছনা ও হত্যা হলো ছবির বিষয়বস্তু, যা

পক্ষ ও বলিষ্ঠ ভাবে চিত্রায়িত। দেশের সৎ ও শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন নাগরিকদের  
 ৭৮৩ন করার চেষ্টায় তাঁর প্রতিরোধের যে প্রয়াস তা ছবিটিকে এক আন্তর্জাতিক  
 খ্যাতি দিয়েছে। ঐক্য ও সৌভ্রাত্বের এই আহ্বান ছবিকে দিতে পেরেছে কালজয়ী  
 শাব্দিক। ছবির শেষাংশে ইহুদী নায়কের ভাষণ 'গ্রেট ডিস্ট্রিক্ট'য়ের সমাপ্তিতে  
 ইহুদী নাপিতের ভাষণের চেয়ে অনেকের মতে অনেক বেশি ছবির সাথে সংশ্লিষ্ট।  
 ঐতিহাসিক কারণে দেশ থেকে দেশে বিভিন্ন সময়ে এই ছবি নিষিদ্ধ হয়েছে।

প্রাক্তন পূর্ব জার্মানির দ্বিতীয় প্রজন্মের উল্লেখযোগ্য পরিচালক কমরাড হবলফ্  
 ১৯৬০-৬১ সনে প্রফেসর মামলক্ পুনর্নির্মাণ করেন।

অভিনয়ে Mezinski ( মামলক্ ), নিকিতিনা ; পরিচালনা A. Minkin,  
 H. Rappoport ; চিত্রগ্রহণ জি. ফিলাটোভ ॥

॥ জোলতান ফাব্‌রি ॥

( ১৯১৭-২৪, হাঙ্গেরী )। নাটক ও চাক্কলা নিয়ে অধ্যয়ন করার পর ফাব্‌রি  
 কমেডিয়ান, স্টেজ ম্যানেজার, সেট ডিজাইনার, নাট্যপরিচালক প্রভৃতি বিভিন্ন  
 পদে কাজ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বেশিরভাগ সময়টা যুদ্ধবন্দী রূপে কাটাবার  
 পর তিনি চলচ্চিত্র পরিচালকের কর্মজীবন শুরু করেন। তাঁর প্রথম দিককার  
 ছবির মধ্যে দুয়েটি আওয়ারস, লেট সীজন, ওয়ান ডে মোর অর লেস, মেরি গো  
 রাউণ্ড, প্রফেসর হ্যানিবল, এ হার্ড সামার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

'Merry-Go-Round' ( ৫৫ ) তাঁর অস্বাভাবিক বিখ্যাত ছবিগুলির মতোই  
 হাঙ্গেরীর জাতীয় জীবনের বিতর্কিত ও সংশ্লিষ্ট সময়কে তুলে ধরে। সময়টা  
 ১৯৫৩ সাল। Marri নামে এক কোমল কিশোরী এবং তার প্রেমিক Mate-র  
 তাদের অভিশ্রুতবাদী অভিভাবকদের কীটদষ্ট গোঁড়া সংস্কার চাপিয়ে দেওয়ার  
 বিরুদ্ধে সংগ্রামের কাহিনী এটি। Fabri তাঁর চলচ্চিত্রসম্মত প্রয়োগকৌশলের  
 দিক থেকে এ ছবিতে এক নতুন জায়গায় পৌঁছে গেছেন। গাঢ় অন্ধকার ভেদ  
 করে ক্যামেরা-চোখের ধীর ও ধারাবাহিক অল্পসঙ্কান এবং তা থেকে ডিজলভ  
 করে নাগর-দোলার উচ্ছল সেটে চলে আসা, এই কাহিনী এভাবে এগিয়েছে।  
 তিনি তাঁর চরিত্রগুলিকে কথা বলানোর জন্ম তাঁর অল্পসঙ্কানী ক্যামেরাকে কাজে  
 লাগিয়েছেন। তাঁর Lap-dissolve, মাথা ও কাঁধের উপর দিয়ে তোলা শটগুলি,  
 স্লো-আপ ও ক্রেন-শটগুলির দ্রুত পারস্পর্যে ব্যবহার, দোহুল্যমান চরিত্রগুলিকে  
 উদঘাটন করার ব্যাপারে শট বিভাজনের গঠন-পদ্ধতি বিষয়ে তাঁর নৈপুণ্য প্রমাণ

করে। এবং এখানেই আমাদের সামাজিক অবস্থার বন্দীদশা থেকে নতুন মূল্যবোধে মুক্তির প্রকাশে তাঁর অনন্ত কৃতিত্ব। 'Ant's Nest' একটা ভিন্নতর তত্ত্বীয় আঘাত করে। এখানে তিনি ছাত্রীদের অবরুদ্ধ কনভেন্ট জীবনের এবং সংস্থা পরিচালনাকারী সন্ন্যাসিনীদের নোংরা কলহের দিকে বিক্রপের চাবুক হেনেছেন। চাবুক হেনেছেন অন্তঃসারশূন্য ক্রিষ্টিয়ান গৌড়ামী ও দূষিত নিয়মাহুর্বাতিতার দিকেও। প্রথম থেকেই Fabri-র ক্যামেরা পবিত্র চার্চের নির্মল প্রশান্তি দেখাতে তাৎপর্যপূর্ণ চরিত্রগুলির উপর ক্লোজ আপে ঘোরাফেরা করে, এবং তারপর প্রার্থনাকক্ষে সমবেত সন্ন্যাসিনীদের দ্বন্দ্বমূলক ও সন্দেহগ্রস্ত মুখের উপর ঠাট্টা-নামা করে। প্রাগম্পন্দনময় দ্রুত যৌবনের প্রতিভূ ছাত্রীরা এই ছবিতে এক ভয়ংকর পটভূমি তৈরি করে রেখেছিল। তাদের বিশ্লেষণী চোখে ফাঁপা সমস্ত ধর্মীয় মূল্যবোধ সহ সম্পূর্ণ ধর্মীয় অথরিটিকেই বিক্রপ করা হয়েছে। চূড়ান্ত পর্যায়ে Fabri-র ক্যামেরা দর্শকদের চমকে দিয়ে পর্যবেক্ষকের মতো ঘুরে বেড়ায়, রোল করে, প্যান করে এবং তাঁদের ক্রোধের পল্লভেতে আগুন ধরাতে সাহায্য করে। [ তাঁর ছবিতে দুই প্রজন্মের সংঘাত, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক এবং ইতিহাসচেতনতা বিশ্লেষণী বুদ্ধিবাদে চিহ্নিত। ]

মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে এঁর প্রি পাওয়া 'The Fifth Seal'-এ বর্ণিত হয়েছে ১৯৪৪-৪৫ সালের Arrow Cross (হাঙ্গেরীয়ান নাজী)-দের সন্ত্রাসের রাজত্বে মুষ্টিমেয় কজন সাধারণ হাঙ্গেরীয়াসীর হৃদয়বিদারক দিনযাপনের কাহিনী। সাধারণ মানুষের আপন পৃথিবী—তাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আশা-নিরাশা—Fabri আন্তরিকতার সঙ্গে বিবৃত করেছেন। নিরীহ লোকদের উপর অত্যাচার ও সন্ত্রাস বর্ণনা করতে Fabri যেভাবে সাউণ্ড ট্র্যাককে ব্যবহার করেছেন, তা সত্যিই প্রশংসার দাবী করে, কারণ, সাউণ্ড ট্র্যাকের মাধ্যমেই আমরা ঘটনাগুলি অনুভব করি, তাদের চোখে না দেখেও। হাঙ্গেরীর জাতীয় জীবনের বিচিত্র ও বিবিধ প্রসঙ্গে তাঁর যে সদা-সতর্ক আগ্রহ তা অসাধারণ সংবেদনশীল রূপায়ণ পেয়েছে তাঁর Hungarians ছবিতেও। তাঁর পরের দিক্কার ছবিগুলিতে বুদ্ধিবাদের পাশাপাশি এসেছে অসাধারণ সংবেদনশীল চিত্রায়ণও। এই সমস্ত ছবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য Requiem, *Baliant Fabian Meets God*, 148 Minutes from the Unfinished Sentence ইত্যাদি। নিজের ছবির চিত্রনাট্য রচনা ও সেট নির্মাণ তিনি নিজেই করেন। (ড. হাঙ্গেরী)

প্রদীপ বিশ্বাস

॥ দাদাসাহেব ফালকে ॥

প্রকৃত নাম যুন্দিরাজ গোবিন্দ ফালকে ( ১৮৭০-১৯৪৪ ), যাকে ভারতীয় চলচ্চিত্রের জনক বলা হয়। ব্রাহ্মণ পুরোহিত বংশের সন্তান বলে বিভিন্ন পারিবারিক ও সামাজিক সংস্কার ও বাধাকে অতিক্রম করে তিনি সিনেমা জগতে প্রবেশ করেন। ফালকে নির্মিত চিত্র রাজা হরিশ্চন্দ্র ( ১৯১২ ) ভারতীয় চলচ্চিত্রের যাত্রাপথে প্রারম্ভিক মাইলস্টোন। এই ছবি ও পরবর্তী ছবি ভস্মাহর মোহিনী, সাবিত্রী, লক্ষাদহন, কৃষ্ণজন্ম, কালীয়মর্দন প্রভৃতির মাধ্যমে পর্দায় ঘটনা ও চরিত্র ( হোক না তারা পৌরাণিক ) প্রথম বিশ্বাস ও গ্রহণযোগ্য রূপ পেতে লাগল। শুধু চিত্রনির্মাণ নয়, চলচ্চিত্র সম্পর্কে তাঁর পরিকল্পনা, আগ্রহ ও চিন্তা ছিল বহুমুখী। চলচ্চিত্র অনুশীলন, মুক্তাংগন চিত্র-প্রদর্শন, জন মাধ্যম ও জনশিক্ষা মাধ্যম হিসেবে বিশেষত তথ্যচিত্রের ব্যবহার, চলচ্চিত্র বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা, চিত্রের প্রযোজনা ও পরিবেশনা সম্পর্কে নতুন ভাবনা, তরুণ চিত্রনির্মাতাদের শিক্ষিত করে তোলার জগু ফিল্ম স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন, এই নতুন মাধ্যমটির জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চরিত্র সম্বন্ধে শিল্পী, দর্শক ও কলা-কুশলীদের অবহিত করানো ইত্যাদি সেই সব বহুমুখী চিন্তার অন্তর্গত। ১৯২৮য়ে ভারতীয় সিনেমাটোগ্রাফ অনুসন্ধান কমিটির সামনে তিনি যে দীর্ঘ সাক্ষ্য দেন তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সিনেমার বিবিধ কলাকৌশল ও চলচ্চিত্র নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়কে তিনি শুধু প্রবন্ধ ও আলোচনা লিখেই প্রকাশ করেন নি, এমন কি ১৯১৮য় শিক্ষায়ুলক একটি চিত্রের মাধ্যমে তাদের প্রত্যক্ষ ও ব্যবহারিক ভাবে তুলে ধরেছেন। চলচ্চিত্রে ভদ্রবংশের মেয়েদের অভিনয় তখন নিষিদ্ধ ছিল, মেয়েদের চরিত্রে প্রায়ই নামতেন পুরুষরা। তিনি এই নিয়মও ভঙ্গ করেন। কালীয়মর্দন-য়ে তিনি নারীচরিত্রগুলিতে নামিয়েছেন মেয়েদেরই, এবং তার চেয়েও বড়ো কথা তাঁর নিজের মেয়েদের। ভারতীয় সিনেমার আদিয়েগে ফালকের মতো একজন প্যাশনেট পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন ছিল। ভারতে আজ চলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠ পুরস্কারটি তাঁর নামে দেওয়া হয়।

॥ রাইনার ওয়ার্গার ফাসবিগার ॥

( ১৯৪৬-৮২ ), জর্মন চিত্রপরিচালক।

‘The one thing I acknowledge is despair’. — ফাসবিগার-অভিনীত চরিত্রের সংলাপ, Beware of a Holy Whore.

নাগহীন এক শহরের পথ দিয়ে হেঁটে চলেছে এক নিঃসঙ্গ পথিক। পথ জনশূন্য, দুপাশের স্তরু, সারবন্দী বাড়িগুলি যেন কোনো যক্ষপুত্রীর পরিত্যক্ত রূপ, আকাশে শীতের বিবর্ণ মেঘ। তীব্র হিমেল হাওয়ার জন্ত, অথবা নিজের অপ্রতুল শীতবস্ত্রের জন্তই, লোকটি চলে একটু দ্রুত অথচ অনিশ্চিত পদক্ষেপে; মনে হতে পারে গন্তব্য স্থানের ঠিকানাটা তার ঠিক স্মরণ নেই বা নির্ধারিত সময়ের একটু আগেই বোধ হয় সে পৌঁছে গেছে। ক্লশ, নিষ্পত্ত একটি গাছের নিচ দিয়ে, অসময়ে জলে-ওঠা গ্লান ল্যাম্পপোস্টের পাশ দিয়ে, লোকটি মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে যায়। নেপথ্যে শোনা যায় কয়েকটি কুকুরের ছাড়া-ছাড়া, ক্রান্ত চিৎকার।

পথিকের নাম ফ্রান্জ—জার্মান চলচ্চিত্রকার রাইনার ওয়ার্গার ফাসবিণ্ডারের *Gods of the Plague* ছবির নায়ক। এক হিশেবে এই দৃশ্যের গ্লান হতাশা ফাসবিণ্ডারের অধিকাংশ ছবির কেন্দ্রীয় mood বা মেজাজকে ধারণ করে আছে, যেমন আছে ছবির নায়ক ফ্রান্জ। ফাসবিণ্ডারের সমস্ত ঠিকানাহীন, নিরাশ্রয় নায়কের নাম ফ্রান্জ; তারা সকলেই এক নিরুত্তাপ, শীতাত পৃথিবীর পথিক। *Gods of the Plague* ছবিতে শুধু পথ নয়, অফিস রেস্টোরাঁ এমন কি শয়নঘরের দৃশ্যও একটা আশ্চর্য শীতলতা অনুভব করা যায়, যেন কবোক্ষতা কোথাও আর নেই। তার কারণ কি শুধু এই যে ফ্রান্জ একজন জেলফেরৎ আসামী এবং অংশত সমাজচ্যুত? ফাসবিণ্ডারের ছবিতে যে সর্বব্যাপী হতাশা তার উৎস এত সামান্য নয়; এই প্রাক্তন অপরাধী, আশ্রয়চ্যুত, তরুণ ফ্রান্জের তাঁর কাছে যুদ্ধোত্তর জার্মান সমাজের রূপকল্প বা metaphor—এদের বঞ্চিত, অবহেলিত জীবনকে দেখতে হবে জার্মান সমাজের অবক্ষয়ের পটভূমিকায়।

হলিউডের যে গ্যাংস্টার চলচ্চিত্রের হালকা প্রভাব ফাসবিণ্ডারের প্রথম পর্বের ছবিতে দেখা যায় তার গভীরতা কিন্তু বেশি দূর বিস্তৃত নয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, ফাসবিণ্ডার হলিউডের বি-ফিল্ম অর্থাৎ অপরাধমূলক চলচ্চিত্র থেকে কয়েকটি archetype অবিকল গ্রহণ করেছেন—যেমন এক সময় করে-ছিলেন মেলভিল কিংবা গদার—কিন্তু তাঁর হুশীলবের যে নিরানন্দ, আশাহীন জীবনের চিত্র আমরা পাই হলিউডের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। হলিউডের গ্যাংস্টারদের মধ্যেও অসহায়তা-জনিত একটা ক্রুরতা দেখতে পাওয়া যায়; তাদের স্নেহকাতরতা বা স্বাভাবিক জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষা নিয়োগ নাটকীয়তা রচনা করা হয়। হামফ্রে বোয়ার্ট এবং সাম্প্রতিককালে স্টীভ ম্যাকুইন এই ধরনের বঞ্চিত নায়কের অনেকগুলি রূপ মূর্ত করে তুলেছিলেন। তারা স্নেহের কাঙাল,

কিন্তু সংসারের স্নেহ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মরীচিকার মতো রয়ে গেছে তাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। ফাসবিগারের নায়করাও কোনোদিন স্নেহের কোমল স্পর্শ পায় না, কিন্তু তা নিয়ে তিনি যেন চিন্তিত নন। তাঁর ছবি থেকে সব সেন্টিমেন্ট, হাদি-কান্না নির্মমভাবে ছাঁটাই হয়ে গেছে; তিনি যেন কতকগুলো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ঘটনার মাধ্যমে একটি কাহিনীর নির্ধারককে তুলে আনতে চান। যে জার্মান সমাজকে তাঁর ছবিতে বার বার নানা চেহারায় আমরা দেখি সেটি কি 'বাস্তব' জার্মান সমাজ? এর উত্তরে ফাসবিগার বলেছেন যে, 'It is not 'the reality', but it is a newly shaped one'. যে দৃশ্যটির বর্ণনা দিয়ে এই রচনার সূত্র হয়েছিল সেই দৃশ্যটিও প্রকৃত অর্থে বাস্তব নয়। বাস্তবের প্রতি ফাসবিগারের দৃষ্টিভঙ্গি চিরকালই অগ্নাধিক রঞ্জিত, এমন কি তাঁর প্রথম পর্বের বস্তবাদী ছবিতেও।

ফাসবিগারের নায়কদের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। এখানে তিন-চারটি মৌল টাইপ দেখতে পাওয়া যায় যারা সকলেই ত্রাত্য। এর মধ্যে পূর্বোক্ত অপরাধীরা আছে—আছে শারীরিক, মানসিক প্রতিবন্ধী, সমকামী অথবা বিদেশা-গত শ্রমিক। এরা সামাজিক অর্থেই আর সকলের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেছে তাই এদের মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে বাধ্য। উদাহরণত *gas-tarbeiter* বা চলতি জার্মান ভাষায় বিদেশী শ্রমিকের প্রসঙ্গটি তোলা যেতে পারে। এরা ফাসবিগারের ছবিতে বার বার এসেছে। বস্তুত, তাঁর দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ ছবি *Katzelmacher* এক গ্রীক শ্রমিকের কাহিনী; ছবিতে দেখা যায় কিভাবে এই অকপট মানুষটি মধ্যবিত্ত জার্মান সমাজের প্রচ্ছন্ন ফ্যাসিবাদের শিকার হলো। ১৯৭২ সালের *The Wild Game* ছবির নায়কও একটি বিদেশী এবং এখানেও সে তার নতুন সমাজের বিধি-বন্ধনগুলি বুঝতে অসমর্থ। তাই সে জার্মান সমাজের উপেক্ষা ও অনাদরের উত্তর দেয় উপেক্ষা ও ভায়োলেন্স দিয়েই। এই প্রসঙ্গে সব থেকে সাহসী ছবি নিঃসন্দেহে *Fear Bats the Soul* (১৯৭৩)। আলি নামক এক আরব শ্রমিক বয়স্ক এক জার্মান মহিলাকে বিবাহ করে, কিন্তু প্রথাসর্বম্ব মধ্যবিত্ত সমাজের পিছুটান তাদের বিবাহ এবং ক্রমে তাদের পারস্পরিক নির্ভরতার ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়।

সমকামিতা ফাসবিগারের ছবিতে বারবার এসেছে, এবং এই সমকামী-সম্পর্ক (পুরুষ/স্ত্রী) আর সকলের কাছ থেকে চরিত্রগুলিকে সরিয়ে নিয়ে আসে বলেই তাদের পারস্পরিক নির্ভরতা একটা স্বতন্ত্র তাৎপর্য পায়। *Fox* (১৯৭৫) ছবিতে যেমন সমাজের পটভূমিকায় সমকামীর একাকিত্ব ও অসহায়তা ফুটে উঠেছে, *The*

Bitter Tears of Petra Von Kant ( ১৯৭২ ) ছবিতে তেমনি কেন্দ্রীয় চরিত্রের অসহায়তা প্রকাশ পেয়েছে তার প্রত্ন করার বাসনার মধ্য দিয়ে । Whity ( ১৯৭০ ) ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র একজন মানসিক প্রতিবন্ধী—নিভাত্ত শারীরিক কারণেই সে সমাজের অন্তর্বাসী, তাই সে ফাসবিণ্ডারের ছবির নায়ক ।

একথা বলা যাবে না যে ফাসবিণ্ডারের পৃথিবীতে অত্যাচারী ও অত্যাচারিত এই দুটি বিপরীত যেক্ট রয়েছে । তাঁর ছবিতে পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারটা এত জটিল যে যেখানে এমন কি সামাজিক শোষণের প্রত্ন জড়িত সেখানেও অপরাধ-বিচার প্রায় অতিসরলীকরণের পর্যায়ে পড়ে । The Wild Game ছবিতে বিদেশী নায়ক যেমন তার কিশোরী প্রেমিকার নাৎসি-ভক্ত পিতার য়ণার শিকার হয়, তেমনি সেই মধ্যবয়স্ক আপাত-শান্তিপ্রিয় মানুষটিও এক ভয়াবহ সামাজিক স্বাধীনতার শিকার হন—যে স্বাধীনতার বলে চতুর্দশী কন্টারও সঙ্গী নির্বাচনের অধিকার স্বীকৃত । ফাসবিণ্ডারের চলচ্চিত্রের লজিক বারবার এই বিচিত্র পথ নেয় ; সে অত্যাচারীকেও দেখিয়ে দেয় victim বা শিকার হিশেবে । এই নাগপাশ থেকে মুক্তির কি কোনো উপায় নেই ? টমাস এলসেসার তাঁর A Cinema of Vicious Circles in Fassbinder গ্রন্থে ঠাট্টা করে বলেছেন, 'It almost amounts to a form of apologetics for leaving things as they are.' মানুষে মানুষে সম্পর্কের যে প্যাটার্ন আমরা ফাসবিণ্ডারের ছবিতে দেখতে পাই তার ভিত্তি বিশ্বাস ও মনুষ্যত্বের ক্ষয় ; সেখানে আশাবাদের অবকাশ নেই বলা চলে ।

তাঁর ছবির কুশীলবের মধ্যে, বিশেষত ফ্রান্স বা ঐ ধরনের ত্রাত্য নায়কদের মধ্যে, যে শিল্পগত সমস্যা দেখা যায় তা হলো কি করে একটি তীব্র, আক্রমণাত্মক অনুভূতিকে—বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা, প্রত্যাখ্যান আবার একই সঙ্গে প্রেম বা আত্মদান—গ্রহণযোগ্য করে তোলা যায় । সমস্যাটি একটু জটিল হয় এই জন্ত যে ফাসবিণ্ডার কোথাও তাঁর চরিত্রের কাজকর্মের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেননি । The Peddler of Four Seasons ছবির নায়ক হাস শেষ দৃশ্বে যে আত্মহত্যা করবে এটা দর্শকের কাছে অপ্ৰত্যাশিত, কিন্তু এটা তার অসহায়তারই ইঙ্গিত বহন করে যদিও কেতাবী নাটকীয় ধারা অনুসারে ফাসবিণ্ডার এর জন্ত দর্শককে প্রস্তুত করেননি । তাঁর চরিত্রগুলি নিজেরাও যেন একটুও বিন্মিত হয় না । Gods of the Plague ছবিতে এক ডাইয়ের নৃশংস হত্যা, অজ্ঞ ডাইয়ের প্রতি তার বিধবা স্ত্রীর আকর্ষণ, এক ফেরিওয়ালীর বিশ্বাসঘাতকতা এবং পুলিশের গুলিতে নায়কের

জীবনান্ত—এগুলি ঘটে প্রায় অমোঘভাবে। ফাসবিচারের কুশীলব পরস্পরের কাছ থেকে চায় হয় প্রেম নয় প্রত্যাখ্যান, মাঝামাঝি কিছুতে তারা তৃপ্ত নয়। আবার প্রেম, ভালোবাসা শব্দগুলি তাদের কাছে প্রভুদেবই নামান্তর, যেমন প্রত্যাখ্যান কথাটির আর এক অর্থ যুক্ত। *The Bitter Tears of Petra Von Kant* ছবির নায়িকা তার সঙ্গিনী মালিনকে বলে তাদের তৃতীয় সহচরী সম্পর্কে, 'I didn't love Karin at all, I just wanted to own her.' মালিন সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য, তাই মালিনও পেট্রাকে প্রত্যাখ্যান করে। এইভাবে প্রভুত্ব/আত্ম-সমর্পণ ও প্রেম/প্রত্যাখ্যানের খেলা চলেছে ফাসবিচারের কুশীলবের মধ্যে। অসহায়তার মধ্যেই এই দ্বন্দ্বের উৎস এবং খুঁজলে দেখা যাবে এই অসহায়তার পিছনে রয়েছে সামাজিক বঞ্চনা ও অবহেলা। সমালোচকরা বলেছেন যে, ফাসবিচারের নায়ক/নায়িকার চরিত্রে যে প্রচ্ছন্ন, অকথিত স্নেহকাতরতা ফুটে ওঠে তা তাঁর নিজের নিঃসঙ্গ কৈশোরের বিরুদ্ধে একটা নিরুদ্ধ প্রতিবাদ। প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে তিনি যে মেলোড্রামাকে বেছে নিয়েছিলেন—যে মেলোড্রামার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কগুলি প্রায় সিমেন্টের মতো সম্পূর্ণ ও অপরিবর্তনীয়—তারও একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে।

চরিত্র নির্বাচন থেকে শুরু করে ঘটনা-বিস্তার, সংলাপ প্রভৃতি ছবির সর্বস্তরে ফাসবিচার সাধারণভাবে মেলোড্রামাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁর প্রায় সব কাহিনীরই কেন্দ্রস্থল একটি স্বাভাবিক যুক্ত্য। আসলে যুক্ত্যকে একটা ঘটনা-পরস্পরার শেষ সোপান বলে গ্রহণ করা বা তাকে একটা সমস্যার অন্তিম ফয়সালা বলে মনে করা ফাসবিচারের অসহায় ও অনন্তোপায় চরিত্রগুলির মজ্জাগত প্রতিক্রিয়া। তাই তাঁর ছবিতে—যে ছবির কুশীলব গ্যাংস্টার নয় সেখানেও—এত খুন-জখম আত্মহত্যার ছড়াছড়ি। *Why Does Mr. R. Run Amok* ছবিতে নিতান্ত সাধারণ, নিরীহ নায়ক একদিন শান্তভাবে তিনটি খুন করে—প্রথমে এক প্রতিবেশী, পরে নিজের স্ত্রী এবং সবশেষে নিজেকে। *The Peddler of Four Seasons* ছবিরও শেষ নায়কের আত্মহননে। সাধারণভাবে ফাসবিচারের চলচ্চিত্রে প্রাধান্য পায় চরিত্রগুলি এবং যেহেতু সেই চরিত্রগুলি এক একটি বিশেষ সামাজিক তাৎপর্যের বাহক সেইজন্য তাদের জন্ম পরিচালককে বিশেষ কতকগুলি ঘটনার কথা ভাবতে হয়। *Whity* ( ১৯৭০ ) এর একটি উদাহরণ। ছবির চারটি মূল চরিত্রের একজনকেও 'স্বাভাবিক' বলা যায় না। কেন্দ্রীয় চরিত্র, অতুল বৈভবের অধিকারী বেন নিকলসন এক অস্থিরমতি মানুষ; তাঁর স্ত্রী কেট মৌন-

বিকারগ্রস্ত। দুটি অল্প পুরুষ-চরিত্রের একজন ফ্রাংক সমকারী এবং অল্পজন ডেভি জডবুর্ন। ক্লোদ শাব্রল যেমন একদা বলেছিলেন যে, মতিচ্ছন্ন ও পাগলাটে চরিত্র পেলে তিনি আর কিছু চান না, ফাসবিগারেরও লক্ষ্য সেইসব কেন্দ্রচ্যুত মানুষ যারা স্বাভাবিক জগৎ থেকে এক ধাপ সরে গেছে। তাঁর ছবির যে সামগ্রিক মেলোড্রামা-স্থলত চলন তার উৎস এইখানে।

স্বাভাবিকতাকে ফাসবিগার বর্জন করেছেন তাঁর শ্রষ্টা-জীবনের প্রায় স্রু থেকেই। নানা বাস্তব ঘটনাস্থল বিশেষ করে মুনিখের শ্রমিক-অধ্যুষিত পাড়া বারবার তাঁর ছবিতে দেখা গেছে, কিন্তু সে ঘটনাস্থল মুনিখ না হয়ে অল্প যে কোনো শহর হ'তে পারত। টমাস এলসেসার সমকালীন জর্মন চলচ্চিত্রের সাদা-কালো 'স্বাভাবিকতা' থেকে ফাসবিগারের পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে লিখেছেন যে তিনি 'has discovered for the German cinema the importance of being artificial in order to appear realistic'. দৃশ্যসজ্জা ও সংলাপ উভয়তই একটা স্টাইলাইজেশন ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে বা পরে Effi Briest ( ১৯৭৪ ) বা Petra Von Kant ছবিতে প্রায় অপেরাধর্মী হয়ে ওঠে। এখানে অরণ করা যেতে পারে যে, ফাসবিগার ইতালির লুচিনো ভিসকন্তিকে চলচ্চিত্রকার হিসেবে প্রায় সকলের ওপরে স্থান দিয়েছেন এবং বলেছেন : 'The Damned is perhaps the greatest film, the film that I think means as much to the history of film as Shakespeare does to the theatre.' ভিসকন্তির পরিচয় স্টাইলাইজেশনের প্রধান পুরোহিত হিসেবে এবং The Damned ছবির ভিত্তি বাস্তবতা ও স্টাইলাইজেশনের সমন্বয়— যা পরে ফাসবিগার সফলভাবে বহু ছবিতে প্রয়োগ করেছেন। এর আর একটি প্রমাণ তাঁর সংলাপ। সমালোচকরা বলেছেন যে, ফাসবিগারের ছবির সংলাপ যে জর্মন ভাষায় রচিত তা একইসঙ্গে গান্ধীর্ষপূর্ণ ও প্রচলিত। এখানেও বলা যায় যে, স্বাভাবিকতা দিয়ে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতো না।

শিল্পীর সৃষ্টিকে তাঁর নিজের জীবন থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব নয়, ফাসবিগারের ক্ষেত্রে তো নয়ই। শিল্পের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক খতিয়ে দেখার জ্ঞান তিনি ১৯৭৭ সালে যে ছবিটি করেন তার নামও Despair। যে স্বগভীর হতাশা ও অসহায়তা তাঁর কুশীলবের নিয়তি, যে দৃষ্টিভঙ্গিকে কোনো কোনো সমালোচক শিল্পীর ছল বলে তির্যক ইঙ্গিত করেছেন, তা যে একটা চালিয়াতি নয় তার প্রমাণ ফাসবিগার রেখেছেন তাঁর নিজের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। ১৯৮২-র ১০ই



ছুন ম্যুনিখ শহরের এক নির্জন ক্ল্যাটে, তাঁর আরও অনেক নিঃসঙ্গ, ভ্রাতা চরিত্রের মতো, তাঁর নিজের শীতল, নিশ্চাপ দেহ আবিষ্কৃত হলো। তাহলে আমরা এথাবৎকাল শিল্পশাস্ত্রীদের যে বাণী শুনে এসেছি যে শিল্প জীবনকে শুদ্ধ করে এবং শিল্পীকে তার দায় থেকে মুক্ত করে একথা সত্য নয়। না হলে ছত্রিশ বছরের অক্লান্তকর্মী ফাসবিণ্ডার তাঁর কিঞ্চিদধিক ত্রিশটি ছবির কল্যাণে অন্ততঃ হতাশা থেকে অব্যাহতি পেয়ে যেতেন।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : টমাস এলসেসার-এর A Cinema of Vicious Circles in Fassbinder ।

অমিত্র বসু

॥ ফিলটার ॥

ফিলটার হলো জিলেটিন, অপটিক্যাল বা সলিড গ্লাস, প্লাস্টিক বা বিশেষ কোনো তরল বেসের ওপর স্থাপিত এক ডাই প্লেট যা দৃশ্যবস্তু থেকে নির্গত বর্ণালীর অংশবিশেষ শোষণ করে নিতে পারে। ক্যামেরা লেন্সের সঙ্গে ফিলটার ব্যবহার করে তাই দৃশ্যবস্তুর রঙ ও টোনের বিস্তার পরিবর্তিত করা সম্ভব। যে কোনো ফিলটার দৃশ্যবস্তু থেকে আগত আলোর পরিমাণকে ছুড়াবে কমিয়ে দেয়— absorption-এর মাধ্যমে নির্বাচিত ভাবে ( যেটা নির্ভর করে কী ধরনের ডাই ব্যবহার করা হয়েছে তার ওপর ) ও সাধারণ ভাবে surface reflection-এর মাধ্যমে। ডাইবিহীন নিরপেক্ষ ফিলটার মোটের ওপর শোষকভাবে নেগেটিভ ফিল্মের ওপর গিয়ে পড়া আলোর পরিমাণ কমিয়ে দেয়। ফিলটারের বেধ নির্ভর করে তার বেস কি দিয়ে তৈরি তার ওপর, এই বেধ জিলেটিন বেসের ক্ষেত্রে ০.১ মি. মি হলে গ্লাস বেসের ক্ষেত্রে ৬ মি. মি পর্যন্ত হতে পারে। বিশেষ প্রয়োজনে কখনো কখনো দুই বা ততোধিক ফিলটারকে একত্র করেও ব্যবহার করা হয়। ফিলটার ফিল্মের ওপর গিয়ে পড়া আলোর পরিমাণ কমিয়ে দেয় বলে তা ব্যবহার করা হলে আনুপাতিক হারে আলোকপাতও বৃদ্ধি করতে হয়। ফিলটারকে ক্যামেরা লেন্সের সঙ্গে ব্যবহার না করে ফিল্ম প্রিন্টার লেন্সের সঙ্গে ব্যবহার করেও ফিলটারের ফল পাওয়া যায়। অনেক সময় স্টুডিও সেটে আলোকসম্পাতের উৎসসমূহের ওপর ফিলটার শীট লাগিয়েও অনুরূপ ফল পাওয়া সম্ভব। যখন ও যেখানে পর্যাপ্ত আলো নিয়ে রাত্ৰিকালে গ্যাটিং করা সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ ফিলটারের সাহায্য নিয়ে দিনের বেলায় গ্যাটিং করে

তাকে রাত্রির দৃশ্য হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়। শব্দ গ্রহণ ও রিপ্ৰোডাকশনযোগ্য সময়ে বিশেষ কম্পাঙ্কের শব্দ ও ধ্বনিকে নির্বাচিত করা ও অল্প কম্পাঙ্কের শব্দ ধ্বনিকে বাতিল করার কাজেও ফিলটারের ব্যবহার ঘটে। ফিলটারের বর্ণ ক্ষমতাকে প্রকাশ করা হয় ফিলটার ফ্যাক্টর-এর সাহায্যে। তা কোনো ফ্রিক সংখ্যা নয়, তা নির্ভর করে ফিলটারের বর্ণ ও বেধের ওপর এবং ফিল্টারের বর্ণ সংবেদন শীলতা, আলোকের বর্ণ ও বস্তুবর্ণের ওপর। সুনির্বাচিত ভাবে ফিলটার ব্যবহার করে প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক রঙের কতদূর পর্যন্ত বিযুক্তকরণ ও শৈল্পিক পরিবর্ধন, এবং অসাধারণ পরিবেশ তৈরি সম্ভব ফারেনহাইট ৪৫১, গেট অব হেল, এ ম্যান অ্যাণ্ড এ ওম্যান, ২০০১—এ স্পেস ওডিসি প্রভৃতি ছবি তার প্রমাণ। বর্তমানে রঙিন নেগেটিভ ফিল্মের মধ্যেও ফিলটার লেয়ার রাখা হচ্ছে। সাদা-কালো বা রঙিন যে কোনো ফিল্মে ফিলটার ব্যবহার করার ৫টি মূল কারণ থাকতে পারে :

১. ফিল্মের অশুদ্ধ বর্ণসংবেদনশীলতা সংশোধন করা
২. বিশেষ বিশেষ বর্ণকে প্রয়োজন মতো উজ্জ্বল বা অহুজ্জ্বল করে বস্তুর বর্ণ-উজ্জ্বলের তারতম্য সঠিক-ভাবে ধরে প্রতিচ্ছবিতে স্বাভাবিক বর্ণসমতা আনা বা বিশেষ প্রভাব সৃষ্টির জন্য বর্ণদ্বন্দ্বের সৃষ্টি করা
৩. আলোর বর্ণ তাপমাত্রাকে পরিবর্তিত করা
৪. একটি মাত্র বর্ণের আলোর সাহায্যে চিত্রগ্রহণ ও
৫. সমাবর্তিত আলোয় চিত্রগ্রহণ বা ছবিকে সমাবর্তিত আলোর প্রভাব থেকে মুক্ত করা।

### ডবলিউ. এইচ. গ্রাইস

॥ সাদা কালো ও রঙিন নেগেটিভ ফিল্ম ॥

ফটোগ্রাফিতে আলোর রাসায়নিক প্রভাবের ফলস্বরূপ ফিল্ম। যাতে চলচ্চিত্রের ছবি তোলা হয় অর্থাৎ নেগেটিভ ফিল্ম তা দু ধরনের হয়ে থাকে, সাদা কালো ও রঙিন। স্বভাবতই রঙিন নেগেটিভ ফিল্মের গঠনপ্রণালী সাদা কালো ফিল্মের তুলনায় অনেক জটিল। নেগেটিভ ফিল্মের যে অংশটির উপর দৃশ্যবস্তুর লীন প্রতিবিম্ব ধরা পড়ে তার নাম ইমালশন, ফিল্মের সবচেয়ে মূল্যবান ও সংবেদনশীল অংশ। ফটোগ্রাফিক ইমালশন গঠিত হয় জিলেটিনে ও কেলাসাকার সিলভার হ্যালাইডে। প্রাকৃতিক প্রোটিন গ্রুপের বস্তু জিলেটিন কোনো সুনির্দিষ্ট রাসায়নিক যৌগ নয়, এর মধ্যে বিভিন্ন আণবিক ওজনের বিবিধ অণু ও নানা ধরনের অ্যামিনো-অ্যাসিড দ্রব্য থাকে। এর দ্রবণ উত্তপ্ত অবস্থায় নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় জেলির আকার নেয় ও তার আসক্তন শক্তির ফলে ইমালশনের অন্তর্গত সিলভার

লষণের কেলাসগুলিকে ঠিকমতো ধারণ করে রাখতে পারে। নেগেটিভ ইমালশনের পিলভার হ্যালাইড হলো মূলত সিলভার ব্রোমাইড ও অল্প পরিমাণে সিলভার আয়োডাইড। তা তৈরি হয় এইভাবে :  $AgNO_3 + KBr = AgBr + KNO_3$  ইমালশনের কেলাসগুলি গঠনাকার ও আয়তনে বিভিন্ন প্রকার হতে পারে ও তারই ওপর নির্ভর করে ইমালশনের সংবেদনশীলতা ও তীক্ষ্ণতা। প্রোটিন গ্রুপের বন্ধ জিলেটিন শুধু যে কেলাসগুলিকে নেগেটিভ ফিল্মের ভূমি (base)-এর সঙ্গে ধরে রাখে তাই নয় কেলাসের গঠন ও আয়তনকেও নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। সাদা কালো নেগেটিভ ফিল্মের উৎপাদনে নিম্নলিখিত চারটি পর্যায় রয়েছে—

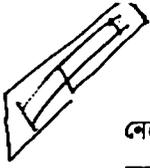
### ১. BASE CASTING

সাদা কালো নেগেটিভের সবচেয়ে তলায় থাকে antihalation layer, ফিল্ম যাতে কুঁচকে না যায় অথবা ফিল্মের ওপর পড়া আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে আলোকবস্তুর সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য এই স্তর, তার ওপর ফিল্ম বেস, তার ওপর ইমালশন। ফিল্ম বেসের কয়েকটি ন্যূনতম বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন, যেমন, তা স্বচ্ছ হবে, দৃক্বেজ্ঞানগতভাবে homogenous হবে ও বর্ণহীন কিন্তু দৃশ্যমানভাবে নিখুঁত হবে। তাকে হতে হবে strong tough hard, tear resistant ও dimensionally stable এবং অত্যন্ত সংবেদনশীল ইমালশনের প্রতি নিরাসক্ত, ফটোগ্রাফিক রাসায়নিক কর্তৃক অপ্রভাবিত ও আর্দ্রতা প্রতিরোধী। এই পটভূমিতে বেস কাঙ্ক্ষিতের কাজ করা হয় এইভাবে—

(ক) Cellulose triacetate is to be dissolved into a mixture of volatile solvents and will be continuously cast with the help of 6 continuous Solvent Casting Machines into films of different thicknesses. (খ) এই thickness বা বেধ  $\cdot 0.10$  মিমি থেকে  $\cdot 2.00$  মিমি পর্যন্ত হতে পারে। ফিল্মের ধরন অনুযায়ী তার ভূমির বেধ নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এই ফিল্মের নাম সেফটি বেস ফিল্ম যা বিভিন্ন যান্ত্রিক ধর্মের প্রতি রিয়্যাক্ট করে থাকে (গ) একটি বিশেষ sub-strating পদ্ধতিতে এই সেফটি বেস ফিল্মকে ইমালশনের সঙ্গে perfect adhesion এর জন্ম প্রস্তুত করে রাখা হয় (ঘ) এই ফিল্ম বেস পরবর্তী প্রয়োজনে আসে তৃতীয় পর্যায়ে।

### ২. EMULSION PREPARATION

আগেই বলেছি ইমালশন হলো নেগেটিভ ফিল্মের light sensitive layer-এর মূল উপাদান। নেগেটিভ ফিল্মের মূল অংশ, যে অংশে দৃশ্যবস্তুর ছবি ওঠে।



নেগেটিভ ফিল্মের প্রকারভেদ অনুসারে ইমালশনের উপাদান, সংবেদনশীলতা ও অন্যান্য ধর্ম পরিবর্তন ঘটে। ইমালশনের ধরনের উপর নির্ভর করে ছবি তোলা সময়ের আলোকরীতি, ক্যামেরার ফিলটারের নির্বাচন ও এক্সপোজ করা ছবির প্রসেসিং। ইমালশন তৈরি করা হয় এইভাবে—

(1) A Silver Nitrate Solution of controlled conditions in jacketed and stainless chambers will be added to a solution of alkali halides and gelatin. (2) The photo-sensitive silver halide emulsion will be separately prepared in the emulsion department under strictly controlled conditions. (3) Stirring of this solution will result to the precipitation of the silver halide crystals of required shapes and sizes. (4) Next this emulsion will be chilled rapidly so that excess halide and soluble salts are removed. (5) To obtain the necessary speed and contrast, this emulsion is to be digested under controlled conditions and in the presence of various sensitizers.

[ বাংলা প্রতিশব্দ নেই বলে এই অংশটি ইংরেজিতে রাখা হলো ]

ইমালশনের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলী এবং ব্যবহৃত ভূমির প্রকৃতি অনুসারে নির্ধারিত হয়ে থাকে ফিল্মের দ্রুতি, বর্ণ সংবেদনশীলতা, বৈষম্য ও ক্রমাগত, কণাময়তা, বিস্মিষ্ট করার ক্ষমতা এবং পরিস্ফুটন গুণাবলী। এই ইমালশনকে এরপর ফিল্ম বেসের সঙ্গে সংলগ্ন করা হবে।

### ৩. COATING ON SUBSTRATED FILM

(ক) চূড়ান্ত ও সেন্জিটাইজড ইমালশনকে সাব-স্ট্রেটেড ফিল্ম বেসের ওপর coat করার আগে ইমালশনকে অতিরিক্ত নিরাপত্তা দেবার উদ্দেশ্যে বিশুদ্ধ জিলেটিনের একটা টপকেট ব্যবহার করা এবং বিভিন্ন স্টেবিলাইজার ও হার্ডেনারের সাহায্য নেওয়া হয় (খ) ফিল্ম বেসের ওপর তারপর এই চূড়ান্ত ও সংবেদনশীল ইমালশনের ( $\geq ৫০$  ইঞ্চি)  $\times$  ( $\leq ৩০০০$  ফুট), এই মাপে কোটিং লাগানো হয়। এই কোটিংয়ের বেধ ও ইউনিকর্মিটি সূক্ষ্মতম ভাবে নিখুঁত হওয়া চাই। কেননা তার ওপরই নির্ভর করে নেগেটিভ ফিল্মের গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যের অনেকটা। ইমালশনের কনসেন্শন ও সালিনতা ও কোটিংয়ের গতি বেধকে ও ইউনিকর্মিটিকে নিয়ন্ত্রিত করে (গ) This final coating for sensitivity and contrast is to be

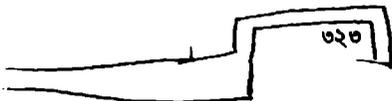
001 by chilled air and dried by warm air before winding up.

এই সমগ্র কার্যক্রমটি সম্পূর্ণ অন্ধকারে অথবা নিরাপদ আলোকের সাহায্যে করা হয়ে থাকে।

## II. FINAL CONVERSION

এই কোটেড নেগেটিভ ফিল্মকে সবশেষে slit, cut, perforated, wound-up & spooled করে প্যাকেটে পুরে বাজারে ছাড়া হয়।

রঙিন নেগেটিভ ফিল্মের গঠনপ্রণালী জানার আগে রঙিন আলোকচিত্রের পৃথকবিজ্ঞানগত তত্ত্ব বিষয়ে কিছু জানা প্রয়োজন। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত রঙকেই তিনটি বর্ণ লাল সবুজ ও নীলের উপযুক্ত মিশ্রণ থেকে পাওয়া যেতে পারে। দৃশ্য-ছবিগ্রহণ অল্পসারে রঙের ক্ষেত্রে তাই লাল সবুজ ও নীলকে বলা হয় মুখ্য বা প্রাথমিক রঙ। ম্যাগ্নাওয়ালের এই ত্রিবর্ণতত্ত্বই রঙিন ফিল্ম তৈরির মূল ভিত্তি এবং আধুনিককালে রঙিন আলোকচিত্র ও চলচ্চিত্রের ব্যাপক প্রসারের কারণ। একটা yellow filter লাল ও সবুজ বর্ণের আলোকে সঞ্চারিত করে দেয় ও নীল বর্ণ আলোকে শোষণ করে নেয়, যার অর্থ হনুদ হলো নীলবিহীন, বর্ণালীতে যে কটি রঙ থাকে নীল ছাড়া তার সমস্তই হনুদে রয়েছে। সাদা তেমনি বর্ণালীর সব কটি রঙের সমন্বয়। আধুনিক রঙিন নেগেটিভ ফিল্মের (মাণ্ডিলেয়ার ফিল্ম, ট্রাইপ্যাক, মনোপ্যাক প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত) প্রচলনের আগে রঙিন আলোকচিত্রের নেগেটিভ কীরকম ছিল তার জ্ঞান টেকনিকালার দ্রষ্টব্য। মাণ্ডিলেয়ার ফিল্মেই প্রথম একই নেগেটিভে লাল সবুজ ও নীল তিনটি বর্ণের প্রতিটির প্রতি সংবেদনশীল একটি করে ইমালশন লেয়ার অন্তর্ভুক্ত করে নেগেটিভকে রঙিন আলোকচিত্রের জ্ঞান স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হলো। এই নেগেটিভের সবচেয়ে তলায় থাকে unihalation layer, তার ওপর ফিল্ম বেস, তার ওপর light sensitive, red-recording ইমালশন লেয়ার, তার ওপর জিলেটিনের একটি স্ক্রিম লেয়ার, তার ওপর green-recording বা green sensitive ইমালশন, তার ওপর নীল রঙকে শোষণ করে নেয় এমন এক yellow filter, এবং সবার ওপরে blue sensitive ইমালশন। ফটোগ্রাফিক ইমালশন প্রাথমিক ভাবে ব্লু সেন্সিটিভ বলে রঙিন নেগেটিভের সবচেয়ে ওপরেই blue-recording ইমালশনের লেয়ারটি রাখা হয়। ফিল্ম বেসের অংশটুকু বাদ দিয়ে রঙিন নেগেটিভ ফিল্মের বেধ সাধারণত ০.০১ ইঞ্চি হয়ে থাকে। তার মধ্যে ইমালশন লেয়ারগুলির বেধ ০.০০২ থেকে ০.০০৫ ইঞ্চি করে, প্রত্যেক দুটি ইমালশন স্তরকে পৃথক করে রেখেছে মধ্যবর্তী যে



বই সংখ্যা-----

জিলেটিন লেয়ার বা ফিলটার তার বেধ \*০০০১ ও \*০০০২ ইঞ্চি হয়ে থাকে। প্রতিটি ইমালশন দৃশ্যবস্তুর একটি নির্দিষ্ট spectral region এর লীন প্রতিবেশ গ্রহণ করে ও তিনটি পৃথক প্রতিবেশের সমন্বয়ে ও সংলগ্নতায় দৃশ্যবস্তুর চূড়ান্ত রঙিন প্রতিক্রমণ পায়। এর জন্ম ইমালশনের বিশেষ কিছু ভৌত, রাসায়নিক ও ফটো গ্রাফিক বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। মধ্যবর্তী লেয়ার দুটিকে সবচেয়ে কার্যকারী ম সক্রিয় করার জন্ম ফিলটার ডাই ও সিলভার স্পটও ব্যবহার করা হয়। আজ অনেক বহুজাতিক সংস্থা রঙিন নেগেটিভ ফিল্ম তৈরি করছেন যেমন, ইস্টম্যান কোডাক, 3M, আগকা, ইলফোর্ড, ফুজি, এক এক সংস্থার ফিল্মের রঙের টোন ও মুড়ের এক এক রকম বৈশিষ্ট্য। কোন্ ভৌগোলিক অঞ্চলে ও জলবায়ুতে ব্যবহার করা হবে সেই অনুসারেও ফিল্মের বৈশিষ্ট্যের তারতম্য করা হয়ে থাকে। তা আমাদের আলোচনার বাইরে।

ইমালশনের প্রধান গুণ দ্রুতি হলো ইমালশনের আলোকসংবেদনশীলতার মানের এক প্রকার প্রকাশ। সিনেমায় যেসব ফিল্ম ব্যবহার করা হয়, দ্রুতি অনুযায়ী সেগুলিকে ধীর দ্রুতি, স্বাভাবিক দ্রুতি, উচ্চ দ্রুতি প্রভৃতি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। রঙিন আলোকচিত্রের সংবেদনশীলতা আরো বাড়ানোর জন্ম ইমালশনের তিনটি লেয়ারের জায়গায় চারটি লেয়ার ব্যবহার করা যায় কিনা তাই নিয়েও এখন গবেষণা চলছে। আলোর ত্রিবর্ণত্বের বদলে নতুন ত্বেরও প্রস্তাব করা হয়েছে, করেছেন এডউইন ল্যাণ্ড। (ড্র. ডিউপ, পজিটিভ ফিল্ম, রিভার্গ্যাল ফিল্ম)

টি. ল্যালি

॥ পজিটিভ ফিল্ম ॥

আলোকসংবেদনশীল ইমালশনে আলোকপাত করলে সিলভার হ্যালাইড দানাগুলি (ড্র. নেগেটিভ ফিল্ম) ডেঙে গিয়ে কালো বর্ণের ধাতব সিলভারের পরমাণু সৃষ্টি করে যাকে রাসায়নিকের সাহায্যে বহুগুণ সম্প্রসারণ করা হয়। আসলে আলোকপাতের ফলে সিলভার হ্যালাইড যে অদৃশ্য প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করে, রাসায়নিকের সাহায্যে তাকে কালো ধাতব সিলভারে পরিণত করে দৃশ্যমান করা হয় এবং অনালোকিত অংশ সাদা থেকে যায়, ফলে আমরা নেগেটিভ পাই। এষ্ট নেগেটিভের মধ্য দিয়ে আলো ফেলে আমরা সিলভার হ্যালাইড মাথানো ফিখো পজিটিভ প্রিন্ট পেতে পারি। আলো যাতে সঞ্চারিত হতে পারে তার জন্ম ফিখো

মুঁমি—যার ওপর ইমালশন লাগানো থাকে—স্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন। ক্যামেরার সাহায্যে আলোকপাতের ফলে ফিল্মের ওপর ও নেগেটিভের মধ্য দিয়ে আলোকপাতের সাহায্যে প্রিন্টের জন্ত যে প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় তা অদৃশ্য ও অস্থায়ী। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে ঐ লীন প্রতিচ্ছবিকে ফুটিয়ে তুলে স্থায়িত্ব দিতে হয়। একে বলা হয় পরিস্ফুটন। পরিস্ফুটিত ফিল্মে যে প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে তা মূল বস্তুর বিপরীত অর্থাৎ এতে উজ্জ্বল আলোকিত অংশ কালো ও অনালোকিত অন্ধকার অংশ সাদা দেখায়। বস্তুর সঠিক প্রতিচ্ছবির জন্তই নেগেটিভ থেকে মুদ্রণ করে পজিটিভ পেতে হয়। পজিটিভ প্রিন্ট করা হয় যে ফিল্মের ওপর তার প্রধান উপকরণ সেলুলোজ ট্রাইঅ্যাসিটেট বা সিনথেটিক পলিমার (সম্প্রতি নেগেটিভ ফিল্মে মধ্যম হিসাবেও কৃত্রিম পলিমার—জিলেটিনের বদলে—ব্যবহার করা হচ্ছে)।

পজিটিভ প্রিন্টের জন্ত যে ফিল্ম তার গঠন মোটের ওপর নেগেটিভ ফিল্মের মতোই, শুধু সংবেদনশীলতা কিছু কম ও হ্যালাইড দানাগুলি আকারে অধিকতর ছোট ও সূক্ষ্ম। এই ফিল্মে যে ইমালশন লাগানো হয় তা সাধারণত ব্রোমাইড বা ক্লোরো-ব্রোমাইড ইমালশন হয়ে থাকে। নেগেটিভ বা পজিটিভ যে কোনো ফিল্মের ক্ষেত্রেই মাত্র এক বর্গসেন্টিমিটার স্থানে লক্ষ লক্ষ হ্যালাইড দানা থাকে। পজিটিভ ফিল্মে ফিল্মের ধরন অনুসারে ইমালশনের স্তরের বেধ হয় ১০ থেকে ১৫ মাইক্রন। রঙিন নেগেটিভ মুদ্রণের মূল পদ্ধতি সাদা-কালো নেগেটিভ মুদ্রণের মতোই। তবে রঙিন নেগেটিভ যত নিখুঁতই হোক না কেন, নেগেটিভ থেকে পরাসরি মুদ্রণ করলে সঠিক রঙ পাওয়া যায় না। সেজন্ত মুদ্রণের সময় রঙিন ফিল্টার ব্যবহার করে পজিটিভ প্রিন্টের বর্ণবিচ্ছাসে সমতা আনার প্রয়োজন হয়। রঙিন নেগেটিভ দুটি পদ্ধতিতে মুদ্রণ করা যায়—যুত পদ্ধতি ও বিযুত পদ্ধতি। রঙিন পজিটিভ ফিল্মের কোনো গ্রেড-ভেদ নেই।

টি. ল্যাঙ্গি

॥ ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ফিল্ম আর্কাইভস ॥

লণ্ডন, নিউইয়র্ক ও প্যারিসের তিনটি প্রারম্ভিক ফিল্ম আর্কাইভ (ড্র. আর্কাইভে ছবি সংরক্ষণ) ১৯৩৮য় বার্লিনের অহরূপ চলচ্চিত্র-সংগ্রহ কেন্দ্র এবং মস্কোর ফিল্ম স্কুলের চলচ্চিত্রাগারকে সঙ্গে নিয়ে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ফিল্ম আর্কাইভস গঠন করে, যার প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয় প্যারিসে। এই সংস্থা পৃথিবীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল চলচ্চিত্র সংরক্ষণের কাজে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

ও সমরয় তৈরি এবং সংস্থার সদস্যদের মধ্যে চলচ্চিত্রের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ও চিত্রবিনিময়ের প্রচলন করা। ১৯৭৫ সনে প্রায় ৪৫টি জাতির ফিল্ম আর্কাইভ এর সদস্য ছিল। অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিতা ও বৃহত্তম আর্কাইভ প্যারিসের সিনেমাথেক ফ্রাঁসাইজ এই সংস্থার সদস্যপদ ছেড়ে দেওয়ায় প্রধান কার্যালয় তখন ব্রাসেলসে স্থানান্তরিত হয়। তৎকালীন সদস্যদের মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়ায় জাতীয় আর্কাইভ ছিল বৃহত্তম। চলচ্চিত্র নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে ও চলচ্চিত্রের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও এই সংস্থার বিশেষ ভূমিকা আছে।

## ॥ ফিল্ম নয়ার ॥

চল্লিশের দশকে ও পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধে হলিউডে অপরাধ, দুর্নীতি ও রহস্যের গোপন জগৎ নিয়ে এক ধরনের ছবি তৈরি হতো যা ভারী আবহাওয়া, অবসন্ন মনোভাব, ধূসর স্বর ও অন্ধকার হতাশায় আচ্ছন্ন। এই ধরনের ছবির ফরাসি সমালোচকরা ফিল্ম নয়ার নামে অভিহিত করতেন। যদিও বলা হয়েছে, ফরাসি অত্যন্ত তরু ফিল্ম নয়ারের প্রতি যথেষ্ট সন্নিহিত করেনি। এই প্রকার ছবির তির্যক অ্যাকশন ও সিন্ধু ছায়াচ্ছন্ন ঘটনা যা সাধারণত রাজকালীন দৃশ্য বিশেষে গাঢ় ছায়ায় তায় চিত্রিত, তার আদি উৎস জর্মন এক্সপ্রেসনিজসের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। জন হাসটনের *The Maltese Falcon*, হাওয়ার্ড হকসের *টু হ্যাভ অ্যাগ হ্যাভ নট*, হিচককের *স্পেলবাইউ* ও *ওয়ালসের দি লেডি ফ্রম সাংহাই*, বিলি ওয়াইল্ডারের *Double Indemnity* প্রভৃতি ফিল্ম নয়ারের প্রাসঙ্গিক উদাহরণ। এ ছাড়া অটো প্রেমিংগার, জর্জ কুকার, ফ্রিৎস ল্যাং, এলিয়া কাজান, নিকোলাস রে ও জিরেম্যানের কিছু কিছু ছবিও এই ধারার অন্তর্ভুক্ত। এই প্রসঙ্গে রেনোয়ার দুটি ছবির ল্যাং-কর্তৃক পুনর্নির্মাণের কথা উল্লেখ করতে হয়—স্কারলেট স্ট্রিট ও হিউম্যান ডিজায়ার। ফরাসি নিউ ওয়েভের একাধিক ছবিতে, বিশেষত মেলভিলের ছবিতে ফিল্ম নয়ারের স্বাদ কিছুটা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে ফরাসি ফিল্ম নয়ার ও মার্কিন ফিল্ম নয়ারের মধ্যে তুলনা মনোগ্রাহী হতে পারে। তারপর বহু বছর পরে কোনো কোনো ছবিতে হঠাৎ এর স্পর্শ পাওয়া গেছে, যেমন পোলানস্কির চায়নাটাউনে। এই ধারার ছবিতে সমাজ ও জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানুষ, প্রকৃতি ও সমাজের সম্পর্ক সম্বন্ধে চিন্তাধারায় নেতিবাচকতা লক্ষ্য করা যায়। এইসব ছবির নায়করা প্রায়ই নিজের চেয়ে অনেক বড়ো এক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল—যে-সংগ্রামে তার পরাজয় প্রায় নিশ্চিত।

## ॥ ফিল্ম স্কুল ও সোসাইটি ॥

প্রথম ফিল্ম স্কুল স্থাপিত হয়েছিল মস্কোয় ১৯১৯য়ে। প্রথম ফিল্ম সোসাইটি লন্ডনে ১৯২৫য়ে। ফিল্ম স্কুলের উদ্দেশ্য শিল্পদক্ষত ও নতুন ধরনের ছবি করার জ্ঞান আগ্রহী ব্যক্তিদের শিক্ষাদান, ফিল্ম সোসাইটির উদ্দেশ্য এই প্রকার ছবিতে উৎসাহিত করার জ্ঞান দর্শকদের তৈরি করা। ফলে বিভিন্ন দেশে ফিল্ম স্কুল ও সোসাইটি উভয়েই প্রথম দিকে ব্যবসায়িক চলচ্চিত্র জগৎ থেকে বাধা ও বিরোধিতা পেয়েছে। তা সত্ত্বেও বহু অভিজ্ঞ চিত্রপরিচালক ও সমালোচক ধারা নতুন ধরনের ছবির আন্দোলনে বিশ্বাসী, ক্রমে ফিল্ম সোসাইটি ও স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, সহযোগিতা করেছেন নানাভাবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই ফ্রান্স, জার্মানি ও ইতালিতে জাতীয় ফিল্ম স্কুল স্থাপিত হয়েছে। যুদ্ধের পর বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশে চলচ্চিত্র শিল্পের জাতীয়করণের ফলে জাতীয় ফিল্ম স্কুলের প্রতিষ্ঠা ও স্বস্থ চলচ্চিত্র অনুশীলনের প্রয়োজনে ফিল্ম সোসাইটির প্রসার সহজ হয়েছে। ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে সুইডেনের ফিল্ম স্কুল এখন প্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষে এই প্রকার স্কুল স্থাপিত হয়েছে পুনে-তে। বিভিন্ন স্কুলের পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য, পদ্ধতি, সুযোগ-সুবিধা, স্বজনশীলতা ও অভিজ্ঞতার ওপর গুরুত্ব আরোপের অনুল্পাত ইত্যাদি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন। বিভিন্ন দেশের ফিল্ম সোসাইটিরও উদ্দেশ্য, কর্মসূচি, সদস্যদের উচ্চ সুযোগসুবিধা বিভিন্ন রকম। সোসাইটি শুধু ছবি দেখানো নয়, ছবি নিয়ে আলোচনা, পত্রিকা প্রকাশ, বিশেষ কোনো ছবির প্রযোজনা বা পরিবেশনা প্রস্তুতিও করে থাকে। ফিল্ম সোসাইটি প্রদর্শনের জ্ঞান ছবি সংগ্রহ করে জাতীয় ফিল্ম আর্কাইভ ও বিদেশি দূতাবাস থেকে। বিভিন্ন দেশের ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজের আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসেবে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ স্থাপিত হয়েছে। এর বর্তমান সভাপতি ভারতবর্ষের যুগল সেন। ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন দেশে স্বস্থ সংস্কৃতির প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : J. Weiner-এর How to Organize and Run a Film Society ।

## ॥ গণশার ফিশার ॥

( জন্ম ১৯১০, সুইডেন )। সুইডিশ সিনেমায় সহকারী চিত্রগ্রাহক রূপে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। পরে আলোকচিত্র-পরিচালক হিসেবে বার্ম্যানের ছবিতে কাজ করে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি পান। অন্যান্য পরিচালকের ছবিতেও তিনি

কাজ করেছেন। তাঁর হাতে ইনডোর কম্পোজিশনের টোনালিটি এবং আউটডোর কম্পোজিশনের টেক্সচার অসাধারণ শৈল্পিক ও নান্দনিক সুষমা পেয়েছে। বিশেষণ বার্গম্যানের পোর্ট অব কল, আইলস অব এ সামার নাইট, দি সেভেনথ সীপ, ওয়াইন্ড স্ট্রবেরীজ, দি ম্যাজিসিয়ান এবং দি ডেভিল'স আই ছবিতে তাঁর শাদা কালো আলোকচিত্রে টোন ও টেক্সচারের সুষমা, ভারসাম্য ও বিহ্বাস এবং কম্পোজিশনের গভীরতা, আয়তন ও অন্তর্দৃষ্টিবিশিষ্টতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বার্গম্যানের ছবির পরবর্তী আলোকচিত্র-পরিচালক নিকভিস্টের কাজের সঙ্গে তাঁর কাজের মেজাজ ও স্বাদের পার্থক্য লক্ষণীয়। **Two People**, প্লেজার গার্ডেন, ৪৯১, মেড ইন সুইডেন, ডন জুয়ান প্রতৃতি ছবিতে ও দি টাচয়ের অংশবিশেষেও ফিশার-এর কাজ উল্লেখ্য। কিশোর-গ্রন্থ অলংকরণে তাঁর বিশেষ দক্ষতা আছে যদিও চিত্রগ্রহণে ওই অলংকরণ প্রবণতার কোনো ছাপ পড়েনি। তাঁর আলোকচিত্রশৈলী গভীর, গস্তীর, ধ্রুপদী, তবু উইটি। তাঁর ছেলেও আলোকচিত্র-পরিচালক হিসেবে খ্যাতি পেয়েছেন।

॥ ফেদেরিকো ফেলিনি ॥

( ১৯২০-৯৩, ইতালি )। 'ছেলেবেলায় পুতুল বানাতাম, বানিয়ে নিজে নিজেই পুতুল নাচ দেখতাম। এখন সে কথা ভাবলে মনে হয় আমার কল্পনা কারিগরি নৈপুণ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। আমার আর একটা প্রিয় অভ্যাস ছিল বাথরুমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিজেকে দেখা। অবিশ্বাস্তভাবে নিজেকে সাজাতাম, রঙচঙ পাউডারে। তারপর সার্কাসে ঢুকে সার্কাস থেকে আমার পালানোর গল্প বহুবার বলেছি। আরো পরে স্কুলে ক্যারিকেচার গল্প ও কার্টুনসহ পত্রিকা বের করি। একমাত্র পেশা যা আমি গ্রহণ করতে পারতাম তা হচ্ছে অভিনয়। তারপর অবশ্য আমাকে অনেক কিছু লিখতে হয়েছে, রেডিও প্রোগ্রাম, সংবাদপত্রের জন্ম প্রবন্ধ, সেখানে আমার আঁকা ছবিও ছাপা হতো। কিন্তু কখনোই নিজেকে চিত্রশিল্পী ভাবিনি।'

'ভেবেছিলাম চলচ্চিত্রও আমার জন্ম নয়। আমার মধ্যে সামঞ্জস্য, ডিটেলের প্রতি মনোযোগের ক্ষমতা, অবিশ্বাস নিজেকে ক্ষয় করার শক্তি, এসবের অভাব ছিল। সবচেয়ে বেশি অভাব ছিল কর্তৃত্বের। শিশুর মতো আমি ছিলাম নিরীহ, নিঃসঙ্গ, অত্যন্ত ভাবপ্রবণ এবং আজ পর্যন্ত আমি লাছুকই থেকে গেছি। ছবির পরিচালককে হতে হয় জাহাজের ক্যাপ্টেনের মতো। তা আমি হব কী করে? একটা অস্পষ্ট দ্বিধাগ্রস্ত সময় থেকে মুক্ত করে রোজেলিনি আমাকে চলচ্চিত্রের

শ্রাবনে আনলেন, তাঁর 'ওপেন সিটি'র চিত্রনাট্য লেখালেন আমাকে দিয়ে। তাঁর মধ্যে আদি পিতার কিংবা আদমের মতো পিতৃষ্ণের সন্ধান পেয়েছিলাম। পেয়ে-ছিলাম নানাবিধ সমস্যা থেকে উদ্ধারের গোপন কৌশলগুলি।'

'ভ্যারাইটি লাইটস ও দি হোয়াইট শেখ ( ৫২ ) দুটোই আমার প্রথম ছবি তবে ভিন্ন অর্থে। প্রথমটি আমারই চিন্তার ফসল, অনুভব করতাম আমার নিজস্ব ছবি। কিন্তু বাঁশি হাতে ল্যাচুয়াদা-ই পরিচালনা দিতেন, আমি তাঁর পাশে দায়িত্বহীনতার প্রশান্তিতে ডুব দিয়ে বসে থাকতাম কেবল। দ্বিতীয়টার ব্যাপার একটু অদ্ভুত। প্রথমে এটা পরিচালনা করার কথা ছিল আন্তনিওনির, কিন্তু আমার ও পিনেলির চিত্রনাট্য তাঁর পছন্দ হয়নি। ফলে আমাকে ছবিটার দায়িত্ব নিতে বাধ্য হতে হলো। এখন মনে পড়ছে ঠিক কোন সময়ে আমি অনুভব করলাম পরিচালক হতে পারব, সেটা হচ্ছে দি হোয়াইট শেখ-য়ের শুটিং-য়ের প্রথম দিন। একটা রহস্যময় প্রেরণা আমাকে শেষপর্যন্ত সিনেমায় নিয়ে এল। আজও ছবি শেষ করার পর নিজেই আশ্চর্য হয়ে যাই, কী করে এত সক্রিয় হতে পারলাম, এত লোককে দিয়ে কাজ করলাম।'

'গল্প বলার পদ্ধতি নয়, ছবিতে আমার আগ্রহ ছিল কেবল গল্পাংশে। এমনকি পরেও আমি সিনেমার ক্লাসিক সম্বন্ধে কিছু জানি না। স্বীকার করতে লজ্জা হলেও জানিয়ে রাখা ভালো যে মুরনাউ, ড্রেয়ার কিংবা আইজেনস্টাইনের কোনো ছবি দেখিনি। নিজের ছবিও পারতপক্ষে হলে গিয়ে দেখিনি। সব সময়েই এক ধরনের নির্মোহতা আমাকে গ্রাস করে থাকে। একটা ছবি আমার দিক থেকে তৈরি করা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তাই করেছিলাম। সেটা দর্শকরা নিল কি নিল না তা আমাকে স্পর্শ করে না। এ কিন্তু সংবেদনহীনতা নয়, আমি জীবনের সব কিছুকেই ভালোবাসি, যৌক্তিক-অযৌক্তিক, সুন্দর-কুৎসিৎ, সং-অসং নির্বিশেষে। আমি সব জিনিসের দুটো দিকই দেখানোর পক্ষপাতী।'

এই প্রেরণা ও পরিশ্রম, প্রসঙ্গ ও পদ্ধতি, বাস্তব ও রহস্য-এর ঘন ও সঙ্কীর্ণ ও সমাস দিয়ে ফেলিনিকে বিচার করা যাবে। প্রসঙ্গ বিষয়ে প্রথমেই মনে পড়ে তাঁর ছবির কনফেশ্‌নাল প্রবণতা ও আত্মজৈবনিক উপাদান। একদা আহত শিক্ষা ও সংস্কার ও পরে তার সঙ্গে নিরন্তর মানসিক ও নৈতিক সংঘাত, বহু ছবিতেই এই থিম প্রবলভাবে উপস্থিত। লৌকিক প্রসঙ্গের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক / ক্যাথলিক বিশ্বাস / অবিশ্বাস-য়ে ও আপন প্রতিসত্তার সঙ্গে অনিবার্য সংগ্রামে ও বোঝাপড়ায় ঝগত তিনি বাগ্ম্যানের কিছুটা কাছাকাছি, ষাঁর সঙ্গে নৈকট্য নিজেই অনুভব

করেন তিনি। তাঁর প্রতি বার্গম্যানও দ্বিধাহীনভাবে শ্রদ্ধাশীল। প্রথাগত পরিবেশনা, গঠনগত সংযম ও ঋপদী শৌন্দর্যের বদলে ফেলিনির ছবির অভিশ্রুতি এক নিবিড় আবেশগত অভিজ্ঞতার, এক নিজস্ব ব্যক্তিগত চেতনায়। তাঁর পদ্ধতির বা পদ্ধতিহীনতার মধ্যে বেশ কিছু নিজস্ব সঙ্গতি ও রিচুয়াল আছে যা তাঁর শিল্প-নীতির অঙ্গীভূত। এই শিল্পনীতিতে কম বিশ্লেষণ ও বেশি মুগ্ধতার প্রবণতার দরুন তাঁর পদ্ধতিতে এক এলোমেলো ভাব চুকে যায়। যারা তাঁর শিল্পমেজাজের কাছাকাছি তাঁরা ওই আঙ্গিককে বলিষ্ঠ ও কল্পনাসমৃদ্ধ, আর যারা কাছাকাছি নন তাঁরা অতিক্রমিত বলে উল্লেখ করেন। একদিকে 'এদিকে তাকাও', 'এটাকে জরুরি ভাব', তাঁর জুম্ব বা প্যান এই রকম নির্দেশ সম্বন্ধে এড়িয়ে যায়, অল্পদিকে মীথ বা ফ্যান্টাসির খররেখা টেনে তিনি ঘটনাকে জরুরি করে তুলতে চান। একদিকে তত্ত্বগঠন ও সাধারণীকরণের প্রতি তাঁর অপ্ৰতিহত বিরাগ, অল্পদিকে তিনি ঘটনার মেজাজ ও প্রতিচ্ছাষে জেনারলাইজেশনের শিকার। একদিকে নিও-রিয়ালিজম আবেগ-প্রধান বলে জাভান্তিনির কাছে অনুযোগ করেন, অল্পদিকে নিজের ছবিতে বাঁধা পড়েন আবেগের তাড়নায়। তাঁর ছবির আলোকচিত্রের কম্পোজিশনে যে আলো ঋধারি তা ফেলিনির মানসিক ছায়াঙ্কনতারই প্রকাশ। এটা যে কী তা ছবির চরিত্রগুলিও জানে না। ফলে স্বাভাবিক, ছবির সমাপ্তি নিয়ে তিনি সর্বদাই দ্বিধাগ্রস্ত। তবু তাঁর মধ্যে এক অচেতন পটুত্ব, এক সহজাত দক্ষতা আছেই, স্তম্ভিতভাবেই আছে। যেমন আছে মনোবিশ্লেষণে গভীর উৎসাহ, যেটা তাঁর ভাষায় অ্যানাডির কৌতূহল, তথ্য সংগ্রহের জন্ত অনবিকার আগ্রহ, অস্বস্থদের পক্ষে উপকারী এক প্রক্রিয়া, স্বপ্নের ব্যাখ্যার মতো মজার খেলা।

'লা দোলচে ভিতার ( ৫৯ ) জন্ত দুই তিন এমনকি শতাধিক সমাপ্তি ভেবে-ছিলাম, কিন্তু গ্রহণ করেছি একটা! এবশ্বিধ ইনডিশিশন আমার চাতুরির অঙ্গ নয়, সংস্কারগ্রস্ত কোনো কৌশলও নয়, এটা এক শ্রেণীর সত্য বাস্তব অতলান্ত মোহ যা আমাকে প্রতিবারই জড়িয়ে ধরে। লা স্তাদা ( ৫৪ ), এইট অ্যাগু হাফ ( ৬০ ) আমার সেই মোহের, মীথের জগতের সম্পূর্ণ বিকাশ, আমার সস্তার অসংযমী, অবাধ এবং মারাত্মক প্রতিভাস। তবু এইট অ্যাগু হাফ ছবিতে জীবনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার চেষ্টা আছে, তা হলো নিজের সঙ্গে মেকি-ভদ্রতাহীন সম্পূর্ণ, নির্ভয়, দ্বিধাহীন ও নিঃস্বার্থ যোগসাধন। নানান বাঁধন থেকে প্রতিনিয়ত মুক্ত হতে চাওয়া, যেমন এই ছবির গুইডো চাইছে। হ্যাঁ, আমিই সেই গুইডো।'

'ছবিতে স্টেট/সীন-ডিজাইনারের সঙ্গে সহযোগিতা, বোঝাপড়া, প্রাথমিক রুচির

মিল আমার খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। চিত্রনাট্যের আগেই তার সঙ্গে প্রত্যহ যোগাযোগ রাখি কারণ ছবিটাকে আমি প্রত্যক্ষভাবে দেখে নিতে চাই একবার। প্রারম্ভিক স্তরে তার সঙ্গে যেমন, তেমনি চিত্রগ্রহণকালে ক্যামেরাম্যানের সঙ্গে সম্পর্কটাও আবশ্যিক। যে আমাকে অনুসরণ করে ও কথামত কাজ করে সেই আমার কাছে শ্রেষ্ঠ ক্যামেরাম্যান। আমার ছবিতে ক্যামেরার গতি আমার উদ্দেশ্য-নির্ভর। আমার বিশ্বাস সিকোয়েন্সের ভিতরের ছন্দটি গুটিংয়ের আগেই আমার মনে আসে। স্টাইল নিয়ে আমি ভাবি না, দৃঢ় ভঙ্গিতে একটি ধারণার অভিব্যক্তিই হচ্ছে আমার প্রদর্শিতব্য বস্তু। ক্যামেরার গতির ফলে যদি কোনো দৃশ্যের তাৎপর্য বাড়ে এবং অন্য কিছু আবিষ্কৃত হয়, তাহলে সেইভাবেই আমি ক্যামেরাকে অ্যাডজাস্ট করি। গুটিংয়ের সময় রেকর্ড থেকেই আমার ছবির সংগীত আসে। থিমগুলি বহুদিন ধরে মনের মধ্যে নির্দিষ্ট আবেগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে। কাটিংয়ের পর সংগীতের আসল কাজ আরম্ভ হয়। আমার সমস্ত ছবির সংগীত রচয়িতা নিনো রোটা একজন স্বরপাগল দেবদূতপ্রায় বন্ধু। আর অভিনয়? যেসব অভিনেতা সঞ্জিষ্ট চরিত্র নিয়ে ভাবনা চিন্তা করে, নিজস্ব ধারণা ঝাঁকড়ে থাকতে চায় কিংবা চিত্রনাট্য মুখস্থ করতে যায় তাদের অপছন্দ করি। একমাত্র অসতর্ক অবস্থাতেই তাদের আমি যেভাবে চাই সেভাবে দেখতে পাই। তার সঙ্গে সিন্টিয়েশনের স্বতঃস্ফূর্ত যোগাযোগেই একটি দৃশ্য অর্থবহ হয়ে ওঠে, আমার ছবিতে তাই। অভিনেতাদের মধ্যে আছেন গিউলিয়েটা মাসিনা, তার মুখ ভঙ্গি অভিব্যক্তি, কঠোরের আদল আমার ইচ্ছের বা কচির সঙ্গে খাপ খায়। পরিহাস সংগীত সারল্য ও রহস্যের অভিনেত্রী সে। Il Bidone ( ৫৫ ), লা স্তাদা, দি নাইটস অব ক্যাবিরিয়া ( ৫৭ ), জুলিয়েট অব দি স্পিরিটস ( ৬৫ ), অনেক, আমার অনেক ছবিতে সে ছিল। তার সম্পর্কে ও তার জগৎই আমার অনেক ছবি। তার কথা ভেবেই ইমেজগুলো তৈরি। ক্যামেরার সামনে গিউলিয়েটা নম্র বাধ্য। আমার কাজকে সহজতর করার জন্ত সে সবকিছু করার চেষ্টা করে। তবে কখনোই ভোলে না যে সে আমার স্ত্রী, আমার ঠাণ্ডা লাগছে কিনা, আমার কফির দরকার কিনা—এসব দিকেও সে নজর রাখে।’

দাম্পত্যের এই অকালমৃত্যুর যুগে ফেলিনির জীবনে গিউলিয়েটার স্থান চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে। স্বাভাবিক তাঁর ছবির থিমে বিবাহের—একটি পুরুষ ও একটি নারীর সম্পর্ক—বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। একটি গভীরতর সংযোগ তাঁর কাছে বিবাহের লক্ষ্য। সেই সংযোগের ধ্বংস ও ব্যঙ্গের প্রতি তাই তিনি

প্রায়ই দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বস্তুতঃ প্রধানতঃ ব্যঙ্গের স্বরে সমস্ত প্রাগৈতিহাসিক শ্রীখণ্ড ও আধুনিক মরালিটির সংঘর্ষের প্রকাশই ফেলিনির সকল সৃষ্টির চাবিকাঠি। অবচেতন বা ফ্রয়েড কথিত আন্তর-প্রবাস বা ব্যক্তিগত পরবাসের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার জগুই যেন তিনি নিজের ভিতরে এক দেয়াল সৃষ্টি করেছেন। আর ঐ দেয়ালের ওপারের অবচেতন ও কল্পনার জগৎ থেকেই নিজের ছবির মালমশলা যোগাড় করছেন। এই দান পরিমিত ভাবে ছড়িয়ে দিতে তিনি জানেন যাতে তা তাঁকে বিপর্যস্ত বা শ্বাসরুদ্ধ না করতে পারে। নয়তো তাঁর আত্মকেন্দ্রিকতা হয়ে পড়ত উৎকেন্দ্রিকতা। ক্রমাগত নিজের সমস্কার দরুন বিধাশ্রস্ত আত্মজীতি হয়ে উঠত অস্বাস্থ্যকর আত্মরতি। কিন্তু তা হয়নি। তাঁর যে কোনো শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মে আসলে সাব্‌জেকটিভিটি—অব্‌জেকটিভিটির সমন্বয়ই ঘটেছে।

অন্যান্য ছবি : ফেলিনি স্মার্টারিকন ( ৬৯ ), দি ক্লাউনস ( ৭০ ), রোমা ( ৭২ ), অ্যামারকর্ড ( ৭৩ ), ফেলিনি'স ক্যাসানোভা ( ৭৬ ), অর্কেস্ট্রা রিহার্সাল ( ৭৯ ), দি সিটি অব উইমেন ( ৭৯ ), E la nava va, Ginger and Fred.

সম্পর্কিত গ্রন্থ : G. Salachas-এর ফেদেরিকো ফেলিনি ।

ধীমান দাশগুপ্ত

॥ জন ফোর্ড ॥

( ১৮৯৫-১৯৭৩ )। আমেরিকার চিত্রপরিচালকদের মধ্যে ফোর্ডের নাম সবচেয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করা হয়, স্বদেশে সবচেয়ে প্রশংসিতও তিনি ( ছয়টি অ্যাকাডেমি পুরস্কার )। তাঁর ছবিতে কোনো অস্পষ্টতা নেই, ব্যক্তিগত প্রতীকের ব্যবহার নেই, তা মূলত আবেগনির্ভর, বর্ণনামূলক ও সর্বত্র জনপ্রিয়। চূড়ান্ত কমেডি ও পরিমিত ট্রাজেডির সহজ সহাবস্থান তাঁর ছবিতে। সরলতা ও বলিষ্ঠতার এক আশ্চর্য সমাবেশ। নির্বাক যুগে প্রায় পঞ্চাশটি ও সবার যুগে এসে আরও প্রায় সমসংখ্যক ছবির মধ্য দিয়ে ফোর্ড সত্যজিতের ভাষায় 'বেঠোফেনের মধ্য পর্বের রচনার মতো বলিষ্ঠ কাঠামো, সহজ ও গভীর মানবিক আবেদন, বীরত্বব্যঞ্জক নাটকীয় পরিসমাপ্তির এক নিজস্ব জগৎ গড়ে তোলেন'। এই জগৎ বিষয়গত ভাবে আমেরিকার ইতিহাসকে ধরে রেখেছে, অ্যানড্রু স্মারিস-এর ভাষায়, আর কোনো পরিচালক ফোর্ডের মতো আমেরিকার অতীতকে এমনভাবে তাঁর শিল্পকর্মে আত্মস্থ করতে পারেননি, যে অতীতের মধ্যে পড়ছে লিংকন, লী, টোয়েন

৩ ওনীলের জগৎ, তিনটি মহায়ুদ্ধ, নিগ্রো রেড ইণ্ডিয়ান প্রাচ্যের মাহুৎ, পশ্চিমের অশ্বারোহী আর সীমানা রাজ্য ও বহু ভাষাভাষী শহরগুলির ঘন্থ ।

তঁার পূর্বপুরুষ আয়ার্ল্যান্ড থেকে আমেরিকায় বসবাস করতে চলে আসেন, বাবা মার তেরটি সন্তানের মধ্যে তিনি কনিষ্ঠ । দাদা ফ্রানসিস ফোর্ডের ছবিতে তিনি সহকারী, স্টাণ্টম্যান ইত্যাদি হিসেবে কাজ করে ১৯১৭-র প্রথম নিজে চিত্র পরিচালনা করেন । কিছুদিনের মধ্যেই তঁার ছবিতে নিজস্ব ছাপ পড়তে শুরু করে । জন ওয়েন প্রমুখ বহু আদি অভিনেতা তঁার ছবির মধ্য দিয়ে পরিচিতি লাভ করেন, চিত্রগ্রাহক Schneiderman-এর সঙ্গে তঁার স্বজনশীল সমঝোতা পরবর্তী বছর-গুলিতেও বিস্তৃত হয় । ১৯২২ থেকে জোসেফ আগস্ট, বিভিন্ন সময়ে গ্রেগ টোল্যাও প্রমুখ চিত্রগ্রাহকও তঁার সঙ্গে কাজ করেন । দৃশ্যগুণ ও ইমেজের সমৃদ্ধির জন্তু তিনি আলোকচিত্রের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন, এর মধ্যে কিছু ছবি ক্যামেরার সাহায্যে আলা ছায়ার নয়নাভিরাম খেলা । অল্প ধরনের জন্তু আমাদের ফোর্ডের ছবির বিষয় বিভাজন করতে হবে, প্রথমত তঁার ওয়েষ্টার্ন ( ড্র. )—দি আয়রন হর্স ( ২৪ ), স্টেজকোচ ( ৩৯ ) সহ পঞ্চাশ-অধিক ছবি যা তঁার আঞ্জীবন সাধনার বস্তু ও দ্বিতীয়ত ওয়েষ্টার্ন ঘরানার বাইরের ছবি—দি গ্রেপস্ অব র্যাথ ( ৪০ ), হাউ গ্রীন ওয়াজ মাই ভ্যালী ( ৪১ ), দি ফিউগিটিভ ( ৪৭ ), সেভেন উওমেন ( ৬৬ ) ইত্যাদি । গ্রেগ টোল্যাও চিত্রায়িত ‘দি গ্রেপস্ অব র্যাথ’ ছবিতে নৈরাশ্রের মরুভূমির মধ্য দিয়ে দারিদ্রপীড়িত এক পরিবারের যাত্রার মধ্যে সৌন্দর্যের কোনো বালাই নেই । ছবিটি তীক্ষ্ণ ও নিষ্করণ । কুশীলবদের মুখগুলির মধ্যে এমন একটা কর্কশতা যা পটভূমির ধূসর আনন্দহীনতার সঙ্গে সংগতিময় । অ্যাকশনের দৃশ্য ছাড়া ফোর্ডের ক্যামেরাকে সচল দেখা যায় কম । এই ক্যামেরা যেন ‘দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে নিশ্চিত একজন সংবেদনশীল অখচ নিলিপ্ত পর্যবেক্ষক । প্রায় একই ঘটনা, একই দৃশ্যরীতি, একই কাঠামো, একই চরিত্রকে তিনি বার বার নতুন রসে সিক্ত করে উপস্থিত করেছেন ।’

ভাবপ্রবণতা, অতীতচারিতা, ব্যবসায়িক বিবেচনা, নব্যরীতির প্রতি অনীহা প্রভৃতি বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তিনি এক বাক্যে প্রশংসিত, আইজেনস্টাইন থেকে কুরোশাওয়া, বার্গম্যান থেকে অ্যানডারসন অনেকের প্রশংসাই তিনি পেয়েছেন । সত্যজিৎ তঁার ছবিতে ছবির বস্তুবোয় উপস্থাপনায়, উপকরণের প্রয়োগকৌশলে, সমগ্র ছবির সজীবতায়, ছন্দোময়তায় ও সামগ্রিকতায় দেখেছেন অসাধারণত্ব, শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলিতে পেয়েছেন শ্রেষ্ঠ কাব্যের মতো রহস্যময়তা । ফোর্ড

ওয়েলস্-এর ভাষায় ছিলেন একই সঙ্গে এই কবি ও কমেডিআন। আর একটু এগিয়ে এইভাবে শেষ করা যায়, ফোর্ড হলেন কমেডি, কবিত্ব ও ট্রাজিক বীররসে দিক্ত 'চলচ্চিত্রের গ্র্যাণ্ডপা'। অগ্নাঙ্গ ছবি : ওয়াগনমাস্টার, দি সান শাইন্স ব্রাইট, My Darling Clementine ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : জন ব্যাকস্টারের দি সিনেমা অব জন ফোর্ড ॥

## ॥ মিলোশ ফোরম্যান ॥

( জন্ম ১৯৩২, চেকোস্লোভাকিয়া )। তাঁর বাবা ছিলেন ইহুদী, অধ্যাপক ও মা প্রটেস্ট্যান্ট। দুজনেই নাৎসি বন্দী-শিবিরে নিহত হন। প্রাগের সংগীত ও নাট্য আকাদেমি থেকে স্নাতক হয়ে ফোরম্যান চিত্রনাট্যকার রূপে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৬৩তে তাঁর প্রথম চিত্রপরিচালনা দুটি মাঝারি দৈর্ঘ্যের ছবি দিয়ে—ট্যালেন্ট কম্পিটিশন ও ইফ দেয়ার ওয়ার নো মিউজিক। প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কাহিনীচিত্র পিটার অ্যাণ্ড পাতলা ( ব্ল্যাক পিটার নামেও পরিচিত ) ( ৬৪ )র জন্য লোকানোয় শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কার পান তিনি। পরবর্তী এ ব্লু ইন লাভ, দি ফায়ারমেন'স বল প্রভৃতি ছবির মধ্য দিয়ে ফোরম্যান তাঁর ছবির খীম ও দৃষ্টিভঙ্গিকে স্পষ্টতর করেন। এই খীম প্রায়ই প্রজন্ম-বিচ্ছিন্নতার খীম, দৃষ্টিভঙ্গি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের মধ্য থেকে উঠে আসা দ্বিধা দ্ব্যর্থতা ও কমিকতার ওপর শ্লেষাত্মক আলোকরশ্মি নিক্ষেপের দৃষ্টিভঙ্গি। ১৯৬৮তে রাশিয়ান সৈন্য যখন চেকোস্লোভাকিয়াতে পদার্পণ করে ফোরম্যান তখন প্যারিসে। ৭১য়ে তাঁর নতুন ছবি নির্মিত হলো আমেরিকায়, টেকিং অফ্ ফ্। তারপর মিউনিখ অলিম্পিকের একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নিয়ে তাঁকে একখানা স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি বানাতে হয়, ছবিটি জার্মানির অলিম্পিয়া (৩৮)-এর প্রচারমূলকতা ও ইচিকাওয়ার টোকিও অলিম্পিয়াড ( দ্র. )-র ঋণদী চেতনার মাঝামাঝি, অ্যাম্বিভালেন্সের। তা-ই হলো ফোরম্যানের মূল স্বর। দৈনন্দিনতার প্রতি তাঁর যে টান ( টেকিং অফ্ ফ্-য়ের বিষয়বস্তু সংগ্রহ করা হয় সংবাদপত্রের সাধারণ এক ঘটনা থেকে ), আবার প্রয়োগের দক্ষতা ও গতির যাত্র ( যা মূল চরিত্রগুলি থেকে কখনো তাঁকে প্রত্যাহত করে নেয় ) এই অ্যাম্বিভালেন্সের দরুন। ৭৫য়ে নির্মিত ওয়ান ফ্লু ওভার দি কুকুজ নেষ্ট ( দ্র. চলচ্চিত্রের শিল্পরূপ ) পুরস্কার ও প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে অকল্পনীয় ব্যবসায়িক সাফল্যও লাভ করে। হেয়ার ( ৭৯ )ও ব্যবসায়িক সাফল্য পায়। তাঁর ছবি কোনোদিনই বর্ণনাত্মক শৈলীর ছিল না, তবু চেকোস্লোভাকিয়ায় নির্মিত ছবির সঙ্গে আমেরিকায়

নির্মিত ছবির একটা পার্থক্য চোখে পড়ে, প্রথম ছবিগুলিতে ছিল স্বাচ্ছন্দ্য ও শ্রাণবন্ততা, পরের ছবিগুলিতে এসেছে তির্যক সফিসটিকেশন, যেটা লিওসে অ্যানডারসন প্রভাবিত বলে মনে হয়। ফোরম্যানের ছবিতে, অ্যানডারসনের ভাষায়, অদ্ভুত বৈচিত্র্য, অসাধারণ পৌরুষ, আধুনিকতা ও নিজস্বতার সংমিশ্রণ ঘটেছে। ফোরম্যান দীর্ঘদিন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চলচ্চিত্র বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। তাঁর অত্যন্ত ছবির মধ্যে আছে Ragtime (81), Amadeus (83), Valmont (91) ইত্যাদি।

॥ ফ্যানটাসি ছবি ॥

ফ্যানটাসি বলতে এমন কাহিনী বা কাহিনীর উপাদান যা অবাস্তব ও পুরোপুরি কল্পনাপ্রবণ। ক্যামেরার অতিরঞ্জন, আরোপণ ও মিথ্যাচারণের ক্ষমতা আর চলচ্চিত্রের বিভিন্ন কারিকুরি ও কলার্কৌশল (ড্র. এফেক্ট) ফ্যানটাসির চিত্রায়ণ সম্ভব ও বিশ্বাস্য করে তোলে। ফ্যানটাসির মধ্যে পড়ে রূপকথা, অলৌকিকতা, স্বপ্নময়তা, কল্প-বিজ্ঞান, ভবিষ্যৎ দর্শন আর ছোট বড়ো বিবিধ মনস্তাত্ত্বিক ও কাল্পনিক উপাদান। রূপকথার ছবির মধ্যে দি ব্লু বার্ড, অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যান্ড, সিলেকশন ফ্রম অ্যানডারসন, গ্রিম ভাইদের কাহিনীর বিভিন্ন রূপান্তর, গুপী গাইন বাবা বাইন, চিট্টি চিট্টি ব্যাং ব্যাং, ডিজনির একাধিক কার্টুনচিত্র ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মনোরঞ্জন ও ইচ্ছাপূরণের স্বাভাবিক লক্ষণ ছবিগুলিতে খুঁজে পাওয়া যায়। ছবিতে বয়স্কদের রূপকথাও কিছু কম নেই, আছে ডে সিকার মিরাকল ইন মিলান, বিলি ওয়াইন্ডারের বল অব ফায়ার, আছে ককতোর পুরোদস্তুর ফ্যানটাসি-চিত্র যা প্রাপ্তমনস্কদের (ড্র. ককতো)। উগেৎস মনোগাতারি সহ জাপানের অনেক পিরিয়ড ফিল্মে ফ্যানটাসির উপাদান এসেছে চমৎকার ও কাব্যময় হয়ে। অলৌকিক চিত্রের অসম্ভব ঘটনা ও অলুপ্ত প্রসঙ্গে জরমন এক্সপ্রেসনিজমের ফসল নসফেরাতু, ফাউস্ত, মেট্রোপলিস-এর নাম করা যায়। পরবর্তীকালের ডাকুলা, ফ্রাঙ্কেনস্টাইন, কিং কং, দি ইনভিজিবল ম্যান কিছুটা অলৌকিক, কিছুটা বিজ্ঞান-ভিত্তিক। আই ম্যারেড এ উইচ প্রভৃতি ছবি যেমন অলৌকিক চরিত্রদের নিয়ে নাচ গান আর মজার আধা অলৌকিকতা, আধা কমেডি। স্বর্গ আর স্বর্গের বাসিন্দাদের নিয়ে চল্লিশের দশকের নিখাদ কমেডিগুলিতে (হেভেন ক্যান ওয়েট, ইত্যাদি) অবশ্য অলৌকিকতা নেই বললেই চলে। বার্গম্যানের দি ডেভিল'স আই ছবি সম্পর্কেও এই কথা বলা চলে। আবার সাম্প্রতিক কালের দি পিকচার অব

ডোরিয়ান গ্রে, দি এক্সপেরিমেন্ট প্রভৃতি বিভিন্ন পার্থিব বস্তু বা ব্যক্তির ওপর অলৌকিক ক্ষমতা আরোপ করেছে।

স্বপ্ন চলচ্চিত্রের অগ্রতম নান্দনিক উপাদান। চলচ্চিত্রে মূলগত ভাবে স্বপ্নের জগৎ। সিনেমার পর্দা যেন এক মনস্তাত্ত্বিক স্বপ্নলোক। স্বপ্নময়তা ( ম্যাজিক, রহস্য, মরমিয়াবাদ ) প্রসঙ্গে সিক্রেটস অব এ সোল, দি নাইট মাই নাশ্বার কেম আপ, ওয়াইল্ড স্ট্রবেরিজের নাম করা দরকার। শেষোক্ত ছবিটিতে স্বপ্নময়তার সঙ্গে কাব্যিক অন্তর্দৃষ্টির অনবদ্য সহাবস্থান ঘটেছে। আমরা চোখ বুজলে যা দেখি তা শুধু স্বপ্ন নয়, সিনেমা থেকে উড়ে আসা ইমেজ বা প্রতিমাও। ভবিষ্যৎ দর্শনের ( আগামী যুগে কী হতে পারে ) ছবি হিসেবে যেমন থিংস টু কাম, ১৯৮৪, ফারেনহাইট ৪৫১ ও আলফাভিল উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে আসে কল্ল-বিজ্ঞান চিত্রের কথাও। এই রকম ছবি সাধারণত দু ধরনের হয়, হয় পৃথিবীর অধিবাসীদের পৃথিবীর বাইরে অভিযান—যেমন ১৯০২য়ে নির্মিত ভয়েজ টু দি মুন থেকে ডেসটিনেশন মুন, ২০০১-এ স্পেস ওডিসি ইত্যাদি ছবি, অথবা পৃথিবীর বাইরের জগতের অধিবাসীদের এখানে আগমন—যেমন ক্লোজ এনকাউন্টারস অব দি থার্ড কাইও, ইনুভেশন অব দি বডি স্মাচারস, দিস আইল্যাণ্ড আর্থ, ই. টি. প্রভৃতি ছবি। তৃতীয় একটি ধরনের ছবিও ইদানিং দেখা যাচ্ছে। যেমন স্টার ওয়ারস, জুরাসিক পার্ক, ইত্যাদি। কল্লবিজ্ঞান চিত্রের ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও প্রায়ুক্তিক সাফল্য আধুনিক চলচ্চিত্রের অগ্রতম ঘটনা।

আধুনিক শিল্পগুণমণ্ডিত, মননশীল ছবিতে, বাস্তবের সঙ্গে ফ্যান্টাসির বিভিন্ন উপাদানের এমন সহাবস্থান শুরু হয়েছে যে বর্তমানে ফ্যানটাসি হয়ে উঠেছে চলচ্চিত্রের এক অগ্রতম প্রসঙ্গ। ফেলিনি, কুব্রিক, তারকোভ্‌স্কি, অস্টম্যান, রুগের ছবি এবং লাস্ট ইয়ার এ্যাট মারিয়েনবাদ, ইউ নেভার ক্যান টেল, ও লাকি ম্যান প্রভৃতি এবং বুদ্ধয়েলের বহু ছবি ও ছবির অংশবিশেষ এর স্মরণ উদাহরণ।

॥ ফ্যানি অ্যাণ্ড আলেকজান্ডার ॥

১৯৮৩, সুইডেন, আন্তর্জাতিক যৌথ প্রযোজনা। বার্গম্যানের সবচেয়ে ব্যয়বহুল চিত্র ( বাজেট ৪ মিলিয়ন ডলার )। উনিশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকের সুইডিশ উচ্চবিশ্ব সমাজের পটভূমিতে দুটি ছেলেমেয়ের ( ভাই-বোন ) বড়ো হয়ে ওঠার কাহিনী। ছবিটির দুটি সংস্করণ—একটি তিন ঘণ্টার চলচ্চিত্ররূপ, অত্রটি পাঁচ ঘণ্টার টিভি-সিরিয়াল। অসাধারণ দৃশ্যগ্রাহতা, তিক্ত ও তীব্র নাট্যক্রিয়া,

জোরালো অভিনয় ও নারুদে হাশুরসে সম্পন্ন এই ছবি সম্পর্কে যথার্থই বলা হয়েছে 'a rich, colourful fresco decorated with national motifs ; a feat of great strength, skill and ingenuity'—প্রকৃত অর্থেই একটি tour de force, একটা devastating film. কিছুটা আশ্চর্যজনক এই ছবিতে, বার্গম্যানের অগাধ ছবির অন্তর্মুখীনতার পরিবর্তে এসেছে কিছুটা বহির্মুখী নাট্যক্রিয়া, ছবির সমাপ্তিতে বিষাদ ও নিরাশা কাটিয়ে উঠে আসে উষ্ণতা ও আশাবাদ, জীবন বয়ে চলে। বার্গম্যানের সর্বশেষ এই চলচ্চিত্রের, তাঁর swan-song-এর নির্মাণ নিয়ে স্কইডিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে একটি তথ্যচিত্রও নির্মিত হয়েছে। ফ্যানি অ্যাণ্ড আলেকজান্ডার চারটি অঙ্কারে পুরস্কৃত, যার মধ্যে আছে সর্বশ্রেষ্ঠ বিদেশি চিত্রের পুরস্কারও।

অভিনয়ে আলেকজান্ডার : Bertil Guve, ফ্যানি : Pernilla Allwin, ইয়োয়া ফ্রোলিং, ওগার বার্নস্ট্রোম ; চিত্রনাট্য বার্গম্যান, চিত্রগ্রহণ নিকভিস্টে ।

॥ ফ্রন্ট প্রজেকশন/ ব্যাক প্রজেকশন ॥

স্বচ্ছ নয় কিন্তু তার মধ্য দিয়ে আলোকে যেতে দেয় এমন একটি বিশেষ ধরনের পর্দার পেছন দিকে প্রজেক্টর রেখে সেখান থেকে চিত্র প্রক্ষেপণ করে ওই পর্দার ওপর প্রদর্শন করা হলে তাকে ব্যাক বা রিয়ার প্রজেকশন বলে। এই রীতিতে আলোকিত ধরেও ছবি দেখান সম্ভব। পর্দায় প্রক্ষিপ্ত ছবিকে স্থির বা গতিশীল পটভূমি রূপে ব্যবহার করে তার সামনে স্টুডিও-সেটে লাইভ অ্যাকশন অভিনীত করা ও তার চিত্রগ্রহণের জন্য ব্যাক প্রজেকশনের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ স্থির মোটর গাড়ির মধ্যে অভিনীত দৃশ্য+পূর্বে গৃহীত চলন্ত রাস্তার দৃশ্যের ব্যাক প্রজেকশন=চলন্ত মোটর গাড়ির মধ্য থেকে দৃষ্ট গতিশীল রাস্তার বিজয়। ব্যাক প্রজেক্ট করা দৃশ্য ও লাইভ অ্যাকশনের একত্র চিত্রগ্রহণের সময়ে ক্যামেরা গেট ও প্রজেক্টর গেট সতর্কতার সঙ্গে সিনক্রোনাইজ করে নেওয়া হয় এবং ক্যামেরা লেন্স ও প্রজেক্টর লেন্সকে একই অক্ষে রাখা হয়। এই প্রকার সমন্বিত ছবিতে স্টুডিওতে তোলা অংশ এবং পিছনের পর্দায় প্রতিফলিত অংশের ভিতর অনেক সময়ই উজ্জ্বলতা ও রঙ-এর তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। ছবির কোনো কোনো অভিনেতাকে সরাসরি লোকেশনে ও প্রত্যক্ষ অ্যাকশনে নিয়ে গিয়ে শ্যুটিং করা সম্ভব হয় না বলে, ব্যাক প্রজেকশন একটি মূল্যবান প্রায়ুক্তিক পদ্ধতি। পর্দার পেছন দিক থেকে দৃশ্য-প্রক্ষেপণ না করে বর্তমানে অনেক সময় সামনের দিক থেকেই প্রক্ষেপ

করা হয়, অর্থাৎ লাইভ অ্যাকশনের জগৎ আনীত অভিনেতার ও সেটের অঙ্গণে বস্তুর ওপর দিয়েই আলোকরশ্মি পর্দায় গিয়ে পড়ে। এই সমস্তার সমাধান প্রজেক্টরকে ক্যামেরার সঙ্গে একই অপটিক্যাল অবস্থানে রাখা হয় ও প্রজেক্টর থেকে নির্গত আলোকরশ্মি একটি স্বয়ংক্রিয় ক্ষুদ্র দর্পণের মধ্য দিয়ে আসে, যা ক্যামেরার দৃষ্টিকোণের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি অভিনেতা ও বস্তুর ছায়াকে তার দ্বারা আবৃত করে দেয়। এই পদ্ধতি ফ্রন্ট প্রজেকশন নামে পরিচিত। ব্যাক প্রজেকশনের তুলনায় এই রীতি বেশি সংবেদনশীল ও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র স্টুডিওতেও কার্যকারী।

## ॥ ফ্রান্স ॥

ফরাসি চলচ্চিত্র উদ্ভাবনীশক্তি ও কলানৈপুণ্যের এক বিরল সমন্বয়। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় যখন প্রকরণগুলির পরিবর্ধন ও পরিমার্জনার কাজ সবেমাত্র শুরু হয়েছে তখনই ফ্রান্সে চলচ্চিত্রের বিষয় ও আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। স্বদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির ওপর স্থাপিত না হলেও ফরাসি চলচ্চিত্রের বিচিত্র জীবনীশক্তি তাকে যুগ যুগ ধরে বিশ্বের পুরোধা বলে চিহ্নিত করে এসেছে।

১৮৯৫ সালে লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয় যেদিন নিজেদের তৈরি প্রজেক্টরে তাঁদেরই তোলা দুটি তথ্যচিত্র দেখিয়ে প্যারিসের দর্শকদের চমৎকৃত করে দেন, সেটি শুধু ফ্রান্সের নয় সারা বিশ্বের চলচ্চিত্রে একটি ঐতিহাসিক দিন। অল্পদিনের মধ্যে গোর্ম ও পাখে নামক দুটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের আত্মপ্রকাশ এই শিল্পের অগ্রগতি ও ব্যবসায়িক প্রসারের সূচনা করল। এই সময়েই চলচ্চিত্র-কলার জনক-রূপে বর্ণিত জর্জ মেলিয়েসের আবির্ভাব এই অর্বাচীন শিল্প মাধ্যমকে একটি অপ্রত্যাশিত পূর্ণতা দান করে।

১৮৯৬ সালে প্রথম ছবির মুক্তির পর মেলিয়েস কুড়ি বছর অক্লান্তভাবে চলচ্চিত্রের কাজ করেন। নিজের ছবিতে তিনি একাধারে চিত্রনাট্যকার থেকে শিল্প নির্দেশক, অভিনেতা তো বটেই। তাঁর হাতে কাহিনীচিত্র মোটামুটি একটি সংহত রূপ পেল। মেলিয়েসের ছবি বস্তুনিষ্ঠতার দিকে না গিয়ে গিয়েছিল কাল্পনিকতার দিকে। একদিকে রূপকথা (Cendrillon) অন্যদিকে বিজ্ঞান-ভিত্তিক ফ্যানটাসী (Voyage to the Moon)—তাঁর চলচ্চিত্রের এই দুটি দিক। সর্বোপরি, অষ্টা হিশেবে মেলিয়েস পৃথিবীকে দেখেছেন ঈশৎ তির্যকদৃষ্টিতে।

অন্য দেশের মতো ফ্রান্সের চলচ্চিত্রেও এই সময় রঙ্গরসিক ও vaudeville

অভিনেতৃবর্গের প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে মাক্স লিগের ছিলেন শ্রেষ্ঠ ; টুকরো টুকরো হাসির ছবি থেকেও কমেডিয়ান হিসেবে তাঁর একটা অখণ্ড ব্যক্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। স্বয়ং চ্যাপলিন লিগেরের কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন।

তবে এই সময়ের সবচেয়ে অরগীয চলচ্চিত্রকার হলেন লুই ফাইয়াদ (Feuilleade), ১৯০৬ সালে কমেডি ছবির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করলেও কিছুদিনের মধ্যে তিনি অপরাধ-কাহিনীর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং পরে কমিকস্ট্রিপ চণ্ডের কয়েকটি ছবি করেন যা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। তাঁর ছবিগুলির মধ্যে আছে ফঁতোমাস ( ১৯১০ ), দি ভ্যাম্পায়ার্স ( ১৯১৫-১৬ ) এবং জুডেল ( ১৯১৭-১৮ ) চিত্রাবলী। ফাইয়াদের ছবিতে দেখতে পাওয়া যায় বাস্তব ঘটনাস্থল এবং কল্পিত ঘটনাবলীর সমন্বয়। তবে তাঁর সাফল্য এই যে, ফটোগ্রাফি, দৃশ্যদৃষ্টি, কাহিনী সব মিলিয়ে চিত্রপরিচালক হিসেবে তিনি একটি নির্ভুল স্টাইল উপস্থাপন করতে পেরেছিলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর স্তিমিত ফরাসি চলচ্চিত্রকে নবজীবন দান করল আভঁ-গার্দ (Avant-garde) আন্দোলন। ফ্রান্সের বৈশিষ্ট্য এইখানে যে, স্বকুমার কলার অগ্রাণ্ড অঙ্গের সঙ্গে চলচ্চিত্রের সম্পর্ক প্রথম থেকেই অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। আভঁ-গার্দ আন্দোলনের পিছনে প্রাক্তন দাদা ও স্যুররিয়্যালিস্ট গোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা ছিল ; Photogenic ও Cinema et cie নামক যে পত্রিকা দুটি এই আন্দোলনকে লালন করেছিল তাদের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন বেশ কয়েকজন স্যুররিয়্যালিস্ট শিল্পী ও লেখক। বিশ্বয়ের কথা, গোর্ম স্টুডিওর শিল্পাধ্যক্ষ রুপে স্বয়ং ফাইয়াদ আভঁ-গার্দ চলচ্চিত্রকারদের কাজ করার সুযোগ দিয়েছিলেন। এর ফলে ফরাসি চলচ্চিত্র সম্পূর্ণ নূতন একটি ধারায় প্রবাহিত হতে শুরু করল।

এই গোষ্ঠীর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য পরিচালক একজন মহিলা—নাম জারমোন হ্যালাক্ ( ১৮৮২-১৯৪২ )। তাঁর La Fete Espagnole ( ১৯১৯ ) ছবিটিকে প্রথম আভঁ-গার্দ চলচ্চিত্র হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি ১৯২৬ সালে ঐতোনান আর্তোঁর চিত্রনাট্য অবলম্বনে একটি ছবি করেন, পরে বোদলেয়রের L'Invitation au Voyage কবিতা অবলম্বনেও একটি ছবি করেন ( ১৯২৭ )। লুই দেলুক এবং জঁ এপক্টিয়া এই সময়ে কয়েকটি অরগীয ছবি করেছিলেন। লুই বুলয়েল এই সময়েই তাঁর প্রসিদ্ধ দুটি ছবি Le Chien Andalou এবং L'Age d'Or নির্মাণ করেন ; সহযোগীদের মধ্যে ছিলেন শিল্পী সালভাদর দালি। অল্প যেসব শিল্পী-

লেখক চলচ্চিত্রে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে আছেন ফটোগ্রাফার ম্যানু রে এণ' কবি জঁ ককতো ।

আর্ভ-গার্দ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত না হলেও কবি-নাট্যকার মার্গেল লেবিয়ে এণ' আবেল গঁস এই যুগের দুজন বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার । 'নেপোলিয়ন' ( ১৯২৭ ) ছবির নির্মাতা গঁস প্রকরণ-পটুক্ষে ছিলেন অধিতীয় ; নির্বাক যুগেও থ্রু-ডাইমেনশন ও রঙ প্রভৃতি নানা পরিকল্পনা তাঁর মাথায় এসেছে । আর একজন উদ্ভাবনকুশল চলচ্চিত্রকার ছিলেন সাসা গিতরী ।

একদিকে আর্ভ-গার্দ আন্দোলনের শিল্পগত তাৎপর্য অন্তর্দিকে ব্যবসায়িক চলচ্চিত্রের বিপুল সম্ভাবনা—এই দুয়ের মধ্যে ষাঁরা দোলায়িত হয়েছেন রেণে ক্লেয়র ছিলেন তাঁদের অশ্রুতম । এদিকে সবাক চলচ্চিত্রের দিনও আসন্ন । ১৯২৪ সালে Entr'acte নামে ক্লেয়র একটি ছবি করেছিলেন যার পরোক্ষ ভিত্তি ছিল দাদাইজম ; অথচ ১৯২৭ সালে তিনিই The Italian Straw Hat নামে একটি সরল, স্ল্যাপষ্টিক কমেডি নির্মাণ করেন । ক্রমে তিনি পুরোপুরি কমেডি ছবির জগতে চলে আসেন । তাঁর এই সময়ের সফল ছবিগুলির মধ্যে আছে Sur Les Toits de Paris ( ১৯৩০ ), Le Million ( ৩১ ) এবং A Nous La Liverte ( ৩১ ) ।

ক্লেয়রের মতো জঁ রেণোয়ার কর্মজীবনও নির্বাক যুগে শুরু হয়, তবে তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি তিনের দশকে সবাক যুগের । তাঁর ছবির আবেদন সর্বজনীন ; আর্ভ-গার্দ আন্দোলন যেমন চলচ্চিত্রকে অনেকটা বুদ্ধিসর্বশ করে তুলেছিল, রেণোয়ার ছবি তার বদলে একটি হৃদয় ও স্নিগ্ধ পরিবেশ রচনা করল ; বিশেষত বহিদৃশ্যের সুসঙ্গত ব্যবহার তাঁর ছবির বৈশিষ্ট্য । রেণোয়ার কাহিনীচিত্রের মধ্যে প্রধান La Chienne ( ১৯৩১ ), Boudu Sauve des Eaux ( ৩২ ), Toni ( ৩৪ ), La Grande Illusion ( ৩৭ ) এবং La Regle de Jeu ( ৩৯ ) । অনেক পরে, পঁাচের দশকের শেষদিকে, রেণোয়া আবার দু-একটি ছবি করেছিলেন যাদের মধ্যে Dejeuner sur Herbe ( ৫৯ ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।

তিনের দশকে রেণোয়া এবং ক্লেয়র আধিপত্য বিস্তার করে রাখলেও ফরাসি চলচ্চিত্রের ইস্টেলেকচুয়াল ধারাটিকে অক্ষুণ্ণ রাখার দায়িত্ব নিয়েছিলেন একজন শক্তিশালী পরিচালক, জঁ ভিগো ( ১৯০৫-৩৪ ) । তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনে ছবি মাত্র দুটি বলা যায়—Zero de Conduite এবং L' Atalante । কিন্তু বিষয় ও আঙ্গিক উভয়তই ভিগোর প্রভাব সুদূরপ্রসারী । এই দশকে ফরাসি চলচ্চিত্র ও সাহিত্য

আরও বনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। জাক প্রেভের, রোবের দেসনোজ, অঁদ্রে মালরো চিত্রনাট্যকার রূপে দেখা দেন। প্রেভেরের চিত্রনাট্য নিয়ে ছবি করেছিলেন জঁ রেমিয়ঁ (Remorques) এবং স্বয়ং রেগোয়া (La Crime de M. Lange— ১৯৩৫)। কিন্তু প্রেভেরকে ভাবীকাল অরণ করবে প্রধানত মার্সেল কার্ণের চিত্রনাট্যকার হিসেবে। কার্ণের Le Jour se Leve ছবিটি (১৯৩৯) একটি সর্জনস্বীকৃত ক্লাসিক। কার্ণে এবং এই সময়ের অন্ত দু'একজন পরিচালকের ছবিতে— যেমন দুভিভিয়ে অথবা জঁ সঁ—নৈরাশ, যন্ত্রণা ও আসন্ন বিশ্বযুদ্ধের মেঘ ছায়া ফেলেছিল একথা ঠিক, কিন্তু সেই সঙ্গে সৎ সাধারণ মানুষের শুভবুদ্ধিতে বিশ্বাসও দেখতে পাওয়া যায়। হয়তো তৎকালীন পপুলার ফ্রন্টের বা কমিউনিস্ট লেখক-শিল্পীদের প্রভাব এখানে কাজ করেছিল। ব্যবসায়িক ও অশাস্ত্র নানা অস্থিরতার মধ্যেও এই সময়ের ফরাসি চলচ্চিত্রের মূল স্বয়ং মৈত্রী ও বিশ্বাসের। এখানে উল্লেখ করা সমীচীন যে, নাৎসি জার্মানি থেকে বিতাড়িত অথবা পলাতক বেশ কিছু জার্মান চলচ্চিত্রকার তিনের দশকে ফ্রান্সে আসেন। এঁদের মধ্যে মাস্ত্র ওফুলস্ Une Histoire d'Amour (১৯৩৩) নামে তাঁরই একটি জার্মান ছবির ফরাসি রূপান্তর প্রস্তুত করেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরের কয়েকটি বছর ফরাসি চলচ্চিত্রের অপেক্ষাকৃত দৈন্তের সময় বলা চলে। জাক বেকের (Le Trou), রেণে ক্লেমঁ (Le Chateau de Verre), ক্লোদ গুঁভ-লারা (Le Ble en Herbe) প্রভৃতি কেউ কেউ দু-একখানি ভাল ছবি করলেও যে-স্বজনশীলতা বরাবর ফরাসি চলচ্চিত্রের উৎস-স্বরূপ তা ক্রীণ হয়ে এসেছিল। অবশ্য, ভবিষ্যতের এক পথ প্রদর্শক জঁ-পিয়ের মেলভিল ১৯৪৭ সালে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এবং পরবর্তীকালের সর্জনশ্রদ্ধিত রোবের ত্রেসঁ ৪৩ সাল থেকেই ছবি করছিলেন। অন্তদিকে রেগোয়া এবং ক্লেয়ার দুজনেই দীর্ঘ প্রবাসের পর নতুন করে ফ্রান্সে ছবি করার উদ্যোগ করছিলেন।

এই অবকাশে তথ্যচিত্র ও অল্প দৈর্ঘ্যের ছবি অনেকটা প্রাধান্য লাভ করল। গ্যাতিমান বহু চলচ্চিত্রকার তথ্যচিত্রের মাধ্যমে এই সময়ে কর্মজীবন শুরু করেন। জর্জ ফ্রাঁঙ্ক করেন Hotel des Invalides (১৯৫১); ১৯৪৮ থেকে ৫৭ সালের মধ্যে আল্যাঁ রেণে করেন সাতটি তথ্যচিত্র, লুই মাল্ করেন একটি। গদারেরও আত্মপ্রকাশ তথ্যচিত্রের মাধ্যমে ১৯৫৪ সালে। এ-বিষয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গটনা 'দিনেমা-ভেরিতে' আন্দোলনের স্বত্রেপাত। জঁ রুশ (Rouch) এবং ক্রিস্ মার্কায় দুজনেই তথ্যচিত্র করে হাত পাকিয়েছিলেন; পরে এঁরাই তথ্য ও কাহিনী-

চিত্রের মাঝামাঝি একটি ফর্ম নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তার মধ্যে *Chronique d'un Ete* (১৯৬১) এবং মার্কোরের *Le Joli Mai* (৬৩) পরবর্তীকালে ফ্রাঁকচারালিস্ট মহলে বহু আলোচিত।

যেমনভাবে দুটি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত কিছু লেখক একদা আঁত-গার্দ ধারায় স্থচনা করেছিলেন প্রায় তেমনভাবে ক্যাঁদিয়ে দ্ব্য সিনেমা নামক একটি পত্রিকাও লেখক-গোষ্ঠী পাঁচের দশকে বিখ্যাত 'নবতরঙ্গ' চলচ্চিত্রের স্বত্রেপাত করলেন। এঁদের অধিকাংশের কোনো ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা ছিল না; প্রায় সকলেই ছবি করতেন কম বাজেটে অপরিচিত অভিনেতা নিয়ে, কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যে এঁরা যেভাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে নিলেন তাতে মনে হয় ফরাসি চলচ্চিত্রের ভূমি এঁদের আবির্ভাবের জন্ম প্রস্তুত ছিল। নবতরঙ্গ ছবিতে বিষয়বস্তুর পরিবর্তনের সঙ্গে এল আঙ্গিকগত পরিবর্তন। অনিবার্যভাবে একদল নতুন ক্যামেরাম্যানও আত্মপ্রকাশ করলেন।

নতুন পরিচালকদের মধ্যে জঁ লুক গদার ও আল্যাঁ রেণের প্রভাব, দুটি ভিন্ন ধারায়, গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। ১৯৫৯ সালে *Breathless* ছবি থেকে শুরু করে ৭১/৭২ পর্যন্ত ১০ বছরে গদার ছোট-বড়ো মিলিয়ে ছবি করেন প্রায় ২৫টি, কিন্তু পরবর্তী দশ বছরে তাঁর ছবির সংখ্যা তিন। তবু গদার তৎকালীন চলচ্চিত্রের অত্যন্ত প্রধান ব্যক্তিত্ব। এর প্রধান কারণ তাঁর ছবিতে যুদ্ধোত্তরকালের যুবোপের মানুষের মোহভঙ্গ, সামাজিক অবক্ষয় এবং আপাত-স্ববিরোধ একটি বিশিষ্ট চলচ্চিত্র-ভাষার জন্ম দিয়েছে। এত রকমের বিষয় ও তত্ত্ব তাঁর ছবিতে অঙ্গাদি হয়ে আছে—সাহিত্য, রাজনীতি, চলচ্চিত্র—যে তাঁর ছবিকে বলা হয় কোলাজ।

অন্যদিকে রেণে যে ভাষার প্রচলন করেছেন তাতে অতীত ও বর্তমান, এবং কখনও ভবিষ্যৎও, মিলে-মিশে এক হয়ে যায়। রেণের কুশীলব কালের পর্যায় বিভাগ থেকে মুক্ত। এদিক থেকে বোধহয় বলা যায় যে তিনি ফরাসি নবতরঙ্গ উপন্যাসের কাছে ঋণী। প্রথম ছবি *Hiroshima Mon Amour* (১৯৫৯) থেকেই তিনি কাহিনীকারদের চিত্রনাট্যকার করে নিয়ে আসেন। মার্গেরিৎ দুৱাজ. জঁ কেরল, আল্যাঁ রব-গ্রিয়ে প্রভৃতি লেখকরা যে ক্রমে পুরোপুরি চলচ্চিত্রের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন তার কৃতিত্ব অনেকটাই রেণের। ১৯৭৬ সালে তোলা *Providence* পর্যন্ত তাঁর নিজের ছবি সাত-আটটি কিন্তু তাঁর থীমগুলির প্রভাব স্মূদ্রপ্রসারী হয়েছিল।

ফ্রঁসোয়া ত্রুকো অনেকগুলি ছবি করেছেন, বিভিন্ন বিষয়ে এবং ঋনিকটা

৩ম ভিন্ন চড়ে। ছবির স্টাইল অল্পযায়ী তাঁর কর্মজীবনকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। শিশুদের নিয়ে তিনি প্রথম দিকে বেশ কয়েকটি ছবি করেছিলেন। তাঁর তৃতীয় ছবি Jules et Jim (১৯৬১) বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক উভয়দিক থেকে গভীরঙ্গ চলচ্চিত্রের একটি প্রতিনিধিস্থানীয় ছবি। প্রেম ও বিবাহ সম্পর্কে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়াও আঙ্গিকের নানা অভিনবত্বের জগৎ এই ছবিটি অরণীয় হয়ে আছে। Quatre Cent Coups (১৯৫৯) ছবিতে যে আত্মীয়ান দোয়ানেল নামক চরিত্রটিকে আমরা শিশু অবস্থায় প্রথম দেখি, তাকে কেন্দ্রীয় চরিত্র করে ক্রমে পরে কয়েকটি ছবি করেছেন।

নবতরঙ্গ গোষ্ঠীর আর একজন শক্তিশালী সদস্য ক্লোদ শাব্রল প্রথমদিকে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন কিছুটা লক্ষ্যহীনভাবে। কিন্তু ১৯৬৮ সালে Les Biches ছবি থেকে তাঁর স্রষ্টাজীবনে এক নতুন অধ্যায় শুরু হলো। সামান্য অদল-বদল করে তিনি একটি ধীম নিয়েই পর পর কয়েকটি অসাধারণ ছবি করেন; ছবির চরিত্র হামী, স্ত্রী ও একজন তৃতীয় ব্যক্তি—ছবির বিষয়বস্তু : প্রেম ও সন্দেহ। এই পর্যায়ে তাঁর অস্বতম শ্রেষ্ঠ ছবি Le Boucher (৭০)।

এই অসাধারণ গোষ্ঠীর আরো দুজন পরিচালক, এরিক রোহ্মের এবং লুই মাল, প্রথম দিকে ঠিক প্রথম সারিতে না থাকলেও পরবর্তীকালে বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছেন। রোহ্মের ১৯৫৮-৫৯ সালে প্যারিস মহানগরীর পটভূমিতে Le Signe du Lion বলে একটি ছবি করেছিলেন, কিন্তু সমস্ত ও আশির দশকে moral tales (করাদি তাৎপর্য : গুট কথ্য) আখ্যা দিয়ে যে কয়েকটি ছবি করেন (Ma Nuit Chez Maud, Genou de Claire) সেগুলি সমালোচক মহলে তাঁকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করে। লুই মাল ১৯৬০ সালে রেই ক্যানোর কাহিনী অবলম্বনে Zazi dans le Metro নামে একটি উদ্ভাবনকুশল, মজাদার ছবি করেছিলেন। পরে ফ্রান্সে এবং ফ্রান্সের বাইরে কিছু বিচিত্র মানুষ এবং তাদের গুট, বিচিত্র মনের কথা নিয়ে যে ছবিগুলি তিনি করেছেন (অস্বতম শ্রেষ্ঠ : Lacombe Lucien) সেগুলি তাঁকে বিশিষ্ট বলে চিহ্নিত করে রেখেছে।

জাক্ রিভেৎ এক সময় স্থপরিচিত হয়েছিলেন প্যারিসেরই পটভূমিতে Paris Nous Appartient (১৯৫৮-৫৯) নামক একটি ছবি করে যাতে কাক্ কার স্পর্শ এসে লেগেছিল। পরে La Religieuse (৬৭) এবং Le Serail (৭৭) প্রভৃতি কয়েকটি ছবিতে তিনি অবিসংবাদিতভাবে তাঁর শক্তির প্রমাণ দিয়েছেন। অস্বতমের মধ্যে জাক্ দেমী—যিনি অপেরার চড়ে Lola (১৯৬০) ও Parapluies

de Cherbourg (৬৪) নামে দুটি অল্প স্বাদের ছবি করেছিলেন—সাম্প্রতিক কালে বিশেষ ছবি করেন নি। তাঁর স্ত্রী আইন্তেস ভার্দা ছয়ের দশকে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছবি করেছিলেন (Cleo de cinq a sept ; Le Bonheur)। এ ছাড়াও নাম করা যায় ক্লোদ লেনুশের ( A Man and A Woman ) যার ক্যামেরা ও দৃশ্যসজ্জার সৌকুমার্য চোখকে ভূষিত দেয় বলে প্রসিদ্ধি আছে।

বর্তমান আলোচনায় আরও দুজন শক্তিশালী চলচ্চিত্রকার এখনও অল্পলিখিত আছেন প্রধানত এই জন্ম তাঁরা দুজনেই নবতরঙ্গ গোষ্ঠীর বাইরে, এবং দুজনেই নিঃসঙ্গ নক্ষত্র। এঁদের মধ্যে রোবের ব্রেসঁ ১৯৪৩ সালে পরিচালক-জীবন শুরু করলেও এ পর্যন্ত ছবি করেছেন মাত্র বারোটি। তাঁরও বিষয় মনস্তত্ত্ব, তাঁরও নায়ক-নায়িকারা নিঃসঙ্গ ; এদের জন্ম প্রথাসিদ্ধ কাহিনী বর্ণনা না করে ব্রেসঁ কোথাও বা স্বগতোক্তি নিয়ে এসেছেন। আপাতদৃষ্টিতে আবেগ-নির্ভর না হলেও ব্রেসঁর কুশীলব একটি-দুটি তাঁর ইমোশনের দ্বারা তড়িত। জোয়ান অব আর্কের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চরিত্রকে তিনি অল্প একটি ব্যাখ্যা দেন Procès de Jeanne D'Arc ( ১৯৬২ ) ছবিতে। নবতরঙ্গ-গোষ্ঠী তাঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল।

আর একজন পরিচালক জঁ-পিয়ের মেলভিল। তাঁর নায়করা স্বল্পবাক, নিঃসঙ্গ অথচ দৃঢ়পণ। এই নায়করা কখনো গ্যাংস্টার কখনো দেশপ্রেমিক যোদ্ধা। কিন্তু সর্বদাই তারা নিজের চেয়ে অনেক বড়ো এক শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল—যে-সংগ্রামে তার পরাজয় প্রায় নিশ্চিত। ওই পর্যায়ে মেলভিলের অল্পতম শ্রেষ্ঠ ছবি Le Samourai ( ১৯৬৭ )। নানাদিক থেকে নবতরঙ্গ গোষ্ঠীর ওপর গোড়ার দিকে মেলভিলের প্রভাব পড়েছিল।

নবতরঙ্গ গোষ্ঠীর বাইরে জর্জ ফ্রঁজুও দীর্ঘকাল ছবি করেছেন। বাস্তবতাবোধ এবং অল্পদিকে আবহ সৃষ্টি করার ক্ষমতা এই দুই গুণের জন্ম তিনি তিনের দশক ও পঁচের দশকের চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে যোগসূত্রের কাজ করেছেন। Therese Desqueyroux ( ১৯৬২ ) এক নিঃসঙ্গ নারীর রক্ষণ অথচ রক্ষ জীবন-চিত্র।

ক্রফো মারা গেছেন। কিন্তু গদার, শাব্রল ও অন্তরা এখনও সক্রিয় আছেন, তবে নবতরঙ্গ আন্দোলনের চৌহদ্দির মধ্যে তাঁরা আর নেই। কিন্তু নবতরঙ্গের টেডে ফরাসি চলচ্চিত্রকে যে প্রাণশক্তি দিয়ে গিয়েছিল তার জের এখনো চলছে। একেবারে সাম্প্রতিক আমলের যারা ভরুণ চলচ্চিত্রকার—জঁ-লুই বেতুঁসেলি, অ্যালঁা কর্ণো, নিকোল্ সেরো—তাঁরা সকলেই আগের যুগের দ্বারা বিশেষভাবে

প্রভাবিত। সেই প্রভাবকে তাঁরা নতুন পথে চালিত করার চেষ্টা করছেন, নতুন-  
ভাবে রূপ দিচ্ছেন কিন্তু অস্বীকার করার চেষ্টা করছেন না।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : Roy Armes-এর French Cinema since 1946,  
James Monaco-এর The New Wave।

অমিয় বসু

॥ ফ্রিজ ॥

গতিশীল দৃশ্যে গতিকে কিছুক্ষণের জন্ত আকস্মিক স্তব্ধ করে দেওয়ারই ফ্রিজ।  
চলমান দৃশ্যকে স্থিরদৃশ্যে পরিণত করার একটি অপটিক্যাল পদ্ধতি এটি। এই  
অপটিক্যাল এফেক্ট একই ফ্রেমকে ক্রমান্বয়ে এক্সপোজার দিয়ে দৃশ্যের গতিময়তাকে  
নিশ্চল করে দেয়। যে জন্ত ফ্রিজকে স্টপড্ মোশন নামেও অভিহিত করা হয়।  
এর বিভিন্ন প্রয়োগ এবং শৈল্পিক গুরুত্ব ও প্রভাবের জন্ত স্নো/হুইক/স্টপড্  
মোশন স্রষ্টব্য। ছবির সমাপ্তিতে ফ্রিজের প্রয়োগ সত্তর ও আশির দশকে ভীষণ  
বেড়েছিল।

॥ ফ্রেম ॥

ক্যামেরা শাটার প্রতিবার উন্মুক্ত হওয়ার ফলে নেগেটিভ ফিল্মের আয়তক্ষেত্রাকার  
যে অংশটুকু সেইবার এক্সপোজড হয় তাকে ফ্রেম বলে (ড্র. ক্যামেরা), অর্থাৎ  
ফ্রেম গৃহীত চিত্রের চারদিককার সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেয়। সেক্ষেত্রে ২৪টি  
করে স্থিরচিত্রের ফ্রেম পর্দায় নিষ্ক্ষেপ করেই চলচ্চিত্রে গতির বিভ্রম আনা হয়।  
এই প্রসঙ্গে ও ফ্রেমের ফর্ম্যাট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে চলচ্চিত্রের  
টেকনিক অংশে। ফ্রেম সিনেমার ক্ষুদ্রতম ও ন্যূনতম ফিজিক্যাল এলিমেন্ট। শট  
ও দৃশ্যের সঙ্গে এর সাংগঠনিক ও শৈল্পিক সম্পর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভাষার ক্ষেত্রে  
যেমন বর্ণ থেকে শব্দ, শব্দ থেকে ফ্রেজিং; সেই ক্রম অনুসরণেই ফ্রেম থেকে শট,  
শট থেকে দৃশ্য ও তারপর একাধিক দৃশ্য নিয়ে একটি দৃশ্যপর্যায়। ফ্রেমের ভেতর যা  
ঘটছে তা দৃশ্য ও ধ্বনি উভয়ের দ্বারা প্রকাশিত। ফ্রেমের বাইরে কী ঘটছে তার  
আভাস শুধু ধ্বনি থেকেই পাওয়া যায়।

॥ ফ্ল্যাশ ব্যাক/ফ্ল্যাশ ফরওয়ার্ড ॥

সময়ের ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করে ছবিতে পূর্ববর্তী সময়ের কোনো ঘটনা দেখানোর  
রীতি ফ্ল্যাশ ব্যাক নামে পরিচিত। সিনেমায় এই রীতির ব্যবহার বহু দিনের।

ইনটলারেন্স ছবিটি বলা যায় চারটি দীর্ঘ ক্ল্যাশ ব্যাকে গঠিত। কাহিনীগত বা পটভূমিগত বিশেষ কোনো উপাদানকে স্পষ্ট করতে, কাহিনী ও চরিত্রের অর্থ ও ব্যঞ্জনার প্রয়োজনে কোনো তথ্য সরবরাহ করতে, এবং বর্ণনার চেয়ে প্রত্যক্ষ অ্যাকশনকে বেশি জরুরি মনে করলে ক্ল্যাশ ব্যাক ব্যবহার করা হয়। আগে ছবিতে যখনই ক্ল্যাশ ব্যাক প্রযুক্ত হতো তখনই কোনো না কোনো ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হতো যে ওটি ক্ল্যাশ ব্যাক অর্থাৎ অতীতের ঘটনা। এটা করা হতো বর্ণনারীতির সহজতা ও সরলরৈখিকতা বজায় রাখার জন্য। একাধিক ক্ল্যাশ ব্যাক ব্যবহার করা হলে তাদের মধ্যে সময়ের ধারাবাহিকতাও অক্ষুণ্ণ রাখা হতো। বর্তমানে এই সমস্ত নিয়ম উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ভাবে অস্বীকার করা হয় ও ক্ল্যাশ ব্যাকের মধ্যে নতুন আর একটি ক্ল্যাশ ব্যাক—এই ধরনের প্রয়োগও ঘটে থাকে। ক্ল্যাশ ব্যাকের উল্লেখযোগ্য ব্যবহার আছে ডেভ রেকনিং, সিটিজেন কেম, দি পাওয়ার অ্যাণ্ড দি গ্লোরি, ডেথ অব এ সেলসম্যান, মিস জুলি, ডক্টর জিভাগো, ওয়াইল্ড স্ট্রবেরীজ, দি বেয়ারফুট কন্ট্রোল, রিপ্টি পারফরমেন্স, দি লকেট, লাস্ট ফর গোল্ড ইত্যাদি ছবিতে। ছবিতে ক্ল্যাশ ব্যাকের স্থায়িত্ব বা ইচ্ছে হতে পারে, 'দি নেকেড নাইট'-য়ের মতো একটি সিকোয়েন্স ব্যাপী (ড. কবিতা ও চলচ্চিত্র) থেকে 'রশোমন'-এর মতো প্রায় সমস্ত ছবি জুড়ে। এমনকি একটা মাত্র শট বা ইনসার্টের ক্ল্যাশ ব্যাকও দেখা যায়। সময়চেতনা ও ফিল্ম সেন্সের চমৎকার উদাহরণ হিসেবে হিরোশিমা মন আমুরের বা গ্র্যারেটিভ ও সাসপেন্স তৈরির সার্থক প্রমাণ হিসেবে জেডের ক্ল্যাশ ব্যাকের কথাও উল্লেখ্য। পঞ্চাশের দশকে ক্ল্যাশ ব্যাকের ব্যবহার কমে গিয়েছিল, এখন এক সময় থেকে অল্প সময়ে যাতায়াতের প্রয়োজনে এর অবাধ সূক্ষ্ম ও জটিল ব্যবহার আবার দেখা যাচ্ছে। (ড. কালচেতনা)

সময়ের ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করে ছবিতে ভবিষ্যতের কোনো ঘটনা দেখানোর রীতি ক্ল্যাশ ফরওয়ার্ড নামে পরিচিত। ওই ঘটনা ভবিষ্যতে সত্যিই ঘটবে, অথবা ঘটবে বলে আশা বা কল্পনা করা হচ্ছে, এর যে কোনটি হতে পারে। চলচ্চিত্র আঙ্গিকের গঠনগত সম্ভাবনা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই রীতি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়া কমেডি ও সিরিও-কমেডি ছবিতে বা ছবির আপাত সমাপ্তি ও প্রকৃত সমাপ্তির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনেও এর ব্যবহার হতে পারে। বাংলায় 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ছবিতে আমরা এর স্বন্দর প্রয়োগ দেখেছি। অনেকে বলেন, '২০০১—এ স্পেস ওডিসি' বা 'আলফাভিল'-এর মতো ছবির পুরোটাই এক স্বদীর্ঘ ও কনসেপ্টবর্ষী ক্ল্যাশ ফরওয়ার্ড। (ড. স্থান-কাল-চেতনা)

## ॥ রবার্ট জে ফ্ল্যাহার্টি ॥

( ১৮৮৪-১৯৫১ ) । আমেরিকা । ফ্ল্যাহার্টি তথ্যচিত্রের জগতে এক বিরল শিল্প-ব্যক্তিত্বের অধিকারী রূপে পরিচিত । তাঁর বনিজ বিশেষজ্ঞ পিতার সঙ্গে বিভিন্ন অভিযানে অংশগ্রহণ করে ও সেই সব অভিযানের তথ্য লিপিবদ্ধ করতে করতে তথ্যসংগ্রহের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম চলচ্চিত্রের প্রতি তাঁর আকর্ষণ জন্মায় । তথ্যচিত্রের শক্তি, বিশ্বাসযোগ্যতা, বর্ণনাক্ষমতা, আবেগমূলক প্রভাব ও নাটকীয়তা সৃষ্টির ক্ষমতা সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দেহ হন । তাঁর প্রথম ছবি স্বমেক্স অঞ্চলের অধিবাসী এন্টিমোদের নিয়ে প্রামাণ্য চলচ্চিত্র 'নালুক অব দি নর্থ' ( ১৯২০-২২ ) ( ড্র. ) । ছবির কেন্দ্র-চরিত্র নালুক ছিল এক বাস্তব ব্যক্তি । সামোয়া দ্বীপের পটভূমিতে তোলা তাঁর পরের ছবি 'মোয়ানা' নালুক...য়ের মতোই অসাধারণ দৃশ্য-সৌন্দর্য ও নমনীয় ছন্দোময়তায় চিহ্নিত ( ড্র. তথ্যচিত্র ) । কিন্তু মোয়ানা মেজাজ ও ধরনে ছিল নালুক থেকে আলাদা । আয়ারল্যান্ডে গিয়ে নির্মিত 'ম্যান অব আরান' ( ৩৩-৩৪ ) অনেকটা একই ধারার, প্রকৃতি নির্ভর ছবি । কাঠামোর দিক থেকে যতটা না গুরুত্ব, তার চাইতে বেশি সাংগীতিক । মেজাজে লিরিক্যাল । প্রকৃতি-ভিত্তিক হলেও 'এলিফ্যান্ট বয়' ( ৩৭ ) ও 'নুইসিয়ানা স্টোরি' ( ৪৮ ) অনেক বেশি রোম্যান্টিক । নুইসিয়ানা স্টোরিতে, আরানের চেয়েও অধিক মিলন ঘটেছে, ভিস্‌য়াল ও মিউজিকের । তাঁর এই কটি ছবির আঙ্গিককে লাইট হ্যারেটিভ নামে অভিহিত করা হয়েছে । যেমন 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্রিটেন' ( ৩৪ ) ও 'দি ল্যাণ্ড' ( ৪২ )-এর রীতিকে বলা হয়েছে টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন । দি ল্যাণ্ড-য়ের সঙ্গে 'আর্থ'-এর প্রতিতুলনাও আমার কাছে আগ্রহকর । ফ্ল্যাহার্টির একাধিক ছবি প্রসঙ্গে পোয়েটিক রিয়ালিজমের কথাও এসেছে ( ড্র. বাদ / ইজম ) । আবহ শব্দ ও সংগীতের ব্যবহারে ফ্ল্যাহার্টি প্রাসঙ্গিকতা ও ফিল্ম সেন্স উভয়কেই স্বীকৃতি দিয়েছেন । তাঁকে আমার খুব মননশীল পরিচালক মনে হয় না, কিন্তু তাঁর সহজাত বোধ ও দক্ষতা ছিল অসাধারণ । ( ড্র. নৃত্ব ও চলচ্চিত্র ) । তথ্যচিত্রের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত তিনিই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্ব । তাঁর বিভিন্ন ছবি নিয়ে তিনি মূল্যবান লেখালেখিও করেছেন । তাঁর স্ত্রীও তথ্যচিত্র আন্দোলনে যোগ দেন ।

[ মারী সীটন-এর ভাষায়, স্বদর্শন ও প্রাণচঞ্চল আইরিশ-আমেরিকান ফ্ল্যাহার্টি ছিলেন জীবনপ্রেমিক, ক্রোধ বা ক্ষোভের মুহূর্তেও সেই প্রেমে তাঁর টান পড়তো না । মেজাজে কাব্যিক ও প্রবণতার দিক দিয়ে আবেগমূলক, তাঁর আগ্রহ ছিল

তথ্যচিত্রের মানবিক প্রদর্শন-অনুষ্ঠানে। রজ্জার ম্যানভেলের ভাষায়, তিনি হলেন এক ধরনের কবিত্বলভ নৃত্যবিন্দু। ]

প্রাথমিক গ্রন্থ : রিচার্ড গ্রিফিথের দি ওয়র্ল্ড অব রবার্ট ফ্র্যাংকিট ॥

ডগলাস স্নকোশে

॥ সির্গেই বন্দারচুক ॥

জন্ম ১৯২০। শুধু সোভিয়েত চলচ্চিত্রে না, আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র জগতে পরিচালক ও অভিনেতা হিসেবে তিনি এক বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। যদিও পুরস্কার কোনো শিল্পীর প্রতিভার মাপকাঠি না, তবু সোভিয়েত চলচ্চিত্রে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৫২-এ পেয়েছেন সোভিয়েত গণশিল্পীর মর্যাদা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার। ১৯৬০-এ পেয়েছেন লেনিন পুরস্কার।

রস্তোভ-এর থিয়েটার ইনস্টিটিউটে পড়াশুনা করতে ঢুকলেও (সেখানে তিনি ছিলেন পুদভকিনের ছাত্র ও স্তানিস্লাভস্কির অভিনয়রীতির অনুগামী)—যুদ্ধ বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৪৬-এ মস্কো ফিল্ম ইনস্টিটিউটে অভিনেতা ফ্যাকালটিতে যখন ভর্তি হন তখন তাঁর বয়স ২৬। ওই বয়সেই বুড়োটে মেরে গেছেন। মুখে মৃত্যুর ছাপ। পরনে সৈনিকের পোশাক। তাঁদের শিক্ষক ছিলেন বিখ্যাত সোভিয়েত চলচ্চিত্র পরিচালক সির্গেই গেরাসিমভ। ক্লাশের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে বড়ো ছিলেন বন্দারচুক। ফলে ফাদায়েভের বিখ্যাত উপন্যাস ইয়ং গার্ড (তরুণ প্রহরী)-র মহড়া চলার সময় বন্দারচুককে একটি ছোট ভূমিকা দেওয়া হয়। আণ্ডার গ্রাউণ্ড পার্টী কর্মী ভালকো। ভালকোর ভূমিকায় তিনি এত চমৎকার অভিনয় করেন যে দৃবাই বুঝতে পারে তিনি একজন প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন অভিনেতা। বিয়োগান্তক অভিনয়ে কুশলী। ছাত্রের অভিনয়ে খুশি হয়ে গেরাসিমভ তাকে ইগর শেভচেঙ্কোর কাছে পাঠান। ইগর তখন তারাস শেভচেঙ্কো ছবির কাজে হাত দিয়েছেন। তারাস শেভচেঙ্কোর ভূমিকায় বন্দারচুকের অভিনয় তাঁকে রাতারাতি বিখ্যাত করে দিল। এর ফলে বিয়োগান্তক-অভিনেতা হিসেবে তাঁর এমন একটা ইমেজ গড়ে উঠল—যে সর্বত্র ঐরকম ভূমিকাতে অভিনয়ের জন্য তাঁর ডাক আসে। এতে বন্দারচুক খুশি হলেন না। তিনি অন্তরকম ভূমিকা চাইলেন। আস্তন চেখভের 'গদ্বাক্‌ডিং' (১৯৫৫) এরকম একটা ছবি। চেখভীয় চরিত্র অভিনয়ে বন্দারচুকের চেয়ে বড়ো অভিনেতা ঐ-সময় ছিল না। খুড়োভানিয়া ছবিতে অভিনয় তা আরো ভালোভাবে প্রমাণ করল।

শেফালীয়ারের ওথেলো চরিত্র বন্দারচুককে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিল। ভালো ও দুর্বল এই চরিত্র তিনি তাঁর নিজস্ব ভাবনা-চিন্তা দিয়ে এত গভীরভাবে ফোটায়েলেন যে কবি ইভান ফ্রাঙ্কোর মতো ঐতিহাসিক চরিত্রে অভিনয়ের ডাক পেলেন। বন্দারচুক আবার ঐতিহাসিক চরিত্রাভিনেতার ইমেজ ভেঙে বেরিয়ে আসতে চাইলেন। এলেনও। শলোখভের গল্প 'মানুষের ভাগ্য' ছবিতে অভিনয়ের সূত্রে। 'মানুষের ভাগ্য' গল্পটি প্রাভদায় ষারাবাহিকভাবে বের হচ্ছিল। গল্পটি তাঁকে এত গভীরভাবে আকৃষ্ট করে যে, তিনি নিজেই এখানে পরিচালক ও অভিনেতার ভূমিকা পালন করলেন এবং অভিনেতা ও পরিচালক হিসেবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেলেন। লা ফিগারো পত্রিকায় রুদ মরিয়াক ছবিটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। যুদ্ধের বিষয়ে অনেক ছবি তোলা হয়েছে। বন্দারচুক পরিচালিত 'মানুষের ভাগ্য' সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের (আন্তরিক ও সংবেদনশীল মানবিকতার জন্ম)। সিনেমা মানুষের বোধের কত গভীরে পৌঁছতে পারে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মানুষের ভাগ্য। মানুষের ভাগ্য দেখে রবার্তো রসেল্লিনি বন্দারচুককে 'তখন রাত্রি ছিল রোমে' ছবিতে অভিনয়ের জন্ম আমন্ত্রণ জানালেন। তাঁর জন্ম নতুন ভাবে চিত্রনাট্য তৈরি হলো। মানুষের ভাগ্য-এ অভিনয়ের সময় তিনি যে পোশাক পরেছিলেন ও কন্ঠিউয় ব্যবহার করেছিলেন—রসেল্লিনি তা তাকে সঙ্গে করে আনতে বললেন।

বন্দারচুক এরপর শিকান্ত নেন তলস্তয়ের বিখ্যাত উপস্থাস 'যুদ্ধ ও শান্তি'-কে নিয়ে ছবি করার। চার খণ্ডে তৈরি এই ছবিটি করতে বন্দারচুক দশ বছর সময় নিয়েছিলেন। পিয়ের বেকুকভের ভূমিকায় তিনি অভিনয় করেন। 'যুদ্ধ ও শান্তি'-র অভূতপূর্ব সাফল্য 'ওয়াটারলু' ছবি তৈরির ব্যাপারে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে। দুটি ছবিই এপিক স্পেকট্যাকল হিসেবে বিখ্যাত। ছবিতে নেপোলিয়নকে মিলিটারি সর্বাধিনায়ক না দেখিয়ে তিনি মানুষ নেপোলিয়ন হিসেবে দেখান। ইতিহাস নির্ভর এ ছবি করতে গিয়ে বন্দারচুক ভুলে যাননি নেপোলিয়নের জীবনের ট্রাজেডি। ভুলে যাননি নেপোলিয়ন ফরাসি বিপ্লবের উত্তরাধিকার। অথচ সেই নেপোলিয়ন-ই পরে বিপ্লব ধ্বংসকারী এক নায়ক হয়ে ওঠেন। যুদ্ধ বন্দারচুককে এত গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল যে, যুদ্ধ বিষয়ে তাঁর ছবিগুলি হয়ে ওঠে যুদ্ধ-বিরোধী ছবি। যুদ্ধের মধ্যে অনর্থক রক্তপাত ছাড়া যে আর কিছু নেই—তা তিনি ছবির মধ্য দিয়ে বলেন, ওয়াটারলু-র পরের ছবির বিষয় শলোকভের উপস্থাস 'তারা তাদের মাতৃভূমির জন্ম যুদ্ধ করেছিল' থেকে নেওয়া।

১৯৭৪-এ ছবিটি করার পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নতুন সোভিয়েত প্রজন্ম—যা মা তিরিশ বছর যুদ্ধ কৌ জিনিশ জানে না—তাদের কাছে যুদ্ধের ভয়াবহতা ৭ অবিচার তুলে ধরা। এ ছবিতে তিনি বিখ্যাত সোভিয়েত অভিনেতা-অভিনেত্রী দের দিয়ে অভিনয় করান। নিজেও অভিনয় করেন। শলোকভের উপস্থাপনের মতোই তাঁর এ ছবিটি সৈন্যদের জীবনের মহাকাব্য হয়ে উঠেছে। যুদ্ধ বিষয়ে ৭ ছবিটি শক্তি ও স্মরণ, প্রসার ও স্মৃত্যার স্মরণ সংমিশ্রণের কারণে সর্বকালের দর্শকদের টানবে।

বন্দারচুকের শেষ ছবি আন্তন চেখভের স্ত্রী। অর্থাৎ যুদ্ধের বিষয় থেকে তিনি আবার সরে আসতে চাইলেন। এ-ভাবেই একটি মহানদীর মতো বন্দারচুক বার বার নিজের ইমেজ ভেঙেছেন ও গড়েছেন। মাত্র ১৭টি ছবিতে অভিনয় ও ৫টি ছবি পরিচালনার সূত্রে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের ইতিহাসে বন্দারচুক চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

বিপ্লব মাজা

॥ বনি অ্যাণ্ড ক্লাইড ॥

( আমেরিকা, ১৯৬৭ )। তিরিশের দশকের প্রথমার্ধে আমেরিকায় জর্নৈক মোটর-ছিনতাইকারী ও তার লক্ষ্যব্যক্তির কথা একত্রে, কর্মী ও প্রেমিক হিসেবে, জুটি বেঁধে দেশের সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাঙ্ক ডাকাতে হয়ে ওঠে। এই বাস্তব ঘটনা ও চরিত্রের ওপর ভিত্তি করে 'বনি অ্যাণ্ড ক্লাইড'-ছবি প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার আমেরিকার তন্দ্রালু পটভূমি ( মূলত সফট ফোকাসের ব্যবহারের মাধ্যমে ) পুনর্নির্মাণ করে সেই পটভূমিতে চরম ও কিছুটা কেতাহরস্তু হিংস্রতার যে চিত্রায়ণ করে তা হিংসা ও কমেডি ও মনস্তাত্ত্বিক আবেগের সহাবস্থানে, কলাকৌশলের বিভিন্ন প্রয়োগে, ও জ্যাজ-প্রধান আবহ সংগীতে মজাদার না অভিধাতী এ নিয়ে দ্বিমত আছে। তবে সাধারণত ছবিটিকে শৈল্পিক ভাবে প্রভাবশালীই বলা হয়। আধুনিক চলচ্চিত্রের অটোমোবাইল ইমেজের পরিপ্রেক্ষিতেও এ ছবি মূল্যবান ( ড্র. টেলিভিশন )। একই বিষয় নিয়ে তোলা ল্যাংয়ের ইউ ওনলি লিভ ওয়াস বা সাম্প্রতিক ছবি ডগ ডে আফটারহুন-য়ের সঙ্গে এই ছবির তুলনামূলক আলোচনা মনোগ্রাহী।

অভিনয়ে ওয়ারেন বেট্রি ( ছবির প্রযোজকও ), ফে ডানওয়ে, জিনে হ্যাকম্যান; পরিচালনা আর্থার পেন, চিত্রগ্রহণ B. Guffey, টেকনিকালার ।

## ॥ বাইশে শ্রাবণ ॥

১৯৬০, ভারত। মনুস্মৃতি-সৃষ্ট দ্বিভিক্ষ সংসারে দারিদ্র ও অনাহারের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে একটি স্বস্থ স্বখী প্রাণী দম্পতির জীবনে কীভাবে স্বার্থপরতা, অসহিষ্ণুতা ও বিদ্বেষ এনে দিয়ে চূড়ান্ত ট্রাজেডি ঘটাল বাইশে শ্রাবণ তার এক মর্মস্পর্শী কিন্তু নিরাসক্ত চিত্ররূপ। মৃগাল সেনের সমাজ-চেতনার উল্লেখযোগ্য ও প্রারম্ভিক প্রমাণ ছাড়া এ ছবিতে আরও আছে তাঁর পরবর্তী জীবনের আদিকগত বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পূর্বাভাস। পরিবেশের বিশ্বস্ততায়, ডকুমেন্টেশনের কৃতিত্বে এবং সুস্বল্প চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় বিধৃত এই ছবিকে আজও প্রাসঙ্গিক ও সমসাময়িক মনে হয়। অশ্রদ্ধ বলেছি, দ্বিভিক্ষ নিয়ে ফিল্ম—যা ক্ষুধার বাস্তব রূপ বাইশে শ্রাবণে, পরে দ্বিভিক্ষ নিয়ে ফিল্ম উইদিন ফিল্ম—যা ক্ষুধার শিল্পরূপ, হয়ে ওঠে আকালের সন্ধানতে এবং ভারতীয় চলচ্চিত্রে দ্বিভিক্ষের চিত্রণ অশনি সংকেত থেকে বাইশে শ্রাবণ হয়ে হাংরি অটামের দিকে চলে গেছে।

অভিনয়ে মাধবী ও জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, চিত্রগ্রহণ শৈলজা চট্টোপাধ্যায়, সংগীত হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সম্পাদনা সুবোধ রায়, শিল্প বংশী চন্দ্রগুপ্ত ॥

## ॥ বাইসাইকেল থীভ্‌স্ ॥

১৯৪৮, ইতালি। বহুদিন ধরে কর্মহীন এক নগণ্য শ্রমজীবীর নতুন চাকরি লাভের পর তার পুরনো বাইসাইকেলটি চুরি গেল, যার সাহায্য ছাড়া তার এই নতুন চাকরি বজায় রাখা অসম্ভব। ফলে নিজের শিশু সন্তানকে নিয়ে সে জনবহুল রোম শগরীর রাস্তাঘাট আর এ প্রান্ত ও প্রান্ত ঘুরতে লাগল হারানো সাইকেলের খোঁজে। এই সামান্য নাট্যসূত্র অবলম্বন করে ডে সিকা (ড্র.) বাইসাইকেল থীভ্‌স্ ছবিতে বছর-মধ্যে-একা দুই নায়কের অসহায়তা, বিচ্ছিন্নতা ও অর্থনৈতিক কারণে বিধাদের মধ্য দিয়ে যে বিশ্বাস পটভূমি তৈরি করেন এবং সহজ স্বাভাবিক কিন্তু গতিময় দৃশ্য ও অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সেই সূত্রকে যেভাবে জরম্বিকশিত করেন তা এক আবেগপূর্ণ মানবিক ভাষ্যের অসামান্য উদাহরণ হয়ে থাকে। বাস্তবতা, লমবেদনা ও সংবেদনশীলতার বিচারে এই ছবি নিও-রিয়ালিজমের (ড্র.) পাঞ্চলোর প্রমাণ। আন্তর্নিওনি ছবিটি সম্পর্কে বলেছিলেন, তিনি এর পরিচালক হলে সাইকেলের কথা কম করে বলে লোকটার কথা বেশি করে বলতেন। সাধারণ দর্শকদের যে এই ছবির কথা মনে থেকে যায় তা সাইকেলের চেয়ে অনেক বেশি

শিশুটির জন্ত, এবং শিশুটিকেও প্রতিনিধি-স্থানীয় কোনো শিশুর চেয়ে বিশেষ একটি শিশু হিসেবেই।

চিত্রনাট্য জাভান্তিনি, ডে সিকা প্রমুখ; চিত্রগ্রহণ C. Montuori, সংগীৎ A. Cicognini।

॥ ঐত্রে বাজঁ ১ ॥

( ১৯১৮-১৮ )। ফ্রান্সের প্রখ্যাত চিত্রসমালোচক, La Revue ও কাইয়ে দ্য সিনেমার অত্যন্ত প্রতিষ্ঠাতা, ফরাসি নিউ ওয়েভ চলচ্চিত্র আন্দোলনের প্রধান প্রেরণাদাতা। বিভিন্ন বিষয়ে বয়স্ক শিক্ষা, সিনেমা ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে রচনা, ফিল্ম এ্যাপ্রিসিয়েশন ও ফিল্ম সোসাইটির কাজকর্মে অংশগ্রহণ—তঁার আগ্রহ ছিল বহুমুখী। তিনি মনে করতেন, চলচ্চিত্রের বাস্তববাদী প্রকৃতি সম্পাদনার চেয়ে আরও বেশি ক্যামেরা নির্ভর, অর্থাৎ মনতাজ সম্বত সংবিধানের চেয়ে প্ল্যান-সিকোয়েন্স গঠনের মধ্য দিয়েই ( ড্র. মির্জাসেন ) এই বাস্তবতা সবচেয়ে বেশি অর্জিত হতে পারে। বাস্তবতার কথা বললেও বাজঁ'র নন্দনচিন্তা কিন্তু বস্তববাদী নয়, ভাববাদী, ক্যাথলিক দর্শনের দ্বারা চিহ্নিতও, এক অনবগত বুর্জোয়া সমালোচক তিনি। ফরাসি ভাষায় চার খণ্ডে প্রকাশিত তঁার গ্রন্থে ( যার ইংরেজি নির্বাচন ও অহুবাদ এক খণ্ডে প্রকাশিত, 'হোয়াট ইজ সিনেমা?' নামে ) চিত্রভাষা, চলচ্চিত্রের শিল্পরূপ, বাস্তবতার প্রসঙ্গ, সমাজতাত্ত্বিক অহুষঙ্গ, চিত্রতত্ত্ব—বিভিন্ন বিষয় আলোচিত। রেনোয়াকে নিয়ে তঁার গ্রন্থ এবং ওয়েলস ও ডে সিকাকে নিয়ে তঁার রচনামালাও উল্লেখযোগ্য। বাজঁ'র মস্তক্রে ব্রেসঁর উক্তি, he had a curious way of taking off from what was false to arrive ultimately at what was true, হয়তো তঁার সমালোচনাপূর্ণ লেখার ক্ষেত্রে সত্য। তঁার স্পষ্টত্ব ঘোষণা ছিল, সিনেমার একটা নির্দিষ্ট ভাষা আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি সিনেমাকে এ-প্রকার নিভাষা হিসেবেই নিয়েছেন। তঁার নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ছিল সমস্ত কিছুই কেবল ভালো দিকটা দেখার প্রবণতা। কিছুটা বালকস্বলভ অতিশয়োক্তিও প্রকৃতি বাজঁ'য় লক্ষ্য করা যায়। তাঁকে যেন সিনেমা সম্বোধিত করেছিল, এম ইল্যাসরি বাস্তবতা রক্ষার জন্ত তিনি শেষদিন পর্যন্ত সংগ্রাম করে গেছেন। 'যেন পৃথিবীর বাস্তবতা সিনেমার বাস্তববাদের ওপর নির্ভরশীল' ( ড্র. চলচ্চিত্র সমালোচনা ) তঁার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বস্তবত নান্দনিক এবং সেকারণেই অরাজনৈতিক।

ইজমের আভিধানিক সংজ্ঞা হলো— a distinctive doctrine, cause or theory adherence to a system or a class of principles characteristic or peculiar feature or trait. চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে বিভিন্ন ইজমের কথা বারবার শোনা গেছে। এর মধ্যে প্রথমেই মনে আসে ছাচারালিজম ও রিয়ালিজমের কথা। সাহিত্য ও চিত্রকলায় কোনো একটি ভাবনা প্রভাব বিস্তার করার পর অনেক সময়ই চলচ্চিত্রের ওপরও তার প্রভাব পড়েছে। সাহিত্যের ছাচারালিজম আগ্রহী ছিল তথাকথিত শিল্পসৃষ্টির পরিবর্তে 'Slices of life'কে তুলে ধরায়। প্রকৃতির যথার্থ অনুল্লেখ, 'ছোটক প্রতিচ্ছবি'। রিয়ালিজমের মতো এরও লক্ষ্য ছিল অবজ্ঞেকটিতিটি। রিয়ালিজম বস্তুজগতের সম্পর্ক-উন্মেষের ও জীবন-অন্বেষণ বাস্তব-সম্মত পদ্ধতির পক্ষপাতী। জীবনকে আরও জীবন্ত করে দেখানোর প্রচেষ্টা। চলচ্চিত্রে প্রথম যখন এদের প্রকাশ দেখা গেল তখন এদের সঙ্গে কল্পনা ও অতিরঞ্জন কিছুটা থাকতই। প্রসঙ্গ ও পদ্ধতিতে তা কিছুটা থাকলেও মূল উদ্দেশ্য ছিল বস্তুজগতের সঙ্গে চিত্র-উপাদানের স্বাভাবিক ও বাস্তব নৈকট্য বজায় রেখে চিত্রনির্মাণ। চলচ্চিত্রে বাস্তববাদের প্রথম বহু আলোচিত ও বহু বিতর্কিত প্রসঙ্গ। রিয়ালিজম থেকে আবার একাধিক শাখা বেরোল—সোশ্যাল রিয়ালিজম, সম-সাময়িক পরিস্থিতিকে সাহিত্যে বা চিত্রে ধরার চেষ্টা, যা মূলত বামপন্থী আদর্শে অনুপ্রেরিত। পোয়েটিক রিয়ালিজম, দৃশ্যরস গতিচ্ছন্দ ও কাব্যিক উপস্থাপনায় এই শাখা লিরিকাল স্বপ্নমা এনে দিল। ফ্ল্যাহার্টের একাধিক ছবি বা পথের পাঁচালী এই ধারার। সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজম, এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এইভাবে, 'Collective statement and expression of useful and mass subjects that bear social and political relevance of the marxist belief.' জনসাবারণকে উদ্বুদ্ধ করার উপযুক্ত হাতিয়ার হিসেবে ও শিল্প / সংস্কৃতি দৃষ্টিতে সফল বুদ্ধোত্তর ধারণার বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে এর সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে। বিশেষত সোভিয়েত রাশিয়ার চলচ্চিত্রে। এর বিপরীত মেরুতে অবস্থিত ছিল জার্মানিতে জন্ম নেওয়া এক্সপ্রেসনিজম ( দ্র. )—যা মূলত অনুভবাত্মক এবং যার লক্ষ্য হলো বিকৃতি ও অতিশয়ের মধ্য দিয়ে ছোটন্যায় সন্ধান। এক্সপ্রেসনিষ্ট চলচ্চিত্রে মানুষ চিত্রিত অতিপ্রাকৃত ও ভয়াল অলৌকিক শক্তির জীড়নক হিসেবে। এখানে বারবার আবির্ভাব ঘটেছে সমাজের বাইরের ও সমাজবিরোধী চরিত্রে

একরকম না হলেও নঞর্থক অনুবোধই ছিল সাররিয়ালিজম ( ড্র. ) যাকে ১৭৭১  
হয়েছে ‘truth of the irrational’, ‘যুক্তি, নান্দনিক বা নৈতিক শৃঙ্খলার পরোক্ষা-  
না করে চিন্তার বিস্তৃত প্রবাহের প্রকাশ’, বাস্তবতাকে বিশ্বাস করে তোলার মত  
বাস্তবকে অতিক্রম করা দরকার এই মত। ইন্ড্রিয়ের মাধ্যমে ব্যক্তি ও বিশ্বকে  
জানার এ এক উপায়। এর অভিব্যক্তি প্রয়োগ ঘটেছে বুল্‌য়েলের ছবিতে।  
চলচ্চিত্রের মাধ্যমটির মধ্যেই যে বাস্তবতাবোধ রয়ে গেছে তা আর একটি সৃজনশীল  
রূপ পেল নিও-রিয়ালিজমে ( ড্র. )। নুভেল ভাগ ( ড্র. )-য়ে এসে বাইরের বাস্তব  
ছাড়িয়ে অন্তর্বাস্তব হয়ে উঠল চিত্রপরিচালকদের উপজীব্য। দিম্বলিজম, স্ট্রাকচার-  
লিজম প্রভৃতি একদিকে অন্তর্বাস্তবের বিভিন্ন প্রসঙ্গকে অত্মদিকে গঠনবাদ ও  
আঙ্গিকের গুরুত্বকে জোরদার করেছে। প্রসঙ্গ বা বিষয়ের দিকে অতীতে যে  
বাড়তি বোঁক পড়েছিল অনেকটা তার প্রতিক্রিয়া হয়েই যেন বর্তমানে গঠন  
পদ্ধতির উপর অতিরিক্ত স্কোর পড়ছে। এখানে ফিউচারিজম ও ইউট্যানিজমের  
কথাও উল্লেখ করা যায়। উপাদানগত ভাবে এরা বাস্তবতাকে ও পদ্ধতিগত ভাবে  
থ্যারেটিভ রীতিকে আঘাত করেছে। কিন্তু এই সমস্ত ধারায় পুরোদস্তুর চলচ্চিত্র  
নির্মাণ আজও হয়নি। ( ড্র. সেমিঅলজি )

### ॥ ইঙ্গমার বার্গম্যান ॥

১৯১৮য় তাঁর জন্ম, সুইডেনে। দশ বছর বয়সে তাঁকে একটা প্রোজেক্টার দেয়া  
হোয়েছিল। আর সেই থেকেই সিনেমার প্রতি তাঁর আগ্রহ। বাইশ বছর বয়সে  
তাঁর প্রথম সাফল্য আসে মঞ্চে ‘ম্যাকবেথ’ প্রোডাকশনে। তিনি একের পর এক  
নাটক লিখতে শুরু করেন, মঞ্চে তা পরিচালনা করতে শুরু করেন। কিছুদিনের  
মধ্যেই অনুভব করেন অল্প একটা মাধ্যম চাই। শুধু থিয়েটারে তাঁর চলবে না।  
বোধহয় ৪৪ সাল। বার্গম্যান নিজেই বলছেন, Carl-Anders Dymling  
হলসিংবর্গে আমার সঙ্গে ছাখা করতে এলেন। ওখানকার থিয়েটারে আমি  
আর্টিষ্টিক ডিরেক্টার। তিনি একটা ড্যানিস নাটক কিনেছেন, Moderdyret.  
কিংবা ওরকমই কিছু একটা। এটা নিয়ে উনি একটা ছবি করতে চাইলেন।  
যাদেরই তিনি অফার করেছেন সবাই পিছিয়ে গেছে। তিনি আমাকে বললেন,  
‘তুমি যদি Moderdyret করো তুমি একটা ফিল্ম করতে পারো।’ আমি বললাম,  
‘আমি যদি ছবি করার সুযোগ পাই আপনার পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো  
রাবিশও আমি করতে রাজী।’ Dymling বললেন, ‘তাহালে এটাই ফাইনাল।’

এই আমার প্রথম ছবি করা। ছবি। ফিল্ম। সিনেমা। ওঃ আনন্দে আমি একে-  
বারে দিশেহারা।

এই Dymling-এর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘকালের সম্পর্ক, এই একটা মানুষ যিনি  
বার্গম্যানকে ক্রমাগত দিয়ে গেছেন শৈল্পিক স্বাধীনতা, যা একটা মানুষের  
পক্ষে দেয়া সম্ভব। নিজের জন্তে তিনটি অনুশাসন ঠিক করেছিলেন বার্গম্যান।  
১. ছবি ক'রে দব সময় আনন্দ দাও ২. সর্ব সময়ে শৈল্পিক চেতনা মনে চলো  
৩. সর্বদা, ছবি করার সময় মনে রেখো এটাই তোমার শেষ ছবি।

১৯৪৫ থেকে ১৯৫০, এই ছ বছরের মধ্যে ছবি করলেন ১০ খানা। ১৯৪৫এ,  
'Crisis', ৪৬-এ, 'It Rains on our Love', ৪৭-এ, 'A Ship Bound for  
India', ৪৭-এ, 'Music in Darkness', ৪৯-এ, 'Towards Joy', ৫০-এ,  
'This can't Happen Here'. চিত্রনাট্য প্রথম থেকে তিনি নিজেই লিখছেন।  
কখনো সাহায্য করেছেন Herbert Grevenius. 'Music in Darkness'  
আর 'This can't Happen Here' এবং 'Thirst' এই তিনটি ছবিতে নিজে  
তিনি চিত্রনাট্য লেখেন নি। অল্প চারটি ছবি : 'Port of Call', 'Prison'-  
৪৮-এ, 'Thirst' ৪৯-এ, ৫০-এ 'Summer Interlude'.

Crisis পরিচালক হিসেবে তাঁর প্রথম ছবি। শূন্যতা, নিঃসঙ্গতার পাশাপাশি  
এলো এই কথা, মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন, একসঙ্গে নারী পুরুষের থাকা, যদি  
তারা জীবনের চাপ, জীবনের ভার, এসবের বিরোধিতা করতে চায়, প্রতিরোধ  
করতে চায়। মানুষ একা মনের শান্তি অর্জন করতে পারে না। তাকে সাহায্য  
চাইতে হবে, কিংবা মরে যেতে হবে। দুটি দুর্দশাগ্রস্ত নারী পুরুষ আবার এলো,  
তারা ঠিক করল, তারা একসঙ্গে পৃথিবীর পাপের মুখোমুখি দাঁড়াবে। এই সিদ্ধান্ত,  
রেলওয়ে ইন্টিশনে তাদের দেখা হবার পর, ছবিটির নাম It Rains on our  
Love. প্রথম দিককার এই ছবিগুলোতেই খুঁজে পাওয়া যাবে, ভালোবানার  
শিকড় তো যৌনতায়। অবিশ্বি ভালোবানা ছাড়াও যৌন কামনা দেখা দিতে  
পারে। যৌনতা ছাড়াও ভালোবাসা দেখা দেয়। A Ship Bound for India  
কিছু পরিমাণে করামি চলচ্চিত্র নির্মাণের Carne-Duvivier স্কুলের দ্বারা  
উৎসৃষ্ট। Music in Darkness-এক যুবকের কাহিনী। মিলিটারি থেকে সে ঘুরে  
বেড়ায় এক ভাঙাচোরা জায়গা থেকে আর এক জায়গায়। তার একমাত্র সঙ্গী  
পরিত্যক্ত, বঞ্চিত একটি মেয়ে, সে তাকে বিয়ে করে। এই ছবিতে আহত পীড়িত  
যৌবনের কথা বলেন বার্গম্যান। স্বীয় হীনতা সম্বন্ধে অবচেতন ধারণায় কিভাবে

মানসিক বিশৃঙ্খলা আসে। হীন-মানসের জটিলতার এক মুক বিবরণ এখানে। এই বিষয়ের ওপর টমাস মান তাঁর যে শৈল্পিক দক্ষতার পরিচয় দেন তাঁর গল্পগুলিতে, বার্গম্যানও সেই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

বার্গম্যানের ছবি, এক বিরূপ বিখে মানুষের নিয়ত জ্ঞানের সন্ধান। ওয়াল্ট মান্নের আকাঙ্ক্ষা শুধু Music in Darkness-এ নয়। এরকম মানুষ কি সমাজের এক হীনমস্ত সদস্য মাত্র? Towards Joy খোঁজে বিবাহিত জীবনের ক্ষয়, ভালোবাসার অভাবের জন্তে এই ক্ষয় ধরে না। নায়ক দুর্বল, সে তার বিপথে চালিত করতে, প্রলুব্ধ করতে স্বেচ্ছা দেয়, এক বুদ্ধ অভিনেতার স্ত্রীকে। ছবিটির সমাপ্তিতে আমরা এটাই শুধু অনুভব করি, শিল্প ছাড়া আর কিছুই টেনে না। মিউজিক, যে কোনো বোঝাপড়া যে কোনো যন্ত্রণার বাইরে এই শিল্প শুধু আনন্দের। বার্গম্যানের ছবিতে এইখানেই প্রথম আশার কথা আমরা শুনে পাঠ, Summer Interlude-এ এই একই সুরে তিনি শেষ করেন, এই আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশের জন্তে, ব্যবহার করা হয় উচ্চাঙ্গ সংগীত। This can't Happen Here, আধা-পলিটিক্যাল গল্প। একটি তরুণী, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় রাশিয়ার আক্রমণে, বাধ্য হয় সুইডেনে আশ্রয় চাইতে। মেয়েটির বিরুদ্ধে বড় কিছু জোর করে চাপানো হয়েছে, চাপিয়েছে অথরিটি, মূলতঃ পুলিশ।

বার্গম্যান বলেছেন, শৈশবে আমার কোনো পরামর্শদাতা ছিলো না। কোনো শিক্ষক ছিলো না। ইস্কুল মাস্টাররা সব আমার মতোই হালছাড়া, যেন কাল, কিরকম সবই যেন চিলেঢালা। যখন প্রাইভেট স্কুলে পড়তাম, হয় আমি অসুস্থ থাকতাম, নয় অ্যাবসেন্ট হতাম। শিশুকালটা কিংবা কৈশোর যৌবনের প্রথম দিনগুলো, বিশেষ শেষ কিংবা তিরিশের গোড়ায় আমি তো এমন একটা পরিবেশে বড়ো হচ্ছিলাম, এমন স্কুলে পড়ছিলাম, যেন আমার আধো ঘুমে দিন কাটছিল। অনুভূতি টনুভূতি সব ভালগোল পাকিয়ে গিয়েছে, বুদ্ধির ক্ষুধা নেই বলেই চলে।

তিনি মনে করেন, রাজনীতি সমাজ সমস্যা ইত্যাকার বিষয়ে তিনি কৌতূহলী নন। বার্গম্যান জড়িত ধর্মীয় প্রশ্নে। শুধু ধর্ম নয়। ধর্মীয় ও মনস্তাত্ত্বিক পথে। নিজেরই বলেছিলেন, ধর্মীয় ভাব ছাড়া অল্প কিছু তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেনি। বলেছেন, মুক্তি কিংবা অভিশাপ, স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলিত অবস্থা সে শুধু রাজনৈতিক প্রশ্ন নয়। আমার কাছে সেটা ধর্মীয় স্তরে। সেই সব পুরনো দিনগুলোতে আমার সামনে সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন, ঈশ্বর আছেন কি? নাকি ঈশ্বর নেই? তাঁর অস্তিত্ব

নেই ? আমরা কি একটা বিশ্বাসের মনোভাব নিয়ে একটা উচ্চতর উন্নততর পৃথিবীতে পৌঁছাতে পারি ? ঈশ্বরের অস্তিত্ব যদি নাই থাকে তাহলে আমরা কি করছিটা কি ? আমরা কি করব ? আমাদের দুনিয়াটা তাহলে কেমন দেখাচ্ছে ? গুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে আমার বিদ্রোহ আসলে প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ।

বেশিরভাগ সমালোচকই বলেছেন বার্গম্যানের মৌলিকতার প্রথম পরিচয় 'Port of Call'-এ, কারো মতে তা নয়, আসলে তা 'Prison'-এ । হুটোই ১৯৪৮-এর ছবি । 'Port of Call'-এ গোস্তা আর বেরিং-এর দেখা হয় গোটবার্গে । বেরিং তার বন্ধুর কাছে ধীরে ধীরে উন্মোচন করে তার দুঃসহ স্বভাব । তার অভিভাবকরা কী ভয়ঙ্কর ঝগড়া করত তাদের ছোট্ট বাড়িতে । সে গোস্তার প্রতি কী এক আশ্চর্য আকর্ষণ বোধ করে । ছবির শেষে ক্যামেরা যেন কয়েকটা ঝাঁচড়ে চিরে দেয় দিনেমার পর্দা । ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল এখানে ব্যবহৃত হয়, যা 'So Close to Life'-এ স্তিনার ডেলিভারীর সময় আমরা দেখতে পাই । বেশ কিছু সংলাপও, বার্গম্যানের পরবর্তীকালের ছবিতে আমরা শুনতে পাই । একটা ঝগড়ার সময় বেরিং বলে, 'কী দরকার আমাদের একজনের আর একজনকে এরকম জালাবার ?' আর একটি মন্তব্য : 'নিঃসঙ্গতা ভয়াবহ' । সে তার মার দিকে টেঁচিয়ে বলে, 'আমি চাই তুমি মরো, তোমার সঙ্গে আমিও মরি' । মানবজীবন যেন একটা জেলখানায় বন্দী । যেখান থেকে মৃত্যুই একমাত্র মুক্তি এনে দিতে পারে । বেরিং বিমর্ষভাবে নিজের মুখের দিকে তাকায়, আয়নায় তার মুখ ভেসে ওঠে, সেখানে কাঁচের ওপরে তার লিপষ্টিক দিয়ে সে লেখে, 'ensam' একা । একজন সুইডিশ সমালোচক Prison সম্পর্কে বলেছেন, a confounding and inspiring embroidery on the theme that life is a hell which moves in a cruel and voluptuous arc from birth to death. কাইয়ে ছা দিনেমায় ( নভেম্বর ৬১ ) Jacques Siclier বলেন, এটা বার্গম্যানের নবথেকে টম্পারট্যান্ট ছবি । Peter Cowie এটাকে remarkable ছবি বলে উল্লেখ করেন । বলেন, Here at last the preoccupations of an imaginative artist are revealed in a profound manner. Significantly, it is his first entirely personal work.

১৯৫০ : 'Summer Interlude.' ১৯৫২ : 'Waiting Women', 'Summer with Monika'. ১৯৫৩ : 'Sawdust and Tinsel'. ১৯৫৪ : 'Journey into Autumn', 'A Lesson in Love'. ১৯৫৫ : 'Smiles of a Summer

Night'. ১৯৫৬ : 'The Seventh Seal'. ১৯৫৭ : 'Wild Strawberries'  
 ১৯৫৮ : 'So Close to Life', 'The Face'. ১৯৫৯ : 'The Virgin Spring'.  
 ১৯৬০ : 'The Devil's Eye'. ১৯৬১ : 'Through a Glass Darkly'.  
 ১৯৬২ : 'Winter Light'.

বার্গম্যান আত্মবিশ্লেষণ করে চলেছেন। নিজের সম্পর্কে নিজেকে নানা প্রাণে তিনি ক্ষতবিক্ষত করেছেন। নিজের ছবি সম্পর্কে, নিজের চিত্রনাট্য, অভিনেতা অভিনেত্রী, সহকর্মী, ক্যামেরাম্যান এডিটর সেট ডিজাইনার সকলের সম্পর্কে নানা মন্তব্য করেছেন নানা সময়ে। কখনো তিনি নিজের ছবির আলোচনা থেকে দূরে থাকেননি। কিভাবে তিনি চিত্রনাট্য লেখেন, ক্যামেরা বসান, অভিনেতাকে দিয়ে কাজ করান, কার দ্বারা তখন তিনি উদ্বুদ্ধ, কার সঙ্গে কখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন, খুব স্পষ্ট করেই এসব কথা যিনি বলেন তাঁর নাম ইঙ্গমার বার্গম্যান। বার্গম্যান বলছেন, যেভাবে আমি আমার কাজের সময়কে ভাগ করার কথা ভাবি, তাতে আমাকে নিয়মানুযায়ী চলতেই হয়। সমস্ত পরিকল্পনাটা অনেক আগেই অগ্রিম দমাও। তারপর লিখতে বসি। আমার চিত্রনাট্য রচনাটা খুব মেথডিক্যাল, নিয়মানুবর্তী, একেবারে স্কুল-শিক্ষকস্বলভ অভ্যস্ততায় এগিয়ে যায়। ষ্ট্রীটবার্গের প্রতি আমি কখনো গভীর আকর্ষণ বোধ করেছি, কখনো বিরক্ত হয়েছি। নারী সম্পর্কে আমার দর্শনের যে তথাকথিত ধারণা প্রচলিত, আমি বলতে পারি এ ব্যাপারে আমি বিশেষভাবে স্মৃশূল নই, যেমন মারীয়ান হুক তাঁর বইতে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। পুরুষ আর নারীর মধ্যে কোনো বিশেষ পার্থক্য নির্ণীত হোক আমি চাই না। নারী সম্পর্কে আমার কোনো মীমাংসিত দর্শন নেই। মেয়েদের সঙ্গে কাজ করতে আমার ভালো লাগে, সেটা আর কিছু নয়, যেহেতু আমি পুরুষ মানুষ। আমি আমার নিত্য কাজে অনেক পেশাদার মহিলার সঙ্গে রয়েছি, আর সত্যিই এদের কখনো আমার ক্ষয়ে যাওয়া কিংবা স্নায়বিক পীড়াগ্রস্ত মনে হয়নি। Now about these Women সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য, 'ওটা আমার একটা বদ-মেজাজের বিস্ফোরণ। 'ওটা একটা ব্লাডি স্ট্রাট্ট ফিল্ম।' Virgin Spring সম্পর্কে বলেছেন, 'ওটা কুরোশাওয়ার অনুকরণ। ওটা একটা ফসিল। লেখিকা উল্লা ইসাকসন আর আমি দুজনই দুজনকে ভুল পথে প্রভাবিত করেছি। Virgin Spring-এ আমরা দুজন দুজনকে প্রভারণা করেছি। একদিন ঐ ছবিটা একবার Vilgot Sjomanই সমালোচনা করেছিল। তখন আমার মনে হয়েছিল Vilgot অস্তুর ভালো সহ করতে পারে না। এখন দেখছি, একসময় ও যা বলেছিল,

এখন আমার ঐ ছবি সম্পর্কে আমিও সেকথা বলছি।' বার্গম্যান আবার বলেছেন, **Summer Interlude** আমার দামী ছবিগুলোর মধ্যে একটা। এই আমার প্রথম ছবি যেখানে আমি অনুভব করেছি আমি স্বাধীন ভাবে কাজ করছি। একা কাজ করছি। নিজস্ব ষ্টাইল তৈরি করছি, একটা ছবি করছি যার সর্বত্র 'আমি'। অন্য ছবিগুলোর থেকে এটা আলাদা। এটা পুরোপুরি আমার নিজের কাজ। হঠাৎ আমি বুঝতে পারছিলাম আমি ঠিক জায়গায় ক্যামেরা রাখছি, ঠিক কল পাচ্ছি, যা চাইছি তাই পেয়ে যাচ্ছি।

Thirst বিষয়গতভাবে যেন Prison-এর একটা অবিকল প্রতিক্রম। Cinema 58-এ Beranger একে বলেছেন, 'a sort of VOYAGE EN ITALIE revised by Sartre'. দুজনে নরকে থাকা, একা নরকে থাকার চেয়ে ভালো। সার্কাস নিয়ে চমৎকার ছবি Sawdust and Tinsel. ভ্রমণের দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করো, বার্গম্যানের প্রায় সব ছবিতেই আমরা এটা জানতে পারি। ছবির নায়ক Albert যেন এক প্রামাণ্য ওথেলো, মনে পড়িয়ে দেয়, সেই জার্মান নায়ককে, Emil Jannings যা করেছেন, Vaudeville, The Last Laugh, The Blue Angel, এসব ছবিতে। আগের সব ছবির টেকনিককে বার্গম্যান এখানে ছাড়িয়ে যান। Face-এর আঙ্গিক এখানে আন্দাজ করা গেল। আকাশের নীচে ক্যারাভানের সিলুয়েট শট, এই দিয়ে শুরু।

মধ্যপর্বে, বার্গম্যান ব্যস্ত নারী নিয়ে তাঁর শৈল্পিক গবেষণায়, এবং পুরুষের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায়। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি মগ্ন হয়ে যান ভগবানের সন্ধানে মানুষের জীবনের জীবনমরণ খুঁজে পেতে। Sawdust and Tinsel পর্যন্ত, Summer Interlude-ই তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবি। কাইয়ে দু দিনেমায় গদার বলেছেন 'The finest of films'. পরিচালক বলেছেন, ওটা তৈরি হয়েছে, 'with my heart'. তাঁর ১৭ বছর বয়সের একটা গল্প থেকে ছবিটা তিনি বানিয়েছেন।

আত্মনিওনির মতো বার্গম্যানও শিল্পের চূড়ান্ত দাকল্য অর্জন করেন, যখন তিনি একটি কি দুটি চরিত্রের ওপরই শুধু মনোনিবেশ করেন। পরবর্তীকালে যার একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ তাঁর ১৯৭৮ সালের ছবি 'The Autumn Sonata'। মা আর বেয়ে, ইনগ্রিড বার্গম্যান আর লিভ উলম্যান, একালের একটা অসামান্য ছবিতে আমরা দুজনের অভিনয় দেখি Autumn Sonata-য়। বার্গম্যান প্রতিভার এক চরম প্রকাশ 'The Seventh Seal' (ত্র.) ছবিতে, যেখানে মৃত্যুর চোখে শলকে ওঠে দাবা খেলার ইচ্ছে।

এরকম একটি ছোট আলোচনায় বার্গম্যানের চলচ্চিত্র নির্মাণের যে বিশাল ইতিহাস, তার ক্ষুদ্র একটা অংশও উল্লেখ করা সম্ভব নয়। অন্ততঃ আমার পক্ষে। তাই দু' একটা ছবির কথা, দু' একটা তাঁর নিজের কথা।

যেমন 'So Close to Life'. বার্গম্যানের অসাধারণ ছবি কিছু নয়। ৩৭ এই ছবিটাতেই চলচ্চিত্রকার বার্গম্যানকে আমরা চিনে নিতে পারি। এই ছবিতে ডেলিভারী রুমে যখন স্ত্রীনােকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সে তার বন্ধুদের বলে, 'তয় পেয়ো না, জীবন তো এরকমই।' এই কথাটাই বার্গম্যানের জীবনদর্শনের সংক্ষিপ্তসার।

কোনো জানা আপনাতোই একান্ত স্বতন্ত্র নয়। সৃষ্টির চরম উদ্দেশ্য কখনো অস্তিত্ব সফলতা লাভ করে না। তাই তো এত প্রশ্ন, এত জিজ্ঞাসা তাই ভাবনা চিন্তা ঘটনার এই পারস্পরিক সম্বন্ধচ্যুতি। মানুষ তার অস্তিত্ব অচূড়িত করতে চায়, তার অর্থ উপলব্ধি করতে উদ্বেগ, অসহ্য দুঃখকষ্টে নির্ভূর আঘাতে মানুষ ছিন্নভিন্ন, অপকৃত সৃষ্টির সর্বনাশ নেমে আসছে, এ কি প্রকৃতির অন্ধ নিয়ম, এই কি বিধাতার বিধান? তন্নতন্ন করে বার্গম্যান জীবনকে দেখেছেন, মৃত্যুকে জেনেছেন।

৭৮ বছরের বৃদ্ধ Victor Sjostrom-কে নিয়ে তিনি কাজ করেছেন 'Wild Strawberries' ছবিতে। চিত্রনাট্য দেখে বৃদ্ধ পিছিয়ে গিয়েছিলেন। বার্গম্যান বলেছেন, 'আমার ঠুঁকে চাই। আমি বিশ্বাস উৎপাদনের সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করলাম, আমার সব শক্তি ব্যবহার করলাম। ঠুঁকে দিয়ে ওই রোলটা করাতেই হবে।' শেষ অন্ধি তিনি রাজী হলেন। বার্গম্যান বলছেন, 'কফিন সীনগুলো নিয়ে আমি একটু বিভ্রত ছিলাম, ভীত ছিলাম। একজন বৃদ্ধের পক্ষে কফিনে গিয়ে শুয়ে থাকা...কী ক'রে বলি ঠুঁকে? কিন্তু বৃদ্ধ নিজেই এগিয়ে এসে বললেন: 'কফিনের সীনটা কি আমরা করব না?'

১৯৬৩ : 'The Silence', ১৯৬৪ : 'Now about these Women', ১৯৬৬ : 'Persona' এবং 'Hour of the Wolf', ১৯৬৭ : 'The Shame', ১৯৬৮ : 'The Rite', ১৯৬৯ : 'A Passion', 'Passion of Anna', এবং 'Paro Document', ১৯৭১ : 'The Touch', ১৯৭২ : 'Cries and Whispers', ১৯৭৩ : 'Scenes from a Marriage', ১৯৭৪ : 'The Magic Flute', ১৯৭৬ : 'Face to Face', ১৯৭৭ : 'The Serpent's Egg', ১৯৭৮ : 'Autumn Sonata', ১৯৮০ : 'From the Life of the Marionettes', ১৯৮৩ : 'Fanny and Alexander'.

বার্গম্যান পৃথিবীর পাঁচজন শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকারের একজন। আপনি হয়তো মনে করেন, পাঁচজন নয় দশজন। কিন্তু এ নিয়ে তো কোনো তর্ক হয় না।

তার ছবিতে ঘুরে ফিরে এসেছেন গুনার বরনফ্র্যান্ড, ম্যান্ন ভন সীডো (ড্র.), বিবি এ্যাণ্ডারসন, হ্যারিয়েট এ্যাণ্ডারসন, ইনগ্রিড থুলীন (ড্র.), গুনেল লিওরম, গুনার ফিশার (ড্র.), নিকভিস্ট (ড্র.), লুন্ডগ্রেন, ত্রিজিটা প্যাটারসন, এরিক মরড্‌গ্রেন, আরো অনেকে আর লীভ উলম্যান (ড্র.)। তাঁর শিল্পের সঙ্গে এঁদের রক্তের সম্পর্ক। মানুষের চিরন্তন আত্মদ্বন্দ্বের কাহিনীকে এঁরাই শিল্পিত করেছেন। Cinema 58-এ Eva Dahlbeck একটা দাঙ্কাৎকারে বলেছেন, 'He discovers himself as he discovers his art'.

২৭ বছর বয়সে তিনি প্রথম ছবি করেছেন।

'Through A Glass Darkly'র শেষে ডেভিড বলেছেন, 'God is love, love in all its forms.'

৩৬ বছর ধরে বার্গম্যান তাঁর ছবিতে এই ভালোবাসার কথা বলছেন। Seventh Seal, Wild Strawberries, Silence, Hour of the Wolf, Touch, Scenes from a Marriage, Autumn Sonata যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি সেই পৃথিবীর মৃত্যু আর ভালোবাসার কথা। প্রত্যেকটিই অসামান্য ছবি। তাঁর ছবি একালের মানুষেরই কথা, তবু সে কথা যেন সৃষ্টির একেবারে প্রথম দিন থেকে মানব মানবীর ইতিহাস। তারা 'One flesh'— তাদের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। বার্গম্যানের ছবি একদিকে যেমন ভালোবাসার কথা অল্পদিকে তেমনি দুঃখের ইতিহাস। এক বিরামহীন প্রবাহ। নাটকে আর সিনেমায় একই সঙ্গে সৃষ্টিশীল এই প্রতিভা। মানুষের পাপ, মানুষের পুণ্য, তার হিংসা, প্রতিশোধ, কামনা, আকাঙ্ক্ষা আর ঈশ্বরসন্ধান চলচ্চিত্রকার বার্গম্যানের চৈতন্যের উপর অনবরত আঘাত করছে। সিনেমার এমন শৃঙ্খলা আর কোথায়, এমন প্রবহমানতা? মানুষ অমৃত আকাঙ্ক্ষা করে, এই অমৃত ঈশ্বর, এই অমৃত ভালোবাসা। 'Touch' ছবির বিবি এ্যাণ্ডারসনকে আমরা কখনো ভুলি না। গোটা জীবনটাই একটা বিরহ-বেদনা। আমাদের সমগ্র সম্ভায় ব্যাপ্ত হয়ে যায় তাঁর নারী। 'Silence'-এর ইনগ্রিড থুলীনকে আমরা কখনো ভুলি না, আমাদের মুগের বড়ো কাছে চলে আসে 'Autumn Sonata'-র লীভ উলম্যানের মুখ। ঈশ্বরের স্বপ্ন ছাখে সকলেই, ভালোবাসার স্বপ্ন ছাখে সকলেই। দুঃখের রূপান্তর ঘটেছে বারে বারে। বার্গম্যানও যেন বলতে চান, চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম

আমি, আর দামবজাতির দুঃখে আমার আত্মা বিদীর্ণ হলো। আকাঙ্ক্ষার শোনেই, অশ্রুচ্ছিতে তার অনবরত সন্ধান।

‘The Hour of the Wolf’, ‘Scenes from a Marriage’, ‘A Passion’, এসব ছবির কথা আমরা অনেক পড়েছি। এখনো দেখিনি। এসব ছবি দেখার স্বযোগ আমরা এখনো পাইনি। না পেয়ে ভালোই হয়েছে। Autumn Sonata বা Fanny and Alexander দেখে ভালো যেমন লাগলো, খারাপও লাগলো। খারাপ লাগলো এই জন্মে যে জেনে ফেললাম, দেখে ফেললাম।

আমাদের প্রতিদিনের জলতেষ্ঠার মতোই আমাদের কাছে ইন্ডমার বার্গম্যানের ছবি।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : রবিন উডের ইন্ডমার বার্গম্যান, B. Steene-র ইন্ডমার বার্গম্যান, প্রলয় শূরের বার্গম্যান।

প্রলয় শূর

॥ ইনগ্রিড বার্গম্যান ॥

( ১৯১৫-৮২, সুইডেন )। এই প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী ১৯৩৪ থেকে পরবর্তী পঁয়তাল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে হলিউড ( সুইডেন থেকে তিনি আমেরিকা চলে আসেন ১৯৩৮য়ে ) ও অল্পত্র অল্প ছবিতে অভিনয় করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য অভিনয়ের মধ্যে রয়েছে Intermezzo, ক্যাসার্ল্যাঙ্কা, ফর ছয় দি বেল টোল্‌স্, গ্যাসলাইট, স্পেলবাউণ্ড, Joan of Lorraine, জোয়ান অব আর্ক, ইউরোপা ৫১, অ্যানাস্টেশিয়া, ক্যাকটাস ফ্লাওয়ার, মার্ভার অন দি ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস, অটাম সোনাটা প্রভৃতি ছবি। নানা ধরনের চরিত্রে তিনি অভিনয় করেছেন—রোমান্টিক ও ট্রাজিক, আত্মকেন্দ্রিক ও উৎকেন্দ্রিক ; নানা রীতিতে অভিনয় করেছেন—শ্রাচারালিষ্টিক ও ক্লাসিক, ইনকর্মাল ও এক্সপ্রেসনিষ্টিক। তাঁর সহজাত দৃশ্য-সৌন্দর্য ও অভিনয়ে ব্যক্তিগত একান্ততা, এই দুই গুণের মিলনে, অর্থাৎ স্বয়ম্বা ও প্রত্যয়ের সংমিশ্রণে বার্গম্যান-এর অভিনয় খুবই মনোগ্রাহী। বার্গম্যানের অটাম সোনাটা ছবিতে উলম্যানের সঙ্গে ও বিপরীতে তাঁর অভিনয়ে এর সবচেয়ে সুন্দর প্রমাণ মেলে। তিনি একদা ছিলেন রোবের্তো রোজেলিনির স্ত্রী।

## ॥ বার্থ অব এ নেশন ॥

১৯১৫, আমেরিকা। টমাস ডিক্সনের কাহিনী অবলম্বনে, গ্রিফিথ পরিচালিত মহাকাব্যোচিত, স্বদীর্ঘ চিত্র ( প্রদর্শন কাল ১৬০ মিনিট, শট সংখ্যা ১৩৭৫ ) বার্থ অব এ নেশন আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পটভূমিতে স্থাপিত। পটভূমির বিশালতা, ঐতিহাসিক ঘটনার যথার্থ, মূল কাহিনীর সঙ্গে বহু উপকাহিনীর সফল সংমিশ্রণ, আড়ম্বরপূর্ণ দৃশ্য ও সেটিংয়ের ব্যবহার, অভিনয়ের সমৃদ্ধি, চিত্রভাবায় ও সম্পাদনা রীতিতে বহু প্রারম্ভিক আবিষ্কার ( ড্র. ইনটলারেন্স, গ্রিফিথ ), দৃশ্য পরস্পরায় সাংগীতিক ছন্দ সৃষ্টি ইত্যাদি নানা কারণে এই ছবি আজও চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একটি অন্তর্গত শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। চলচ্চিত্রকলার ইতিহাসে প্রথম ক্লাসিক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে এই ছবি। এর বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তাও ( প্রযোজনা-ব্যয় ১ লক্ষ ১০ হাজার ডলার, প্রদর্শনী-আয় ২ কোটি ডলার ) একটা অসাধারণ রেকর্ড। ছবিটি রাজনৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল এবং আমেরিকার জনসাধারণের এক অংশের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিল ক্রোধ ও বিক্ষোভ। কেননা ছবির বহু স্থানে প্রকাশ পেয়েছিল গ্রিফিথের নিগ্রো-বিরোধী মনোভাব।

অভিনয়ে ওয়াপ্টহল, মে মার্শ, আর লিউইস, লিলিয়ান গিশ ও স্ট্রাইম ; চিত্রগ্রহণ বিলি বিটজার, সংগীত জোসেফ ব্রাইল, চিত্রনাট্য গ্রিফিথ, উড্‌স্ ও ডিক্সন জুনিয়র ॥

## ॥ বেলা বালাজ ॥

( ১৮৮৪-১৯৪৯ )। হাঙ্গেরীয় লেখক, চলচ্চিত্র তাত্ত্বিক ও সংগীতপ্রেমী। নতুন শিল্প মাধ্যম চলচ্চিত্রের জন্ম একটি নতুন নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে বালাজের সিনেমা সংক্রান্ত রচনাগুলির বিশেষ ভূমিকা আছে। বামপন্থী মতবাদের সঙ্গে সক্রিয় যোগাযোগের ফলে হৃদির আমলে তাঁকে দেশ ছাড়তে হয়। তিনি অস্ট্রিয়া ও জার্মানিতে গিয়ে কয়েক বছর কাটান ও নাৎসিদের উত্তরের আমলে জার্মানি ছেড়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে যান ও সেখানে চলচ্চিত্র বিষয়ে শিক্ষকতা করেন। ১৯৪৫য়ে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার কালে তিনি হাঙ্গেরী ফিরে যান ও সেই দেশের চলচ্চিত্রশিল্পের উন্নয়নে প্রধান ভূমিকা নেন, সাহায্য করেন চেকোস্লোভাকিয়ার চলচ্চিত্রশিল্পকেও। ১৯৫৮য় হাঙ্গেরীয় তরুণ চিত্রনির্মাতারা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা

নিবেদনের জন্ম যে বেলা বালাজ স্টুডিও গঠন করেন তা অসাধারণ শৈল্পিক  
কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ থিয়োরি অব ফিল্ম, ক্যামেরা-নাচ  
অ্যাণ্ড প্রোথ অব এ নিউ আর্ট। এছাড়াও তাঁর আরো দুটি বই প্রকাশিত হয়।  
বেলা বারটক-এর ভাষ্য রচয়িতাও তিনি। এ ছাড়া তিনটি চিত্রনাট্যও লিখেছেন  
তিনি। বালাজ দিনেমাকে অল্প নানা শিল্পের সময়রূপেই দেখেছিলেন এবং  
চলচ্চিত্র সংস্কৃতির ব্যাপক প্রদার দরকার তা বুঝেছিলেন।

## ॥ বিচ্ছিন্নতা ও চলচ্চিত্র ॥

সিনেমা যুদ্ধক্ষেত্রের মতো, প্রেম ঘৃণা সংঘাত বন্ধুত্ব হিংস্রতা যত্ন...এক কথায়  
আবেগ। আর এই আবেগ থেকেই বিচ্ছিন্নতা। ফেলিনি আন্তনিওনি রেনে এই  
সব পরিচালকদের ছবিতে প্রেমের পরাজয় সন্ধান করা যায়। তিনজনেই বুর্জোয়া  
সমাজে আবেগের মূল্য ধসে যাওয়া এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছেন। La Dolce  
Vitaয় বুর্জোয়া অধঃপতনের সাধারণ একটা দৃষ্টিই আমরা লক্ষ্য করি। La  
Strada দরদী প্রেমের ছবি, সংযোগের ব্যর্থতা বিষয়ে এক ভিন্ন রূপ। আন্তনিওনি  
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করেন বুর্জোয়া সমাজের শূন্যতা, Il Grido ছবিতে  
শ্রমিকশ্রেণীর পারিপার্শ্বিক। একজন কাজের লোক মরীয়া হয়ে মানবিক সম্পর্ক  
সন্ধান করছেন। আলডোর আত্মহত্যা ও ইরমার কান্না, যখন সে দেখছে আলডো  
ঝাঁপ দিচ্ছে, এই দৃশ্য আধুনিক চলচ্চিত্রে বিচ্ছিন্নতা বিষয়ক থিমের একটি শক্তিশালী  
ইমেজ। আলডোর যত্ন খুব সহজ ভাবেই ছিল একটা 'প্রয়োজন'। এটাই  
অনিবার্য উপসংহার, বোধের বাইরে চলে যাওয়া। নীচে দাঁড়িয়ে থাকা ইরমাকে  
যখন সে বিদায় জানাচ্ছে তা শুধু ইরমাকে নয়, জানাচ্ছে তার নিজেকে, সে  
নিজের কাছ থেকে, পরিবেশ গোষ্ঠী গ্রাম গোটা পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।  
পরের তিনটি ছবিতে বিচ্ছিন্নতার বিষয় আরো পরিমার্জিত সূক্ষ্ম ও জটিল, আরো  
বিশদ ও গভীর। মধ্যবিত্ত সমাজ ও মধ্যবিত্ত সম্পর্ক। মূল্যবোধ নষ্ট হয়ে যাওয়ার  
গুরুত্ব ব্যক্তিগত পরাজয়ের চেয়ে বেশি। বোধে শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে যায় আরো।  
'লাভেত্তরা' শূন্য দ্বীপের নির্জনতার মানবিক একাকিত্বের নাটক, শহর আমাদের  
চারপাশে যে স্থাপত্যের কারাগার তৈরি করে তারই পটভূমিতে 'লা নত্তে'  
নিজেরই কারাগারে বদ্ধ মানুষের নাটক। আন্তনিওনি একবার চিত্রকর মার্ক  
রোথকোর স্টুডিওতে গিয়ে তাঁকে বলেছিলেন, 'আপনার ঝাঁকা ছবি আমার  
ক্যামেরায় তোলা ছবির মতো, about nothing. আপনার মনে পড়ে, apart

from the experiences of subjects there is nothing, nothing, nothing, bare nothingness'. অপরাহ্ন থেকে নিধুম্ন রাত্রি থেকে ধূসর ভোরের দিকে চলে যায় 'লা নভে'। যন্ত্রণা, ঘন্দ, পীড়ন ও যন্ত্রণার এক দীর্ঘ ঐতিহ্য। জিওভানি আর লিদিয়া যেন জীবনের নির্জনতায় গোপনতায় একে অপরকে জানতে চেষ্টা করে এবং তারা নিজেদের ভিন্ন ভিন্ন নিঃসঙ্গতায় একা থেকে যায়। বিচ্ছিন্নতা এই। লিদিয়া স্মৃতি হাতড়ে মরে। স্মৃতি কিছু অরণ্য করিয়ে দেয় না। জানিয়ে দেয় না, সে তার ভালোবাসা থেকে বিচ্ছিন্ন। *Pierrot Le H'ou* গদারীয় দ্বন্দ্বের অন্ততম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র। 'রঙিন ছবির শ্রেণতের মতো চমৎকার, বরণার মতো স্বতঃস্ফূর্ত। সিনেমার মালার্মে। এই ছবিতে আছে কবিতা শব্দগীত ও চিত্রকলা, একজন বিখ্যাত সমালোচক বলেন, কিন্তু আমরা তো সিনেমায় কবিতা চাই না, এটা খুব দুঃখের, সমালোচক এখানে গল্প অ্যাকশান ও চরিত্র চান। *Pierrot* আর *Alphaville* দুটো ছবিতেই আমরা দেখি একজন মানুষকে বিচ্ছিন্ন ছনিয়ার সঙ্গে দ্বন্দ্ব, পিয়েরোতে অপরাহ্নে সূর্য বিপদ ও মৃত্যু। আলফাভিল, রাতের শহর। আলোকিত ফ্রান্স অথবা রাতের প্যারিস দুটোই দিচ্ছিন্ন পৃথিবী কিন্তু তা আন্তর্নিওনির বিচ্ছিন্নতায় আক্রান্ত আধুনিক মানুষের ছবির মতো নয়, অল্প জ্ঞাতি অল্প সময় অল্প দেশ, এই অর্থে বিচ্ছিন্ন। *A Bout de Souffle*-র মতো *Pierrot*তেও একটি নারী পুরুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে। বিশ্বাসঘাতকতা গদারের প্রধান মানবিক বিষয়। তাঁর ছবিতে মানুষ সবসময় একে অপরের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। *Une Femme Mariee*-তে মেয়েটি স্বামীর প্রতি, *Les Carabiniers*-এ একে অপরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে, *Le Petit Soldat* রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত বিশ্বাসঘাতকতা, *Vivre Sa Vie*-তে আনা কারিনা...। পিয়েরোতে গদার চেয়েছেন, বাস্তব সম্পর্কিত তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত প্রতীতিকে চলচ্চিত্রায়িত করতে, যা নিয়ে যায় শেষ পর্যন্ত বিচ্ছিন্নতায়। এই সময়, এই সময়ের দ্বন্দ্ব ও বিচ্ছিন্নতার এক মূল্যবান তথ্য *Pierrot*, বিচ্ছিন্নতা বিষয়ক একটি সিনেমাটিক কবিতা। ফেলিনি আমাদের দেখিয়েছেন ব্যক্তি নিজেকে পুন-স্বাধিকারের চেষ্টা করছে শৈশবে, সৃষ্টিমূলক কাজে, যেন এক অলৌকিক জগতে। আন্তর্নিওনির ছবিতে এটা পরিষ্কার যে প্রেমের সম্পর্ক যেখানে, সেখানেই আমাদের ব্যক্তিক মূল্য নির্ণয় করতে হবে, আর সমাজের পারিপাশ্বিকের চাপটা ব্যক্তিকে ক্ষমাগত ভয় দেখাচ্ছে। অল্প কোনো ভূমিকায় ব্যক্তিক পরিচয়ের সন্ধান নিমজ্জিত মানুষ কীভাবে বিচ্ছিন্ন গদারের ছবিতে আমরা তা দেখি। রেনের ভূমিকা

ভিন্নরকম। রেনের ছবিতে বহির্বিষয়ের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক, বস্তু ও মানুষের মধ্যবর্তী পরিবর্তনশীলতা। মানুষ তার প্রেম তার সমাজ শহর সব থেকে বিচ্ছিন্ন। বিচ্ছিন্নতার ধারণা বিষয়ে রেনের ছবির মূল্য অসাধারণ, নারী পুরুষ শুধু খঙকে দেখতে পায়, উপরের স্তরটাকেই শুধু দেখতে পায়, তারা চেষ্টা করে নিজেদের মধ্যে নিজেদের পরিচয়কে খুঁজে পেতে। কিন্তু তারা শুধু ইন্দ্রিয়গত অনুভূতি কয়েকটা টুকরো খুঁজে পায়, দেখতে পায়, তাদের চারপাশের অসম্পূর্ণ বাস্তবের গ্রন্থিছিন্ন প্রতিবিম্ব। আবার আমরা আন্তর্নিওনিতেই ফিরে যাই। ‘Passenger’-এ ফিরে আসি, কারণ বিচ্ছিন্নতা বিষয়ে এর চেয়ে ভালো ছবি আর কিছু হয়নি। ডেভিড লক তার নিজের জীবন থেকে অকালে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন, লক হয়ে যান রবার্টসন। আন্তর্নিওনি বলেছিলেন, One of the themes of the film is to examine the myth of objectivity, আমরা দেখি ব্যক্তির ব্যক্তিরূপের উদ্ঘাটন। রবার্টসন-এর নতুন অস্তিত্ব কি লককে বাঁচিয়ে দেবে? Passenger film within the film-এর অন্তর্গত প্রতিবিম্ব। অপরিচিত সব উদ্দেশ্যে সন্ধান চলেছে লক। একজন মৃত মানুষকে লক তার নিজের নামটা দিয়ে দেয়। যেন লক নিজের সম্পর্কে একটা মৃত-সত্যকে আবিষ্কার করছে। এক জীবনে নিজেই দুবার আবিষ্কার করা যায় না। প্রথম অস্তিত্ব থেকে নিতে হয় নির্বাসন। দ্বিতীয় অস্তিত্ব খুঁজে বার করা যায়, কিন্তু সেখানেও মুক্তি নেই। বিচ্ছিন্ন হতেই হবে, লক যদি রবার্টসন হয়ে যায় রবার্টসনও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, বিচ্ছিন্ন হতেই হবে, লক রবার্টসন হয়েও বাঁচতে পারে না, বিচ্ছিন্নতা এইই। (ড. সংযোগ ও চলচ্চিত্র)।

প্রলায় শূন্য

॥ চলচ্চিত্র আঙ্গিকে বিভাজন ॥

চলচ্চিত্রের প্রারম্ভিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল পর্দায় গল্প বলা। যে প্রসঙ্গে স্টারিটেল রীতির উদ্ভব। এই রীতি ছিল বর্ণনামূলক। বর্ণনায় আদি মধ্য অন্ত পারস্পর্য, কাহিনীর প্রকাশ, ক্রমপরিণতি ও সমাপ্তি, চরিত্র ও ঘটনা সৃষ্টি করে আবেগ তৈরি এবং চরিত্র ঘটনা আবেগের পরিপূর্ণতা—এসব ছিল তার লক্ষণ। আইজেন-স্টাইনের মননশীল মনতাজ পদ্ধতিতে প্রথম এই নিয়মের ব্যত্যয়। বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন চলচ্চিত্র আন্দোলনেও সময়ের ধারাবাহিকতাকে অস্বীকার করা, এক স্থান বা কাল থেকে দ্রুত অল্প স্থান বা কালে চলে যাওয়া, বাস্তবতা, গল্প বা নাটকীয়তাকে

কম বেশি বর্জন করার প্রয়াস দেখা গেছে (ড্র. বাদ / ইজম)। জাম্প কাট বা শ্যাশ ব্যাকের ব্যবহার তো বর্ণনারীতির ধারাবাহিকতাকে একরকম ভঙ্গ করাই। শ্যাশ ব্যাকের প্রয়োগকে ইচ্ছাকৃতভাবে অস্পষ্ট রাখা, একাধিক ক্ল্যাশ ব্যাকের মধ্যে সময়ের ক্রম অহুসরণ না করা, এবং স্বপ্ন বিভ্রম কল্পনা ফ্যানটাসিকে আরো বেশি করে ছবিতে অন্তর্ভুক্ত করে গ্রায়েটিভের সহজতা ও সরলরৈখিকতাকে ব্যাহত করা, কাহিনীচিত্রের প্রচলিত আঙ্গিকে এগুলো বিবিধ পরীক্ষামূলক ও বিভাজনকারী উপাদান। পুরোপুরি প্রচলিত রীতি-বিরোধী ছবি যা আঙ্গিককে নিটোল ও পরিপূর্ণ করে গড়ে তোলার বদলে ক্রমাগত বিভাজিত করার দিকে (যেমন তথ্য ও গল্পনার বৈপরীত্য বা ভিসুয়াল ও সাউণ্ডের বিচ্ছেদ) অর্থাৎ আরো সচেতনভাবে ব্যবহার করার দিকে (তুলনীয় : ব্রেথট) নজর দিল তা সাম্প্রতিককালের রেনে, গদার, ইয়াকো প্রমুখ পরিচালকদের মাধ্যমে। ওয়াইল্ড স্ট্রবেরীজ বা Belle de Jour নিশ্চয়ই গ্রায়েটিভ রীতির ছবি নয় কিন্তু সেখানে আঙ্গিকগত বিভাজন অবশ্যই La Chinoise বা কলকাতা-৭১-এর মতো অত উত্তেজক, প্রত্যক্ষ ও অকপট নয়। আঙ্গিকগত বিভাজনের চূড়ান্ত উদাহরণ গদার, এক্সপেরিনেন্টাল ফিল্ম ও আণ্ডারগ্রাউণ্ড চলচ্চিত্র ও চলচ্চিত্র-আঙ্গিকে বিভাজনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান গুণিয়েছে। বলা হয়েছে, বিষয়ের উপর এতদিন যে জোর পড়েছে তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে এখন আঙ্গিক ও গঠনের উপর অতিরিক্ত জোর পড়েছে (ড্র. বিমূর্ত ফিল্ম)।

## ॥ বিমূর্ত ফিল্ম ॥

বাস্তব বা ফিগারের টিভ রূপবন্ধ থেকে বিকৃতিকরণ, থেকে বিমূর্তিকরণ। বিমূর্তিকরণ হচ্ছে বাইরের রূপের বিশ্লেষণাত্মক বা অন্তর্নিহিত সারাৎসার। বিমূর্ত বা অ্যাবস্ট্রাক্ট ফিল্মে বিভিন্ন ইমেজ বাস্তব কোনো কিছুর প্রতিনিধিত্ব না করে দৃশ্যগত ভাবে আগ্রহকর ও ট্রানজিশনাল এবং প্রতীকী কিছু আকার ও রূপবন্ধ সৃষ্টি করে। এই ধরনের ছবি বিন্দু রেখা আকার তল রঙ ও বিভিন্ন জ্যামিতিক ডিজাইনের এক দৃশ্য-অভিজ্ঞতা দর্শকের ওপর যার দৃক-বিজ্ঞানগত ও মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব পড়ে। বিমূর্ত ছবি আবার, হয় বাস্তবের ইমেজকেই বিমূর্ত ভঙ্গিতে আলোকচিত্রিত করে, নয় গ্রাফিক উপাদানকে কাজে লাগিয়ে, এর যে কোনটা হয়ে থাকে। বাস্তবের গন্ত ও ক্রিয়াকে কীভাবে বিকৃতিকরণ বা বিমূর্তিকরণের মাধ্যমে কাজে লাগানো যায় আণ্ডারগ্রাউণ্ড চলচ্চিত্র (ড্র.) তার সুন্দর উদাহরণ। বিমূর্ত প্রকাশভঙ্গির বিশেষ প্রয়োগ ঘটে অ্যানিমেটেড চলচ্চিত্রেও। এই প্রকার ছবি উপভোগ করে

উঠতে গেলে দর্শকের অন্তত কিছুটা থাকা দরকার শিল্পীর অনুরূপ মানসিকতায়। শিল্পবোধ। V. Eggeling, H. Richter, ম্যাকলারেন ( সাউও ফিল্মের ওপর হাতে একে ), লেন লী, ম্যান রে প্রভৃতি বিমূর্ত ছবির উল্লেখযোগ্য স্রষ্টা। ডিজনীর ফ্যাণ্টাসিয়া, ফাইভ মিনিটস অব পিয়োর সিনেমা, দি লাভস্ অব জিরো, H<sub>2</sub> O, বেলস্ অব আটলান্টিস, N. Y. N. Y., ড্রিম্স ছাট মানি ক্যান বাই বিমূর্ত ছবির প্রামাণ্য উদাহরণ। এই প্রকার ছবিতে প্রায়ই ইমেজ ও সংগীতের ছান্দিক মিলন দেখা যায়। আধুনিক কম্পিউটার ফিল্মও বিমূর্ত ছবির অন্তর্গত।

॥ লুই বুহুএল ॥

(১৯০০-৮৩, স্পেন)। মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানের শিক্ষাগে তিনি সহকারী বৈজ্ঞানিক ও স্পেন সরকারের বিজ্ঞানী অ্যাটাশে রূপে প্যারীতে কাজ করেন। শিল্পগত ভাবে তৃতীয় দশকের প্যারী ছিল সার-রিয়ালিজমের তাজা বস্তায় উজ্জ্বলিত। বুহুএলের সঙ্গে দেখানে বন্ধুতা হলো দালির ও দুজনে মিলে Un Chien Andalou ছবি করতে প্ররোচিত হলেন। এই ছবিটিকে তার পারম্পর্ষের পটভূমিতে বিচার করতে হলে প্রথমে বুঝতে হয় এর তব্বগত দিকের গতানুগতিকতা এবং তার পরে আসে এর নির্মাতাদের আবেগতীব্রতা। ছবির শুরু থেকেই দর্শকের মনকে মুক্ত অল্পক্ষে ছেড়ে দিয়ে ধোঁনতা এবং হিংসার সম্পর্ক বিচার করে ছবিটিতে সামাজিক নীতি-নিষেধের কল অনুসন্ধান করা হয়েছে। তাঁদের পরের ছবি L' Age d'or-এর প্রথম দৃশ্য বিছা সম্পর্কে নীরস এক দলিল চিত্রের দাবিদার। স্টাইল ও আখ্যানের দিক থেকে এই দৃশ্যাংশই ছবিটির বক্তব্যের প্রতীক। সভ্যতা মাত্রই অত্যাচার, দুঃখভোগ ও নৈরাশ; উপরে নাস্তিকস্বলভ শূন্যতা ও বিস্তবানের বেদরদী জাঁকজমক; নিচে দরিদ্রের ক্ষুধা, দুর্দশা ও ষিকি ষিকি বিপ্লবচিন্তা—এই ছবিতে সার-রিয়ালিজমের মধ্যে বুহুএল পেলেন স্বাধীনতার অন্ত, নশ্বাৎ করার ক্ষমতা আর এই মতবাদের স্বভাবস্বলভ হতাশাকে ধ্বংসের মধ্য দিয়ে আশাবাদে ও বাস্তবকে অস্বীকার করার প্রবণতাকে বাস্তবের মর্মভেদ করে তার মুখোশ খুলে দেবার কাজে নিয়ে এলেন। পরের ছবি ল্যাও উইদাউই ব্রেড (১৯৩২) পুরোপুরি বাস্তবধর্মী, যে বাস্তব সার-রিয়ালিজমের তিক্ততম আভঙ্ককেও হার মানায়। এ ছবিতে তিনি অসঞ্জিত তথ্য দিয়ে ঘটনা এমন সোজা করে বর্ণনা করেন যে চেহারাটা আরো ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। যত ছবি আমি দেখেছি তার মধ্যে প্রগাঢ়ভাবে অশান্তিজনক হলো এই ছবিটি। এরপর

তিনি কিছুদিন আমেরিকায়, কিছুদিন স্পেনে ও কিছুদিন প্যারীতে কাটবে, কয়েকটি ব্যবসায়িক চিত্র নির্মাণ করে ১৯৫০য়ে তাঁর অন্ততম শ্রেষ্ঠ ছবি **Los Olvidados** পরিচালনা করলেন। এই তীব্র নাট্যরূপে একদল উচ্ছৃঙ্খল বালককে দেখানো হয়েছে ব্লেকের ইনোসেন্স অ্যাণ্ড এঞ্জেলিকাস কবিতার মতো করে। ছবিটির নৈয়ায়িক পদ্ধতি এমন অভিনিবিষ্ট যে যেন তুলাদণ্ডের একপাশে স্থাপন করা হয়েছে করুণ ও চিতোসকে, আর একপাশে পাশবিক জৈবোকে, আর মাঝখানে দলনেতা পেড্রো যে নিষ্পাপ কিন্তু অভিজ্ঞতার গোড় খেয়ে খেয়ে যে আজ পশু হয়ে গেছে। ছবিটির অনন্ত শক্তি হলো এর কল্পনার সারল্য ও শৃঙ্খলা এবং ভয়ঙ্করতা ও কবিদের মিলিত রূপ। হিংসা ও বীভৎসতার বর্ণনায় অশৈল্পিক কিছু নেই, কেননা ভয়ের ভারসাম্য এখানে রক্ষা করছে করুণা, নৈরাশ্রের সমান হয়েছে মানবতাবোধ।

বুহুএলের সৃষ্টি মাত্রকেই ধারা রক্ষতা ও হিংসার দায়ে দায়ী করেন তাঁদের দেখা উচিত স্মবিদো আল চিএলো। মেকসিকোর জঙ্গলের রেড ইণ্ডিয়ান একটা গ্রামের পরিবেশে লোকগাথা ও রূপকথার মিশ্রণে এমন এক সরল নিশ্চল ছন্দোবদ্ধ কবিত্বময় প্রহসন এখানে সৃষ্টি করা হয়েছে যা লোরকার কাব্যস্বরের সমতুল। [ বসন্ত বুহুএলকে দঠিক ভাবে বুঝতে হলে তাকাতে হবে কবি লোরকা ছাড়াও তাঁর স্বদেশীয় আর তিন মহাপ্রাণীর দিকে—গন্না, এল গ্রেকো ও গ্যারনিকার পিকাসোর দিকে। ] পরবর্তী ছবি এল ( ৫২ ) ভিন্ন মেজাজের প্রতিভুলনা; অস্বচ্ছন্দ, শীতর্ভ ও তীক্ষ্ণ। ছবিটিতে পরিচালকের ক্রীড়া-কৌতুকের পরিচয় স্পষ্ট। আর প্রকট তাঁর বিস্ফোরণকারী ক্যাথলিক বিরোধী মনোভাব। পরের ছবি রোবিনসন ক্রুসো-তে ডিফোর অসংবদ্ধ ও নীতিবাগীশ বাস্তবতা থেকে বুহুএল সরে আসেন টানটান সুর ও কবিদের জগতে, প্রবেশ করেন মানুষটির নিঃসঙ্গতা ও যন্ত্রণার অন্তঃপুরে। সকল মহৎ নাট্যকবির মতো তিনি মানুষটাকে এমন নির্ভুল মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে অঙ্কিত করেছেন যে সে আমাদের সমকালের গভীর ও শক্তিশালী প্রতীক হয়ে উঠেছে। চমৎকার সূক্ষ্ম টেকনিকালারে তোলা এই রচনা যেমন প্রবীণ তেমন সুন্দর। ‘আমি কেবল রোবিনসনকে দেখে যাই, বাড়ি বানাচ্ছে, খাট বানাচ্ছে, গম জন্মাচ্ছে...ই্যা, প্রকৃতির সঙ্গে তার জীবন-সংগ্রাম নিয়ে এই ছবি করেছি...একাকিত্ব সম্পর্কে...হতাশা সম্পর্কেও’ (—বুহুএল)। এই সমস্ত ছবি আর ব্ল্যাক কমেডি নামে পরিচিত **The Criminal Life of Archibaldo de la Cruz** ( ৫৫ ), নাজারিন ( ৫৮ ) ( দ্র. ), নাজারিনের ধীমকে

পরিবর্তিত করে Viridiana ( ৬১ ), যুক্তিহীনতার যুক্তি-চালিত The Extorting Angel ( ৬২ ), অসাধারণ শিল্প সম্বন্ধ Le Journal d'une Femme de Chambre ( ৬৪ ) যা একাধিক অল্পবয়স্ক বেল গু ছুর ( ড্র. )-এর পূর্বসূরী, জিস্তানা ( ৭০ ) এবং দি ডিসক্রিট চার্ম অব দি বুর্জোয়া ( ৭২ )-য় বুল্‌এলের যে ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত তা জ্ঞাত শিল্পীর যিনি নিঃসঙ্গ ও প্রজ্ঞাবান, প্রচলিত নীতি বিরোধী কিন্তু তাই বলে অবক্ষয়ী নন, আঘাতকারী ও জ্বালাকর তবু বিস্ময় আঙনের মতো পবিত্র, কাব্যময় ও উষ্ণতাদায়ক। তাঁর মধ্যে 'great tenderness' লক্ষ্য করেছিলেন হেনরি মিলার। যেমন নাজারিনের বিশ্বয়কর সমাপ্তি দৃশ্যটি নেহাৎ আখ্যানপর্বের মুসিয়ানা নয় বা সমাপ্তিতে ঘটনার আচঞ্চিত দৃষ্টি পরিবর্তন কোনো আরোপিত উন্নততা নয়, নিষ্ঠা সহকারে দেখলে তা সক্রিয়, সঠিক ও নদর্শক। তেমনি ডায়েরি অব এ চেম্বারমেড ছবিতে উপর্যুপরি মানবিক পতনের ইস্তাহার হিসেবে শয়ন-পরিচারিকা আসে বহিরাগত রূপে প্রাদেশিক বুর্জোয়াদের দুর্নীতির মধ্যে। যৌনতা ও ধর্ষণ, মৃত্যু ও হত্যা—সমস্ত দৃশ্যের পেছনেই জিয়াশীল এঃ উচ্চকিত নীতিহীনতা। এই কথাটাই বলেন বুল্‌এল অসাধারণ ক্রোধ ও প্রেমের সঙ্গে। স্বদেশে সম্মানহীন হলেও প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি ছিলেন একজন স্পেনীয়। দৃঢ় (ও শেষ জীবনে শান্তও) প্রতিজ্ঞার চিহ্নবহু। [ পরিণত বয়সে এনে একবার তিনি পরিহাস করে বলেছিলেন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি এখনও নাস্তিক রয়েছি। আর্জেন্টিনার L. T. Nilsson-এর ছবিতে তাঁর স্বর খুঁজে পাওয়া যায়। ]

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : Ado Kyrou-এর লুই বুল্‌এল—অ্যান ইনট্রোডাকশন।

জে. এইচ

## ॥ বুল্‌গেরিয়া ॥

চলচ্চিত্রের অগ্রতম পথিকৃৎ ভাসিল গেগুভ, যিনি তিরিশ বছর সংগ্রাম করেছেন জাতীয় চলচ্চিত্রের জন্ম, ১৯১০ সালে তাঁর 'দু গ্যালান্ট বুল্‌গেরিয়ান' চিত্র দিয়ে বুল্‌গেরিয়াকে চলচ্চিত্র কর্মে প্রথম বাস্তব দেশ হিসাবে চিহ্নিত করেন। সাধারণ ভাবে পশ্চাৎপদ বাস্তব দেশগুলি চলচ্চিত্র নির্মাণক্ষেত্রে এসেছেই দেরী করে, ফলে বুল্‌গেরিয়া পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে এই শিল্পে কনিষ্ঠতম বলে পরিচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে চলচ্চিত্র নির্মাণ মূলত ব্যবসায়িক সাফল্যের জন্ম প্রয়োজনীয় বাণিজ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল; মানবিক সূক্ষ্মতা-সম্পন্ন অল্পভূতিগুলি বা শৈল্পিক ও যুক্তিপ্রদায়িনী চলচ্চিত্রের আত্মাটিকে বাঁচিয়ে

মাথতে পারতো তাঁর দিকে নজরই ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে নতুন পরিচালকেরা সীমিত অভিজ্ঞতা বা ঐতিহ্যের দশল নিয়ে এবং সমসাময়িক সৌভিয়েত প্রযোজনাগুলিকে সামনে রেখে তাঁদের নতুন পথের হৃদিস করে নিলেন।

প্রথমদিকের চলচ্চিত্রগুলি ছিল ফ্যাসিবাদ বিরোধী বিষয়ের উপর। এই সময়ের প্রযোজনাগুলি হলো—‘ডন ওভার দ্য হোমলাণ্ড’, ‘ডাক্কা’, ‘আণ্ডার দি ইয়ক’, ‘সং অব ম্যান’, ‘পিপল অব ডিমিজগ্রাদ’। এসব ছবি দেশপ্রেমে উৎসাহী এবং ফ্যাসিবিরোধী কাহিনী ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, কিন্তু বিষয়ের শাদা ও কালোয় স্পষ্ট বিভাজিত এই ছবিগুলির ঝাঁক ছিল সাদামাঠা সাহসিকতার দিকে। পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে যুদ্ধোত্তর যুবকদের প্রতিনিধি এমন পরিচালকদের এক নতুন প্রজন্মের উদ্ভব হলো। এই সময়েই আবির্ভাব হলো ভালকানভ্ ও রদেভ্-এর মতো সাহসী পরিচালকদের, যারা ধর্মঘোক্তার আগ্রহ ও নিষ্ঠা নিয়ে এই মাধ্যমটিকে সংগ্রামের মতো ব্যবহার করেন। তাঁদের সঙ্গে এসে যুক্ত হলেন—ঝেল্জাযাকোভা, মুজ্জভ্, কোরাবভ্, পিসকভ্, ইয়ানসেভ্, পেত্রভ্ ও হেসকিয়া। এই পরীক্ষামূলক আবহাওয়ায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছবি হলো নাৎসিবাদের ব্যক্তিগত কিন্তু প্রতিনিধিত্বমূলক মূল্যায়ন—বুলগেরিয়া-জি. ডি. আর-এর যৌথ প্রযোজনা ‘ষ্টারস’।

এইসব সাহসীরা পরপর কিছু ছবি করলেন। ‘পুওর ম্যান’, ‘স্ট্রীট’, ‘দি ফার্স্ট লেনন’, ‘উই ওয়্যার ইয়ং’, ‘দি ক্যাপচার্ড স্কোয়াড্রন’, ‘দি কিং অ্যাণ্ড দি জেনারেল’, ‘দি লংগেট নাইট’—এসব অসাধারণ ছবি দক্ষতার সঙ্গে তৈরি হলো। এসব ছবিতে গভীর অনুসন্ধান ও সামাজিক জাগরণের উদ্দেশ্য চিত্রিত হলো।

ইতিমধ্যে প্রচলিত পদ্ধতিতে ডিটেক্টিভ ও স্পাই থ্রিলার কাহিনী নিয়ে ছবি করার বিশাল চেষ্টা শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু ইয়াকিমভ্, হেসকিয়া, ভাসিল মিরসেভ্-এর মতো বহুশ্রী প্রতিভাধর পরিচালকদের সমসাময়িক আবেদনমূলক ছবি খুব দ্রুত এই সব ব্যবসায়িক ছবিকে অর্থহীন করে দিতে লাগলো। এই সমসাময়িক আবেদনমূলক চিত্রগুলি হলো ‘দি সী-উল্ফ্’, ‘দি ট্রাবলড্ রোড’, ‘ইট নুন’, ‘নাইট উইদাউট আরমার’, ‘মেন’ এবং ‘দি এ্যাটাচড্ বেলুন’। এইসব ছবি সমবেতভাবে প্রকাশ ও বক্তব্য নিয়ে এল সমসাময়িকতা। এসব ব্যাপার সম্ভব হয়েছিল মূলত জাতীয় সংগ্রামের রূপটিকে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রতিকলিত করার সন্নকারী প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ। বুলগেরিয়ান জাতীয় ফিল্ম লাইব্রেরীর পরিচালক

জর্জি ষ্টোয়ানভ্‌ বিগর বলেছেন—‘সমাজতান্ত্রিক দেশের চলচ্চিত্র শিল্পকে জাতীয় করণের ফলেই মৌলিক পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। ১৯৫০ সালে কাহিনীচিত্র, প্রামাণ্যচিত্র ও জনপ্রিয় বিজ্ঞানভিত্তিক চিত্রগুলির অল্প তিনটি বৃহৎ রিপোর্ট তৈরি হয়েছে।’ অধিকাংশ ছবিই তৈরি হচ্ছে সোফিয়ার নিকটস্থ এক আধুনিক প্রযোজনা কেন্দ্রে।

কিন্তু একটা সময় আসেই যখন বহুল আলোচিত পরীক্ষামূলক ছবির নির্মাতাদের স্বরূপ করে দেয় তাঁদের আত্মতৃপ্তি। বুলগেরিয়ান ছবিও তার ব্যতিক্রম নয়। যে চলচ্চিত্রকে সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হত, সেই চলচ্চিত্র ক্রমেই হয়ে গেল এক কোমল মাধ্যম। ফলতঃ প্রথম দিকের কীর্তিগুলির শুল্কিত খুব শিগ্গীরই নিবে এলো।

বুলগেরিয়ান চলচ্চিত্রের কীর্তি অপরিমিত। গত পঁচিশ বছরে প্রায় ৩০০টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার তারা পেয়েছে। ষ্টোয়ানভ্‌ বিগর এর এক আশ্চর্য পর্যালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন : ‘আমরা যে পথ অতিক্রম করে এনেছি তার সঠিক মূল্যায়ন করিনি। আমি একথা বলতে পারি না যে এদেশের চলচ্চিত্রকাররা নিজস্ব ভঙ্গির কথা জোর গলায় বলতে পারেন...এবং এ যাবৎ যা হয়েছে তা চূড়ান্ত নিখুঁত নয়, তা যৌবনের মনোগ্রাহিতা ও জীবনীশক্তির চিহ্ন বহন করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তিসম্মত অনুসন্ধান চালালে দেখা যাবে যে সমাজ তাত্ত্বিকদের আদর্শ থেকে একটা মারাত্মক দূরত্বের সৃষ্টি হয়েছে। কারণ সমসাময়িক বিষয়ের উপর তৈরি চলচ্চিত্রে এখন আর দর্শনের গভীরতা প্রকাশ পায় না। এগুলিতে বর্তমান ধারায় গা ভাসিয়ে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও সিনেমাটিক ভঙ্গির প্রকাশের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।’

‘এ যাবৎ অজানা’ সমস্যাগুলির উপর দৃষ্টি দিতে গিয়ে নতুন চিত্রনির্মাতাদের দল শিল্পের এমন একটা সীমানায় নিজেদের নিয়ে গেছেন যা প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির চেয়ে অনেক দূরে অবস্থিত। যদি তা না হতো, তবে কি করে চিত্রনির্মাতাদের এক বিরাট অংশ বিকৃত যৌনতার দিকে এত বেশি করে ঝুঁকি পড়েন? বুলগেরিয়ান সিনেমার আরেকটা ঝাঁক হলো ‘স্পাই-থ্রি লার’-এর দিকে।

চিত্রনির্মাণের বর্তমান ঝাঁকগুলি বুলগেরিয়ান ছবির একটা তিক্ত দিক উদ্ঘাটন করে। ভালচানভ্‌ (আননোন সোলজার’স পেটেট লেদার স্ফুজ), হেসকিয়া, কোরাভভ্‌, পেত্রভ্‌ ও ষ্টোয়ানভ্‌ ছাড়া অন্য কোন চিত্রনির্মাতাই ধীম সমৃদ্ধ ছবির ক্ষেত্রে কোনো ছাপ রাখতে পারেননি। ধীরা লুডমিল স্টাইকভ্‌-এর ‘এ্যামেগমেন্ট

‘দি ডিফেন্স অব দি স্টেট এ্যাক্ট’, ‘দি প্রোরি অব থান’ বা ‘দি টায়াল’ ছবি দেখেছেন, তাঁরা এই কথা ভেবে আশ্চর্য হবেন যে একই দেশে এই রকম ভুল শৌক তৈরি হয় কী করে।

এক সময় নুই বুল্‌এল বলেছিলেন : ‘আমাদের এই খারাপ পৃথিবীটাতে একটাই রাস্তা খোলা আছে—বিদ্রোহ।’ এবং এটা সকলেরই জানা আছে যে সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশের সংগ্রামী চিত্রনির্মাতাদের কাছে এই অনুভূতিটাই একদিন প্রতিকলিত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির রাষ্ট্রায়ত্ত্ব চলচ্চিত্র শেষদিকে আর আগের বিশ্বাস ধরে রাখতে পারছিল না, এটাই দুঃখজনক। পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের সাম্প্রতিক সংকটের পর এখন বুলগেরিয়ার চলচ্চিত্র কোন্ পথে যাব্ব সেটাই দেখার।

## প্রদীপ বিশ্বাস

### ॥ জাক্ বেকের ॥

( ১৯০৬-৬০, ফ্রান্স )। শিল্পপতি পিতা ও স্কটিশ মাতার সন্তান। জঁ রেনোয়ার সহকারী রূপে তাঁর চিত্রজীবন শুরু হয়। তারপর চিত্র পরিচালনার কাজে এসে চল্লিশের দশকের গোড়া থেকে পঞ্চাশের দশকের শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরের যে কয়েকটি বছর ফরাসি চলচ্চিত্রের অপেক্ষাকৃত দৈন্তের সময় সেই পর্বে তিনি নানা ধরনের ছবি তৈরি করেন। গ্রাম জীবনের পটভূমিতে বাস্তববাদী চিত্র Goupi-Mains-Rouges ( ৪৩ ), আধুনিক প্যারিসের পটভূমিতে কমেডি Edouard et Caroline ( ৫১ ), প্যারিসের বিগত যুগের পরিবেশে চরিত্র এবং তাদের আচরণ ও সম্পর্কের বিশ্লেষণ Casque d'or ( ৫২ ), থ্রিলার ও রূপকথা, বা শিল্পীর ( মদিগ্‌লিয়ানি ) জীবনচিত্র। যে ধরনেরই হোক না কেন বেকেরের ছবিতে ছুটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, প্রথমত তাঁর মানুষ, ও মানুষের চরিত্র, আচার-আচরণ, সম্পর্ক ও বৈশিষ্ট্যের তীক্ষ্ণ, সানুপুঞ্জ, কিন্তু মহানুভূতিশীল পর্যবেক্ষণ, দ্বিতীয়ত ক্যামেরার অনুসন্ধিৎস্ব অভিযাত্রীর ভূমিকা ও সম্পাদনার সচেতন, ছান্দিক রীতি। তাঁর ছবি সময়ের একটি বিশেষ মুহূর্ত, চরিত্রের একটা নির্দিষ্ট জটিলতা, ঘটনার একটি বিশেষ ঝাঁকের কখনো সার্থক ও কখনো দ্বিধাগ্রস্ত উপস্থাপন। তিনি নিজেকে ‘কিছুটা পতঙ্গতাত্ত্বিকের মতো’ বলে উল্লেখ করেছিলেন, কথাতা রুজোর ক্ষেত্রে যতটা সত্যি তাঁর বেলায় ততটা নয়, আমি বরঞ্চ টাকে চেষ্টিতবাদী মনস্তাত্ত্বিকের মতো বলে উল্লেখ করব। তাঁর শেষ ছবি Le

Trou ( ৬০ ) কারাজীবন ও কারাগার থেকে পলায়নের বিষয় নিয়ে ; বাস্তবতা, মানবতা ও শৈলীর স্বতঃস্ফূর্ততায় এটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবি । ( ড. ফ্রান্স ) । অনেকটা একই বিষয় নিয়ে তোলা ক্রফোর দি ফোর হাণ্ডে ড ব্লোজ ( ৫৯ ) ছবির সঙ্গে এটি ছবির প্রতিভুলনা মনোগ্রাহী হতে পারে । তাঁর সঙ্গে পরবর্তীকালের শ্রাবণের দৃষ্টিভঙ্গির মিল আছে । তাঁর অস্বাভ ছবির মধ্যে আছে Antoine and Antoinette ( ৪৭ ), Rendez-Vous de Juillet ( ৪৯ ) ও Golden Marie ( ৫২ ) — তাঁর অস্বতম শ্রেষ্ঠ ছবি, মৌলিকতা ও কাব্যগুণে সমৃদ্ধ ।

## ॥ শ্যাম বেনেগাল ॥

( জন্ম ১৯৩৪, ভারত ) । বেনেগাল চিত্রজীবন শুরু করেছিলেন টিভিতে ও পরে বিজ্ঞাপনী চিত্রনির্মাতা হিসেবে, Blaze সংস্কার হয়ে তিনি বহু অ্যাড ফিল্ম নির্মাণ করেন, যার বেশ কয়েকটিতে কল্পনাশক্তি ও স্বতঃস্ফূর্ত মেজাজের পরিচয় আছে । এই সময়ে প্রাকৃতিক বিষয় বা ভৌগোলিক অঞ্চল নিয়ে ভ্রমণচিত্র এবং একাধিক তথ্যচিত্রও তিনি পরিচালনা করেছেন । এই অভিজ্ঞতা কাহিনীচিত্রের জগতে আসার পর তাঁকে অনেকভাবে সাহায্য করেছে, যেমন, তাঁর কাজের মধ্যে পেশাদারী দক্ষতা এসেছে, প্রথম ছবি থেকেই কলাকৌশলের চাকচিক্য ও অভিনয়ের সমৃদ্ধি দেখা গেছে, প্রযোজনা ও পরিবেশনাগত সমস্যার সমাধান সহজ হয়েছে । আবার ওই অভিজ্ঞতার দরুন তাঁর অস্ববিধাও হয়েছে কম না । ছোটগল্প লিখে হাত না পাকিয়ে সরাসরি ধারা উপস্থাপনে হাত দেন তাঁদের রচনায় গঠন-শৃঙ্খলা ও ভাব-পরিমিতির অভাব লক্ষ্য করেছিলেন গার্ট্রুড স্টেইন । শাদা কালো ফিল্মে ছবি না বানিয়ে প্রায় প্রথম থেকেই রঙ নিয়ে কাজ করার ফলে শৃঙ্খলা, পরিমিতি ও গাঙ্গীর্যের তেমনি কোনো অভাব বেনেগালের ছবির আঙ্গিকে রয়েছে কিনা এটা ভাববার । তাঁর অক্ষুর ( ৭৪ ) বা নিশান্ত ( ৭৫ ) বা কলিয়ুগ ( ৮১ ) ছবির বহু দৃশ্যের কম্পোজিশন ও রঙ নির্বাচন আমার কাছে স্মৃদিত ক্যালেন্ডার-আর্টের মতো মনে হয় । ঈষৎ বর্ণবহুল, অতিরঞ্জিত । ছবির বহু সংলাপে বা হাস্যরসে ও কখনো কখনো দৃশ্যকল্পনায় সেই বৈশিষ্ট্যটি উপস্থিত যা ভারতীয় বিজ্ঞাপনেও লভ্য — পরিশীলিত গ্রাম্যতা । শোষণের দরুন যে শ্রেণী-বৈষম্য তা বেনেগালের প্রিয় বিষয়, কিন্তু এই শোষণ তাঁর হাতে অনেক সময়ই অর্থনৈতিক শোষণ না হয়ে আগে হয়ে উঠেছে যৌন শোষণ ( প্রায়ই দরিদ্র বা নিচ জাতির কোনো নারীকে ), পেশাদারী দক্ষ লেখকের লেখায় যেমন থাকে ।

শাবানা আজমী বা স্মিতা পাতিল বা রেখা, তাঁর ছবিতে প্রায়ই হতে হয় নায়িকা প্রধান, ভূমিকা (৭৭) ছাড়া কোনোটিতেই যা খুব অমোঘ মনে হয় না, এবং কলিযুগে নারীর যে চিত্রণ প্রায় স্বেচ্ছাচারের পর্যায়ে পড়ে।

কিন্তু সাফল্যও তো তাঁর আছে। মন্থন-য়ে মিশ্রজীর বাড়িতে ডা. রাওয়ের বিরুদ্ধে চক্রান্ত হলো। বোঝাতে গ্রামের নিঃস্বস্ত পটভূমিতে পরপর কয়েকটি স্টেডি শটের সংযোজনে যে মনতাজ তা মনতাজের জাত উদাহরণ, জুহুন-য়ের যুদ্ধদৃশ্য ভারতীয় ছবিতে দেখা অল্পতম বিশ্বাস্য টেকনিক্যাল নৈপুণ্য, বিভিন্ন ছবির অংশ-বিশেষে বিষয়ের ইঙ্গিতধর্মী উপস্থাপনা ও শক্তিশালী দৃশ্যরীতি, শাবানা ও স্মিতার মতো অভিনেত্রীদের আবিষ্কার, এবং ভূমিকা। বস্তুত শুধু এই শেষোক্ত ছবিটির জগুই বেনেগাল উল্লেখযোগ্য পরিচালক বলে গণ্য হতে পারেন। এর দুঃসাহসী গীম, সময় ও পরিবেশের নিখুঁত নির্মাণ, রঙের অসাধারণ ফলপ্রদ ব্যবহার (যার দরুন ছবিটি একই সঙ্গে পেয়েছে গভীরতা ও স্বপ্না), মদল বাজু বাজু রে-গানটির মোটিফতুল্য প্রয়োগ (যার এক তুলনীয় উদাহরণ স্ববর্ণরেখা-য় আজি ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়া-গানটির ব্যবহার) এবং একাধিক স্তরে গ্রহণযোগ্যতা—সব নিয়ে ভারতীয় চলচ্চিত্রে এই ছবির খুব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে (ড. ভূমিকা)। ম্যাচিয়র ফিল্ম বলতে যা বোঝায় এই ছবি হলো তাই। ইয়া, সাফল্য বেনেগালের রয়েছে।

কোন্দুরা ও কলিযুগের ব্যর্থতার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রয়োজনায় ভাগ-চাষী ইন্দ্র লোহারের বাস্তব ঘটনা নিয়ে নির্মিত আরোহণ ছবিতেও তাঁর বহিরঙ্গ মুদ্রাদোষগুলি প্রকট। কিন্তু পরিশীলিত ব্ল্যাক কমেডি মাণ্ডি এবং চিত্তাকর্ষক এপিক টেল শ্রম ক্য সার্ভ বোড়া, ভূমিকার পর এই দুটি ছবি তাঁকে ফের শৈল্পিক সাফল্য এনে দেয়। নেহরুর ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া অবলম্বনে তাঁর টিভি-সিরিয়ালও খুবই চিত্তাকর্ষক ও পরিশীলিত।

এক টেলিভিশন সাফাংকারে বেনেগাল একবার বলেছিলেন, তিনি মার্জারী দর্শনে বিশ্বাসী, ফলে তাঁর ছবির বিষয়বস্তু যদি কোনো সমস্তার ওপর ভর করে থাকে তবে তা সামাজিক সমস্যা এবং তিনি তা বিচার করবেন অর্থনৈতিক দৃষ্টি-ভঙ্গিতে। অন্ধুর, নিশান্ত ও মন্থন, এই তিনটি ছবিতে তিনি সমাজ-কাঠামোর যে সমস্তার দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন তার চরিত্র মূলতঃ সামন্ততান্ত্রিক বা আধা-সামন্ততান্ত্রিক। এই কাঠামোর অবিচার জনিত সমস্তার বিরুদ্ধে তাঁর মন্তব্য এই ঠিকজিতে প্রতিবাদের চেহারায় ধাপে ধাপে প্রকাশ পেয়েছে। অন্ধুরে তা ছিল

প্রতীকী, নিতান্ত একক বিদ্রোহ। নিশান্তে প্রতিবাদ অনেক ব্যাপক চেগা। পেয়েছে, আঘাত করা হয়েছে ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। মন্থনে এসে জনসাংগঠিত হয়েছে, তারা পথ নির্ণয় করেছে। এই ক্রমপরিণতিতে ঠিক পথে চলে। তিনি কয়েকটি ক্ষেত্রে ভারসাম্য হারিয়েছেন।

কখনো এই বিভ্রান্তি ঘটেছে নয় নারীর দেহ সম্পর্কের জটিলতায় জড়িয়ে পড়ার জগত, কখনো জাত-বর্ণের ওপর গুরুত্ব দিতে গিয়ে। এই দ্বিধা, এত অনিশ্চয়তা, চিত্রনাট্যে মাঝে মাঝে প্রচলিত উপাদানের উপস্থিতি—এদের প্রত্যেকের জগত দায়ী বেনেগালের পূর্বতন পেশাদারী চিত্রজীবন যা তাঁকে কখনো কখনো তাৎক্ষণিকতায় আগ্রহী ও তথ্যমূলকতায় উদ্বুদ্ধ করেছে। তাঁর ভূমিকা ছবিতে আমরা উষার দিদিমা, উষার মা, উষা, উষার মেয়ে, উষার মেয়ের গর্ভস্থ সন্তান—পাঁচ পুরুষকে একত্রে দেখি। হেরেডিটির যে ধারাটির মধ্যদেশ উষার জীবনে। উষার নিজের মন্ব ও সংঘাত যে জীবনকে স্বতন্ত্র করেছে। বেনেগালের ছবিতেও তাৎক্ষণিকতা ও তথ্যমূলকতা এমনি অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া উত্তরাধিকারের চেয়ে বেশি কিছু, এককালীন বনাম চিরকালীন, তথ্য বনাম শিল্প-এর দ্বন্দ্ব ও সংঘাত যাকে স্বতন্ত্র করেছে। আধুনিক ভারতীয় চলচ্চিত্রে প্রকরণগত ভাবে সম্ভবত-সবচেয়ে দক্ষ এই পরিচালক, তাঁর বক্তব্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সবেও, তাঁর বক্তব্যের জগত তাই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে একটি তথ্যচিত্রও নির্মাণ করেছেন।

## ॥ বেরনার্দো বের্তোলুচ্চি ॥

জন্ম ১৯৪০, ইতালি। তাঁর শিল্পী-জীবন শুরু হয় কবি হিসেবে। বাবা আন্তিলিও বের্তোলুচ্চি ছিলেন পাসোলিনির বন্ধু। পাসোলিনির মতো বেরনার্দোও কবিতা ছেড়ে আসেন চলচ্চিত্রে। কারণ, উভয়ের মতে সিনেমা ইজ দি ট্রু পোয়েটিক ল্যাঙ্গুয়েজ। বের্তোলুচ্চির চিত্রজীবনের সূচনা পাসোলিনির সহকারী রূপে। পাসোলিনির প্রথম ছবি আকাতোনে-তে তিনি সহকারী পরিচালকের কাজ করেন। উভয়েরই সিনেমায় প্রথম পদক্ষেপ। বেরনার্দো এই ছবি থেকে কলা-কৌশল যতটা না শিখলেন তার চেয়ে অনেক বেশি শিখলেন চলচ্চিত্রে মানবিক সম্পর্কের ব্যাপারটা। পরে বাইশ বছর বয়স হওয়ার আগেই পাসোলিনির গল্প নিয়ে তিনি নিজেই বানাালেন ছবি—দি গ্রিম রীপার। পাসোলিনির দৃষ্টিকোণের সঙ্গে তাঁর মিল-অমিল এই ছবিতেই স্পষ্ট হয়ে যায়। ছবিটিতে রশোমন ও

সিটিজেন কেনের প্রভাব আছে। পরের ছবি ও প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রথম স্বাধীন ছবি বিফোর দি রেভলিউশন। এই ছবি থেকেই তাঁর সৃষ্টিতে মার্শ ও ফ্রয়েডের, বামপন্থী রাজনীতি ও উগ্র আবেগের তীব্র ও দ্বন্দ্ববিধুর সহবাস শুরু হয়। যে উগ্রতা প্রায়ই মুক্তপ্রাণ যৌনতার রূপ নেয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি ও দ্বন্দ্বিকতার দিক থেকে তিনি বিশেষভাবে গদারের দ্বারা প্রভাবিত।

১৯৬৪-র পর বের্তোলুচ্চি একটি টিভি ছবি, একটি তথ্যচিত্র ও একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি তৈরি করে ফের কাহিনীচিত্র পরিচালনা করেন ৬৮-তে, পার্টনার (দস্তয়েভ'স্কির উপস্থাস অবলম্বনে ও গদারের তৎকালীন রীতি অনুসরণে); ৭০য়ে, দি স্পাইডার'স স্ট্র্যাটেজি (অসাধারণ দৃশ্যশৈলী দ্বারা চিত্রিত ও সাররিয়া-লিজমের দ্বারা প্রভাবিত); ওই ৭০য়েই, দি কনফারেন্স (মোরোভিয়ার উপস্থাস অবলম্বনে হলেও, এই ছবির মূল ও প্রকৃত উৎস হলো প্লেটোর মিথ অব দি কেভ)। এই ছবি তিনটিতে রাজনৈতিক মতবাদের উপস্থাপনায় সচেতন প্রত্যয় ও চিত্রভাষার বিশ্বয়কর পারদর্শিতা আছে। এদের রাজনৈতিকও বলা যায়, আবার অনেক দূর পর্যন্ত এরা মনস্তাত্ত্বিকও। বস্তুত রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত তথা মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের সংমিশ্রণের ক্ষেত্রে বের্তোলুচ্চি ততদিনে প্রধান শিল্পী, এক অসাধারণ শক্তিশালী ও উজ্জ্বল চলচ্চিত্রকার। তাঁর ছবিতে তখন নিশে আছে কাব্যময়তা, দ্বন্দ্বিকতা ও দৃশ্যভঙ্গি।

বিপ্লবাত্মক মনোভাব ও প্রত্যক্ষ যৌনতা, এই দুয়ের সংমিশ্রণ আরও বিতর্কিত, আরও বিস্ফোরক, প্রায় চূড়ান্ত রূপ পায় লাস্ট ট্যাপ্পো ইন প্যারিস (১৯৭২)-য়ে। ত্র্যাগেডর অনবচ্ছিন্ন অভিনয়ে, চমকপ্রদ রঙের প্রয়োগে ও অসাধারণ নির্মাণ পদ্ধতিতে সমৃদ্ধ এই ছবি কামনা ও যন্ত্রণা ও হতাশার (নায়কের ও নায়কের স্ত্রীর একাকিত্ব, নায়কের নায়িকার ওপর ধর্ষকামী আচরণ, নায়কের স্ত্রীর আত্মহত্যা, নায়িকার নায়ককে হত্যা) এক কৃষ্ণ চিত্ররূপ। কিন্তু তাও রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে জড়িত। যার বড়ো প্রমাণ তাঁর পরের ছবি Novecento (৭৬) —এর বিষয়বস্তু ১৯০০ সন থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত ইতালির সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস। ক্যামেরাশৈলী ও দৃশ্যরচনায় এ ছবি তাঁর আগের ছবি-গুলো থেকে আলাদা, রূপদী সরলতায় চিহ্নিত ও তাঁর অল্পতম শ্রেষ্ঠ ছবি। তাঁর চলচ্চিত্রলোক ক্রমেই সাহিত্যের, চিত্রকলার, অপেরার (La Luna) দ্বারা প্রভাবশালী ও সদর্শক ভাবে সমৃদ্ধ হতে থাকে। ঠিক যে সময়ে মনে হচ্ছে যা এতদিন ছিল চঞ্চল ক্রোধ তা এখন হয়ে উঠছে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, তুলনীয় বুল্গেয়েল,

সেই সময়েই হঠাৎ একটা বিরাট পরিবর্তন এলো বের্তোলুচ্চির শিল্পী-জীবনে। প্রথমত তিনি খান-দুয়েক নিরুত্তাপ ছবি বানােলেন—Tragedy of a Ridiculous Man (৮১), The Sheltering Sky (৯১) এবং স্পেক্টাকুলের মোহে পড়লেন—অনেকগুলি অ্যাকাডেমি পুরস্কারে ভূষিত দি লাস্ট এম্পেরর (৮৭) ৷ বহুল-বিজ্ঞাপিত / আলোচিত দি লিটল বুদ্ধ (৯৩)।

ভবিষ্যতে তাঁর বিবর্তন কোন্ পথে হয় তা আমাদের গভীর আগ্রহের মধ্যে দেখতে হবে। কেননা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, আধুনিক চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে বের্তোলুচ্চি নিঃসন্দেহে একজন। তাঁর ছবি একই সঙ্গে চোখকে, মনকে ও আবেগকে আকৃষ্ট করে। ইমেজ ও আইডিয়ার সার্থক মিলনে তাঁর প্রভাবও দূর-প্রসারী হয়েছে, বিশেষত কপোলা ও স্করসীজের ওপর তাঁর প্রভাবের কথা সুবিদিত। অল্প পরিচালকের জন্ম চিত্রনাট্যও তিনি লিখেছেন। চলচ্চিত্র নিয়েও তাঁর অনেক লেখালেখি আছে।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : R. P. Kolker-এর বেরনার্দো বের্তোলুচ্চি ॥

মিহির সেনগুপ্ত

॥ বেল ছ জ্যুর ॥

১৯৬৬, ফ্রান্স। বুলুএলের সাতাশতম কাহিনীচিত্র। এই ছবি এমন এক নায়িকা-প্রধান যে সুন্দরী ও বিবাহিত জীবনে এক সম্পন্ন পুরুষের তরুণী স্ত্রী যাকে সে গভীরভাবে ভালোবাসে। এটা তার অহুত্বের দিক। প্রযুক্তিগত ভাবে এই নারী কিন্তু মর্ষকামী, সাধারণ দাম্পত্য জীবনে তার কামনা মেটে না বলে বিকেলে ছোটো থেকে পাঁচটা পর্যন্ত তিন ঘণ্টার জন্য সে কুখ্যাত এক বিলাসগৃহে দেহোপ-জীবিনীর কাজ নেয়। মূল উপন্যাস ও নায়িকা চরিত্র উভয়েই যৌন মনস্তত্ত্ব এবং বুর্জোয়া নীতি ও সংস্কার এই দুই টানা পোড়েনের মধ্য দিয়ে ক্রমগঠিত। বুলুএলের ছবিতে কিন্তু তথাকথিত নীতি বা সৌন্দর্যবোধের সমর্থনে নায়িকার অহুকম্পা বা পাপবোধের ওপর কোনো গুরুত্ব পড়েনি, তাঁর বিচারে গুলো বিলাসিতা, বরং ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয় সাধনের মধ্য দিয়ে নায়িকা সামাজিক সংস্কারের নৈতিক বেড়া জাল থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করেছে। বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা ও / অর্থাৎ অবক্ষয়ী মনস্তত্ত্বের শিকার এই নায়িকাও কিন্তু বুলুএলের সমর্থন পায়নি।

তাঁর এই ছবিকে বুলুএল বলেছেন পর্নোগ্রাফিক চিত্র। বিস্কন যৌনতার ছবি। তাই বলে তাঁর ক্যামেরা নিতান্ত কানুক নয়, এক কিউবিষ্ট চিত্রশিল্পীর

তুলিও, নায়িকা চরিত্রে ক্যাথেরিন ডেনেউভের বিভিন্ন অঙ্গ ও অভিবাদের উত্তেজক  
 এদর্শনই শুধু তার লক্ষ্য নয়, সামগ্রিকভাবে নায়িকার যৌনস্বপ্না ও নারীর কাম-  
 রহস্য তুলে ধরাও তার উদ্দেশ্য। বস্তুত আর কোনো ছবিতে বুলুএলের চেতনা,  
 বিশুদ্ধি, অবশেষণ এত স্বতঃস্ফূর্ত ও পরিপূর্ণ ভাবে, ও সমৃদ্ধ আঙ্গিকে প্রকাশ  
 পায়নি। এই ছবিতেও সার-রিয়ালিজমের প্রভাব আছে, প্রভাব আছে  
 ফ্যানটাসির, ছবির সমাপ্তিতে বহু সম্ভাবনার যে উন্মুক্তি তাতেও ফ্যানটাসির  
 লক্ষণ। বেল গু জুরকে বলা হয়েছে দাট্‌রী, মনন ও নৈব্যক্তিকতার ছবি।  
 নাটকীয়তা ও আবেগ ছবিতে লক্ষণীয় ভাবে স্বল্প, আবহ সংগীত নেই, ক্লোজ আপ  
 কম। বুলুএলের মাস্টারপিস। একাধিক অহুস্বে দি ডায়েরি অব দি চেয়ারমেড  
 ( ৬৪ ) এই ছবির পূর্বসূরী।

অভিনয়ে ডেনেউভ, জঁ সোরেল ; মূল উপস্থাপন Joseph Kessel, আলোক-  
 চিত্র S. Vierney, সম্পাদনা L. Hauteceur, ইন্সট্যানকালার ॥

॥ জঁ পল বেলমনদো ॥

জন্ম ১৯০৩, ফ্রান্স। পিতা ছিলেন ভাস্কর। নাটক নিয়ে পড়াশুনো করে মঞ্চ  
 থেকে বেলমনদো চিত্রে আসেন। তাঁর প্রথম চিত্রাভিনয় ১৯৫৮-এয়, দি চিটারস-য়ে।  
 তাঁর অল্প ধরনের মুখশ্রী, আকর্ষণী ও একটু রোমাঞ্চিক ব্যক্তিত্ব, আর অভিব্যক্তি ও  
 অভিনয়ের ভারি ক্যান্ডিড ও ইম্প্রোভাইজড্‌ রীতি তাঁকে একই সঙ্গে শক্তিশালী  
 অভিনেতা ও জনপ্রিয় তারকা করেছে। কমিডি, রোমাঞ্চিক ও স্থাচারালিষ্টিক  
 তিন ধরনের অভিনয়েই তিনি পারদর্শী। গদার, ক্রফো, লুই মাল, বেনে—বহু  
 সুভেল ভাগ পরিচালকের ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন, ব্রেথলেস, পিয়েরো  
 লো ফু, বোরসালিনো, Le Voleur ; Leon Morin, Pretre ; মিসিসিপি  
 মারমেড, ফিয়ার ওভার দি সিটি, স্তাতিস্কি, হ্যাপিইস্টার, দি মার্জিনাল প্রভৃতি  
 তাঁর উল্লেখযোগ্য ছবি। ষাট-সত্তর দশকের অস্থিরমতি ও অনিশ্চিত যুগকদের এক  
 আর্কিটাইপ ইমেজ পাওয়া যায় তাঁর মধ্যে ও তাঁর মধ্য দিয়ে। তিনি যেন  
 হামফ্রে বোগার্ট ও জেমস ডীনের এক সম্মিলিত রূপ। পরবর্তী কালের উডি  
 অ্যালেনের অভিনয়রীতিতে তাঁর ছাপ কিছুটা খুঁজে পাওয়া যায়। নিজের জীবন  
 নিয়ে বেলমনদো তাঁর অভিনয়ের মতোই ক্যান্ডিড একটা বই লিখেছেন, তাঁর  
 আত্মজীবনী। Cerito Films তাঁর নিজের প্রযোজনা-সংস্থা।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : R. Chazal-এর জঁ পল বেলমনদো ॥

## ॥ মার্কে বেল্লোচ্চিও ॥

(জন্ম ১৯৩৯, ইতালি)। অভিনয় ও চিত্রপরিচালনা সম্পর্কে ফিল্ম স্কুলে পাঠ গ্রহণ করে তিনি লণ্ডনে গিয়ে একাধিক স্বল্প দৈর্ঘ্যের চিত্র নির্মাণ করেন। তাঁর প্রথম কাহিনীচিত্র ফীটস ইন দি পকেট (৬৬) দেশ বিদেশে উচ্চ-প্রশংসিত, যদিও বুল্‌এলের ছবিটি মোটেই ভালো লাগেনি। বলা হয়েছে এই ছবি পরিবাহের প্রতি উৎসর্গিত। পরের ছবি চায়না ইজ নিয়ার গঠন-শিথিলতা দোষে ছুট। ৭১-এর ছবি ইন দি নেম অব দি ফাদার, এক ক্যাথলিক বোর্ডিং স্কুলের ভয়ানক পটভূমিতে স্থাপিত। বলা হয়, চার্চ ও স্কুলকে নিবেদিত, তাঁর ছবিতে রাজনৈতিক প্রশ্ন উত্থাপনের ও প্রতিবাদের যে লক্ষণ স্পষ্ট তাঁর সেই প্রতিবাদী-রাজনৈতিক মতকে স্পষ্টতর করে এই ছবি। ৭২-এর রেপ অন দি ফ্রন্ট পেজ সাংবাদিকতার অসত্যতা নিয়ে, দক্ষিণপন্থী মিডিয়াকে শ্লেষ ও ব্যঙ্গের সঙ্গে উৎসর্গিত এই ছবি স্বদেশে বিতর্কের সৃষ্টি করে। ৭৫-এর, সৈন্যবাহিনীকে নিবেদিত, Marcia Trionfale আরো প্রতিবাদী ও বিস্ফোরক। পরিবার শিক্ষা ধর্ম নীতি রাষ্ট্র—বিভিন্ন স্তরের সীমাবদ্ধতাকে ও ক্রটিকে ক্রমান্বয়ে আঘাত করছেন বেল্লোচ্চিও, এই অশান্ত প্রাণবন্ত প্রতিভার রাজনৈতিক প্রতিবাদের রূপ ও চিত্রভাষার রীতি ক্রমেই নিজস্বতা ও বৃহত্তর গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে। অপ্রভাবিত রীতি থেকে রাজনৈতিক আঙ্গিক—বেল্লোচ্চিও-র এই হলো শৈল্পিক বিবর্তন। তাঁর অছায়া ছবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য Leap into the Void (80), Les Yeux, la bouche (83), Enrico IV (84) এবং এক অনন্তসাধারণ তথ্যচিত্র Fit to be United। তাঁর ওপর সাররিয়ালিজমের প্রভাব পড়েছে। সেদিক থেকে এবং তীব্র, সহিংস শ্লেষবোধের দিক দিয়ে তাঁর নৈকট্য আছে বুল্‌এলের সঙ্গে।

## ॥ ব্যাটল অব আলজিয়ারস ॥

১৯৬৫, আলজেরিয়া / ইতালি যৌথ প্রযোজনা। ফরাসি ঔপনিবেশিকতার সঙ্গে আলজেরিয়াবাদীদের সংঘাত ও বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে তাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম যার ফলস্বরূপ ১৯৬২তে আলজেরিয়ার স্বাধীনতা লাভ, জিল্লো পট্টিকর্ভো পরিচালিত ব্যাটল অব আলজিয়ারসের এই হলো বিষয়বস্তু। ছবির শৈলীতে তথ্যচিত্র-স্বলত বাস্তবতা পরিলক্ষিত। বিভিন্ন ঐতিহাসিক, নাটকীয় ঘটনার নৈর্যাত্তিক চিত্রণ ও দলিলচিত্র তথা সংবাদচিত্র থেকে বিবিধ ঘটনা নির্বাচন করে

নেই সব অংশের ডিউপ প্রিন্ট ব্যবহার তথ্যমূলকতার ওই পটভূমি তৈরি করে দিয়েছে। ( যুদ্ধের সংবাদচিত্রের তুলনামূলক ব্যবহারের জন্য জুল অ্যাণ্ড জিম ট্রষ্টব্য। ) আবার সামগ্রিক ঘটনা ও যৌথ অনুভূতির পাশাপাশি ব্যক্তিবিশেষের গুণের দৃষ্টিনিক্ষেপ এবং শাদা কালো আলোকচিত্রের বিশেষ এক ধরনের টোনলেস-মেসের সঙ্গে আবহের টোনাল সংগীত ( বিশেষত অত্যাচার ও যুদ্ধের দৃশ্যে ) ছবিতে তথ্যমূলকতার সঙ্গে স্বজনশিল্পের দ্বন্দ্বিকতাও যুক্ত করেছে। ( ড. ওভার টোনাল মনতাজ ) পণ্টিকর্ভোর এই ছবিকে তাই আমি রাজনৈতিক কাহিনীচিত্র বলব। এই ছবি আবার ইতিহাস নিয়েও ( ড. ইতিহাস ও চলচ্চিত্র )।

চিত্রগ্রহণ M. Gatti, চিত্রনাট্য এফ. সলিনাদ, সংগীত পণ্টিকর্ভো, ই. মরিকোন ; শিল্প নির্দেশনা S. Canevari, অভিনয়ে জঁ মার্টিন ও অ্যান্থ্র।

॥ ব্যাটলশিপ পটেমকিন ॥

( ১৯২৫, সোভিয়েত ইউনিয়ন )। পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ছবি। চলচ্চিত্র সম্পর্কে আইজেনস্টাইনের তত্ত্বের সবচেয়ে ব্যাপক, গভীর ও বলিষ্ঠ প্রয়োগ এই ছবিতে, এর প্রভাবও সুবিস্তৃত ও কালজয়ী। চলচ্চিত্রের ছাত্রদের কাছে এই ছবি সম্বন্ধে আইজেনস্টাইনের নিজের মন্তব্য খুবই মূল্যবান : 'পটেমকিন' সংক্রান্ত আলোচনায় এ ছবির দুটি বৈশিষ্ট্যের কথাই সাধারণত উল্লেখ করা হয় ; সামগ্রিক ভাবে ছবিটির সাংগঠনিক স্বসংবদ্ধতা এবং ছবিতে সন্নিবিষ্ট নাট্যরস। বৈশিষ্ট্য দুটিকে মাথায় রেখে এখন আমরা আলোচনা করতে পারি কীভাবে ছবিতে তাদের ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, মূলত কাঠামোর স্তরে। প্রথম বৈশিষ্ট্যের জন্য ছবির সামগ্রিক গঠন নিয়েই আলোচনা করতে হবে। 'স্বসংবদ্ধতা নিঃসন্দেহে এক মহত্তর ঐক্য।' শাদা চোখে হয়ত 'পটেমকিন' কালানুক্রমিক এক ইতিবৃত্তের বেশি আর কিছুই নয়। কিন্তু লক্ষণীয়, এর নাট্যরস দর্শককে নাড়া দেয়। এই অনুরণনের চাবিকাঠি লুকানো রয়েছে ছবিতে ঘটনা-বিঘ্নাসের বিশেষ কায়দায়। প্রথানুগ পঞ্চাঙ্ক ট্রাজেডির সাংগঠনিক রীতিনীতি এখানে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়েছে। নির্বাচনের সময় আনুপূর্বিক নিরাভরণ তথ্যই বেছে নিয়েছি, তারপর তাদের ভাগ করা হয়েছে পাঁচটি বিরোধান্ত অঙ্কে। তথ্যগুলিকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে তারা পায় এক অখণ্ড, ধারাবাহিক সত্তা, ধ্রুপদী ট্রাজেডির চাবিকাঠি যথাসম্ভব পূরণ করেই এ কাজ সমাধা করতে হয়েছে। তৃতীয় অঙ্কটি হয়েছে প্রথমটির চেয়ে আলাদা, পঞ্চমটি তৃতীয়টির তুলনায় ভিন্ন এইরকম। ট্রাজেডির

চিরাচরিত গঠনকৌশলকে আরও স্পষ্ট করা হয়েছে প্রত্যেক অঙ্কের আগে শিরোনাম যোগ করে। ছবিতে পাঁচটি অঙ্ক এইরকম :

১. মানুষ এবং কীট—এখানে নাট্যঘটনা উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে।

২. কোয়ার্টার ডেক্-এর নাটক।

৩. মৃতের জন্তু প্রতিহিংসা কামনা—কুয়াশা।

৪. ওদেরার সিঁড়ি।

৫. স্কোয়াড্রনের সঙ্গে দেখা—উৎসুকরাত্রি। গুলিবর্ষণে স্কোয়াড্রনের অস্বীকৃতি। প্রতিটি অংশেই যত্ন সহচরনা। সামগ্রিকভাবে কিন্তু এরা দ্বৈত পুনরাবৃত্তির সাহায্যে পরস্পর দৃঢ় সংবন্ধ। এ ছবির পাঁচটি অঙ্ক সাধারণ এক বৈষয়িক সূত্রে গ্রথিত হলেও তাদের পরস্পরের মধ্যে লক্ষণীয় সাদৃশ্য কিন্তু সামান্যই। চেহারার আদর্শে অবশ্য এরা অভিন্ন। প্রতিটি অঙ্কই পরিষ্কার ছুটি সমান ভাগে বিভক্ত। ছবির দ্বিতীয় অঙ্কে খুব সহজেই এই বিভাজন সূত্রের ব্যাখ্যা মিলবে।

ত্রিপলের দৃশ্য—বিদ্রোহ।

ভাকুলিনচুক্-এর জন্তু শোক—

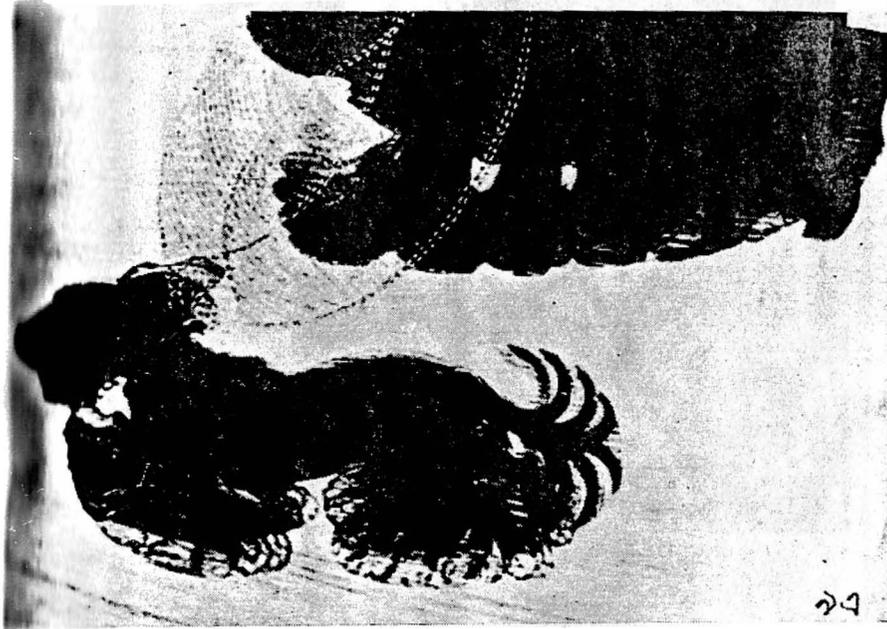
বিষ্কর প্রতিবাদে উত্তাল সভা। সৌভ্রাতৃৎ—গুলিবর্ষণ।

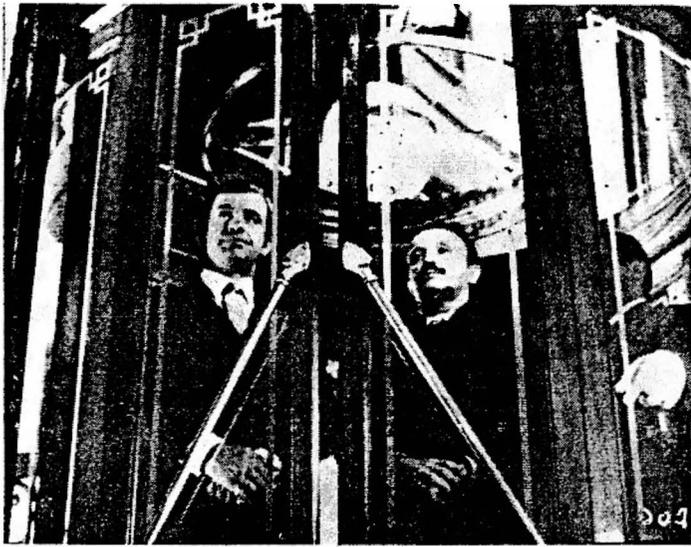
স্কোয়াড্রনের জন্তু অধীর প্রতীক্ষা—বিজয়।

প্রতিটি পরিবৃষ্টি বিন্দুকে আরও তীক্ষ্ণ তীত্র করতে ব্যবহার করা হয়েছে বিরতি বা যতি। লক্ষণীয়, এই বিভাজন বিন্দুগুলি শুধু ভিন্ন আবেগ, ভিন্ন গতি এবং ভিন্ন ঘটনারই সূত্রপাত ঘটায় না, এইসব পরিবৃষ্টি দর্শককে সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মী এক লক্ষণের সামনে এনে দাঁড় করায়। শুধু বৈপরীত্য বললেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে না; আসলে একই বিষয়ের চিত্রকল্প উপস্থাপিত হচ্ছে বিপরীত দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে; অথচ দৃষ্টিকোণের এই পরিবর্তন কখনোই বিষয়ের সঙ্গে তার যোগাযোগ হারাচ্ছে না, বিষয়ের মধ্য থেকেই তা বেরিয়ে আসছে। নীতির এই ঐক্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, নাটকের প্রতিটি অঙ্কেই এর পুনরাবৃত্তি। এই ঐক্যই সামগ্রিক বিচারে ‘পটেমকিন’ ছবির সংগঠনের বৈশিষ্ট্য। ছবিটিকে তার সামগ্রিক কাঠামোয় বিচার করলেও দেখতে পাব প্রায় মধ্যবিন্দুতে অবস্থিত এক যতির সাহায্যে এটি বিভক্ত। এই বিন্দুতে এসে প্রথম পর্বের ঝটিকাসংকুল ঘটনার গতি পায় লয়। আবার এখান থেকেই দ্বিতীয় পর্বের ঘটনা পায় গতি। ভাকুলিনচুক্-এর মৃতদেহ এবং ওদেরা বন্দরের কুয়াশা নিয়ে যে দৃশ্যপর্যায় (Sequence) সেটাই সমগ্র ছবির যতিবিন্দু। ঠিক সেই মুহূর্তে বিপ্লবের চিন্তা রণতরীর সীমাবদ্ধতা

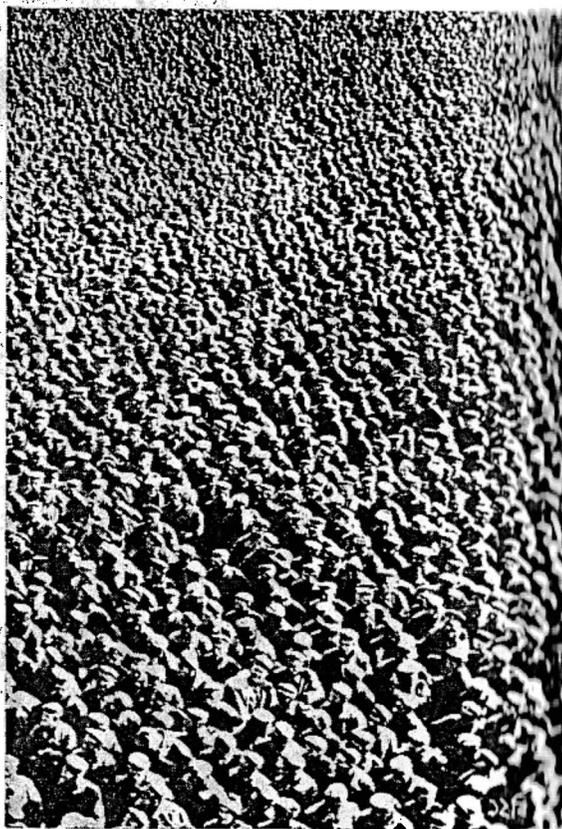
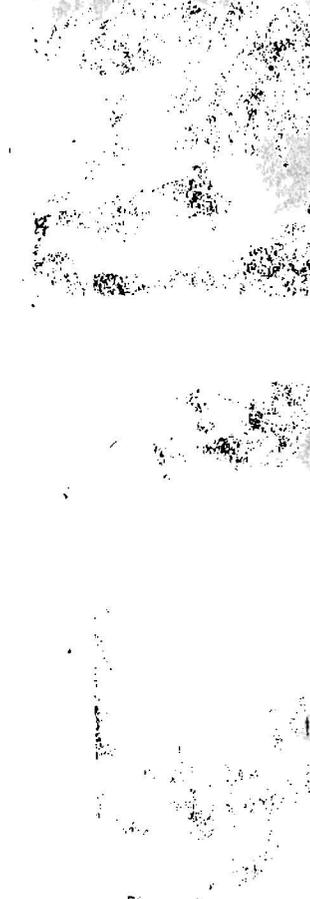
ঙ্গিমে বিস্তৃত হয় ওদেসা শহরের বুকে। বিকাশের এই স্বত্র ধরে ছবির যে  
 দংগঠন আমরা পাই তাও, কি অংশত কি সমগ্রত, বৈসাদৃশ্যহীন স্ৰমঙ্গল। ছবিতে  
 আগাগোড়া একই ঐক্য-স্বত্র যেনে চলা হয়েছে। আনুপাতিক বিচারেও এ ছবিতে  
 প্রকাশ পাচ্ছে এক স্ৰসংবদ্ধ ঐক্য। নন্দনতত্ত্বের ভাষায় যাকে বলা হয় সোনালি  
 বিভাজন (Golden Section)। এই নীতি অনুসারে গড়ে ওঠা যে কোনো  
 শিল্পকর্মই সাধারণভাবে চিত্তাকর্ষক হয়। গতিময় (plastic) শিল্পের বিশ্লেষণে  
 তো বারবার আমরা এই নীতির ব্যবহার লক্ষ্য করেছি। সাংগঠনিক স্ৰসংবদ্ধতার  
 জন্ম সুবিদিত এই 'পটেমকিন' ছবিতে অন্ততম লক্ষণীয় বিষয় হলো 'সোনালি  
 বিভাজন' নীতির ব্যবহার। অংশত বা সমগ্রত, এ ছবির বিভাজন বৈশিষ্ট্য  
 আলোচনার সময় আমরা বলেছিলাম, 'ছবিটি প্রায় দুই সমান ভাগে বিভক্ত।'  
 আসলে অনুপাতটা ২ : ৩-এর কাছাকাছি, যা মোটামুটি 'সোনালি বিভাজন'-এর  
 আদর্শ। যেখানে সমস্ত ঘটনার বিরতি, সেই প্রধান যতিবিন্দুটি দ্বিতীয় অংকের  
 সমাপ্তি এবং তৃতীয় অংকের সূচনার মাঝামাঝি অবস্থিত। অর্থাৎ এটা ২ : ৩  
 অনুপাত। ঠিকভাবে বলতে গেলে দ্বিতীয় অংকের শেষেই এর সন্ধান মিলবে।  
 এখানেই মৃত ভাস্কর্যলিনচুক প্রসঙ্গের অবতারণা। প্রতিটি অংকের যতিবিন্দুকেও  
 এভাবে সঠিক অনুপাত অনুসারে খুঁজে পাওয়া যাবে। 'পটেমকিন' ছবিতে আরও  
 আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শুধু শূন্য বিন্দুর ক্ষেত্রেই নয়, চরম মুহূর্তের সংগঠনেও ওই  
 একই সোনালি বিভাজন নীতি অনুসৃত। রণতরীর মাস্তলে লাল পতাকা ওড়ানোর  
 দৃশ্যই এ ছবির চরম বিন্দু, এবং এ দৃশ্যের আবির্ভাবও সোনালি বিভাজনের  
 নীতিতে; তবে বিভাজন এখানে বিপরীত (inverse) অনুপাতে ( অর্থাৎ ৩ :  
 ২তে )। এবার আসি 'পটেমকিন' ছবির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের আলোচনায়। এর  
 নাট্যরস এবং বিশেষ করে তাকে উৎসারিত করতে যে সব নির্মাণকৌশলের  
 সাহায্য নেওয়া হয়েছে। নাট্যরস একই সঙ্গে গভীর আবেগ এবং উৎসাহের জন্ম  
 দেয়। উপযুক্ত ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে হলে তাই রচনার আগাগোড়াই চিত্তাকর্ষক  
 ঘটনা এবং গুণগত পরিবর্তনের একটি ধারা সক্রিয় থাকা বাঞ্ছনীয়। দর্শককে যদি  
 আমরা তাঁর আবেগের চরমে পৌঁছে দিতে চাই, চাই তাঁকে উচ্ছ্বসিত, উদ্দীপ্ত  
 করতে, তাহলে সিনেমায় সবচেয়ে সহজ উপায় হলো উচ্ছ্বসিত, উদ্দীপ্ত কোনো  
 মানুষকে দেখানো—চরিত্রটি যখন ভীষণ এক আবেগে মগ্ন হচ্ছে, যখন  
 সে আত্মহারা। নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘটনার গুণগত পরিবর্তন দেখানোর জন্ম সমগ্র  
 পরিবেশকেই কাজে লাগাতে হয়। বলা যায়, শুধু চরিত্র নয়, তাকে ঘিরে যে

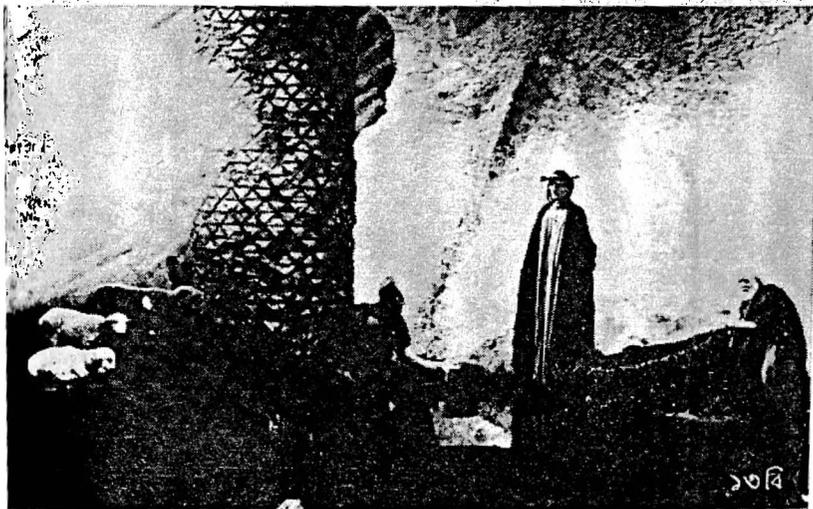
পরিবেশ, তাও সেখানে 'আল্‌হারা'। ছবির প্রসঙ্গে ফিরে আসি—ওদেশা বন্দোবস্ত  
 সিঁড়িতে। বিশেষ এই দৃশ্যে বিভিন্ন চরিত্র তথা জনতার বিহ্বল অবস্থার কথা যা  
 দিয়ে আমরা শুধু দেখাব, কী ভাবে এখানে 'গতি'-কে আবেগের ক্রম-আরোহণ  
 প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। শুরুতে ক্লোজ আপ-এ কিছু  
 মাহুয়ের বিশৃঙ্খল দোঁড়াদোঁড়ি। এরপরে লং শট-এ সেই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি।  
 কিন্তু পরের কয়েকটি দৃশ্যে আগেকার বিশৃঙ্খল গতির জায়গায় এল সৈন্তদের  
 পায়ের কিছু শট—বন্দরের সিঁড়ি দিয়ে ছন্দোবদ্ধ পদক্ষেপে তারা নামছে। এখানে  
 লম্বা বাঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছন্দও বাঁড়তে থাকে। এই অবরোধী গতি তার অস্তিম  
 বিন্দুতে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই আচমকা হলো দিক পরিবর্তন, সিঁড়ি বেয়ে  
 ছত্রভঙ্গ, পলায়নপর জনতার যে ভীড় আগে দেখেছি তার জায়গায় নিল মৃত-পুত্র  
 কোলে হতভাগ্য নিঃসঙ্গ জননীর মূর্তি। ধীর বিষন্ন পদক্ষেপে সিঁড়ি বেয়ে তিনি  
 উঠছেন। ছত্রভঙ্গ জনতার ব্যস্ততার গতি অবরোধী। তারপরই হঠাৎ নিঃসঙ্গ  
 প্রতিমা, ধীর বিষন্ন। এবারে গতি আরোহী। কিন্তু মুহূর্তমাত্র তার স্থায়িত্ব।  
 আবার আকস্মিক দিক-পরিবর্তন—বিপরীত গতি, অবরোধ। দ্রুততর ছন্দ নিয়ে  
 আসে বর্ধিত লম্বা। আবার হঠাৎই ধাবমান জনতার এই দৃশ্যকে অনুসরণ করে  
 আসে সিঁড়ি বেয়ে গড়িয়ে পড়া প্যারাসুলেটর-এর দৃশ্য। এবার কেবল লম্বা  
 পরিবর্তন নয়, উপস্থাপন পদ্ধতিতেও পরিবর্তন দেখা দেয়—বিযুক্ত থেকে বস্তুগত।  
 অবরোধী গতির এ হলো আরেক দিক। ফলে ক্লোজ থেকে আমরা চলে যাই লং  
 শট-এ। ছত্রভঙ্গ জনতার ব্যস্ততাকে অনুসরণ করে সৈন্তদের ছন্দোবদ্ধ কুচকাওয়াজ।  
 গতির বিশেষ এক রূপ ( জনতার পলায়ন, পতন ইত্যাদি ) পরিবর্তিত হয় অল্প  
 এক রূপে ( পতনশীল প্যারাসুলেটর ), অবরোধ থেকে আরোহণ। গর্জ-ওঠা  
 একাধিক রাইফেল থেকে চলে যাই রণভরীর একটিমাত্র কামানের একটি মাত্র  
 গোলাদাগার দৃশ্যে। এভাবে পূর্বাপর মাত্রা পরিবর্তন ঘটে, ঘটে যায় গুণগত  
 পরিবর্তন, যতক্ষণ না তা শুধু ঘটনার বিশেষ অংশকেই নয়, কাহিনীর সমগ্র ব্যাপ্তিকেই  
 আচ্ছন্ন করছে। উন্নত সিংহমূর্তির পর্যায়ে এসে এমনকি কাহিনীর বর্ণনামূলক ভঙ্গিও  
 রূপান্তরিত হয় প্রতীকী উপস্থাপনায়। সিঁড়ির দৃশ্যমান ধাপগুলি যেমন ঘটনায়  
 অবরোধী গতির সূচনা করে, তেমনি স্তরে স্তরে বিস্তৃত গুণগত পরিবর্তনের ধারাটিও  
 স্পষ্ট করে তোলে, তবে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার বিপরীত আবারে। স্তরায় সিঁড়িতে  
 জলিবর্ষণের দৃশ্যের নাট্যবস্তুর যে স্পর্ধিত প্রকাশ তা একই সঙ্গে নাট্য সংগঠনেরও  
 মূলসূত্র হয়ে ওঠে এবং ঘটনার গতি ও ছন্দকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। যার ফলে



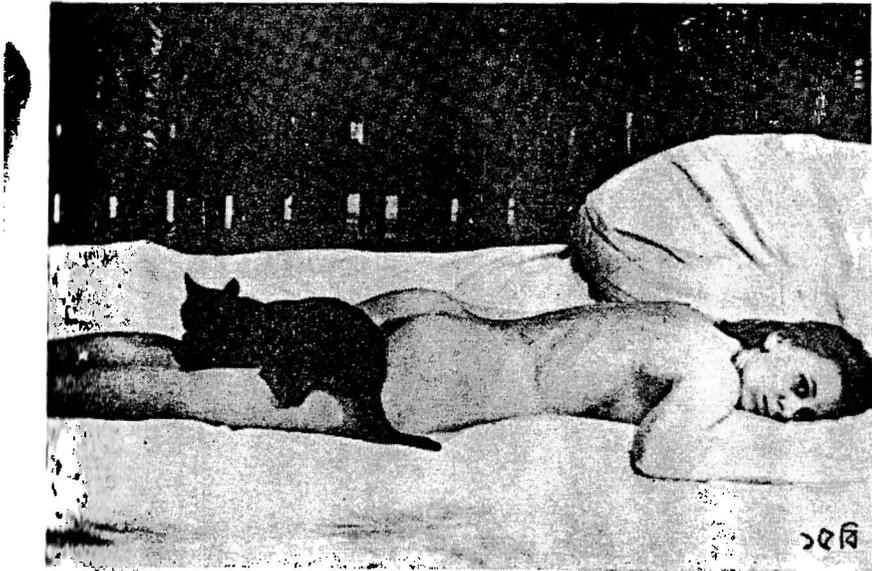
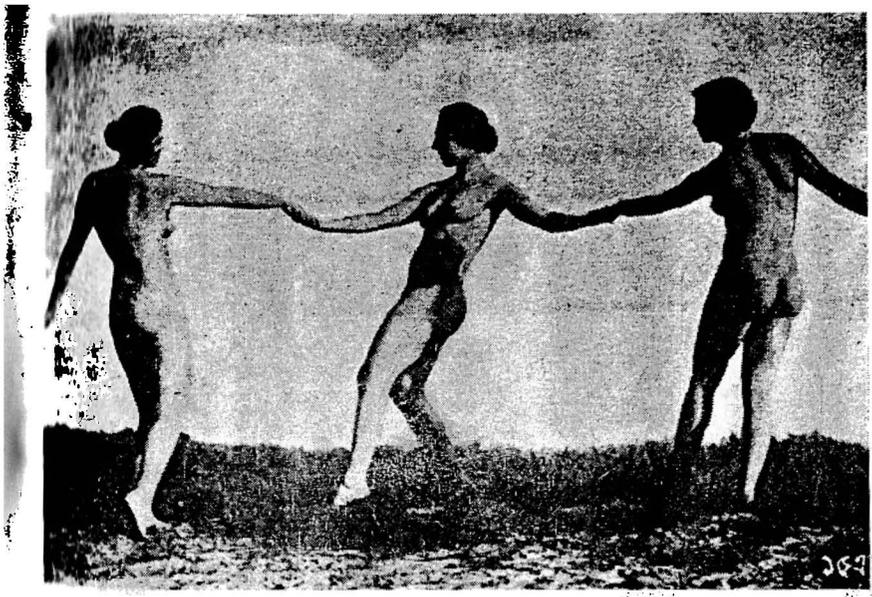














বিশেষ এই ঘটনাই সমগ্র ছবির বিয়োগান্ত পরিণতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। 'পটেমকিন' ছবিতে স্রসংবদ্ধতার তৃতীয় একটি লক্ষণের কথাও এবার উল্লেখ করতে পারি। এ ছবির প্রত্যেকটি সাংগঠনিক উপাদানকেই শুধু নয়, সামগ্রিক কাঠামোকেও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তুলেছে যে আকস্মিক উল্লেখ, তাই আমাদের নাট্য বিষয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান অর্থাৎ বিপ্লবী উদ্ভাদনার সাংগঠনিক প্রকাশ। বিপ্লব হচ্ছে সামাজিক উল্লেখ-প্রবাহের একটি অংশ, যার সাহায্যে সামাজিক বিকাশ অব্যাহত থাকে।

চিত্রগ্রহণ টিশে, সম্পাদনা আইজেনস্টাইন, সংগীত মাইজেল, সহ পরিচালনা আলেকজান্দ্রভ, অভিনয়ে আন্তোনভ ( ভাকুলিনচুক ) ও আরো অনেক-অনেকে ।

॥ বের্টস্ট্রেট ১ ॥

( ১৮৯৮-১৯৫৬, জার্মানি )। কবি ও নাট্যকার বের্টস্ট্রেট তাঁর যে অ্যালিয়েনেশন তত্ত্বের জন্ম বিখ্যাত তা দর্শককে নাটক দেখার সময়ে সচেতন করে দেয় যে এটি একটি নাটক ; বাস্তবতা নয়, বিভ্রম ; আবেগ নয়, মনন ; প্রমোদ নয়, বিচার— বিপ্রতীপ এই সূত্র প্রযুক্ত সেখানে। তাঁর নাট্যশিল্পনীতি এপিক থিয়েটার নামে পরিচিত, যা অভিনেতা থেকে দর্শকের দৃষ্টি সৃষ্টি করে তাদের সচেতন করে তোলে। এই তত্ত্ব ও নীতি সিটিজেন কেন থেকে Alfie পর্যন্ত বহু ছবিকে ও বিশেষত গদারকে প্রভাবিত করেছে। চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে তাঁর একাধিক নাটক ও ছোটগল্প তার মধ্যে আছে কাতালকান্তির তোলা ছবি পুষ্টিলা, পাব্‌স্টের দি থ্রু পেনি অপেরা ও দি শেম্‌লেস্‌ ওল্ড লেডীর চিত্রায়ণ। বের্টস্ট্রেট নিজেও দি থ্রু পেনি অপেরার একটি চিত্ররূপ দিয়েছিলেন। বের্টস্ট্রেটের নাট্য প্রযোজনা দি মাদার, মাদার কারেজ ও গ্যালিলিও গ্যালিলিই যেভাবে মঞ্চস্থ হয় তার চিত্রায়ণ করাও হয়েছে। বের্টস্ট্রেটের নিজের প্রযোজনায় যে সব টুকরো ফিল্ম ব্যবহার করা হয়েছে ও বের্টস্ট্রেটের তত্ত্ব চিত্রভাষার তাৎক্ষিক সমৃদ্ধিতে যে ভাবে সাহায্য করেছে তাও উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রায় ছ-বছর হলিউডে কাটান, যে সময়ে এককভাবে বা অস্থানের সঙ্গে সহযোগিতায় তিনি কয়েকটি চিত্রনাট্য লেখেন যার মধ্যে ল্যাংয়ের হ্যাংমেন অলসো ডাই বা ইভেন্সের তথ্যচিত্র-এর চিত্রনাট্য উল্লেখযোগ্য। 'অন সিনেমা' ( ৩০ ) চলচ্চিত্র বিষয়ে তাঁর একমাত্র গ্রন্থ। বুর্জোয়া ফিল্ম আদর্শ সম্পর্কে তাঁর সমালোচনার কথা সুবিদিত। বিশ শতকের থিয়েটারের অগ্রতম প্রধান পুরুষ বের্টস্ট্রেট-এর গুরুত্ব চলচ্চিত্রের আলোচনাতে দিন দিন বাড়বে বলে মনে হয়।

## ॥ রোবের ব্রেসঁ ॥

(জন্ম ১৯০৭, ফ্রান্স)। ১৯৪৩ সালে পরিচালক-জীবন শুরু করা ব্রেসঁর এগারোটি ছবির পর্যালোচনা প্রকৃতপক্ষে সমালোচকদের পরিষ্কার দুটি শিবিরে গণ্য করেছে। চিত্র নির্মাণ সম্পর্কে ব্রেসঁর ধারণার বিরোধীরা তাঁর ছবির জগৎবাসী নীরক্ত, ম্লানসহীন জগৎ বলে অভিহিত করেছেন, বলেছেন ব্রেসঁর সিনেমা শূন্য সিনেমা নয়, সিনেমার কংকাল। এঁরা অপেক্ষা করছেন কবে কবিতা সম্পর্কে মালার্মের স্বপ্নের মতো (যে স্বপ্নে কবিতা হলো 'কালির কোনো দাগ পড়েন, শুধুই সাদা পাতা') ব্রেসঁর ছবিও সাদা পর্দায় নব্বই মিনিট ধরে সাদা আঙো প্রক্ষেপ করে শেষ হবে। Au Hasard, Balthazar-এর শরীরে কিছু রক্তমাংস পাওয়া গেলেও ব্রেসঁ কাঠামো-সর্বস্বতা অতিক্রম করে এসেছেন, এঁরা তা বলেননি, বলেছেন, হয়ত তাঁর আনুগত্য রাজকীয়, কিন্তু অন্ধ আনুগত্য তা। অগ্নি শিবিরের সমালোচকরা তাঁর প্রতিটি নতুন ছবির মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহে পুষ আবেগে চালিত হয়ে গত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে এই কথাই বলে আসছেন যে তাঁর সর্বশেষ ছবি আগের সব সৃষ্টিকে ব্যঞ্জনায়, সম্পদে, মর্মান্বিত্য অতিক্রম করে গেছে। এই স্পষ্ট বিভক্ত ও পরস্পর বিরোধী মতবাদ ফ্রান্সের সবচেয়ে বিপ্লবাত্মক ও সবচেয়ে গৌড়া চিত্রপরিচালক ব্রেসঁর চলচ্চিত্র সম্পর্কে নিজস্ব ধারণার স্বাতন্ত্র্য কারণেই। যে ধারণার প্রাঞ্জল ও তীক্ষ্ণ উদাহরণ রয়েছে তাঁর ১৪০ পাতার গ্রন্থ Notes Sur le Cinematographe (১৯৭৫)-য়ে।

প্রথমত সিনেমাটোগ্রাফি ও সিনেমার মধ্যে তিনি স্পষ্ট সীমারেখা টানেন। সিনেমা হলো আলোকচিত্রিত নাটক, যাতে পরিচালক অভিনেতাদের অভিনয় করতে দেন, আর সেই অভিনয়ের চিত্রগ্রহণ করে একটির পর আরেকটি ছবিতে সাজিয়ে নেন। অভিনেতাদের ও দর্শকদের মশরীফী একত্র উপস্থিতি ছাড়া মঞ্চনাট্যের আর সব কিছুই থাকে নাট্যাঙ্কিক-ধর্মী সিনেমায়। কিন্তু সিনেমাটোগ্রাফি অল্প জিনিশ, তা আলোকচিত্রিত নাটক নয়, বাস্তবের ছব্ব অনুকরণ নয়, আবার গিমিকের খেলাও নয়, এই বলে তিনি চলচ্চিত্রের ইতিহাসের প্রায় সমস্ত ছবিতে অস্বীকার করে চলচ্চিত্রের মাধ্যমটিকে, যা তাঁর মতে এতদিন কুব্যবহৃত হয়েছে, সমস্ত সম্ভাবনার মধ্য দিয়ে উন্মুক্ত করতে যান। এ যেন শেকসপিয়ার, গায়টে, মলিয়ের-দের হাতে ভাষার যে ব্যবহার ঘটেছে সেই ভাষাই সাংবাদিকতা, বিজ্ঞাপন, আর রহস্য উপস্থানে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে ওই ভাষাকে বাতিল করে

ধাপে ভাষার অনুসন্ধান। ব্রেস্টার কাছে চলচ্চিত্র বাস্তবতার পুনর্নির্মাণ নয়, বাস্তবকে সৃষ্টি করাও নয়, বরং চলমান ছবি ও শব্দের সাহায্যে ভাব-প্রকাশের এক বাস্তব মাধ্যম যা এমন এক বাস্তবতাকে অর্জন করতে পারে সাহিত্য, চিত্রশিল্প ও মঞ্চের যা নাধ্যাতীত। সিনেমাটোগ্রাফি যদি ছবি ও শব্দের মধ্যে বিশেষ সম্পর্কই হয় তাহলে ব্রেস্ট যে নিজেকে setter of scene না বলে (যেহেতু সেটা মঞ্চধর্মী), setter into order বলবেন সেটাই স্বাভাবিক। তিনি বাস্তবতা, বাস্তবতার বিশেষ কিছু অংশ বা দিক, বেছে নিয়ে তাদের একটা বিশেষ ক্রমে সাজিয়ে দেন। বিশেষ কোনো চিত্রশিল্পীর রঙ সাজানো ও রঙ-ম্যাটিংয়ের মধ্য থেকেই তাঁর ক্যানভাসকে সম্পূর্ণ করে তুলে আনার মতো। তৃতীয় যে প্রচলিত ধারণাকে তিনি অস্বীকার করেছেন তা হলো পেশাদারী অভিনেতার ব্যবহার। তাঁর তৃতীয় ছবি 'দি ডায়েরি অব এ কান্ট্রি প্রিষ্ট' (১৯৫০)-এর সময়ই তিনি পেশাদারী অভিনেতাদের শুধু মজাদার মুখ আর গিমিকের অধিকারী বলে মনে করছেন, বলছেন তাঁরা যখন সংলাপ আর অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে অনুভব প্রকাশ করছেন বলে ভাবেন আসলে তখন তাঁরা যা প্রকাশযোগ্য তাকে নষ্ট করছেন। অভিনেতাদের কাজ অভিনয় করা নয়, পরিচালকের হাতে কাঁচা মাটির পুতুল হয়ে থাকা, আমার সামনে তাঁরা যা করে দেখান তার কোনো মূল্য নেই, যা তাঁরা করেন না ও তার চেয়েও বড়ো কথা করতে পারেন বলে জানেন না, সেটাই আসল। তাই গুটিং-য়ের সময় তাঁর ছবির অভিনেতাদের সম্পূর্ণরূপে অন্ধকারে রাখা হয়, তাদের খাটান হয় দৈহিক ও মানসিক রূপে তারা একেবারে ভেঙে না পড়া পর্যন্ত, একই দৃশ্যের ৩০, ৪০টা করে টেক হয়, যতক্ষণ না পর্যন্ত অভিনয় একেবারে ভাবলেশহীন, নৈর্ব্যক্তিক, নিরাসক্ত হয়ে ওঠে, আমার খিদে পেয়েছে ও শেষ দিন পর্যন্ত আমি তোমাকে ভালোবাসব— দুটি সংলাপই একইভাবে উচ্চারিত হয়। চরিত্রের সঙ্গে অভিনেতার দৈহিক সাদৃশ্য নয়, নৈতিক সাদৃশ্য দেখে, ব্রেস্ট অভিনেতা বাছেন, তারপর তার দক্ষতা ও স্তিমিত্বকে শীর্ণ ও তরল করে নিয়ে চরিত্র ও পরিচালকের মধ্যে অভিনেতাকে নিজীব করে বসিয়ে দেন। ১৯৫০-এর পর থেকে তাঁর কোনো ছবির কোনো অভিনেতাই অভিনয়কে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে পারেননি।

তাঁর ছবিতে অভিনয়হীনতার এই ব্যাপারটির সঙ্গে থাকে ছবি, সংলাপ ও ধারাবিবরণীর সান্নিপাত্য ও সীলিত স্টাইলাইজেশন যা সাধারণ দর্শকের কাছে ছবিকে ইচ্ছাকৃতভাবে স্বন্দর না করা, সংলাপকে সাদামাটা করা ও ধারাবিবরণীকে টেলিফোন গাইড পাঠের মতো একঘেয়ে করে তোলা বলে মনে হতে

পারে। এর উত্তরে ব্রেসঁ বলবেন, সিনেমাটোগ্রাফির সৌন্দর্য নির্ভর করে প্রথম ছবির ওপর ততটা নয়, যতটা প্রতিটি ছবির সঙ্গে অল্প ছবিগুলোর প্রাদিক্ৰমণের ওপর। কোনো শব্দ বা বাক্যের সঠিক গুরুত্ব, সৌন্দর্য বা সত্যতাও তথাকথিত প্রচলিত সংলাপের চেয়ে ভিন্নধর্মী কিছুর। কেননা এই রকম শব্দকে আমি বিশালাসিতক, অর্থহীন জবজব বলে মনে করি। আর রঙ? অধিকাংশ রঙকেই আনন্দ মনে হয় বড় বেশি বর্ণবহুল, খুব বেশি রূপসচেতন। চিত্রশিল্পী হিসেবে বলতে পারি প্রত্যেকের এমন ছবি আঁকা উচিত যা সুন্দর ছবি না হোক কিন্তু অবশ্যই যেন হয় অপরিহার্য ছবি। রঙ, শব্দ ও কাহিনীর ওপর বেশি যদি জোর পড়ে তাহলে আসল জিনিসটাই তো হারিয়ে যাবে—বিষয়বস্তুর আর চরিত্রগুলোর ভেতরটা। ‘আপাতদৃষ্টিতে আবেগ-নির্ভর না হলেও ব্রেসঁর কুশীলব একটি-দুটি তীব্র ইমোশনের দ্বারা তাড়িত।’ (ড্র. ফ্রান্স)

এমন ঠাঁর শৈলী জানা কথাই তাঁর জগৎ ব্যক্তিগত জগৎ, সাবজেকটিভ। *The Diary of a Country Priest* (৫০), *A Man Escaped* (৫৬), *Pickpocket* (৫৯), *Trial of Joan of Arc* (৬২), *Au Hasard, Balthazar* (৬৬), *Mouchette* (৬৭), *Une Femme Douce* (৬৯),—রঙে তাঁর প্রথম ছবি, *Four Nights of a Dreamer* (৭১), *Lancelot du Lac* (৭৪)—তাঁর ছবির নাম, চিত্রনাট্য ও মূল চরিত্রগুলি ইতিহাসের বিভিন্ন সময় ও পাঁশ্চাত্য সভ্যতার নানান দিক থেকে টানা হয়েছে, সব মিলিয়ে একটি প্রসারিত জগৎ, বিভিন্ন বৈচিত্র্য সত্ত্বেও যেখানে বিশ্বয়কর ঐক্য পরিলক্ষিত। যে চরিত্র হোক না কেন ব্রেসঁ তাকে এক ধরনের একাগ্নতা ও উত্তরাধিকার দেন। নিঃস্বপ্নিতা, প্রেম বা অস্বপ্নের মধ্যে ও প্রতি তারা প্রত্যেকেই সমান আনন্দপ্রাপ্ত-মাইজিং, সমান প্যাশনেট। এদের প্রত্যেকের দর্শন যেন এক—*Our real life is not our history, but the permanent recreation of our self through the direct action of our will* (—Fernand Alquié-র মতবাদ)। ব্রেসঁ মানুষের অন্তর্জগৎ ও তার আধ্যাত্মিক অস্তিত্বকে প্রকাশ করতে চান কেননা ওই স্তরেই মানুষের বন্দী সত্তার যাবতীয় নাটক সংঘটিত হয়। তাঁর ছবির নায়ক বাইরের অথবা ভেতরের কারণারের যন্ত্রণা সহ করে আর ক্রমাগত তা থেকে মুক্তি পেতে চায়। সার্বিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম—ব্রেসঁর ছবির মূল থীম এটাই। তাঁর বারো নম্বর ছবি *The Devil, Probably* (৭৭)-য়ে এই সংগ্রাম পার্থিব সভ্যতাকে রক্ষার জন্যই সংগ্রাম। [ফ্রান্সের নবতরঙ্গ পরিচালক-

গোষ্ঠী ছিল ব্রেস্টের প্রতি বিশেষ আস্থাশীল। গদারের ভাষায়, জার্মান সংগীতে মোৎসার্ট  
খা, বা রুশ উপস্থাপনে দস্তোয়েভস্কি, ফরাপি চলচ্চিত্রে ব্রেস্ট হলেন তাই।]

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : I. Cameron সম্পাদিত দি ফিল্মস অব রোবের ব্রেস্ট ॥

জে. এফ. ম্যার

॥ মারলন ব্র্যাণ্ডো ॥

জন্ম ১৯২৪, মার্কিন অভিনেতা। চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এমন অভিনেতা-অভিনেত্রী  
এনেছেন যারা যে দুর্ভাগ্য অভিনেতা বা একটার পর একটা দারুণ ছবিতে অভিনয়  
করেছেন এমন নয়, কিন্তু পর্দার ব্যক্তিত্ব (screen personality) ও নিজস্ব  
ব্যক্তিত্ব দিয়ে জীবৎকালেই মিথ হয়ে উঠতে পেরেছেন— এমনই একজন অভিনেতা  
ব্র্যাণ্ডো। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষানবিশি অভিনয়ে ( নিউ ইয়র্কের নিউ স্কুল ফর  
সোশ্যাল রিসার্চের নাট্যবিষয়ক শিক্ষাকেন্দ্রে ) ও জগৎ-জোড়া খ্যাতি অভিনয়ের  
স্ববাদেই, কিন্তু চিত্রাভিনেতা হবার কোনো পরিকল্পনা বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা-ই নাকি  
তাঁর ছিল না, তিনি নাকি জীবিকার একটা উপায় হিসেবেই একে নিয়েছিলেন  
এবং পরে দেখলেন অল্প সময়ের মধ্যে অনেক টাকা রোজগারের এটাই শ্রেষ্ঠ  
উপায়। অভিনয়ের স্ববাদে জীবনে আদ্য অর্থ, খ্যাতি ও নারীকে ঘিরেই তাঁর দারুণ  
জীবন আবর্তিত হয়েছে, এর মাধ্যমেই তিনি অর্জন করেছেন, তাঁর ‘বিগ বুল’  
ইমেজ, জ্যাক নিকলসনের ভাষায় তিনি হলেন ‘the big fellow in the hill’.

ব্র্যাণ্ডো মঞ্চ থেকে চিত্রে আসেন। তিনি স্তানিস্লাভস্কির অভিনয়-পদ্ধতিকে  
নঞ্চাভিনয়ে ও চিত্রাভিনয়ে প্রয়োগ করেন। ১৯৪৭-৪৯ এশিয়া কাজান প্রখ্যাত  
অভিনেতাদের সদস্য করে দি অ্যাক্টরস’ স্টুডিও স্থাপন করার পর মার্কিন সিনেমায়  
পরিমিত স্বাভাবিক অভিনয়ের প্রচলন হলো। যে-প্রসঙ্গে ব্র্যাণ্ডোর কথা আসে।  
এইভাবে স্তানিস্লাভস্কির বৈজ্ঞানিক চিন্তার ফলস্বরূপ চলচ্চিত্রে চলচ্চিত্রধর্মী  
অভিনয়ের প্রবর্তন হয়েছিল। এবং ব্র্যাণ্ডোর অভিনয়রীতি জেমস ডিন থেকে রবার্ট  
ডি নিরো পর্যন্ত বহু মার্কিন অভিনেতাকে প্রভাবিত করেছে। তিনি শুধু অভিনেতা  
মন, প্রযোজক ও পরিচালক রূপেও তিনি কাজ করেছেন। তাঁর বিচিত্র জীবনের  
বিশ্বস্ত পরিচয় মিলবে তাঁর আত্মজীবনী ‘Songs My Mother Taught Me’  
গায়ে।

অডগুয়ে থেকে হলিউডে ব্র্যাণ্ডোকে নিয়ে আসেন স্ট্যানলি ক্রামার জিমে-  
য়ানের দি মেন ( ১৯৫০ ) ছবিতে অভিনয়ের জন্ত। তারপর আর তাঁকে পিছনে

তাকাতে হয়নি। সর্বার্থে পুরুষালি অভিনয় তাঁর অভিনয়কে দিয়েছে দৃঢ় প্রত্যয়। প্রতিবাদ, পৌরুষ ও যুদ্ধ কমিক্‌গণ—তাঁর অভিনয়ের ও অভিনীত চরিত্রের প্রমাণ বৈশিষ্ট্য এই তিনটি। তাঁর অভিনীত অনেক চরিত্রই প্রতিবাদ করে, কিন্তু কোন করে তা ঠিক জানে না, হতাশ নায়ক এরা। তাঁর দি ওয়াইল্ড ওয়ান ( ৫৩ ) ছবিতে তীব্র হিংস্রতা এবং লাস্ট ট্যাঙ্কো ইন প্যারিস ( ৭৩ ) ছবির মুক্তপ্রাণ যৌনতা সেই সময়ে খুবই নিন্দিত হয়েছিল। বের্তোলুচ্চি পরিচালিত লাস্ট ট্যাঙ্কো ছবিতে ( ছবিটি নায়ক ও নায়কের স্ত্রীর একাকিত্ব, নায়কের নায়িকার ওপর ধর্ষকামী আচরণ, নায়কের স্ত্রীর আত্মহত্যা, নায়িকার নায়ককে হত্যা—দুই মিলিয়ে যৌনতা, যন্ত্রণা ও হতাশার এক ক্রম চিত্ররূপ ) মারিয়া শ্লেইডারের বিপরীতে তাঁর বিভিন্ন দৃশ্য খুবই আঘাতদায়ক। এর বিপরীতে রাখা যেতে পারে চ্যাপলিনের কমেডি এ কাউন্টেস ফ্রম হংকং ( ৬৬ ) এবং দি গডফাদারের প্যারডি দি ফ্রেশম্যান (৯০)-কে। অন দি ওয়াটারফ্রন্ট ( ৫৪ ) ও দি গডফাদার ( ৭২ ) ছবির জন্ম ত্র্যাগেডী শ্রেষ্ঠ অভিনেতার অস্কার পুরস্কার পান। তাঁর অস্বাভাবিক উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে আছে এ স্ট্রীটকার নেম্‌ড্ ডিজায়ার ( ৫১ ), Viva Zapata ( ৫২ ), Sayonara ( ৫৭ ), The Fugitive Kind ( ৫৯ ), Burn ! ( ৬৯ ), Apocalypse Now ( ৭৯ ), A Dry White Season ( ৮৯ ), Christopher Columbus : The Discovery ( ৯২ ) ইত্যাদি। তাঁর রাজনৈতিক মতবাদের জন্মও তিনি অনেক সময়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছেন। পট্টিকর্ভোর 'বার্ন!'-এর মতো রাজনৈতিক ছবিতে অভিনয় থেকে তাঁর এই আত্মগত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু আরও অনেক কিছুর মতো এটাও তাঁর ভান হতে পারে, ত্র্যাগেডীর সম্মোহন!

## ॥ ব্লু ফিল্ম ॥

পর্নোগ্রাফিক ফিল্মের আরেক নাম ব্লু ফিল্ম। যৌনতা হলো এই ধরনের ফিল্মের প্রথম ও প্রধান বিষয়বস্তু। নারী ও পুরুষের যৌন মিলনের প্রতিটি পর্যায়ের ও বিভিন্ন আসনের প্রত্যক্ষ, অকপট ও পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্ররূপ। শিক্ষামূলক বা মেডিক্যাল প্রবণতার চেয়ে এই সমস্ত ছবিতে বিকৃত মনস্কতার পরিচয়ই বেশি। তাই নারী-পুরুষের মৈথুন ছাড়াও সমর্মৈথুন, আত্মমৈথুন, ধর্ষণ, গণধর্ষণ, ধর্ষকাম, মর্ষকাম, ভয়ানকরিজম, নর-পশু মৈথুন প্রভৃতি বিভিন্ন বিকৃত ক্রিয়ার বিশ্বাস প্রদর্শন হয়ে থাকে ব্লু ফিল্মে। পর্নোগ্রাফি ও এরোটিকার মধ্যে যে পার্থক্য, যৌন চলচ্চিত্র ও চলচ্চিত্রে যৌনতার মধ্যে সেই পার্থক্য। যেমন ব্রিটিশ Spanking Films আর পাসোলিনিয়

হান্ডেড টুয়েন্টি ডেজ অব স্‌ডম। পাশ্চাত্যের অধিকাংশ দেশেই এই ধরনের ছবি তৈরি হয়, তার মধ্যে ডেনমার্ক ও সুইডেনের বহু প্রযোজক এই ছবির প্রধান রপ্তানিকারক। প্রায় সনস্ত ব্লু ফিল্মের রীতি ও রূপ এক রকম, তাকে বলা যায় প্যাথলজির আদিক আর বিবমিষার বাহক। বিকৃত মানসিকতা ভিত্তিক হলেও এই ছবি কিন্তু সুস্থ মানসিকতার দর্শকরাও দেখে থাকেন, বিশেষত অল্প বয়সী এবং প্রৌঢ়রা। যথেষ্ট পরিমাণ টাকা খাটছে বলে ব্লু ফিল্ম ধনতান্ত্রিক চলচ্চিত্রের এক অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে (ড্র. চলচ্চিত্রে ভাবনাস্বীতি, মেয়েদের বিরুদ্ধে সিনেমা)। এই অবক্ষয়ের প্রাধান্য শুধু অর্থনৈতিক নয়, সমাজতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক প্রনদের সঙ্গেও জড়িত। (ড্র. যৌনতা ও চলচ্চিত্র)

॥ রো আপ ॥

৮, ১৬ বা ৩৫ মি. মি. ফিল্ম নেগেটিভে ছবি তুলে তাকে ৮, ১৬ বা ৩৫ মি. মি. পজিটিভ ফিল্মে প্রস্ফুটন করা হয়। কিন্তু ৮ মি. মি. নেগেটিভকে ১৬ বা ৩৫ মি. মি. পজিটিভে বা ১৬ মি. মি. নেগেটিভকে ৩৫ ও এমনকি ৭০ মি. মি. পজিটিভে প্রস্ফুটন করাও সম্ভব। একে রো আপ বলে। অর্থাৎ মুভির রো আপ স্থিরচিত্রের এনলার্জমেন্টের মতো। এই ধরনের রো আপে প্রদর্শনকালের হেরফের হয় না কিন্তু ফিল্ম ফর্ম্যাটের পার্থক্যের দরুন পজিটিভের দৈর্ঘ্যে ব্যাপক পরিবর্তন হয়। ৪০০ ফুট ১৬ মি. মি. ৩৫ মি. মি.-য়ে এসে ১০০০ ফুট দৈর্ঘ্য পায়। নেগেটিভ ফিল্মের খরচ অনেক কম লাগে বলে রো আপের কদর দিন দিন বাড়ছে। পিস্ফুটনের মানও আগের তুলনায় এখন অনেক উন্নত, শাদা কালো ও রঙিন উভয় ক্ষেত্রে। রো আপ কখনো কখনো যে অসাধারণ শৈল্পিক মুহূর্ত সৃষ্টি করতে পারে ছল অ্যাণ্ড জিমের যুদ্ধদৃশ্য তার প্রমাণ।

॥ ম্যাক্স ভন সিডো ॥

(জন্ম ১৯২৯, সুইডেন)। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পুত্র সিডো স্টকহমের রয়াল ড্রামাটিক থিয়েটার স্কুল থেকে অভিনয়ের অতুশীলন শেষ করে মঞ্চে অভিনয় শুরু করেন ও ক্রমে মঞ্চ থেকে চলচ্চিত্রে আসেন। বার্গন্যানের নিজস্ব নাট্যসংস্থার ঐচ্ছিক সদস্য হিসেবে তাঁর বহু ছবিতে অভিনয় করার স্বযোগ পেয়ে ভন সিডো ঐচ্ছিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন হয়ে ওঠেন। এর মধ্যে দি সেভেন্থ সীল, ওয়াইল্ড নটবেরীজ, সো ক্লোজ টু লাইফ, দি ফেস, দি ভার্জিন স্ট্রীং, থু এ গ্রাস ডার্কলি,

উইন্টার লাইট, আওয়ার অব দি উল্ফ, দি শেম, দি টাচ, এ প্যাশন ইত্যাদি বহু ছবি রয়েছে। বার্গম্যানের ক্যামেরা নারী চরিত্রের ওপর যে মায়া ও আবেগ আরোপ করে সিডো অভিনীত পুরুষ চরিত্র তা থেকে বঞ্চিত, তাঁর অধিকাংশ ছবিতে তন সিডোর মুখে বিদগ্ধ যন্ত্রণা অনবদ্য ফুটেছে। উলম্যানের বিপরীতে তাঁর অভিনয় দেখলে এই দুটো জিনিসই বোঝা যায়। দীর্ঘ নির্মেদ স্বপ্নে, ব্যক্তিত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বরের অধিকার, ও চলচ্চিত্রের পর্দায় অসাধারণ শক্তিময়ান প্রভাবশালী উপস্থিতি তাঁর অভিনয়কে ধ্রুপদী পর্যায়ে নিয়ে গেছে। ধ্রুপদী বলিষ্ঠ, এবং তারই সঙ্গে পরিমিত ও টানটান অভিনয়, দীর্ঘ ও সাহিত্যগুণমণ্ডিত সংলাপ যেভাবে তিনি উচ্চারণ করেন তা দর্শনীয়। তাঁর অস্বাভাবিক ছবির মধ্যে মিশ জুলি, হাওয়াই, দি এমিগ্রেন্টস, দি একজরসিস্ট II, মার্চ অর ডাই, দি হারিকেন, ডেথওয়াচ, ড্রীমস্কেপ, এস্কেপ টু ভিক্ট্রি, দি গ্রেটস্ট স্টোরি এভার টোল্ড (যাঁচ চরিত্রে) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আমেরিকান ব্রিটিশ ইতালিয় ফরাসি বিভিন্ন প্রযোজনায় তিনি সমান সাফল্যের সাথে কাজ করেছেন। চিত্রাভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে তিনি মঞ্চও নিয়মিত অভিনয় করে থাকেন।

॥ আন্দ্রে ভাইদা ( ওয়াইদা ) ॥

( জন্ম ১৯২৬, পোল্যান্ড )। তাঁর বাবা ছিলেন পোলিশ দৈত্যবাহিনীর ক্যাভালারি অফিসার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যিনি নিহত হন। ভাইদা ১৬ বছর বয়সে নাৎসি-অধিকৃত পোল্যান্ডে প্রতিরোধ বাহিনীর সদস্য হিসেবে কাজ করেন। যুদ্ধের শেষে ভাইদা ক্রাকো অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে পেইন্টিংয়ের পাঠ নিয়ে পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে পোলিশ ফিল্ম স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ করেন ও ১৯৫৪ সালে আলেকজান্ডার ফোর্ডের তত্ত্বাবধানে তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ ছবি এ স্জেনারেশন নির্মিত হয়। এ ছবির বিষয় নাৎসি স্বৈরাচার ও তাদের প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে যুব সম্প্রদায়ের প্রতিরোধ। এ ছবিতে তৎকালীন অপরিণতি কিছুটা লক্ষিত, টেকনিকাল নৈপুণ্যও অপেক্ষাকৃত কম, কিন্তু বহু জায়গায় ফিল্ম মাধ্যমের ঐশ্বর্যগুলি সম্পর্কে ভাইদার সচেতনতা যথেষ্ট প্রকাশিত। পরের ছবি কানাল (৫৬)-য়ে ওয়রশ অভ্যুত্থানের শেষ কয়েকদিনে একটি প্রতিরোধ বাহিনীর তীব্র দেশপ্রেমের বীভৎস পরিণতি ভাইদা অল্পাল্পভাবে চিত্রায়িত করেছেন। একটার পর একটা ইমেজ সৃষ্টি করে তিনি দর্শকদের টেনে আনেন নর্দমার মরণফাঁদের এক নিদারুণ দমবদ্ধ করা আতঙ্কজনক পরিবেশে। এ যেন একটা অসম্ভব দুঃস্বপ্ন, নরকদৃশ্য।

এক ট্রাজিক সমাপ্তির স্বরে কানালের প্রতিটি সিকোয়েন্স সমৃদ্ধ, বেহরো কর্কশ  
 আশংক্য সংগীতে ও তির্যক ভাষ্যে এর মুড স্পষ্ট। এর পরের ছবি আশেজ অ্যাণ্ড  
 ডায়মণ্ড ( ৫৮ )। এর প্রধান চরিত্রদ্বয় মাচেক ও স্জুক্কার মধ্যে মূর্ত হয়েছে ৫৬র  
 অক্টোবর পরবর্তী মোহভঙ্গের কিছুটা। এই ছবিটি জটিল, বিশ্বয়কর কলাকৌশল-  
 নির্ভর এবং প্রতীক, তুলনামূলক উল্লেখ ও রূপক নির্ভরও, যার লক্ষ্য হলো কতক-  
 গুলি আবেগ, টেনশন ও ধারণার সঙ্গে ভাইদার ব্যক্তিগত সম্পর্কে সর্বজনীন ও  
 গৃহদাকার করে প্রকাশ করা এবং সেই কারণে বহুলাংশে বোধজনিত, প্রত্যক্ষ  
 রাজনৈতিক তর্কে জয়লাভ এই ছবির লক্ষ্য নয়। এই তিনটি ছবি মিলিয়ে ভাইদার  
 মুদ্র বিষয়ক ট্রিলজিতে এই কথাটিই স্পষ্ট যে হিংসার গর্ভ থেকে কেবল হিংসাই  
 জন্ম নেয়, হিংসা নিজের গতিতেই এগিয়ে যায় যতক্ষণ না বাতককেই সে হত্যা  
 করে। মাচেক 'এ জেনারেশন'-য়ে সিবুলস্কি অভিনীত যুবকটির ক্রমপরিণতিও হতে  
 পারে। ভাইদার সমস্ত ছবিতেই একটা সংযোগকারী সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়।  
 যেমন মাচেক এক জায়গায় বলে যে দীর্ঘকাল নর্দমার ভেতরে কাটানোর দরুন  
 তাকে সর্বদা কালো চশমা ব্যবহার করতে হয়। কিংবা একটি মেয়েকে নিয়ে মাচেক  
 যখন রাস্তায় হাঁটছে হঠাৎ আবির্ভাব হয় একটা শাদা ঘোড়ার— এই ঘোড়াটিই  
 তাঁর পরবর্তী ছবি লোটনার প্রধান চরিত্র।

তাঁর ছবিতে বারবার এসেছে হারানো সময় বা বিগত যুগের শ্রদঙ্গ, পূর্বোক্ত  
 ছবিগুলি ছাড়াও এই শ্রদঙ্গ এসেছে স্মাসনে বা লাভ আট টোয়েন্টি-তে। বস্তুতঃ  
 এই অবসেশন ও রোমান্সিজম ভাইদার ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারের চেয়েও অনেক বড়ো  
 ব্যাপার। জনগণের আবেগ ও সমকালের বিরোধকে সোচ্চার করার কাজে এদের  
 প্রতি তাঁর ঋণ অপরিমীম। অবশ্য অল্প বিষয় নিয়েও তিনি ছবি করেছেন। দি  
 ইনোসেন্ট সর্গারার্স এক তীক্ষ্ণ ট্রাজি-কমেডি যার কেন্দ্রে আছে নৈরাশ্রবাদের  
 মুখোশ আটা ষাট দশকের স্বপ্নজীবী মানুষ যারা তাদের মহৎ ও সত্য অহুত্ব-  
 গুলিকে চতুরভাবে লুকিয়ে রাখে। নতুন বিষয়ের তাগিদে তিনি ইতিহাসেরও  
 শরণ নিয়েছেন, আবিষ্কৃত করেছেন কিছু আবেগ ও সমস্যা, যাদের তাৎপর্য এখনো  
 নষ্ট হয়নি, দি সাইবেরিয়ান লেডি ম্যাকবেথ ( ইয়োগোপ্লাভিয়ায় নির্মিত ) কিংবা  
 গেটন্ টু প্যারাডাইস ( ব্রিটিশ প্রযোজকের জন্ম তৈরি ) তার প্রমাণ। এই অন্বেষার  
 সার্থকতম প্রকাশ জারোম্বস্কির উপন্যাস-ভিত্তিক অ্যাশেজ ছবিটি। ১৯৬৫তে নির্মিত  
 এই ছবির কাহিনী-কাল নেপোলিয়নের আমল। এই ছবিতে ভাইদা উপলব্ধি  
 করেছেন যে তাঁর ট্রিলজির সমস্যার সঙ্গে তৎকালীন করুণ ঘটনাপ্রবাহে ভেসে

যাওয়া মাহুঘের সমস্তার কোনো তফাৎ নেই। যেমন তাঁর পরের দিক্কার ৮৭  
 রাফ ট্রিটমেন্টও তৎকালীন বিষয়ে সমকালীনতা আরোপের চেষ্টা। এই সমস্ত ছািনা  
 প্রতিটিতেই যা লক্ষণীয় তা হলো পৃথিবী সম্বন্ধে তাঁর অননুক্রমীয় দৃষ্টিভঙ্গি,  
 অগ্নিশিখার রেখায় আঁকা স্টাইল যাকে সমালোচকরা ভাইদা-বারোক আখ্যা  
 দিয়েছেন। বারোক দৃশ্যসজ্জার প্রতি তাঁর টান ও চেতনীয় মেজাজের পরিচয়  
 পাওয়া যায় দি মেইডন অব উইলকো ছবিতেও। প্রকাশের এই ভঙ্গিতে ভাইদার  
 শিল্পের প্রতি এক বিশেষ শর্ত আছে, সে শর্ত হলো যে আর্ট শুধুমাত্র সামাজিক  
 দায়িত্ব পালনের মধ্যেই সীমিত না থেকে মাহুঘের অন্তর্দৃষ্টি, নন্দনতত্ত্ব ও মনো-  
 জগতের রহস্যাবৃত সত্যেরও মুখোমুখি হবে। তাঁর প্রিয় অভিনেতা সিবুলস্কির  
 মৃত্যুর দু বছর পরে ৬৮তে তোলা এভরিথিং ফর দেল এর অনবদ্য উদাহরণ। এই  
 ছবিতে প্রদর্শিত হয় পরিচালক, ফিল্ম ইউনিট, অগ্নান্ত ব্যক্তি প্রত্যেকে তাঁদের  
 ভালোবাসার ধন একজন অভিনেতার অনুপস্থিতিতে তাঁর জন্ম ব্যর্থ প্রতীক্ষা করে  
 চলেছে। এ ছবির প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিচ্ছবি আর বাস্তব জীবন মিলেমিশে এক  
 হয়ে গেছে, এ ছবি আর্ট সম্পর্কে পরিচালকের ধারণার ওপর একটি নিবন্ধও। দি  
 কন্ডাক্টর ছবিতেও (জন গিলগুড অভিনীত), পরিচালকের জীবন ও শিল্প সম্পর্কিত  
 ধারণা খুব সংবেদনশীল ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন দি আয়রন ম্যান (৮০),  
 দি মার্বল ম্যান ইত্যাদি রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর ধারণার প্রকাশ। প্রথমটিতে  
 ভাইদা যদি ব্যক্তিজীবনের দুঃখময় স্মৃতিকে রূপান্তরিত করেছেন মহাকাব্যে তো  
 পরের দুটিতে তিনি সমষ্টিজীবনের দৃষ্টি ও বিশ্বাসকে গেঁথেছেন গতিময়ভায়ে ও  
 প্রগাঢ় আত্মবিশ্বাসে। বহুমুখী ভাইদার আগ্রহ ও অবেশা। তবে ল্যাগ অব  
 প্রমিড, দি শ্রাডো লাইন প্রভৃতি ছবিতে তাঁর সাম্প্রতিক দ্বিধা দ্বন্দ্বের পরিচয়  
 আছে।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : B. Michalek-এর দি সিনেমা অব আন্ড্রে ভাইদা ॥

॥ চলচ্চিত্রে ভাবনাস্থলীতি ॥

সিনেমাটিক ইন্সপেকশনস-এর বাংলা প্রতিশব্দ এই। বিচ্যুতি অতিরঞ্জন বিকৃতি,  
 চলচ্চিত্রে এসব থাকবেই, কেননা শিল্পের কাজই হলো বাস্তবের কিছু ওপরে উঠে  
 গিয়ে বা নিচে নেমে এসে বাস্তবকে দেখানো। এই স্বাভাবিক শিল্পশুলভ বিকৃতির  
 পাশাপাশি চলচ্চিত্রে সময় ও স্থান নিয়ে যা ইচ্ছে করার স্বযোগ, চলচ্চিত্রের  
 নিজস্ব ফিজিক্যাল প্রপ্যারটিস এবং চলচ্চিত্রে কাহিনী ও ইমেজের প্রভাবময়তা

চলচ্চিত্রের অতিরঞ্জনকে আরো একটু গাঢ় করেছে। তারই সঙ্গে যখন নির্মাতার শিল্প ভাবনাস্বীতি যুক্ত হয়ে পড়ে তখন সম্মিলিত ফল কী দাঁড়ায় ও শৈল্পিক গভীরতা ছাড়িয়ে তা কোনো সামাজিক ক্ষতির কারণ হয়ে ওঠে কিনা তা বিচার করে দেখা দরকার। স্বশান সোনটাগ আধুনিক সিনেমার গড় লক্ষণ নির্দেশ করতে গিয়ে হত্যা ও হিংসা, যৌনতা ও যৌনবিকৃতি, নেশা ও দায়িত্বহীনতা এবং সন্দেহ ও আতঙ্কের উল্লেখ করেছিলেন, এই আলোচনায় আমি এর সঙ্গে আর কিছু নতুন অঙ্গুলি যোগ করব।

হত্যা ও হিংসা :

অক্রম পদ্ধতিতে বেছে নেওয়া, ১৯৪৫-এর আগে তোলা ৮৫টি চলচ্চিত্র এবং ১৯৫০-এর পরে তোলা সমসংখ্যক চলচ্চিত্রের তুলনামূলক বিশ্লেষণে জর্জ গারবনার দেখেছিলেন, প্রথম পর্যায়ের ছবিগুলির প্রদর্শনী সময়ের গড় শতকরা ৬৩ ভাগ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের ছবিগুলির প্রদর্শনী সময়ের গড় শতকরা ১১.৮ ভাগ হিংসা ও রক্তপাতের দৃশ্যকল্পে ব্যবহৃত। ১৯৬৫র পরে তোলা কয়েকটি বিশেষ ধরনের ছবিতে এমন কী হিংসা ও রক্তপাতের দৃশ্যাবলী শতকরা ২৯.৬ ভাগ সময় ধরে প্রদর্শিত হয়েছে। এই একটি উদাহরণেই বোঝা যাবে গত তিরিশ বছরে সিনেমাতিক ভায়োলেন্স কী মাত্রায় বেড়েছে। ১৯৭৫-এ উটকামণ্ডে চার সপ্তাহে দেখা আটটি ছবিতে মোট সতেরোটি হত্যাকাণ্ড দেখেছিলাম। এর পাঁচটি আমেরিকা, একটি ইংলণ্ড ও দুটি ইউরোপের ছবি। ১৯৭০-৭৫-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি এক লক্ষ লোকে এগার জন, ইংলণ্ডে প্রতি এক লক্ষে একজন, অবশিষ্ট ইউরোপে প্রতি এক লক্ষে প্রায় তিনজন খুন হয়েছিল, অফিস অব হেলথ ইকনমিকসের এই পরিসংখ্যানের পাশাপাশি সতেরোটি হত্যাকাণ্ডের ওই চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই মাত্রাতিরিক্ত অতিরঞ্জন মনে হবে। এবং সত্যিই তাই। বাস্তবের তুলনায় যে চলচ্চিত্রে নারী পুরুষ ও শিশু অনেক বেশি অনুপাতে আঘাত হিংসা ও হত্যার শিকার হয় এই প্রবণতা সাম্প্রতিক টিভি ও চলচ্চিত্রে সেই সমস্ত প্রোটোটাইপ নায়কের জন্ম দিয়েছে যারা তরুণ নির্বাক পুরুষালি, ধনী হিংস্র কামুক, 'রেডি টু গ্যাট এট দি ফাষ্ট ইন্সট্যান্স'—( জর্জ গারবনার ) এবং প্রোটোটাইপ নায়িকার যারা স্ত্রী প্র্যামারপ্রিয় অর্ধশিক্ষিত, অনৈতিক নিঃসঙ্গ ফ্যাশনদর্পণ, রেডি টু ট্রিপ এট দি ফাষ্ট জেশচার। রাতের পর রাত, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, ছবির পর ছবিতে এই অতিসরলীকৃত হিংসা, অকারণ রক্তপাত ও খুন, সমস্ত দেখানোর — সব ডিটেল, মুদ্রার উভয় পিঠ, কী হচ্ছে ও কেন হচ্ছে—এই প্রবণতা, ঘটনা

প্রবাহের অতি দ্রুত গতি এমন এক ফাঁপানো জগৎ তৈরি করেছে যে দর্শনের উপর তার প্রতিক্রিয়া হয়ে উঠছে মারাত্মক। গত কুড়ি বছরে পাশ্চাত্যে ছায়া আঘাতে খুনের ঘটনা বেড়ে গেছে দ্বিগুণের বেশি। অপরাধ বিশেষজ্ঞদের ধারণা ছুরি নিয়ে মারামারি কদাচিৎ কোনো পেশাদার গুণ্ডার কাজ, যার অর্থ অ্যামেচার অপরাধীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। পর্যবেক্ষণ আরো বলেছেন, বিশেষ করে যারা বয়সে তরুণ তাদের মধ্যেই এই অপরাধ বৃদ্ধির হারটা অনেক বেশি। এগুলি ভেবে চিন্তে করা হত্যাকাণ্ড নয়, চলচ্চিত্রে যেমন তেমনই কোনো তাৎক্ষণিক কারণে হিংস্র প্রবৃত্তির বিস্ফোরণ। ওয়েস্টার্ন মূর্তির অধিকাংশ দর্শক যে বয়সে তরুণ এই স্বীকৃতিতে বিশেষজ্ঞদের ওই পর্যবেক্ষণ অতিরিক্ত তাৎপর্য পায়। টি. লিলিয়ার্ড তাঁর হারভার্ড রিপোর্টে লিখেছেন, ‘ছয় সাত বছর বয়স থেকে বালক বালিকারা কয়েক বছরের জন্য অনুকরণপ্রিয় হয়ে ওঠে। আদর্শ পুরুষ ও স্ত্রী চরিত্র হিশেবে চোখের সামনে কারুকে খাড়া করতে চায়। বর্তমান সমাজের ক্রমক্ষীয়মান পারিবারিক আকর্ষণ ও সাংসারিক মূল্যবোধ বাবা ও মাকে আদর্শ নায়ক-নায়িকা রূপে গ্রহণে বাধা দেয়। তখন তাদের বহির্মুখী মন আদর্শ নায়ক হিশেবে কোনো টিভি হিরো ও আদর্শ নায়িকা হিশেবে হয়ত কোনো ক্যাভারে নর্তকীকে বেছে নেয়। ওই মানসিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে ক্রমে মাদক দ্রব্যে আসক্তি, বেআইনের প্রতি আগ্রহ, যৌন স্বেচ্ছাচার তাদের ব্যক্তিত্বহীনতা, আত্মহনন ও মানসিক ভারসাম্য লোপের কারণ হয়ে ওঠে এবং কৈশোরে পদার্পণ করে তাদের একটি বড়ো অংশ যৌন অপরাধ, সম্পত্তির ক্ষতি, আঘাত ও রক্তপাত ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়। এইসব তারা করে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন ভাবে। এমনকী খুন করার পরে খুন কেন করেছে তা অনেক সময় তারা নিজেরাও বলতে পারে না। এদের প্রাথমিক পদাঙ্কন ও পরবর্তী অপরাধ প্রবণতায় চলচ্চিত্র কাজ করে যথেষ্ট।’ শুধু শিশু ও তরুণদের উপর নয়, বয়স্ক শিক্ষিত ও শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের ক্ষেত্রেও দিনেমাটিক ভায়োলেন্স তার নঞর্থক প্রভাব বিস্তার করেছে, নিচের তালিকা তার প্রমাণ। পুরুষদের কি বিশ্বাস করা যায়, এই প্রশ্নের উত্তরে ‘না’ বলেছেন,

দিনে গড়ে ২ ঘণ্টা টিভি-সিনেমা দেখেন যে সব পুরুষ—৮.৫%

দিনে গড়ে ৪ ঘণ্টা টিভি-সিনেমা দেখেন যে সব পুরুষ—১৭.৭%

দিনে গড়ে ২ ঘণ্টা টিভি-সিনেমা দেখেন যে সব মহিলা—১৯.১%

দিনে গড়ে ৪ ঘণ্টা টিভি-সিনেমা দেখেন যে সব মহিলা—২৪.৪%

হিংসাকে কাঁপিয়ে চলচ্চিত্র এইভাবে সমাজের একটি বিকৃত রূপ তুলে ধরে। আবার এক দ্বিগুণী অসততার বিপদের সম্ভাবনা বড়ো করে দেখিয়ে সং নাগরিকদের মোশাল অরডার ব্যাহত করে ও হিংসাকে গ্যামারাইজ করে হিংসা ও বিপদের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে।

যৌনতা :

হিংসার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাম্প্রতিক চলচ্চিত্রে যৌনতাও বেড়েছে প্রায় সমান মাত্রায়। এমনিতেই যৌনতা ও হিংসা পরস্পর-সম্পৃক্ত। ব্রু ফিল্মের গণ্ডীর বাইরে সাধারণ চলচ্চিত্রেও যৌনতা আজ স্বামী-স্ত্রী বা প্রেমিক-প্রেমিকার যৌনতা ছাড়িয়ে বাবা ও মেয়ে, মা ও ছেলে, ভাই ও বোন এবং মানুষ ও পশুর যৌনতায় অনুসীর্ণ। শুধু ধর্ষণ আত্মমেথুন সমকাম নয়, একাধিক পুরুষের একসঙ্গে কোনো নারীকে ভোগ, গণধর্ষণ, ভয়ানকজমও।

বি. ম্যালিনস্কির মতে, অস্বাভাবিকের প্রতি মানুষের একটা সহজাত কোঁতুহল আছে। সামাজিক ও নৈতিক বিচারে নিন্দনীয় এবং নজিরবিহীন, এই দুই কারণে মানুষ অস্বাভাবিক কিছু থেকে বিরত থাকে। কিন্তু বাস্তবে সেই অস্বাভাবিক কিছুর দৃষ্টান্ত তার সামনে উপস্থিত হলে তার আগ্রহ বেড়ে যায় ও ক্রমে তাকে অস্বাভাবিক না ভেবে সে বিরল বলে ভাবতে থাকে। এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তাকে একদিন ওই অস্বাভাবিকে আসক্ত করে তুলতেও পারে। চলচ্চিত্রে যৌনতার পূর্বোদ্ধৃত ওই সব অস্বাভাবিকতা তাই সিনেমার দ্বিমাত্রিক ক্ষেত্র ছাড়িয়ে বাস্তব জীবনেও তার ফুল বিস্তার করছে, স্বাভাবিক। পর্ণ ফিল্মের বিকৃতি (ড্র. ব্রু ফিল্ম) আমাদের আলোচনার বিষয় নয়, কিন্তু পর্ণ ফিল্মের দৃশ্যে নিজের সন্তানের সঙ্গে যে তার বাবা মা যৌনদৃশ্যে অংশ নিচ্ছে বা এইসব ছবিতে কাজ করার জন্ত যে যথেষ্ট বালক বালিকা পাওয়া যাচ্ছে, তার কারণ কী নিশ্চয়ই ভেবে দেখতে হবে। যে শহর বা দেশে টিভি ও সিনেমায় যৌনতা ও নগ্নতার মাত্রা যতো বেশি সেখানে পর্ণ ফিল্মের প্রকোপও যে তত বেশি সে কথা আজ অনস্বীকার্য। এই অবস্থায় চলচ্চিত্র তার দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না। সামাজিক ও আর্থিক নৈতিকতার সঙ্গে পরিবেশের কী ঘনিষ্ঠ সংযোগ, সকলেই জানে। এবং এই পরিবেশ সৃষ্টিতে টিভি ও সিনেমার চেয়ে প্রভাবশালী উপাদান সাম্প্রতিক কালে আর কী আছে ?

এই প্রভাব যেমন বিকৃতি ও অনৈতিকতা এনে দিচ্ছে তেমনি সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করছে। মেয়েদের কি বিশ্বাস করা যায়, এই প্রশ্নের উত্তরে 'না' বলছেন—

টিভি-সিনেমা প্রায় দেখেন না এমন পুরুষরা— ১২%

দিনে গড়ে ২ ঘণ্টা টিভি-সিনেমা দেখেন যে সব পুরুষ— ৫৪%

দিনে গড়ে ৪ ঘণ্টা টিভি-সিনেমা দেখেন যে সব পুরুষ— ৯৬%

যৌনতার কারণে আমরা প্রত্যেকে দিনে খুব বেশি হলে দু ঘণ্টা সময় ব্যয় করি। ফলে একজোড়া নরনারীর আটচল্লিশ ঘণ্টা সময়ের দু ঘণ্টা যৌনতায় ব্যয়িত হয়। শতকরা হিসেবে তা প্রায় চার ভাগ। পূর্বে উল্লিখিত উটকামণ্ডের আটটি ছবি নয় শো পাঁচ মিনিটে চুখন আলিঙ্গন শৃঙ্গার ও সংগমের দৃশ্য ছিল সাতানব্বই মিনিট, শতকরা হিসেবে যা দশ দশমিক সাত ভাগ। শিশুদের উপর এই প্রভাব হয়ে উঠেছে আরও দূরপ্রসারী ও মারাত্মক। কেননা এক থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুরা তাদের চারপাশে যা দেখছে তা নিবিচারে আত্মসাৎ করে। তারপর ছয় সাত বছর থেকে শুরু হয় ইচ্ছা-অনিচ্ছা বিচার করে অহুকরণের পালা। ‘শিশুদের উপর ওয়েষ্টার্ন ছবির প্রভাবের কথা বলতে গেলে বলতে হয় আমাদের বাড়ির বাচ্চার কথা, তাকে যখন তার কাকার যুত্বাসংবাদ দেওয়া হলো, সে জানতে চাইল, ছ শট হিম?—মিনুন, টাইমস।’

‘এগার থেকে পনের বছর বয়সের তিরিশটি বালক, এদের কোনো পারিবারিক বন্ধন বা যথেষ্ট শিক্ষা ছিল না, একটি খেলনা তৈরির কারখানায় সামান্য পারিশ্রমিকে দিনে আট ঘণ্টা করে কাজ করত। আয়কর বিভাগ তের জনকে এমন কী ট্যান্ড কার্ডও পাঠাত। থাকে ও খাওয়া ছাড়া এরা অর্থ ব্যয় করত নেশা ও সিনেমায়। বিশেষ করে এদের ভালো লাগত ছবিতে রক্ত, বীর্যপাত ও পুথুলা রমণীর সঙ্গে যৌনদৃশ্য।—Welt der Arbeit.’

রাজনীতি বিষয়ক :

হিংসা ও যৌনতার সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক যে আজ অতি ঘনিষ্ঠ, রাজনৈতিক ক্লাকমেল, বিট্টেয়াল, স্পাইং ও চলচ্চিত্রে তাদের রূপারূপ যে পরস্পর বিনিময়-যোগ্য এবং আন্তনিওনি, গদার, গাল্ডাসরা যে অত্যাচারীর হিংস্রতা ও অত্যাচারিতের হিংসা এই দুইকে সম্পূর্ণ পৃথক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেন সেগুলোর উল্লেখ মাত্র করে মূল তথ্যটিতে আসা যাক, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার নামে সরকার কী ভাবে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কেড়ে নেয় ও প্রয়োজনে অমানুষিক অত্যাচার চালায়, অল্প দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে, স্বদেশ ও মিত্রদেশে বিরোধী নেতাদের এমনকী কখনো হত্যাও করে, অমিত্রদেশে নির্বাচিত সরকারের পতনে বা সামরিক বাহিনীর বিদ্রোহে উস্কানি দেয়, ভিন্নদেশে নিজেদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও

দাণ্ডিতিক প্রভাব বিস্তারের জন্ত যে কোনো উপায়ের আশ্রয় নিতে প্রস্তুত থাকে, কিছু সং সাহসী ও আন্তরিক চলচ্চিত্র পরিচালকের ছবিতে আমরা তার নিখুঁত বিবরণ পেয়েছি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা ও অত্যাচারের যে সমস্ত নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে ইদি আমিন উগাওয় তার বহুল প্রচলন করেছিল। টর্চার চেম্বারের পরিকল্পনা, ইলেকট্রনিক গ্যাঞ্জেটের ব্যবহার ও বিরোধী নেতাদের হত্যা করার পদ্ধতি অনুশীলনে আমিনের নিজস্ব সামরিক বাহিনী নিয়মিত বিদেশী ছবি দেখে থাকত (রিপোর্ট, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল)। এই সমস্ত ছবির তালিকায় আন্তনিওনি, গদার ও গাভ্রাসের ছবিও আছে। ইংরেজিতে একেই বোধহয় বলে আয়রনি। আমেরিকার ছবিতে যখন বিকৃত্তির পৃষ্ঠপোষক, অসৎ ও অসাদু এবং অত্যাচার ও হিংসার যন্ত্র হিসেবে নিগ্রোদের দেখানো হয়, ব্রিটিশ যুদ্ধচিত্রে যখন জার্মানদের দেখানো হয় স্থূলবুদ্ধি ভাঁড় ও পলায়নপর করে, ক্যাথলিকদের ছবিতে যখন প্রটেস্ট্যান্টদের তথাকথিত অনৈতিকতা নিয়ে ব্যঙ্গ করা হয় বা মিশর ও জাপানের সেন্সর কর্তৃপক্ষকে যে কোনো কোনো বিদেশী ছবির সেন্সরে যৌনদৃশ্যের চেয়ে সেইসব ছবির মুসলমান ও বৌদ্ধ চরিত্রের উপস্থাপনা নিয়ে বেশি কাটছাঁট করতে হয় তার কারণও নিহিত আছে রাজনৈতিক গভীরে। যে ছবিতে হত্যাকাণ্ডকে বীরত্ব রূপে দেখানো হয়েছে, সেই জয় ও উদ্দীপনার ছবি দেখিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিকদের কৃত্রিমভাবে উৎসাহিত করাও হয়।

নেসেসারী ঐভল্‌স :

ছবিতে কুইক মোশনে গাড়ি চালানো দেখে অতিদ্রুত গাড়ি চালাতে গিয়ে মারা পড়লো, ডামিকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে পথে লাফিয়ে পড়ে পা ভাঙলো, ডাকাতির ছবি দেখে ছিনতাই করতে গিয়ে ধরা পড়লো, মদ টাকা মেয়েমানুষ— ছবির মানুষ যা চাচ্ছে তাই পাচ্ছে, জীবন সম্পর্কে এই স্ফীত ভাবনা নিয়ে বাস্তব জীবনে হতাশ হলো। মনস্তাত্ত্বিকরা এদের চলচ্চিত্রের রসিকতা বললেও সমাজ-বিজ্ঞানীদের চোখে এগুলো ঐভল্‌স। মনস্তাত্ত্বিকরা অপরাধ প্রবণতার ভিত্তিতে তিন রকম মানুষের কথা বলেন, যারা প্রায় নিষ্ক্রিয় অপরাধ প্রবণতার মানুষ, যারা সক্রিয় অপরাধ প্রবণতার মানুষ ও যারা পারিবেশিক কারণে অপরাধপ্রবণ হচ্ছেন। অপরাধ সংঘটনে পরিবেশ তৃতীয় শ্রেণীর মানুষের বেলায় সলতে ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বেলায় স্কুলিঙ্গের কাজ করে, বি. ম্যালিনস্কি এই উপমা দিয়েছেন। মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন, অজিত অপরাধ প্রবণতার পিছনে মুখ্যত কাজ করে দারিদ্র, পারিবারিক-দাম্পত্যিক অশান্তি ও মানবিক মূল্যবোধ তৈরির বিষয়ে বর্তমান সমাজের ব্যর্থতা।

আবার সাম্প্রতিক চলচ্চিত্রের গড় লক্ষণ নির্দেশ করতে গিয়ে বলা হয়েছে পাশ্চাত্য সম্পদ ও মানসিক দারিদ্র, পারিবারিক আকর্ষণহীনতা এবং মানসিক স্বেচ্ছাস্বাস্থ্যের ব্যাপারে বর্তমান চলচ্চিত্রের ভূমিকার কথা। এই দুই তালিকা ১৭ ওভারল্যাপ করছে তা যথেষ্ট ইঙ্গিতধর্মী। ‘Negative portraiture, morbidity, cynicism, violence, terror, and so often killing, cinema breeds fear’ (— জর্জ গারবনার )। এই ভয় ও আতঙ্ক, সন্দেহ ও সংশয় যে মানসিক অবদান ও আত্মিক হতাশার সৃষ্টি করে তা অপরিণত মনের উপর যেমন ছায়া ফেলে তেমনি গর্ভবতী রমণীদের উপরও তার প্রভাব হয় মারাত্মক। প্রখ্যাত ধাত্রীবিদ্যা বিশেষজ্ঞ ড. ইউ বার্ণ, কাঁঝাল মদ ও সিডিউল ড্রাগের মতো এইসব ইমেজারিও জগের শারীরিক গঠন ও মানসিক বৃদ্ধির পক্ষে একই রকম ক্ষতিকর, রায় দিয়েছেন। পুনঃ পুনঃ প্রদর্শনে সন্তানসন্তবা নারীর শারীরিক অস্বস্থতা ৭ গর্ভপাত ঘটাত বিচিত্র নয়। গর্ভবতী অবস্থায়, এই রকম ছবি বেশি দেখেছেন এমন মায়ের সন্তানরা তুলনায় স্বাস্থ্যহীন ও মনমরা হয়, ড. বার্ণ বলছেন। বড়ো ওষুধ বিক্রির ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা আছে বা বিজ্ঞাপনের জ্ঞাত যেমন কোড চলচ্চিত্রের বিষয়ে তেমনি কোনো বিস্তৃত নিয়মবিধির প্রয়োজন ক্রমেই আগে বেশি করে অনুভূত হচ্ছে। যে নিয়মবিধির প্রয়োগে শুধু সেন্সর কর্তৃপক্ষের অধিকার নয় দরকার মতো জনসাধারণেরও কিছু বক্তব্য থাকবে, থাকতে পারে। কেননা জর্জ গারবনারের এই মন্তব্যের সঙ্গে আমি মোটেই একমত নই যে, ‘by mobilising motivated fear Cinema / TV replaces Church as the toughest means of social control’. এমনকী শিক্ষামূলক ছবির ক্ষেত্রেও এখন এত ঈভলুশনের প্রকোপ দেখা যাচ্ছে। ভূবিদ্যা বিষয়ক ঠাণ্ডি রীলে পৃথিবীর যে অংশ-গুলিতে যেতাদ্রা বাস করেন সেগুলিকে প্রকৃত অনুপাতের তুলনায় অনেক বড়ো করে দেখানো হচ্ছে। ফলে ১’১ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট স্ক্যান্ডিনেভিয়াকে ৩’৩ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট ভারতের সমান দেখাচ্ছে কিংবা ২’১ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটারের গ্রীনল্যান্ডকে ৯’৫ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটারের চীনের চেয়ে অনেক বড়ো দেখাচ্ছে। এই অসংগতিতে স্বাভাবিক ভাবেই ফোভের সৃষ্টি হয়। যে ফোভ নিচের দৃষ্টান্তে এসে পরিণত হয় আতঙ্কে।

পরমাণু বিজ্ঞানীরা মনে করেন পারমাণবিক বোমা সংক্রান্ত যে সমস্ত তথ্য ফর্মুলা ও প্রস্তুত প্রণালী প্রকাশিত বিভিন্ন পুস্তকে ছড়িয়ে আছে মাঝারি শিক্ষিত যে কোনো বুদ্ধিমান বিজ্ঞানের ছাত্রের পক্ষেও তা থেকে বোমা নির্মাণের জ্ঞানে

অনেকটা এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। এবং অত্যন্ত প্রতিভাবান কারও পক্ষে কয়েকটি চূড়ান্ত টেকনিক্যাল ডিটেল ছাড়া পরমাণু বোমা প্রস্তুতির সমস্ত কিছু আয়ত্তে আনা মোটেই অবাস্তব নয়। কয়েক বছর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টিভিতে ছদ্মবেশধারী এক যুবককে দেখানো হয়েছিল, বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের উপস্থিতিতে যে পরমাণু বোমা তৈরির সব কটি পর্যায় নির্ভুলভাবে উল্লেখ করে। এরকম কারুকে পর্যাপ্ত অর্থ ও যন্ত্রের জোগান দিলে বোমা তৈরি তার পক্ষে খুব সম্ভব। একাধিক টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের পরমাণু-বিজ্ঞান বিষয়ক সাম্প্রতিক শিক্ষাচিত্রে সেই চূড়ান্ত টেকনিক্যাল ডিটেলগুলিও তুলে ধরার যে প্রবণতা দেখা দিচ্ছে তাতে বেসরকারি কোনো সংস্থা বা ব্যক্তি পরমাণু বোমা তৈরি করে ফেলতে পারলে সমস্ত পৃথিবীর রাজনৈতিক অবস্থা কতটা অনিশ্চিত দাঁড়াবে তা ভেবে আতঙ্ক হয়। ঈভলুশনকে নেসেসারী ঈভলুশন বলে চালাবার প্রয়াস এই হলো আধুনিক চলচ্চিত্রের সমাজ-তাত্ত্বিক ট্রাজেডি।

### ধীমান দাশগুপ্ত

॥ ভারতবর্ষ ॥

১৮৯৬ সালের জুলাই মাসে বোম্বাইয়ের ওয়াটসন হোটেলে লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয়ের ছবি দিয়ে ভারতে চলচ্চিত্রের সূচনা হয়। সম্ভবত নতুন শতকের গোড়ার দিকে হীরালাল সেন কিছু স্বল্প দৈর্ঘ্যের চিত্র তুলেছিলেন। ১৯০৪ সনে তিনি নাকি 'আলিবাবা অ্যাণ্ড ফর্টি থীভ্‌স' নামে একটি কাহিনীচিত্র নির্মাণ করেন। এইসব ছবির কোনো অংশই শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। ১৯১৩য় দাদাসাহেব ফালকে (ড্র.) পরিচালিত 'রাজা হরিশ্চন্দ্র'কে তাই ভারতের প্রথম কাহিনী-চিত্রের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে ফালকে এরপর আরো বহু ছবি নির্মাণ করেন। রুস্তমজী দ্ব্যতিয়ালের 'বিভ্রমঙ্গল', চান্দুলাল শা'র 'গুণসুন্দরী', বীরেন গাঙ্গুলির 'ইংল্যাণ্ড রিটার্নড', হিমাংশু রায় ও ফ্রান্স অষ্টেনের পৃথিবী জুড়ে প্রদর্শিত 'লাইট অব এশিয়া' প্রভৃতি আদি পর্বের উল্লেখযোগ্য নির্বাক চিত্র। প্রথম ভারতীয় সবাক চিত্র আরদেবী ইরানী নির্মিত 'আলম আরা' (৩১), ছবিটিতে বারোটা গান ছিল। প্রথম দিককার সবাক চিত্রের মধ্যে কর্ম, অমর জ্যোতি, অচ্যুত কণা, সন্ত তুকারাম, বাল্যোগিনী, আদমি, বিষবৃক্ষ, নৌকাডুবি, পুরাণ তন্ত্র, রূপলেখা প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৮-এর মধ্যে প্রায় প্রতিটি ভারতীয় ভাষায় প্রথম সবাক চিত্র মুক্তি পেয়ে যায়। ইংরেজিতেও

( 'কর্ম', ইরানীর 'হুরজাহান' ) । ইরানী বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় এবং বার্মিংহাম প্যারিসিয়ানেও চিত্র প্রযোজনা করেন । দেশের প্রথম রঙিন চিত্র নির্মাণের প্রয়াস ( 'কিষণ কন্যা' ) তাঁর । প্রারম্ভিক অস্ফাচ্চ চিত্রনির্মাতার মধ্যে জে. এফ. ম্যাডাগ, বি. এন. সরকার, ভি. শান্তরাম, বিমল রায়, কে. এ. আকাস, প্রমথেশ বড়ুয়া প্রমুখ উল্লেখযোগ্য । বাংলায় এই সময়ে দেবকী বসু, নীতিন বসু, মধু বসু নিয়মিত ছবি করছেন । চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে পরের দশ বছরে বেশ কিছু বাংলা ছবিতে 'আত্মপালী' জাতীয় চিত্রে যে স্টুডিওর কৃত্রিমতা ও নৈশী বাস্তবতা পরিলক্ষিত হত তা বর্জনের একটা প্রয়াস দেখা গেল । 'উদয়ের পথে' ( ৪৪ ), 'ভুলি নাই' ( ৪৮ ), 'ছিন্নমূল' ( ৫১ ), '৪২' ( ৫১ )-র নাম এ প্রসঙ্গে করা যায় । উদ্বাস্ত সমস্যা নিয়ে নিমাই ঘোষের 'ছিন্নমূল' সামাজিক ভাবে প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুর বাস্তববাদী চিত্রায়ণ । বড়ুয়ার 'মুক্তি', 'দেবদাস', 'অধিকার' বা 'রক্ত-ক্ষয়িতী'-র সামাজিকতা থেকে যা যথেষ্ট আলাদা । ক্রমে হিন্দীতেও অকৃত্রিম, বাস্তববাদী ও সামাজিক ভাবে দায়িত্বশীল ছবি করার প্রবণতা এল । বিমল রায়ের 'দো বিধা জমিন', শান্তরামের 'দো আঁখে বার হাথ', 'পড়োশী', 'ডা. কোর্টনীশ কী অমর কহানী', আকাসের 'হামারা ঘর', 'শেহের আউর স্বপ্না', 'মুন্না' এবং 'মির্জা গালীব', 'বুট পালিশ', 'জাগতে রহো', 'ধরতী কী লাল', 'নীচানগর', 'উচেলোগ', 'আন্দোলন', 'তিসরি কসম' । এর মধ্যে গান্ধীকে নিয়ে তৈরি হয়েছে তথ্যচিত্র 'নাইন আওয়ার্স টু রাম', ৫৫য় 'পথের পাঁচালী' মুক্তি পাবার পর ভারতীয় চলচ্চিত্র বিশ্ব চলচ্চিত্রের মানচিত্রেও স্থান পেয়েছে । সত্যজিৎ রায় ( ড. )-এর একটির পর একটি ছবি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভারতের জন্ম নিয়ে আসছে প্রশংসা ও পুরস্কার । বাংলায় তখন সৃষ্টিশীল ঋদ্ধিক ঘটক ( ড. )ও, তাঁর অসাধারণ সংরাগ, বলিষ্ঠ প্রত্যয় ও ঈষৎ বিশৃঙ্খলা নিয়ে । কাজ করছেন যুগাল সেন ( ড. ), যার প্রথম দিককার ছবিগুলি ( 'বাইশে শ্রাবণ' ছাড়া ) শৈল্পিকভাবে চূড়াও অভিধাতী না হলেও সাহসী ও বহুমুখী যে স্রষ্টা কালক্রমে হয়ে উঠলেন সত্যজিৎের পর ভারতের দ্বিতীয় পরিচালক আন্তর্জাতিক স্তরে যার বহুল স্বীকৃতি । চরম শিল্পোত্তীর্ণ না হলেও তপন সিংহ ও তরুণ মজুমদারের প্রথম ও মধ্য পর্বের ছবি পরিচ্ছন্নতায় ও সুস্থ প্রমোদমূল্যে উল্লেখযোগ্য । উৎপল দত্তের 'ঘুম ভাঙার গান' ও অনেক পরের 'বৈশাখী মেঘ' ও 'ঝড়', ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালের 'টেউয়ের পর টেউ', ব্রাজেন তরফদারের 'গঙ্গা' ও 'পালঙ্ক', বারীন সাহার 'তেরো নদীর পারে', তপন সিংহের 'ক্ষণিকের অতিথি', অসিত সেনের 'চলাচল', হরিসাধন দাশগুপ্তের 'একট'

অঙ্কে এত রূপ', পূর্ণেন্দু পত্রীর 'ষপ্ত নিয়' ও 'স্ত্রীর পত্র', বিমল ভৌমিকের 'দিবা-  
 ষাত্রির কাব্য', চিদানন্দ দাশগুপ্তের 'বিলেত ফেরত' এবং নবোন্দু চট্টোপাধ্যায়ের  
 ংকাদিক ছবি বিভিন্ন কারণে গুরুত্বপূর্ণ। 'বাক্সবদল', 'শুভা ও দেবতার গ্রান',  
 'দীপ জেলে যাই' প্রভৃতি ছবির কথাও এই প্রদক্ষে উল্লেখনীয়। এর বাইরে  
 ষবশ্চই ছিল বাংলা ছবির বিস্তৃত ব্যবসায়িক জগৎ যা অভিনেতা উত্তমকুমারের  
 ওপর অনেকটা নির্ভরশীল, বা উত্তম-সুচিত্রা জুটির জনপ্রিয়তা ভিত্তিক। শিল্প সম্মত  
 ছবিতে যেমন বড়ো ভূমিকা ছিল মাধবী মুখোপাধ্যায় (ড্র.) ও সৌমিত্র  
 চট্টোপাধ্যায়ের।

হিন্দী ও বাংলা ছাড়া অষ্টাশ্র ভারতীয় ভাষায় ও ভাষাভাষী অঞ্চলে পরীক্ষামূলক  
 ও শিল্পসম্মত ছবি তৈরির উদাহরণও কম নয়। দক্ষিণ ভারতের তেলুগু তামিল  
 কন্নড় ও মালয়লম ভাষায় নিমিত উন্নত পোল ওরুভন, এম্বাই পদম্ পদ, মলেশ্বরী,  
 মদল মুহূর্ত, সমস্কারা, চেম্বিন, চোমানা ছুদি, কোদিয়ত্তম, স্বয়মভরম, নির্মাল্যম,  
 ষটশ্রাদ্ধ, শংকরাভরণম, ওকা উরি কথা, মা ভূমি, নাহুম ওরু পোন, আননাই,  
 ওগানপু কালাভাল্লী, কাঞ্চন সীতা, এলিপাথায়ম, পিরভী প্রভৃতি; পূর্ব ভারতের  
 অসমিয়া, ওড়িয়া, মণিপুরী প্রভৃতি ভাষায় মণিরাম দেওয়ান, এরা বাট স্বর,  
 সঙ্কারাগ, পূবেক্কা, মাটির মনিষ, চিঙ্কা ভীরে, ইমাগী নিংথম, আবর্তন ইত্যাদি, উত্তর  
 পশ্চিম ভারতের ও পাঞ্জাবী, মারাঠী, সংস্কৃত ও অষ্টাশ্র ভাষায় শ্রামচি আই, এক  
 চান্দ্র ময়লীসী, নানক নাম জাহাজ্জ হ্যায়, হা মাঝা মার্গ একলা, সতকারী পাশ,  
 কংকু, কাডু, ভবানী ভবাই, আদি শঙ্করাচার্য প্রমুখের এ প্রসঙ্গে নাম করা যায়।  
 দব মিলিয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের ছবিতে তখন সামাজিক দায়িত্ব ও শিল্প-  
 স্বস্কার হোয়া লেগেছে। যদিও বিশিষ্ট শিল্পচারিত্রের জন্ত মূলত দক্ষিণ ভারতীয়,  
 বাংলা ও হিন্দী ছবিই বিবেচ্য। হিন্দীতে তুবন সোম, সারা আকাশ, উস্কি রোটী,  
 ২৭ ডাউন, মায়াদর্শণ, গরম হাওয়া, ভূমিকা, সতরঞ্জ কে খিলাড়ী, অরবিন্দ দেশাই  
 কী আজীব দস্তান, আক্রোশ, শোধ, মির্চ মশালা, খওহর, বাঘবাহাদুর ও আরও  
 অনেক ছবি নব্য ভাবনার ফসল। হিন্দী ছবির জগতে ওই সময়ে প্রধান পরিচালক  
 রূপের দাবীদার শ্রাম বেনেগাল (ড্র.)। আরও বেশ কিছু পরিচালকের সৃষ্টিতে  
 নিজস্ব রীতি ও জগৎ তৈরির লক্ষণ ও প্রবণতা স্পষ্ট। যেমন ঈষণ বিমূর্ত, ফর্ম-  
 প্রধান মণি কাউলের (ড্র.) পারসোন্সাল ফিল্ম, জে. অরবিন্দনের (ড্র.) প্রতীকী  
 চিত্রময়তা ও উইটি ডকুমেন্টেশন, আদুর গোপালকৃষ্ণণের (ড্র.) বলিষ্ঠ আঙ্গিক  
 ও গভীর মননশীলতায় সমৃদ্ধ চিত্রকর্ম এবং জে. ভি. আইয়ারের ভারতীয় দর্শনের

বিভিন্ন ধারার ধারাবাহিক চিত্ররূপ উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রতিক বছ শিল্পসমৃদ্ধ ছবিতে অভিনেত্রী শ্রিতা পাতিলের ( দ্র. ) ও শাবানা আজমীর ( দ্র. ) ৭৭৭ অভিনেতা ওম পুরীর ও নাসিরুদ্দিন শাহর ভূমিকাও উল্লেখ্য। দেশের বিশদ প্রান্তে কিছু মহিলা পরিচালকের আত্মপ্রকাশের কথাও উল্লেখ করার মতো। যেমন নীনা শিবদাসানী ( ছত্রভঙ্গ খ্যাত ), মীরা নায়ার, সাই পরাঞ্জপে, কল্পনা লাগুমা ও অপর্ণা সেন। পশ্চিমবঙ্গে সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকে বেশ কয়েকজন ৩৭৭ পরিচালকের একত্র আবির্ভাবও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, গৌতম ঘোষ, বিপ্লব রায়চৌধুরী, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী, সত্যজিৎ-পুত্র সন্দীপ রায় প্রমুখ। এর মধ্যে বুদ্ধদেব গৌতম বিপ্লব উৎপলেন্দুর ছবি স্বদেশে স্বর্ণকমল পেয়েছে। বিদেশে পুরস্কার পেয়েছেন বুদ্ধদেব, গৌতম, অপর্ণা ছাড়াও আর কেউ-কেউ। নব প্রজন্মের বাঙালি পরিচালকদের মধ্যে বুদ্ধদেব ও গৌতম-ই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। দুই প্রান্তের দুটি বিপরীত বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ / বিকর্ষণের ঘন্থে বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের ছবি টেনশনের ছবি। বুদ্ধদেব যদি কাব্যময় তো গৌতম ঘোষের ছবি অসাধারণ চিত্রময়তায় সমৃদ্ধ। দ্বঃসাহসী ও প্রয়োজনাগত ভাবে অপরিমিত শ্রমশীল গৌতম তরুণতর পরিচালকদের কাছে বস্তুত আদর্শ বলে বিবেচ্য হতে পারেন।

ভারতে ১৯৩১-য়ে সবাকচিত্রের সংখ্যা যেখানে ছিল ২৭, ৭৮-য়ে সেখানে তার সংখ্যা ৬১৯, আর ৯১-য়ে ৯১০। শুধু কাহিনীচিত্র নয় সংবাদচিত্র, বিজ্ঞাপনী চিত্র, ভ্রমণ চিত্র, শিক্ষামূলক চিত্র ও তথ্যচিত্র ( দ্র. )-য়েও ভারতের প্রয়োজনা, পরিমাণগত ও অনেকটা শিল্পগত ভাবেও উল্লেখযোগ্য ( দ্র. সুখদেব )। ফিলা ডিভিশন ( স্থাপিত ১৯৪৮ ), পুণের ফিল্ম অ্যাণ্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউট ( স্থা. ৬১ ), শ্রাশাশাল ফিল্ম আর্কাইভ অব ইণ্ডিয়া ( স্থা. ৬৪ ), ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইয়েটিজ অব ইণ্ডিয়া ( স্থা. ৫১ ), ফিল্ম ফিফ্যান্স কর্পোরেশন ( স্থা. ৬০ ), বোর্ড অব সেন্সরস, শ্রাশনাল ফিল্ম ডেভালাপমেন্ট কর্পোরেশন প্রভৃতি সংস্থা ও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ( ৫২ থেকে ) আর চলচ্চিত্রে জাতীয় পুরস্কার ( ৫৩ থেকে ) ভারতের চলচ্চিত্রের বিভিন্ন দিকের সমৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত।

॥ জঁ ভিগো ॥

( ১৯০৫-৩৪, ফ্রান্স )। মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে ভিগো মারা যান। সাকুল্যে তাঁর ছবি চারটি, দুটি তথ্যচিত্র, দুটি কাহিনীচিত্র, সব মিলিয়ে তাদের প্রদর্শনকাল তিন ঘণ্টার মতো। তবু পরবর্তী চলচ্চিত্রের ওপর বিষয় ও আঙ্গিক উভয়তাই

তার প্রভাব যথেষ্ট এবং আজ তাঁকে ফ্রান্সের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালকদের মধ্যে স্থান দেওয়া হয়। তিরিশের দশকে ফরাসি চলচ্চিত্রের ইস্টেলেকচুয়াল ধারাটিকে অক্ষুণ্ণ রাখার দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি। তাঁর তথ্যচিত্র দুটি নীস নগরী ও বিখ্যাত মীতারু জঁ টারিসকে নিয়ে। প্রথম কাহিনীচিত্র জিরো ফর কন্ডাক্ট (৩৩), এর বিষয়বস্তু স্কুলের অত্যাচারী নিয়ম ও শাসনের বিরুদ্ধে একটি ছাত্রের বিদ্রোহ। ছবিটি পরে অ্যানডারসনকে অনুপ্রাণিত করে ইফ তুলতে। ছবিটি ইদ্রিতধর্মী (স্কুল অধরিটি এখানে বৃহত্তর শাসকের প্রতিভূ, উল্লেখ্য, ভিগোর পিতা ছিলেন বিখ্যাত সন্ত্রাসবাদী, কারাগারে বন্দী অবস্থায় তিনি নিহত হন)। তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ, শক্তিশালী বাস্তবতা ও ইদ্রিতধর্মিতার জন্ম ছবিটি দীর্ঘদিন নিষিদ্ধ হয়েছিল। দ্বিতীয় কাহিনীচিত্র L' Atalante, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ও সমস্যা নিয়ে, এখানেও চমৎকার সংশ্লেষণ ঘটেছে, এবার বাস্তবতার সঙ্গে কবিদের। ভিগোর সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যও এই সংশ্লেষণে, শক্তির সঙ্গে সরলতার। নিজের ছবি সম্পর্কে তিনি বলেছেন, গুগুলির বৈশিষ্ট্য হলো পরিচালক সেখানে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করেছেন। সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি বলেছেন তথ্যসমৃদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি। যার লক্ষ্য থাকবে, 'অঙ্গভঙ্গির আড়ালে যে-তাৎপর্য থাকে তাকে উন্মোচিত করা, সাধারণ একটি চরিত্রের ভিতর থেকে তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য বা সেই সৌন্দর্যের হান্তাস্পদ দিকটি বার করা; একটি সম্প্রদায়ের নিছক শারীরিক অস্তিত্বের মধ্যে তার আত্মাকে উদঘাটন করা এবং এ কাজটি এমন প্রচণ্ড ক্ষমতা প্রয়োগে ঘটানো হয় যাতে যে-পৃথিবীকে নিতান্ত সাধারণ বলে মনে হয়েছিল, তাকে তার নিজস্ব বাধা অতিক্রম করে তার আপাতরূপের আড়ালে প্রচ্ছন্ন সত্যায় স্বপ্রকাশ দেখা যায়।'

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : পি. ই. এস. গোমেস-এর জঁ ভিগো ॥

॥ লুসিনো ভিসকন্তি ॥

(১৯০৬-১৬, ইতালি)। ভিসকন্তি Modrone-র ডিউক, অভিজাত Lombard পরিবারের বংশধর, উত্তরাধিকার হৃত্রে যিনি পেয়েছিলেন মিলান নগরীর বেশ একটি বড়ো অংশের মালিকানা। কিন্তু যেহেতু তাঁর শিল্পসৃষ্টিতে ছিল বঞ্চিত-শোষিতদের প্রতি সমবেদনা, তাই তাঁকে ভালোবেসে ডাকা হতো লাল ডিউক নামে। তিনি ছিলেন দক্ষ সংগীতজ্ঞ, ঘোড়া ও ঘোড়দৌড়ের নাম করা বিশেষজ্ঞ, নাটকের শিল্পনির্দেশক। ১৯৩৬য়ে রেনোয়ার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং লণ্ডন,

প্যারিস ও ইতালিতে রেনোয়ার সঙ্গে কাজ করতে করতে তিনি চলচ্চিত্রের পথে  
কৌশলে দক্ষ হয়ে ওঠেন।

স্বাধীনভাবে চিত্রপরিচালক হিসেবে তাঁর প্রথম কাহিনীচিত্র *Ossessione*  
( ৪২ ), মূলত লোকেশনে তোলা এই ছবি বাস্তবতাবোধে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি  
করে ( ড. নিও-রিয়ালিজম )। সিনেমা পত্রিকার সম্পাদকীয় সহকর্মীদের নিয়ে,  
তাঁর নিজের টাকায় তৈরি এই ছবি হয়ে উঠেছিল টাজিক-বলিষ্ঠ-বল্ল, নিখুঁত  
বাস্তব। ৪৫য়ে তিনি মঞ্চে ফিরে যান এবং ককতো, সাত্র' ও Anouilh-এর  
কয়েকটি আধুনিক নাটক প্রযোজনা করেন। ৪৭য়ে চলচ্চিত্রে ফিরে এসে তিনি  
সিসিলি অঞ্চলের জেলেদের নিয়ে *La Terra Trema* পরিচালনা করলেন।  
চমৎকার আলোকচিত্রিত এই চিত্র এক দীর্ঘ, জটিল ও সার্থক শিল্পসৃষ্টি। নিও-  
রিয়ালিজমের ধারায় পারিবারিক সংগঠন ও অর্থনৈতিক শোষণের প্রাদম্বিক  
রূপায়ণ। এরপর ফের মঞ্চ। দালির তৈরি সাররিয়ালিস্ট সেট ও কসটিউম ব্যবহার  
করে শেকসপিয়রের *অ্যাক্স ইউ লাইক ইট*। তারপর *Troilus and Cressida*  
৫১য় চলচ্চিত্রে আবার এসে সংলাপ, গতি ও প্যাশন নির্ভর *Bellissima*। ৫৪য়  
প্রথম রঙিন ছবি *Senso*, রঙ ও দৃশ্যের বৈচিত্র্যে, অনুভবের গভীরতা ও প্রদারে,  
গঠনের ও কলাকৌশলের সমৃদ্ধিতে চিহ্নিত। অদাধারণ দৌন্দর্যময় ছবিতে ধ্রুপদী  
সংগীত সাক্ষ্যের সাথে ব্যবহৃত। ভিসকন্ডি ইতিমধ্যে বিভিন্ন মাধ্যমকে অনবদ্য  
ভাবে সংমিশ্রিত করতে শিখেছেন, তাঁর সাংস্কৃতিক চেতনা হয়ে উঠেছে স্বভাবে  
আন্তর্জাতিক। দস্তয়েভ্‌স্কির কাহিনী অবলম্বনে হোয়াইট নাইটস বাস্তব ও  
ফ্যান্টাসির, নাটক ও সিনেমার মিলনের প্রয়াস। পরের ছবি রোকো অ্যাণ্ড হিজ  
ব্রাদার্স ( ৬০ ) নিখাদ বাস্তব নিয়ে, দেশের দূর দক্ষিণ অঞ্চলের দারিদ্র ও  
বেকারত্ব থেকে মা আর তার সন্তানদের শিল্পসমৃদ্ধ উত্তরাঞ্চলে- চলে আসার  
কাহিনী, যে উত্তরে সব কিছুই রক্ষণশীল আগ্রাসী। নাটকীয় ও কখনো কখনো  
হিংস্র হলেও ছবির চিত্রায়ণ বাস্তববাদী। 'একের তেতর তিন' বোঙ্কাচ্চিয়ো  
৭০য়ে ভিসকন্ডির অংশটি বিদ্রোহমূলক কমেডি; অপূর্ব সেটিং, আড়ম্বরপূর্ণ স্মৃতি ও  
প্রাচুর্যের আবহাওয়ায় চিহ্নিত। ভিসকন্ডির পরের ছবি *দি লেওপার্ড* ( ৬৩ )  
সিসিলিতে সমাজ-বিদ্ভাসের পরিবর্তন হতে এক অভিজাত বংশের কীভাবে  
বিনাশ ঘটল তার রাজকীয় রূপায়ণ, ব্যাপ্তিতে, কস্পোজিশনে, ল্যাণ্ডস্কেপে, সেট  
ও কসটিউমে, পরিবেশ তৈরিতে—সব দিক থেকেই রাজকীয়। ছবির শেষ ৪৫  
মিনিট এক অতুলনীয় *tour de force*—যেন এক মহাজাগতিক নাগরদোলা।

এই বর্ণিত বৈচিত্র্যের পর অ্যান্টিরাইম্যাক্স হিশেবে এল অভিনাটকীয় সাদা কালো ছবি অব এ থাউজ্যান্ড ডিলাইটস ও কাম্বুর উপস্থাসের সাদামাঠা চিত্ররূপ দি ষ্ট্রেঞ্জার। তারপর তাঁর প্রিয় বিষয়, ঐতিহাসিক পটভূমিতে পারিবারিক বিভাজনের ধ্রুপদী চিত্রায়ণ, নিয়ে দি ড্যামড্ (৬৯)। ছবিটি হিংস্র সমস্ত আঘাতে পরিপূর্ণ যার মধ্যে সন্তান কর্তৃক মাকে ধর্ষণ অন্ততম। এই ছবিতে ব্রিটিশ অভিনেতা Bogarde-কে প্রায়ই পেছন থেকে দেখানো হয়েছে বলে ভিসকন্টি দুঃখিত হয়ে-ছিলেন ও পরের ছবি ডেথ ইন ভেনিস (ড্র.)-য়ে তাঁকে প্রায় কখনোই ক্যামেরার ফোকাস থেকে না সরিয়ে যেন তার প্রায়শ্চিত্ত করেন। ছবির পিরিয়ড ডিটেল ও দৃশ্যসৌন্দর্য অনন্যসাধারণ। এতদিনে ভিসকন্টি শারীরিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, নিকোটিন বিষের বিরুদ্ধে চিকিৎসার জন্য তাঁকে এবার স্থানেটোরিয়ামে ভর্তি হতে হয়। সেখান থেকে কিছুদিন পর তিনি ছাড়াও পান। কিন্তু কর্মশৃঙ্খলা ও গঠন নৈপুণ্য আগের মতো আর ফিরে পান না। তাঁর শেষ ছবিগুলি গঠনে দানা বাঁধেনি, চরিত্রেও তারা জলো বা অভিনাটকীয়, যদিও পিরিয়ড দেশ ও দৃশ্য সৌন্দর্য ঝিলিক মেরে যায় তা থেকে।

তাহলে ওই দাঁড়িয়ে আছেন ভিসকন্টি তাঁর স্বয়ংশাসিত আভিজাত্য নিয়ে, অন্য় সমাজের শিকার যে বক্তিতরা তাদের জন্ত সমবেদনাময়, আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির আবেগী বাহক, কলাকৌশলে চূড়ান্ত দক্ষ, আর দৃশ্যসৌন্দর্য, কালচেতনা ও শৈলী-বৈচিত্র্যে প্রাণময়।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : জি. নোয়েল-স্বিথের নুসিনো ভিসকন্টি ৯

ল্যাংডন ডিউই

॥ ভূমিকা ॥

১৯৭৭, ভারত। ভূমিকার অবলম্বন ব্যক্তিমানস বা individual psyche নয়, social psyche বা ব্যষ্টিমানস। যদিও এক বা একাধিক মনের গভীরে এই ছবিকে ডুব দিতে হয়েছে। যে মারাঠী অভিনেত্রীর আত্মজীবনী এই ছবির ভিত্তি, শ্যাম বেনেগল ছবির ঋমকে তার অধিকারের বাইরে নিয়ে গেছেন এবং উর্ধশীর সংগ্রামকে তিনি দেখেছেন প্রথাগত পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর ভূমিকার পশ্চাৎপটে। উর্ধশীর সংগ্রামকে Women's lib বললে তাকে অনেক ছোট করে দেখা হয়। যুদ্ধোত্তর কালে সমস্ত পৃথিবীতে অন্তঃপুরের বেড়া তেঙে পড়লো এবং মেয়েরা আর্থিক ও সামাজিক স্বাধীনতা লাভ করলো। 'ভূমিকা' ছবির বিভিন্ন

অব্যাহত এই পটপরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়; বি বি সি-র সংবাদে লেলিমাগাশ শহরের অবরোধ মুক্তি এবং পরে অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে স্তালিনের মৃত্যু এবং ভারতের পঞ্চবার্ষিক সূচনার কথা ঘোষণা করা হয়। উর্বশীর আত্মমোচনকে এই প্রেক্ষাপটে দেখতে হবে।

উর্বশীর জীবনে যে সমস্ত মানুষ এসেছে তাতে সকলেই তাকে কিছু 'ভূমিকা' নির্দিষ্ট করে দিতে চেয়েছে—তার মা, তার স্বামী ( দুজনেই উর্বশীকে গৃহদেবতার সামনে শপথ নিতে বলেছে), স্বামী, ব্যবসায়ী / জমিদার ( অমরীশ পুত্রী অভিনীত ), এমন কি তার মেয়ে কুম্ম পর্যন্ত। উর্বশীর ট্রাজেডী এই যে, পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে সে কখনোই তার ভূমিকা কী হবে তা বুঝতে পারেনি। ছবিয় শেষ দৃশ্যে যখন রাজন তার সঙ্গে ফোনে কথা বলতে চায়—রাজনই একমাত্র পুরুষ যে উর্বশীকে স্ত্রীরূপে পেতে চেয়েছিল—তখন উর্বশী নির্বাক হয়ে থাকে। তার একদিকে প্রথাসিন্ধ পরিবারের টান ( কুম্মের সন্তান সম্ভাবনার খবরে সে বলেছে নারীর সবচেয়ে বড়ো ঐশ্বর্য তার চরিত্র ) অন্যদিকে তার নিজের দুঃস্বপ্ন আবেগ।

এম. এস. সথু যেমন 'গরম হাওয়া' ছবিতে একটি প্রায় নিষিদ্ধ অথচ অত্যন্ত delicate বিষয়কে সাহসের সঙ্গে চিত্রায়িত করেছেন, 'ভূমিকা' ছবিতেও তেমনি এমন একজন নারীকে উপস্থিত করা হয়েছে যে পুরুষ-শাসিত সমাজের নিয়ম-কানূনের বিরুদ্ধে, অতি নাটকীয় ভঙ্গিতে হলেও যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। গৃহদেবতার সামনে সেই নারীর শপথ—মায় যী চাছকী ওহি করুঙ্গী। যে-সব পুরুষের সংস্পর্শে সে এসেছে তাদের কারোর বিবাহিত স্ত্রী হবার কিছুমাত্র চেষ্টা করেনি। স্ত্রীর 'ভূমিকা' উর্বশীর কাছে শুধু অসম্ভব নয়, অবাঞ্ছিতও বটে। চিরকালের ঘোমটা-পরা, বিনীত, কোমল-স্বভাব 'ভারতীয়' নারীর ভাবমূর্তি বেনেগলের হাতে ভেঙে না পড়লেও প্রচণ্ড জোরে একটা আঘাত পেয়েছে।

অভিনয়ে স্মিতা পাতিল ( উর্বশী ), অমল পালেকর ; চিত্রগ্রহণ গোবিন্দ নিহালনী ।

॥ ঝিগা ভের্তভ ॥

এটি ডেনিস এ কফম্যানের ছদ্মনাম। সোভিয়েত রাশিয়ার এই চিত্র-তাত্ত্বিক ও চিত্রনির্মাতার জন্ম ১৮৯৬য়ে, মৃত্যু ১৯৫৪। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রাশিয়ার গৃহযুদ্ধে যথাক্রমে সৈনিক ও সংবাদচিত্রগ্রাহক হিসেবে অংশ নেন। সোভিয়েত বিপ্লবের

শাখেল্যের পর মাত্র বাইশ বছর বয়সে তাঁকে সারা রাশিয়া কেন্দ্রীয় পরিচালনা কমিটির চলচ্চিত্র বিভাগের প্রধান রূপে নির্বাচিত করা হয়। এই বিশের দশকেই তিনি মায়াকভস্কির কাব্য ও নন্দন-চিত্রায় অনুপ্রাণিত হয়ে নাট্যধর্মী চলচ্চিত্রকে নিশ্চিত করে ও ক্যামেরাকে একটা ফিল্ম আই ( চোখ ) হিসেবে কল্পনা করে নিয়ে সিনেমা বিষয়ে তাঁর নিজস্ব ধারণাকে তাত্ত্বিক রূপ দেন। এই ধারণায় ফিল্ম আই স্থানে 'ও কালে অবাধ বিচরণ, অনুভব ও বর্ণনা ক্ষমতার অধিকারী। সে নিরাসক্ত, নৈর্যক্তিক, যৌথদায়িত্ববদ্ধ ও বিকৃত না করে সিনেমায় নির্জলা সত্যের পরিবেশক। তাঁর এই তত্ত্ব যা কিনো-আই ( ড্র. ) নামে অভিহিত তাঁর ভাষায় হলো, a microscope and telescope of time, an X-ray eye, the candid eye,...not the Kino-eye for its own sake, but the truth by the means of the Kino-eye. Cinematic truth. The Kino-eye as a means of making the invisible visible, the obscure clear, the hidden obvious, the disguised exposed, and acting not acting. সংবাদচিত্র ও তথ্যচিত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই তত্ত্ব তাঁর নেতৃত্বে গঠিত কিনো-আই গোষ্ঠীর সদস্যদের তৈরি তেইশটি সংবাদচিত্রে ( কিনো প্রভদা ১, ২, ... ) রূপায়িত। এর মধ্যে তাঁর নিজের তোলা ছবিও রয়েছে যার মধ্যে লেনিনের মৃত্যুর পর তোলা দুটি ছোট ছবি উল্লেখযোগ্য। এই ছবিগুলির প্রত্যক্ষতা, আকর্ষণিকতা ও তাৎক্ষণিকতা নিয়ে বিতর্কও হয়েছে যথেষ্ট। তাঁর দি সিগ্নথ্, পার্ট অব দি ওয়ার্ল্ড ও ম্যান উইথ এ মুভি ক্যামেরা প্রদর্শনপ্রিয়তার জন্ম আইজেনস্টাইন কর্তৃক নিশ্চিত হয়েছিল। আইজেনস্টাইন-ভের্তভ নান্দনিক বিতর্কের জের পরবর্তীকাল পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। যেমন ওই বিতর্কে গদার ভের্তভের পক্ষে। তাঁর সব্যচিত্র থি, মণ্ড্, অব লেনিন ( ৩৪ )-য়ে কলার্কৌশলের সমৃদ্ধি মানবীয় উত্তাপ ও আবেগ যুক্ত হয়ে চিরন্তন রূপ পেয়েছে। তাঁর ধারণা, বিশেষত, হ্যাণ্ড-হেল্ড ক্যামেরার ব্যবহার সহ তাঁর কলার্কৌশল, সাধারণভাবে তথ্যচিত্রকে ও বিশেষভাবে চিত্রশৈলীকে প্রভাবিত করেছে এবং তাঁর ছবি জনপ্রিয়তাও পেয়েছে। বিতর্ক সত্ত্বেও চলচ্চিত্রে ভের্তভের ভূমিকা আজ স্বীকৃত।

॥ মণি কাউল ॥

( জন্ম ১৯৪২ )। ভারতীয় চলচ্চিত্রে মণি কাউলের ব্যক্তিগত চিত্ৰায়ণ প্রথম থেকেই ঈশৎ দুরূহ। সত্তর দশকের সূচনায় সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়কে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে

মৃগাল সেন 'উনকি রোট'র গুরুত্ব মেনে নিয়েও আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন মৃগাল রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ না ফ্যানসিজমের প্রতি অনুরাগত হয়ে পড়ে। ভারতীয় নবজাগরণ বিষয়ে ছোট তাঁর রচনায় প্রয়াত সত্যজিৎ রায় প্রকাশ্যেই বিদ্রোহ করেছিলেন যে মৃগাল কাউল, কুমার সাহনি প্রমুখ তাঁদের দীক্ষাদাতার কাছ থেকে রসবোধের অভাব ছাড়া আর কিছুই শেখেননি। আর এই দীক্ষাগুরু ঋষিক আশা প্রকাশ করেছিলেন আড়ষ্টতা ও কিছু প্রদর্শনবাদ কাটিয়ে বুদ্ধিমান মৃগি কাউল ক্রমেই নিজস্ব অতিব্যক্তি খুঁজে পাবেন। অথচ মৃগি কাউলের প্রায় তিন দশক ছুঁই ছুঁই চলচ্চিত্রজীবন প্রমাণ করে যে, তাঁর যাত্রাপথ মোটেই রৈখিক সমীকরণ নয়, তাঁর অতিবেক পর্ব ঋষিকতন্ত্রেই কিন্তু দার্শনিক ও নির্জন, কবি ও বুদ্ধিজীবী, আত্মপ্রচারকামী গুরু শিল্পের প্রবক্তা এই শিল্পী নিজের যে মানচিত্র নির্মাণ করেন তা জনতা-মুখর নয় এবং সেখানে দৃশ্য ও শব্দ পৃথিবী সংরক্ষিত ছাড়াই নিজেদের মেলে ধরে। ভারতীয় স্তরে মৌলিকতার এই প্রকৌশল মৃগি কাউলের নিজস্ব যদিও তার প্রয়োগপ্রায়তা প্রশ্নের অতীত নয়।

কাউল জন্মেছেন চিত্রময় জয়পুরে। রাজকাহিনী নানা লোককথা জড়িয়ে রেখেছে তাঁর শৈশব। বারো বছর বয়সে দেখতে গেলেন 'ট্রয়ের রাণী হেলেন।' স্থানীয় প্রেক্ষাগৃহে দেখা এই ছবিই পালটে দিল তাঁর জীবন। দৃষ্টিকৌশল সবেও মৃগি প্রেমে পড়ে গেলেন সিনেমার। কলেজ জীবনে একটি বই মৃগির নিত্য পাঠ্য হয়ে উঠবে। রুডলফ আর্নহাইমের ফিল্ম অ্যান্ড আর্ট। এও এক আশ্চর্য সমাপ্তন যে শান্তিনিকেতন গ্রন্থাগারে ওই একটি বই-ই ছাত্র সত্যজিৎ‌রও মনোহরণ করেছিল। চলচ্চিত্রের ছাত্র হিসেবে আমরা সকৌতূহলে লক্ষ্য করি উক্ত গ্রন্থের অন্তিম পরিচ্ছেদের শিরোনাম — the dialogue paralyses visual action — পথের পাঁচালী ও উনকি রোটের জনস্বিত্যকে মেরুপ্রমাণ পার্থক্য থেকে প্রেরণা জোগায়।

অবশেষে তিন বছরের ছাত্রজীবন শেষ করে ১৯৬৬ সালে পুণের শিক্ষায়তন থেকে ডিপ্লোমা পেলেন মৃগি কাউল। গদার, ব্রেস্ট, তারকোভস্কি...পুণেতে প্রবাসকালীন এই যে বিখ্যাত দর্শন, আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র ক্রমউন্মোচনশীল রহস্য মৃগিকে আয়ুল পুনর্গঠিত করে। কিন্তু তাঁর পক্ষে দ্বাবতীয় আলোকপ্রাপ্তি ও প্রথম প্রভাতসংগীত হলো ঋষিকের সান্নিধ্য। আমাদের চলচ্চিত্রের এই উপমারহিত প্রতিভা তখন দৈবাৎ স্বল্পকালের জন্য পুণের ইনস্টিটিউটে শিক্ষাদানকর্মে নিযুক্ত ছিলেন। অনেকটা আইজেনস্টাইনের ধরনেই তিনি আবিষ্কারের আনন্দ বপন

করে দিতে পেরেছিলেন তাঁর ছাত্রদের মধ্যে। মণি কাউল এই উন্মাদনার ফসল।  
মণি বারেকবারেই 'গুরু' সমীপে তাঁর ঋণ ব্যক্ত করেছেন।

হয়ত তাঁর দীক্ষান্ত ছবি 'যাত্রিক' (১৯৬৬)-এ ঋদ্ধিকৃত রুঁদেভুর কিছু প্রভাবও ছিল। কিন্তু অচিরেই মণি মাতৃভাষা খুঁজে পান এবং তৈরি হয় উসকি ধোটি (১৯৭০)—তাঁর প্রথম কাহিনীচিত্র। শাদা-কালো এই ছবিতে বঙ্গত পত্রীক্ষার বিষয় ছিল না কোন সামাজিক সমস্যা, চরিত্রায়ণ মণিকে ভাবিত করেনি, কথকতা কৌশল হিশেবে প্রযুক্ত হয়েছে শুধু। স্রষ্টা ষতটা চিন্তিত ছিলেন মুদ্রিত সময়ের চিত্রলেখ নিয়ে ততটা সম্ভবত আমাদের দর্শকের রুচিতে প্রত্যাশিত ছিল না। মণি জানতে চেয়েছিলেন সময় কি স্থিরচিত্র? হয়তো তাঁর উদ্দিষ্ট ছিল সময়ের দেশীভবনের বদলে দেশের সাময়িকীকরণ—এ প্রশ্নের জবাব না দিলেও আমরা মেনে নেব আমাদের সিনেমায় ধারণাগতভাবে সময় কখনোই এত দ্ব্যর্থহীন ভাষ্যকর্ম হয়ে ওঠেনি। মণি কাউলের কাছে সিনেমা মেধাবৃত্তির সম্প্রসারণ নয় বরং আমাদের জ্ঞাত অভিজ্ঞতার বাইরে অল্প ধরনের ইন্দ্রিয় শিহরণ।

তাঁর দ্বিতীয় ছবি 'আষাঢ় কা এক দিন' (১৯৭১)—মেঘদূতের এক নবরূপায়ণ। একটি নাট্যবয়ানকে আশ্রয় করে আবার মণি কাব্য, কাহিনী, নিবন্ধ ও সর্বোপরি তাদের সাধারণ সূত্র কালকে মন্তাজের বদলে কোলাজের স্তরে বিবেচনা করলেন। তৃতীয় ছবি দুর্ভিধা (১৯৭৩) কাউলের প্রথম রঙিন ছবি। ১৬ মিমিতে তুলে ৩৫ মিমিতে পরিবর্তিত করা হয়েছে।

এক ধরনের অবিশেষিত অপেক্ষা মণির ছবির কেন্দ্রীয় স্তর। বিশেষত দুর্ভিধায় তিনি রাজপুত মিনিয়েচার এবং সেইসূত্রে চিত্রকলা ও চলচ্ছবির অন্তর্গত সম্পর্কেও আলোকপাত করতে চেয়েছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় চলচ্চিত্রবেত্তারাও মণির সাফল্য বিষয়ে সন্দিহান। স্বয়ং সত্যজিৎ রায় এই আত্ম-প্রশ্নকে চলচ্চিত্রের গঠন শৃঙ্খলার সম্পূর্ণ পরিপন্থী বলে মনে করেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে মায়া ও বাস্তবের স্থানচ্যুতি ষটিয়ে যাকে অধৈতবাদ বলে এমন কোন উপস্থাপনা হয়ত মণির উচ্চাশার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু তিনি নিজে ও তাঁর অমুগামী সমালোচকদের বিবৃতিদানের পরও যা থেকে যায় (আগের নির্মাণ ধরে) তা কতিপয় স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি ও ঘাসিরাম কোতোয়াল (১৯৭৬)-এর অংশবিশেষ এবং সাতাহু সে উখাতা আদমি (১৯৮০) প্রমুখ ছবি।

কাউল এছাড়া পশ্চিম জার্মান টেলিভিশনের জন্ম ছবি বানিয়েছেন। অভিনয় করেছেন বাহু চ্যাটার্জীর 'সারা আকাশ' জাতীয় ছবিতে। পৃথিবীতে এমন কোনো

কোনো শিল্পী থাকেন যাদের পরীক্ষাসমূহ জনপ্রিয়তা বা শিল্প সফলতার তুলনায় অনেক বেশি উল্লেখ্যক। মর্গি কাউল এরকম একজন।

অন্যান্য ছবি : দ' নোমাদ পাপেটিয়ারস ( ১৯৭৪—স্বল্প দৈর্ঘ্য ), বাসিরাম কোতোয়াল ( ১৯৭৬—আরও তিনজনের সঙ্গে ), চিত্রকথী ( ১৯৭৭—স্বল্প দৈর্ঘ্য ), আরাইভাল ( ১৯৮০—স্বল্প দৈর্ঘ্য ), ফ্রপদ ( ১৯৮৩ ), দি ডেজার্ট অব এ থাউজেন্ড লাইনস ( ১৯৮৪ ), মাটি মানস ( ১৯৮৫ ), বিফোর মাই আইজ ( ১৯৮৮ ), সিঙ্কেথরী ( ১৯৮৯ ), নজর ( ১৯৯০ ), আহাম্মক ( ১৯৯২ ) ॥

### সঙ্গম মুখোপাধ্যায়

॥ আইভর মনটাপ্ত ॥

( ১৯০৪-৮৪, গ্রেট ব্রিটেন )। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ., ছাত্রাবস্থা থেকেই দুটি বিষয়ের প্রতি তাঁর স্মৃতিচারণ টান দেখা যেতে থাকে, বাসমতী রাজনীতি এবং চলচ্চিত্র। ১৯২৫য়ে লণ্ডনে পৃথিবীর প্রথম ফিল্ম সোসাইটির তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। দি অবজারভার ও নিউ স্টেটসম্যান পত্রিকার চিত্রসমালোচক এবং তথ্যচিত্রের প্রযোজক, সম্পাদক ও পরিচালক রূপে তিনি সিনেমার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠতার সুযোগ পান। এর মধ্যে আইজেনস্টাইনের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা, হিচককে সিনেমার কাজে সহযোগিতা দান, স্কট অব দি আনটারকটিক ছবির চিত্রনাট্য রচনা, যুদ্ধ বিষয়ক সংবাদচিত্রের ও ব্রিটিশ টেলিভিশনের বিভিন্ন কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ ইত্যাদি অন্যতম। ১৯৫৯য়ে তাঁকে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে লেনিন শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়। তিনি ছিলেন World Peace Council-এর সভাপতি।

অনুবাদিত গ্রন্থ : আইজেনস্টাইনের ফিল্ম ফর্ম, পুদভকিনের ফিল্ম টেকনিক।

রচিত গ্রন্থ : ফিল্ম ওয়ার্ল্ড, উইথ আইজেনস্টাইন ইন হলিউড, দি ইয়ঙ্কস্ট মান্ন ( আত্মজীবনী ) ॥

॥ মনতাজ ॥

মনতাজ একটি ফরাসি শব্দ, এর অর্থ একত্রীকরণ। তাই বলে বিভিন্ন ক্ষেত্র, ইমেজ ও শটকে একত্র করা মানেই মনতাজ নয়, ওটা সম্পাদনারই একটা প্রাথমিক দায়িত্ব। সম্পাদনায় একাধিক ইমেজ, শট বা দৃশ্যাংশকে গ্রথিত করে যখন উপাদান-অতিরিক্ত অন্য কোনো ভাবনা সৃষ্টি করা গেল তখন তার নাম মনতাজ।

অর্থাৎ মনতাজের ক্ষেত্রে মাত্রার পরিবর্তনই যথেষ্ট নয়, ঘাতের পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। মনতাজ হলো 'a particular process in creative assemblage of shots from which the greatest, finest and furthest result comes out'. এই বিশিষ্ট প্রক্রিয়া রাশিয়ার চলচ্চিত্রকারদের সৃষ্টির মধ্য দিয়েই প্রথম শৈল্পিক তাৎপর্য পায়। কুলেশভ (ড্র.) মনতাজ নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন যা কুলেশভ এফেক্ট নামে পরিচিত। তাঁর একাধিক ছবির গঠন-রীতি ও সম্পাদনা মনতাজ প্রক্রিয়ার অনুসরণে নির্ধারিত হয়েছিল। যদি A ও B হয় দুটি পর পর ইমেজ, তাহলে তাদের মিলিত পরিবেশনার সন্নিধি বা জাকসট-পোজিশনের মধ্য থেকে সৃষ্টি হবে C ভাবের, যা তার অস্তিত্ব, অর্থ ও তাৎপর্যে A ও B অতিরিক্ত এক সত্তা, এবং এই মিলিত পরিবেশনা গাণিতিক বিচারে সংযোগ নয়, সংঘাত। কুলেশভের ছাত্র পুদভকিনের মত ছিল মনতাজ পদ্ধতি হলো  $A+B=C$ , আর মার্ক্সীয় দ্বান্বিকতার থেসিস ও অ্যান্টিথেসিস মিলিয়ে সিন্থেসিস অনুসরণে আইজেনস্টাইনের মত ছিল  $A \times B=C$ , এই সংঘাত ক্রিয়াশীল হলেই একমাত্র ঘাতের পরিবর্তন সম্ভব, অর্থাৎ ইমেজ থেকে ভাবনায় উপনীত হওয়া সম্ভব। শুধু দুটি ইমেজের মধ্যবর্তী সংঘর্ষই নয়, মনতাজ হলো সম্পূর্ণ চিত্রের বিভিন্ন অল্পভূতি, দৃশ্য ও খণ্ড খণ্ড গঠনরূপের সেই সামগ্রিক সৃজনশীল সংঘাত যার মধ্য দিয়ে ক্রমপরিণত ও অখণ্ড রূপকল্পনা প্রতীত হয়ে ওঠে। আইজেনস্টাইনের মনতাজ নিয়ে এই ব্যাপক গবেষণা চলচ্চিত্রের ভাষাকে চূড়ান্ত সমৃদ্ধি দিয়েছে।

সিনেমা মূলত: ভিসুয়াল মাধ্যম। আলো, গতি ও ছন্দের মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রে ভিসুয়াল ইমেজ তার রূপ পায়। এই দৃষ্টিগ্রাহ্য অল্পভূতিকে আবেগ ও মনস্তত্ত্বের সহায়তায় মানসিক অল্পভূতিতে পৌঁছে দিতে হয় (ধ্বনি ও সংগীত আবেগ ও মনস্তত্ত্বেরই মাত্রা ও ক্রমবিকাশকে উন্নত করে)। এই পৌঁছে দেবার কাজে কোন্ কোন্ ইমেজ ও দৃশ্য নির্বাচন করা হবে, তাদের কীভাবে সাজানো হবে, এবং কোন্টির পর্দায় স্থিতিকাল কত হবে—প্রতিটি প্রশ্নই গুরুত্বের। তিনটে বিষয়কেই প্রাসঙ্গিক করে অসংখ্য খণ্ড খণ্ড দৃশ্যের সম্পাদিত সম্মেলনের মধ্য থেকে উঠে আসা শব্দ কীভাবে ছান্দিক সৌন্দর্য ও চূড়ান্ত জ্যোতনা সৃষ্টি করে ব্যাটলশিপ পটেমকিন (ড্র.) তার অনবদ্য উদাহরণ। নির্বাচনে নিখুঁত কল্পনা ও সম্পাদনায় স্মৃষ্টি না থাকলে তাই মনতাজ প্রক্রিয়া থেকে কোনো মৌলিক প্রাপ্তি হবে না। দৃকবিজ্ঞান ও নন্দনতত্ত্বের নীতি অনুসারে আইজেনস্টাইন মনতাজের চারটি প্রকারভেদ করেন।

১. মেট্রিক মনতাজ : বিভিন্ন শট ও খণ্ডিত দৃশ্যাংশের সম্মেলন এখানে মূখ্যতঃ তাদের দৈর্ঘ্য ( অর্থাৎ স্থিতিকাল ) অনুসারে । দৈর্ঘ্যের বিভিন্ন মাপের সমবায় ৭৭ বিভাগ খুব সরল থেকে দারুণ জটিল পর্যন্ত যা ইচ্ছে হতে পারে । প্রতিটি এন-এ শটের আপাত স্থিতি একত্র সম্মেলনের মধ্য দিয়ে বাহ্যিক চিত্রগতি পায় । এটি পদ্ধতিতে শট A × শট B = tension of objective view (C) [ × tension of subjective view (D) — কখনো কখনো ] । এই ভাবেই দৃষ্টিগ্রাহ্য বা জ্যামিতিক দৃশ্য অনুভূতিগ্রাহ্য বা মনস্তাত্ত্বিক আবেদনের পর্যায়ে উঠতে পারে ।

২. রিদ্মীক মনতাজ : এই পদ্ধতিতে প্রতি শটের দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সঙ্গে সমান গুরুত্ব দেওয়া হলো শটের অন্তর্বর্তী বিষয়বস্তুর ছান্দিক দাবী ও স্পন্দনের উপর । বিভিন্ন শটের ছন্দ ( অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে গতিও ) বিভিন্ন হওয়ায় জটিল ছন্দরচনার ক্ষেত্রে মেট্রিক মনতাজের দৈর্ঘ্য-নির্বাচন রীতির চেয়ে বেশি জোর পড়ে ছন্দিত রূপ ও ছান্দিক রূপারোপের ওপর । এই পদ্ধতিতে দুই বা ততোধিক শটের মনতাজ = visual tension × ছান্দিক mental tension = mental pictorialism.

৩. টোনাল মনতাজ : শটের গঠন ভেত বিচারে শটের বিবিধ টোনের দৃশ্য বা সংঘাত । তা শাদা কালো বা আলো ছায়া বা বিভিন্ন বর্ণের optical tonality এবং রৈখিক ও তল বা পৃষ্ঠের geometric tonality যে কোনটি হতে পারে । একাধিক মাত্রার টোনালিটি ও রিদ্মীক মনতাজের ছন্দরূপের ( যার সঙ্গে থাকতেও পারে মেট্রিক মনতাজের সম্মিলিত চিত্রগতি ) সংঘাতে টোনাল মনতাজের সৃষ্টি । এই পদ্ধতিতে montage of object × montage of tone = montage of subject = mental pictorialism.

৪. ওভার-টোনাল মনতাজ : টোনাল মনতাজের একক দৃশ্যক্রমের সীমানা ছাড়িয়ে পূর্ণাঙ্গ চিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে টোনালিটির সংঘাতের প্রদার ওভার-টোনাল মনতাজের জন্ম দেয় । সম্পূর্ণ চিত্রের বক্তব্য ও দর্শনের কথাই এই প্রসঙ্গে চলে আসে । এই পদ্ধতিতে mental pictorialism = conflict of objective view with subjective view. aural, visual এই দুই উপধনকে একত্র করে টোনের ষাতের পরিবর্তনে ওভার-টোনাল মনতাজ । দৃশ্যকল্পের-প্রক্রিয়া-মনতাজে শাস্তিক ও ধ্বনি-অনুভব গ্রথিত হয়ে এই প্রক্রিয়াকে সমৃদ্ধতর করছে ।

চলচ্চিত্র এমনিতেই সংঘাতময় । অনুভূমিক অক্ষের সঙ্গে উল্লম্ব অক্ষের, পুরোভূমির সঙ্গে পশ্চাদ্ভূমির, আকার ও আয়তনের, মাত্রা ও ঘনত্বের, ক্যামেরা দূরত্ব ও ক্যামেরা কোণের । স্থিতি ও গতির, গতি ও ছন্দের, ছন্দ ও টোনের,

টোন ও ওভারটোনের। মনতাজ এই সংঘাতেরই চূড়ান্ত স্বজনশীল রূপ। হোলিউডের কাহিনীচিত্রে এক সময়ে দ্রুত পরম্পরায় কিছু ইমেজ দেখিয়ে কাহিনী-পূর্ব তথ্যাদি সংক্ষেপে সরবরাহ করা বা পরিবেশ ও ছবির মেজাজ নিয়ে আসা হতো, তা সম্পাদনার সরল কোলাজ, মোটেই মনতাজ নয়, কেননা মনতাজের 'greatest-creative-multiple impulse' ওতে নেই। কাজের সুবিধার জ্ঞান মনতাজের আর এক রকম শ্রেণী বিভাজন করে নেওয়া হয়েছে, তা হলো কাল সাপেক্ষ, স্থান সাপেক্ষ, পদ্ধতি সাপেক্ষ ও উপাদানের সম্পর্ক সাপেক্ষ মনতাজ ( ড. চলচ্চিত্রের শিল্পরূপ )। যে বিভাজন সিনেমার কালচেতনা, স্থানচেতনা, স্থান-কাল চেতনা ও সম্পূর্ণ ফিল্ম সেন্স-য়ের সাথেই সংশ্লিষ্ট। জাপানী ও চীনা লিপিচিত্র-মালার থেকে কাবুকি নাটোর প্রতীকী ব্যঞ্জনা পর্যন্ত, ধ্রুপদী সাহিত্য থেকে উচ্চাঙ্গ সংগীত পর্যন্ত, বিবিধ উৎস থেকে তথ্য ও উদাহরণ সংগ্রহ করে আইজেনস্টাইন মনতাজ তত্ত্বের যে রূপ দিয়েছিলেন কালে অসংখ্য ছবিতে অজস্র প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তা সমৃদ্ধতর হয়েছে। পূর্বোক্ত চারটি শ্রেণীর যে কোনটির চূড়ান্ত প্রসারণ বা একাধিকের জটিল সম্মেলনের মধ্য দিয়ে যখন মনতাজের সম্ভাবনা আরো বিস্তার পায়, বিযুক্ত কোনো ভাবনা দৃশ্যরূপে প্রকাশযোগ্য হয়ে ওঠে তখন তাকে বলা হয় ইন্টেলেক্চুয়াল মনতাজ, এটি অনুভবের স্তরের। সাহিত্যে এর প্রকাশ আমরা দেখেছি। অবক্ষয়ের মোটিফ ফুটিয়ে তুলতে মনতাজের রীতিতে ইমেজগুলো সাজাচ্ছেন কবি : বিবসনা বসুন্ধরা / সপ্তঋষির অন্ন ছুড়ায় ; / গন্ধে বাতাস শিউরে ওঠে / আলোর দেশে ঝড় বয়ে যায় । / অনেক দূরে অরুন্ধতীর / গুঁঠ জলে চোরের চুমায় / আর সমস্ত আকাশ জুড়ে / যুধিষ্ঠিরের কুকুর ঘুমায় ॥ (— বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় )। এই ইন্টেলেক্চুয়াল মনতাজ চলচ্চিত্রে যখন রূপ পায় তখন তা লা দোলচে ভিত্তি-র শেষ দৃশ্য হয়ে ওঠে। উপাদান নিয়ে গুরু করে মনতাজ একটি পদ্ধতি হয়ে উঠে চরম পর্যায়ে সমস্ত ছবিটিরই স্বচক রূপে কাজ করে : 'montage is the whole film.' একটি শটেই মনতাজের পরিপূর্ণতার কথাও মনতাজ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। ( ড. মিজ'সেন )

॥ মেরিলিন মনরো ॥

( ১৯২৬-৬২; আমেরিকান অভিনেত্রী )। তাঁর আসল নাম ছিল নর্মা জেন বেকার। নিদারুণ দারিদ্রে তাঁর শৈশব কেটেছিল। তিনি ছিলেন কুমারী মায়ের সন্তান। মায় ছিল মানসিক রোগ। অনেকটা অনাথা হিশেবেই মেরিলিন বড় হয়ে ওঠেন,

কৈশোরে একবার তাঁকে ধর্ষণের শিকারও হতে হয়েছিল। ফটোগ্রাফারের মণ্ডল রূপে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। একবার ক্যালিফোর্নিয়ার জায়গায় তাঁর ছবি তোলা হয়, তাঁকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় পঞ্চাশ ডলার, কোম্পানি সেই ক্যালিফোর্নিয়ার লক্ষ লক্ষ কপি বেচে লাভ করে সাড়ে সাত লাখ ডলার। তাঁর দারিদ্র, অসহায়তা, বঞ্চনার অবসান হতে থাকে টুয়েনটিয়েথ সেকুলারী ফিল্ম-এর সঙ্গে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হবার পর। তাঁকে যৌনতার নবদেবী রূপে তুলে ধরার প্রয়াস শুরু হয়। হাওয়ার্ড হক্‌সের ছবি *Gentlemen Prefer Blondes* ও তারপর *How to Marry a Millionaire* তাঁকে বিখ্যাত করে তোলে। ক্রমে ক্রমে তৈরি হয় *The Seven Year Itch*, *Bus Stop*, *Some Like it Hot* ইত্যাদি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তারকাপ্রথার নিরন্তর চাপ মনোরোগের প্রভাব ফেলতে থাকে, তিনি বিষয়ে করেন, ডিভোর্স করেন, ফের বিষয়ে করেন; গুটিংয়ের ফাঁকে ফাঁকে স্টুডিওর কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁর কলহ শুরু হয়; তাঁর মদের পরিমাণ ও ঘুমের ওষুধের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে; প্রতিদিন সাইক্রিয়াটিস্টের কাছে যেতে হয় তাঁকে। এই সময় তাঁর তৃতীয় স্বামী হবিখ্যাত নাট্যকার আর্থার মিলারের লেখা চিত্রনাট্যে *The Misfits* (61) ছবিতে অভিনয় করলেন তিনি— ছবিটি যেন তাঁর নিজেরই প্রতি ইঙ্গিত। এর কয়েক মাস পরেই এক বিষণ্ণ সন্ধ্যায় তাঁর নগ্ন প্রাণহীন শরীরটা পাওয়া গেল শোবার ঘরে তাঁর বিছানায়। আত্মহত্যা করেছিলেন তিনি। জীবদ্দশাতেই ও মাত্র পঁয়ত্রিশ বছরের জীবনকালের মধ্যেই মনরোগে একটা লেজেগু হয়ে উঠেছিলেন। সারা পৃথিবীকে তিনি দেখিয়েছিলেন একটা গরীব মেয়ে নিজের ক্ষমতায় কী অর্জন করতে পারে ও তারপর নিজের দোষে কীভাবে সব হারাতেও পারে।

প্রাশঙ্গিক গ্রন্থ : নর্মান মেইলার-এর মেরিলিন : এ বায়োগ্রাফি অব মেরিলিন মনরো ।

॥ মনস্তত্ত্ব ও চলচ্চিত্র ॥

[ ১. যখন মনস্তত্ত্ব চলচ্চিত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়; অর্থাৎ বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা-প্রসঙ্গ-অহুস্ক ও সমস্যা কাহিনীচিত্রে রূপায়িত হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে পড়ছে দি ক্যাবিনেট অব ড. কালিগারি, দি ডার্ক সিরিস, *The Cobweb*, দি থার্ড সিক্রেট, প্রেসার পয়েন্ট, ফ্রয়েডের জীবন নিয়ে হান্সটনের ছবি, সাইকো, *Cul-de-Sac*, মিস্ট্রিজ্ অব অরগানিজম ইত্যাদি।

৬. যখন স্বপ্ন, কল্পনা, ফ্যানটাসি, হ্যালুসিনেশন উপাদান হিসেবে কাহিনীচিত্রে প্রবেশ করে থাকে ( ড. ফ্যানটাসি )। বাস্তববাদী, আধা-বাস্তববাদী ও বিমূর্ত যে কোনো ছবিতেই এটা সম্ভব হতে পারে।

৩. যখন মনস্তত্ত্ব পরিচালককে অনুপ্রাণিত ও নিয়ন্ত্রিত করে কোনো এক নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ও নিজস্ব জগতের দিকে ( ড. ফেলিনি )। সেই জগতের বিভিন্ন দৃশ্য ও দৃশ্যকল্প মনস্তাত্ত্বিকভাবে সত্য ও সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক নাও হতে পারে কিন্তু তারা একমাত্র মনস্তত্ত্বের স্তরেই গ্রহণযোগ্য ও বিশ্লেষণযোগ্য।

কাহিনীচিত্রে মনস্তত্ত্বের এই বিবিধ প্রয়োগ ও অন্তর্ভুক্তি ছাড়াও, মনস্তত্ত্ব নিয়ে শিক্ষামূলক, বৈজ্ঞানিক ও তথ্যচিত্রও হয়েছে বহু। বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য মনস্তাত্ত্বিক কেস-হিস্ট্রি নিয়ে মেডিক্যাল ফিল্মের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। ছবির বিষয়বস্তু নির্বাচন, দৃশ্যকল্পনা, দৃশ্যরীতি, থীম, আবেগ/ যৌনতা/ নারী/ প্রকৃতি/ সমাজ ইত্যাদির প্রতি পরিচালকের অ্যাট্রিচুড প্রভৃতিও বিশেষভাবে মনস্তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। মনস্তত্ত্বের মতো পদ্ধতির ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিকতার ভূমিকা অনস্বীকার্য। দর্শক সাধারণও কোনো ছবিকে সাধারণত গ্রহণ করে থাকে মনস্তত্ত্বের স্তরে। ]

চলচ্চিত্রের শিল্পগত সক্রিয়তার ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক করণকৌশল এক প্রধান আলোচনার বিষয়। বিশেষ করে চলচ্চিত্র নির্মাণ ও সৃষ্টি করতে গিয়ে পরিচালকের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ এর বিশিষ্ট প্রসঙ্গ হতে পারে। সংগীত, চিত্রকলা, সাহিত্য ও নাটকের মতো অত্যাশ্চর্য শিল্পরূপের ঐতিহ্যবাহী সমস্তা এই নবীন শিল্পরূপটিরও আছে। নানা স্তরে বিচলিত এ একটি সৃষ্টিশীল কর্ম। পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণ, অবধারণ ও তার মূল্যান্বিত এই সৃষ্টিকর্মটির ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক বিবেচনার ব্যাপার। দৃশ্যের পরম্পরায় রচিত চলচ্চিত্রের শিল্পিত প্রতিমার আবির্ভাব, চিত্রনাট্যের কাহিনীর উপর নির্ভর করে অথবা স্বাধীনভাবে অতীত অভিজ্ঞতার রূপায়ণের প্রক্রিয়া, সৃষ্টিশীল কল্পনা এবং ভাবনার মিশ্রণ, রচনার মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠা পরিচালক ও অভিনেতার শিল্পী-ব্যক্তিত্বের সক্রিয়তা ও নবায়ন, অভিনয় ও পরিচালন ক্ষমতা এবং প্রতিভা এ সমস্তই মনস্তত্ত্বের আলোচ্য প্রসঙ্গ।

শিল্পগত অবধারণের মূলে যৌথ প্রণোদনা নিহিত, সাম্প্রতিক এই মনস্তাত্ত্বিক প্রত্যয়টিকে চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। শিশু ও বয়স্ক, নারী ও পুরুষ অভিনেতার শিল্পিত অবধারণ প্রক্রিয়ার পার্থক্য এর সমীক্ষার বিষয় হতে পারে। কোনো গল্প উপস্থাপনের গৃহীত সংগঠনকে চলচ্চিত্রের ভাষায় অনুবাদ করতে গিয়ে,

অথবা বিশ্ববীক্ষাকে মতাজবাহিত রূপ দিতে গিয়ে যেভাবে মনস্তাত্ত্বিক অবধারণ ঘটে, যে সব শর্তসাপেক্ষে ঐ রূপারোপ-প্রক্রিয়ায় বিচ্যুতি ঘটে, পরিচালন বা অভিনয় এ দুটি শিল্পশিক্ষার মনস্তাত্ত্বিক যেসব দিক উন্মোচিত হয় তাও মনস্তাত্ত্বিক নিরীক্ষার বিষয়। চলচ্চিত্র নামের যৌথ ও আন্তর্জাতিক শিল্পটির মুখোমুখি হওয়া দর্শক সাধারণের রুচি, সংবেদনশীলতা এবং নান্দনিক অনুভবের বিবেচনা মনে করিয়ে দেয় যে এটি শিল্প-মনস্তত্ত্বের একটি মৌল অভিমুখ, একটি প্রধান সমস্যা। ভাবা যেতে পারে যে চলচ্চিত্রটির সৃষ্টিদৃষ্টি সংগঠন নির্ধারিত ভাবে দর্শক সাধারণের মনে নান্দনিক প্রতিক্রিয়া ঘটায়। চলচ্চিত্রটির মনস্তাত্ত্বিক দিক এবং দর্শক সাধারণের নান্দনিক অবধারণ এ দুটি বিষয়কে পরস্পরের সম্পর্কে অধিষ্ঠ করে একত্রে পরীক্ষা করার প্রশ্নালীটি এখানে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সৃষ্টিশীল সক্রিয়তার মনস্তত্ত্ব চলচ্চিত্র আলোচনায় লাভবান হয়। সাহিত্য সংগীত চিত্রকলা নাটক ইত্যাদি সৃষ্টিধর্মী উপাদান ব্যবহার করে, ফোটোগ্রাফি কম্পিউটার প্রভৃতির যান্ত্রিক প্রয়োগ ঘটিয়ে একই সঙ্গে শিল্প এবং বিজ্ঞানরূপে প্রদর্শনযোগ্য চলচ্চিত্রের মনস্তত্ত্ব নিরূপণ একটি কঠিন কাজ। মাত্র শতবর্ষের প্রেক্ষাপটে স্থাপিত হলেও ঐতিহাসিকতার সূত্রটি এতে প্রযুক্ত হতে পারে। বিচ্ছিন্নভাবে পরিচালক ও অভিনেতার শিল্পভাবনা, অন্তর্দৃষ্টি, প্রতিভা, প্রেরণা ও পরিস্থিতিগতভাবে স্বাধীন সক্রিয়তার আলোচনা সম্ভব এবং এক সৃষ্টিশীল সমবায়ের অংশরূপে চলচ্চিত্রের শিল্পী-ব্যক্তিত্বের মূল্যবিচার করা যেতে পারে। এখানে দলগত সহযোগ ব্যক্তির সৃষ্টিপ্রতিভার একটি প্রেরণাস্বরূপ। চলচ্চিত্র-শিল্পীর প্রতিভার বিকাশে সামাজিক সহায়তা কার্যকর কারণ দলের মধ্যে আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক সহৃদয় সহযোগের ফলে মূর্ত হয়ে ওঠে, অত্মদের ঘনিষ্ঠ উপস্থিতিতে তার শিল্পীব্যক্তিত্বের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া সহজ ও সুন্দর হয়, মনস্তাত্ত্বিক বাধাসমূহ অপসারিত হয় এবং ব্যক্তিশিল্পীর উৎকর্ষবিধান সম্ভব হয়। বৃহত্তর মানসিক-শারীরিক তন্ত্রের একটি অঙ্গ রূপে চলচ্চিত্রের মনস্তাত্ত্বিক আবহনির্মাণ একটি বিশেষ প্রাসঙ্গিক ব্যাপার। ব্যক্তিমানুষের চেতনা মানববিশ্বের পটে অভিক্ষেপের বিষয়, এ বিষয়ে সাম্প্রতিক দর্শনগুলি একমত। এই বিশ্ব এবং মানবমন, মানবমন এবং মানবশরীরের মিলনের বিশেষ প্রশস্ত ক্ষেত্র চলচ্চিত্র রচনা করেছে, এটি একের মধ্যে অপরের প্রকাশের মাধ্যম হয়ে উঠেছে। ইতালিয় নব্য-বাস্তববাদ, ফরাসি নবতরঙ্গ, লাতিন আমেরিকার নতুন চলচ্চিত্র আন্দোলন — নব নব আন্দোলনের অভিঘাতে চলচ্চিত্রের মনস্তত্ত্ব দৃঢ়ত্ব প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

চলচ্চিত্র নামক স্বতঃস্ফূর্ত লৌকিক শিল্পট এবং তার সঙ্গে চলচ্চিত্রশিল্পের মনস্তাত্ত্বিক ভাবনার ক্রমবর্ধমান দূরত্ব এরই মধ্যে আশঙ্কার বিষয় হয়ে পড়েছে। চলচ্চিত্র সমালোচনা এখন আর সহৃদয় সামাজিকের অভিজ্ঞতার প্রদারণমাত্র নয়। পরিশীলিত দর্শকের মনে এসব তাত্ত্বিক আলোচনা এখনই শর্তসাপেক্ষ প্রতিবর্ত সৃষ্টি করেছে, চলচ্চিত্রের অন্তর্মুখীন পরিক্রমা বাড়ছে। ফিল্ম নয় এমন সিনেমা সম্পর্কে নান্দনিক উদাসীনতা অধিকাংশ চলচ্চিত্রশিল্পকে মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্র থেকে নির্বাসনের পক্ষপাতী। কিন্তু চলচ্চিত্র হলো দর্শকের কাল্পনিক অভিজ্ঞতা। শিল্প ও বিজ্ঞানরূপে তা চলমান দৃশ্যপ্রতিমা নির্মাণ করে চলেছে। এবং তা একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম। সুতরাং কোনোমতেই শিল্পমনস্তত্ত্বের এলাকা থেকে তথাকথিত শিল্পরহিত চলচ্চিত্রগুলিকে প্রত্যাখ্যান করা চলে না। ফ্রেয়েডিয় মনো-সমীক্ষণ প্রমাণ করেছে মানবমন অচেতনভাবে হলেও নির্বাচিত দৃশ্যপ্রতিমার মধ্যে অহুস্ত আকাঙ্ক্ষার যতদূর সম্ভব পরিপূর্তি দাবি করে। পরবর্তীকালে লাকার মনো-সমীক্ষণ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে যে শুধু শিশু নয়, শিশুর পিতামাতাও অল্পদের প্রতিমার দর্পণে নিজেকে মুহুরিত দেখে একান্ত বোধ করে, কাল্পনিক বা প্রতীকায়িত বাস্তব এমনকি অবাস্তবকেও সে বাস্তব বলে বিবেচনা করে। দর্শকের মনের মধ্যে ঘটমান চলচ্চিত্র যেন কল্পনার একটি যান্ত্রিক প্রয়োগ এবং তার ফলে চলচ্চিত্র স্বপ্নের আর দিবাস্বপ্নেরও নামান্তর মনে হয়। শুধুমাত্র বর্তমানের কাঠামোয় রচিত এবং উৎপ্রেক্ষার আধারে অপিত স্বপ্ন এবং চলচ্চিত্র অনঙ্গজাত সংশ্লিষ্ট বস্তুদৃশ্যের সঙ্গে দর্শকের সম্পর্ক সৃষ্টি করে।

সম্পর্কিত গ্রন্থ : H. Munsterberg-এর, দি ফিল্ম, এ সাইকোলজিক্যাল স্টাডি।

### বীভূশোক ভট্টাচার্য

॥ জান্ মরো ॥

(জন্ম ১৯২৮, ফ্রান্স)। অভিনয়ের শিক্ষা লাভ করে মরো ১৯৪৮ সনে একই সঙ্গে মঞ্চ ও চিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি চলচ্চিত্রে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা পান ১৯৫৮ সনে। পর্দায় আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও স্থনিয়ন্ত্রিত অভিনয় তাঁকে সফল চিত্রাভিনেত্রী করে তোলে। তাঁর অভিনয়ে শক্তি ও সূক্ষ্মতা, উইট ও নৈরাত্তিকতা, ষষণ যোনাবেদন ও সোফিসটিকেশনের সূন্দর প্রমাণ মেলে। মালের Les Amants (এই ছবিতেই তিনি প্রথম নায়িকা হন), ভিভা মারিয়া, ও অস্ভাস্ত

ছবি, আন্তর্নির্দেশিত না নস্তে, ক্রফোর জুল অ্যাণ্ড জিম ও দি আইড য়োর গ্রাণ্ড, বুল্লেলের দি ডায়েরি অব দি চেম্বারমেড, এবং দেমি, ওফুলস, ওয়েলস, রিচা ওয়াগ, দ্ব্যরাজ প্রমুখর ছবিতে তাঁর উল্লেখযোগ্য অভিনয় আছে। তাঁর অস্বাভাবিক বিখ্যাত ছবির মধ্যে আছে Chimes at Midnight, Monte Walsh, Alex in Wonderland, The Last Tycoon, The Immortal Story, The Trout, The Wizard of Babylon। তিনি খুব প্যাশনেট, নিজেই স্বীকার করেন, বলেন, খুব সহজেই প্রেমে পড়ে যান তিনি। তাঁর ব্যক্তিগত এই ইমেজটি অতিরঞ্জিত রূপ মাতাহারি চিত্রের নাম-ভূমিকার অভিনয়ে। জনৈক সমালোচক বলেছিলেন, মরো হলেন মননশীলা দুষ্টি-মিষ্টি নায়িকা। তাঁর দ্বিতীয় স্বামী চিত্র পরিচালক উইলিয়াম ফ্রিডকিন। তাঁর ছবিতেও তিনি অভিনয় করেছেন। গায়িকা রূপেও তাঁর দক্ষতা আছে। La Lumière ও দি অ্যাডলিনেন্ট নামে দুটি ছবিও তিনি পরিচালনা করেছেন। তুলেছেন লিলিয়ান গিশকে নিয়ে একটি তথ্যচিত্রও।

॥ হুসান মাকাভেজেভ ॥

( জন্ম ১৯৩২, বেলগ্রেড, ইয়োগোস্লাভিয়া )। বেলগ্রেড বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন ও মনস্তত্ত্বের স্নাতক তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাপ্তাহিক 'স্টুডেন্ট' পত্রিকার সম্পাদক এবং চলচ্চিত্র সমালোচক ছিলেন মাকাভেজেভ। পরবর্তী সময়ে চলচ্চিত্র অ্যাকাডেমি, থিয়েটার এবং টেলিভিশনে যোগদান। ছাত্রাবস্থাতেই 'অ্যান্থনীস ব্রোকেন মিরর' নামে একটি ছোট ছবির নির্মাতা। তাঁর অপর ছোট ছবিগুলির নাম 'ডোন্ট বিলিভ দি মহুমেন্টস', 'ড্যামড্ হলি ডে', 'সাইল ৬১' এবং 'প্যারেড'। প্রথম ফিচার ছবি 'এ ম্যান ইজ নট এ বার্ড' (৬৬) লণ্ডনের নিউ সিনেমা ক্লাবে দেখানো হলেও, বিশেষ সাড়া তুলতে পারেনি। চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে তিনি একটি চমকপ্রদ বক্তব্য রাখেন যে : চলচ্চিত্র আমার কাছে গেরিলা অপারেশনের মতো। যা কিছু বাঁধাধরা ব্যাখ্যাত প্রতিষ্ঠিত গোঁড়ামীযুক্ত আর চিরকালীন তাদের বিরুদ্ধেই গেরিলা অপারেশন। রাস্তা থেকে সংগ্রহ করা ইটের টুকরো, আগুন, বুলেট, শ্লোগান এবং গান—যে কোনো অস্ত্রই গেরিলারা তাদের পছন্দ-মতো ব্যবহার করতে পারে। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটুকু তাই। গল্প ডকুমেন্টস টাইটেলস কিংবা বাস্তবিকতা, যা কিছু আমাদের হাতের কাছে, সবই ব্যবহার করতে পারি। 'স্টাইল' প্রয়োজনীয় নয়। বিশ্বয়কে আপনারা নিশ্চয়ই

মহাস্তমিক অঙ্ক বিশেষে ব্যবহার করেন। আমরা এমনকী শত্রুর কাছ থেকে নেওয়া রসদও ব্যবহার করতে পারি।

ঠিক এমনিভাবেই তাঁর দ্বিতীয় ছবি 'দি স্লিচ বোর্ড অপারেটর' (৬৭) ইন্টারনেটের উপর বক্তৃতায় গুরু। এই বক্তৃতা ব্রিটিশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের প্রধানের কাছে অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছিল। [ এই ছবির কাহিনী প্রেমের কাহিনী, কিন্তু তা একইসঙ্গে সমাজ কী করে প্রেমকে যৌন প্যাথলজিতে নামিয়ে আনে তার বর্ণনাও, ফলে উক্ত বক্তৃতা অপ্রাসঙ্গিক নাও হতে পারে। ] তাঁর তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ ছবি 'ইনোসেন্স আনুপ্রটেক্টেড' (৬৮)। এই ছবি সম্পর্কে পরিচালকের বক্তব্য : কাটিং রুমে ছবিটির জন্ম। আমি শুনি, রসদের দিকে তাকাই, এবং নির্ভুল চিত্রকল্পে তা নিজেই প্রকাশের বন্দোবস্ত করে নেয়। আমার মনে হয় একজন অন্ধনশিল্পীর মতোই আমি ছবি করি। চলচ্চিত্রে সবচেয়ে ভালো বস্তুগুলি এইরকম ইমপ্রোভাইজেশন থেকেই জন্ম নেয়।

পরের ছবি 'মিস্ট্রিস অব দি অর্গানিজম' (৭১) সম্পূর্ণভাবে কোলাজে গঠিত। মার্কিন সংগীতে জেডিট টাইটেল, একটা কাঁচা ডিম বিশৃঙ্খল এবং ইন্ডিতপূর্ণ ভাবে হাতে হাতে চলে যায়। ক্যামেরা পিছনে সরে এলে অংশগ্রহণকারীদের দেখা যায়। তারপরেই নগ্ন নারী পুরুষের নগ্নতা এবং যৌন আচরণের দৃশ্য। পরের দিকোয়েসেই দলিল চিত্রের মতো ভিলহেলম রাইখের জীবন, কর্মসাধনা এবং নিগ্রহের চিত্র। তাঁর ছেলেমেয়ে প্রতিবেশী এবং শিষ্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং অর্গাননের রাইখ মিউজিয়ামের পুরনো এবং নতুন ভাবে গৃহীত শটের দৃশ্যাবলী। রাইখ প্রসঙ্গে মাকাভেজেভ বলেছেন : পঞ্চাশের সালে ছাত্রাবস্থায় তাঁর বই ডায়ালেক্টিক্যাল মেটরিয়্যালিজম অ্যাণ্ড সাইকো অ্যানালিসিসকে আমি আবিষ্কার করে ফেলি। মানব স্বাধীনতার দুই মহাপুরুষ মার্ক্স ও ফ্রয়েডের সংযুক্তি আমাকে বিস্মিত করেছিল। মার্ক্স সমাজের কাঠামোর মধ্যে অর্থনৈতিক শর্তে, ব্যাপারটিকে চিন্তা করেছিলেন। বেড়াগুলি সব ভেঙে সৃষ্টিক্রমকে সীমিত করে এমন সব সীমানাকে উন্মুক্ত করে দেওয়া—মানুষের গঠন প্রণালীর মধ্যে কাজ করতে চেষ্টা করেছিলেন ফ্রয়েড। রাইখের মাধ্যমে এই দুজনকে সংযুক্ত করার বিষয় প্রসঙ্গে এই ছবিতে উপস্থাপিত রাজনীতি বিতর্কমূলক, যৌন আচরণের দৃশ্য-গুলিও প্রচণ্ডভাবে উপস্থিত, তবুও সমালোচকরা অনেকেই এ ছবি দেখে বিমুগ্ধ, একে মানস্টরপীস বলতে তাঁদের দ্বিধা নেই। [ মানুষের কোনো ছোট ও একক প্রসঙ্গ থেকে মাকাভেজেভ যেভাবে বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক অনুষণে চলে

যান পরের ছবি 'সুইট মুভি' (৭৪) তারই আরও স্পষ্ট উদাহরণ।] আজ তিনি একজন উচ্চমানের পরিচালক শুধু নয়, যহৎ শিল্পী বলে খ্যাত হচ্ছেন। [ চলচ্চিত্র প্রদর্শনে তিনি গেরিলা অপারেশনের কথা বলেছিলেন। আর তাঁর সাম্প্রতিক ছবিটির নাম 'গেরিলা বাদস এ্যট হুন'। ছবির বিষয় পূর্ব ইউরোপে কম্যুনিজমের নী উত্তরাধিকার অবশিষ্ট রয়েছে। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগত প্রদর্শ থেকে এখানেও তিনি বৃহত্তর রাজনৈতিক অঙ্গুক্ষেপে পৌঁছে যান। তাঁর অস্বাভাবিক ছবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য **Pigs and Pearls** (৮১), **The Coca-Cola Kid** (৮৫), **Manifesto** (৮৬)। ষাটের দশকের শেষভাগে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের বৃত্তি নিয়ে তিনি এক বছর আমেরিকায় কাটান। ]

ল্যাংডন ডিউই

॥ মাধবী মুখোপাধ্যায় ॥

এক নিম্নবিত্ত পরিবারে ১৯৪০ সনে তাঁর জন্ম। তাঁর প্রথম অভিনীত ছবি টনসিল। সেখান থেকে যাত্রা শুরু করে কালক্রমে তিনি ভারতের এক শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী রূপে স্বীকৃতি পান। অভিনয় এমন একটা প্রক্রিয়া যার দ্বারা অভিনেতা অভিনেত্রী একটা চরিত্রকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলেন। কারো কারো মতে অভিনয়ের প্রথম কথা হচ্ছে প্রাক্ সত্তা বিলোপ। এসবের জ্ঞান শিল্পীর একটা তৃতীয় নেত্র থাকে। একটা অতিরিক্ত সেন্স, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। এদের সাহায্যেই মাধবী মুখোপাধ্যায় প্রতিটি চরিত্র অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে একজন নতুন মানুষের জন্ম দিয়েছেন। তাই গ্রাম্য চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও পদ্ম ও বৌ অঙ্গভঙ্গি ও কথনভঙ্গিতে আলাদা আর সীতা বা আরতি নিজের নিজের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ ব্যাপারে মাধবীকে সাহায্য করেছে তাঁর কল্পনা, মনোযোগ ও অনুভব।

কল্পনাশক্তির সাহায্যেই রবীন্দ্র চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিগত চারু, ব্যক্তিগত মেজ বৌয়ের থেকে আলাদা ও গ্রাম্য চরিত্র হয়েও বাইশে শ্রাবণের বৌ গণ-দেবতার পদ্ম থেকে স্বতন্ত্র। দ্বিতীয়তঃ মনোযোগ। বাইশে শ্রাবণে মাধবী দৌড়তে গিয়ে বালতি ফেলে দেন এবং মুহূর্তের জ্ঞান সে দিকে তাকিয়ে তাতে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে চরিত্রের গভীরে প্রবেশ করেন। এ বিষয়ে চারুকে সাহায্য করেছে তার সেলাই আর সীতা বহুক্ষেত্রে ব্যবহার করেছে স্ববর্ণরেখা নদী। তৃতীয়তঃ অনুভব। মাধবী অভিনীত চরিত্র তাঁর সূক্ষ্ম অনুভব প্রবণতার স্পষ্ট প্রমাণ। গণদেবতায় পদ্মর অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবার ঠিক আগে কয়েক সেকেন্ড স্থির দৃষ্টিতে

চেয়ে থাকা আর একটু একটু করে অভিব্যক্তির পরিবর্তন অনুভূতিকে আশ্রয় করেই অভিনীত। স্বর্ণরেখায় অভিরামের মৃত্যু সংবাদে সীতা দরজা ঘেঁদে ঘেঁদে অজ্ঞান হয়ে নীচে পড়ে যায় এবং যেতে যেতে অভিব্যক্তিকে পরিপূর্ণতার স্থির বিন্দুতে নিয়ে যায়, বা মাতাল দাদা দালাল মারফত বোনের বাড়ীতে এলে সীতার অনুভব দর্শককেও যন্ত্রণা দেয়। মহানগরে আরতির চাকরী ছাড়ার কয়েকটি মুহূর্তের উদ্বেগ-অশান্তি, স্বামী ফিরে আসার আগে চাকর মানসিক দ্বন্দ্বের মুহূর্ত, এসবও অনুভব আশ্রিত। অভিনয়-বিজ্ঞান বলে চরিত্র অনুযায়ী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কথা বলবে অর্থাৎ physical acting। মাধবী তার পরীক্ষা দিলেন বাইশে শ্রাবণ-এ। মাধবী যখন নতুন বৌ তখন তার বয়স অল্প, ক্রমে তার বয়স বাড়ল। বিভিন্ন রূপ পরিস্থিতির মধ্যে তিনি শক্ত হলেন, এই বয়স বাড়ার কাজ নিপুণ-ভাবে করল তাঁর physical acting। রবীন্দ্রনাথ নষ্টমীড়ে লিখেছেন, 'ধনী গৃহে চাকরুলতার কোন কর্ম ছিল না।' চাকর এই একাকিঙ্ক অনবগু চিত্রনাট্যে প্রকাশ করেছেন সত্যজিৎ আর অভিনয়ে তাঁকে সমান সাহায্য করেছেন মাধবী। চাকর জানলা দিয়ে একজন মোটা লোককে দেখছে। কামেরা পেছন থেকে চাকরকে ধরেছে, আমরা তার অভিব্যক্তি দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু এক জানলা থেকে আর এক জানলায় যাওয়ার ভঙ্গি তার চাপল্য, আগ্রহ, উৎসাহ স্পষ্ট ফুটিয়ে তুলেছে। অথবা বন্ধ্য পদ্মের ভোরের উঠানে জল ছোটানো, অনি কামারের কথায় লজ্জা পেয়ে 'হেই মা' বলে বুকে কিল মারা, একেবারেই গ্রাম্য ভঙ্গি। সীতা ঈশরের ছোট বোন, ঈশরকে শাসনও করে। শাসনের মুহূর্তে একটা মিশ্র অনুভূতি মাধবীর দেহে, অভিব্যক্তিতে। ঘাড় ঈষৎ শক্ত করে ঝাঁকানো, মুখে ছেলেমানুষী শাসন ভঙ্গি বা মধ্যবিস্তৃত স্ত্রী চরিত্রে আরতির হাঁটা চলা বা বিন্দুর অস্থ বিসয়ে প্রতিবাদ। মেজ বোয়ের ব্যক্তিব্ধসম্পন্ন চলন চরিত্রকে সম্পূর্ণভাবে পরিচুট করেছে। মাধবীর কান্নার একটা বৈশিষ্ট্য আছে যা তাঁকে অল্প অভিনেত্রীদের থেকে আলাদা করেছে। মাধবী কান্নায় ভেঙে পড়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত দর্শক বুঝতে পারেন না যে তিনি ঠিক কোন মুহূর্তে কেঁদে উঠবেন। কান্নার মুহূর্তে তাঁর মুখে খুব পেশী কুঞ্জনও দেখা যায় না।

সংলাপ অভিনয়ের প্রাণ। সংলাপ যথাযথ ভাবে শোনানোই হলো অভিনেতার প্রধান দায়িত্ব। সংলাপ শোনানোর তত্ত্বটি সংলাপের স্পষ্ট উচ্চারণে। মাধবীর উচ্চারণ ভাষাতাত্ত্বিক ভাবে একেবারে ঠিক না হলেও উচ্চারণে দ্বর্বলতা বড়ো একটা চোখে পড়ে না।

মাধবীর প্রধান অভিনয়গুলিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়—(১) রোম্যান্টিক অভিনয় : ‘স্বপ্ন নিয়ে’, ‘অবতার’ যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। (২) ছাচরালিপিক অভিনয় : ‘মহানগরের’ আরতি চরিত্র এর যথার্থ উদাহরণ। (৩) ট্রাজেডি : স্ববর্ণরেখা, চারুলতা, বাইশে শ্রাবণ, জীর পত্র, দিব্যারাজির কাব্য, গণদেবতা— এই ছয়টি চলচ্চিত্রে তাঁর অভিনয় Tragedy Acting-এর মধ্যে পড়ে। এষ্ট ছয়টি চরিত্র একই স্তরে ঝাঁপা, এরা সবাই বিদ্রোহী কিন্তু প্রত্যেকেই শেষ পর্যন্ত ঘটনার শিকার। বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে চারুর সঙ্গে অল্পদের অনেকটাই অমিল তবু মিলটা এক জায়গায়—চারুও বিদ্রোহী, তার বিদ্রোহ মৌনভাবে, সে তার একাকিস্বের সঙ্গে লড়াই করে, স্বামীর কাছে তার বিদ্রোহ আত্মমর্ষাদার। সেইজন্য সে সঙ্গী হিসেবে স্বামীর সঙ্গ দাবী করে না, নতি স্বীকার করে না, ভূপতি রুমাল পেয়ে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল রুমালটি চারুর করা, তখন সে আবার চারুকে জিজ্ঞাসা করল—‘এত সময় তুমি কোথায় পাও চারু?’

‘আমার কি সময়ের অভাব আছে।’ এটুকু বলে চারু অল্প ঘরে চলে যায়, এর চেয়ে বেশি বলে নিজের ভারটুকু হাঙ্কা করতে সে রাজী নয়, ভূপতি তখন তার নিঃসঙ্গতা সম্পর্কে প্রশ্ন করাতে চারু একেবারে অবাস্তব প্রশ্ন করে তা চাপা দেয়—‘তুমি স্বর্ণলতা পড়েছ?’ মাধবীর এই ভঙ্গি, এই অন্তর্মুখীনতা তাঁর নিজস্ব।

এক কথায় মাধবী সম্বন্ধে বলা যায় তিনি জ্ঞাত অভিনেত্রী, তিনি অভিনয় জানেন। তাই উল্লেখযোগ্য পরিচালকের ছবিতে, কি উল্লেখযোগ্য ছবিতে ছাড়াও অল্পল্লেখযোগ্য ছবিতেও বা মঞ্চেও তাঁর অভিনয় এত উল্লেখযোগ্য। তাঁকে নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন পূর্ণেন্দু পত্রী, সম্প্রতি তথ্যচিত্রও তোলা হয়েছে তাঁকে নিয়ে। মাধবী এক সময়ে ছিলেন অভিনেতা নির্মলকুমার চক্রবর্তীর স্ত্রী।

গোপা সেনগুপ্ত

॥ কার্ল মায়ার ॥

( ১৮৯৪-১৯৪৪ ), অস্ট্রিয়ান-জার্মান চিত্রনাট্যকার। অভিনেতা এবং শিল্পী হিসেবে জীবন শুরু করেছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে রণাঙ্গন থেকে দেশে ফিরলেন গভীরভাবে যুদ্ধবিরোধী ও সর্বপ্রকার কর্তৃত্ববিরোধী হয়ে। চেক কবি হান্স য়ানোভিৎস্-এর সঙ্গে একযোগে ‘দাস্ কাবিনেট্ দেস্ ডক্টর কালিগারি’-র ( ১৯১৯ ) গল্প ও চিত্রনাট্য লেখেন। তাঁর কর্তৃত্ববিরোধী মানসিকতার প্রকাশ

ষটলো 'কালিগারি' ছবির মূল চিত্রনাট্যে। এই ছবির অসাধারণ সাফল্যের পর 'কালিগারি'-র পরিচালক রোব্যাট ডিনে তাঁর পরবর্তী ছবি 'জেরুইন'-এর চিত্রনাট্য লেখার ভার দেন কার্ল মায়ার-কে। এরপর মায়ার লেখেন ফ্রিডরিখ মুরনাউ-এর 'প্লোস্ ফ্যাগেলয়েড' (১৯২১) এবং লেওপোল্ড য়েসনার-এর 'হিটোরট্রেনে' (১৯২২) ছবি দুটির চিত্রনাট্য। নুপু পিক-এর দুটি ছবি 'শেরবেন' (১৯২১) এবং 'সিলভেস্টার' (১৯২৩)-এর চিত্রনাট্যও মায়ার-এর লেখা। ১৯২৪ শালে লিখলেন মুরনাউ-এর বিখ্যাত ছবি 'ডেয়ার লেঞ্জ্‌টে মান'-এর চিত্রনাট্য। চলচ্চিত্র সমালোচক ও ঐতিহাসিকদের মতে এই চিত্রনাট্যটিই মায়ার-এর জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। মুরনাউ-এর পরবর্তী ছবি, মলিয়ার-এর নাটক-এর উপর ভিত্তি করে 'তারভুফ' (১৯২৫)-এর চিত্রনাট্যও তিনি লিখেছিলেন। ১৯২৫ সনে সেগেই আইজেনস্টাইন-এর 'দি ব্যাটলশিপ পটেমকিন' দেখার পর থেকেই মায়ার ধীরে ধীরে বাস্তব থেকে দূরে মূলতঃ স্টুডিওর মধ্যে থেকে সম্পূর্ণ ছবি তোলার ঝোঁকের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে থাকেন। তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল বার্লিন শহরের উপর একটি ডকুমেন্টারি ছবি করার এবং এই আশা নিয়েই তিনি স্বার্টার রুটমান-এর 'বার্লিন, ভী সিম্ফোনী আইছার গ্রোস্টাড্‌ৎ' (১৯২৭) ছবির চিত্রনাট্য লেখার ব্যাপারে যোগ দিয়েছিলেন, যদিও কিছুদিন পরেই রুটমান-এর সঙ্গে মতানৈক্যের ফলে মায়ার এই ছবির কাজ থেকে সরে আসেন। মুরনাউ যখন হলিউডে 'সানরাইজ' (১৯২৭) তুলতে গেলেন তখন চিত্রনাট্যকার হিসেবে কাজ করতে ডাকলেন মায়ারকে। জার্মানিতে মায়ার-এর শেষ কাজ পাউল জিনার-এর দুটি ছবি 'আরিয়াণে' (১৯৩১) এবং 'ডেয়ার ট্রয়েমেণ্ডে মুণ্ড' (১৯৩২)-এর চিত্রনাট্যকার হিসেবে। এরপর তিনি চলে যান ইংল্যাণ্ডে তাঁর বন্ধু পল রোথার-র সঙ্গে কাজ করতে। 'দু সিটিজ প্রোডাকসান কম্পানী'র উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছিলেন ইংল্যাণ্ডে। এই সময় তিনি যে চিত্রনাট্যগুলি লেখেন তার কোনটিরই অবশ্য চলচ্চিত্রায়ণ হয়নি।

অসাধারণ চিত্রময়তাকে রূপ দিয়েছেন মায়ার তাঁর চিত্রনাট্যগুলিতে। অসাধারণ তাঁর সমাজসচেতনতাও। চলচ্চিত্রের সেই শৈশবে তিনি চিত্রনাট্য লিখেছেন প্রতিটি ডিটেল দিয়ে। ছবির কাজ শুরু হবার পর নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন গুটিং এবং সম্পাদনার কাজের সঙ্গে। চলচ্চিত্র আঙ্গিকের বিবর্তনে তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান 'কান্সারস্পীলফিল্ম'। বিখ্যাত চলচ্চিত্র সমালোচক ও ঐতিহাসিক জিগফ্রীড্‌ ক্রাকাউয়ার-এর মতে কার্ল মায়ার-এর অবদান ছাড়া

জর্মন চলচ্চিত্র বিশ্বসভায় স্থান পেত কিনা সন্দেহ। ১৯৪৪ সনে তিনি ক্যাথলি  
রোগে মারা যান।

ব্লগজিৎ রায়

॥ মার্কস ভ্রাতৃবৃন্দ ॥

আমরা কমেডিতে একক শক্তিশালী অভিনেতার দেখা পেয়েছি ( ড্র. কমেডি ),  
অভিনেতা জুটি দেখেছি ( যেমন লরেল-হার্ডি ), আর অভিনেতা গোষ্ঠী রূপে  
পেয়েছি মার্কস ভ্রাতৃবৃন্দকে—গ্রুচো ( ১৮৯০-১৯৭৭ ), চিকো ( ১৮৮৬-১৯৬১ ),  
হারপো ( ১৮৮৮-১৯৬৪ ), জেপ্পো ( ১৯০১-১৯৭৯ )। জেপ্পো কিছুদিন পর অভিনয়  
ছেড়ে দেন ও চতুর্থ সদস্য হিসেবে মার্গারেট ডুই গোষ্ঠীতে যোগ দেন। মোটের  
ওপর কমেডি অভিনয় হলেও প্রত্যেকের অভিনয় রীতি ছিল আলাদা ; গ্রুচো  
ছিলেন তৎপর ও প্রত্যয়ী, চিকো যুক্তিবিশু ও স্বনির্ভর, হারপো মুকাভিনেতা ও  
মুখাভিনেতা। এঁদের উল্লেখযোগ্য গোষ্ঠী-অভিনয়ের মধ্যে আছে দি কোকোনোটস  
( ২৯ ), অ্যানিমাল ক্রাকারস্ ( ৩০ ), মাংকি বিজনেস ( ৩১ ), হর্স ফেদারস্ ( ৩২ ),  
ডাক স্লপ ( ৩৩ ), এ নাইট এট দি অপেরা ( ৩৫ ), এ ডে এট দি রেসেস্ ( ৩৭ ),  
দি বিগ স্টোর ( ৪১ ) ইত্যাদি। তাঁদের অভিনয় ভাঁড়ামো ও হান্সরস, রোমান্স ও  
সমবেদনা, তাৎক্ষণিক সিচুয়েশন ও ক্রমপরিণত প্লট, কৈশোরক স্বাদ ও দীর্ঘ-  
ক্ষোভ, এবং তরতরে গতি ও বাহুল্যের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। সামাজিক প্রশ্ন থেকে  
অসম্ভব সিচুয়েশন পর্যন্ত এক দিলখোলা জগৎ, তার সাথে নিজেদের প্যারডি।  
বিখ্যাত ব্রডওয়ে মিউজিক্যাল মিনি'স ব্যেঞ্জ তাদের ও তাদের মায়ের কাহিনীকে  
অবিস্মরণীয় করে রেখেছে। হারপোর স্বত্বিকথা হারপো স্পিকস ও গ্রুচোর আত্ম-  
জীবনী গ্রুচো অ্যাণ্ড মী নামে প্রকাশিত হয়েছে।

॥ ত্রিশ মার্কার ॥

( জন্ম ১৯২১, ফ্রান্স )। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রতিরোধ বাহিনীর সদস্যরূপে অংশগ্রহণ  
করার পর মার্কার ঔপন্যাসিক, লেখক, কবি ও সাংবাদিক হিসেবে কৃতিত্বের  
পরিচয় দিয়ে চলচ্চিত্রে প্রবেশ করেন। তাঁর পরিচালনায় নির্মিত অধিকাংশ ছবিই  
স্বল্প ও মাঝারি দৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র, যে সব চিত্রের চিত্রনাট্য লেখা ও চিত্রগ্রহণের  
কাজও সাধারণত তিনিই করেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরের কয়েকটি  
বছরে ফরাসি চলচ্চিত্রে তথ্যচিত্র ও অল্প দৈর্ঘ্যের ছবি অনেকটা প্রাধান্য লাভ

করেছিল। এর পিছনে মার্কিনের অবদান অনেকখানি। তাঁর সামাজিক-রাজ-  
নৈতিক প্রশংসার বিভিন্ন তথ্যচিত্রে, যা মার্কীয় ভাবধারা প্রভাবিত, বুদ্ধি ও  
দৃষ্টির সমন্বয় ঘটেছে। এর মধ্যে অলিম্পিয়া ৫২, ফার ক্রম ভিয়েতনাম, কিউবা :  
ব্যাটল অব টেন মিলিয়নস, চার ঘণ্টা স্বাধিকের Le Fond del' Air est  
Rouge, লেটার ক্রম সাইবেরিয়া প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ। চীন রাশিয়া ইস্রায়েল কিউবা  
জাপান ভিয়েতনাম চিলি নানান দেশে গিয়ে ছবি তুলেছেন তিনি। তথ্যচিত্র  
করে হাত পাকিয়ে জঁ রুশ এবং তিনি তথ্য ও কাহিনীচিত্রের মাঝামাঝি একটি  
আঙ্গিক নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। চিত্র-প্রযোজনার কোঅপারেটিভ সংস্থা  
SLON স্থাপন, বাজার সঙ্গে চলচ্চিত্র বিষয়ে লেখালেখি; স্থিরচিত্র গ্রহণে  
পারদর্শিতা, তাঁর কাজকর্ম সর্বদাই ছিল বহুগুণী। নিজের সম্পর্কে ঈষৎ রহস্যময় ও  
নিরাসক্ত এই ব্যক্তির অভিধাতী ব্যক্তিত্ব তথ্যচিত্রের জগতে সবিশেষ উল্লেখ্য।  
তাঁর Le Joli Mai ( ৬৩ ) স্ট্রীকচারালিস্ট মহলে বহু আলোচিত ও কান  
চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত। বহু আলোচিত তথ্যচিত্র দি ব্যাটল অব চিলি তাঁরই  
সহায়তায় কিউবার ফিল্ম ইন্সটিটিউটে সম্পূর্ণ হয়। আকিরা কুরোশাওয়াকে নিয়ে  
একটি অসাধারণ তথ্যচিত্রও নির্মাণ করেছেন তিনি A. K. ( ৮৫ )।

॥ লুই মাল ॥

ফ্রান্সের এক অতি ধনী শিল্পপতি পরিবারে ১৯৩২য়ে জন্ম। রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে সর্বো  
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী লাভ করে চলচ্চিত্রনির্মাণ বিষয়েও অধ্যয়ন করেন।  
১৯৫৬য় কুস্তো ও তিনি যুগ্মভাবে সমুদ্রের নিচের জীবন নিয়ে প্রসিদ্ধ তথ্যচিত্র  
দি সাইলেন্ট ওয়র্ল্ড পরিচালনা করেন। আরো দুটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের চিত্র নির্মাণ করে  
ও ব্রেসের সহকারী রূপে কিছুদিন কাজ করে ৫৮য় তিনি প্রথম কাহিনীচিত্র পরি-  
চালনা করলেন, Frantic, একটি মনস্তত্ত্ব ঘেঁষা থ্রিলার। ওই বছরই জানু মরোক  
নাগ্নিকা করে তৈরি দি লাভারস তাঁকে ও মরোককে একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা  
দিল। ১৯৬০য়ে রেই ক্যানোর কাহিনী অবলম্বনে তৈরি করলেন একটা মজাদার  
উদ্ভাবনকুশল ছবি—Zazi dans le Metro। এ ডেরি প্রাইভেট অ্যাফেয়ার  
( ৬২ )-র পর মাল ৬৩তে দি ফায়ার উইদিন নির্মাণ করলেন, ব্যক্তিগত নিঃসঙ্গতার  
ভীক্ষ পর্যবেক্ষণে ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতার সংবেদনশীল বর্ণনায় সমৃদ্ধ তাঁর অল্পতম  
শ্রেষ্ঠ ছবি। এরপর বার্দো ও মরো, দুই নাগ্নিকাকে নিয়ে তোলা অসাধারণ দৃষ্টির  
চিহ্নিত ননসেন্স কমেডি 'ভিতা মারিয়া' ( ৬৫ ), বিতর্ক সৃষ্টিকারী পূর্ণ দৈর্ঘ্য তথ্যচিত্র

ওহ্, ক্যালকাটা (৬৯) ও সাত পর্বে বিভক্ত টিভি ফিল্মমালা ফ্যানটম ইন্ডিয়া।  
আবেগ ও সহজ সারল্যের চিত্রায়ণ মারমার অব দি হার্ট ( ৭১ ) ও Lacombe  
Lucien ( ৭৩ ) লুই নালের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ছবি। তারও পরে অ্যান্ডি  
ইন ওয়াশিংটন অল্পপ্রাণিত ব্ল্যাক মুন ( ৭৫ ) ও Pretty Baby ( ৭৮ )।  
ফ্রান্সে ও ফ্রান্সের বাইরে কিছু বিচিত্র মানুষ এবং তাদের গৃহ, বিচিত্র মনের কথা  
নিয়ে তৈরি এই ছবিগুলি তাঁকে বিশিষ্ট বলে চিহ্নিত করেছিল। যদিও মাল্ খুণ  
সম্ভবত একজন নিউ ওয়েভ চিত্রপরিচালক হিসেবেই কর্মজীবন শুরু করেন, তিনি  
কিন্তু পরবর্তী কালে শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়েছিলেন চিত্রনির্মাণের প্রচলিত  
রীতিকেই। যা তাঁর ছবিকে দৃশ্যগতভাবে জৌলুসম্পন্ন ও অনুভবগতভাবে  
পরিশীলিত করেছে, রাজনৈতিক বা মূল্যবোধের প্রশ্নে কখনো কখনো বিতর্ক  
তৈরি করলেও সাধারণভাবে প্রায় ছবিই হয়েছে প্রমোদমূলক ও ব্যবসা-সফল।  
ছবি থেকে ছবিতে অতি দ্রুত পট পরিবর্তন ও যে কোনো ছবিতেই পটভূমিকে  
মোটামুটিভাবে বিশ্বাস্ত করে প্রতিষ্ঠিত করতে পারার মধ্যে তাঁর যে পেশাদারী  
দক্ষতা ও নিশ্চয়তার প্রমাণ মেলে তাকে তিনি কোনো নিজস্ব শৈল্পিক স্তরে নিয়ে  
যেতে পারেননি। তাঁর ছবির যে স্বপ্না তা মূলত বহিরঙ্গের। তাঁর সাম্প্রতিক  
ছবির মধ্যে আছে আমেরিকায় গিয়ে তোলা দুটি অসাধারণ ছবি অ্যাটলান্টিক  
সিটি ( ৮০ ) ও মাই ডিনার উইথ আন্ড্রে ( ৮১ ) এবং ফ্রান্সে ফিরে গিয়ে করা  
Au revoir, les enfants ( ৮৭ ), ও May Fools ( ৯০ )।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : Henry Chapier-এর লুই মাল্ ॥

॥ মার্চেল্লো মাস্ত্রোইয়ানি ॥

( জন্ম ১৯২৩/২৪, ইতালি )। বার্গম্যানের প্রিয় অভিনেতা ম্যাক্স ভন সিডো,  
কুরোশাওয়ার তৌশিরো মিফুন আর ফেলিনির মাস্ত্রোইয়ানি। মাস্ত্রোইয়ানি  
গরীব চাষীর সন্তান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি জার্মানদের এক লেবার ক্যাম্প  
থেকে পালান ও যুদ্ধের পর কেরানির চাকরি করতে করতে অভিনয় শুরু করে মঞ্চ  
থেকে চলচ্চিত্রে আসেন। আধুনিক মানুুষের নাটকীয় দৃষ্টি, মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা, এবং  
কমিক দ্ব্যর্থতা-অসংলগ্নতার রূপায়ণে তিনি অসাধারণ দক্ষতা ও সংবেদনশীলতার  
পরিচয় দিয়েছেন। ভন সিডোর অভিনয়ে যে রূপদী প্রত্যয় ও বেলমনদোর  
অভিনয়ে যে স্বতঃস্ফূর্ত অন্তরঙ্গতা, মাস্ত্রোইয়ানি অভিনয়ে সেই প্রত্যয় ও অন্ত-  
রঙ্গতার মাঝামাঝি। বিভিন্ন দেশের ছবিতে ও বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয়ে তিনি

একত অর্থেই আন্তর্জাতিক। তাঁর প্রথম ছবি ৪৭য়ে লে মিজারেবল, উল্লেখযোগ্য অভিনয়ের মধ্যে এয়ার-এর *Domenica D' Agosto*, ভিসকন্ট্রি (এঁর নাট্য-সংস্কার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন) *Le Notti Bianchi*, ফেলিনির লা দোলচে-স্তিতা, এইট অ্যাণ্ড হাফ, সিটি অব উইমেন, জিঞ্জার অ্যাণ্ড ফ্রেড, আন্তনিওনির লা মস্কে, এবং *Che ?*, ক্যানোনোভা ৭০, দি ভায়ার, হোয়াইট নাইটস, ডিভোর্স ইটালিয়ান স্টাইল, এ স্পেশাল ডে, ট্র্যাফিক্ জ্যাম, এনরিকো ৪, রিভেঞ্জ ও লিঙ্কানি, মাল প্রমুখের ছবি রয়েছে। একমাত্র অসতর্ক অবস্থাতেই যেন তাঁকে যেভাবে চাওয়া হচ্ছে সেইভাবে পাওয়া যায়—তাঁর অভিনয়ের অল্পতম প্রধান ধরনটি এই।

## ॥ মিউজিকাল ছবি ॥

মিউজিকাল ছবি বা গীতিচিত্র বিশেষভাবেই একটি মার্কিন চিত্র-জাতি এবং বিশ্ব-চলচ্চিত্রের ইতিহাসে হলিউডের অল্পতম অবদান। যে-সব দর্শক গয়েস্টার্ন এবং মিউজিকাল জাতীয় চলচ্চিত্র উপভোগ করে থাকেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই এ-জাতীয় ছবিকে অগভীর এবং ‘নিছক বিনোদনের’ ফিল্ম বিবেচনা করেন। ফলে এগুলি সম্পর্কে তাঁরা চিন্তাভাবনা করতেই প্রস্তুত নন। কিন্তু মার্কিনি জীবনযাত্রার অন্তরালে যে মানসিকতা তথা অভিকথাগুলি সক্রিয় গয়েস্টার্ন ছবিতে আমরা তাঁর নানা রকমফের দেখি। অপর দিকে মিউজিকাল ছবিতে আছে বিগুহতম বিনোদন। বর্তমান মার্কিনি মানসিকতার প্রচ্ছন্ন সমর্থন হয়ত গয়েস্টার্ন ফিল্ম-এ আছে। কিন্তু সেই মানসিকতা যে-সব সমস্যা সৃষ্টি করেছে তা থেকে বিনোদনাশ্রয়ী পলায়নের পথ খুলে দেয় মিউজিকাল ফিল্ম। এই কারণে এই দুই শ্রেণীর ছবি নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজন আছে। তাছাড়া শিল্প হিসেবেই বা এদের কেন নিকৃষ্ট বলে গণ্য করা হবে? চলচ্চিত্রের একটি প্রজাতি বা জঁর হিসেবে মিউজিকাল-এর সার্থকতা অসামান্য। এই বিষয়ে দুটি তথ্য প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত, তথাকথিত প্রথম ‘সবাক’ ছবিটি—‘দ জ্যাজ্ সিঙ্গার’—আসলে ছিল মিউজিকাল। দ্বিতীয়ত, সর্বকালের হিসেবে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছবিগুলির মধ্যে অল্পতম ‘দ সাউণ্ড অফ মিউজিক’-ও একটি মিউজিকাল। এর বিপুল ব্যবসায়িক সাফল্য হেতু এর ডাকনাম হয়েছে ‘দ সাউণ্ড অফ মানি’। বলা যায়, প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিকৌশল আয়ত্ত্ব হবার সঙ্গে সঙ্গেই সিনেমা সংগীতাশ্রয়ী বিনোদনের রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে।

ভারতীয় চলচ্চিত্র নিয়ে ধারা পঠনপাঠন করছেন তাঁদের কাছে হপিউড মিউজিকাল একটি 'জ'র' হিসেবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ : কারণ হলিউড মিউজিকাল প্রদর্শিত পথেই ভারতীয় চলচ্চিত্রের বৃহৎশ বিকশিত হয়েছে ; এবং এই 'জ'র'-এর মধ্যেই তার যথার্থ সার্থকতা লাভের যা-কিছু সম্ভাবনা রয়েছে । অধিকন্তু মিউজিকাল ফিল্ম-এর চলচ্চিত্রগুণ উপলব্ধি করতে পারলে সর্ব-ভারতীয় ছবির সেই সব সম্ভাবনা আমাদের চোখে ধরা পড়বে যাকে উৎসাহ দেওয়া যায় ।

বিনোদন এবং পলায়নীয়ুত্তির প্রশ্ন এখানে আলোচিত হবে না । সমাজ-জীবনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি এই সবের মধ্যে নিহিত আছে । বরঞ্চ সংক্ষেপে হলেও আমরা এই 'জ'র' বর্তমান, এইটে স্মেনে নিয়েই তার জনপ্রিয়তা ও চিত্রকালীনতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি । এর সাংস্কৃতিক মূল্য বিচারের ভার পাঠকের উপরই ছেড়ে দেওয়া গেল । এই 'জ'র'-এর সার্থকতা এবং তার নিজস্ব গুণাবলী সম্পর্কে খানিকটা ধারণা না থাকলে অবশ্য ঐ কাজটিও ঠিকভাবে করা যাবে না । লক্ষ করা গেছে যে ধারা মিউজিকাল ফিল্ম-কে 'লঘু প্রকৃতির' ছবি বলে অবজ্ঞা করে থাকেন তাঁরা এর গুণাবলী উপলব্ধি করতে অপারগ । ফলে ধারা এই জাতীয় ছবির আকর্ষণ বোধ করেন না, তাঁদের মনে এই জাতীয় ছবি সম্পর্কে একটা বৈরিতা সৃষ্টি হয়, এবং ক্রমে সেই বৈরিতাকে তাঁরা একটা যুক্তির বনিয়াদ দেন । 'মিউজিকাল বিষয়ে আমাদের গুরুগম্ভীর হয়ে উঠবার কোনো প্রয়োজন নেই । কিন্তু মিউজিকাল-কে তার নিজস্ব শর্তসাপেক্ষ গ্রহণ করলে অল্প যে কোনো ধরনের ছবিতে প্রাপ্য অভিজ্ঞতাকে যতটা মূল্য দেওয়া যায়, মিউজিকাল-এর অভিজ্ঞতাকে ঠিক ততটাই মূল্য দেওয়া যায়—এই কথাটা অস্বীকার করার আগে যেন আমরা একটু ভালো করে ভেবে নিই ।' কথাটা, জে. আর. টেলরের ।

তাহলে মিউজিকাল ফিল্ম-এর গুণাবলী কী ? প্রধানত তা কর্ম বা রূপরীতি-গত । সব শিল্পের মধ্যেই সংগীতাত্মিনুখী এক প্রবণতা বর্তমান । শিল্প হিসেবে সিনেমার মধ্যে নিহিত সংগীতাত্মিনুখী এই প্রবণতার দাবি মেটায় মিউজিকাল ফিল্ম । কিন্তু মিউজিকাল হতে গেলে ছবিতে শুধু নাচগান থাকলেই হয় না, তাদের সংখ্যা যত বেশিই হোক না কেন । 'মিউজিকাল' হতে গেলে ছবিকে নাটকাত্মিত সিনেমার মতো গল্প ধরে চললে চলবে না, বা সাহিত্যাত্মিত তথা উপগ্হাসাত্মিত ছবির মতো কথার উপর নির্ভর করলেও চলবে না । তাকে পুরোপুরি নির্ভর করতে হবে কেবলমাত্র সংগীতের উপর । অর্থাৎ এই জাতীয় ছবিতে যা-কিছু থাকবে সবই চলবে স্বরলিপি ধরে । এমনকি যখন নাচ আসবে, তাও নাচের খাতিরে আসবে

না, আসবে বিকাশমান সাংগীতিক বিস্তারের সম্পূরক দৃষ্টিভঙ্গির অঙ্গ রূপে। গানের কথা, ফ্রেমের মধ্যে কুশীলবদের চলাফেরা, এবং বিশেষত ক্যামেরার মড়াচড়া ও অবস্থান নির্ধারণ এবং সম্পাদনার গতি, সবকিছুকেই এই শর্ত যেনে চলতে হবে। গল্পটি ভাবগম্বীর হোক (যেমন 'ওয়েস্ট সাইড স্টোরি'), আর নিতান্তই যুক্তিবিরহিত হোক (যেমন 'সিংগিং ইন দ রেন'), তাতে কিছু আসে যায় না।

সবাক চলচ্চিত্রের ইতিহাসে মিউজিকাল-এর স্থান স্বপ্রকট। এই ইতিহাসের কিছু অরণীয় মুহূর্ত সৃষ্টি হয়েছে ছবিতে গীতধ্বনির সংযোজনে। সেই মুহূর্তগুলিকে আমরা শিল্প, আবির্ভাব বা মামুলি, যাই বলি না কেন, তাতে কিছু ইতরবিশেষ ঘটে না।

ছবির এই বিশেষ জাতটি নানা উত্থানপতনের ভিত্তর দিয়ে গিয়েছে। সময়ে সময়ে জনপ্রিয়তা হারালেও এ-জাতীয় ছবি বারবারই নতুন ও মনোমুগ্ধকর কিছু প্রবর্তন করে আবার দর্শকদের টেনে এনেছে। প্রথম স-গীত ছবি 'দ জ্যাজ সিঙ্গার' (১৯২৭)-এর পর প্রথম যে ছবিটি মিউজিকাল-এর কাছাকাছি বিবেচিত হতে পারে তার নাম 'দ ব্রডওয়ে মেলডি' (১৯২৯); এর জন্ম একটি বিশেষ সুর রচিত হয়েছিল। পরবর্তী কয়েক বছর বহু ছবিই গানে ভরে দেওয়া হয়, গানের ভাবে দর্শকসাধারণ অচিরেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন। কল্পনাবোধসম্পন্ন পরিচালক বাগবি বার্কলি-র ছবি 'ফরটি-সেকও ষ্ট্রিট' (১৯৩৩) এই জাতের ছবিতে নতুন প্রাণ সঞ্চার করে, এবং এমন একটি ফরমুলা বা ছক তৈরি করে যা বেশ অনেক বছর জুড়েই টিকে থাকে। নাটকীয়তা সম্পূর্ণ পরিহার না করেও নাটকের চেয়ে বড়ো মাপের অভিজ্ঞতা পরিবেশন, ভালো গায়ক-গায়িকা, ভালো মৌলিক গান, একটি দুর্ধর্ষ পুরুষ, কয়েকটি মজার চরিত্র, ডজন ডজন সুন্দরী, তরুণ তরুণীর প্রথম সাক্ষাৎ থেকে প্রেমের উত্তরণ অবলম্বন করে শিথিলবিচলিত কাহিনী এই জাতীয় ছবির লক্ষণ হয়ে দাঁড়াল। অতঃপর বিশেষ কয়েকজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব মিউজিকাল-এর বিকাশকে প্রভাবিত করে। এই পর্যায়ের আদিপুরুষদের মধ্যে অস্বতম হলেন বিগ ক্রসবি (১৯০১-৭৭) — 'জনপ্রিয় সংগীতের ইতিহাসে সম্ভবত সবচেয়ে আদৃত বিনোদনশিল্পী'। 'কিঙ অফ জ্যাজ' (১৯৩০) থেকে শুরু করে 'রবিন অ্যাণ্ড দ সেভেন হুড্‌স্' (১৯৬৪) পর্যন্ত তিনি প্রায় ষাটটি মিউজিকাল-এ অভিনয় করেছেন, এবং 'জুনিং'-কে জনপ্রিয় করে তোলেন। জে. স্প্রিংগার-এর মতে 'ক্রসবি যা করেছেন তা হলো গানের কথা ও সুরের দিকে দৃষ্টি রেখে বু-বু-বু করে কিছু গলার খেলা দেখিয়েছেন,

বেপরোয়া স্বাস্থ্যের মেজাজে'। কিন্তু এই শ্রেণীর মহতম ব্যক্তি ফ্রেড অ্যাসটোর ( ১৮৯৯-১৯৮৩ )। তিনি ছিলেন একাধারে 'নৃত্যশিল্পী, গায়ক, স্বরকার, লেখক, নৃত্যরচয়িতা এবং হলিউডের সর্বপ্রদেশে কীর্তিমান প্রতিভা' ( জে. আর. টেলর )। জিনজার রজার্স, রিটা হেগ্গর্থ, সিড চ্যারিস, জেন পাওয়ার, জীন কেলি, ফ্র্যাংক সিনাট্রা প্রমুখ বহু মিউজিকাল-শিল্পীই তাঁর কাছে শ্বণী। ফ্রেড অ্যাসটোর প্রথম ছবিতে নামেন ১৯৩৩ সালে, উনসত্তর বছর বয়সে 'ফিনিয়ান্জ্ রেনবো' ( ১৯৬৮ ) ছবিতে অভিনয় করেছেন। আর্থার নাইট এই শেখোক্ত ছবিতে তাঁর অভিনয় সম্পর্কে লিখেছেন : 'ফিনিয়ান-এর ভূমিকায় ফ্রেড অ্যাসটোর...সর্বদাং সহজ ও সাবলীল, প্রয়োজনতিরিক্ত কিছু কখনোই করেন না, যা দেয় তার চেয়ে এতটুকু কম দেন না। শেষ শট-এ তিনি যখন নাচতে নাচতে দিগন্তের দিকে চলে যান তার মধ্যে পাওয়া যায় চ্যাপলিনের অরূপ কোনো ফেড-আউট-এর অন্তর্বেদনা — আর সঙ্গে সঙ্গেই আশ্বাসও মিলে যায় যে আসলে তা নয়। তার কালের মধ্যে নিজেকে বেঁধে এবং সবকিছুই অত্যন্ত চমৎকারভাবে সম্পন্ন করে 'ফিনিয়ান্জ্ রেনবো' কালজয়ী হয়েছে। অ্যাসটোর-এর মতোই ছবিটিও যেন অক্ষর।'

মিউজিকাল-এর ভবিষ্যৎ কী, এবিষয়ে চিন্তা করে জে. আর. টেলর লিখেছেন : 'যদি একজন নতুন পরিচালক, একজন তরুণ পরিচালক বহু বছরের মধ্যে সবচেয়ে কল্পনাসমৃদ্ধ, সবচেয়ে মুক্ত, সবচেয়ে প্রাণবন্ত ফিল্ম মিউজিকালটি আজ তৈরি করতে পারেন, যেমন ফ্রানসিস ফোর্ড কপোলা করেছেন 'ফিনিয়ান্জ্ রেনবো'-তে—তবে তো আমরা ভরসা রাখতেই পারি। এখনো তিরিশের কোঠায় ধীর বয়স, গদার থেকে লেস্টার পর্যন্ত চিত্র-নির্মাণের যাবতীয় অভিনব প্রয়োগকৌশলে যিনি সিদ্ধহস্ত, এমন এক নতুন পরিচালককে যখন নবযুগের স্রষ্টার ভূমিকায় দেখি, তখনই আবার লক্ষ করি, যেখানে গুরু হয়েছিল আবার সেখানেই ফিরে এসেছি, সেই মহান, মৃত্যুহীন, একক ও অদ্বিতীয় ফ্রেড অ্যাসটোর-এর কাছেই; এই যোগাযোগের মধ্যে যেন একটা অদ্ভুত সংগতি আছে।'

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : জে. আর. টেলর-এর দ হলিউড মিউজিকাল ।

গান্ত' র্নোবের্জ

॥ মিকসিং ॥

মিকসিং দৃশ্যগত ও শব্দগত দুভাবে হতে পারে। দৃশ্যগতভাবে মিকসিং হলো বিলীমমান দৃশ্যের অংশ থেকে আরেকটি নতুন দৃশ্যের প্রকাশ। পূর্ববর্তী দৃশ্যের

বিলোপ ও পরবর্তী দৃশ্যের উদ্ভাসের মধ্যে ক্ষণকালের জ্ঞান একাধিক ইমেজের ওভারল্যাপিং হয়ে থাকে। ডিজলভ ( ড্র. )-এর সঙ্গে এর সুস্বপ্ন পার্থক্য রয়েছে। শব্দের ক্ষেত্রে মিকসিং হলো ছবির সংলাপ, সংগীত, আবহ ও ধ্বনি, প্রভৃতির বিভিন্ন ম্যাগনেটিক সাউণ্ড ট্র্যাককে একত্র করে ছবির একটি ও চূড়ান্ত সাউণ্ড ট্র্যাক প্রস্তুতি। এই পদ্ধতিকে রিরেকডিংও বলা হয়ে থাকে ( ড্র. সম্পাদনা )। উভয় মিকসিং অপটিক্যাল পদ্ধতিতে করা হয়।

॥ কেন্জি মিজোগুচি ॥

( ১৮৯৮-১৯৫৬, জাপান )। জাপানী চলচ্চিত্রের ধ্রুপদী শিল্পীদের সৃষ্টিতে নন্দন-তন্ময়ের ধর্ম (religion of estheticism) ও নৈতিক জ্যামিতির চেতনা (sense of moral geometry) সম্পর্কে অনেকেই সচেতন। ঐতিহ্যপূর্ণ এই সংস্কৃতি যুগ যুগ ধরে বিশ্বাস, ভাবনা, ও কর্মপদ্ধতির যে রূপ শিল্পে তুলে ধরেছে তা দৈনন্দিন জীবনের বহু কুশ্রীতা ও মালিগ্নের মধ্য থেকে সৌন্দর্যকে তুলে এনে তাঁর স্ততি করে। জোনান্ড রিচি জাপানী পরিচালকদের মধ্যে ওজুকেকে সবচেয়ে ডাইনে ( সনাতনী অর্থে ) ও কুরোশাওয়াকে সবচেয়ে বামে ( আধুনিক অর্থে ) স্থান দিয়েছেন। এই রেখা বরাবর মিজোগুচি সম্ভবত মাঝখানে পড়বেন, কেননা তাঁর ছবিতে এই গুণ দুটির উভয়ই আছে, দুই চরম পর্যায়। বিশেষত তাঁর যুদ্ধ-উত্তর ছবিতে সনাতনী ধারণা ও আধুনিক ব্যক্তি মানসের বিরল ও স্বয়ং সংমিশ্রণ ঘটেছে। একদিকে সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ ও পারিবারিক গুরুত্বের স্বীকৃতি, সংযম ও অধীনতার কাছে সানন্দ নতি স্বীকার; অন্যদিকে সংযম বিষয়ে অসহিষ্ণুতা, সনাতনী মূল্যবোধের সমালোচনা, বাধা অতিক্রমের আনন্দ, জীবন ও অভিজ্ঞতার পরিধি-বিস্তার। কুরোশাওয়া নিজেই স্বীকার করেন, 'তাঁর প্রতি আমার আকর্ষণ, এটা নস্টালজিয়া হতে পারে—যাই হোক না কেন আমিও তো জাপানী...যে জগৎ তিনি সৃষ্টি করেন তা বিস্ময় ভাবে জাপানী...আর মাহুঘের প্রতি তাঁর সত্যিই টান আছে।'

১৯২৩-এর নির্বাচ যুগ থেকে ছবি তৈরি শুরু করে মিজোগুচি সারা জীবনে ৮৮টি ছবি সম্পূর্ণ করেন, কিন্তু ৫২র আগে, যখন ভেনিসে তাঁর 'লাইফ অব ও-হারু' দেখানো হয়, আন্তর্জাতিক স্তরে তাঁর সঠিক পরিচিতি লাভ ঘটেনি। জীবনের শেষ চার বছর মূলত পাশ্চাত্য থেকে তিনি একটির পর একটি সেরা পুরস্কার লাভ করেন, হয়ে ওঠেন কাইয়ে-সমালোচকদের অগ্রতম আকর্ষণ, তাঁকে নিয়ে কাইয়ের

ছবি বিশেষ সংখ্যা বেরায়। সাধারণ ভাবে ছবির বিষয়বস্তু দিয়ে পরিচালককে নির্দিষ্ট শ্রেণীভুক্ত করা ঠিক নয়, বিষয়বস্তু নির্বাচনের ওপর বহু পরিচালককে কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। কিন্তু সেরা জাপানী পরিচালকদের মতো মিজোগুচি ক্ষেত্রেও ছবির বিষয়বস্তু পরিচালকের ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশক। মূলতঃ একজন লেখকের লেখা থেকেই তিনি বিষয় নির্বাচন করেছেন—Yoda Yoshikata, দুজনের এই জুটি পারস্পরিক সমঝোতায় ডাডলি নিকলস ও জন ফোর্ড বা নোদা ও ওজুর সমতুল্য।

কলাকৌশলের প্রদর্শনপ্রিয়তা দিয়ে যদি সিনেমার আধুনিকতা মাপা হয় তবে মিজোগুচি প্রাচীনপন্থী, কেননা তিনি সাহিত্যমুখী ও চিত্রশিল্পীস্বভাব। তিনি ক্যামেরার মাধ্যমে ভাববার বদলে চরিত্রের মাধ্যমে ভেবেছেন, চিত্রগতভাবে সন্দর করে তাঁর দৃশ্য গড়েছেন। রূপদক্ষতায় সাবলীল তাঁর ছবির কথা মনে এলে প্রথমেই মনে পড়ে বিশ্বয়কর ভাবে সন্দর কিছু স্থিরচিত্রের কথা : উগেৎসুতে লনের ওপর পিকনিক, এ স্টোরি ফ্রম চিকানাৎসুতে নোকোদৃশ্য, Sansho the Bailiff-য়ে কে. তানাকা যেখানে তার শিশু সন্তানদের খুঁজে যাচ্ছে, দি লাইফ অফ ও-হারুতে বয়স্ক বেছাটি যখন রোদে বসে আছে। তিনি নিজেও পুরনো চণ্ডেই সিনেমার কথা ভাবতেন, প্রসারিত পর্দা অপছন্দ করতেন, চারুকলাস্বভাব অনুপাত চাইতেন পর্দার, চলচ্চিত্রকে উল্লেখ করতেন shashin নামে। আবার এরই সঙ্গে ছবির পরিবেশ তৈরি করার জন্ম ( তাঁর কাছে যথাযথ পরিবেশই ছিল ছবির প্রাণ ) তিনি সবচেয়ে পরীক্ষামূলক পদ্ধতির আশ্রয় নিতেও পিছপা হতেন না। পরিচালক জীবনের আগাগোড়া তিনি একটি দৃশ্য—একটি শট রীতি অনুসরণ করেছেন, যা পুরোপুরি প্রাচীনপন্থী, গ্রিফিথ যা প্রথম জীবনেই পরিত্যাগ করেন, মিজোগুচি ও ওজুর হাতে তা আউ গার্ডের মর্যাদা পায়। সরলতম বলে মিজোগুচির শিল্প জটিলতম। সেখানে ক্যামেরা এফেক্ট ও ট্র্যাকিং শট প্রায় নেই, কিন্তু কোনো দৃশ্যে তারা যখন আকস্মিক প্রযুক্ত হয় তখন তার ফল হয়ে ওঠে ধাঁধানো সৌন্দর্য। ত্রেন শট হয়ে ওঠে Hokusai-এর তুলির টান। এই ভাবে তাঁর ছবিতে পরিবেশ তৈরি হয়, তৈরি হয় এই অনুভব যে ওই জগৎ যেন বাস্তব। এই পরিবেশ অনেক সময় অপার্থিব বা অলৌকিক হয়েও স্বাভাবিক এবং লোকায়ত। তাঁর আর একটি প্রিয় কৌশল হলো লং শটে, ক্যামেরা থেকে অনেক দূরে, অ্যাকশনকে সংহত করা। একটি দৃশ্য—একটি শট, লং শট, ও ক্যামেরা মুভমেন্টের প্রচলিত পদ্ধতি তাঁর হাতে চরম প্রয়োগ ও উত্তেজক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এক ধরনের নতুনস্বই হয়ে

ওঠে। ক্যামেরা মুভমেন্টের ক্ষেত্রে এর সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত সম্ভবত উগেৎসু-র শেষ দৃশ্য। এখানেই তাঁর নিজস্বতা যে একটি পরিচিত কৌশল, পরিবেশ ও মুড তৈরির অল্প ক্যামেরা মুভমেন্টের ব্যবহার, এতখানি স্বাধীনতা ও দ্বঃসাহসের সঙ্গে ব্যবহৃত। মিজোগুচি কোনো টেকনিক আবিষ্কার করেননি কিন্তু (কুরোশাওয়া ও সত্যজিৎ-ও তাই) প্রচলিত টেকনিককেই তিনি চূড়ান্ত সমৃদ্ধি দিয়েছেন।

দিনেমায়া আসার আগে তিনি চিত্রকলা নিয়ে পড়াশুনো করেন। প্রিয় চিত্র-শিল্পী উতামারোর মতো তিনিও নারীকে বিষয়বস্তু করে সৃষ্টিতে আগ্রহী ছিলেন। তাঁর প্রধান থীম—পুরুষ প্রধান সমাজে নারী, নারীর স্থান (যদি কিছু থাকে), পুরুষ থেকে তার স্বাভাবিক, পুরুষের সাথে তার সম্পর্ক, নারী ও প্রেমের মধ্যকার জটিল সম্পর্ক। উগেৎসু (যার জন্মে তাঁকে গদার গ্রিফিথ, আইজেনস্টাইন ও রেনোয়ার সমতুল্য বলেছিলেন)-তে তাঁর এই থীমের সবচেয়ে সম্পন্ন প্রকাশ ঘটেছে। ছবির দুই নায়িকা—কুমোরের বোঁ ও হন্দরী প্রাসাদকর্ত্রী, তাঁর থীমের দুই চরম বিন্দুর ধারক, যে থীম বিগ্গ ও পবিত্র ভালোবাসার চেয়ে বেশি কিছু, তা হৃদয় ও মিত এক আয়রনি যে দুই নারীই—বিশ্বস্তা ও প্রেমিকা স্ত্রী এবং প্রাসাদবাসী আত্মা—মারা গেল প্রেমাকৃতি ও ভালোবাসার প্রয়োজনে। এই সমান্তরাল উপস্থাপনাই তাঁর কাছে আগ্রহের। অত্যাশ্চর্য ছবিতে থীমের যে কোনো একটি চরম বিন্দুর ওপর জোর পড়েছে। মিজোগুচির অধিকাংশ ছবির কাহিনী-কাল Edo যুগ (১৬১৫-১৮৬৮), এই সময়েই জাপানী নন্দনতত্ত্বের বিশিষ্ট হৃদয়গুলি আত্মপ্রকাশ করে। সরল হন্দর ও মিত কথনের ওপর জোর পড়ে। তাঁর পিরিয়ড ছবিতে নো ও কাবুকি নাট্যের ধ্রুপদী সংবিধানের প্রভাব পড়েছে। বলা হয়, মিজোগুচির শিল্প এই কথাই প্রমাণ করতে চায় যে আসল জীবন অল্প কোথাও, অল্প কোনোখানে, আর তবু একই সময়ে একই সঙ্গে তা এখানেও। তাঁর বেশ কিছু ছবি প্রথাগত বন্ধন থেকে মুক্তির ছবি, যার পেছনে জেনবাদের প্রভাবও লক্ষ করা যায়। তাঁর বিশ্বয়কর ও বিকীর্ণ দৌন্দর্ঘ্যের চেতনা, বিগ্গের ধারণা, শৃঙ্খলার নিয়ম হ্রাসে তাঁর সমকাল থেকেই উদ্ভূত। তিনি যখন প্রাচীন জাপানকে তুলে ধরেন তা ধরেন অবিকৃত সত্যে, অনিবার্য দক্ষতায়। মধ্যযুগকে আর কখনো আমরা নিজের চোখে পরিবেশের এই রকম তীব্রতা নিয়ে পুনর্নির্মিত হতে দেখিনি। কুরোশাওয়া ঠিকই বলেছিলেন, 'মাহুয়ের প্রতি তাঁর সত্যিই আগ্রহ আছে'। তিনি মানবিক গভীরতা ও চিরকালীন স্বন্দকে রূপ দিতে গিয়ে পুরনো সময় ও পরিবেশকে আধুনিক মাহুয়ের বিভিন্ন প্রদঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন। অতীত ও

বর্তমানের মধ্যে এই স্ক্রু ও প্রতীকী যোগসূত্র (বারাবাহিকতা) এবং প্রকাশ  
আর মাহুষের মধ্যে এক অভীক্ষিত বিস্তার দর্শকের নজর এড়ায় না।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : A. Iwazaki-র কেনুজি মিজোওচি ।

দিলীপ মুখোপাধ্যায় ॥

[ তাঁর আর একটি ছবি : তায়রা ক্ল্যান সাগা। একই কাঠামোর মধ্যে ৩০০  
সময় ছবি ধরে রাখা, অভিনয়ও চড়া পর্দার—সব মিলিয়ে এক ধরনের নাটকীয়তা  
আছে দৃশ্যগুলোর মধ্যে। মধ্যযুগের পটভূমিতে ক্ষমতাবান সামুরাই আর সংস্কার  
দৃশ্য ছবির একটা দিক, কিন্তু এর চেয়েও বড়ো আরেকটা দিক আছে, যা হয়তো  
আমাদের দর্শকের অনেকেরই চোখ এড়িয়ে যাবে, আর সেখানেই ছবিটির আপন  
জাপানিত্ব। তায়রা বংশের ছেলে এই বংশমর্যাদাকে মই হিসাবে ব্যবহার করতে  
চায় না, আবার সে এ বংশের ছেলে নয় জানতে পেরে ক্ষুব্ধ হয়। ছেলে জানতে  
পারে বাবা তার প্রকৃত বাবা নয়, কিন্তু সেই প্রতীক পিতৃস্বের জন্ত জীবন পণ  
করে; আর বাবাও সেই প্রতীক বাৎসল্যের জন্ত তাঁর মর্যাদা খুইয়ে আনেন।  
ছেলে দুটো অমোঘ তীরে সংঘের পবিত্র দোলায় রক্ষিত পিতৃপুরুষদের আশ্রয়  
আধারটিকে ফুটো করে দেওয়ার সাহস রাখে, আর পর মুহূর্তেই তার সেই বাবার  
সমাধির পাশে নতজানু হয়ে সাহস চায়। এই অন্তর্লীন চাপ কোম বিখ্যাত  
স্ববিরোধী সত্যগুলোকে ধরে রেখেছে। কুরোশাওয়ার ছবির চরিত্রের মতো  
অতীক সাংঘাতিক হাসিতে ফেটে পড়ার চেয়ে ভিন্ন এক জাপানিত্ব।—ব. ভ.]

॥ মিজু-সেন ॥

এটি একটি ফরাসি শব্দ, এর অর্থ 'দৃশ্যে অন্তর্ভুক্তি'। এর মূল উপাদানগুলি হলো  
সেটিং, লাইটিং, পোশাক-পরিচ্ছদ ও প্রধান চরিত্রগুলির আচার-আচরণের ধারা।  
ফিল্ম ফ্রেমে যা দেখানো হচ্ছে তার ওপর পরিচালকের কতটা অধিকার রয়েছে তা  
এর দ্বারা বোঝা যায়। ক্যামেরার সামনে দৃশ্য বা ঘটনাকে নির্দিষ্ট ভাবে সংঘটিত  
করার মধ্য দিয়ে পরিচালক একে নিয়ন্ত্রিত করে থাকেন। মিজুসেন প্রসঙ্গে  
বাস্তবতার কথা আসে। কিন্তু বাস্তববাদী ছবি ছাড়া অল্প ধরনের ছবির জগৎ এই  
কৌশল বা পদ্ধতি সহায়ক। তা বাস্তব ও কল্পনা উভয় ক্ষেত্রেই পরিচালককে  
সাহায্য করতে পারে। স্বতরাং মিজুসেনের কর্মক্ষেত্র ও কর্মপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা  
করা দরকার।

এর অল্পতম উপাদান সেটিং। থিয়েটারের চেয়ে দিনেমায় সেটিং-এর ভূমিকা

অধিক সক্রিয়। তা শুধু অ্যাকশনের ধারক নয়, ছবির গঠনকাঠামোর সবিশেষ ঝংগণও। পরিচালক সেটিংকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত করে ও কাজে লাগিয়ে থাকেন। সেটিং যোটিফ তৈরির কাজেও সাহায্য করে। এইভাবে সেটিং ছবির শুধু ফিজিক্যাল নয়, অর্গ্যানিক উপাদানও।

লাইটিং এর আর একটি উপাদান। আলোকসম্পাত তো শুধু দৃশ্য গ্রহণের জন্য একটা ভৌত উপায় মাত্র নয়, তা ইমেজের অভিঘাত কতটা হবে সেটা ঠিক করে দেয়, কম্পোজিশনকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত করে, সমগ্র ছবির মুড ও সুরকেও প্রভাবিত করতে পারে। মির্জাসেনের উপাদানগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো 'the drama and adventure of light'.

লাইটিং-এর মতো দামগ্রিক না হলেও, সেটিং-এর মতো সূনির্দিষ্ট, ভূমিকা আছে পোশাক-পরিচ্ছদেরও (কস্টিউম)। তা একদিকে চিত্রশৈলীকে প্রভাবিত করে, অন্ডদিকে কোন্ ধারার ছবি সেই অনুসারে নিজে নিয়ন্ত্রিত হয়। কস্টিউমের অংশ বিশেষ প্রপ হয়ে উঠতে পারে এবং তা থেকে উঠে যেতে পারে যোটিফের সুরেও। আর তখন তা ছবির সমগ্র আঙ্গিককেই সমৃদ্ধ করে থাকে।

দৃশ্যে অন্তর্ভুক্ত পাত্র-পাত্রীদের আচার-আচরণকেও নিয়ন্ত্রিত করতে হয় পরিচালককে। এখানে পাত্র-পাত্রী বলতে ব্যক্তি, প্রাণী, বস্তু ও এমনকি বিস্তৃত আকার পর্যন্ত সবকিছুকেই বোঝানো হচ্ছে। আচার-আচরণের মধ্যে পড়ে অভিব্যক্তি (expression) ও গতিবিধি (movement)। তাদের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয় অহুত্ব, রূপ পায় বিশেষ-বিশেষ ভাবধারা। ফলে এই উপাদানটির ক্ষেত্র শেষ-পর্যন্ত বিস্তৃত অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয়শৈলী পর্যন্ত। সমগ্র ছবির পরিপ্রেক্ষিতে কোনো একটি চরিত্রের যে ভূমিকা, চরিত্রাভিনেতাকে অভিনয় করতে হবে সেই ভূমিকার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক—এমন উপায়ে। ফলে অভিনেতা তাঁর অঙ্গসঞ্চালন ও গতিবিধির মধ্য দিয়ে যেমন ছবির গ্রাফিক, তেমনি সার্বিক অভিনয়শৈলীর মধ্য দিয়ে ছবির অর্গ্যানিক, উপাদানও।

বোঝাই যাচ্ছে, মির্জাসেনের প্রধান উপকরণগুলি একক ভাবে ক্রিয়াশীল না হয়ে একত্রে ক্রিয়াশীল ও কার্যকর হয়। তাদের একত্রিত ও সমন্বিত কর্মপদ্ধতি সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য, ঐক্য/অনৈক্য, সংঘাত ও ক্রমবিকাশ—যে-কোনো পদ্ধতিভিত্তিক হতে পারে। বলা বাহুল্য, এইভাবে মির্জাসেন শেষ পর্যন্ত ছবির অঞ্চল স্থানকাল-চেতনা পর্যন্তই বিস্তৃত হয়ে যায়।

অবস্থানান্তরপাত, পরিপ্রেক্ষিত, পুরোভূমি / পশ্চাদ্ভূমি সম্পর্ক এবং কম্পোজি-

শনের রৈখিক উপাদানসমূহের ( যার মধ্যে রঙ ও আলোও অন্তর্ভুক্ত ) মধ্য দিয়ে ইমেজ বা প্রতিমার ও দৃশ্যরূপের স্থানিক গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়। আন কালিক গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে মূলত গুভমেণ্টের দ্বারা। যার মধ্যে পড়ছে দ্রুতি, অভিমুখ, ছন্দ, বর্ণবিচ্ছাস জনিত গতিময়তা, বিবিধ গতির মধ্যবর্তী সম্পর্ক ও সংঘাত, ফ্রেমের ওপর দিয়ে দর্শকের দৃষ্টিপাত জনিত গতিময়তা, ইত্যাদি।

চলচ্চিত্রের যে-কোনো কৌশল বা পদ্ধতির মতো মিজঁসেনেরও অন্তত তিনটি ভূমিকা বা ফাংশন আছে। এর একটি হলো চিত্রগত, দ্বিতীয়টি বর্ণনামূলক, তৃতীয়টি মনস্তাত্ত্বিক বা আবেগগত। স্তত্রাং সব মিলিয়ে, মিজঁসেন, বলা যায়, চলচ্চিত্র-কারের আত্মপ্রকাশের নিজস্ব উপায়-ই। তা ছবির সবকিছুকে চিত্রনির্মািতার প্রয়োজন অনুযায়ী উদ্দেশ্যমূলক ভাবে নিরূপিত করে দিতে পারে। ফলে মিজঁসেনের অর্থ এক কথায় 'চলচ্চিত্রকরণ'-ই হয়ে ওঠে শেষ পর্যন্ত।

গ্রিফিথের পরবর্তীকালে চলচ্চিত্র দুটি মূল ধারায় বিকাশ লাভ করেছে। তার একটা হলো আইজেনস্টাইন প্রমুখর মনতাজনমত সম্পাদনা-প্রধান-পদ্ধতি, অষ্টটা স্ট্রাইইম, ওয়েলস, রেনোয়ার মিজঁসেনচালিত অথও দৃশ্যপর্যায়ের পদ্ধতি। সেদিক দিয়ে দেখলে, মিজঁসেন পদ্ধতি মনতাজ তদের বিরোধী। সেটা স্বাভাবিক, কেননা, 'Mise-en-scene is at bottom a theatrical notion : the film-maker stages an event to be filmed'. অথও দৃশ্যপর্যায় নিয়ে মূল্যবান তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন অঁদ্রে বাজঁ।

ডি. বি.

॥ মিরাকল ইন মিলান ॥

১৯৫১, ইতালি। মিরাকল ইন মিলান আপাতদৃষ্টিতে ফ্যানটাসি। টোটো নামে এক অনাথ কিশোর বস্তির অবর্ণনীয় দুর্দশায় তার দরিদ্র সহবাসীদের কল্যাণে ও ধনতান্ত্রিক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে যে জাহাজিয়া করে সেটাই এই ছবির বিষয়বস্তু। নিও-রিয়ালিজমের আদর্শকে যে নিখাদ বাস্তববাদী বিষয়ে সীমাবদ্ধ না রেখে চূড়ান্ত ফ্যানটাসিতেও প্রয়োগ করা যায় ডে সিকার এই ছবি তারই নিরীক্ষামূলক উদাহরণ। ফ্যানটাসি রঙ্গের অন্তরালে ছবিতে যে বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক প্রসঙ্গ ও ব্যঙ্গাত্মক ইঙ্গিত তাতে কঠোর বাস্তবতার ছোঁয়া রয়েছে। এই ছবি বাস্তব ও কল্পনার, গল্প ও কাব্যের, রুচতা ও সুষমার সুলভ মিশ্রণ। বস্তিবাসীদের রোদ পোহাবার দৃশ্যটি পর্দায় সমবেদনার এক অবিস্মরণীয় চিত্ররূপ ও নীলাম দৃশ্যে

ব্যবসায়ীদের মুখ বাদন করে দর কষাকষি ক্লোজ আপের এক অনবদ্য দৃষ্টান্ত হয়ে  
থাকে।

অভিনয়ে Golisano (টোটো), উপস্থান জাতভিনি, আলোকচিত্র G. R.  
Aldo, সম্পাদনা ই ডি রোমা, সংগীত A. Cicognini।

॥ অশ্লে মুষ্ক ॥

(১৯২১-৬১)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পোল্যান্ডে নব্যরীতির চলচ্চিত্রের  
সূচনা হয়েছিল ভাইদা ও মুষ্ক-য়ের মাধ্যমে। এর ফলে বেশ কয়েকজন নতুন  
পরিচালকের আবির্ভাব হয়, যারা প্রত্যেকেই এক একটা স্বতন্ত্র শিল্প-ব্যক্তিত্ব, কিন্তু  
তাদের আদর্শ মূলত এক, তা হলো মুষ্ক-এর ভাষায়, 'film about Poles for  
Poles'। যুদ্ধের সময়ে ওয়ারশ যখন নাৎসি অধিকৃত ছিল মুষ্ক তখন স্বাধীনতা  
সংগ্রামীদের গুপ্ত সংগঠনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত ছিলেন। যুদ্ধের পর তিনি  
স্থাপত্য, আইন ও অর্থনীতি এবং Lodz ফিল্ম স্কুলে চলচ্চিত্র নিয়ে অধ্যয়ন  
করেন। তথ্যচিত্র নির্মাণের মধ্য দিয়ে তাঁর চিত্রজীবনের সূচনা হয়। দৃশ্যশৈলী  
ও শব্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্ম এই তথ্যচিত্রগুলি উল্লেখযোগ্য। তাঁর  
কাহিনীচিত্র ম্যান অন্ দি ট্র্যাক (৫৬), আয়রনি-প্রধান Eroica (৫৮),  
স্ববিধাবাদ সম্পর্কে তির্যক গবেষণা ব্যাড লাক (৬০) এবং বহুবিখ্যাত দি  
প্যান্ডেঞ্জার (৬৩), পোলিশ জীবনের বিভিন্ন স্তরের তিজ্ঞ-মধুর চিত্রায়ণ ও বিবিধ  
পর্যায়ে সত্যের স্লেষাত্মক অনুসন্ধান। শুধু স্লেষ নয়, তাঁর ছবিতে মনন, কাণ্ট  
বিরোধিতা, পরিমিত ও প্রাজলতারও বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। প্যান্ডেঞ্জার-য়ে  
নাৎসি বন্দীশিবিরের পটভূমি তৈরিতে মুষ্ক কল্পনাত্মক অনুভব ও সঘন্য পরিশ্রমের  
এক চমৎকার সমন্বয় ঘটান। এই ছবিতে দ্ব্যর্থতার এক বিশেষ মাত্রা আরোপিত,  
কিন্তু অস্বাভাবিক ছবির মতো এখানেও তিনি রাজনৈতিক ভাবে কমিটেড। মোটর  
দুর্ঘটনায় তাঁর আকস্মিক মৃত্যু সিবুলস্কির রেল দুর্ঘটনায় মৃত্যুর মতোই অবিখ্যাস্ত,  
আবসাদ।

॥ মুভিঅলা / স্টেইনবেক ॥

মুভিঅলা হলো সম্পাদনার মোটর-চালিত যন্ত্র। এর প্রারম্ভিক প্রচলন হয়  
আমেরিকায়, উদ্দেশ্য ছিল নির্ধারিত চলচ্চিত্র অবলোকন করা। পরবর্তীকালে এই  
যন্ত্রে দৃশ্যের ও শব্দের জন্ম পৃথক পৃথক অপারেশন অন্তর্ভুক্ত হয়ে দৃশ্যের প্রিন্ট ও

শব্দের প্রিন্টকে আলাদা আলাদা ভাবে অথবা লক করে দিয়ে পাশাপাশি " একত্রে synchronously চালানো সম্ভব করে তোলে। মুভিঅলায় দৃশ্যের অপারেশনটি বস্তুতঃ সরলীকৃত এক প্রজেক্টরের অপারেশন, যা দৃশ্যের প্রিন্টের সম্মুখবর্তী ও পশ্চাদভিমুখী গতির যে কোনটিতে চালাতে পারে ও চলার পথের মধ্যবর্তী এক জায়গায় একটি ছোট শাদা পর্দার ওপর প্রতিটি ফ্রেমকে প্রদর্শিত করে যেতে থাকে। শব্দের কোনো একটি নির্দিষ্ট ফ্রেমকে যদি চিহ্নিত করতে হয় কাটিং, অপটিকাল এক্ফট বা সাউণ্ড সিনক্রোনাইজেশনের জন্ম তাহলে মুভিঅলাকে তৎক্ষণাৎ থামাতে এই যন্ত্রে ব্রেকের মতো ব্যবস্থা আছে যা মুভিঅলার গতিকে নিয়ন্ত্রিতও করতে পারে। বিশেষ দেই ফ্রেমটিকে এই যন্ত্রে চিহ্নিত করে নেওয়া হয় ও তারপর ওই শটটিকে যন্ত্র থেকে বের করে নিয়ে অন্ড্র কাটিং করা হয়। শব্দের অপারেশনে শব্দের চৌম্বক ট্র্যাক নিয়ে একইভাবে কাজ করা হয়। পৃথক পৃথক ও বিভিন্ন শটকে সম্পাদনার মাধ্যমে সংযুক্ত করে করে ছবি যখন সূদীর্ঘ ও প্রায় সমাপ্ত হয়ে ওঠে তখন মুভিঅলায় ছবি দেখার সময়ে সশব্দ চিত্র দুটি ফিড রীল থেকে এসে ছোট শাদা পর্দায় প্রক্ষিপ্ত হয়ে দুটি টেক-আপ রীলে জমা পড়ে। মুভিঅলা এডিটিং রুমের অপরিহার্য যন্ত্র যা সাম্প্রতিক কালে উন্নততর মানের ও আরও সুযোগ স্ববিধা সমন্বিত হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে আছে ছবির বৃহদাকার প্রজেকশন, শব্দের নিখুঁত রিপ্ৰোডাকশন ও বৃহত্তর সম্পাদকীয় সমন্বয়। মুভিঅলার পরিবর্তে যে-সকল যন্ত্রের ব্যবহার করে সম্পাদনার কাজ করা যায় সেগুলির মধ্যে স্টেনবেক, এডিসিংক বা পিকসিংক নামক যন্ত্রগুলি আধুনিক। এই যন্ত্রগুলিতে বিশেষ স্ববিধে এই যে, একসঙ্গে দুটি বা তিনটি সাউণ্ড ট্র্যাক সমান্তরাল ভাবে সংযুক্ত বা বিযুক্ত করে চালানো যায়। মুভিঅলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি সাউণ্ড ট্র্যাকেরই ব্যবস্থা থাকে। মুভিঅলার মতো পিকসিংক বা এডিসিংকে ছবির পর্দা ছোট। স্টেনবেক-এ ছবির পর্দা অনেক বড়ো, প্রায় একটা টিভির পর্দার মতো।

॥ ফ্রিড্‌রিখ হিলহেল্ম্‌ মুরনাউ ॥

( ১৮৮৯-১৯৩১ ), জার্মান চলচ্চিত্র পরিচালক। শিল্পতত্ত্বের ইতিহাস, সংগীত ও দর্শন নিয়ে পড়াশুনো করেছিলেন। বিখ্যাত নাট্য পরিচালক মাক্স রাইনহার্ট-এর কাছে অভিনেতা হিসেবে কাজ করেছিলেন। চলচ্চিত্রের জগতে আসেন প্রথমে স্মাইংজারল্যাণ্ডের জার্মান দূতাবাসের হয়ে প্রচার চিত্র করতে গিয়ে। প্রথম ছবি 'স্টাটানাস' ( ১৯১৯ )। দ্বিতীয় ছবি 'স্মাইলস্‌কফ্‌' ( ১৯২০ ), ডক্টর জেকিল অ্যাণ্ড

ধিস্টার হাইডের কাহিনী অবলম্বনে তোলা। তাঁর তৃতীয় ছবি 'প্লোস্ ফোগেলয়েড' (১৯২১)। তাঁর প্রথম তিনটি ছবিতে, বিশেষ করে 'প্লোস্ ফোগেলয়েড' ছবিতে, বাস্তব এবং অতিপ্রাকৃতের মেলবন্ধন ঘটানোর অসাধারণ ক্ষমতা প্রমাণিত। এরপর বাস্তব জীবনকে ভিত্তি করে 'বেনেগোর আঙ্কার' (১৯২২) ছবিটি। এই ছবিতে মুরনাউ ক্লোজ আপ ব্যবহার করেছেন অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে। দীর্ঘ সময় নিয়ে ক্যামেরা ধরে রেখেছেন অভিনেতা অভিনেত্রীদের মুখের উপর, চরিত্র-গুলির মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের অভিঘাতকে চিত্রিত করতে। এই বছরই, মুরনাউ ব্রাম্ স্টোকারের ড্রাকুলা কাহিনী অবলম্বনে 'নোসফেরাটু, আইনে সিনফোনী দেস্ গ্রাউয়েনস্' (১৯২২/২৩) ছবিটি করেন। এই ছবিটি মুরনাউকে বিশ্বচলচ্চিত্রের অগ্ণতম শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান এনে দিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে বিখ্যাত চলচ্চিত্র সমালোচক লটে আইজনার মুরনাউকে জার্মানির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার আখ্যা দিয়েছেন। হ্যোরনার হ্যারৎজোগ মুরনাউ-এর 'নোসফেরাটু'কে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী জার্মান চলচ্চিত্রের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম চলচ্চিত্র হিসেবে অভিহিত করেছেন। ১৯৭৯ সনে তিনি মুরনাউ-এর স্মৃতির সম্মানে 'নোসফেরাটু'-র আরেকটি সংস্করণ তোলেন। মুরনাউ-এর 'নোসফেরাটু'-কে সত্যজিৎ রায় অভিহিত করেছেন অসাধারণ শিল্প-কর্ম হিসেবে।

মুরনাউ এর পর অতি প্রাকৃতের জগৎ থেকে সরে এদে সাধারণ মানুষের জীবন থেকে নেওয়া ঘটনা নিয়ে 'ডেয়ার লেংজ্ টে মান্' (১৯২৪) ছবিটি করলেন। এই ছবিটিতে মুরনাউ-এর সহযোগী হিসেবে কাজ করেছিলেন চিত্রনাট্যকার কার্ল মায়ার এবং আলোকচিত্রশিল্পী কার্ল ফ্রয়েণ্ড। বিখ্যাত অভিনেতা এমিল য়ানিংস্ এই ছবিতে নায়কের ভূমিকাতে অভিনয় করেন। জিগ্ ফ্রীড্ ক্রাকাউয়ার 'ডেয়ার লেংজ্ টে মান্' ছবিটিকে অসাধারণ শক্তিশালী ছবি হিসেবে অভিহিত করেছেন। চিত্রনাট্যকার কার্ল মায়ার 'কান্নারস্পীল-ফিল্ম'-এর যে ধারার প্রবর্তন করেছিলেন চলচ্চিত্রে, যে ধারায় অপেক্ষাকৃত অল্প কয়েকটি চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক ও তার দৃশ্যকে তুলে ধরার উপর জোর দেওয়া হোত, সেই ধারার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছবি 'ডেয়ার লেংজ্ টে মান্'। এক অভিজাত হোটেলের বৃদ্ধ দ্বাররক্ষীর ভাগ্যের উত্থান, পতন ও পুনরুত্থান-এর অপরূপ মানসিক কাহিনীর চিত্ররূপ এই ছবিটি। জার্মান চলচ্চিত্রের তদানীন্তন ইতিহাসে ক্যামেরার এমন গতিময় ব্যবহার আর কোনো ছবিতেই করা হয়নি। সমস্ত ছবিতে সাব-টাইটল অতি সংক্ষিপ্ত কিন্তু প্রতিটি শট বাস্তব হয়ে উঠেছে ভিসুয়ালের নিপুণ ব্যবহারে। 'নোসফেরাটু'-তে

মুরনাউ যে প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতি পেয়েছিলেন তা আরো অনেক বেশি ছড়িয়ে পড়ণ এই ছবির পর। বস্তুত: জর্মন চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগে এমন উজ্জ্বল মানবিক ছবি বিরল।

মুরনাউ জার্মানিতে এর পর মলিয়ের-এর নাটকের কাহিনী অবলম্বনে 'তারতুয়ান' ( ১৯২৫ ) এবং গ্যোটে-র ফাউস্টের কাহিনী অবলম্বনে 'ফাউস্ট' ( ১৯২৬ ) ছবি দ্বিটি করেন। চলচ্চিত্র সমালোচকদের মতে এই দ্বিটি ছবির কোনোটিই মুরনাউ-এর অসাধারণ প্রতিভার সাক্ষ্য দেয় না।

উইলিয়াম ফক্সের আস্থানে মুরনাউ হলিউডে এসে ১৯২৭ সনে 'সানরাইজ' ছবিটি করেন। এই ছবির চিত্রনাট্য লিখেছিলেন কার্ল মায়ার। বিশেষ শিল্পগুণের জন্ম এই ছবিটি অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেয়েছিল। আলোকচিত্রের কাজের জন্ম এই ছবির আলোকচিত্রী হুজ্ঞনও পুরস্কার পেয়েছিলেন। এই ছবিটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে 'লাইফ' পত্রিকা লিখেছিল 'বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাসে অল্পতম শ্রেষ্ঠ ছবি'। ব্যবসায়িক ভাবে অবশ্য ছবিটি অসার্থক হয়েছিলো। এই ছবির পর মুরনাউ হলিউডে প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মধ্যে 'ফোর ডেভিলস্' ( ১৯২৮ ) এবং 'আওয়ার ডেলী ব্রেড' ('সিটি গার্ল' নামে মুক্তি পেয়েছিল, ১৯২৯/৩০) ছবি দ্বিটি করেন। ছবি দ্বিটিতে মুক্তির আগে শব্দ সংযোজন করা হয়েছিল ব্যবসায়িক দিকের কথা চিন্তা করে। কিন্তু তাড়াতাড়িতে শব্দ সংযোজন করতে গিয়ে ফল হয়ে দাঁড়ায় বিপরীত।

১৯২৮ সনে মুরনাউ রবার্ট ফ্ল্যাহার্টির সঙ্গে একযোগে একটি চলচ্চিত্র প্রযোজনা সংস্থা গড়ে তোলেন। 'মোয়ানার' পর ফ্ল্যাহার্টি আবার একটি ছবি করার কথা ভাবছিলেন দক্ষিণ সামুদ্রিক অঞ্চলের জীবনের উপর। 'টারু' ছবির পরিকল্পনা করে হুজ্ঞনে কাজে হাত দিলেন, কিন্তু ১৯৩০ সনে হুজ্ঞনের মধ্যে মত পার্থক্য এমন অবস্থায় পৌঁছোল যে রবার্ট ফ্ল্যাহার্টি এই সংস্থা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। 'টারু' ছবিটি মুক্তি পাবার ( ১৯৩১ ) এক সপ্তাহ আগে মোটর দ্রুঘটনায় মুরনাউ মারা যান। [ বিশেষ দশকের জর্মন পরিচালক দলের অন্তর্গত মুরনাউ তৎকালীন জর্মন ধারা অনুসারে বক্তব্যকে মূলত পরোক্ষভাবে উপস্থিত করতেন। বাস্তবের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল শারীর বাস্তবতার প্রেক্ষিতে বাস্তবমায়ী সৃষ্টিতে ও মনো-জাগতিক বাস্তবতার প্রেক্ষিতে মান্নার বাস্তব সৃষ্টিতে। চলচ্চিত্রভাষার দিক দিয়ে দেখলে অল্প শটের ব্যবহার হতো, শৈলী ছিল মোটর ওপর বিশ্লেষণাত্মক। ]

প্রাদক্ষিক গ্রন্থ : L. H. Eisner-এর মুরনাউ।

ব্রজজিৎ রায়

## ॥ মুণাল সেন ॥

বয়স ১৪ মে, ১৯২৩। ফিজিওলের ছাত্র। অধ্যয়ন শেষ করে জীবিকার সন্ধানে ছিলেন। সাউণ্ড রেকর্ডিং-এর কাজ শিখতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু সিনেমার প্রতি কোনো আগ্রহ ছিল না। চলচ্চিত্রের প্রতি প্রথম তাৎক্ষিক আগ্রহ জন্মে রুডলফ আর্নহেইম-এর ফিল্ম ইসথেটিক্স ও আইজেনস্টাইনের শিষ্য নীলসেনের সিনেমা অ্যান্ড এ গ্রাফিক আর্ট নামক বইগুলি পড়ে।

বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কিন্তু কখনো কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হননি। ফিল্ম সোসাইটিতে ছবি দেখতেন। কিন্তু ফিল্ম সোসাইটির সদস্য হতে পারেননি আর্থিক সমস্যার কারণে। চলচ্চিত্র বিষয়ে তাৎক্ষিক ও গবেষণামূলক লেখা লিখতে শুরু করেছিলেন চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করার আগেই।

১৯৫৫-তে নির্মাণ করেন তাঁর প্রথম ছবি, কাহিনীচিত্র, রাতভোর। ছবিটি ব্যর্থ হয়েছিল। এই ছবি সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন, অত্যন্ত জঘন্য ছবি।

১৯৫৯—নীল আকাশের নীচে। ছবির মূলে ছিল এক আন্তর্জাতিক আত্মীয়তাবোধের ইংগিত। এক চীনা ফেরিওয়ালার তার কুটি-কুজির সংগ্রাম চালাতে গিয়ে, তার অস্তিত্বের লড়াইয়ের সঙ্গেই এ দেশের মাটিতে শেকড় বিস্তার করে বসেছিল। ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও সে শরিক হয়ে পড়েছিল। ছবির বিষয় বস্তুতে মানবিক উচ্চতা থাকলেও, আঙ্গিক ও প্রতিচ্ছাসে কোনো নুতনত্ব ছিল না।

১৯৬০—বাইশে শ্রাবণ। এই ছবিতেও দেখি এক ফেরিওয়ালার—তবে চীনা না, বাঙালী। সেও ওই চীনা ফেরিওয়ালার মতো হৃদয়বান, তার চেয়ে বেশি রোমাণ্টিক। চীনা ফেরিওয়ালার গল্পের সময় প্রেক্ষিতে ছিল যুদ্ধ। বাঙালী ফেরিওয়ালার এই গল্পে প্রেক্ষিতে এল যুদ্ধের সঙ্গে ছুঁতিক্ষ। আগের ছবিতে ছিল দেশ-কাল নির্ভর মূলত একটি মানুষের গল্প। এই ছবিতে সময় ও সমাজের প্রেক্ষিতে একটি পরিবারের গল্প। ফেরিওয়ালার জীবন থেকে তার স্ত্রীর জীবন ও সংকটের গল্প। সমাজ ও সময়—যুদ্ধ ও ছুঁতিক্ষ মানুষের মধ্যে সম্পর্কবোধে মূল্যবোধে পরিবর্তন ঘটায়, যেখানে পরিবারের মধ্য দিয়ে তাকালে সমাজের চেহারা দেখা যায়, সময়কে বোঝা যায়। এই ছবিতেই সম্ভবত—ভারতীয় ছবির ক্ষেত্রে—নারীমুক্তির প্রসঙ্গ প্রকৃত অর্থে ধরা পড়ে। এই ছবিই বোধকরি, ভারতীয় ছবির ক্ষেত্রে, প্রথম অপ্রত্যক্ষত কিন্তু সঠিক অর্থে—রাজনৈতিক ছবি।

১৯৬১—পুনশ্চ। গ্রাম ছেড়ে শহরে। শহরে মধ্যবিত্ত একটি পুরুষ ও এগটি নারীর—প্রেমিক-প্রেমিকার গল্প। প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক সংকট। এখানেও আশে নারী স্বাধীনতার প্রশ্ন। পুরুষ প্রাধান্যের সমাজে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বা ব্যক্তি স্বাধীনতা কীভাবে অধীকৃত হয়, মানুষের সম্পর্কের মধ্যে, মানসিকতার মধ্যে অর্থনৈতিক সমস্যা কী প্রকার প্রভাব বিস্তার করে তারই যেন—বাইশে শ্রাবণ-এর গ্রাম থেকে সরে এসে—এক শহুরে সংস্করণ, যেন পুনঃকথিত ভিন্নভাবে।

১৯৬২—অবশেষে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক—প্রেম ও বিচ্ছেদ নিয়ে একটা কমেডি ছবি। সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে নানা শ্লেষ ও মজা করা হয়েছে এই ছবিতে।

১৯৬৪—প্রতিনিধি। এই ছবির বিষয়ও পুরুষ-শাসিত সমাজে মেয়েদের অবস্থা। এই ছবিতে তিনি যেন মেয়েদের পক্ষ নিয়ে খানিকটা নির্দেশ দিয়ে যেন যে মেয়েদের আপাত সামাজিক ভয়-ভীতি ও সংস্কার ভেঙে বেরিয়ে আসা উচিত।

১৯৬৫—আকাশ কুম্ব। এই ছবির নায়ক অজয় স্বপ্নবিলাসী। মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে সে দ্রুত উচ্চবিত্ত শ্রেণীতে পৌঁছতে চায়। ছল-চাতুরী দিয়ে সে কৃতকার্য হতে চায়। বড়োলোকের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে সে বড়োলোক হতে চায়। কিন্তু কৌশলের পথে প্রেম নার্বকতা পায় না। তার দ্রুত উচ্চশ্রেণীতে ওঠার স্বপ্ন ভেঙে যায়। কাহিনীর মেজাজের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পটভূমি হিশেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল কলকাতা শহর। ছবিতে নায়ককে পদে পদে রিডিকিউল করা হয়েছে, যেমন সমালোচনা করা হয়েছে পেটি-বুর্জোয়া ব্যবস্থার। ছবিতে শৈলী ও আঙ্গিকগত অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা রয়েছে যা তৎকালীন চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে নতুন স্বাদের।

১৯৬৬—মাটির মনিষ। ওড়িয়া ভাষায় তৈরি। কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহীর গল্প। মূল কাহিনী তিনের দশকের উড়িষ্যার এক কৃষক পরিবারের যৌথ সংসারের সমস্যা নিয়ে। মৃগাল সেন কাহিনীতে ৩৮-৩৯ সালের যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিত ও যন্ত্র-যুগের বাতাবরণ আরোপ করেন। মূল কাহিনীর প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন ঘটান পরিবারের ভাঙনে সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতাকে দায়ী করে। জমির ভাগাভাগির দ্বন্দ্ব বড়ো ভাই সমস্ত সম্পত্তি ত্যাগ করে, তবু সে মানুষ হিশেবে বড়ো কিছু হয়ে ওঠে না। ছোটো ভাই সমস্ত সম্পত্তি চায়নি, তবু পায়, পেয়ে সে ছোট হয়ে যায় না। কারণ বড়ো ভাই সামন্ততান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিভূ হয়েই থাকে, ছোট ভাই সেই প্রতিষ্ঠানকে ভাঙতে চায়। ছবিতে প্রতীকের ব্যবহার অসংখ্য যদিও, তা অনবগ্ন ও সংযমী। ভারতীয় চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে কৃষক পরিবারের সমস্যা বিশ্লেষণে মৃগাল সেনই প্রথম, এই ছবিতে, মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ করেন।

১৯৬৭—মুক্তি পারস্পেকটিভ। তথ্যচিত্র। ফিল্মস ডিভিশনের জন্ম তৈরি।  
বিষয় ভারতীয় ইতিহাসের পাঁচ হাজার বছর।

১৯৬৯—ভূবন সোম। হিন্দীতে তৈরি। বনফুলের কাহিনী। প্রধান চরিত্রে  
অভিনেতা উৎপল দত্ত। রেলের জাঁদরেল অফিসার ভিকটোরিও আদর্শবাদের  
প্রতিভূ, সৎ ও কর্মনিষ্ঠ মানুষ ভূবন সোম, যিনি তাঁর সততা রক্ষার জন্ম নিজে  
ছেলেকেও চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে পারেন, তিনিও আপাত সৎ ও বিবেকী  
স্বাভাব্যতার আড়ালে নিছক ক্ষমতা-তৃপ্তির জন্ম দুর্নীতিকে প্রথয় দিতে পারেন।  
রেলের রুটিন কাজের থেকে বেরিয়ে একটু ভিন্নতার জন্ম গুজরাটের এক গ্রামে  
পাখি শিকারের জন্ম যান তিনি। সেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও এক নারীর  
সরলতা ও লাভ্যা যেন তাকেই শিকার করে বসে। সেই নারীর স্বামীর  
দুর্নীতিকে প্রথয় দিয়ে বসেন ভূবন সোম শেষ পর্যায়ে, তার সততা রক্ষার রুটিন  
ভেঙে। মৃগাল সেনের কথায়, এই ছবিতে, I just wanted to make fun  
with this ridiculous business of bureaucracy. ছবিটির আঙ্গিকগত ও  
শৈলীগত ও বিশ্বাসগত সৌন্দর্য ভারতীয় চলচ্চিত্রের জগতে এক নতুন মাত্রা যোগ  
করে। হিন্দী ছবির ক্ষেত্রে এই ছবিই বোঝায় প্যারালাল সিনেমার স্বত্রপাত  
ঘটায়।

১৯৬৯—ইচ্ছাপূরণ। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প অবলম্বনে তৈরি। শিশুচিত্র।  
এই ছবিতে ধনি ও সৎলাপের ব্যবহার নিয়ে প্রচুর মজা করা হয়েছে। অনেকের  
মতে ছবিটি শিশুদের পক্ষে কঠিন।

১৯৭১—ইন্টারভিউ। ভারতীয় চলচ্চিত্রে প্রথম স্টারিটেল ফর্ম ভাঙার কাজ  
শুরু হয় এই ছবিতেই। এই ছবি থেকেই মৃগাল সেনের চলচ্চিত্র জীবনের  
এক নতুন পর্যায় শুরু হয় : সরাসরি রাজনৈতিক ছবি, খানিক প্রবন্ধধর্মী ছবি।  
একটা স্ক্রিপ্ট না থাকায় এক যুবকের ইন্টারভিউ দিয়েও চাকরি হয় না : যৎ-  
সামান্য এক বিষয়ের ভিতর দিয়ে তিনি আক্রমণ করেছেন ঔপনিবেশিক দৃষ্টি  
ভঙ্গির, সামাজিক স্থানিক সমস্যার ব্যাখ্যা করেছেন রাজনৈতিক বিচারে,  
আন্তর্জাতিক নিরিখে। ছবির প্রতিপাত্ত অংশে আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের  
দেশে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে, কিন্তু colonial legacy থেকেই গেছে।  
ছবির শেষ হয় এক আধা-বাস্তব ও আধা-ফ্যানটাসির স্তরে, যেন একটা বিমূর্ত  
অবস্থায় যেখানে নায়ককে নানা প্রশ্ন করা হয় এবং সেও নানা প্রশ্ন তোলে,  
সে একটা স্মৃতির সামনে এসে সবকিছু ভাঙতে শুরু করে। সে তখন একটা

মানুষ থেকে একটা আইডিয়াতে, একটা কনসেপ্টে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ছবিটি যুগল সেনের কলকাতা বিষয়ক চিত্রশ্রয়ীর প্রথম পর্ব।

১৯৭২—কলকাতা ৭১। কলকাতা চিত্রশ্রয়ীর দ্বিতীয় ছবি। ইন্টারভিউ ছবির নায়কের ক্রোধের বিবর্তন—একটা সামাজিক ও ঐতিহাসিক বৃহত্তর প্রেক্ষিত পায় কলকাতা ৭১-এ। এই ছবিতে ইন্টারভিউ ছবির নায়কের—কনসেপ্টের এক্সটেনশন হয় এবং যেন এক্সপ্ল্যানেশনও। এই ছবির নায়কের বয়স ফুড়ি বছর। কিন্তু সে বলে যে সে হাজার বছর ধরে হেঁটে চলেছে দারিদ্র্য মালিন্য আর মৃত্যুর ভিড় ঠেলে আর হাজার বছর ধরে সে দেখে চলেছে। অর্থাৎ সেও একটা কনসেপ্ট। সে হাজার বছর ধরে দেখেছে আমাদের ইতিহাস দারিদ্র্য, বঞ্চনা ও শোষণের ইতিহাস। সে প্রতিক্রিয়া জানায়। গুলি খেয়ে মারা যায়। আবার ফিরে আসে। একটা কনসেপ্ট হিশেবেই। এই ছবিতে তিনটি গল্প নেওয়া হয়েছে—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের, প্রবোধ সাত্তালের ও সমরেশ বসুর। প্রথম গল্পে ৩৩ সালের এক বর্ষার রাতে বস্তিবাসী পরিবারের নিদারুণ দুর্দশার চিত্র ধরা হয়। দ্বিতীয় গল্প ৪৩ সালের, এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের। আকালের—মানুষের সৃষ্টি করা আকালের মধ্যে একটি পরিবারের মানুষ কিভাবে বিচ্ছিন্ন, অবমাননাকর অবস্থায় পড়ে, তার ভেতর ক্রোধ জমা হয় সেই ছবি। পরের গল্প ৫৩ সালের। নতুন এক শ্রেণীর মানুষের জন্ম হয় যারা কঠিন জীবনের সঙ্গে লড়াইতে পারে, ক্ষিদে ছাড়া আর কিছুকেই ভয় পায় না। চালের চোরা চালানকারীর জীবিকার মধ্য দিয়েই যেন তারা সামাজিক মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে, চ্যালেঞ্জ জানায়। এই তিনটি গল্পের পর একটি অংশ আছে যেখানে বিজ্ঞান-বৈভবের ভেতর সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণীর লোককে দেখা যায়। মূল তিনটি গল্পের সমন্বয় ঘটানো হলেও গল্প বলার প্রথাগত রীতি ভাঙা হয়েছে বারেকারে। তিনি নিজেকে বলেছেন, এই ছবিতে তিনি গল্প বলিয়ে নন, একজন essayist.

১৯৭২—এক আধুরী কহানী। সুবোধ ঘোষের 'গোত্রান্তর' গল্প অবলম্বনে তৈরি। অমিক-কৃষক ও তাদের মূল্যবোধ নিয়ে, হিন্দীতে তৈরি। এ ছবি সম্পর্কে তাঁর নিজের মত এই প্রকার যে কৃষকের সমস্যার দিকগুলি তিনি বোঝেন, কিন্তু শ্রমিকের মানসিকতা, মূল্যবোধ তিনি ঠিক বোঝেন না। তবু চেষ্টা করেছেন। ছবিটি তার কলকাতাশ্রয়ী পর্যায়ের ছবিগুলির মধ্যে তো বটেই, এমন কি বাইশে শ্রাবণ থেকে ভুবন সোম পর্যন্ত পর্যায়ের মধ্যেও এক ব্যতিক্রম, বিচ্যুতিও।

১৯৭৩—পদাতিক। কলকাতা-৭১-এর পরবর্তী পর্যায়। এর বক্তব্য অনেক

বেশি আন্তর্জাতিক। একটি রাজনৈতিক দলের ছেলে গ্রেপ্তার হয়, পুলিশ ড্যান থেকে পালায়, আশ্রয় পায় এক মহিলার ফ্ল্যাটে। মহিলা স্বামীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই হিসেবে একা থাকার ব্যবস্থা বেছে নিয়েছেন। মহিলা পাঞ্জাবী, তার ভাইও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত। সে পাঞ্জাবেই থাকে, যেখানে চলেছে প্রচণ্ড রাজনৈতিক অস্থিরতা। এই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে এসে পড়ে ছেলেটির আত্মানুসন্ধানের, আত্মবিশ্লেষণের কাজ শুরু হয়। সে বুঝতে পারে তার লড়াইয়ের পথ ছিল এক অর্থে বিচ্ছিন্নতার পথ। তার ভুল-ত্রুটি শুধরে নিয়ে mass mobilisation-এর দিকে এগোতে হবে। বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে লড়াইতে হবে। ইন্টারভিউ থেকে কলকাতা ৭১ হয়ে পদাতিক পর্যন্ত তিনটি ছবিতেই কলকাতার শারীরিক উপস্থিতি ছাপিয়ে বিষয়বস্তু সম্পর্কিত হয়েছে আফ্রো-এশিয় দেশগুলির সঙ্গে, যেখানেই লড়াই চলেছে—ভিয়েতনাম, মোজাম্বিক, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশগুলির সঙ্গে। তবে অবশ্যই তিনটে ছবির উপস্থাপনা ও বিশ্লেষণে তিনতা আছে। ইন্টারভিউ, কলকাতা ৭১ ও পদাতিক এই ট্রিলজি সম্পর্কে মৃগাল সেনের নিজের মত : কলকাতা এই তিনটি ছবিতেই শারীরিকভাবে উপস্থিত আগাগোড়া। কিন্তু তিনটি ছবিতেই, অন্তত আমি এইভাবেই দেখেছি, কলকাতার শারীরিক উপস্থিতি এসেছে নেহাৎই একটা excuse হিসেবে। চেষ্টা করেছি এই উপস্থিতির মধ্য দিয়ে গোটা দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চেহারার আন্দাজ পাওয়ার, বিশ্লেষণ করার এবং ব্যাখ্যা করার এবং ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে দেশের এই realityকে এক সঠিক perspective-এ এনে দাঁড় করানোর।

১৯৭৪—কোরাস। এই ছবিতে মানুষের সম্মিলিত আবেগ, পরিবর্তনকামীতার নাম কোরাস। কলকাতাজয়ীতে যে প্রচলিত ফর্ম ভাঙার কাজ শুরু করেছিলেন এ ছবিতে যেন তা আরো তীব্রতা পায়। বুর্জোয়া নিষ্পেষণ ও আপাত স্বাধীনতার মধ্যে হতাশ ব্যর্থ শ্রমিক ও তার প্রতিক্রিয়া, ইচ্ছে, স্বপ্ন ইত্যাদি প্রকাশ করেছেন কখনো পালাকারের মতো, কখনো প্রাবন্ধিকের মতো। এই কাজে, তিনি থিয়েটারের উপাদান, ভঙ্গি ও রীতিও ব্যবহার করেছেন প্রয়োজন মতো। এই ছবি প্রসঙ্গে মৃগাল সেন বলেছেন, ‘আমার সিনেমার জীবনে কোরাস বাস্তবিকই একটি মস্ত সিনেমাটিক অভিজ্ঞতা।’

১৯৭৬—মৃগয়া। হিন্দী। রঙিন। ভগবতীচরণ পাণিগ্রাহীর ওড়িয়া গল্প। ব্রিটিশ শাসিত ভারতে, এক আদিবাসী যুবকের কাহিনীকে ঘিরে বুর্জোয়া আইনের ও

শাসন ব্যবস্থার পার্বল্যতা ও নির্লক্ষ্যতার উন্মোচন। এই ছবিতে এক আদিবাসী যুবক, তার সম্বন্ধ ও সমাজের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে আদিবাসী বিদ্রোহের ইতিহাসে।

১৯৭৭—ওকা উরি কথা। প্রেমচন্দ্রের গল্প। ছবি তৈরি তেলুগু ভাষায়। মৃগাল সেনের অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ছবি। ছবির পটভূমি গ্রাম, কাহিনী শোষণের, শোষণের যন্ত্র শ্রম এবং লক্ষ শ্রমিক। ছবির নায়ক ভেক্কায়া একজন কৃষিশ্রমিক বা দাসশ্রমিক নয়, স্বাধীন শ্রমিক। এবং সে সর্বহারা। সে তার অভিজ্ঞতায় বোঝে বঞ্চনার ইতিহাস, সে বুঝতে পারে শ্রমিকের শ্রম থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে পুঁজি, কতিপয়ের মুনাফা। সে প্রতিবাদের প্রতিশোধের কথা ভাবে। কিন্তু তার প্রতিবাদ প্রতিশোধের অস্ত্র ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শ্লেষ। এমনকি সামাজিক স্ফায়-নীতি বিসর্জন দিয়ে সে যেন সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। সে নিজের ছেলেকে শেখায় কাজে ফাঁকি দিতে, চুরি করতে, নিজেও তাই করে। ছেলের বউ মারা গেলে সংস্কারের জন্ত সংগৃহীত পয়সা দিয়ে মদ খায়। ছবির চূড়ান্ত পর্বে সে তিনটি দাবী রাখে: অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান। এবং একটু ভালোবাসা, প্রিয়জনের পরমায়ু। ছবিতে সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষিত ও প্রতিপাতকে বিচার করা হয়েছে মার্ক্সীয় অর্থনীতির নিরিখে। মুখ্য চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করেছেন বাহুদেব রাও।

১৯৭৮—পরশুরাম। কলকাতার পটভূমিতে একদল বস্তিবাসীর জীবনযাপনের কাহিনী। ইন্টারভিউ ছবি থেকে পদাতিক পর্যন্ত ক্রোধ প্রকাশের ভঙ্গিতে যে মাত্রা ও শৈলী ছিল, মৃগয়া থেকে ওকা উরি কথা হয়ে পরশুরাম পর্যন্ত তা ক্রমে ভিন্নতা পেল। প্রতীকী রাগ শারীরিক রাগ হয়ে ক্রমে দার্শনিক এক ভঙ্গিতে পরিণত হলো।

১৯৭৯—একদিন প্রতিদিন। কলকাতা। রাজনৈতিক সন্ত্রাস স্পষ্টত নেই, কিন্তু অনিশ্চয়তা, দুর্ভাবনা রয়েছে। একটি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে অফিস থেকে যথাসময়ে বাড়ি ফেরেনি। উদ্বেগ ও অহুস্কান শুরু হলো। এই অহুস্কানের ফলে পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামোর, সম্পর্কের নানাদিক বেয়ে আসতে লাগল। মেয়েটি যখন বাড়ি ফিরে আসে, ততক্ষণে মধ্যবিত্ত মানসিকতার কৃত্রিম পর্দা সরে গেছে অনেকটা। মানুষগুলোর সম্পর্কের, মানসিকতার ক্ষুদ্রতা, অসহায়তা, স্বার্থ-পরতা exposed হয়ে গেছে। মেয়েটি কোথায় ছিল ছবিতে জানা যায় না, সঙ্গত কারণেই জানানো হয় না। এই অহুস্কান আসলে বিশ্লেষণের চেহারা পেয়ে যায়। এই ছবি থেকে পরবর্তী কয়েকটি ছবিকে মৃগাল সেন বলেন, তাঁর আত্ম-বিশ্লেষণের ছবি।

১৯৮০—আকালের সন্ধানে। পঞ্চাশের দশকের ছবি তুলতে একটি ফিল্ম ইউনিট গেছে গ্রামে। শহরের ছবি করিয়ের দল গ্রামে গেলে, আটের দশকের মাহুয পাঁচের দশকের ছবি তুলতে গেলে, সময় ও স্থানকে পুনর্নির্মাণ করতে গেলে নানা সংকট দেখা দেয়। সংকট দেখা দেয় পরিচালকের পরিকল্পনায়, ইউনিটের মাহুযগুলোর মধ্যে, এমনকি লোকেশনের মাহুয ও পরিবেশের মধ্যেও। চলচ্চিত্র জগতের মাহুযগুলোর সঙ্গে বর্তমান বাস্তবের মাহুযের, বর্তমানের সঙ্গে অতীতের, শিল্পের দাবীর সঙ্গে বাস্তবের দাবীর বোঝাপড়ার অভাব, এমনকি সংঘাতও দেখা দেয়। ছবির কাজ শেষ হয় না। সিনেমার মতো সিনেমা—এই কাঠামোর মধ্যে ছবির শৈলী, আঙ্গিক ও প্রতিস্থাপের নিরিখে এই ছবি ভারতীয় চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯৮১—চালচিত্র। কলকাতা। পলেন্স্তারাখসা, জীর্ণদশার এক বিরাট বাড়িতে অনেকগুলি পরিবারের বাস। তার মধ্যে একটি পরিবার ও সেই পরিবারের একটি ছেলে, দীপু, তাকে কেন্দ্র করেই চালচিত্র রচিত হয়েছে বৃত্তাকারে। একটি পত্রিকার জন্ম, মধ্যবিত্ত জীবনের চিত্তাকর্ষক দিকগুলি নিয়ে ফীচার লিখতে হবে দীপুকে। পত্রিকা-সম্পাদকের উদ্দেশ্য অনুযায়ী তা বিক্রয়যোগ্য হওয়া চাই। সে মধ্যবিত্ত জীবনের দৈনন্দিনতার মধ্যে নূতনত্বের সন্ধান করে। কিন্তু পায় না। দব কিছুই তার কাছে একঘেঁয়ে, অকিঞ্চিংকর মনে হয়। শেষে সে বোঝে, আপাত তুচ্ছের মধ্যেই গভীর বিষয়ের সন্ধান চাই, পায়ও। নিতান্ত উল্লুনের ধোঁয়াও হতে পারে লেখার বিষয়। উল্লুনের ধোঁয়া যখন তার লেখার গ্রাহ্য বিষয় হয়ে ওঠে তখন সম্পাদক তাকে লিখতে বলেন উল্লুনের বিরুদ্ধে, আবহাওয়া দূষণ সম্পর্কে। দীপু, সেও অসহায়, রাজী হয় বিক্রয়যোগ্যতার কথা ভেবে, তার লেখার, তার নিজের। তার জীবনে প্রতিষ্ঠা আসে। তার নিজের ঘরে উল্লুনের বদলে গ্যাস আসে। বাকী পরিবারগুলোতে উল্লুন থাকে, দর্ভজ উল্লুনের ধোঁয়া থাকে।

১৯৮৩—খারিজ। কলকাতা। মধ্যবিত্ত পরিবার। একটি ছোট ছেলে, বাড়ির চাকর, ঠাণ্ডার ভয়ে, একটু আরামের জন্ম রান্নাঘরে জলন্ত উল্লুনের পাশে শুয়ে ছিল। মারা যায়। তার জীবদ্দশায় মাহুয হিশেবে তার দিকে তাকায়নি কেউ। এখন তাকায় সবাই, নিজেদের দিকেও। ছেলেটির মৃত্যুর পর যেন পরিবারের আত্মকেন্দ্রিক, স্বাচ্ছন্দ্যকামী মাহুযগুলোর চরিত্রের ময়নাতদন্ত শুরু হয়, মধ্যবিত্ত মানসিকতার ভগ্নামী ধরা পড়ে যেতে থাকে। বেরিয়ে আসে অনুশোচনাও। যুগল নেনের নিজের কথায় এই ছবির 'উদ্দেশ্য ঠাণ্ডা মাথায় নিজেদের নিদারুণ

সমালোচনা, এই ব্যবস্থার, যাতে আমরা মধ্যবিত্তরা বাস করি। আমাদের মিথ্যাচার এবং আদর্শবিরোধী সমস্ত কথার কথা বলা হয় এখানে।... আমাদের মানসিক যন্ত্রণার কথাও, কারণ আমরা বোধহীন নই।

১৯৮৪—খগুহর। কাহিনীমূল প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার'। ছবিতে কাহিনী এই রকম : শহরের তিন বন্ধু, যাদের একজন কটোগ্রাফার, এ-এ গ্রামের বিশালাকার ভগ্নদশাগ্রস্ত একটি বাড়িতে বেড়াতে আসে। সেই বাড়িটি এক অংশে থাকে একটি অবিবাহিতা মেয়ে ও তার মা, অল্প পক্ষাঘাতগ্রস্ত। নিরঞ্জন নামে কোনো এক যুবক ওই মাকে কথা দিয়েছিল যে সে একদিন এসে মেয়েটিকে বিয়ে করে নিয়ে যাবে। মেয়েটি জানে নিরঞ্জন আসবে না। কিন্তু জীবনের প্রতি মায়ের এই শেষ আস্থা, বিশ্বাসটুকু সে ভাঙতে চায় না। মা তাবোধ, তিন বন্ধুর মধ্যে বুঝি নিরঞ্জন এদেছে। পরিচালক এক এমন অমোঘ মুহূর্ত রচনা করেন যেখানে ফটোগ্রাফার স্ত্রী নিরঞ্জনের ভূমিকায় ধরা পড়ে, প্রত্যেকটি মাহুবেই অসহায়ের মতো সেই অনিবার্য মুহূর্তের সম্মুখীন হতে হয়—হৃদয় ব্যঞ্জনা ময় সেই দৃশ্য চলচ্চিত্রের জগতে এক অনবদ্য সৃষ্টি। তিন বন্ধু শহরে কিংবা যায়, স্ত্রীও।। কলকাতাত্রয়ীর আগে ও পরে মুগাল সেন এক অর্থে গল্প বলা ছবিই করেছেন, কিন্তু তাৎপর্য ছিল শৈলীতে, আঙ্গিকে, প্রতিস্থানে। এই ছবিতে স্থারিটি ফর্ম ব্যবহার করলেও ডিটেলের প্রতি মনোযোগ, আশ্চর্য সহজ সংলাপ ও সংলাপহীনতার মধ্যে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি, সূচিত্তিত যেন অনিবার্য ক্যামেরা অ্যাপ্রেন ও শট-ডিভিশনের মধ্য দিয়ে ঘটনাপ্রবাহ নয়, যেন সহজ-তুচ্ছ-স্বল্প মুহূর্তগুলির বিচ্ছাদের মধ্য দিয়ে এক অসামান্য সৃষ্টি করেছেন তিনি।

১৯৮৪—তসবীর আপনে আপনে। টিভির জন্ম তৈরি। ভারতীয় ছবিতে কিউবিজমের ব্যবহার সম্ভবত এই ছবিতেই প্রথম।

১৯৮৪—জেনেসিস। হিন্দী, ফরাসি ও ইংরেজি—ত্রৈভাষিক ছবি। জনশূন্য এক মরুপ্রান্তে যেন সভ্যতার আক্রমণ : সেখানে বাস করে দুই পুরুষ, তাদের মধ্যে এল এক নারী—এবং পরে পরেই এল এক ব্যবসায়ী শিকারীর মতো। প্রকৃতি ও মনুষ্যপ্রকৃতির ওপর এসে পড়ল অর্থনীতি—এক সমাজনীতির সৃষ্টি হলো যা তাদের জীবনে এনে দিল তুচ্ছ-বৃহৎ দন্দজর্জর প্রাত্যহিকতা। তারই মধ্য দিয়ে তারা খুঁজে পেল তাদের অস্তিত্বের শেকড়—মিজের বাসভূমি যা তারা ছেড়ে যেতে চায় না, ব্যবসায়ীর প্রলোভনেও না—ওই শিকারীর ফাঁদে পড়েও না। কিন্তু তবু ছবির শেষ পর্যায়ে সেখানে আসে একটা বুলডোজার ধ্বংসের চ্যু,

শস্যের আশ্রয়নের আরেক রূপ নিয়ে—হয়তো আরেক রূপ গড়ে দিতে, শস্যের ঘটতে। এই ছবির পাত্রপাত্রীরা বাকসংযমী। পরিচালক চিত্রমালাতেই যেন বেশি প্রকাশময়। অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য এক চলচ্চিত্র শিল্প।

১৯৮৭—কভী দূর কভী পাস। তেরটি, প্রতিটি তেইশ মিনিটের পর্বের চিঠি মিরিয়াল। ভিন্ন ভিন্ন গল্প। কিছু মানুষের জীবনের কয়েকটি ক্ষুদ্র মুহূর্ত, কিছু আপাত তুচ্ছ ঘটনার মধ্য দিয়ে জীবনের কয়েকটি দিক দেখতে পাই, মনের কিছু অবস্থা ধরা পড়ে যায়, পরিবেশ ও পরিস্থিতির কিছু ব্যাখ্যা বেরিয়ে আসে।

১৯৮৯—একদিন আচানক। ষাটোর্ধ্ব এক অধ্যাপক-লেখক এক ঝড়-বৃষ্টির রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন, যেন জগৎ-জীবন সম্পর্কে কিছু প্রশ্নোত্তরের সন্ধানে। তাঁকে খোঁজা শুরু হলো। তাঁর স্ত্রী ও মেয়ে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হলেন। তাঁদের ঘিরেও অনেক প্রশ্ন তৈরি হয়। অনেক নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের সমস্যা উন্মোচিত হতে থাকে। 'একদিন প্রতিদিন' ছবির সঙ্গে এই ছবির গঠন বিজ্ঞানের মিল থাকলেও, এর প্রতিজ্ঞাসে, শৈলীতে ও প্রেক্ষিতে ভিন্নতা আছে। 'একদিন প্রতিদিন'-এ অর্থনৈতিক সমস্যা নৈতিক সমস্যার ওপর প্রভাব ফেলেছিল। এই ছবিতে সামাজিক মূল্যবোধের সমস্যা জীবনের নৈতিকতার ওপর প্রতিজ্ঞা জানিয়েছে। 'একদিন প্রতিদিন'-এ মেয়েটি বাড়ি না ফেরায় খোঁজা শুরু হয়েছিল। এই ছবিতে অধ্যাপক বাড়ি ছাড়ায়, খোঁজা মেয়েটি কিরে এসেছিল। লোকটি ফেরেনি। এই দুটি খোঁজার মধ্য দিয়েই সমাজ জীবনের অনেক খোঁজ-খবর বেরিয়ে আসে, শুধু ছুটি ক্ষেত্রে মাত্রা ঘাত অতিশ্রুতা ও উদ্দেশ্য পার্থক্য।

১৯৯১—মহাপৃথিবী। আটের দশকের শেষ দিকে কমিউনিষ্ট দেশগুলিতে বিশৃঙ্খলা ও ভাঙনের পর হুগাল সেন যেন কতকগুলি প্রশ্নের সম্মুখীন হলেন। তাঁরই সাতের দশকের ছবিগুলিও যেন কিছু প্রশ্ন তুলে ধরল তাঁর সামনে। বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক ও সমাজনৈতিক সংকট তাঁকে যেন আরো বিশ্লেষণী করে তুলল। মহাপৃথিবীর মধ্যে তিনি সেই প্রশ্নগুলিকে ও তার ব্যাখ্যাগুলিকে ধরেছেন একটি সংসারের মধ্য দিয়ে তাকিয়ে। সংসারটার মধ্যে যেন সমগ্র বিশ্বসমাজের একটা প্রতিফলন দেখেছেন। সাতের দশকের ছবিগুলির একটা লজিক্যাল এক্সটেনশনের মতো হয়ে ওঠে এই ছবি—তবে প্রশ্ন ও প্রেক্ষিত পাশ্চাত্যে, ছবির স্টাইলও।

১৯৯৩—অন্তরীণ। সাদাত হামান মাণ্টোর উর্দু গল্প। ছবি বাংলায়। ছবির লেখক নায়ক শহর থেকে দূরে একটা প্রকাণ্ড পুরোন বাড়িতে কয়েকদিনের জন্ম যায়—যদি সেই স্রষ্টাগে কিছু লেখার বিষয়বস্তু খুঁজে পাওয়া যায়, তবে ; এই

পুরোন বাড়িতে যেন ক্ষুধিত পাষাণের গল্প আছে, অতীতের স্মৃতি জড়িয়ে আছে, আবার টেলিফোনও আছে বর্তমানের সঙ্গে সংযোগের। সেই টেলিফোন বাজেগা এবং বেজে উঠলে শোনা যায় এক নারীর কণ্ঠস্বর। ক্ষুধিত পাষাণের কাহিনীর মতো, এই নারীও বন্দি—শহরের বিলাস বৈভব, স্বামীর হৃদয়হীনতা, নিঃস্বপ্ন অসহায়তার মধ্যে। লেখক অতীত বর্তমান খুঁজে একই কাহিনীর সূত্র পায়, শুধু কাহিনীর প্রতি তার অ্যাপ্রোচ পাণ্টে যায়—সময় পাণ্টে গেছে, প্রেক্ষিত পাণ্টে গেছে। টেলিফোনে জানা যায়, যেন ইংগিতেই জানা যায় জীবনের এই রহস্য-সমস্যা দিক। একটি ডিজলভের মধ্য দিয়ে দেখা যায় লেখকের, মেয়েটির, অতীতের, বর্তমানের, শহরের, গ্রামের স্থান-কাল যেন মিশে যায়। একই বৈশিষ্ট্য ঠা-নামা করে ছাঁজন, তবু কারো সঙ্গে মুখোমুখি কথা হয় না। যেন কোনো নির্দিষ্ট নারী না, নির্দিষ্ট লেখক না ওরা। ওরা একজন বিষয়দাত্রী, অশ্লীল বিষয়-গ্রহীতা—ওরা যেন অষ্টা।

মৃগাল সেনের ছবি ক্রমশ যেন এক একটি ক্যাপসুলের মতো হয়ে উঠেছে, যার ক্ষুদ্র পরিনয়ের মধ্যে ধরা পড়েছে বিশ্ব সমাজের রূপ গুণ স্বভাব চরিত্র, মানুষের অগণিত জিজ্ঞাসা। শুধু বিষয় উৎকর্ষে না, তাঁর শিল্পের প্রসাদগুণও ক্রমশ শৈলী আঙ্গিক প্রতিস্থানের অন্বেষ শক্তি বিকশিত করেছে। তাঁর ছবিগুলি জীবন-জগতে, চলচ্চিত্র জগতে, শিল্পের জগতে যেন দার্শনিক পরিক্রমা—ক্রম-বিস্থানে ক্রমপরিণতিতে যেন দিশারীর মতো। শিল্পী হিসেবে যেন তিনিও ক্রমশ খুঁজে চলেছেন তাঁর পথ, পথ রচনাও করে চলেছেন অনুসন্ধানীদের জন্ম।

তাঁকে নিয়ে ছবি করেছেন বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্রকার রাইনার্ড হাউফ, ছবির নাম টেন ডেজ ইন ক্যালকাটা। মৃগাল সেন নিজে লিখেছেন প্রচুর চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ, বেশ কয়েকটি গ্রন্থ।

রচিত গ্রন্থ : চার্লি চ্যাপলিন, আমি এবং চলচ্চিত্র, চলচ্চিত্র ভূত বর্তমান ভবিষ্যৎ, ভিউজ অন সিনেমা।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : প্রলয় শুর সম্পাদিত মৃগাল সেন ॥

ঐশ্বর চক্রবর্তী

॥ মেট্রোপোলিস্ ॥

১৯২৬/২৭, জার্মানি। 'ডক্টর মার্জে ডোয়ার স্পীলার' (১৯২২) ও 'এম' (১৯৩১), ফ্রিংস্ লাঙ্-এর এই দুই প্রত্যন্তের মধ্যে তাঁরই তোলা বিশ্বখ্যাত নির্বাক ছবি

'মেট্রোপোলিস্' সেই সময়ে যে প্রচণ্ড বিতর্কের ঝড় তুলেছিল তার প্রমাণ নিম্ন-  
 লিখিত মন্তব্যগুলি : এইচ্ জি ওয়েলস্-এর মতে এটি একটি অতি নিম্নমানের  
 চলচ্চিত্র, স্কার আর্থার কোনান ডয়েল-এর মতে এ ছবি একটি সাড়া জাগানোর  
 মতো ছবি । লুই বুল্লে-এর ধারণায় 'মেট্রোপোলিস্' দুটি চলচ্চিত্রের সমাহার ।  
 এর যেটুকু গল্পাংশ সেটুকু অতিশয় দুর্বল ও নিম্নমানের আর যেটুকু আদিকের অংশ  
 সেটুকু অনন্ত, অসাধারণ । লাড্ বলেছেন, জাহাজের ডেক থেকে দেখা আলোর  
 মালা পরা রাত্রির নিউ ইয়র্ক শহরকে দেখে 'মেট্রোপোলিস্' ছবির পরিকল্পনা  
 প্রথম তাঁর মনে আসে । এই ছবির অকুস্থল ২০০০ সালের এমনি এক মহানগর,  
 যার দুটি অংশ—মাটির উপরে নগরের যে অংশ তাতে বাস করে বিস্তাশালী ধনিক  
 গোষ্ঠী, উচ্চপদস্থ আমলাকুল আর বিলাসব্যসনে মত্ত ধনী যুব সম্প্রদায় । মাটির  
 নিচে নগরের যে অংশ—যেখানে দিনের আলো প্রবেশ করে না, ইলেকট্রিকের  
 আলো জ্বলে কাজ করতে হয়—সেই অংশে বাস করে শ্রমিকেরা । দীর্ঘদিনের  
 শোষণে তারা দাসে পরিণত । ধীরে ধীরে বিদ্রোহ দানা বাঁধে শ্রমিকদের মধ্যে,  
 মারিয়া নামে একটি মেয়ের নেতৃত্বে । বিদ্রোহী শ্রমিকদের সঙ্গে এসে যোগ দেয়  
 মহানগরের সবচেয়ে বিস্তারিত ও শক্তিশালী ধনিক ফ্রেডেরার পরিবারের সন্তান ।  
 অনেক ঘটনার মধ্য দিয়ে ছবির পরিণতি ঘটে মিলনাত্মকভাবে, বিস্তাশালী ধনিক  
 এবং বিদ্রোহী শ্রমিকদের হৃদয় পরিবর্তনে, যার ফল শ্রমিক-মালিক সমঝোতা ।  
 এই সমঝোতা ঘটানোর মূলে দুজন, মারিয়া আর ফ্রেডেরার পরিবারের 'শ্রমিক-  
 দরদী' ছেলেটি যাদের মধ্যে একটি প্রেমের সম্পর্ক ইতোমধ্যে গড়ে উঠেছে । এদের  
 ভাষায় এই সমঝোতা হৃদয়ের প্রভাবে বুদ্ধি ও শ্রমের সমঝোতা ।

জিগ্‌ফ্রীড্ ক্রাকাউয়ার-এর মতে 'মেট্রোপোলিস্' ছবির বক্তব্যে আপাত  
 বনতন্ত্র বিরোধিতা ও শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুত্থানের কথা থাকলেও ছবিটি বস্তুতঃ  
 অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রতিক্রিয়াশীল জীবনদর্শনই প্রচার করেছে । ক্রাকাউয়ার  
 তাঁর বক্তব্যের দপক্ষে এই ছবি সম্পর্কে হিটলার ও তাঁর প্রচারমন্ত্রী গ্যোয়েবেলস্-  
 এর উচ্ছ্বাসিত প্রশংসার কথা উল্লেখ করেছেন । তিনি অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এটাও  
 উল্লেখ করেছেন যে ছবির এই ক্রটির জন্য লাড্-এর চেয়ে অনেক বেশি দায়ী  
 থিয়া ফন হারবু, যিনি ব্যক্তিগত জীবনে লাড্-এর স্ত্রী ছিলেন এবং তাঁর প্রায়  
 সব ছবির চিত্রনাট্য লেখাতে সহায়তা করেছিলেন, প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে হারবু  
 পরবর্তীকালে নাৎসিদের সমর্থন করেছিলেন । ক্রাকাউয়ার-উল্লিখিত সমস্ত ক্রটি  
 স্বীকার করেও 'মেট্রোপোলিস্'-কে একটি অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ছবি বলে আখ্যা

দেওয়া যায়। চিত্রভাষা ও আঙ্গিকের বিচারে এই ছবি আজও বিশ্বয়ে অভিনু করে তোলে চলচ্চিত্র রসিকদের। এই ছবিতে বিখ্যাত অস্ট্রিয়ান-জর্মন নাট্য পরিচালক ব্রাইনহার্ট এবং ব্রেভ্ট-এর সতীর্থ জর্মন নাট্য পরিচালক এরস্টিন পিস্বাটোর নাট্য প্রয়োগ পদ্ধতিদ্বয়, এক্সপ্রেশনিজম্ এবং পূর্বযুগী জর্মন চলচ্চিত্রকার অটো রিপার্ট-এর (‘হোমুনকুলুশ’, ১৯১৬) প্রয়োগপদ্ধতি সার্থক ও সুন্দর ভাবে ব্যবহৃত হয়ে ছবিতে অসাধারণ গতিময়তা এবং ছন্দ এনেছে।

অভিনয়ে ত্রিগিস্তে হেল্ম, রুডল্ফ ক্লাইন-রোগে, হেলেনে ফাইগেল; আলোকচিত্র কার্ন ফ্রেয়গে, গ্যুস্টার রিটাউ; শিল্প নির্দেশনা অটো ছনটে, এরিখ কেটেল-ছট্ট, কার্ল ফলব্রেখট্ট; সাজসজ্জা আনি স্থিলকম্, ফ্রাণ্টার গুলৎসে-মিটেনদর্ফ; স্পেশাল এফেক্ট অয়গেন গ্যুফ্টান।

বুর্গজিৎ রায়

॥ মেফিস্টো ॥

১৯৮১, হাঙ্গেরি-জার্মানি যৌথ প্রযোজনা। ক্লাউস মান-এর উপস্থাপন অবলম্বনে ইস্তভান সাবোর অসাধারণ সার্থক, প্রতীকী চিত্র। মূল উপস্থাপনটি লেখা হয়েছিল গ্রুয়েগেন্স নামে এক বিখ্যাত জর্মন অভিনেতার জীবনকে ভিত্তি করে। ছবিতে তার নাম হেনড্রিক হোফ্গেন। পরিচালকের ভাষায়, সে এমন একজন মানুষ যার মানিয়ে নেবার ক্ষমতা চমকপ্রদ, যার বিবেচনায় তার জীবনের সমস্ত সম্ভাবনা অল্পদের কাছে স্বীকৃতি পাওয়ার মধ্যে। এমন একজনকে নায়ক করে বিশ দশকের শেষার্ধের ও ত্রিশ দশকের নাৎসি জার্মানির পটভূমিতে শিল্পী তথা বুদ্ধিজীবীদের স্ববিধাবাদ ও আত্মবিক্রয়ের যে চিত্র সাবো এঁকেছেন তা কাহিনী, ইতিহাস, লেজেন্ড ও মিথের জটিল গ্রন্থনায় অসাধারণ অভিব্যক্তি ও শিল্পনিপুণ রূপ পেয়েছে।

ছবিতে ‘একাধিক পরস্পরসম্পৃক্ত কাঠামোর বিশ্বাস এক আশ্চর্য বুনট রচনা করে। একটি স্তরে থিয়েটারের ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিমণ্ডল। (যেখানে) সাবো বড়ো হিসেব করেই বেছে নেন তাঁর ছবিতে থিয়েটারের চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত রূপে ইতালিয় অপেরা, ব্রেভট-এর ‘দ ব্রেভশপ’, গ্যোয়টে-র ‘ফাউন্ট’ এবং শেক্সপীয়রের ‘হ্যামলেট’, মাত্র এই চারটিই, কারণ এই চারটিতেই আঁকা হয়ে যায় তৎকালীন পশ্চিম ইয়োরোপিয় থিয়েটারের পরস্পর মানচিত্রের বহিরেখচিত্র। পেশাদার থিয়েটারের চর্চার মধ্যেই রয়ে গেছে এক ধরনের আত্মহত্যার বীজ। ...অভিনেতা-বুদ্ধিজীবী-নিরাপত্তামোহ-আত্মসমর্পণ-আত্মবিক্রয়ের

এই অত্যন্ত তাৎপর্যগভীর স্তরটির নিচে আরেকটি স্তরে গ্যায়টে-র 'ফাউস্ট' নাটক ও ফাউস্ট মিথ্-এর অনুষ্ণের একটি জন্ম আছে মেফিস্টো ছবিতে। গ্যায়টে-র নাটকে মেফিস্টোর ভূমিকা 'সিডিউসার'-এর। কিন্তু সাবোর মেফিস্টো-হোফ্গেন কেবল ফাউস্ট নয়, একাধারে ফাউস্ট ও মেফিস্টো। হোফ্গেন-কে অশ্রু কেউ প্রনুরু করে কক্ষচ্যুত করে না। সে নিজেকেই নিজে প্রনুরু করে। এই ফাউস্ট-মেফিস্টো অভেদে শিল্পী-বুদ্ধিজীবীর, বুদ্ধিবাদী আত্মহননেরই এক মিথ রচনা করেছেন সাবো।' (—শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়)। অসাধারণ চিত্রভাষা ও প্রতীকী ব্যঞ্জনায সমৃদ্ধ মেফিস্টো ছবি এক রূপোত্তীর্ণ ও রসোত্তীর্ণ অভিজ্ঞতা।

অভিনয় ক্লাউস মারিয়া ব্রানডাউয়ার ও কারিন বয়েড; চিত্রনাট্য সাবো ও ডোবাই; চিত্রগ্রহণ কলতাই, সংগীত তামাসি, সম্পাদনা Csakany।

শ্রেষ্ঠ বিদেশিচিত্র রূপে অ্যাকাডেমি পুরস্কার (অস্কার)।

॥ মেয়েদের বিরুদ্ধে সিনেমা ॥ (Cinema against women)

ছবি করতে প্রচুর টাকা লাগে। ঘরোয়া পরিমণ্ডলে টাকা মেয়েদের হাত দিয়ে খরচ হোক, এককভাবে এতে প্রায় ছেলেরই আপত্তি থাকে না। কিন্তু এ রকম কয়েকটি ছেলে ও মেয়ে একত্র হয়ে যখন একটি বড়ো পরিমণ্ডল গড়ে তোলে তখনই ক্যাশের দায়িত্ব চলে যায় কোনো ছেলের হাতে। এর কারণটা মনস্তাত্ত্বিক। ভীষণ টাকা খরচ যে চলচ্চিত্র মাধ্যমে তা এইভাবেই পুরুষ নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে। এমন কী মহিলা পরিচালকরা নিজেরাও টাকার দায়িত্ব দিয়ে দেন পুরুষ প্রোডাকশন কন্ট্রোলারদের এবং বহু মহিলা প্রযোজকও টাকার দায়িত্ব দিয়ে থাকেন পুরুষ ফিন্যান্সিয়াল এজেন্টকে। শিক্ষা ও সংস্কৃতি নির্বিশেষে যে কোনো পুরুষের পুরুষ বলেই একটা উপরিকমণ্ডতা আছে। যা মেয়েদের যে জোর করে উপভোগ করা যায় কিন্তু পুরুষকে তা যায় না এই শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও দস্তান ধারণ করতে হয় মেয়েদের, পুরুষকে নয়, এই প্রাকৃতিক পরিতুষ্টি থেকে যুগ যুগ ধরে অবচেতনে শিকড় গেড়ে এসেছে। তাই অর্থাগত কারণে পুরুষ শাসিত চলচ্চিত্র মাধ্যম ভাবনাগত ভাবেও পুরুষ নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে, যার অতি সামান্ত কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই:

১. পোশাক বদলায় মেয়েরা সকলে, পুরুষেও। কিন্তু মেয়েদের কাপড় খোলা, স্নান বা ব্যায়ামের দৃশ্যই যে বেশি গুরুত্বের হয়ে পড়ে তা।
২. দু-দুটি মহাযুদ্ধে ছোট শহরে পরাজিত ও বন্দী হয়ে পড়া স্বল্প সংখ্যক শত্রু

সৈন্যদের অসংখ্য বুদ্ধি মেয়ের ধারাবাহিক লালসা মেটাতে বাধ্য করা হয়েছিল ( বাধ্য করা হয়েছিল যৌনরোগগ্রস্তাদের সঙ্গে মিলনেও ), যাকে অনেকে অ্যান্টিরেপ বলেছেন, কটি ছবিতে তার উল্লেখ পাওয়া যায়, যদিও কারণে অকারণে নারী বর্ষণের দৃশ্য চোকাতে তো উৎসাহে টান পড়ে না ?

৩. হত্যা করে ও জখম করে পুরুষ পুরুষকে, পুরুষ নারীকে, নারী পুরুষকে ও নারী নারীকে, বাস্তবের তুলনায় চলচ্চিত্রে যে নারী অনেক বেশি অল্পপাতে আঘাত ও রক্তপাতের শিকার হয় এই প্রবণতা একেবারে সাম্প্রতিক চলচ্চিত্রে নারীকে দিয়ে নারীকে অত্যাচারিত করার কুশীল্মোটিভেশনে নেমে আসে ( যা উনবিংশ শতাব্দীতে এশিয়া থেকে আগত দাস-দাসীদের শাস্তা করার জ্ঞান নিগ্রো প্রহরী ও নিগ্রো ক্রীতদাসের জ্ঞান আরব প্রহরী নিয়োগের মতো স্কাঙ্কারজনক ) ।

৪. হরর ফিল্মে শরীরের সঙ্গে মাথার অস্বাভাবিক কোণ করে গুঁড় প্রায় বাদানী রক্তে গুয়ে আছে যে হতভাগ্য সে যে একটি মেয়ে বা সে একটি ছেলে হলে তার বীভৎস ও ভীতিপ্রদ শরীর সবচেয়ে প্রথম দেখতে পেয়ে আতঙ্ক ও বিভীষিকায় যে মৃতপ্রায় হয়ে পড়বে সে যে একটি মেয়ে, এও তো প্রায় অবধারিত ।

৫. ব্লু ফিল্ম বা স্যাডিস্ট ফিল্মে যে মেয়েদের মাংসপিণ্ডের মতো দেখানো এবং দুঃস্বপ্নেও কল্পনায় আসে না এমন পদ্ধতিতে অত্যাচারিত করা হবে তা স্বাভাবিক, কিন্তু পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠ পরিচালকের ছবিতেও যখন তারই কাছাকাছি ঝাঁজের পরিচয় পাওয়া যায় এবং রাজনীতি ও দর্শন নির্বিশেষে পাওয়া যায় তখন তার কারণ নুকিয়ে থাকে কোনো আদিয় গহনে কেননা কনভেনশনাল দিনেমায় যখন নারী বিরোধী ভাবনা জাঁকিয়ে বসে তখন তা ততটা ক্ষতি করে না, সিরিয়স ফিল্মে নারী বিরোধী ভাবনা যতোটা করে ।

৬. ব্যভিচার বা চরিত্রাঙ্কনের ইঙ্গিতটি যে প্রায়ই মেয়েদের দিক থেকে আসবে বা তাদের দায় পাবে, সরলতম মুখশ্রীর অধিকারিণীই যে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যে পড়বে বা নির্দোষতম মেয়েটিই হবে ওয়র্স্ট সাফারার এবং নগ্নতা যৌনতা আতঙ্ক অত্যাচার হিংসা ট্রাজেডি যে যত বেশি সম্ভব, মেয়েদের কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে, তা ঠিক হয়ে পড়া এরকম অসংখ্য ট্র্যাডিশনের কয়েকটি ।

এশিয়ার ছবিতে আবার অল্প একটা ব্যাপার দেখা যায় । সেখানে মহিলা মনস্তত্ত্ব নিয়ে ছবি করতে উৎসাহ বেশি । হিংসা ও যৌনতা সেখানে থাকে কম । একাকিত্ব বিবাদ হতাশা মৃত্যুভয় স্মৃতি এই নিয়ে ভারি হয়ে থাকে মেয়েটির মন,

দৈনিক জীবন। এইভাবে খুব টিমোতালে ও ধীর লয়ে মেয়েটির সম্পর্কে দর্শকের  
 মনে একটা সহানুভূতি, সমবেদনা আনতে চাওয়া হয়। বা কখনো সংজ্ঞাতীত  
 অদৃশ্য এক অতীন্দ্রিয় তৃপ্তিতে তাকে উত্তীর্ণ করা হয়। সহানুভূতি সমবেদনা,  
 এগুলো স্তন্যে ভালো, কিন্তু একটি মেয়েকে সমবেদনার পাত্রী করেই রাখা হলো  
 যা তাকে বোধগম্য কোনো তৃপ্তিতেই আনা গেল না, এটা অবশ্যই আপত্তিকর।  
 যেহেতু মধ্যযুগীয় সন্ন্যাসের নিয়ম কালুনের মতো এও আরোপিত। অবশ্য আমি যে  
 সব আপত্তি তুলেছি তার জন্ত, এক মহিলা-প্রাবন্ধিকের ভাবায়, 'মেয়েরা নিজেরাও  
 অনেকটা দায়ী, স্ক্রিপ্ট গার্লের চেয়ে আরও একটু বেশিভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণের  
 সঙ্গে যে মেয়েরা যুক্ত তারাও যে ছবির ব্যাপারে নিজস্ব ধ্যান-ধারণা বা বক্তব্য  
 মন্তব্য বিষয়ে ভেমন সচেতন নয়, মহিলা সমালোচকরাও যে তাদের পর্যালোচনায়  
 কয়েকটি ব্যাপারকে সম্বন্ধে এড়িয়ে যান, চলচ্চিত্র পরিচালিকাও ছবি করতে এসে  
 যে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার উদ্দেশ্যে তৈরি খোপের সঙ্গে নিজেকে খাপ  
 খাইয়ে নিতেই বেশি আগ্রহী এবং শিল্প সাহিত্যে সচেতন আগ্রহ যে মেয়েদের  
 বড়ো কম বা সেই আগ্রহ তৈরির মতো মেধা ও মনন যে আমাদের অধিকাংশই  
 নেই, তা স্বীকার করে নেওয়া ভালো। যেন স্বীকার করা ভালো যে আমরা  
 ভীষণ বেশি অনৈতিক, বিশ্বজ্ঞ ও ব্যক্তিবহীন হয়ে পড়েছি। পণ্য হিসেবে আমরা  
 আমাদের মূল্য বুঝতে পেরেছি এবং তাতেই নিজেদের মূল্যবান ভেবে বসছি।  
 তাই নারীমুক্তি নারীমুক্তি বলে হাজার টেচালেও কিছু এসে যাবে না। সাংসারিক  
 দাসত্ব, এটি ছাড়াও আর একটি দাসত্ব আছে, মানসিক দাসত্ব, সেটা আরও বেশি  
 ক্ষতিকর। তাই সমাধান নিজেদের কোনো অলীক মুক্তি দিয়ে নয়, কেননা  
 সমস্যার কেন্দ্রবিন্দুটি আরও অনেক গভীরে, যা নুকিয়ে আছে আচার আচরণ  
 কাষ্টম রিলিজিয়নে। রয়ে গিয়েছে শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠক্রমে। রয়েছে মেয়েদের  
 প্রতি মেয়েদের দৃষ্টিভঙ্গিতেও।' তাই নারী বিরোধী ভাবনা—দিনেমাথ ও নারী  
 বিরোধী ভাবনা—অথত্র, একই মুদ্রার এ-পিঠ ও-পিঠ। নারী বিরোধিতা  
 দিনেমাথ চেয়েও বেশি প্রকট ও অধিক প্রভাবশালী টিভিতে (ড্র. চলচ্চিত্রে  
 ভাবনাস্বীতি)। নারীবিদ্বেষ নয়, নারীবিরোধিতা নয়, আবার নারীপূজাও নয় :  
 টিভিকে কীভাবে ব্যবহার করতে হবে নির্মাতা হিসেবে—এটা একটা আর্থ-  
 সামাজিক তথা রাজনৈতিক শিক্ষার বিষয় হওয়া উচিত, কেননা নারীবিদ্বেষ থেকে  
 মানববিদ্বেষের দূরত্ব খুব বেশি নয়।

॥ জঁ-পিয়ের মেলভিল ॥

ফ্রান্সের নিউ ওয়েভ চলচ্চিত্রের পূর্বসূরী হিসেবে মেলভিলের (১৯১৭-৭৫) পরিচয় হয়তো অবতারণা নয়, কিন্তু তা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ। 'ক্যাপ্তিভে দ্য সিনেমা'র শব্দিকতা তাঁর কাছ থেকে শিল্পগত ও ব্যবসায়িক দুইদিকে নানা দিগ্‌দর্শন পেয়েছিলেন। একথা যেমন সত্য, তেমনই সত্য যে নিউ ওয়েভ চলচ্চিত্রের পূর্ণ বিকাশের যুগে মেলভিল চলচ্চিত্রকার হিসেবে নিজের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন।

তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ ছবি *Le Silence de La Mer* (১৯৪৭) প্রমাণ করেছিল যে মেলভিল একজন সাহসী পরিচালক ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রযোজক (তাঁর সব ছবির প্রযোজক তিনি নিজে)। যুদ্ধোত্তর ফরাসি ছবিতে এর বক্তব্য ও আঙ্গিক ছিল একটি ব্যতিক্রম। মেলভিলের নিজের কথায়, 'I wanted to attempt a language composed entirely of images and sounds'; অতীতদিকে, মাত্র তিনটি মুখ্য চরিত্র নিয়ে গঠিত এর কাহিনীর প্রায় সবটুকু বলা হয় একটি চরিত্রের জবানবন্দীতে। ব্রেসঁ বলেছেন তাঁর *Journal d'un Cure de Campagne* ছবিতে তিনি এই আঙ্গিক গ্রহণ করেছিলেন।

প্রযোজক হিসেবে মেলভিলের দৃষ্টান্ত পরবর্তীকালে নিউ ওয়েভ গোষ্ঠীকে প্রেরণা দিয়েছিল। নিত্য আর্থিক কারণেই মেলভিলের ছবিতে থাকত স্বাভাবিক ঘটনাস্থল (রাস্তা, ব্যাংক), অপেশাদার অভিনেতা, কমসংখ্যক টেকনিশিয়ান। নিউ ওয়েভ পরিচালকরাও এই পথ গ্রহণ করেন। তাছাড়া তাঁদের অত্যন্ত প্রধান সহায়ক ও ক্যামেরাম্যান জঁরি দেকে (Henri Decae) মেলভিলেরই আবিষ্কার। নানাদিক থেকেই নবতরঙ্গ গোষ্ঠীর ওপর গোড়ার দিকে মেলভিলের প্রভাব পড়েছিল।

মেলভিলের দ্বিতীয় ছবি *Les Enfants Terribles* (১৯৪৯) কবি-নাট্যকার জঁ কক্তোর কাহিনী ও সংলাপ অবলম্বনে নির্মিত। অনেক অভিনবত্ব থাকা সত্ত্বেও ছবিটি অসার্থক হয় দুটি কারণে। এক, চলচ্চিত্রে কাব্যধর্মিতা সম্পর্কে মেলভিলের দ্রুত মোহমুক্তি; দুই, অভিনেতা নির্বাচনে ভুল। ছবির স্টাইল কি হবে সে সম্পর্কে মেলভিলের সঙ্গে কক্তোর কোনো সময়েই মতের মিল হয়নি। পরবর্তী ছবি *Quand tu Liras cette Lettre* (১৯৫৩) ছবিটিও মেলভিলের বিচারে ব্যর্থ, কারণ চলচ্চিত্র-জগতে পেশাদার হিসেবে নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করতে

পক্ষে এই ছবিতে তিনি বেছে নিয়েছিলেন এমন একটি কাহিনী যা, তাঁর মতে, ঐ সময়ের যে-কোনো ফরাসি পরিচালক অন্যায়সে চিত্রায়িত করতে পারতেন।

১৯৫৫ সালে Bob le Flambeur নামক খিলার ছবির সঙ্গে সঙ্গে মেল্ভিলের নতুন সৃষ্টি-জীবন শুরু হলো বলা চলে। আমেরিকান B-film অর্থাৎ গ্যাংস্টার ও অপরাধীদের জীবন-কাহিনীর প্রতি তাঁর চিরকালের যে আকর্ষণ ছিল। তাই এই ছবিকে নতুন রূপ দিল; এই আকর্ষণ পরে গদার ও ক্রফোকেও বিশেষ-ভাবে প্রভাবিত করে (ড্র. ফিল্ম নয়্যার)। এখন থেকে একমাত্র ১৯৬১ সালের Leon Morin, Pretre বাদ দিলে (এক তরুণ ধর্মযাজকের প্রণয়-কাহিনী) তাঁর সব ছবির নায়ক বর্ষাতি ও টুপি-ঢাকা, নিঃসঙ্গ, স্বল্পবাক একটি নাহুষ যে জানে একদিন, হয়তো খুব শীঘ্রই, তার পরাজয় অবশ্যস্তাবী। এই শ্রেণীভুক্ত ছবিগুলি হলো : Deux Hommes dans Manhattan ( ১৯৫৮ ), Le Doulos ( ১৯৬১ ), L' Aine des Ferchaux ( ১৯৬২ ), Le Deuxieme Souffle ( ১৯৬৬ ) এবং Le Cercle Rouge ( ১৯৭০ )।

এর মধ্যে জর্মনবিরোধী ফরাসি গুপ্তযোদ্ধাদের (resistance) নিয়ে মেল্ভিলের ছবি L' Armee des Ombres ( ১৯৬৯ ) সম্পর্কে কোনো কোনো সমালোচক বলেছিলেন যে এটিও আসলে গ্যাংস্টার ছবি, কারণ ছবির দেশভেদিক নায়ক গুপ্তবাহিনীর এজেন্ট ( লিনো ভেনুতুরা ) চলনে-বলনে আর এক গ্যাংস্টার মাত্র। উত্তরে একথা বলা যায় যে, মেল্ভিলের দৃঢ়পণ নায়করা গুপ্ত-অস্ত্রের ভেদ বিচার করে না—তার নিজের চেয়ে অনেকগুণ বড়ো এক শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে প্রায় অনিবার্যভাবে। জন হিউস্টনের নায়কদের মতো তারাও একথা জেনেই যুদ্ধ শুরু করে যে, সব প্রয়াসই একদিন ব্যর্থ হবে। এই ধীমের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ হয়েছে মেল্ভিলের সর্বাধিক পরিচিত Le Samourai ( ১৯৬৭ ) ছবিতে ( নায়ক : আল্যা দেল )।

গুপ্ত-অস্ত্রের বিচারে মেল্ভিলের আর একটি কৌতূহলোদ্দীপক অবদান তাঁর ছবির পুলিশ অফিসার। আইনের সীমারেখার উভয়দিকে থাকা ছাড়া অপরাধী ও দণ্ডদাতার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রায়শ, দুজনেই ব্যক্তিগতভাবে ধীর, স্নেহশীল অথচ নিঃসঙ্গ, দুজনেরই গৃহ নীরব ও অন্ধকার। বস্তুত, ছবির এক স্তরে তারা পরস্পরের সমব্যবীণ গণ্য হতে পারে। দুটি বয়স্ক পুরুষের আত্মিক সখ্য—মেল্ভিলের শেষ দিকের ছবিগুলি নারীবর্জিত বলা যায়—তাঁর ছবির আর একটি প্রধান ধীম।

ধূলার ছবিকে অভিনব একটি দার্শনিক তাৎপর্য দিতে পেরেছেন বলেই মেলভিলকে ভাবীকাল শ্রদ্ধা করবে। তাঁর নায়কদের সহজাত মর্যাদা বোধ এবং জয়-পরাজয়ের প্রতি অভিন্ন দৃষ্টি তাদের আশ্চর্য আভিজাত্য এনে দিয়েছে। আবার, পরাজয় প্রায় নিশ্চিত জেনেও তারা এক বিরাট শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছে তাই তারা পেয়েছে ট্রাজেডির মহিমা। জঁ-পিয়ের গুম্বাখ্ যে Moby Dick-এর স্রষ্টার নামানুসারে নিজের পদবী পরিবর্তন করে নিয়েছিলেন তা হয়তো শুদ্ধ দুর্ঘটনা নয়।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : Melville on Melville : Edited by Rui Nogueira।

অমিয় বসু

॥ জর্জ মেলিয়েস ॥

১৮৬১-১৯৩৮, ফ্রান্স। জন্ম ফরাসি দেশের এক বিত্তশালী ব্যবসায়ী পরিবারে। তাঁর বাবার ছিল একটি খুব নামী জুতো তৈরির ফ্যাক্টরি। মেলিয়েস তাঁর বাবার কারখানায় বেশ কিছুদিন কাজ করে ধীরে ধীরে একজন দক্ষ যেকানিক হয়ে উঠলেন। ১৮৮৪ সালে তেইশ বৎসর বয়সে, মেলিয়েস জুতোর ব্যবসার কাজে কিছু দিনের জন্ত লণ্ডন যান। সেখানে থাকাকালীন তিনি খুব ঘনঘন জাহ্নবিদ্যা প্রদর্শনী দেখতে যেতেন। জাহ্নবিদ্যার প্রতি প্রচণ্ড কৌতূহলবশত তিনিও ধীরে ধীরে ম্যাজিকের নানা কলাকৌশল শিখে নিতে থাকলেন। প্যারিসে ফিরে এসে তিনি জাহ্নবিদ্যার কয়েকটি প্রদর্শনীও করলেন। ১৮৮৮ সালে তিনি প্যারিস শহরে একটি থিয়েটার হল কিনে নিলেন। লুমিয়ের ভ্রাতারা যখন প্যারিসের প্রেক্ষাগৃহে নিয়মিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনী শুরু করেছেন, তখন মেলিয়েসের দৃশ্যপট-অঙ্কনশিল্পী, জাহ্নকর, থিয়েটার হলের মালিক এবং কার্টুনিষ্ট হিসেবে খ্যাতি বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। এর পরে তিনি চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর জন্য কিছু প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কিনে নিলেন এবং গোটা চল্লিশেক ছবি নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করে দিলেন। ১৮৯৭ সালের যে মাসে ফ্রান্সের মনট্রেউল শহরে তাঁর নিজস্ব একটি স্টুডিওরও পত্তন করলেন। বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এইটিই প্রথম ফিল্ম স্টুডিও। এই স্টুডিওতেই ১৮৯৭ সালের বসন্তকালে একদিন হঠাৎ মেলিয়েস ট্রিক ফটোগ্রাফি আবিষ্কার করে বসলেন। এই কৌশলটি এবং ডাবল এক্সপোজার, স্পার ইম্পোজিশন, টেবল টপ ডামি ইত্যাদি কৌশলের সাহায্যে মেলিয়েস চলচ্চিত্রের জগতে জাহ্নবিদ্যার আমদানি করলেন।

ক্যামেরা যন্ত্রটির পেছনে কল্পনাশক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে জর্জ মেলিয়েসই প্রথম পথিকৃৎ। ক্যামেরাকে তিনি অনেক সময়েই ব্যবহার করেছেন জাদুদণ্ডের মতো। প্রকৃতপক্ষে, মেলিয়েসই সর্বপ্রথম চলচ্চিত্রে কল্পকাহিনীর জন্মদাতা। তিনি যে শতাধিক ছোট ছবি তুলেছিলেন সেগুলির কল্পনার সজীবতা ও অন্তর্গত তাঁর সমকালীন দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছে। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত ও জনপ্রিয় ছবির নাম হলো 'দি বিউইচ্‌ড্‌ ইনন্' ( ১৮৯৭ ), 'দি ব্রাঞ্চিং এ্যাণ্ড দি বাটার-ফ্লাই' ( ১৯০১ ), 'দি ভয়েজ এ্যাক্রস দি ইম্পসিবল' ( ১৯০৪ ), 'সোপ বাব্ল্‌স' ( ১৯০৬ ), 'দি কনকোয়েস্ট অফ দি পোল' ( ১৯১২ ) এবং 'এ ট্রিপ টু দি মুন'। এ ছাড়া কিছু ডকুমেন্টারি বা দলিলচিত্রও তিনি তুলেছিলেন, যার মধ্যে 'দি ডেকার্স এ্যাফেয়ার্স' ( ১৮৯৯ ) এবং 'দি করোনেশন অফ এডোয়ার্ড এইট' ( ১৯০২ ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর বেশিরভাগ ছবিই প্রযোজিত হয়েছিল স্টার ফিল্মসের নামে এবং ১৯১১ সাল থেকে শিল্পপতি চার্লস্‌ পাথে তাঁর সঙ্গে ব্যবসায়িক সহযোগিতা শুরু করেন এবং মেলিয়েসের ছবিগুলির পরিবেশক নিযুক্ত হন। কিন্তু আর্থিক ব্যাপারে পাথে মেলিয়েসকে এমনভাবে ফাঁদে জড়িয়ে ফেলেন যে তা মেলিয়েসের পক্ষে প্রচণ্ড মানসিক অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং পরিণামে প্রচুর ঋণগ্রস্ত অবস্থায় ১৯১৩ সালের পর থেকে জর্জ মেলিয়েস চলচ্চিত্রের জগৎ থেকে বিদায় নেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর তাঁর থিয়েটার হল এবং স্টুডিওটি বিক্রী হয়ে যায়। ১৯২৩ সালে তিনি একটি খেলনার দোকানে সামান্য একটি চাকরি নেন। ১৯২৯য়ে তাঁকে বিলম্বিত সম্বর্ধনা দেওয়া হয় এবং ক্রস অফ দি লী-জেন অফ অনার-এ ভূষিত করা হয়। তাঁর জীবনের শেষ কয়েকটি বছর প্যারিসেরই একটি শহরতলীতে ঘটনাবিহীনভাবে কাটে এবং ১৯৩৮ সালের ২১শে জানুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়।

চলচ্চিত্রের ইতিহাসে মেলিয়েসকেই প্রথম যথার্থ সিনেমা পরিচালক বলা চলে। তাঁর ছবিগুলির বিষয়বস্তুও ছিল নানা ধরনের—রূপকথা, লোককথা, ঐতিহাসিক কাহিনী, বিজ্ঞান-ভিত্তিক কল্পকাহিনী, অপরাধ কাহিনী, এবং নিউজ রীল এই সবকিছুকে অবলম্বন করেই তিনি ছায়াছবি তুলেছেন। চলচ্চিত্র-নির্মাণের প্রকরণগুলিকে তিনিই সর্বপ্রথম সুসম্বন্ধভাবে কাজে লাগান। আলোকচিত্র এবং যন্ত্রাভিনয় এই দুটো ব্যাপারেই তাঁর সমান জ্ঞান ও পারদর্শিতা থাকার ফলেই তিনি চলচ্চিত্রের অনেক নতুন টেকনিকের প্রবর্তন করতে পেরেছিলেন। তাঁর উদ্ভাবনীশক্তির সাহায্যে চলচ্চিত্রের স্বধর্মের কিছুটা স্পর্শ করতে পেরেছিলেন।

চলচ্চিত্রের নিজস্ব ইলিউশন বা মায়ার জগৎ যে থিয়েটারের ইলিউশন থেকে কিছুটা আলাদা এ জিনিস প্রথমে মেলিয়েসের ছবির মধ্যেই দেখা গেল। চলচ্চিত্র-নন্দনের ইতিহাসেও প্রথম নাম তাঁর। জর্জ সাহুল লিখেছিলেন, চলচ্চিত্র শিল্পের জনক, মিজ ঐ সেন-এর সৃষ্টিকর্তা, পৃথিবীর প্রথম চলচ্চিত্র-নির্মাতা মেলিয়েস নিজেকে তাবতেন একজন শিল্পী হিসেবে। তিনি বলেছিলেন তিনি একজন শিল্পী এবং শিল্পীই হতে চান। ১৯০৭ সালেই তিনি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যার নাম চলচ্চিত্রে প্রতিরূপ বা সিনেম্যাটোগ্রাফিক ইমেজ। সব মিলিয়ে প্রকৃতই তাঁর ছিল বিশ্বদ্রকর প্রতিভা।

রুজত রায়

॥ দারিয়ুস মেহরজুই ॥

( জন্ম ১৯৩৯, ইরান )। বর্তমান চলচ্চিত্র আন্দোলন যে মুক্তিকামী মানুষের সশস্ত্র সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে চলেছে তা তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন চলচ্চিত্র নির্মাতাদের ভূমিকা প্রমাণ করে। তৃতীয় বিশ্বের ছবি করিয়ে দেশগুলির মধ্যে ইরানকে চলচ্চিত্র আন্দোলনের শরিক হিসেবে যিনি সর্বপ্রথম তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তিনি হলেন দারিয়ুস মেহরজুই। ইরানি সমাজ ব্যবস্থায় শোষণ, নিপীড়ন ও অবক্ষয়ের চেহারাটি সর্বপ্রথম আমরা মেহরজুইয়ের সৃষ্ট চিত্রগুলির মধ্যে পাই। তিনি খুব দস্তবতঃ প্রথম ব্যক্তি যিনি মোটামুটি ভাবে শোষণ ভিত্তিক সমাজে ছোট্ট একটা নাড়া দেবার সাহস দেখিয়েছেন। তাঁর প্রথম ছবি 'গু কাউ' নির্মিত হয় দশকের সামান্য কিছু আগে। একটি গরুর হারিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ ছবির বিস্তার। গল্পের কেন্দ্র চরিত্র নিঃসন্দেহে একজন দরিদ্র কৃষক। শোষণ যন্ত্রের প্রতিঘাতে সে উন্মাদ হয়ে যায় তার একমাত্র মূলধন 'গরু' হারানোর। এই সঙ্গে মেহরজুই তাঁর সমাজ কাঠামোর সংস্কার, ভয়, অশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়কে নমাজ নমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। মেহরজুইয়ের পরের ছবি 'গু জানুক হাউস' ও 'গু পোষ্টম্যান'। এই ছবি দুটি তেমন সাড়া জাগাতে না পারলেও ছবি নির্মাণের পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে, নতুন ইমেজ গঠনের এবং সেই সঙ্গে বিষয়-ভাবনার প্রবাহটি তিনি অব্যাহত রাখেন। মেহরজুই-এর সব থেকে বিতর্কিত ছবি 'গু সাইকেল', রিলিজ হওয়ার সাথে সাথে ইরানের শাহ নরকার ছবিটির দেশে বিদেশে প্রদর্শন নিষিদ্ধ করে দেন। এই সঙ্গে এই তরুণ পরিচালককে নানাভাবে বাধা দেওয়া হয় যাতে করে এই শিল্পী

পরিচালক আর কোন সমাজ সচেতন ছবি করতে না পারেন। অবশেষে 'জু সাইকেল' সাতান্তরে প্যারী উৎসবে দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। এখানেই ছবিটি যথেষ্ট সমালোচনা ও বিতর্কের ঝড় তোলে। 'জু সাইকেল'-এর গল্প বলা হয়েছে এক দরিদ্র কৃষক সন্তান আলীকে নিয়ে। এই দরিদ্র যুবকের ধীরে ধীরে নৈতিক অধঃপতন ও দেশজোড়া শোষণ তীব্রতর করে দেখানো হয়েছে। আলী ও তার ষাণা শহরে আসে বাঁচার তাগিদে, দারিদ্র মেহেতু এদের মরণদণ্ডী তাদের সংগ্রাম গড়ে ওঠে কেবল বেঁচে থাকার প্রত্যয়ে। শহরে রক্ত বিক্রীর পসার বসেছে। এবং মাহুষের রক্ত নিয়ে অনৈতিক ব্যবসা জাঁকিয়ে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে আমরা আলীকে দেখি তার রক্ত বিক্রী করতে। আলীও মেতে ওঠে এই অমানবিক ব্যবসায়। মুনাফা আর মুনাফা এই উল্লাস আলীকে পেয়ে বসে। সরকারের চোখের উপরে রক্ত বেচা কেনার উৎসব, অপরদিকে হতাশা, দারিদ্র, প্রবঞ্চনা, শোষণ পর্বীর উপর ছড়িয়ে পড়তে থাকে। মেহরজুই এক নিষ্ঠাবান সচেতন পরিচালক। তিনি সমগ্র ইরানের অবক্ষয়ের চেহারাটি তাঁর ছবির ফ্রেমে রেখে দিয়েছেন। চরম বিপর্যস্ত নত্যকে, বাস্তবকে নিষ্ঠার সঙ্গে তুলে ধরেছেন কোন মোহ, ভয় না রেখেই। এই ছবি দেখে জনৈক সমালোচক বলেছেন : 'Mehr-jui's use of his principal characters as symbols of the various conflicting forces within contemporary Iran is also quite remarkable. Ali's father, Ali and Sameri, symbolize the forces of religion, oppression and youth at odds with one another.'

তৃতীয় বিবে ভেতরে বাইরে শোষণের বিরুদ্ধে যে লড়াই চলেছে সেই প্রেক্ষাপটে মেহরজুইয়ের ভূমিকা উপেক্ষা করার মতো নয়। এই প্রসঙ্গে গুণের ছবির সঙ্গে তাঁর ছবির তুলনা মনোগ্রাহী হতে পারে। ইরানে শাহ সরকারের পতনের পর ও ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর তিনি কিছুকাল স্বদেশে নীরব থাকেন ও তারপর তিনি যে ছবি করেন তাতে আবার প্রগতিশীলতা বনাম মৌলবাদ এই দ্বন্দ্ব দেখা গেছে।

প্রদীপ বিশ্বাস

॥ মোটিফ ॥

মোটিফের সংজ্ঞা হলো a dominant image or idea or one of the central subthemes as in a work of art. বিশেষ কোনো প্রতীক, প্রতিমা বা প্রয়োগ

সচেতন পুনরাবৃত্তি, পুনরাবৃত্তির অভিধাত ও ন্যূনতম পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রয়োগের মধ্য দিয়ে মোটিক হয়ে ওঠে। মোটিক চিত্রভাষার, একই সঙ্গে, quantitative « qualitative উপাদান, মোটিক বর্ণ, সংগীত, বিশেষ কোনো টেকনিক — যে কোনোটি ভিত্তিক হতে পারে। মনতাজ বা দৃশ্যের ব্যবহারও অনেক সময়ই মোটিক হয়ে ওঠে। একই দৃশ্যাংশ, পটভূমি বা সংলাপ দামাশ্ব এদিক ওদিক করে ব্যবহার করে যখন বক্তব্য, মন্তব্য, হংগিত বা ব্যঞ্জনা আনা হয় তখন তা মোটিকতুল্যই। রঙ বা রঙের বিশেষ কোনো কম্পোজিশনের, নির্দিষ্ট সংগীত বা সংগীতাংশের, বিশেষ কোনো শট কম্পোজিশন বা ক্যামেরা মুভমেন্টের মোটিক হয়ে ওঠার অসংখ্য উদাহরণ বহু ছবিতে রয়েছে। যে-সমস্ত ফিল্ম টেকনিক প্রায়ই মোটিকের কাজ করে তার মধ্যে ফ্রীজ, ডীপ ফোকস, আকস্মিক পীড়াদায়ক আলো, ফ্রেম ছোট অবলিক কি ইনভারটেড করে দেওয়া প্রভৃতি অত্যন্তম। স্থপার ইম্পোজিশনও অনেক সময় সাদৃশ্য বা বৈপরীত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে অহুত্বিত বা মন্তব্যকে তীক্ষ্ণ করে, সেখানে তার কাজ মোটিকের। বাইবেলের বহু অল্পবয়স্ক (যেমন দপ্তম মোহর) বার্গম্যানের ছবিতে মোটিকের পর্যায়ে পৌঁছেছে। কোনো একটা দৃশ্য বা কল্পমূর্তির পিছনে যে সৌন্দর্যরস তাও অনেক সময় মোটিকের কাজ করে। যেনন কোনো পরিচালকের প্রায় সব ছবিতেই প্রত্যক্ষ অথবা প্রচ্ছন্নভাবে একই ধর্ম ক্রিয়াশীল থাকতে পারে, সেও মোটিকের উদাহরণ। উপাদান হয়েও মননশীল প্রয়োগের মাধ্যমে মোটিক হয়ে উঠতে পারে একটা পদ্ধতিও, গদার রেনে ও আইজেনস্টাইনের ছবি ঘর প্রমাণ।

## ॥ ঈভ্ মোঁট ॥

(জন্ম ১৯২১, ইতালি)। প্রকৃত নাম Ivo Livi তাঁদের ইহুদী চাষী পরিবার মুসোলিনি ক্ষমতায় এলে ইতালি ছেড়ে পালিয়ে আসে। অল্প বয়স থেকেই মোঁট ফ্রান্সে এসে সংগীত নিয়ে অহুশীলন শুরু করেন। তাঁর শৈশব ছিল দারিদ্র, ছোটখাটো অস্থায়ী চাকুরি, আর বেকারত্ব সমাকীর্ণ। ক্রমে সংগীত শিল্পী রূপে তিনি প্যারিসের বিখ্যাত মিউজিক হলগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে অভিনয়ের জগতে আসেন (তাঁর প্রথম ছবি ৪৬য়ে 'স্টার উইদাউট লাইট') এবং ক্লুজোর 'দি ওয়েজেস অব কিয়ার', Autant-Lara-র 'Marguerite de la Nuit', 'নেপোলিয়ন', রেনের 'দি ওয়র ইজ ওভার', লেনুশের 'লিভ ফর লাইফ', কষ্টা-গাত্রানের 'দি স্লিপিং কং মার্ভারস', 'জেড', 'L' Aveu', 'স্টেট অব সীজ' ও অত্যাশ্চ ছবি,

'দি রেডস টু দি সাউথ' এবং কার্ণে, পণ্টিকোর্ভো, রিচার্ডসন, কুকর, মেলভিল, রুপ বেরি ও গদারের ছবিতে অভিনয় করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি পান। তাঁর অভিনয়ে প্রত্যয়ী ব্যক্তিত্ব ও সুপ্ত রোমাণ্টিকতার ছাপ রয়েছে। যে জগু অ্যাক্টিভ 'হেরো ও প্রেমিক চরিত্র—দুই প্রকার অভিনয়েই তিনি সাবলীল। ব্যক্তিগত মানে তিনি ও তাঁর অভিনেত্রী স্ত্রী (মৃত্যু : ১৯৮৫) বামপন্থী রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী। এই প্রসঙ্গে তানেসা রেডগ্রেভের কথা মনে আসে। হলিউডের ছবিতেও তিনি অভিনয় করেছেন। গায়ক রূপেও তিনি বিশেষ জনপ্রিয়।

॥ স্লো / কুইক / স্টপ্‌ড্‌ মোশন ॥

দেহকেও ২৪টি করে ফ্রেমের স্বাভাবিক গতির চেয়ে বেশি গতিতে ক্যামেরায় ছবি তুলে সেই ছবিকে যখন স্বাভাবিক গতিতে পর্দায় প্রক্ষেপ করা হয় তখন পর্দায় প্রদর্শিত অ্যাকশনের গতি মন্থরগামী মনে হয়। একে স্লো মোশন বলে। স্বপ্ন ও ক্যান্টাসির দৃশ্যে এর সুন্দর প্রয়োগ ঘটেছে। ব্যবহার ঘটেছে ড্রাজিক মুহূর্ত ও কাব্যিক মুহূর্তে। সময়ের কোনো একটি বিশেষ মুহূর্তকে চিহ্নিত করে রাখার উদ্দেশ্যে ও ক্রীড়াচিত্রে বিশেষ বিশেষ অংশকে বোধগম্য করে বোঝাতেও এর ব্যবহার হয়। স্লো মোশনে এক ধরনের সূক্ষ্মতা, রোমাণ্টিকতা ও বিবাদ রয়েছে।

স্বাভাবিক গতির চেয়ে কম গতিতে ক্যামেরায় ছবি তুলে সেই ছবিকে যখন স্বাভাবিক গতিতে পর্দায় প্রক্ষেপ করা হয় তখন পর্দায় প্রদর্শিত দৃশ্য ও অ্যাকশনের গতি স্বাভাবিকের চেয়ে দ্রুতগামী মনে হয়। একে কুইক মোশন বলে। কনিক রস, সৃষ্টিতেই এর প্রধান ব্যবহার ঘটেছে। বিশেষ কোনো অল্পভব, অভিযুক্তি, মুহূর্ত বা অ্যাকশনকে প্রাধান্য দিতেও এর প্রয়োগ ঘটে। অ্যাডভেঞ্চার ফিল্মে অ্যাকশনের গতি বাড়িয়ে দিয়ে কুইক মোশন এই ধরনের ছবিকে আরো উত্তেজক করে তোলে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও বিজ্ঞানভিত্তিক ছবিতে এর বিশেষ প্রয়োজন আছে।

স্লো মোশন, কুইক মোশন-এর সঙ্গে মিলিয়ে ফ্রিজকে অনেক সময়ে বলা হয় স্টপ্‌ড্‌ মোশন। গতিশীল দৃশ্যে গতিকে কিছুক্ষণের জন্ত আকস্মিক স্তব্ধ করে দেওয়াই স্টপ্‌ড্‌ মোশন (ড্র. ফ্রিজ)। নানা কারণে এর ব্যবহার ঘটে। কখনো পরিচালকের বিশেষ কোনো বক্তব্য বা ইঙ্গিত প্রকাশ করতে, কখনো চরিত্রের কোনো অল্পভব বা আচরণের প্রতীক হিসেবে, বিশেষ কোনো মুহূর্তে অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করে, ও কোনো ফ্রেম বা সময়ের ভগ্নাংশকে (তথাকথিত) ঐদৃশ্যিক ও অনন্ত কালচেতনা দিতে। ছবির সমাপ্তিতে ফ্রিজের প্রয়োগ বিগত

দুই দশকে ভীষণ বেড়েছিল। ফ্রিজ যেমন স্থান-কাল-চেতনার এক স্বল্প রূপারোপ, তেমনি খুব অল্প সময়ের কোনো অ্যাকশনকে চরম স্নো মোশনে অনেকগুলি স্নো ছুড়ে দেখিয়ে কালের স্থানে রূপান্তর ও চরম কুইক মোশনের সাহায্যে স্থানের কালে রূপান্তরও সম্ভব। (ড্র. ক্যামেরাতাষা, স্থান-কাল-চেতনা)

## ॥ নর্ম্যান ম্যাকলারেন ॥

১৯১৪-১৭, স্কটল্যান্ড। নর্ম্যান ম্যাকলারেন কানাডার জাতীয় ফিল্মবোর্ডের সঙ্গে ১৯৪১ সাল থেকে যুক্ত। তাঁর প্রচেষ্টায় ওই দেশ অ্যানিমেশনে চূড়ান্ত সহকৃষ্টি লাভ করেছে। তিনি ছিলেন এক বিরল শিল্প-ব্যক্তিত্বের শিল্পী। তাঁর শিল্পের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন তা বিভিন্ন উপাদানের সম্মেলন। যার কিছু কিছু পুরোপুরি 'টেকনিক্যাল' আবিষ্কার, যেমন ডট্‌স্‌ এবং লুপ্‌স্‌, বিনা ক্যামেরায় সিনেমা কিংবা 'সিন্বেটিক সাউণ্ডের' ব্যবহার। সংগীতের কোনো নির্দিষ্ট টুকরো থেকেই জন্ম নেয় তাঁর ছবির পরিকল্পনা, যেমন 'Begone Dull Care' ছবিটি হাতে রং করা অবিভাজিত ফ্রেমের এক ধীর ও বারাবাহিক প্রবাহ, যা ছবির সাংগীতিক লয় ও তালের সঙ্গে নামঞ্জর ও পারস্পর্য বজায় রেখে চলেছে। 'C'est L'Avion' ছবিতে প্রথাগত অ্যানিমেশনে জুম টেকনিকের ব্যবহার এখন তুলন গতি সঞ্চার করে। শব্দের সঙ্গে দৃশ্যের যোগসূত্র নির্ধারণ করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন তাঁর পর্দায় সমস্ত দৃশ্যের সূচনা হয় ধ্বনি থেকে। এ হলো এক ধরনের ছবিতে। অন্য ধরনের ছবিতে শব্দ সংযোজিত হয় দৃশ্য নির্মাণের পর। সব অবস্থাতেই লক্ষণীয় যে ধ্বনির সঙ্গে তিনি কখনো সংলাপকে টেনে আনেননি।

মুক্‌ভিনয় ও নৃত্য, বিযুক্ত আইডিয়া ও ফর্ম-প্রধান অঙ্কন এরকম বিভিন্ন উপাদানের সংযোগে অ্যানিমিমেটেড ছবি নির্মাণে ম্যাকলারেন দৃশ্য ও ধ্বনির সমান্তরাল প্রয়োগের চাইতে কৌণিক প্রয়োগে বেশি আগ্রহী যেহেতু তাতে ঐ দুই উপাদান পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠতে পারে। ডিজনির স্বাভাবিকতাবাদী ধারা থেকে তাঁর ধারা সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি কাল্পনিক গতিভঙ্গির সাহায্যে ও নব্য চিত্রকলার রীতিকে অহুসরণ করে অভিনব ধরনের ছবি তৈরি করেছেন।

রং প্রয়োগের নীতি ও নিয়মের প্রক্ষে তিনি নিজেই বলেছেন রং-এর চেয়েও গতিভঙ্গি আরো বেশি গুরুত্বের। সাদা কালোয় পরিকল্পিত ছবিতে পরবর্তীকালে প্রযুক্ত রং বাঞ্ছিত আবেগের জন্ম দিয়েছে।

পাঁচ মিনিটের কার্টুন ফিল্ম তৈরি করতে ম্যাকলারেনের বস্তুত দরকার পড়ে

৫০০ ফুট দীর্ঘ ও ১৬ ইঞ্চি প্রস্থের এক পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ সেলুলয়েডের রোল যাতে একটির পর একট খণ্ডচিত্র আঁকা হয় যার একেকটি উচ্চতায় ৬" ও প্রস্থে ৬"। ৫ মিনিটের একট ছবিতে এই আকারের দাত সহস্রাবিক ফ্রেম দরকার হয় যেগুলো মনে হবে প্রায় একরকম। এগুলি তিনি আঁকতেন কালি-কলম, কালি-তুলি, প্যাটেল, ডাই ও ক্রেয়ণে। তুলি ব্যবহার করা হতো ঘনত্ব ও টোনের পার্থক্য আনতে। সমস্ত ছবি একই শিল্পী আঁকতেন যেজন্ত বারাবাহিকতা ও সাদৃশ্য নিখুঁত বজায় থাকত। ডিজনির অ্যানিমিমেটেড ছবিতে অনেকে মিলে ছবি আঁকার যে ধারাবাহিকতা যথেষ্ট সূক্ষ্ম হতো। অঙ্কনের সময় চলচ্চিত্রে প্রদর্শিত ঘটনাক্রম পুরোপুরি অনুসরণ করা হতো ফলে ভারসাম্য রক্ষা করতে গিয়ে সম্পাদনার সময় হঠাৎ হঠাৎ ইনসারশনের প্রয়োজন হতো না। ট্রান্সজিশনও হতো নিখুঁত ও সুসমঞ্জস। প্রথম থেকেই সম্পূর্ণ ছবির কথা মাথায় রেখে কাজ করা হতো বলে গতি, গতিভঙ্গি, আলোছায়া ও রং বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ইমপ্রোভাইজেশনের স্বযোগ থাকত। ১১" X ১৪" মাপে একে সেগুলির আলোকচিত্র গ্রহণের প্রথাগত অ্যানিমেশন শৈলী থেকে ম্যাকলারেন তাই ছিলেন পুরোপুরি আলাদা।

ম্যাকলারেন গতিবৃদ্ধি ও গতিস্থান জনিত তারতম্যকে কাজে লাগান। তাঁর ছবির স্বতঃস্ফূর্ততা আর একজনের ছবিতেই দেখা যায়, তিনি লেন লি। মাত্র ৬" X ৬" ফ্রেমে যথেষ্ট ডিটেল আঁকা সম্ভব হয় না বলে ম্যাকলারেন জটিল দৃশ্যঙ্কন থেকে বিরত থাকতেন, টানা লাইন, ক্যালিগ্রাফি, সহজ জ্যামিতিক রূপারোপের এবং সুস্পষ্ট নাইলাইজেশনের ওপর নির্ভর করতেন। ম্যাকলারেনের ছবিতে হস্তান্তর কতকগুলি বিশেষত্বও আছে যা দাম্পত্যিক কালের কার্টুন চিত্রে প্রায়ই দেখা যায় না। যেমন ধরা যাক কাটিং বা কেডিং-এর সাহায্যে টুকরো টুকরো দৃশ্যের সহজে একটি বিশেষ বক্তব্যকে উপস্থিত করার প্রচলিত পদ্ধতি। কিন্তু তিনি তাঁর ছবিতে একটি সুদীর্ঘ শট ব্যবহার করে এক নিরবচ্ছিন্ন প্রবহমানতা বজায় রাখেন শুরু থেকে শেষ অবধি। দর্শকের আগ্রহ বজায় রাখা হয় পর্নায় প্রদর্শিত ঘটনা ও ক্রিয়ায় ক্রমপরিবর্তন এনে।

স্তেমনি মেটামরফোসিস, অ্যানিমেশনে এক ফর্ম থেকে আর এক ফর্মে পরিবর্তন ও রূপান্তর। গল্পের প্রয়োজনে চিত্রমূর্তিকে ভেঙে দেওয়া ও তার পুনর্গঠন। কার্টুনচিত্র বাস্তববাদের দিকে ঝুঁকি পড়ায় এই রীতি বছদিন উপেক্ষিত ছিল। এই রীতি পরে ম্যাকলারেনের প্রচেষ্টায় তিন ভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। প্রথমত এক দৃশ্যবস্তুর থেকে দৃশ্যগত বা মানসগত ভাবে সম্পূর্ণ অসম ও বিসদৃশ অস্ত্র কোনো দৃশ্য-

বস্তুতে পট পরিবর্তন। দ্বিতীয়ত বস্তুর আকারগত ও দৃশ্যগত সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করে রূপান্তর। তৃতীয়ত মন বা অবচেতন মনের ছবি ও প্রতিচ্ছবি নির্ভর রূপান্তর।

নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া কটি ম্যাকলারেনের কর্মপদ্ধতির পরিচয় দেবে—

১। সংগীত রেকর্ড করা হয় প্রথমে। ২। সংগীত ও ধ্বনির ফিতে মুক্তিওলায় চালিয়ে গ্রীজ পেন্সিলে নির্দেশ-চিহ্ন রাখা হয়। ৩। সংগীতের প্রতিটি তাল, শব্দ ও অব্যায়ের দৈর্ঘ্য ফ্রেমের সংখ্যা দিয়ে হিশেব করা থাকে। ৪। গ্রীজ পেন্সিলে নির্দেশিত সাউণ্ড ট্র্যাককে ডামির সঙ্গে একত্রে চালিয়ে ডামিটিকে নিয়ন্ত্রিত ও সম্পূর্ণ করা হয়। ৫। চূড়ান্ত অঙ্কনের সময় এমন একটি যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয় যার কাজ হলো ফিল্মকে জায়গামতো ধরে রাখা, ঝাঁকা হয়ে গেলে ফ্রেমকে সরিয়ে দিয়ে পরের ফ্রেমকে নিয়ে আসা ও যে ফ্রেমটি সচ ঝাঁকা হলো তাকে একটি পর্দায় প্রতিফলিত করা যাতে যে ফ্রেমটি ঝাঁকা হবে তাতে পর্যায়ক্রম বজায় থাকে। ৬। ঝাঁকা হয় প্রথম ফ্রেম প্রথমে, পরের ফ্রেম তারপর, এইভাবে শেষের ফ্রেম সবশেষে। ৭। ঝাঁকা শেষ হলে রদায়নাগারে দৃশ্য ট্র্যাকের প্রিন্ট-কপি করা হয় ও তাকে সংযুক্ত করা হয় ধ্বনি ট্র্যাকের সঙ্গে। ৮। রঙিন ছবি হলে মাষ্টার-প্রিন্টের বিভিন্ন ডোপ তৈরি করা হয় ও রঙিন প্রস্ফুটনের ক্ষেত্রে সেগুলি পৃথক পৃথক নেগেটিভের কাজ করে। আঙ্গিকের অবকাশকে মৌলিকভাবে না বাড়াতে পারলে কারুকো প্রকৃত অর্থে পরীক্ষামূলক বলা যায় না। আর সেদিক থেকে দেখলে ম্যাকলারেন দর্প অর্থেই পরীক্ষামূলক।

অন্তান্ত ছবি : Stars and Stripes, Neighbours, A Chairy Tale, Canon, Pas de deux, ইত্যাদি ॥

জে. এইচ

॥ রজার ম্যানভেল ॥

(জন্ম ১৯০৯, গ্রেট ব্রিটেন)। চলচ্চিত্র-ঐতিহাসিক, চলচ্চিত্রের বিভিন্ন বিষয়ের প্রাবন্ধিক এবং বহু শিক্ষামূলক ও অ্যানিমেটেড চিত্রের চিত্রনাট্যকার রজার ম্যানভেলের নাম চিত্রসমালোচনার ইতিহাসে গুরুত্বের সাথে উল্লিখিত হয়ে থাকে। তাঁর সম্পাদিত কর্মের মধ্যে রয়েছে সোসাইটি অব ফিল্ম অ্যাণ্ড টেলিভিশন আর্টস-এর পত্রিকা এবং দি টেকনিক অব ফিল্ম মিউজিক ও দি ইন্টারগ্যাশনাল এননাই-ক্লোপেডিয়া অব ফিল্ম গ্রন্থ। রচিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে হিন্দ্রি অব দি ব্রিটিশ ফিল্ম (১৮৯৬-১৯০৬), দি জার্মান সিনেমা, শেক্সপিয়ার অ্যাণ্ড দি ফিল্ম, দি টেকনিক

অথ ফিল্ম অ্যানিমেশন, দি ফিল্ম অ্যাণ্ড দি পাবলিক প্রভৃতি। তাঁর রচনায় ইতিহাসের সঙ্গে এসেছে শিল্পরূপের কথা, তথ্যমূলকতা ও টেকনিকাল জ্ঞানের মনোর সংমিশ্রণ ঘটেছে ( দ্র. চলচ্চিত্র সমালোচনা )। তথ্যচিত্রকে জনপ্রিয় করার পিছনেও তাঁর বিশেষ অবদান আছে।

॥ ম্যারেড / কস্‌মাইণ্ড / কম্পোজিট প্রিন্ট ॥

সম্পাদনার সময়ে দৃশ্যের পঞ্জিটিত প্রিন্ট ও শব্দের চৌষক ট্র্যাককে কাজের সুবিধে, সম্পাদকীয় সিদ্ধান্ত ও টেকনিকাল নম্যতার জ্ঞান পৃথক পৃথক ভাবে গুটিয়ে রাখা হয়। ছবির সমস্ত কাজ যখন চূড়ান্ত ভাবে শেষ হয়ে যায় শব্দের চৌষক ট্র্যাককে তখন অপটিকাল ট্র্যাকে পরিবর্তিত করে ( দ্র. মিকসিং ) ছবির চূড়ান্ত দৃশ্য নেগেটিভ ও শব্দ নেগেটিভকে একই পঞ্জিটিভের উপর পরিস্ফুটন করা হয়। দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে ও পাশাপাশি শব্দের এই সংলগ্ন একক প্রিন্টকে ম্যারেড প্রিন্ট বলে। সমস্ত রিলিজ প্রিন্ট এই প্রিন্ট অনুসারে করা হয়ে থাকে। এই প্রিন্ট থেকে দৃশ্য ও শব্দের বিভাজনের কোনো সম্ভাবনাই থাকে না। যদি প্রিন্টের কোনো অংশ পরে কেটে বাদ দেওয়া হয় সম দৈর্ঘ্যের দৃশ্য ও শব্দ বাদ পড়ে বলে সিনক্রোনাইজেশন অব্যাহত থাকে। তবে যদি টানা সংগীত বা আবহ সংগীত থাকে তবে সাংগীতিক ধারাবাহিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

॥ যৌনতা ও চলচ্চিত্র ॥

চলচ্চিত্রে যৌনতার প্রদর্শনটিকে অন্ততঃ তিনটে ভাগে ভাগ করা যায়।

১. যৌনতার শারীরিক, সমাজতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক, ও সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ নিয়ে যে সমস্ত মেডিকাল ও জনশিক্ষামূলক ফিল্ম, তথ্যচিত্র, নৃতাত্ত্বিক চিত্র ও গবেষণামূলক চিত্র নির্মিত হয়ে থাকে সেগুলি। জেনেটিক্স ও হেরেডিটির মতো বিগুহ বৈজ্ঞানিক বিষয়ও এর অন্তর্ভুক্ত।

২. এর ঠিক বিপরীত মেরুতে অবস্থিত বিভিন্ন যৌন আচরণের প্রত্যক্ষ ও নির্লজ্জ চিত্রায়ণ এবং বিচিত্র যৌন বিকৃতির প্রদর্শনপ্রিয়, পর্নোগ্রাফিক উপস্থাপন ( দ্র. স্কু ফিল্ম )।

৩. এই দুই শ্রেণীর মাঝামাঝি রয়েছে কাহিনীচিত্রে নগ্নতা ও যৌনতার ভূমিকা। চলচ্চিত্রের সমাজতত্ত্বে ও পরিচালকের মনস্তত্ত্বে এই প্রসঙ্গ বারবার এসেছে। কাহিনীচিত্রে নগ্নতা ও যৌনতা কখনো যেমন অসাধারণ শিল্প-স্বষমা, ব্যঞ্জনা ও

উত্তরণ নিয়ে এসেছে, কখনো তেমনি বিতর্ক বা প্রতিবাদের রূপ ধরেও এসেছে। স্নীলতা ও অস্নীলতার প্রশ্নও এর সঙ্গে জড়িত। নগ্নতার সঙ্গে যৌনতার সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। কিন্তু নগ্ন নারীমূর্তি দর্শনে যৌনকামনা জাগবেই এ ধারণাটি স্বতঃসিদ্ধ নয়। মূল ফ্রেমের কতটা অংশ ছুড়ে নগ্নতা ও যৌনতার ইমেজটি তা অনেক সময় দর্শকের ওপর ওই ইমেজের প্রতিক্রিয়া কতটা হবে তা নিরূপণ করে, তারই সঙ্গে ব্যাকগ্রাউণ্ড / ফোরগ্রাউণ্ড বিভাজন, ফ্রেমে আর কোন দৃশ্যবস্তু উপস্থিত, ক্যামেরা-কোণ ও গতি, এবং আবহ ও ধ্বনিও এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ। দেশ থেকে দেশে নগ্নতা ও যৌনতা বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি ও মাপকাঠি যেমন আলাদা, ধনতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও সনাতনতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে তার রূপারোপও তেমনই পৃথক। যেমন যৌনতার রূপকল্প প্রকৃতই একাধিক ধরনের অস্থূতি সৃষ্টি করতে পারে, যেমন কাব্যিক বা কামনানয়ন বা বিবমিষাকর। ফলে যৌনতা ও মূল্যবোধের এই প্রসঙ্গ সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির সঙ্গেও জড়িত। ধনতান্ত্রিক চলচ্চিত্রে ও এমনকী সনাতনতান্ত্রিক চলচ্চিত্রেও কখনো কখনো, যৌনতার জন্মই যৌনতা, এর উদাহরণ তো অজস্র! সেন্সরশিপ দিয়ে তাকে প্রতিহত করা কোনো স্থস্থ বা স্থায়ী সমাধান নয়। চলচ্চিত্রে যৌনতার দূশরস ও মনস্তাত্ত্বিক আবেদন তিনটে বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করতে পারে। এর প্রথমটি নতুনত্বের অভিধাত। যৌনতার প্রতিরূপের বাস্তবতার বিক্রম, ভোগ্যপণ্যমূল্য ও আঘাতকারী ক্ষমতা থাকলে, তা কোনো পরিচিত নারী বা স্থবিখ্যাত তারকা কেন্দ্রিক হলে ও যৌনতার অপেক্ষাকৃত স্থিররূপ অপেক্ষা অধিকতর গতিশীল ও সক্রিয় যৌনতার অভিধাত বেশি। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি হলো আবেগগত প্রতিক্রিয়া। যৌনতার আবেগগত আবেদন মৌল ও ঝঁঝ আবেদন, এবং যৌনতার প্রতিরূপের প্রতিক্রিয়া সদর্থক না নঞর্থক, অহুসঙ্গ শোভন না অশোভন, চিত্ররূপ আনন্দদায়ক না বিরাগকর প্রভৃতি প্রসঙ্গ নির্বিশেষে এই আবেদন কার্যকর থাকে। যৌনতার বিশেষ কোনো প্রতিরূপের আবেদন অস্নীল বা বিহত হলেও স্থস্থ মানসিকতার দর্শকরাও তা দেখে আবেগ অহুসঙ্গ করে থাকেন। তৃতীয়ত মূলত টেকনিকাল ও আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে যৌনতার কল্পমূর্তির নিজেই চিত্রিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে পারার ক্ষমতা। চলচ্চিত্রে যৌনতার কেন্দ্রীয় বিষয় যতটা না যৌনক্রিয়া তার চেয়ে বেশি মূহুর্ত্যয়, যৌনতার প্রধান অহুসঙ্গ ঘটনা না নগ্নতা তার চেয়ে বেশি সাফল্য ও ক্ষমতার বাসনা, নগ্নতা ঘটনা না প্রদর্শিত প্রতিরূপ সংক্রান্ত তার চেয়ে বেশি কল্পনাপ্রবণতা ও পলায়নপরতা বিষয়ে। এই কারণেই চলচ্চিত্রে যৌনতা একই সঙ্গে বাস্তব ও অবাস্তব। তা

একই সঙ্গে এক আপেক্ষিকতার কারণ ও ফল। (ড্র. চলচ্চিত্রে ভাবনাস্বীতি, মেঘেদের বিরুদ্ধে সিনেমা)।

সম্পর্কিত গ্রন্থ : আলেকজান্ডার ওয়াকারের সেন্স ইন দি মুভিজ : দি সেলুলয়েড স্ট্রাক্চারাইস।

॥ চলচ্চিত্রে রঙের ব্যবহার ॥

নান্দনিক ভাবে দেখলে, প্রতিভাবান একজন চিত্রনির্মাতা ছবিতে রং তখনই ব্যবহার করার কথা ভাববেন যখন তাঁর বক্তব্য প্রকাশে বা গল্পের অনুভূতিগুলো মূর্ত করার কাজে রং একটা বিশেষ ভূমিকা নিতে সক্ষম। শাদা কালো ফটোগ্রাফি তাঁর ভাবনা পুরোপুরি ফুটিয়ে তুলতে পারছে না, ছবিতে রংটা অপরিহার্য বা অবিচ্ছেদ্য এক অঙ্গ রূপে প্রতীয়মান হচ্ছে, এই অনুভূতি না আসা পর্যন্ত ফিল্ম রঙিন হবে না, পুরোপুরি রঙিন তো নয়ই। কেননা শাদা কালো ফটোগ্রাফিতে আলোক সংস্থাপন রীতির সক্রিয় সহযোগিতায় আলো ছায়ায় যে অন্তর্মুখীনতা আনা সম্ভব তার একটা আলাদা মূল্য সবসময়েই থেকে যায়, তাকে অস্বীকার করা যায় না। পরিচালকের নান্দনিক চিন্তা যখন ছবি রঙিন করার ব্যাপারে সায় দিচ্ছে তখন সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন ছবিতে রং-এর ব্যবহার কোন ক্ষেত্রে কিরূপ হবে? ছবিতে রংকে কাজে লাগানো যায় দুভাবে। প্রাথমিক কাজ, প্রস্তুতির সময় ছবির সমস্যা খুঁজে বার করে তার সমাধান ও সহকর্মীদের পরিচালকের ভাবনার শরিক করে তোলা। এক বা একাধিক ছবি একে আর সেই ঠাঁয় ছবিতে তাঁর আইডিয়ামত রং ব্যবহার করে (ফিল্ম) শাদা কালোয় হলেও রংকে অনায়াসে এক প্রাথমিক কাজে লাগানো সম্ভব। ইউনিটের লোকেরা অল্প অনায়াসে বুঝে নিচ্ছেন কোন্ ইমেজে পরিচালকের কল্পনা কোন্ রং আরোপিত করল, অতএব কোথায় ক্যামেরা বসালে ভালো হয়, আলো কতটা কমাতে বা বাড়াতে হবে, ঠিক কোন্ লেন্সটা ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত, সেটে আর একটু পরিবর্তন করলে ভালো হয় কিনা। রং-এর সোপানের প্রথম ধাপ অভিক্রম করে এবার আমরা চলে এলাম মূল ধাপগুলোতে। কোন্ ভাবের প্রকাশে কোন্ রং? বিভিন্ন স্টিল অনুভূতি মূর্ত করে তুলতে রং-এর কোন্ কম্পোজিশন? এটা তো ঠিকই পৃথিবীতে বার যা রং ছবিতে যদি তাদের তেমনই হয় তবে রং নতুন কোনো দরঙ্গাই খুলে দিল না, মূর্ত মূর্তই রইলো। কিন্তু রং ব্যবহারের প্রয়োজন তো বিমূর্তকে মূর্ত করে তোলা। স্মরণ্য প্রকৃতির রংকে পুরোপুরি অনুসরণ করা হবে

না, অনুসরণ করা হবে অনুভবের রংকেও। কেননা শুধুমাত্র তাহলেই অপ্রকাশ যোগ্যকে প্রকাশ করা সম্ভব। ফলে রং-এর কাজটা এখন ফ্যানটাসির জগৎ তুলে ধরা, ভিতরের রংয়ে বাইরের জগৎকে প্রক্ষেপিত করা, বাইরের রংয়ে ভিতরের জগৎকে প্রতিফলিত করা। রং অন্তরের নিজস্ব অনুভূতি ও ভাবকে ভাষা দেবে, মূর্ত করবে এমন কি অতিরিক্ত অর্থ এনে দেবে। স্মরণ্যে একরূপ চিত্রকরে আকাশ কালো হতে পারে, জল গাঢ় লাল, গাছপালা পাখি ঘন ধূসর, আকাশের ভাঙা চাঁদ হালকা সবুজ। অনেক সময় পরিবেশের কারসাজিতে কিংবা কোনো অনিবার্য যান্ত্রিক বা ব্যবহারিক কারণে রং ব্যবহারের পরিকল্পনার কিছুটা অদল বদল হয়ে যেতেও পারে। এমন আশঙ্কা নিয়েই রংকে কাজে লাগাতে হয়। রংগুলো প্রত্যেকেই একক ভাবে কোনো না কোনো ভাবের প্রকাশক। যদিও একটা নির্দিষ্ট রং প্রত্যেকের কাছে একই ভাবের প্রতীক নাও হতে পারে, হাতে আঁকা ছবিতে দর্শক যেমন এক একটা ছবিতে রং-এর এক এক রকম ব্যবহারের উপর নিজস্ব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আরোপিত করার একটা সুযোগ পান, ফিল্মে ছবি আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাহিনী ও আঙ্গিকের উপর নির্ভর করে পরিচালকের রং সম্পর্কিত নিজস্ব মেজাজ ও পরিমণ্ডল একটু একটু করে গড়ে উঠতে থাকায় তেমন সুযোগটা এখানে কম। ফলে কোন্ রং কিসের প্রকাশ, এ ব্যাপারে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য এক সিদ্ধান্ত খাড়া করা যেতেও পারে, যেমন—

শাদা : পবিত্রতা, শুভ্রতা, আশা, সেবা, শান্তি, জ্ঞান, বিশ্বাস, আভিজাত্য।

কালো : শাদার বিপরীত। কুশ্রীতা, বিকৃতি, ক্ষুদ্রতা, হতাশা, দুঃখ, শোক, ধ্বংস।

লাল : মৌলিক রং। প্রেম, আনন্দ, সৌন্দর্য, বিপ্লব, আশা, উৎসাহ।

নীল : মৌলিক রং। ভয়, অস্বস্তি, উদ্বেগ।

হালকা নীল : সহনশীলতা, রোমাণ্টিসিজম, অদীমতা, জ্ঞান।

ভারী নীল : হিংস্রতা, বদমাইশী, ধ্বংস।

হলুদ : মৌলিক রং। ভয়, নৃশংসতা, হিংসা, শক্রতা, অবিশ্বাস, যৌনতাজাত পাপ।

আবার জ্ঞান, প্রজ্ঞা, তাপ, আশ্বাস।

সবুজ : মৌলিক রং। প্রাণ, আশা, মুক্তি, মহত্ব, বিশালতা, জীবন, সততা, প্রকৃতি,

ভারুণ্য।

বেগুনী : হতাশা, শোক, নির্জীবতা।

বাদামী : মন্বরতা, ঔদাসীন্য।

কদলা : উষ্ণতা, আলো, প্রেম, উৎসাহ।

ধূসর : ভারী ধূসর : হতাশা, বিষাদ ।

হালকা ধূসর : উদাসীনতা ।

যদিও উপরের তালিকাটি প্রণয়ন করা গেল ; বর্ণত্বের ইতিহাস ঘাঁটলে দেশ ও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণের ব্যবহারিক প্রয়োগে নানা পরস্পর-বিবোধিতার পরিচয় পাওয়া যায় । শাদা রং আশার প্রতীক, কিন্তু আমাদের দেশে বিবাদের শাদা পোশাক স্বাভাবিকভাবেই শোকের প্রকাশ । অবশ্য এরকম ব্যাখ্যা আমরা করতে পারি, এই শাদা রং যতটা না শোকের, তার চেয়ে বেশি পবিত্রতার । আবার বিদেশে বিবাহ উৎসবের শাদা পোশাক কি আনন্দের প্রতীক ? মনে হয়, আনন্দের চেয়েও শাদা রং সেখানে বিশ্বাস, গাঙ্গীর্ষ, আশার প্রকাশ এরূপ বললে আমাদের তালিকা পরস্পর-বিবোধিতা দোষে দুষ্ট হয় না । অবশ্য আরো কিছুটা তলিয়ে বিচার করা যেতে পারে । আমাদের দেশের দর্শনতবে মৃত্যুর পর জীবন তার সমস্ত রূপ ও বর্ণ নিয়ে উদ্ভাসিত, তাই সেই জীবনের প্রতীক রূপে সমস্ত রংয়ের সমন্বয়ে শাদা রংয়ের ব্যবহার, যে লোকটি সে জীবনে চলে গেল তার সঙ্গে self-identification-এর জন্মই যেন বিবাদের শাদা পোশাক, আবার পাশ্চাত্য দর্শনের মতে লৌকিক জীবনই সমস্ত বর্ণ ও রনে উদ্ভাসিত, তাই বিবাহের পোশাকের রং শাদা, মৃত্যুর পরের জীবন শূন্য, ফলতঃ মৃত্যুজাত শোকের প্রকাশ সমস্ত রংয়ের অল্পপস্থিতি, অর্থাৎ কালো রং । অতএব রং-এর ব্যবহারে ঐতিহ্যগত ও ভৌগোলিক দিকটা অস্বীকার করা যাবে না । রং-এর প্রয়োগে প্রাচ্য না পাশ্চাত্য কোন্ বর্ণত্বের আশ্রয় নেব, সেটা অবশ্য নির্ভর করছে ছবির কাহিনী ও আঙ্গিকের উপর । কেননা ভৌগোলিক দিকটা গড়ে ওঠে চতুষ্পার্শ্ব পরিমণ্ডলের উপস্থাপনে । অবশ্য এমন কিছু উদাহরণ বর্ণত্বের পাওয়া যায় যার কোনো দৃষ্টিক ব্যাখ্যা করা কষ্টের । যেমন লাল রং আবার মৃত্যু, প্রতিশোধ এবং ভয়ংকরতারও রং । সবুজ ক্রুরতা, শয়তানি, ভয়, অস্বস্থতা, ঈর্ষার । শাদা নৃশংসতা, মৃত্যু ও শীতলতার । কালো আভিজাত্য ও সাহসের । এগুলোকে ভৌগোলিক কারণে নিয়ম থেকে স্বাভাবিক বিচ্যুতি বলে ধরে নিলে আমাদের তালিকাটি মোটের উপর গ্রহণযোগ্য বলা যায় । মনে রাখা দরকার, শুধু রং না, রং-এর ঘনত্বও ভাব বা অহুত্বিত প্রকাশে বিশেষ সহায়ক, গাঢ় ঘনত্বের রং ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে যেমন একটা নির্দিষ্ট স্বর বা মেলাজ চলে আসে, হালকা বা নিম্প্রাণ রংয়ের ব্যবহারেও ঠিক তেমনি আর একটা বিশেষ পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে । রং একটা মহাস্ব জিনিশ । কোন্ হৃজনের মধ্যে তার অবস্থিতি তার উপরেই নির্ভর করে সবকিছু । হৃজনের

মাঝখানে ছাড়া সে অর্ধহীন। তাই রং নির্বাচন করতে হবে আবেগময় প্রভাণে।  
 দিকে লক্ষ্য রেখে, যেহেতু রঙিন ছবিতে কম্পোজিশনটা তলের বিরুদ্ধে তপো,  
 রংয়ের পরিপ্রেক্ষিতে রংয়ের সমাবেশে। কল্পনাকে সীমাবদ্ধ না করে যত  
 সংখ্যক রং ব্যবহার করে পারা যায় ততই ভালো। রংয়ের সংখ্যা বেশি হয়ে গেলে  
 ব্যবহারিক অসুবিধা যেমন তেমনি দুর্বোধ্য হয়ে যাওয়ার একটা আশঙ্কাও থাকে।  
 চলচ্চিত্র নিজে গতিশীল বলে দর্শক এক একটি রঙিন দৃশ্য দেখে নিয়ে তৎক্ষণাৎ  
 যথেষ্ট ভাবনা বা চিন্তার সময় পান না, তাই রং প্রয়োগে যেমন অমোঘতা থাকা  
 বাঞ্ছনীয় তেমনি অল্প সংখ্যক রংয়ের সঙ্গে শাদা কালো ব্যবহার করে কাজ করাই  
 ভালো। রঙিন ছবিতে সম্পাদনার ব্যাপারটা যেহেতু খুব নিখুঁত হওয়া দরকার  
 তাই বেশ জটিল। তাই রং নির্বাচনে পরিমিতিবোধের দিকে নজর দেওয়া দরকার।  
 যাতে কল্পনার ক্যানভাসকে বড়ো করতে গিয়ে ছবিতে ডিটেলের উপর দর্শক দৃষ্টি  
 রাখার ব্যাপারটা ব্যাহত না হয়। কোন্ রংয়ের সঙ্গে কোন্ রং ব্যবহার করা  
 হলো, কোন্ রং থেকে কোন্ রংয়ে আসা হলো তার উপরেও নির্ভর করছে অনেক  
 কিছু। যেমন লাল, লালচে বেগনি ও গাঢ় নীলের সমাবেশ ঘটিয়ে এক ভীতিদায়ক  
 পরিবেশ তৈরি করা যায়। ধূসর ও বেগনি বর্ণে প্রস্তুত পটভূমিতে নিম্প্রাণ শাদা  
 রং-এর ছিটে ব্যবহার করে তুলে ধরা যায় বিষণ্ণতা। গাঢ় কালো ও টুকটুকে লাল  
 রংয়ের জ্যামিতিক বর্ণালী জাগিয়ে তুলতে পারে ক্রোধ। এই ধরনের বিভিন্ন  
 বিমূর্ত ও জ্যামিতিক প্যাটার্নের বর্ণালী স্ফুটিত ভাবে ছবিতে ব্যবহার করে  
 সহজেই নানান পটভূমি তৈরি ও জটিল অল্পভূতি প্রকাশ করা যায়। যেহেতু  
 কয়েকটা রং-এর সমাবেশে এরা একটা অতিরিক্ত কিছু তুলে ধরে। যেমন সাতটি  
 রংয়ের প্রত্যেকটিই কোনো না কোনো অল্পভূতির প্রকাশ কিন্তু দপ্তরংয়ের সমন্বয়ে  
 বিচ্ছুরিত আভাষ প্যাটার্নে যেন নির্মল ও প্রাণবন্ত আনন্দই প্রতিভাত। এই  
 প্রসঙ্গে বলে রাখা যাক, প্রকৃতির কিছু নিজস্ব রংয়ের কম্পোজিশন আছে, যেগুলোতে  
 আমরা অভ্যস্ত। রং-এর প্রয়োগে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে তেমন একটি  
 কম্পোজিশন ব্যবহৃত হয়ে যে ভাব আনতে চাওয়া হচ্ছে তার বিপরীত প্রকৃতিজাত  
 অভ্যস্ত ভাবটি না নিয়ে আসে। অবশ্য সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য দেখানোর জন্য যদি  
 বিপরীত দৃশ্যকল্পে প্রকৃতিজাত ভাবটিই তুলে ধরার দরকার হয় তবে প্রকৃতির সেই  
 নিজস্ব রংয়ের কম্পোজিশনটিই এক্ষেত্রে যথেষ্ট। তাই রংয়ের স্লাইডগুলো পাশা-  
 পাশি, সোজাসুজি, বৃত্তাকারে না তির্যক ভাবে পড়ছে তার উপরেও নির্ভর করছে  
 অনেক কিছু। কোন্ রং থেকে কোন্ রংয়ে পরিবর্তন হচ্ছে সেটাও যথেষ্ট

৩৩৩৩পূর্ণ। এই পরিবর্তনে কী বোঝাতে হবে সেটা নির্ভর করছে যে দৃশ্য বা দৃশ্যাংশ  
 না চিত্রকলে পরিচালক রং ব্যবহারের কথা ভাবছেন তার অন্তর্নিহিত ভাব ও  
 আবার উপর। ধরা যাক, এক গুচ্ছ মেঘ, শাদা রং ব্যবহারে শীতকালের, হালকা  
 নীল ব্যবহারে শরৎকালের এবং ঘন কালো ব্যবহারে বর্ষার। আবার একটা  
 পাত্রে। বিশেষ বিশেষ রং প্রয়োগে একই পাত্র মাটির, কাঁঠের বা ষাতুর। মনে  
 করা যাক একটা প্রচণ্ড শোক ধ্বংস ও বিপর্যয়ের দৃশ্য। যতদূর দৃষ্টি যায় বস্তুর জলে  
 ভরা। উপড়ে পড়া গাছ, মানুষ ও জন্তু, ফুলে ওঠা শব্দেহ, বীভৎস, চারপাশে  
 ধিলু ও রক্ত, আকাশে শকুন-শকুনী, চহুদিকে আর্তনাদ ও বিলাপ, ভীতিপ্রদ শব্দ  
 ও ধ্বনি। জলের তোড়ে ভেসে যায় ঘরের চালা ও মানুষ। ক্রমে সকাল হলো,  
 মেঘের আড়ালে সূর্য। সেই সূর্যের একটি রশ্মি এসে পড়ল এই পটভূমিতে। কী  
 সাগ্রহে তার দিকে তাকিয়ে রইল সবাই। ঐ সূর্যরশ্মি কোন্ বর্ণের? লাল রং  
 নয় ও আশার প্রতীক। কিন্তু আমি তো এখানে পূর্বের আকাশ উষার লাল রংয়ে  
 টকটক করছে ভাবতেই পারছি না। অমন পটভূমিতে লাল রং আনন্দের প্রকাশ  
 নয়। ভয়, যত্ন এবং ধ্বংসের প্রতীক। লাল সূর্যরশ্মি যেন মহাকালের ছুঁড়ে দেওয়া  
 রক্ত মাখানো এক নির্ভর বর্ণ। স্মরণ্য সূর্যরশ্মির রং আমি বরঞ্চ হালকা বা ঘন  
 হনুদ করব। হনুদ এখানে আশ্বাস ও তাপের প্রতীক। তাহলেই বোঝা যাচ্ছে  
 রং-এর পুরো ব্যাপারটা নির্ভর করে পরিবেশ, পটভূমি ও দৃশ্যই ভাবের উপর।  
 গ্যেটের ফাউন্ট চিত্রায়িত করতে গেলে নায়কের মানসিকতা প্রকাশে অবশ্যই তার  
 নিজের ঘরটি অত্যন্ত উঁচু এবং অপ্রশস্ত পরিদরের করতে হবে ও তারই সঙ্গে রং  
 ব্যবহার করলে ঘরের দেয়ালগুলো ছাদ পর্যন্ত ঘন নীল, ছাদ লাল, কালো ও  
 নীল স্লাইড পর্যায়ক্রমে ফেলে এবং বন্ধ জানলার শিকড়গুলো গাঢ় লাল। আর  
 ফাউন্ট নিজে? তার পোশাক হবে মূলতঃ সবুজ লাল হালকা নীল ও হনুদ রেখা  
 ব্যবহার করে এবং তাদের সঙ্গে সমকোণে মাঝারী নীল ও কালো রং-এর ডোর।  
 গাঢ় নীল পটভূমিতে রঙিন এক নক্ষত্র হয়ে ফাউন্ট বিরাজমান। যেখানে যত্ন শুধু  
 যত্নই না, অধিকতর কিছু সেখানে কালো রং-এর বদলে লাল ও সবুজাত লালের  
 ব্যবহারই যুক্তিযুক্ত। অহরুপভাবে যখন কোনো অহুত্ব নিজেতে পুরোপুরি  
 আবদ্ধ না থেকে অতিরিক্ত আরো কিছু নির্দেশ করে আপাতবিরোধী বর্ণপ্রয়োগের  
 স্বযোগটা পাওয়া যায় তখনই। রঙিন ছবিতে রং ব্যবহারে পরিচালকের নিজস্ব  
 একটা ভঙ্গি সুর বা স্টাইল তো থাকবেই। সেটা যদি বেশি পরিমাণেই স্বতন্ত্র হয়  
 তবে পরিচালকের মূল কাজ হবে ছবি আরম্ভ হবার পর যত অল্প সময়ের মধ্যে

সম্ভব নিখুঁত ভাবে দর্শককে সেই স্টাইলটি ধরিয়ে দেওয়া, দরজা চিনিয়ে দিখে তাকে নিজেই যাত্রার সঙ্গী করে তোলা। রং যে কেবল সবসময় ভাবেরই ভাষা তা নয়। স্তরস্বয়ং অতীত বর্তমান কল্পনা স্বপ্ন বাস্তব স্মৃতি সব একাকার করে দেওয়ার কাছে রং যে শুধুমাত্র অতীত ও বর্তমান বা সত্য ও বিভ্রমকে আলাদা করে আইডেন্টিফাই করিয়ে দেবে, তা নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্নিহিত সুর-গুলোর মধ্যকার সম্পর্ক, যোগাযোগ ও ভাবও নির্দেশ করবে। অর্থাৎ বর্তমানের রং উজ্জ্বল, অতীতের রং তুলনায় মলিন কিংবা বর্তমানের রং-ই মলিন, অতীতের রং তুলনায় উজ্জ্বল। অথবা বর্তমান ও অতীত একই রকম উজ্জ্বল বা মলিন। আবার স্বপ্ন কল্পনা অতীত বর্তমান যাই হোক না কেন কোন রং এবং কেমন তার ঘনত্ব, ঐজ্জ্বলতা, বিস্তার তা নির্ভর করছে দৃষ্টির অন্তর্নিহিত ভাবের উপর। ফলে একই ভাবের প্রকাশে স্বপ্ন কল্পনা অতীত বর্তমান যাই হোক না কেন একই রং, ঘনত্বে প্রভেদ হতেও পারে, নাও পারে। এমন ক্ষেত্রে রং আর সময়ের না, স্মরণের বাহক। ফলে ঘুরে ফিরে কয়েকটা রং বারবার আসছে এবং তার সঙ্গে বিশেষ বিশেষ ভাব এবং অহুরূপ নির্দিষ্ট এক রংয়ের ব্যবহারে স্মৃতির্দিষ্ট ভাবটি না এনে শিল্পীর তচ্ছন্নিত মন্তব্য। অর্থাৎ বৃত্তের পরিপূর্ণতা বা বিচ্ছেদ এখানে বর্ণের ভিত্তিতে ( রংয়ের মাধ্যমে )। কাহিনীচিত্রে এবং বাস্তবধর্মী চলচ্চিত্রে ছাড়াও বিমূর্ত চলচ্চিত্রে এবং অ্যানিমেটেড ছবিতেও রংয়ের বিশেষ ভূমিকা আছে। ছবিতে বিমূর্ত রীতিতে রং ব্যবহারের ক্ষেত্রে blot drawing ও pointillism পদ্ধতিরও আশ্রয় নেওয়া হয়। রং নিয়ে ছবিতে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ ইদানিং পুরোনো আরাধিত হয়েছিল তার একটা আভাষ এখানে পাওয়া গেল। এইভাবে এগিয়ে গেলেই একদিন রঙিন ছবি আর শুধুমাত্র রঙে তোলা ছবি না থেকে বিশেষ কিছু হয়ে উঠবে। শিল্পগত ভাবে সেটা জরুরি। কেননা নান্দনিক প্রয়োজনে নয়, প্রায়ুক্তিক কারণেই এখন পৃথিবী জুড়ে ছবি রং-এ তোলা নিয়ম হয়ে গেছে আর দর্শকও তাই চায়। ( ড্র. রঙিন নেগেটিভ ফিল্ম )

ধীমান দাশগুপ্ত

॥ আলীয়া রব-গ্রিয়ে ॥

জন্ম ১৯২২, ফ্রান্স। ফরাসি দেশে সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের সম্পর্ক চিরদিনই খুব নিকট, তবু ১৯৬১ সালে আলীয়া রেণের Last Year in Marienbad ছবির চিত্রনাট্যকার-রূপে নব-উপস্থানের মুখ্য প্রবক্তা আলীয়া রব-গ্রিয়ের আত্মপ্রকাশ

একটি বিশেষ অরগানিক ঘটনা। তাঁর মধ্য দিয়ে ফরাসি চলচ্চিত্রে অপেক্ষাকৃত গৌণ অথচ গুরুত্বপূর্ণ একটি ধারার সূত্রপাত হলো।

এ পর্যন্ত রব-গ্রিয়ের নিজস্ব ছবির সংখ্যা খান দশেক। তাঁর ছবির আলোচনা করার আগে একথা জানা দরকার কেন তিনি চলচ্চিত্রে এলেন, কারণ এই উত্তরের মধ্যেই তাঁর সৃষ্টির চাবিকাঠি খুঁজে পাওয়া যাবে। 'মারিয়েনবাদ' চিত্রনাট্যের মুখবন্ধে তিনি বলেছেন যে রেণের সঙ্গে কাজ করতে তিনি রাজি হয়েছিলেন এইজন্ত যে, রেণের একটি ছবিতে [ হিরোশিমা মনামুর ] কার্যকারণবাদ এবং ঘটনার পারস্পর্য উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ মানসনির্ভর একটি দেশ বা কাল গড়ে তোলার প্রয়াস করা হয়েছিল। ফরাসি নব-উপস্থানে ইতিপূর্বেই চরিত্রের জয়পরিণতি ও ষড়ির সময় পরিত্যক্ত হয়েছিল; এবার রব-গ্রিয়ে যখন বললেন যে, 'মানসিক সমস্বই হচ্ছে ঠিক তাই যা আমাদের মনে লাগে' তখন রেণে তাঁর সঙ্গে একমত হলেন। [ ছরাজ, রব-গ্রিয়ে প্রমুখ লেখকরা যে ক্রমে পুরোপুরি চলচ্চিত্রের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন তার কৃতিত্ব অনেকটাই রেণের। ]

চলচ্চিত্রের পর্দায় যে ছবি ফুটে ওঠে সে সম্পর্কে রব-গ্রিয়ে বলেছেন, 'The essential characteristic of the image is its presentness'; যে ঘটনা অতীতে ঘটে গেছে তাকেও দর্শক তার চোখের সামনে দেই মুহূর্তে ঘটতে দেখে। চলচ্চিত্র-মাধ্যমের এই 'বর্তমানতা'র পূর্ণ স্বয়োগ রব-গ্রিয়ে নিয়েছেন। তাঁর ছবিতে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ আলাদা করে চেনা যায় না; আলাদা করার জন্ত চিরাচরিত স্নো ডিজলভের ব্যবহারকেও তিনি বিদ্রূপ করেছেন। আবার এই বিশেষ ফর্মই তাঁর content বা বিষয়, কারণ তাঁর ছবির প্রধান থীম হলো বাস্তব ও কল্পনার অভিন্নতা। মারিয়েনবাদের বিগত বছর সম্পূর্ণভাবে নায়কের মনগড়া ব্যাপার; The Man who Lies ছবির নায়ক বোরিসও সত্য ও কল্পনা মিশিয়ে স্মৃতিচারণ করে; Trans-Europ Express ছবিতে যা ঘটে এবং ভবিষ্যতে যা ঘটবে (চিত্রনাট্যকার ও তার পরিকল্পিত চিত্রনাট্য) অদ্বাদিভাবে চলে। শেখোক্ত দুটি ছবিতে অবশ্য কাহিনীর জট ছাড়িয়ে শেষ পর্যন্ত যা 'সত্য' তা উদ্ঘাটন করা হয়।

দ্বিতীয়ত, চলচ্চিত্রের সঙ্গে রব-গ্রিয়ের chosist বা বস্তুনির্ভর (ফরাসি chose শব্দের অর্থ বস্তু) নীতির সায়ুজ্য স্পষ্ট। তাঁর মতে একটি লোকের চোখ যা দেখে তাই দিয়ে তাকে বিচার করা যায়। তার চতুর্দিকে যত বস্তু আছে সে তার শব্দটুকুই লক্ষ্য করে না—তার চোখ কিছু দেখে, কিছু বাদ দিয়ে যায়। এখন

লোকটির চোখ যা ধরে আনল সেটাকে সে নিজের মজি ও মানসিক গঠন অনুসারে ব্যাখ্যা করে। অতএব ঐ লোকটিকে বুঝতে হলে তার দর্শনেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বিখ্যাত বস্তুপুঞ্জকে সর্বাঙ্গে বুঝতে হবে। চলচ্চিত্রের কাজ হচ্ছে দৃশ্য জগৎকে নিয়ে। এতে রব-গ্রিয়ের তারি স্থবিধা হয়ে গেছে। তাঁর উপস্থানে তাঁকে কথা সাত্ত্বিখে বস্তুজগতের বর্ণনা প্রস্তুত করতে হচ্ছিল—কষ্ট করে বোঝাতে হচ্ছিল এগুলি তাঁর কুশীলবের মানসিক অবস্থার বহির্লক্ষণ, এলিয়ট যাকে বলেছেন *objective correlative*। চলচ্চিত্রের পর্দায় শব্দের মাধ্যম ব্যতিরেকে এইবার রব-গ্রিয়ে সেই বস্তুপুঞ্জকে ইচ্ছে মতন উপস্থিত করার স্বাধীনতা পেলেন।

রব-গ্রিয়ের প্রথমদিকের ছবিতে বস্তুপুঞ্জের বিশেষ গুরুত্ব আছে। *L'Immortelle* ছবির নায়িকা রহস্যময়ী লায়েলা আরব্য রজনীর ধারা অনুসারে একজন *femme fatale*। একটি দুখে তার সঙ্গে নায়ককে শয়নকক্ষে প্রবেশ করতে দেখা যায় এবং এইসঙ্গে পরপর দুটি শট আসে : প্রথমে একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ এবং পরে বাঁকা-চোরা প্রস্তরফলক-সমেত একটি সমাধিক্ষেত্র। এই ফলকগুলি একই সঙ্গে নায়কের প্রেম ও তার আত্মবিনাশের স্রোতনা বহন কবে আনে। রব-গ্রিয়ের পরবর্তী ছবিগুলিতে বস্তুপুঞ্জের বদলে কাহিনীসূত্র বা *narrative-line*-এর দিকে ঝোঁক দেখা যায়। এই কাহিনীসূত্রের ভিত্তি বাস্তব বনাম কল্পনা। *Trans-Europ Express* থেকে স্বরূপ হলো তাঁর ধাঁধা সৃষ্টি করার প্রয়াস; গল্পের কোন্ অংশ ঘটেছে, ঘটতে পারে অথবা একেবারেই অসম্ভব, এ নিয়ে তিনি যেন দর্শকের সঙ্গে একটা খেলায় মাতেন। শেষ দিকের কয়েকটি ছবিতেও—*L'Eden et Apres* (৭০) এবং *Glissements sur le Positif* (৭৩)—এই দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান, কিন্তু এই ছবিগুলির অত্যন্তম প্রধান ধীম যৌনতা/পশুত্ব। একদিকে নিরন্তর ধাঁধা, অন্যদিকে তীব্র যৌনতা—এই দুয়ের মাঝখানে রব-গ্রিয়ের ভক্ত দর্শক বর্তমানে খানিকটা বিধাগ্রস্ত। একথা অনস্বীকার্য যে, মারিয়েনবাদে যে পর্বের স্বরূপ হয়েছিল তার শেষ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

অগ্ণাত ছবি : *Les Gommages* ( ৭২ ), *Le Jeu avec le feu* ( ৭৪ ), *Giocare col Fuoco* ( ৭৫ ), *Piege a Fourrure* ( ৭৭ ), *Guerres civiles en France* ( ৭৮—উপদেষ্টা ), *La Belle Captive* ( ৮২ )।

অমিয় বসু

## ॥ চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথ ॥

বিদেশী চলচ্চিত্রে শেক্সপীয়র যতোটা ব্যাপকতায় গৃহীত এবং শিল্পচর্চার মাধ্যমে স্বীকৃত, ভারতীয় চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথ সেই পরিমাণে আলোচিত প্রতিভূ নন। তার একটা কারণ, বাংলা ভাষার আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতা। বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের কাছে রবীন্দ্রনাথ যতোটা কাছের মানুষ, বিভিন্ন প্রাদেশিক মানুষের কাছে তাঁর আকর্ষণ ততোটা নয়। রবীন্দ্রনাথ শুধু ভারতীয় সাহিত্যেই নন, বিশ্ব-সাহিত্যের যে কোনো শ্রেষ্ঠ কীর্তির পাশে স্থান পাবার যোগ্য। তবু আমরা চলচ্চিত্রে তেমন সার্থকতায় তাঁকে পাইনি। দু' একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বাদ দিলে, চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাহিত্যের উৎকৃষ্ট রূপায়ণ ঘটেনি। এ প্রসঙ্গে দুটি বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমত: চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাহিত্যের সার্থক রূপায়ণে মূল সাহিত্যরস অনুধাবনে পরিচালকের অজ্ঞতা, দ্বিতীয়ত: উৎকৃষ্ট সাহিত্যের ষষ্ঠাযথ চলচ্চিত্রায়ণে সিনেমা ও সাহিত্যের প্রাথমিক ও অপরিহার্য শর্তগুলি সম্পর্কে পরিচালকদের অজ্ঞানতা ও উদাসীনতা।

রবীন্দ্রনাহিত্য বিশেষ ভাবেই মননধর্মী রচনা। তাঁর বর্ণনাময়ী রচনাতেও মননপ্রধান রূপ মিশে গেছে। অস্তিত্ব সাহিত্য নিদর্শনের তুলনায় তাই রবীন্দ্র-সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ণ কিছুটা দুর্বল। তাঁর সাহিত্যে বিশ্বপ্রকৃতি ও মানুষ উভয়ই বিচ্যুত আছে, এবং তা বিশেষভাবেই এক দার্শনিক প্রস্তা আর ভাবানুভবে মূর্ত হয়ে আছে। তাঁর সাহিত্যের এই শিল্পরহস্যটি উপলব্ধি না করলে, চলচ্চিত্রায়ণে বিভ্রান্ত হবার সম্ভাবনা খুব বেশি। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প আধুনিক চলচ্চিত্রের শিল্পউপযোগিতায় যতোটা সার্থক, তাঁর উপস্থাপন ততোটা নয়। রবীন্দ্রনাহিত্যের অতি সূক্ষ্মতা এবং চলচ্চিত্রায়ণে তার শিল্পসম্ভাবনার ক্ষেত্রে, চলচ্চিত্র স্রষ্টাকে প্রাথমিকভাবেই সতর্ক থাকতে হয় যে, রবীন্দ্ররচনার কোন্ কোন্ অংশ চলচ্চিত্র মাধ্যমের কাছাকাছি।

রবীন্দ্রনাথ যখন উত্তরতিরিশে, চলচ্চিত্র শিল্প মাধ্যমটির জন্মলগ্ন তখন সূচিত হয়। আর তাঁর প্রৌঢ় বয়সে তিনি বিদেশ সফর কালে বিদেশী চলচ্চিত্র দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং সিনেমা মাধ্যমটির অভিনবত্ব সম্পর্কে মন্তব্যও করেছিলেন। তাঁর চলচ্চিত্রে অভিজ্ঞতার বর্ণনা আছে তাঁর 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি' রচনায়। রবীন্দ্রনাথ জার্মানি ভ্রমণকালে যীত্বীষ্টের 'প্যাশন প্লে' দেখে উবুদ্ধ হন। সেখানে জার্মানির UFA কোম্পানী কবিকে একটি চিত্রনাট্য লিখে দেবার অনুরোধ

করেন। রবীন্দ্রনাথের তদানীন্তন সচিব কবি অমিয় চক্রবর্তীর একটি পত্রে ১৯০৭  
 ঘটনার উল্লেখ আছে। রবীন্দ্রনাথের এই চিত্রনাট্যটি হলো ‘The Child’  
 (শিশুতীর্থ)।

নির্বাচ যুগ থেকেই রবীন্দ্রসাহিত্য অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মাণের নিদর্শন পাও  
 আমরা। নির্বাচ যুগে রবীন্দ্রকাহিনী নিয়ে যে ক’টি ছবি তৈরি হয় সেগুলির  
 কোনোটিই চলচ্চিত্রের শিল্পসংজ্ঞায় আলোচিত হবার যোগ্য নয়। এমনকি সবাক  
 যুগেও, রবীন্দ্রনাথের কাহিনীভিত্তিক অনেকগুলি ছবিকেই সার্থক চলচ্চিত্র হিসেবে  
 গণ্য করা যায় না। সবাক যুগের পর্বে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে হিন্দী ও  
 অসমীয়া আঞ্চলিক ভাষায় ৬টি ছবি তৈরি হয়। তার মধ্যে কয়েকটি জনপ্রিয়তা  
 পেলেও শিল্পের নিরিখে কোনোভাবে সেগুলি উল্লেখযোগ্য নয়। কেননা প্রায়  
 ক্ষেত্রেই এসব ছবির পরিচালকেরা ছবির পর্দায় নাট্যভঙ্গিতে কাহিনী-গ্রন্থেই ব্যস্ত  
 ছিলেন। রবীন্দ্রকাহিনীর স্বল্প তাৎপর্য, চিত্রকল্প, প্রতীকীচেতনা এবং কাহিনীর  
 অন্তর্গত মনস্তাত্ত্বিক স্বরূপ চলচ্চিত্রের বিস্তারিত আবিষ্কার করতে পারেননি।  
 রবীন্দ্রকাহিনী নিয়ে প্রথম নির্বাচ ছবি ‘মানভঙ্গন’। তৈরি হয় ১৯২৩ সালে।  
 পরিচালক ছিলেন নরেশচন্দ্র মিত্র। তখনকার দিকপাল শিল্পীদের অভিনয়পুণ্ড্র  
 হয়েও ছবিটি ব্যর্থ হয়েছিল। এর বছর চারেক পরে তৈরি আর একটি নির্বাচ  
 রবীন্দ্রচলচ্চিত্রের সংবাদ পাই সাহিত্য গবেষক উজ্জলকুমার মজুমদারের একটি  
 লেখা থেকে। ১৯২৭ সালে রবীন্দ্রনাথের ‘বিসর্জন’ নাটক অবলম্বনে এই ছবিটি  
 তৈরি হয়। ছবিটি ছিল ৭ রীলের। মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন জুব্বিদাবাহু  
 ও সুলোচনা। মানভঙ্গন গল্পটি নিয়েই ১৯২৯ সালে আর একটি ছবি হয়। গল্পের  
 নায়িকার নাম সুলদারে ছবির নাম দেওয়া হয় ‘গিরিবালা’। পরিচালক ছিলেন মধু  
 বসু। ঐ একই বছর একটি রবীন্দ্রচলচ্চিত্রের সংবাদ পাই আমরা। ছবির নাম  
 ‘বিচারক’। পরিচালক ছিলেন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী। ১৯৩০ সালে  
 ‘ডালিয়া’ নামে একটি রবীন্দ্রচলচ্চিত্র নির্মিত হয়। ছবিটি সম্পর্কে পরিচালক মধু  
 বসু তাঁর আত্মকথায় বেশ কিছু সংবাদ জ্ঞাপন করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা যে  
 ছবিটির বিজ্ঞাপনে কোথাও পরিচালক মধু বসুর নাম নেই। ১৯৩২ সালের ৩রা  
 জুন কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারে মুক্তি পায় ‘নৌকাডুবি’, পরিচালক ছিলেন নরেশচন্দ্র  
 মিত্র। সবাক ছবি রূপে তৈরি হবার কথা থাকলেও নানারকম আর্থিক কারণে ও  
 কপিরাইট সংক্রান্ত গুণ্ডগোলে শেষ পর্যন্ত ছবিটি নির্বাচ হয়েই মুক্তি পায়।

সবাক যুগের গোড়া থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কাহিনী নিয়ে প্রায় এক-

চল্লিশটি ছবি তৈরি হয়েছে। এর অনেকগুলিই রবীন্দ্রনাথের অতি বিখ্যাত এবং শ্রেষ্ঠ রচনার অন্তর্ভুক্ত। ছবিগুলোর বেশ কয়েকটি জনপ্রিয়তাও অর্জন করে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ শিল্পোত্তীর্ণ ছবি হিসেবে এর মধ্যে কয়েকটিকেই মাত্র গণ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রতি এক ধরনের সম্মতি ও ভয় থেকে কেউ আতঙ্কত কাহিনীর সব খুঁটিনাটিকে চিত্রিত করার দিকে ঝুঁকতেন, কেউ সামান্য পরিবর্তন, পরিমার্জনায একটু অভিনব হতে গিয়ে স্বজনী ক্ষমতার অভাবে ব্যর্থ হতেন। এ দুয়ের মাঝখানে তাই রবীন্দ্র চলচ্চিত্র সম্পর্কে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর আকর্ষণ কোনোদিনই গড়ে ওঠেনি আর অধিকাংশ ছবিও শিল্পসার্থক হয়ে ওঠেনি।

সবাক যুগের প্রথম রবীন্দ্রচলচ্চিত্র হলো 'চিরকুমার সভা'। নির্মিত হয় ১৯৩২ সালে। পরিচালক ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রেমাসুর আতর্খী। ছবিটি অত্যন্ত বিরূপ সমালোচনা পেয়েছিল। ঐ একই বছর মুক্তি পায় 'নটীর পূজা'। পরিচালক ছিলেন দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। এরপর ১৯৩৮ থেকে ১৯৫৫ সালের মধ্যে গোরা, চোখের বালি, শোধবোধ, শেষরক্ষা, নৌকাডুবি, দৃষ্টিদান, মালঞ্চ, বৌ ঠাকুরাণীর হাট, শেষের কবিতা, চিত্রাঙ্গনা, এই দশটি ছবি মুক্তি পায়। ১৯৪২-এ সৌমেন মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'শোধবোধ' নাটক চলচ্চিত্রায়িত করেন। দু'বছর পরে তৈরি হয় 'শেষরক্ষা'। পরিচালক ছিলেন পশুপতি চট্টোপাধ্যায়। এ ছবি সম্পর্কেও ভালো-মন্দ বিশিয়ে খুব মামুলি সমালোচনা তদানীন্তন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৫৭ সালে নীতিন বসুর পরিচালনায় বস্বেতে 'নৌকাডুবি' ছবিটি নির্মিত হয়। এই ছবিকে অনেকে সার্থক রবীন্দ্রচলচ্চিত্র হিসেবে গণ্য করেছেন। নীতিন বসুর পরিচালনায় 'দৃষ্টিদান' মুক্তি পায় ১৯৪৮ সালে। এ ছবি সম্পর্কে 'দীপালি' পত্রিকায় কিছুটা নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনার আভাস লক্ষ্য করা যায়। সমালোচনা সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং শিল্পসার্থকতার কিছু উপকরণ নিয়ে এখানে আলোচনার প্রচেষ্টা ছিল।

১৯৫৩ সালে তৈরি মধু বসু পরিচালিত 'শেষের কবিতা' ছবিটিকে অনেকে ক্লাসিক রবীন্দ্রচলচ্চিত্র রূপে গণ্য করেন। বাংলা সিনেমার একদা জনপ্রিয় চিত্রনাট্যকার স্বর্গত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এ ছবির চিত্রনাট্য লিখেছিলেন। ১৯৫৬ সালে আনরা একটি উপভোগ্য ছবি পেলাম 'চিরকুমার সভা'। পরিচালক ছিলেন দেবকীকুমার বসু। ১৯৩২-এ তৈরি প্রেমাসুর আতর্খীর 'চিরকুমার সভা'র তুলনায় দেবকীবাবুর এ ছবি অনেক দিক থেকেই উল্লেখযোগ্য ছবি। ছবিটি দর্শক আনুকূল্য

ও সমালোচকদের অভিনন্দন পায়। ঐ একই বছর তপন সিংহের পরিচালনাধীন তৈরি হয় 'কাবুলিওয়াল'। বাস্তবিক এই প্রথম চলচ্চিত্রের পর্যায় রবীন্দ্রনাথের অতি বিখ্যাত গল্পের সর্বজনগ্রাহ্য রূপ প্রতিফলিত করার চেষ্টা দেখা যায়। এরপরে ১৯৬০-এ মুক্তি পায় 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'। পরিচালক ছিলেন 'অগ্রদূত' গোষ্ঠী। গল্পটির মধ্যে চলচ্চিত্রাঙ্গ পরিবেশ বিস্তারের বহু গুণ থাকলেও পরিচালকেরা তার সদ্যবহার করতে পারেননি। ঐ বছরই তপন সিংহ 'স্মৃতি পাষণ্ড' চলচ্চিত্রায়িত করেন। পরিচালকের উৎকৃষ্ট কল্পনাশক্তির অভাবে এই অসাধারণ গল্পটির অতীন্দ্রিয় রহস্যচেতনা, পরিবেশ, গল্পের সূক্ষ্মতা ছবির পর্যায় ফুটে ওঠেনি। অভাবনীয় ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করলেও চলচ্চিত্রের শিল্পশর্তে এ ছবি শ্রেষ্ঠত্বের পর্যায়ে পড়ে না। তপনবাবুর আর একটি রবীন্দ্রচলচ্চিত্র 'অতিথি'। মুক্তি পায় ১৯৬২ সালে। ছবিতে কিছু সূক্ষ্ম দৃশ্যক্রম আছে, কিছু ভালো কম্পোজিশন আছে, মোটামুটি ভালো অভিনয় আছে। সেইসঙ্গে চলচ্চিত্রের পর্যায় গল্প বলার জনপ্রিয় ভঙ্গিটাও লক্ষণীয়। তবু ছবিটি উৎকৃষ্ট রবীন্দ্রচলচ্চিত্র নয়। রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের চারটি কবিতা নিয়ে 'অর্থ্য' নামে একটি ছবি হয়। পরিচালক ছিলেন দেবকী কুমার বসু। অতিথি যে বছর নির্মিত হয় সেই সময়ে আমরা আর একটি ছবি পাই 'নিশীথে' (১৯৬৩)। পরিচালক ছিলেন অগ্রগামী গোষ্ঠী। এটিও রবীন্দ্রচলচ্চিত্রের ব্যর্থ নিদর্শন। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীতে এক অসাধারণ রবীন্দ্র-চলচ্চিত্র পেয়েছিলাম 'তিনকণ্ঠা'। শুধু রবীন্দ্রচলচ্চিত্রে নয়, সর্বভারতীয় দিনেমার ক্ষেত্রে এক অনবদ্য শিল্প নিদর্শনরূপে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত এ ছবি ইতিহাস হয়ে আছে। পোষ্টমাস্টার, মণিহার ও সমাপ্তি এই তিনটি গল্প অবলম্বনে সত্যজিৎ চলচ্চিত্রের অনুপম শিল্পসৌন্দর্য নির্মাণ করেছেন। 'নষ্টনীড়' গল্প অবলম্বনে সত্যজিৎ ১৯৬৪ সালে আর এক অনবদ্য রবীন্দ্রচলচ্চিত্র নির্মাণ করেন 'চারুলতা'। বাস্তবিক, এযাবৎ নির্মিত সবকটি রবীন্দ্রচলচ্চিত্রের মধ্যে সত্যজিতের চারুলতা নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর্ম। চলচ্চিত্র ভাষায়, ব্যাকরণের ঈর্ষণীয় প্রয়োগ নৈপুণ্যে এবং সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক সম্পর্কে সত্যজিতের গভীর শিল্পবোধ মিলেমিশে ছবিটি শিক্ষণীয় নিদর্শন হয়ে আছে। আসলে সত্যজিৎই প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্রকার যিনি, রবীন্দ্রসাহিত্যের দ্বস্তর পরিবর্তন সাধন করে আপন সৃজনী ক্ষমতায় এমন এক শিল্পরূপ নির্মাণ করলেন, যার মধ্যে রবীন্দ্রসাহিত্যের মূল রস অক্ষুণ্ণ থেকেও একই সঙ্গে এক ভিন্ন শিল্প নির্মিতির মুখোমুখি হলাম আমরা।

চারুলতা ছবির দুই দশক পরে সত্যজিৎ আর একখানি গুরুত্বপূর্ণ রবীন্দ্র-

চলচ্চিত্র উপহার দিলেন 'ঘরে বাইরে' ( ১৯৮৫ )। কিন্তু 'চাকুলতা' থেকে 'ঘরে বাইরে'র মধ্যবর্তী সময়ে আমাদের আরো কয়েকখানি ছবির মুখোমুখি হতে হয়। ছবিগুলি রবীন্দ্রচলচ্চিত্র হিসেবে তেমন দার্দিক নয়। যেমন পার্থপ্রতিম সৌধুরীর 'ভূতা ও দেবতার গ্রাম' ( ১৯৬৪ ), অরুন্ধতী দেবীর 'মেঘ ও রোদ্দ' ( ১৯৬৯ ), মৃগাল দেনের 'ইচ্ছাপূরণ' ( ১৯৭০ ), অজয় করের 'মালাদান' ( ১৯৭০ ) ও 'নৌকাডুবি' ( ১৯৭৯ ), স্বদেশ সরকার পরিচালিত 'শান্তি' ( ১৯৭০ ), বীণেশ্বর বসু পরিচালিত 'বিনর্জন' ( ১৯৭৪ ), পূর্ণেন্দু পত্রীর 'স্ত্রীর পত্র' ( ১৯৭৩ ) ও 'মালঞ্চ' ( ১৯৭৯ ), শংকর ভট্টাচার্য পরিচালিত 'শেষ রক্ষা' ( ১৯৭৭ ), স্বদেশ সরকারের 'দিদি' ( ১৯৮৪ ) ইত্যাদি ছবি। রবীন্দ্রসাহিত্যাশ্রিত এতাবৎ শেষ ছবি হলো 'ছেলেটা' ( ১৯৮৬ )। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রযোজনায় ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন সন্তোষ ঘোষাল। চলচ্চিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা আজ থেকে ৬০/৬৫ বছর আগে করা হলেও এখনও অতি প্রাসঙ্গিক ও আধুনিক। আর চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রকাহিনীর আধুনিক ও শিল্পদফল রূপান্তর এখনও একাধিক সত্যজিতের অনমাপ্ত প্রয়াসের কাজ। সমাপ্তিতে আমরা বাংলা চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনংগীতের প্রয়োগের কথাও উল্লেখ করতে পারি।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : অরুণকুমার রায়ের চলচ্চিত্র ও রবীন্দ্রনাথ।

প্রামাণিক চিত্র : সত্যজিৎ রায়ের রবীন্দ্রনাথ ॥

**সোমেন ঘোষ**

॥ রশোমন ॥

১৯৫০, জাপান। বনের মধ্যে সংঘটিত একটি অপরাধ দৃশ্যকে চারজন ব্যক্তির পরস্পরবিরোধী কিন্তু এককভাবে বিশ্বাসযোগ্য চারটি বিবৃতি নিয়ে কুরোশাওয়ার রশোমন। কামনার একটি ঘটনা ও হিংসার একটি মুহূর্তকে কেন্দ্র করে এই ছবি সত্যের প্রকৃতি বিষয়ে বিখ্যাত অহুদজ্ঞান ও ধ্রুপদী উদ্ঘাটন ( ড. কুরোশাওয়া )। বস্তুদত্ত্য বনাম শিল্পদত্ত্য তথা সত্যের আপেক্ষিকতা বিষয়ে প্রাজ্ঞ শিল্পীর এক দার্শনিক ভাষ্য। ক্যামেরা ও লাইটিংয়ের অনবগ্ন ব্যবহার, অসাধারণ দৃশ্যরস, পরিবেশের অমোঘতা ও বলিষ্ঠ অভিনয় ছবিটিকে অবিস্মরণীয় করেছে। রশোমন একদিকে কুরোশাওয়ার চিত্রশৈলীটিকে স্থনিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত করে, অন্যদিকে আপানি চলচ্চিত্র দৃশ্যকে সারা বিশ্বের আগ্রহ জাগ্রত করে দেয়। অনেকের মতে কুরোশাওয়ার জগতের ভারকেন্দ্রটি স্তম্ভ এই ছবিতে।

অভিনয়ে তোশিরো মিয়ুন, এম কিয়ো; কাহিনী R. Akutagawa, চিত্রগ্রহণঃ  
K. Miyagawa, চিত্রনাট্য হাশিমোতো, কুরোশাওয়া; সম্পাদনা কুরোশাওয়া।  
ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কার, ১৯৫১।

## ॥ রাজনীতি ও চলচ্চিত্র ॥

চলতি শতকের ষাট দশকের মাঝামাঝি থেকে রাজনীতি ও চলচ্চিত্রের অন্তর্গত সম্পর্ক বিষয়ে দৃষ্টিপাত করার একটি প্রবণতা গড়ে উঠেছে। প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায় প্রথমে ইতালিয় নববাস্তবতা ও পরে ফরাসি নবতরঙ্গ আন্তর্জাতিকভাবেই সমালোচনার ধারাকে এ বিষয়ে প্রভাবিত করে। তবু, সবিনয়ে বলার, সিনেমার জন্মক্ষেণেই একটি রাজনৈতিক রাশিচক্র নির্দিষ্ট ছিল।

ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত বিচার করলে ও সংশ্লিষ্ট সমাজে তার উপযোগিতা-মূল্য নির্ণয়ের প্রয়াস পেলে রাজনীতির নির্ধারণীয়তা প্রাথমিক। প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃত, গ্রীক বা রোমক নন্দনতরে কোনো শিল্পকর্মের সামাজিক উপযোগিতা নিয়ন্ত্রিত হয় রাজনৈতিক নির্ধারকের দ্বারা। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও সাধারণভাবে এই সূত্র কার্যকরী। মাধ্যমের গুণাগুণ নিরপেক্ষভাবে গ্রিফিথের বার্ধ অব এ নেশনের (১৯১৫) জাতিবিদ্বেষ ও আইজেনস্টাইনের ব্যাটলশিপ পটেমকিনের (১৯২৫) বিপ্লবী ঐক্য যথাক্রমে মার্কিন ও সোভিয়েত সমাজব্যবস্থার মতাদর্শকেই প্রতিফলিত করে। চলচ্চিত্রের স্রষ্টারা যখনই প্রতিষ্ঠান বিষয়ে প্রশ্ন ও আলোচনার অবতারণা করেছেন তখনই সিনেমার রাজনৈতিক মাত্রাটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা চার্লি চ্যাপলিন, সের্গেই আইজেনস্টাইন, জঁ রেনোয়া, রবার্তো রসেলিনি, জঁ-লুক গোদার, ঋত্বিক ঘটক, ফার্নান্দো সোলানাস বা ইলমাজ গুণের নাম উল্লেখ করতে পারি।

অবশ্য চলচ্চিত্রের সঞ্চার পথটিই ঐতিহ্যের বিরুদ্ধাচরণ। রেমব্রানটের 'নৈশ-পাহারা' দেখতে চাইলে আমাদের রাইকস চিত্রশালা ভিন্ন গতি নেই। এখানেই শিল্পের অনন্ততার ঐতিহ্য। কিন্তু ওয়াশিংটন বেঞ্জামিন প্রমুখ মহাজন যথাযথ ভাবেই খেয়াল করেছেন যে চলচ্চিত্রের অজস্র পুনরুৎপাদন সম্ভব। আর সম্ভব বলেই শিল্পমাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্র ঐতিহ্যিক পৌত্তলিকতার বদলে চলমান নাশকতাকে অধিকতর মাত্রা ভাবে। বাস্তবিক এ কারণেই শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে আপলিনেয়ার দালি ও বুহুএল সহ য়োরোপীয় শিল্পীদের একটি বড়ো অংশ চলচ্চিত্রের হাতছানিতে সাড়া দেন। অব্যর্থ ভাবে চলচ্চিত্রীয় বাস্তবতা তাদের

দেখিয়ে দেয় ইতিহাসের সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক অস্থিসংস্থান কত ভঙ্গুর। তবুগত ভাবে তাহলে চলচ্চিত্রের প্রকাশক্ষমতা সংস্কৃতির প্রথাবীকৃত মূল্যমানকে অবিনীত করতে পারে। একই সঙ্গে প্রতিকল্প রচনার প্রয়োজনে এই মাধ্যম বাস্তবতাও পুনর্গঠন করে। আর জ্ঞাপনস্থল হিসেবে সিনেমা যে দর্শককে নতুন ও সজীব সমীকরণে টেনে নেয় তা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। আমরা কি একটু সাহস করে বলব উপলব্ধির আপেক্ষিকতাকে আয়ত্ত্ব করে চলচ্চিত্র যে নন্দনতবের আড়িনা থেকে পরমতত্ত্বকে নির্বাসন দিল—এই অধিকার-ই চলচ্চিত্রের সবচেয়ে বড়ো রাজনৈতিক অর্থছোতনা।

আর চলচ্চিত্রের এই অপার সম্ভাবনার কথা প্রথম বোধহয় সচেতন ভাবে প্রয়োগনকল করে তোলেন সোভিয়েত চলচ্চিত্রের মহারথীন্দ্র। একজন অগ্রগামী রাজনৈতিক নেতা হিসেবে লেনিন বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত ভূমিতে চলচ্চিত্র শিল্পকলাসমূহের মধ্যে বলশেভিকতন্ত্রের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি জানতেন উচ্চারিত ভাষার তুলনায় চিত্রিত ভাষা কত সর্বজনীন এবং এই সূত্রে চলচ্চিত্রের সর্বত্রগামীতা। কিন্তু মার্ক্সীয় দর্শনের দ্বন্দ্বিক পটভূমিটি প্রথম স্পষ্ট অবয়ব পেল আইজেনস্টাইনের যুদ্ধজাহাজ পটেমকিনে। আজও পর্যন্ত চলচ্চিত্র ও রাজনীতির প্রধান দেহুবন্ধন উক্ত সেনুলয়েডায়িত মহাকাব্য। একটু ভেবে দেখলেই দেখা যাবে একটি বিপ্লবী আধেয়কে উপস্থিত করতে আইজেনস্টাইন আধারটিকে আয়ুল পরিবর্তিত করেছিলেন। গ্রিফিথ প্রবর্তিত অদৃশ্য সম্পাদনার ভিত্তিতে ব্যক্তির আন্তঃসম্পর্কের বহমান কথকতা নয়। বালিন যেভাবে অভিব্যক্তিবাদের সাহায্যে আবহ রচনা করত তাও নয়, চিত্রকলার নোঙলে ফরাসিদের ফ্রেমবদ্ধ ভিত্ত্য্যাল রচনার তাৎক্ষণিক আধেগ তাকে স্পর্শ করেনি, বরং তাঁর গায়ত্রীমন্ত্র হয়ে উঠেছিলো মেধাবৃত্ত মন্তাজ যা অনুরূপস্থের বদলে বাস্তবতাকে সম্প্রদারণশীল ও আরোহী মাত্রা দেয়। বিপরীতের সমন্বয় যে কিভাবে নতোর আত্মা ও শরীর পরীক্ষা করে তা এই মহাশিল্পীর দান্নিধ্য ব্যতিরেকে চলচ্চিত্রের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারত না, অপর দিকে জিগা ভেরতত নতোর অন্তরস্থল খুঁজে পেতে চাইছিলেন তাঁর প্রত্যক্ষ ক্যামেরার মাধ্যমে; তথ্য ও তত্ত্ব তাদের শ্রেণী অবস্থান বদল করছিল। অর্থাৎ চলচ্চিত্র এই প্রথম দৃষ্টিনন্দন হওয়ার বদলে চিত্তাশোভন হয়ে উঠল। বিষয়ের মায়া পেরিয়ে বক্তব্যের দিকে এই যে উত্তরণ, ডিসকোর্সের এই যে অবতারণা, যা কিছু দর্শনীয় তা থেকে যা কিছু চিত্তনীয়—এই যে সেরিব্রাল প্রদাহের আরোপ, এইসব অভিজ্ঞতাকে

সঙ্গী করে হুড়ি শতকীয় রাজনীতি সিনেমাকে এক অমোঘ অস্ত্র হিসেবে গুণে নিল।

কাহিনীর বদলে ইতিহাস রেনোয়ার ল্য রেগলে দ জু ছবিটিকেও বুর্জোয়াদের প্রতি সন্দেহান করে তোলে কিন্তু ভাঁড়ামির একটি উপমারহিত মুখোশ ব্যবহার করে চার্লি চ্যাপলিন যেভাবে পুঞ্জিবাদ ও তার বিপননধর্মকে আক্রমণ করেন তাতে মার্কিনী গণতন্ত্রেরও দত্তবর্ষণ শুরু হয়ে যায়। চার্লি, বাস্তবিক, দণ্ডিত সভ্যতার বিবেক ও বিগ্রহ। যুদ্ধোত্তরকালে ইতালিয় নববাস্তবতার পুরোহিত্য; ভিনকত্তি, রসেলিনি ও ডি সিকা সিনেমা ও রাজনীতির সম্পর্কটিকে আবার আঙ্গিক-গত নিরীক্ষার মধ্যে প্রতিষ্ঠা করলেন। ডিপ-ফোকাস ফটোগ্রাফির সাহায্যে তাঁরা ছায়াছবির দেশগত সংজ্ঞার আকার পাটালেন। বিশেষত বাইসাইকেল চোর মিসেসেনকে যেভাবে অর্থপূর্ণ করে তাতে আপাতভাবে ঘটনাবিরল এই ছবি ক্যাথলিক সভ্যতার মর্মমূল পর্যন্ত বিদ্রূপ করে, একটি প্রতিরোধ প্রায় বিপ্লবের স্তরে পৌঁছে যায়। ঙ্গ্রে বাজী খুব অকারণে ছবিটিকে যুদ্ধোত্তর পর্বের সবচেয়ে বৈধ কমিউনিস্ট ফিল্ম বলেননি।

দেখা যাচ্ছে বামপন্থা ও প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার সঙ্গে রাজনৈতিক সিনেমার হরণেরী সম্পর্ক। ( অবশ্য আমরা ফ্যাসিবাদী দলিল চিত্রগুলিকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করছি না কিন্তু তারাও চরিত্রে রাজনৈতিক )। এই সম্পর্কটিই আরো বিস্তৃতভাবে প্রমাণিত হলো ফরাসি নবতরঙ্গ বিশেষত জঁ-লুক গোদারের কার্যাবলীতে। প্রকৃত প্রস্তাবে কাইয়ে দু সিনেমার পঞ্চপাণ্ডব, গোদার, জুফো, শ্রাত্রল, রোমার ও রিভেত সমালোচনা ও চলচ্চিত্রকর্মকে অবৈত রূপে দেখেছিলেন। এই দেখা বস্তুত কামেরা-বিলো ( ক্যামেরা-লেখনী ) তত্ত্বের ফলিত রূপ। অর্থাৎ গোদার প্রমুখ আপাত সন্ত্রাসবাদীরা চাইছিলেন চলচ্চিত্রে বিনোদন ধর্মের বদলে একটি প্রবন্ধধর্মের প্রবর্তন ও সেইসূত্রে দেশ-কাল পটভূমি ও নন্দনতত্ত্বের সমালোচনার অন্তর্ভুক্তি। গোদারের অবিষ্ট বিশ্বরূপদর্শন ; শিল্পী ও তার সমালোচনার মেরুসমন্বয়। এ প্রসঙ্গে তিনি যে ইতিহাসচেতনার আশ্রয় নেন তা সর্বত্র প্রদর্শনবাদ নয়। যেমন ন'তের বিশ্ববিদ্যালয়ের যে যুবক-যুবতীরা মাওপন্থার পথিক লা শিনোয়াজে ( ১৯৬৭ ) এক বছর বাদে তারাই ইতিহাস নির্দেশিত ক্যাম্পাস অভ্যুত্থানে অংশ নেয়।

গোদার ও তাঁর সংস্থা-বিরোধী উচ্চারণসমূহ ক্রমেই রাজনৈতিক সিনেমাকে একটি নবীন গোত্র হিসেবে চিহ্নিত করে। বিশেষত লাট্রিন আমেরিকায় জঙ্গী

বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতিধাতে গ্রবার রসা, ফার্নান্দো সোলানাস চলচ্চিত্র-কর্মকে চুল্লীর প্রহর হিসেবে চিহ্নিত করে ফেলেন। অগ্নিত্র কস্টা গাভরাস, ইলনাজ গুণে, কিছু আগে পট্টিকর্ভো নানা সময়ে চলচ্চিত্রকে তার আখ্যানধর্মীতা থেকে পৃথক করে প্রত্যক্ষায়ণের দিকে ঝুঁকে পড়েন।

ভারতবর্ষে দিনেমা ও রাজনীতির আত্মীয়তা শুরু থেকেই। রাজা হরিশ্চন্দ্র বা ত্রিভঙ্গ জাতীয় ছবিতে, লোকমাণ্ড তিলকের নেতৃত্বে যে হিন্দু জাতীয়তাবাদ আন্দাদের রাজনীতিতে ঢেউ তুলেছিল, দাদাসাহেব ফালকে তার রেশ অনুভব করেছেন। পরবর্তীকালে বামপন্থী আন্দোলন ও গণনাট্য সঙ্ঘের প্রভাবে বিন্দল রায় উদ্বোধনের পথে ও দো বিধা জমিন জাতীয় যে ছবিগুলি তোলেন তা আরো মোহনার দিকে অগ্রসর হয় ঋত্বিক ঘটকের নাগরিক চিত্রে। নাগরিক (১৯৫২) শুধু ঋত্বিকের প্রথম ছবি নয়; তার অভ্যন্তর নির্মাণক্রটি সবেও এই উপমহাদেশের প্রথম রাজনৈতিক ছবি। অবশ্য ঋত্বিক-নাট্যে রাজনীতি চিরদিনই একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে গেছে। বিষয়কে গোঁণ বিবেচনায় বক্তব্যধর্মী প্রেক্ষাপটের আশ্রয় গ্রহণ ও সৃষ্টিকর্মে ওভারটোন সংশ্লেষণের যে রীতি ঋত্বিক প্রচলন করেন তা দীর্ঘদিন তুলনামূলক শিল্পতত্ত্বের পক্ষে বিশ্বাস হয়ে থাকবে।

সত্তর দশক থেকে রাজনীতি সত্যজিৎ রায় সহ অগ্নিত্র ভারতীয় পরিচালকদেরও আকৃষ্ট করতে থাকে। বিশেষভাবে হৃণাল সেন ইন্টারভিউ থেকে কোরাস পর্যন্ত ও পরে মহাপৃথিবীতে অর্কষ্ট রাজনীতি নিমজ্জিত।

চলচ্ছবি ও রাজনীতির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে অতএব আর্থিক পরিকাঠামো ছাড়াও, রাষ্ট্রচরিত্র ও তার আনুযায়িক নিয়ন্ত্রণ (সেন্সর) ব্যবস্থা, শিল্পীর স্বাধীনতা বোধের স্থিতিস্থাপকতা ইত্যাদি গভীরভাবে জড়িত। মাও সে তুং যাকে উপরিতলের ঘটনার কুচকাওয়াজ বলে পরিহাস করেন তা সচরাচর এক ধরনের পরিচালকের সহজিয়া সিদ্ধির পথ মনে হলেও সিনেমার প্রকৃত রাজনীতি সমগ্র কাঠামোটাই তদন্ত ও নবদমীক্ষা দাবি করে।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : অ্যালান লাভেল-এর অ্যানারকিস্ট সিনেমা ॥

**সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়**

॥ রাফ-কাট / রাশ ॥

ত্রুটিংয়ের সময় এক বা একাধিক ক্যামেরায় যা তোলা হলো সেই গৃহীত ছবির প্রাথমিক শাব্দা কালো বা রঙিন প্রিন্টকে রাশ বলা হয়। রাশ প্রিন্টে সাধারণত

শুধু দৃশ্যসমূহই থাকে, সংলাপ অর্থাৎ সাউণ্ড ট্র্যাক থাকে না। রাশ প্রিন্ট থেকে প্রযোজন্য, অভিনেতার বা কলাকৌশলের কোনো ক্রটিতে যে সমস্ত শট ৭ দৃশ্যাংশ বাতিল হয়েছে তা ও যে সমস্ত শটের একাধিক করে টেক নেওয়া হয়েছে তার সর্বোত্তমটি ছাড়া আপাতত অল্পগুলি বাদ দিয়ে চিত্রনাট্যের আউটলাইন ৭ সাধারণ ধারাবাহিকতা অনুসারে রাশ প্রিন্টের প্রাথমিক সম্পাদনায় ছবির যে রূপ দাঁড়ায় তাকে রাফ-কাট বলে। এই খসড়া-চিত্র কখনো কখনো সবাক হয় (সাধারণত তথ্যচিত্রের ক্ষেত্রে তা হয় খসড়া ধারাত্ম্য, কাহিনীচিত্রের ক্ষেত্রে সংলাপ ও মিউজিক্যালের ক্ষেত্রে সংগীত) কিন্তু ধ্বনি, আবহ সংগীত, অপটিক্যাল এফেক্ট, বা পরিচয়লিপি, এসব তাতে থাকে না। এই শিথিল সংস্করণ মূল সংস্করণে ছবির দৈর্ঘ্য যা হবে তার চেয়ে দীর্ঘ হয়ে থাকে।

### ॥ টনি রিচার্ডসন ॥

(জন্ম ১৯২৮, ইংল্যান্ড)। রিচার্ডসন চলচ্চিত্রে আসেন মঞ্চ থেকে! পঞ্চাশের দশকে যে সমস্ত তরুণ পরিচালক ব্রিটেনের ফ্রি সিনেমা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তিনি তাঁর অল্পতম। এই আন্দোলনের প্রবক্তা হিসেবে কিছু উল্লেখযোগ্য স্বল্প দৈর্ঘ্যের চিত্র এবং কয়েকটি টিভি চিত্র নির্মাণের পর তিনি কাহিনীচিত্র পরিচালনা করা শুরু করেন। পঞ্চাশের দশকের শেষভাগ থেকে ব্রিটেনে নব্যধারার কাহিনীচিত্রও নির্মিত হতে লাগল। সেই ধারায় তাঁর লুক ব্যাক ইন অ্যান্ডার (৫৮), এ টেস্ট অব হানি (৬১), দি এন্টারটেনার (৬০), দি লোনলিনেস অব দি লং ডিস্ট্যান্স রানার (৬২) প্রভৃতি ছবির এস্টাব্লিশমেন্ট বিরোধী বিষয় (এই বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে লিওসে অ্যানডারসনের কথাও প্রাসঙ্গিক) এবং কিশোর ও তরুণদের প্রতি সহানুভূতির সুর, অপ্রত্যাশিত ও বিস্ফোরক উপাদানের উপস্থিতি, তীব্রতা ও সতেজতার বিশেষ সমন্বয় (যদিও স্বাদ ও মেজাজের দিক থেকে তা প্রায়শই ভীষণভাবে ব্রিটিশ) এবং শহরতলীর স্থনির্বাচিত লোকেশনে শ্রাটিং ও অভিনেতা নির্বাচনে আর অভিনেতাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার বিরল দক্ষতা—এই সমস্ত গুণ উল্লেখযোগ্য। তিনি উডফল ফিল্ম নামে একটি চিত্রসংস্থার অল্পতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন যা তাঁর নিজের ছবি ছাড়াও অল্পের পরীক্ষামূলক ছবি প্রযোজনা করেছে, যেমন, রেইজ-এর স্টার্টারডে নাইট অ্যাণ্ড দান্ডে মনিং। হলিউডে গিয়ে স্যাংচুয়ারি (৬১) ও দি লাভড্ ওয়ান (৬৫) তোলার পর তিনি গ্রেট ব্রিটেনে আর যেসব ছবি তোলা—টম জোনস্ (৬৩), হ্যামলেট (৬৯), নেড কেনী

( ৭০ ), ইত্যাদি তাঁর আগের ছবিগুলি থেকে এই কারণে আলাদা যে এগুলো মূলত: বড় মাপের পিরিয়ড-পীস। তাঁর মধ্যে হ্যামলেট তাঁর নিজের মঞ্চ প্রযোজনারই চিত্ররূপ। দি লোনলিনেস-য়ে টেকনিক-সচেতনতার বিশেষ প্রমাণ থাকলেও মূলত: তিনি নাট্যধর্মী চিত্রপরিচালক। ফ্রি দিনেমা আন্দোলনের প্রভাবের দরুন তাঁর ছবিতে তথ্যমূলকতার ভূমিকাও রয়েছে। তাঁর অস্কা ছবির মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য এ ডেলিকেট ব্যালাস ( ৭৩ ), দি বর্ডার ( ৮২ ), ব্লু স্কাই ( ৯১ )।

॥ ক্যারল রিড ॥

( ১৯০৬-৭৬, ইংল্যান্ড )। চলচ্চিত্র পরিচালকের কাজ শুরু করার আগে রিড, আরো অনেক ব্রিটিশ পরিচালকের মতো, নাটকের প্রযোজক পরিচালক ও অভিনেতা রূপে খ্যাতি পান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তিনি সামরিক বাহিনীর জ্ঞান প্রশিক্ষণ চিত্র, একটি স্পেশালাইজড্ তথ্যচিত্র দি ওয়ে অ্যাহেড ( ৪৪ ) ও প্রচারচিত্র দি ট্রু গ্লোরি ( ৪৫ ) নির্মাণ করেন। যুদ্ধের পর, চল্লিশের দশকের শেষ ভাগে, ব্রিটিশ চলচ্চিত্রশিল্প যখন মান্য রকম অনিশ্চয়তায় ভুগছে তখন তাঁর কাহিনী-চিত্রের সম্ভাবনাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন লরেন্স অলিভিয়ার, তিনি ও ডেভিড লীন। যদিও ব্রিটিশ চলচ্চিত্রের নিজস্ব স্বতন্ত্র ও জাতীয় কোনো সত্তা তখনও গড়ে ওঠেনি। তাঁর তৎকালীন উল্লেখযোগ্য কাহিনীচিত্রের মধ্যে আছে অড ম্যান আউট, দি ফলেন আইডল, দি থার্ড ম্যান, এই সমস্ত ছবি কাহিনী বর্ণনা, পটভূমির বিশ্বস্ততা, অভিনেতাদের ব্যবহার, পরিমিত ও আন্তরিকতা, এবং মানবিকতা সম্পর্কে ব্যক্তিগত দরদী ভাবনায় চিহ্নিত। রিডের ছবিতে ও ছবির কাহিনীতে যে প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ সুর ও মেজাজ তা মিউজিক্যাল ছবি 'অলিভার!'য়ে সবচেয়ে স্পষ্ট রূপ পেয়েছে, ছবিটি জনপ্রিয়তাও পেয়েছিল অসাধারণ। ওই ছবির সঙ্গে আর এক জনপ্রিয় মিউজিক্যাল 'মাই ফেয়ার লেডি'র প্রতিভুলনা মনোগ্রাহী হতে পারে। ১৯৫২য় তাঁকে স্মার উপাধি দেওয়া হয়।

॥ রিডাক্শন প্রিন্ট ॥

রিডাক্শন প্রিন্ট হলো ব্লো আপ প্রিন্টের বিপরীত। ৮ মিমি বা ১৬ মিমি নেগেটিভে ছবি তুলে তাকে ১৬ মিমি বা ৩৫ মিমি পজিটিভে বর্ধিত করার নাম ব্লো আপ। পক্ষান্তরে ৩৫ মিমি নেগেটিভে ছবি তুলে তাকে ১৬ মিমি বা ৮ মিমি পজিটিভে সংহত করার নাম রিডাক্শন ও অনুরূপ condensed পজিটিভ প্রিন্টই রিডাক্শন

প্রিন্ট নামে পরিচিত। এই প্রিন্টে কিছু কিছু ডিটেল একটু চাপা পড়ে গেলেও কম্প্যাক্সিনের কম্প্যাঙ্কনেস ও কনসেনট্রেশন বৃদ্ধি পায় বলে ছবি দেখতে ভালো লাগে এবং এই রকম প্রিন্টের টেকনিকাল মানও যথেষ্ট উন্নত হয়। এই ধরনের রিডাক্শনে প্রদর্শনকালের হেরফের হয় না কিন্তু ফিল্ম ফর্ম্যাটের পার্থক্যের দরুন পজিটিভের দৈর্ঘ্যে ব্যাপক পরিবর্তন হয়। ১০০০ ফুট ৩৫ মিমি ১৬ মিমি-তে এসে ৪০০ ফুট দৈর্ঘ্য পায়। আর্কাইভ, ফিল্ম ক্লাব, ব্যক্তিগত সংগ্রহ ও টিভি সম্প্রচারের জন্য সাধারণত রিডাক্শন প্রিন্টের প্রয়োজন।

### ॥ রিভার্স্যাল ফিল্ম ॥

নেগেটিভ ফিল্মে ছবি তুলে তাকে পজিটিভ ফিল্মে প্রিন্ট করিয়ে পজিটিভ প্রিন্টের যতগুলো ইচ্ছে কপি পাওয়া যায় ও নেগেটিভ প্রিন্টটি সম্বন্ধে ল্যাবরেটরিতে রক্ষিত থাকে। রিভার্স্যাল ফিল্মে কিন্তু যে ফিল্মে ছবি উঠছে প্রেসিংয়ের মাধ্যমে সেই ফিল্মটিই পজিটিভ প্রিন্ট হয়ে বেরিয়ে আসছে ও মূল নেগেটিভটিই পজিটিভ হয়ে যাওয়ায় নেগেটিভ প্রিন্ট আর সংরক্ষিত থাকছে না। রিভার্স্যাল ফিল্ম সাধারণত ১৬ মিমি ফর্ম্যাটে পাওয়া যায়, ঠিকমত ছবি তুলতে পারলে ছবিতে তীক্ষ্ণতা ও সংবেদনশীলতা যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষিত হয় বলে শুধু অপেশাদার ব্যক্তির নয়, পেশাদার ক্যামেরাম্যানরাও এখন মাঝে মাঝেই এই ফিল্ম ব্যবহার করে থাকেন। সম্প্রতি রিভার্স্যাল ফিল্মের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছে। উন্নত মানের ইন্টারমিডিয়েট ফিল্মের প্রচলনের ফলে প্রেসিংয়ের মানও বৃদ্ধি পেয়েছে। রিভার্স্যাল ফিল্মের বিপ্রতীপ বস্তু হলো ডিউপ নেগেটিভ ( ড্র. )।

### ॥ দি রুল্‌স্ অব দি গেম ॥

১৯৩৯, ফ্রান্স। ১০৬ বছর পূর্বে প্রকাশিত উপন্যাসের আপাত তুচ্ছ ও শাদামাটা গল্পাংশ অবলম্বনে রেনোয়া এই ছবিতে দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ফরাসি অভিজাত সমাজের অবক্ষয় ও শিথিলতা ও তা কীভাবে এই সমাজকে ভিতর থেকে ক্ষয়প্রাপ্ত করে দিচ্ছিল তার এক স্নেহস্বক চিত্ররূপ দিয়েছেন যা স্বীকৃত ক্লাসিক হিসেবে কালোত্তীর্ণ হয়েছে। রেনোয়া এই ছবির চিত্রনাট্যকার, পরিচালক, ও একটি মূল ( সম্ভবত গল্পের ধারক ) চরিত্রের অভিনেতা। ছবিটি বাস্তবতা ও কাব্য, কমেডি ও ফার্স, আপোষ ও প্রবঞ্চনা, প্রেম ও ক্রীড়নশীলতা, সংরাগ ও বহুতার এক বলিষ্ঠ সূক্ষ্ম সমন্বয় থাকে রেনোয়া ধরে রেখেছেন কয়েকটি ব্যক্তিগত সম্পর্কের

অটিল-বুননের জালে। ছবিটি তৈরি হয়ে যাবার পর রেনোয়াকে আমেরিকা চলে যেতে হয় এবং ছবির যথেষ্ট কাটাকুটি করা একটি সংস্করণ মুক্তি পায়। বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন দেশে অপসংস্কৃতির অঙ্কহাতে এ ছবিতে নিষিদ্ধ করাও হয়েছে। শিল্পীর নিজস্ব ও ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর স্বদেশ ও সমাজের একটা বিশেষ ঝাঁকের মূল্যায়ন হিসেবে ছবিটি করাসি চলচ্চিত্রের অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এই ছবির সঙ্গে সংগঠনের দিক দিয়ে আমি ফেলিনির এইট অ্যাণ্ড হাফ ছবির ও ঝিমের দিক দিয়ে বার্গম্যানের আইলুস অব এ সামার নাইটের সাদৃশ্য পাই। এই প্রসঙ্গে বাঙালি পাঠক-দর্শকের আরও মনে পড়বে বনফুলের মৃগয়া উপস্থাপনের কথা।

অভিনয়ে M. Dalio, N. Gregor, R. Toutain ; চিত্রগ্রহণ J. Bachelet, সম্পাদনা মার্গেরিৎ রেনোয়া, সংগীত জে কসমা ও অন্ত্যাত্ত ।

॥ জঁ রুশ ॥

জন্ম ১৯১৭, করাসি চিত্রপরিচালক ও নৃত্যবিদ। একদিকে তাঁর ছিল সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-য়ে ডিগ্রি, অন্যদিকে তিনি ছিলেন সাহিত্যে পিএইচ. ডি। প্যারিসে CNRS সংস্থার গবেষণা বিষয়ক বিভাগের অধিকর্তা রূপে তিনি ইন্টারন্যাশনাল এথনোগ্রাফিক ফিল্ম কমিটি স্থাপন করেন ও সমাজবিজ্ঞানী, নৃত্যাত্মিক ও চিত্র-নির্মাতা এডগার মরিনের সহযোগিতায় এথনোগ্রাফিক চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করেন। এথনোগ্রাফিক ফিল্মের প্রথম আন্তর্জাতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬০ সালে। তিনি চলচ্চিত্র মাধ্যমকে প্রথম ব্যবহার করেছিলেন আফ্রিকায় তাঁর নৃত্যাত্মিক গবেষণাকর্মের অঙ্গ হিসেবে। সেই সময়ে আফ্রিকানদের রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে তিনি কয়েকটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের চিত্র প্রযোজনা করেন। তারপর চলচ্চিত্র মাধ্যমটিতে মূলগত ভাবেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে তিনি ১৯৫৮-য় তাঁর প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্রও নির্মাণ করেন। তথ্য ও কাহিনীচিত্রের মাঝামাঝি একটি শৈলী নিয়ে তিনি বিস্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। যার ফলস্বরূপ ফ্রান্সে সিনেমা ভেরিতে (ড্র.) আন্দোলন প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাঁর ছবির কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল আন্তর্গোষ্ঠিক সম্পর্ক (interracial relations)। এই সমস্ত প্রসঙ্গ যার অন্তর্গত—বাস্তব বনাম কল্পনা, আফ্রিকানদের সঙ্গে ইউরোপিয়ানদের সংঘাত, কথ্য ঐতিহ্য ও দৃশ্যকলার সমন্বয়, ইত্যাদি। পরে তিনি আবার আফ্রিকায় ফিরে গিয়ে তথ্যচিত্র নির্মাণে মনোনিবেশ করেন। আফ্রিকান চলচ্চিত্রের উদ্ভব ও বিকাশে তাঁর যথেষ্ট ভূমিকা ও প্রভাব ছিল। তাঁর বহু ছবি বিখ্যাত চলচ্চিত্র

উৎসবগুলিতে পুরস্কৃত হয়েছে। *The Adolescents* (১টি পর্ব), *সিন্স ইন প্যারিস* (১টি পর্ব), *জাওয়ার, দি লায়ন হাণ্টারস, এনিগ্‌মা তাঁর অসংখ্য ছবির কয়েকটি।*

মানুষের জীবনকে সচেতন ভাবে লিপিবদ্ধ করার জ্ঞান রুশ সিনেমা মাধ্যমটির ব্যাপক ব্যবহার ঘটান। এথনোগ্রাফিক ফিল্মের সংখ্যা খুব বেশি নয়, কিন্তু তার মধ্যেই তাঁর কয়েকটি অসাধারণ তথ্যচিত্র রয়েছে। পুরনো, প্রথাগত, চিত্র-বিনোদনকর চলচ্চিত্রের বিপরীতে এক নতুন ও ভিন্ন সিনেমার সৃষ্টিতে যারা সবচেয়ে বেশি অবদান যুগিয়েছেন জাতিবিজ্ঞানী ও নৃত্যবিদ রুশ তাঁদের অন্ততম। এমনকি গদার ও তাঁর একটি ছবির দ্বারা [*Moi, unnoir* (৫৮)] প্রভাবিত হন। তাঁর সাম্প্রতিক ছবি *Cantate pour deux généraux*।

॥ নিকোলাস রে ॥

১৯১১-১৯, মার্কিন চিত্রপরিচালক। হলিউডের বিশাল প্রাঙ্গণে অনেক মানুষের ভিড়—তবু তার মধ্যে নিকোলাস রে'কে আলাদা করে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। ফোর্ড বা হক্‌স্‌ যে অর্ধে রুপদী, রে'কে সে গোত্রের ফেলা যাবে না, বরং তাঁকে বলা যায় রোমাণ্টিক, কিন্তু তাঁর ছবি মার্কিন জীবনের ছবি, সর্ব অর্থেই তিনি একজন মার্কিন, খাঁটি মার্কিন।

জন্ম ১৯১১তে। ১৯৩২এ এলেন নিউইয়র্কে। ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইটের সঙ্গে কিছুদিনের যোগাযোগের পর ১৯৩৪এ ওয়ার্কাস ল্যাবরেটরি নামে একটি বামপন্থী থিয়েটার গ্রুপে যোগ দিলেন। পরের কয়েক বছর তিনি ক্রকলিন লেবার কলেজে নাট্যশিক্ষকতা করলেন, ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে নাট্যপ্রযোজনা করলেন। এরপর যোগ দিলেন ওয়াশিংটন ডি. সি.তে WPA থিয়েটার প্রজেক্টে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জড়িয়ে পড়লেন পূর্ব যুরোপের দেশগুলির উদ্দেশে প্রচারের কাজে। যুদ্ধ শেষ হলো, কাজানের সঙ্গে নিকোলাস এলেন ক্যালিফোর্নিয়া, ব্যস্ত রইলেন কাজানের ছবির বিভিন্ন কাজে। তখনই সম্পাদনার প্রথাগত রীতি সম্পর্কে তাঁর আপত্তির শুরু। নিকোলাস রে'র ফিল্ম জীবন শুরু হলো এডুইন অ্যাণ্ডারসনের *Thieves Like Us* বই—এর চিত্ররূপ *They Live by Night* দিয়ে। এটা একটা প্রেমের গল্প কিন্তু তার পরিণতি ট্রাজেডিতে। এই প্রথম ছবি থেকেই সমাজ বহির্ভূত চরিত্র সম্পর্কে পরিচালকের সহানুভূতি দেখা যায়।

ছবির পর ছবি ছুড়ে নতুন থেকে নতুনতর পরীক্ষায় ক্লাস্তিহীন নিকোলাস বাবেবারেই ধরতে চেয়েছেন মার্কিন জীবনের মৌল দৃশ্য, তার সামাজিক, রাজ-

নৈতিক বিড়ম্বনা ও প্রাপ্তিকে। মার্কিন স্বপ্নই রে'র ছবির বিষয়, তার চরিত্ররা সেই স্বপ্নের সন্ধান, যদিও সে স্বপ্নের পরিণতি তিক্ত ও কটু। তাঁর চরিত্ররা বলে বেড়ায় যে বিষাদ ও যন্ত্রণা, তা ব্যক্তিগত, কিন্তু শুধুই ব্যক্তিগত নয়, তা এক নিকরুণ অত্যাচারী ব্যবস্থার চাপিয়ে দেওয়া যন্ত্রণাও বটে। আর সেইসঙ্গে তা বোধহয় তাদের অষ্টারও দ্বিধা ও যন্ত্রণার ভাগ বলে বেড়ায়। তাঁর ছবি সে জন্মই শুধু ঐ মার্কিন জীবনকেই দেখা নয়, সেই সঙ্গে নিকোলাস রে'কেও দেখা।

এ ভাবেই নিকোলাস রে গড়তে চেয়েছিলেন তাঁর ছবিগুলিকে। ১৯৪৯এ তোলা *Knock on Any Door*, ৫৩তে তোলা *Johnny Guitar*, ৫৪তে তোলা *Run for Cover* প্রভৃতি ছবিতে তিনি যেন খুঁজতে চাইছেন প্রতিষ্ঠিত মানাজিক নিয়মকানুন ও নৈতিকতার সঙ্গে তথাকথিত সনাজ-বিরোধিতার পারস্পরিক সম্পর্কের জটিলতাকেই। তিনি একটা সমাধান খুঁজতে চেয়েছিলেন, প্রতিষ্ঠিত সমাজের হিংস্রতার একটা বিকল্প—কিন্তু তাতে পৌঁছতে পারেননি। *Rebel Without a Cause* (৫৫)-য় ধরা পড়ল নিকোলাস রে'র সেই যন্ত্রণা। এ ছবিকে রুপদী আখ্যা দেওয়া হয়েছে, বলা হয়েছে সমকালের তুলনায় পরবর্তীকালেই এ ছবির তাৎপর্য আরও বেশি অনুভূত, এখানে যেন মার্কিন সমাজের এক অসহায়ত্বকে ফোঁটাতে চেয়েছিলেন নিকোলাস। এ ছবির মূল চরিত্র, *James Dean* অভিনীত, বয়ঃসন্ধিকালের এক কিশোর, সত্যিই প্রতিবাদী ও বিদ্রোহী, বিদ্রোহী নিকোলাস রে নিজেও।

তাঁর প্রতিবাদ অশ্রুভাবে রুপ পায় ৫৬তে নির্মিত *Bigger Than Life*-এ। এখানে তাঁর বিচরণ মনস্তাত্ত্বিক জগতে। এই ছবি নিম্ন মধ্যবিত্তের উপরে ঠাঠা বাসনার মর্মান্তিক ট্রাজেডির রূপায়ণ, বুর্জোয়া জীবনের মোহ কী ভাবে টানে নিকোলাস তাই দেখাতে চেয়েছিলেন। গোদার এ ছবিকে সেরা দশটি মার্কিন সবার চিত্রের একটি হিসাবে নির্বাচিত করেছিলেন। ৫৭তে নির্মিত রে'র *Bitter Victory* সম্পর্কেও গোদার প্রবল উচ্ছ্বাস দেখান। ১৯৪২ সালে, বিশ্বযুদ্ধের সময় লিবিয়ার মরুভূমিতে ছবির কাহিনীর বিস্তার। যুদ্ধ বা দেশপ্রেম এ ছবির বিষয় নয়, রে যেন বোঝাতে চেয়েছিলেন যুদ্ধ ইত্যাদির মাঝখানে একজন বুদ্ধিজীবীকে আত্মধ্বংসের পরিণতিই বেছে নিতে হয়। আসলে এর নায়কের চরিত্রটি যেন নিকোলাস রে'রই চরিত্র। ৫৮ সালের *Wind Across the Everglades*-এ এই সমস্যারই অশ্রু চেহারা দেখা গেল। এ ছবির নায়ক দাঁড়াল মননের সমস্যার নয়, নৈতিক সমস্যার সামনে। নৈতিকতার সেই সমস্যাটা শুধু নায়কের নয়,

পরিচালকেরও। ফিল্মে যে যুক্তি ও নৈরাজ্যের লড়াই, তা হয়তো নিকোলাস রে'র নিজেরও লড়াই।

ক্যাইয়ে দ্ব্য সিনেমা ৫৮তে নির্মিত Party Girl নিয়ে খুব উচ্ছ্বাস দেখিয়েছিল। নিকোলাস নিজে অবশ্য তার অগ্রতম কারণ হিসাবে মনে করেছিলেন বহিরঙ্গের নানা উপাদানের ব্যবহার, যেমন রংয়ের প্রয়োগগত সার্থকতা। অবশ্য শুধু সেটাই Party Girl-এর একমাত্র উপাদান নয়। The Savage Innocents (৬০)-এ পটভূমিকা একটু আলাদা। এক্সিমো জীবন নিয়ে রচিত এই ফিল্ম একই সঙ্গে নৃত্য, পরিবেশবিজ্ঞান ও নৈতিকতার প্রশ্ন নিয়ে আলোড়িত। এক্সিমো জীবনের ছবি—কিন্তু মারা ছবি জুড়ে সাদা মানুষদের সভ্যতা সম্পর্কে এক প্রবল ঘৃণাই উচ্চারিত। বারেরবারে মার্কিন জীবনের যে অভিশাপ সম্পর্কে নিকোলাস আপত্তি জানাতে চেয়েছেন, এখানে তাই রূপ পেল গোর্টা সভ্যতা সম্পর্কে আপত্তিতে। ৬৩তে 55 Days at Peking. কেন এ ছবি করেছিলেন রে—তা একটা রহস্য। এ ছবি তাঁর মনোমত ছিল না, ব্যর্থও। ফলে কয়েক বছর তাঁকে সরে থাকতে হলো ফিল্ম রচনা থেকে। বেশ কিছুকাল পরে ছবি তুলতে চেয়েছিলেন আদালত ও বিচার ব্যবস্থা নিয়ে, চিকাগো ষড়যন্ত্র মামলা তাঁকে সে স্বযোগ দিয়েছিল, তবু সে ছবি তিনি শেষ করতে পারেননি। মার্কিন বিচার ব্যবস্থার স্বরূপ উদঘাটন তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি, যে কাজ পরে করেছিলেন নিকোলাস-তরু গোদার।

৭১-এর ডিসেম্বরে নিকোলাস হারপুর কলেজে শিক্ষকতায় যোগ দেন। সেখানেই ছাত্রদের নিয়ে শুরু করেন We can't Go Home Again—কিন্তু তাও শেষ হয় না। এ ছবিতে তিনি নিজে অভিনয় করেছিলেন—সে ভূমিকা একজন বিশ্বাসঘাতকের। নিকোলাস মনে করেছিলেন তাঁর প্রজন্মই বিশ্বাসঘাতক, যে বিশ্বাসঘাতকতা জন্ম দেয় যুদ্ধ, হত্যা আর গ্যারগেট কেলস্কারির। নিজ প্রজন্মের সেই বিশ্বাসঘাতকতার দায় বহিতে চেয়েছিলেন নিকোলাস রে। কিন্তু শুধু এই অসম্পূর্ণ ছবি নয়, সব ছবিতেই তো নিকোলাস রে স্বয়ং উপস্থিত। জাক্ রিভেৎ তাঁর ছবি সম্পর্কে বলেছিলেন, যে তাঁর সব ছবিতেই অস্তিত্বের নিঃসঙ্গতা, মানবিক সম্পর্কের জটিলতা রূপায়িত। আর এগুলো নিকোলাস রে'র নিজেরও সমস্যা। নিকোলাসকে ছবি করতে হয়েছে হলিউডে বসে, এবং বাণিজ্যিক ছবিই করেছেন তিনি। তাঁর পরিচালনার চূড়ান্ত দক্ষতা, টেকনিকাল কাজের প্রতি অত্যধিক মনোযোগ, অভিনেতাদের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেওয়া—নানা ভাবেই

তঁার ছবির বাণিজ্যিক সম্ভাবনাকে তিনি প্রশারিত করেছেন, ছবিকে দিয়েছেন ঝকঝকে চেহারা। কিন্তু তবু তিনি হলিউডের বাইরের লোক। হলিউডের মধ্যে থেকে হলিউডকে অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন তিনি, ফলে তাঁকে বিদ্রোহী হতে হয়েছে, আবার কখনো আসতে হয়েছে সমঝোতায়। এই দ্বন্দ্ব সচেতন ভাবেই অহুত্ব করেছেন তিনি, চেষ্টা করেছেন তা থেকে বেরিয়ে আসতে। যে বিদ্রোহ তঁার ছবিতে, উৎপীড়ক মার্কিন সমাজের বিরুদ্ধে—সে বিদ্রোহ নিকোলাস রে'র নিজেরও। তাই উজ্জ্বল, বর্ণদমারোহ সম্বলিত তঁার ছবিগুলি ভিতরে ভিতরে বয়ে বেড়ায় এক ধূসর বেদনা, নিকোলাস রে'র ফিল্ম এমনই। কেননা নিষ্ঠুর, নিষ্করণ মার্কিন সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদই শুধু নয়, সেই সঙ্গে সেই সমাজের দায়ভাগও বহন করতে চান তিনি। এই হলেন নিকোলাস রে : বিদ্রোহের ধূসর বেদনা।

ইয়াবান বসুরায়

॥ আলীয়া রেণে ॥

(জন্ম ১৯২২)। বিগত দুই দশকের কাহিনীচিত্রে—বিশেষত ইওরোপীয় চলচ্চিত্রে—বাস্তব-ধর্মিতার বন্ধন যে সামগ্রিকভাবে শিথিল হয়ে এসেছে, তার পিছনে আলীয়া রেণের অবদান প্রভূত। চলচ্চিত্রের ইতিহাসে তঁার নাম একটি বিশিষ্ট বাক-ভঙ্গির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়ে থাকবে।

যুদ্ধোত্তরকালের অনেক ফরাসি চলচ্চিত্রকারের মতো রেণেরও হাতেখড়ি স্বল্প-দৈর্ঘ্য ও তথ্যচিত্রে দিয়ে। ১৯৪৮ থেকে ৫৭ সালের মধ্যে তিনি এই শ্রেণীর ছবি করেন মোট সাতটি; প্রথম দুটি দুজন বিশ্ববিশ্রুত শিল্পীর জীবন ও কর্মের ওপর, একজন ভ্যান গগ (৪৮) অগ্নাজন গোগ্যা (৫০)। তৃতীয় তথ্যচিত্রটিও এক মহান শিল্পীর একটি অরণীয় শিল্পকৃতিকে উপলক্ষ করে—পিকাসোর *Guernica* (৫০) (ড্র.)। কিন্তু এই ছবির প্রসঙ্গ ধরে এসেছে যুদ্ধ ও তার ভয়াবহতার কথা। ১৯৫৫ সালে *Auschwitz* বন্দী-শিবিরকে অবলম্বন করে *Nuit et Brouillard* নামক তথ্যচিত্রে এই বিষয়টি প্রত্যক্ষভাবে ফিরে আসে, কিন্তু যুদ্ধের ভয়াবহতা তখন খানিকটা পরিশোধিত হয়ে রূপ নেয় একটি কলঙ্কিত ও দ্বন্দ্বপন্থে স্বত্তিতে। এই কলঙ্কিত ও দ্বন্দ্বপন্থে স্বত্তি ক্রমে রেণের অগ্রতম প্রধান থীমে পরিণত হয়েছে।

রেণে তঁার ছবির কাহিনীকারদের স্বাধীন ও সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য লিখে দিতে

বলেন এবং নিজেকে কেবলমাত্র 'metteur-en-scene' বা দৃশ্য-নির্দেশক বলে অভিহিত করেন, তবু তাঁর ছবিতে কয়েকটি ধীম বারবার ফিরে আসে। এদের মধ্যে হারানো প্রেম অগ্রতম। তাঁর ছবির প্রধান চরিত্রগুলি এক অবলুপ্ত, প্রায়-বিস্মৃত কৈশোর-প্রেমের স্মৃতিতে আকুল। এই স্মৃতির সূত্র ধরেই রেণের ছবিতে অতীত ও বর্তমানের, এবং কখনো ভবিষ্যতেরও, অনায়াস সংক্ষেপ। রেণের কুশীলব কালের পর্যায় বিভাগ থেকে মুক্ত। এদিক থেকে বোধহয় বলা যায় যে তিনি ফরাসি নবতরঙ্গ উপস্থাপনের কাছে ঋণী।

তাঁর প্রথম কাহিনীচিত্র Hiroshima Mon Amour (৫৯)—চিত্রনাট্য : মার্গেরিৎ দ্বরাঙ্ক—যুগান্তকারী বলে গণ্য হয় প্রধানত এই জ্ঞান যে, এখানে ঘটনার পারস্পর্ষ ও কার্যকারণবোধ প্রায় সম্পূর্ণভাবে অহুপস্থিত। নায়িকার জীবনের দুটি প্রেম—একটির ঘটনাস্থল Nevers অল্পটির হিরোশিমা—পরস্পর জড়িয়ে যায়, অতীত ও বর্তমানের মধ্যে দীর্ঘা নির্দেশ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। রেণের ছবিতে একটি অন্তঃসারী রাজনৈতিক বক্তব্য আছে। লক্ষণীয় যে, নায়িকার প্রথম প্রেমিক জার্মান এবং দ্বিতীয় জন জাপানি, তবু 'হিরোশিমা যনামুর' প্রচলিত অর্থে যুদ্ধ-বিরোধী শান্তিবাদী শ্রেণীর ছবি নয়।

দ্বিতীয় ছবি Last Year at Marienbad (৬১)—চিত্রনাট্য : আর্ন্যা রব-গ্রিয়ে—সময়ের অভিন্নতা তো বজায় রাখলই, তার সঙ্গে নিয়ে এল একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়—বাস্তব বনাম কল্পনা অথবা illusion বনাম reality। মারিয়েনবাদ ছবিতে যে অতীতের কথা বলা হয়েছে তা সম্পূর্ণভাবে নায়কের কপোলকল্পিত; ছবিতে সেই 'কল্পিত' অতীত বাস্তব হয়েই আসে কারণ চলচ্চিত্রের পর্দায় সব কালই ঘটমান বর্তমান। রেণে একদা 'মারিয়েনবাদ'কে 'বাস্তবধর্মী' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন, কারণ তিনি মনে করেন মানুষের স্মৃতি পারস্পর্ষরহিত, সেখানে অগ্র-পশ্চাতের ভেদ নেই।

এই দুটি ছবির প্রভাব স্মূরপ্রসারী হয়েছিল। তৃতীয় ছবি Muriel (৬৩)-এর জ্ঞান রেণে একটি সাব-টাইটেল ঠিক করেছিলেন—Le temps d'un Retour বা প্রত্যাবর্তনের কাল। ছবিটি—চিত্রনাট্য : জঁ কেবল—বৃত্তাকারে এসে যেখান থেকে কাহিনীর স্বরূপ অনেকটা সেইখানেই শেষ হয়। এই ছবিতে কিন্তু ঘটনাগুলি ঘটেছে কালানুক্রম অহুযায়ী, যদিও দুটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন দেখা যায়। প্রথমত, সংলাপের পরিবর্তে বস্তুপুঞ্জের মাধ্যমে চরিত্র-পরিষ্কৃটনের প্রয়াস যা ইতিপূর্বে মারিয়েনবাদে দেখা গিয়েছিল, এবং দ্বিতীয়ত, চরিত্র-চিত্রণ থেকে ক্রম-

পরিণতির ধারণা পরিহার। 'মুরিয়েল' ছবির সঙ্গে রেণের চলচ্চিত্রে stylisation-এর একটি অরণীয় অধ্যায় শেষ হলো।

পরবর্তী কয়েকটি ছবিতে রেণে নানা ধরনের কাহিনী নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন। *La Guerre est Finie* (৬৬)-তে এক প্রৌঢ় বিপ্লবীর জীবন, *Loin du Vietnam* (৬৭)-এ একটি রাজনৈতিক ঘটনা, আবার *Stavisky...* (৭৫) ছবিতে এক প্রতারকের ট্রাজেডি। কিন্তু সব ছবিতেই প্রত্যক্ষ অথবা প্রচ্ছন্নভাবে অতীত/বর্তমান বা বাস্তব/কল্পনা ধীম জিয়াশীল। *La Guerre est Finie* ছবির নায়ক স্পেনের দীর্ঘকালব্যাপী মুক্তিসংগ্রামের নানা কাহিনীর মধ্য থেকে প্রকৃত সত্য আহরণ করার চেষ্টা করে। নিজের অজ্ঞাতসারে সেও এই কাহিনী বা myth-এর অংশ। *Je t'aime, Je t'aime* (৬৮)—চিত্রনাট্য : জ্যাক স্টের্নবের্গ—খানিকটা ওয়েলসীয় ঢঙে একটি ব্যর্থ প্রণয়কে কেন্দ্র করে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে আসা-যাওয়া করে। রেণের আঙ্গিকে কিছুটা ব্যতিক্রম এখানে দেখা যায়, কারণ এই ছবিতে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে আসা-যাওয়া স্থিতির নিজস্ব রসায়নে হয় না, হয় বিশেষজ্ঞের ব্যবস্থায়।

রেণের পরের দুটি ছবি, *Providence* (৭৬) এবং *Mon Oncle d'Amerique* (৮০) তাঁর প্রধান ধীমগুলিকে স্বরণ করিয়ে দিলেও অংশত নূতন স্বাদ নিয়ে এসেছে। *Providence*—এক বর্ষীয়ান ঔপন্যাসিকের কাহিনী। কয়েকটি চরিত্র তাঁর গ্রামের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসে যে-সময়ে তাঁর উপন্যাসের খসড়া তৈরির কাজ চলছে। ছবির একটি স্তরে রক্ত-মাংসের মাহুঁবগুলি এবং ঔপন্যাসিকের কল্পিত দুটি-একটি চরিত্র অভিন্ন হয়ে ওঠে। *Mon Oncle d'Amerique* রেণের সুপরিচিত ধীমগুলিকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে। প্রথমদিকের দু-একটি তথ্যচিত্রে (*Toute La Memoire du Monde* এবং *Le Chant du Styrene*) রেণে মাহুঁষকে দেখেছিলেন ক্ষুদ্র এক প্রাণী হিসেবে; এখানেও তাঁর চরিত্রগুলি প্রাণিতত্ত্বের sample-এ পরিণত। তারা পরস্পরের সঙ্গে ক্রমাগত সংঘর্ষে ক্লান্ত ও বিক্ষুব্ধ। রেণের প্রথম পর্বের ছবিতে কুশীলব বলে, আমরা যা ভাবি আমরা তাই। তাঁর এই পর্বের চরিত্রগুলি বলে, অস্ত্রেরা যা ভাবে আমরা তাই।

আল্টা রেণে সেই দলের স্রষ্টা যারা বলেন যে সৃষ্টির মূল্য সংখ্যায় নয়। রেণের ছবির সংখ্যা, বিশ্বয়ের কথা, মাত্র খান বারো, তবু তিনি একালের দবচেয়ে

প্রভাবশালী চলচ্চিত্রকারদের একজন। তাঁর সাম্প্রতিক ছবি *Mélo* (৮৬)।  
*Je veux rentrer á la maison* (৮৯)।

পাঠ্য গ্রন্থ : *The Cinema of Alain Resnais—Roy Armes, Alain Resnais or the Theme of Time—John Ward*।

অমিয় বসু

। জঁ রেনোয়া ॥

(১৮৯৪-১৯৭৯, ফ্রান্স)। ইম্প্রেশনিষ্ট চিত্রশিল্পী অগস্ত রেনোয়ার পুত্র জঁ রেনোয়া চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে যে পর্য্যক্রিষ্ট ছবি পরিচালনা করেছেন তাদের কালগত ভাবে ও স্বরগত ভাবে আমি দুটি পর্বায়ে ভাগ করতে চাই। একদিকে তিরিশের দশকের ছবিগুলি, যে সময়টা তাঁর সবচেয়ে স্বজনশীল পর্যায়, শৈলী ও প্রদর্শনের বিষয়কর বৈচিত্র্যে বা চিহ্নিত, এতদসহেও যখন তাঁর ছবি অকারণ নিন্দা পেয়েছে, পেয়েছে শীতল নিম্পূহা। আর এক পর্বায়ে পড়বে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের সময়টি যখন কিছু চলচ্চিত্রপ্রেমী ও সমালোচকের চেষ্টায় ও উৎসাহে—ভবিষ্যতে ধারা নুভেল ভাগ-এর পরিচালক বলে কথিত হবেন—তিনি পেলেন তাঁর প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা, যদিও এই সময়ে তাঁর তৈরি ছবিতে উচ্চ মানবিকতা ও সদিচ্ছায় কোনো টান না পড়লেও তা পূর্বের সৃষ্টির মতো অত সমৃদ্ধ নয়। তাঁর ত্রিশের দশকের বিভিন্ন ছবির বিষয়বস্তুতে [*La Bete Humaine* (৩৮), *Une Partie de Campagne* (৩৫)] স্ফাচারালিজম ও চিত্রশৈলীতে ইম্প্রেশনিজমের স্পষ্ট প্রভাব দেখা গেছে। এই সময়ের তিন সেরা ছবি তোনি (৩৫), দি গ্র্যাও ইলিউশন (৩৭), দি রুলস অব দি গেম (৩৯) জীবন ও ব্যক্তি-সম্পর্কের গভীর পর্যবেক্ষণ, মানব ও সমাজ চেতনা, এবং সমৃদ্ধ গ্রন্থনা ও সামগ্রিক শিল্পগুণে অনন্তসাধারণ। এর মধ্যে দি রুলস অব দি গেম স্বীকৃত ক্লাসিক। বার্গ-ম্যানের থিউ আইলস অব এ সামার নাইট ছবির সঙ্গে এ-ছবির প্রতিলুলনা মনোগ্রাহী হতে পারে। বাঙালি পাঠক-দর্শকের আরো মনে পড়বে বনফুলের উপন্যাস যুগয়ার কথা। তাঁর ছবিতে প্রথম থেকেই নাটকীয় জন্মবিকাশ ও ঘটনার বনঘটা কম, পরিবর্তে ছবির এক বা একাধিক চরিত্রের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণ, সারল্য ও জীবনের (শব্দ দুটি তাঁর কাছে প্রায়ই সমার্থক) প্রতি অপ্রতিহত আবেগ, এবং চলচ্চিত্রের মাধ্যমটি নিয়ে কাজ করতে অবাধ আনন্দ (ও বিষয়তাও) —এই বৈশিষ্ট্যগুলিই লক্ষণীয়। তাঁর ছবি প্রায়ই গড়ে উঠেছে শুধু কেন্দ্রীয় চরিত্রকে

নয়, সেই চরিত্রাভিনেতার ব্যক্তিবশেই আশ্রয় করে। সেই অভিনেত্রী বা অভিনেতা কখনো তাঁর বাবার প্রাক্তন মডেল তথা তাঁর তৎকালীন স্ত্রী, কখনো Anna Magnani বা ইনগ্রিড বার্গম্যান, কখনো Michel Simon বা Jean Gabin.

আঙ্গিকগত ভাবে রেনোয়া প্রথম থেকেই innovation ও improvisation-এর পক্ষপাতী। অতিরিক্ত যান্ত্রিক কলাকৌশল, প্রায়োগিক কারিকুরি, শব্দ সংগীত বর্ধ নিয়ে প্রদর্শনপ্রিয়তা প্রভৃতি তাঁর কাছে অর্থহীন, বিরক্তিকর, শিল্প এর ফলে তার সারল্য ও বিগুন্ধি হারাচ্ছে, রেনোয়ার মত। সাধারণ মানুষের চোখ ও মনের কাছে যা সহজ এবং সরল তিনি চাইতেন ক্যামেরার চোখও সেই সারল্য নিয়েই সবকিছু দেখবে, ক্যামেরা ও আঙ্গিকের কেরামতিতে সাধারণকে অসাধারণ কিছু করার বিরোধী ছিলেন তিনি প্রথম থেকেই। চলচ্চিত্র, তাঁর কাছে, কিছু মুখ, কিছু মুহূর্ত, কিছু ঘটনা সম্পর্কে সঠিক ও বেঠিক দিক্কাণ্ডের সম্মেলন, সঠিক ও বেঠিক উপাদানের এক শিল্পসম্মত প্রকাশ, তিনি যার এক অত্রান্ত অভিভাবক রূপে স্বীকৃত, অত্রান্ত কিন্তু নন কদাপি নির্ভুল, মূঢ়া ও অভ্যাসের ক্ষেপক এবং মূঢ়া-দোবের শিকার। যতটা যুক্তিবাদী তার চেয়ে বেশি আবেগপ্রবণ। ক্রফো তাঁর সম্বন্ধে যে কথা লিখেছিলেন, 'a man of warmth and enthusiasm and impulsive lack of discipline' তা অনেকটাই সত্য মনে হয় (রেনোয়ার সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গিতে ও বিভিন্ন বিষয়ে ক্রফোর সাদৃশ্যও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য)।

শিল্প সম্পর্কে রেনোয়ার ধারণার কথা এ ক্ষেত্রে জরুরি। একদা থিয়েটার কর্মী ও শিল্পের প্রতি অহুগত রেনোয়া সম্ভবতঃ জীবনকে একটি বিশাল মঞ্চ রূপেই ভেবেছেন যেখানে পর্দা পড়ে গেলে আমরা সবাই যে যার নিজের জগতে ফিরে আসি। তাঁর ছবির দৃশ্যভাবনায় ও দৃশ্যের গঠনশৈলীতে বহুবার মঞ্চের আভাস স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর বহু ছবিতে প্রেম, ভালোবাসা ও জীবনের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষার ভূমিকা মুখ্য। এই ভালোবাসা শুধু স্বামী-স্ত্রীর প্রেম-বন্ধন নয়, যার অধিকাংশই সামাজিক বিচারে অবৈধ প্রেম, যা অত্যাচার ও কথায় রেনোয়া কোথাও বলছেন না। এ তাঁর কাছে জীবনের প্রতিই আহুগত্য। Le Carrosse d'or (৫২) ছবিতে তাঁর শিল্পের প্রতি আহুগত্যও পরিষ্কার। ছবির শেষাংশে নাসিকা ক্যামিলার বাড়িতে যখন আকস্মিক ভাবে তার তিন প্রণয়ীর আবির্ভাব হয় ক্যামিলা তাদের সবাইকেই ফিরিয়ে দেয়, এবং তার নাট্যাচরণ মধ্য দিয়েই স্বপ্নের অন্বেষণ করার সিদ্ধান্ত নেয়, উপলব্ধি করে যে প্রেমে নয়, শিল্পেই তার স্বপ্ন। শিল্প

রেনোয়ার কাছে অনেকটা বাগান বানানোর মতো, আর চলচ্চিত্রের উদ্দেশ্য হ'লো সমসাময়িক শিল্পের ভূমিতে নিজের সামান্য অবদানটুকুর জলসেচ। চলচ্চিত্র মাধ্যমটির সীমাবদ্ধতা, শিল্প বহির্ভূত নিয়মকানুনগুলি, তাঁর বিচারে, শিল্পীকে কিছুটা যেমন বাধা দেয়, অনেকটা তেমনি সাহায্যও করে, মাধ্যাকর্ষণ যেমন-উড়তে বাধা দেয়, চলতে সাহায্য করে, আর উড়তে যে বাধা দেয় সেটা ভালোভাবে করে নিশ্চয়ই।

তাঁর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের ছবিগুলি, *Elena et les Hommes* ( ৫৬ ), বা *The Vanishing Corporal* ( ৬১ ) আগের ছবিগুলি থেকে সুর ও মেজাজে স্বতন্ত্র, রঙচঙে পিরিয়ড স্পেকট্যাকল। ফ্রান্স থেকে সরে গিয়ে, হলিউড ভারত ইতালি—বিভিন্ন দেশে ঘুরে ঘুরে ছবি করার দরুন অস্থিতির লক্ষণ এইসব ছবিতে স্পষ্ট। কিন্তু ছবিকে এক স্তর থেকে আর এক স্তরে উত্তরণের প্রয়াস ( বাজাঁ বা লিগুয়েন কথিত ) ও বিভিন্ন স্তরে গ্রহণযোগ্যতা ( ক্রফো কথিত )—যে দুটি গুণের জন্ম রেনোয়ার বড় ও মহৎ শিল্পী তার প্রমাণ তাঁর ছবিতে শেষ দিন পর্যন্ত ছিল বলে মনে করি। তাঁর তোলা বেশ কটি ছবি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা পুনর্নির্মিত হয়েছে।

অন্যান্য ছবি : নানা ( ২৬ ), দি বীচ ( ৩১ ), *The Crime of M. Lange* ( ৩৫ ), দি সাউদার্নার ( ৪৫ ), ডায়েরি অব এ চেয়ারমেন ( ৪৬ )—বুহুয়েলের এই নামের ছবির কথা উল্লেখনীয়, দি রিভার ( ৫০ )—ভারতে এসে তোলা, বলা যায়, সত্যজিতের শিক্ষানবিশি হয়েছিল এই ছবিতে, দি গোল্ডেন কোচ ( ৫২ ), ফ্রেন্স ক্যান-ক্যান ( ৫৪ ), লাঞ্চ অন দি গ্রাস ( ৫৯ )।

রচিত গ্রন্থ : মাই লাইফ অ্যাণ্ড মাই ফিল্মস, রেনোয়ার—মাই ফাদার।

সম্পর্কিত গ্রন্থ : অঁদ্রে বাজাঁর জঁ রেনোয়ার।

## ॥ রোবের্তো রোজেলিনি ॥

১৯০৬-৭৭, ইতালি। রোজেলিনি স্পষ্টতই স্বীকার করেছেন যে তাঁর চলচ্চিত্র তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একবার তিনি লিখেছিলেন 'আমার প্রত্যেকটি ফিল্ম, ফিল্মের চেয়েও অতিরিক্ত কিছু, তা আমার তৎকালীন সমস্যা, উদ্বেগ ও কোঁতূহলের প্রকাশ'। ১৯০৬ সালে স্থপতি ও নির্মাণশিল্পীর পরিবারে জন্মগ্রহণ করে শৈশবে সেখানে লালিত হওয়ার জন্তে রোজেলিনির যান্ত্রিক জিনিসের প্রতি আসক্তি জন্মায়। কয়েকটি অপেশাদারী স্বল্প দৈর্ঘ্য চিত্র

গ্রহণের পূর্বে তিনি অল্পকাল এডিটিং, ডাবিং ও চিত্রনাট্য রচনার কাজ করেন। ছবিগুলি ফ্যানসিষ্ট সেনসর কর্তৃক অশোভন মনে হওয়ায় দ্রুত নিষিদ্ধ করা হয়। তিনি 'Luciano Serra Pilota' (১৯৩৮)-র চিত্রনাট্য রচনা করেন। এর দুবছর পর 'La Nave Bianca' ছবি অপেশাদারী অভিনেতাদের নিয়ে আধা-ডকুমেন্টারী চণ্ডে পরিচালনা করেন। সেই সময় Neo-Realist-দের আন্দোলন শুরু হচ্ছে। যদিও তিনি 'La Nave Bianca'র পর আরো দুটি ছবি করেন, 'Un Pilota Ritorna' (৪২) এবং 'L'uomo della Croce' (৪৩) যেগুলোতে ফ্যানসিষ্ট দাবীগুলো মেনে নেওয়া হয়েছিল। বাস্তবতার ও ডিটেলের প্রতি বিশ্বস্ততা ছিল উভয় ছবিতে। তারপর রোজেলিনি 'Rome, Open City' (৪৫)-র দিকে মন দিলেন। ফিল্মটি সারা পৃথিবীকে Neo-Realism-র দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করালো। ছবিতে তিনি একজন অসাধারণ নায়িকাকে পরিচিত করালেন—Anna Magnani (নায়িকার আবিষ্কার ও একই সাথে তার প্রেমে পড়ার রটনা কাক-তালীয় ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল)। কিন্তু এর চেয়ে দরকারী যা, তা হলো ওই ছবিতে এক নতুন চমকপ্রদ রীতির সূত্রপাত যা সাফল্যের সাথে প্রযুক্ত হবে পরবর্তী দুটি ফিল্ম (একত্রে তিনটিকে ট্রিলজি হিসেবে মনে করা যেতে পারে) 'Paisa' (৪৬) এবং 'Germania Anno Zero' (৫৭)-য়ে। এই নতুন রীতির উৎসে ছিল রোজেলিনির ব্যক্তির প্রতি গুরুত্ব অর্পণ। এরপর তাঁর সৃষ্টিতে বহুস্বাভাৱতা এল, কিন্তু তাতে অমৃৎ ও অস্থির পরিচালনার এবং শিল্প-মেজাজের ব্যর্থতাও ছিল। 'L' Amore' (৪৮) Anna Magnani-র শিল্পের প্রতি নিবেদিত ও হৃভাগে বিতর্ক শারীরিক ও আধ্যাত্মিক প্রেমের কাহিনী যার মধ্যে চরিত্রের বাস্তবতা, তাদের পারিপার্শ্বিকতা ও মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার প্রতি রোজেলিনির আগ্রহের প্রতিকলন হয়েছিল। তারপর তিনি হলিউড চলে যান ও ইনগ্রিড বার্গ-ম্যানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন। তিনি সৃষ্টি করলেন 'Stromboli, Terra di Dio' (৪৯), যার বিষয়বস্তু ছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষী, একজন নারী ব্যক্তিগত সমস্যার ভ্রান্ত দমাজ থেকে কী ভাবে বিচ্ছিন্ন। ছবিতে নায়িকা বার্গম্যানের অত্যধিক প্রাধান্য। তাঁর পরবর্তী দুটি চলচ্চিত্র 'Europa' 51' এবং 'Viaggio in Italia'-য় বার্গম্যানেরই (ততদিনে তাঁর স্ত্রী) প্রচার। স্ত্রীর সাথে সর্বশেষ ছবিটি ছিল 'La Paura' (৫৪) যেখানে দেখানো হয়েছিল এক কাকতালীয় ঘটনা, ফুরিয়ে যাবার মুখের এক বিবাহ সম্পর্ক। ১৯৫৭ সালে রোজেলিনি ভারতবর্ষে এনেছিলেন এবং ফিল্ম ডিভিশনের সহায়তায় প্রচুর মাল-মশলা সংগ্রহ করেন, যেগুলি টেলিভিশন

পর্যায়ের অমুকাহিনীমূলক ফিচারধর্মী ছবি 'India' ( ৫৮ )-র রূপ নেয়, যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এই দেশ ও দেশবাসীর সম্বন্ধে ভুল ধারণা দূর করা। এই সময়ে তিনি তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী বার্গম্যানকে পরিত্যাগ করে বাঙালি সোনালাী দাশগুপ্তকে বিবাহ করেন। পরবর্তী জীবনে তাঁর কর্মপ্রণালীর অনিশ্চয়তা আরো স্পষ্ট হয়েছিল। ৫৯ সালে তিনি সম্পূর্ণ কমাশিয়াল ফিল্ম 'Il Generale della Rovere' ও তারপরে গ্যারীবন্দী সম্বন্ধে 'Viva I, Italia' ( ৬০ ) তৈরি করেন। এগুলি এক ঐতিহাসিক অধ্যয়ন চিত্রমালার সূত্রপাত করেছিল। যার মধ্যে কিছু কিছু বিশেষভাবে টেলিভিশনের জন্ম তৈরি করা হয়। জীবনের শেষ দিকে New York এবং Rome এই দুই নগরীর মধ্যে জমাগত সঞ্চরণ করেছেন তিনি। প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি তখন ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ছিল তাঁর। যদিও তিনি সমৃদ্ধ দেশগুলির আত্মিক দারিদ্র সম্পর্কে ছিলেন অত্যন্ত তিক্ত।

[ নয়া বাস্তববাদের জনক বলে তাঁকে যে সাধারণভাবে ছাপ দেওয়া হয়েছে তাতে যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা আছে। সেই সময়কার অস্বাভাবিক নয়া বাস্তববাদীদের থেকে তাঁকে যা আলাদা করেছিল তা হলো একটি শক্তিশালী আধ্যাত্মিকতা, ধ্বংসলীলার মধ্যেও এক ধরনের সৌন্দর্য ও সময়ের অমুভূতি এবং একটি সমাজ পুনর্গঠনের লড়াই। গদার বলেছিলেন, রোজেলিনির প্রতিটি প্রতিচ্ছবি সুন্দর, এগুলি যে নিজেরা সুন্দর তা নয়, কিন্তু তার মধ্যে রয়েছে সত্যের ঝলকানি। অন্তেরা হয়তো যেখানে কুড়ি বছরে পৌঁছবেন, তিনি সেখানে এখনই পৌঁছে গেছেন। তাঁর ছবিতে সহজেই নজরে পড়ে একটি ব্যক্তিগত বিবর্তন যা এসেছে মানব জীবনের পীড়ন ও প্রাকৃতিক জগতের নিবিড় সৌন্দর্যের মধ্য থেকে। India মুক্তি পাবার পর এটা অবিসম্বাদী ভাবেই স্পষ্ট হয়েছিল যে তাঁর দর্শন খোলাখুলিভাবে কার্যত সমস্ত মহাজাগতিক শক্তিকেই ধরতে চায়। তাঁর শেষ জীবনের ঐতিহাসিক ছবিগুলিতে সৌন্দর্য ও অস্তিত্বের ঐক্য প্রকাশ করার জন্ম তিনি সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসকে কাজে লাগিয়েছেন। আমরা যখন তাঁর ছবি দেখি তখন প্রথাগত পরিবেশনার ওপর আমাদের কোনো মোহ থাকে না ও একটি নতুন জগতে গিয়ে পড়ি। সম্পূর্ণ গঠনগত সংযম ও সৌন্দর্যের কারণে এই নতুন জগৎ আমাদের মধ্যে এক আশ্চর্য নিবিড় আবেশগত অভিজ্ঞতা সঞ্চারণ করে যার ফলে আমরা যে জগতে বাস করি তার সম্পর্কেই আমাদের উপলব্ধির প্রসার ঘটে। এই অর্থে তাঁর চলচ্চিত্র প্রকৃত অর্থে শিক্ষামূলক ও বৈজ্ঞানিক। ]

সম্পর্কিত গ্রন্থ : L. G. Jose-র রোবের্তো রোজেলিনি ।

## ॥ পল রোথা ॥

(১৯০৭-৮৯, ইংল্যান্ড)। চিত্রশিল্পী ও কলাসমালোচক রূপে রোথার কর্মজীবনের সূচনা। পরে তিনি চলচ্চিত্র বিষয়ে তাত্ত্বিক রচনা ও তথ্যচিত্র পরিচালনায় মনোনিবেশ করেন। রোথা পরিচালিত বিভিন্ন তথ্যচিত্র—শিপইয়ার্ডস্, দি ফেস অব ব্রিটেন, ওয়ল্ড অব প্লেন্টি, দি লাইফ অব অ্যাডল্ফ্ হিটলার, নো রেপ্তিং প্লেন—প্রয়োগের নতুনদে, স্থানীয়স্থিত আলোকচিত্রে, চিত্তাঙ্গীল সম্পাদনায় তথ্যচিত্রের জগতে ও ব্রিটিশ তথ্যচিত্রে প্রথম শ্রেণীর উদাহরণ। তথ্যচিত্রকে একটি শক্তিশালী ও প্রভাবময় মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে তাঁর অবদান অস্বীকার্য হয়ে আছে। ওয়ল্ড অব প্লেন্টিতে কলাকৌশলের কাজে তিনি যে সূজনশীলতার পরিচয় দেন তা অনাধারণ। ১৯৫৩ থেকে ৫৫ পর্যন্ত তিনি বিবিসি-র টিভি তথ্যচিত্র বিভাগের প্রধান হিসেবে কাজ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে দি ফিল্ম টিল নাউ, ডকুমেন্টারি ফিল্ম, ডকুমেন্টারি ডায়েরি, মুভি প্যারেড, রোথা অন দি ফিল্ম ও সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে টেলিভিশন ইন দি মেকিং উল্লেখযোগ্য। ডকুমেন্টারি ফিল্ম বইয়ে তিনি তথ্যচিত্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন এইভাবে—বাস্তব জনজীবনের সৃষ্টিধর্মী ও সামাজিক তাৎপর্যমণ্ডিত ব্যাখ্যাকল্পে ফিল্ম মাধ্যমের ব্যবহার, বইটিতে একশোটি তাৎপর্যপূর্ণ তথ্যচিত্রের একটি তালিকাও দিয়েছেন তিনি। মারী সীটমের ভাষায়, অগ্রদেব নগ্নে মতবিরোধ হত বলে রোথা একটু দূরে দাঁড়াতেন!

## ॥ রোমানিয়া ॥

প্রথম চিত্র-প্রদর্শন ১৮৯৬য়ে, চিত্র প্রযোজনা এর কয়েক বছরের মধ্যেই শুরু হয়। প্রারম্ভিক পরিচালকদের মধ্যে Lupu Pick, Negulesco ও Georgescu উল্লেখযোগ্য। কাহিনীচিত্র, তথ্যচিত্র ও আনিমেটেড ছবির একটা জাতীয় ঐতিহ্য ঘাটের দশকের মধ্যে তৈরি হয়ে যায়। কয়েক দশক আগে রোমানীয় ছবির বা অবস্থা ছিল আঙ্গ অবশ্য আর তা নেই। 'Danube Goes its Way', 'The Mill of Luck and Plenty', 'The Soldiers without Uniform' প্রভৃতির মতো যে ছবিগুলি বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতার এবং চলচ্চিত্র-শৈলীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তৈরি হয়েছিল, তার সমকক্ষ ছবি আর তৈরি হচ্ছে না। Victor Lilu, Liviu Sulei, Francise Munteanu প্রমুখ চলচ্চিত্রকাররা রোমানীয় ছবিকে

প্রাপ্তমন্ড করে তুলেছিলেন। এ ব্যাপারে ১৯৪৫ সালে তোলা 'The Prodigal Father'-ই সম্ভবতঃ একরকমভাবে পথ নির্দেশক, কেননা এ বছর থেকেই ছবিতে সমাজতান্ত্রিক আদর্শায়িত পরিবর্তন আনতে আরম্ভ করে।

রোমানীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে নতুন সমাজ গড়ে তোলার জয় সাধারণ উন্নয়ন প্রকল্প থেকে চলচ্চিত্র তথা কাহিনীচিত্রকে আলাদা-ভাবে দেখা হবে না। কিন্তু কার্যতঃ সরকারী চেষ্টা সবেও স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কোনো নতুন চিন্তার উদ্ভব হয়নি।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি এবং সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে বেশ কিছু প্রাসঙ্গিক ও অনবঙ্গ ছবি তৈরি হলো। 'Explosion', 'The Dowry', 'The Last Cartridge', 'About a Certain Happiness', 'Power', 'Truth', এবং 'Genesis'-এর মতো ছবি রোমানীয় চলচ্চিত্রকারদের গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা ও ষোগ্য ভিত্তিভূমি দিল। এর প্রায় সবগুলিই সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ছবি। এর সঙ্গে স্বাধীনতার ত্রিশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে তোলা ছবিগুলিও ছিল এবং এই সবগুলি ছবিরই একটা সংগ্রামী ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ছিল। এই সময়কার বিখ্যাত ছবিগুলি হলো 'Stephan', 'The Great', 'Dimitrie Cantemin' এবং 'Life without Death'। এই ছবিগুলির কাঠামোতে বিরল পরিচ্ছন্নতা, আঙ্গিক ও বক্তব্যের একীকরণ এবং প্রয়োগকৌশলের দৃঢ় সংস্থান উল্লেখযোগ্য। তখন রোমানীয় ছবি খুবই গতিময় ও প্রাণবন্ত ছিল এবং সবার মধ্যে সাড়া জাগাতো। কিন্তু আশির দশকে ধারা চলচ্চিত্র মাধ্যমটিকে নিয়ে কাজ করেছেন, তাঁরা সমাজতন্ত্রের উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন বা সমাজতান্ত্রিক চারিত্র্য সামনে তুলে ধরেছেন একথা বলা যাবে না। Daneliue-র 'The Race', Pita-র 'The Prophet', 'Gold and the Transylvanians', Calotescu-র থি়লার 'The Bus for Action' বা Ursu-র 'September' এমন কোনো প্রত্যয় আনে-নি যে বিদ্রোহী চলচ্চিত্রের রাজ্যে সমাজতান্ত্রিক রোমানিয়ার নবীন চলচ্চিত্রকাররা তাঁদের দেশের হয়ে তখন কোনো উল্লেখযোগ্য উদাহরণ রাখতে পেরেছেন। আমাদের মনে রাখা উচিত যে সমাজতান্ত্রিক ছবি শুধু তার দৃষ্টি, আঙ্গিকে এবং চলচ্চিত্রগত সঙ্কেতময়তায় বেঁচে থাকে না, বেঁচে থাকে শ্রেণীস্বন্দেহ বক্তব্যে এবং সমস্তর মানবিক বিপ্লবে—সমাজতান্ত্রিক দেশের অগ্রজ চলচ্চিত্রকাররা এক কালে এই দ্বন্দ্বিক শিক্ষাই দিয়ে গেছেন। কিন্তু কার্যতঃ, রোমানিয়ার তৎকালীন চলচ্চিত্রকাররা সমাজবাদীর পবিত্র মূল্যবোধ—সংঘবদ্ধতার দৃষ্টিকোণ থেকে—

জীবনকে দেখাৰ চেয়ে ব্যক্তিগত অনুসন্ধান ও স্বপ্নকে নিয়ে ব্যস্ত থেকেছেন। পূৰ্ব ইউৰোপে সমাজতন্ত্ৰেৰ সাম্প্ৰতিক সংকটৰ পিছনে এইদৰ কাৰণও ক্ৰিয়াশীল।

## প্ৰদীপ বিশ্বাস

॥ ফ্ৰান্সেসকো ৰোসি ॥

( জন্ম ১৯২২, ইতালিয় চলচ্চিত্ৰকাৰ ও চিত্ৰনাট্য ৰচয়িতা )। চলচ্চিত্ৰেৰ মায়া-মৃগটিকে ৰোসি স্বৰ্শে আনতে চেয়েছেন নিতান্ত কৈশোৰ থেকেই। আলোকচিত্ৰী পিতাৰ সৌজন্তে ছেলেবেলায় 'জ্যাকি কুগানেৰ মতো দেখতে' প্ৰতিযোগিতায় জয়ী হন। মাৰ আপত্তিতে বালক ৰোসিৰ পুৰস্কাৰ প্ৰাপ্তি অৰ্থাৎ হনিউড ভ্ৰমণ সম্ভব হলো না, কিন্তু তাঁৰ বয়ঃসন্ধিৰ একমাত্ৰ আকৰ্ষণ ছিল চলচ্চিত্ৰই; বাস্তব জীবন নয়, কেননা বাস্তব জীবনে তো জ' হালো বা অল্প কোনো অভিনেতা / অভিনেত্ৰীকে খুঁজে পাওয়া যেত না। স্বয়ং ফ্ৰান্সেসকোই স্বীকাৰ কৰেছেন মাৰ্কিন চলচ্ছবি যে মাৰ্কিন দৈনন্দিন জীবনকে প্ৰকাশ কৰে না একথা বুঝতে তাঁকে অনেক বছৰ অপেক্ষা কৰতে হয়েছিল। ধোঁবনাৰস্তেও ৰোসি সংকল্পবদ্ধ ছিলেন যে আইন পাঠক্ৰম শেষ কৰে চলচ্চিত্ৰ শিক্ষণালয়ে প্ৰবেশ কৰবেন। তবু কি ছিল বিবাতাৰ মনে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেৰ সেই অন্তহীন আঙনেৰ ভেতৰে দাঁড়িয়ে ৰোসি খুঁজে পেলেন না অবসৰ—ৰজনীগন্ধাৰ মতো নাৰীশৰীৰ ও চিত্ৰমায়া অলীক হয়ে ৰইল। ৰোসি প্ৰবেশ কৰলেন বেতাৰ সাংবাদিকতাৰ জগতে। কৰ্মস্থল নেপলস।

যুদ্ধশেষে প্ৰতীক্ষাৰ অবসান। ১৯৪৮-এ ভিসকন্তি দৈবাৎ তাঁকে নিয়োগ কৰলেন 'লা স্তেৰা জেমা'ৰ অন্ততম সহকাৰী পৰিচালক হিসেবে। নব-বাস্তবতাৰ প্ৰবেশিকা সদৃশ এই চলচ্ছবি তাঁকে শুধু আলোকপাতের নতুন নিয়মাবলী শেখাল না; বৰং অধিকতৰ মৌলিকভাবে বাস্তবতা ও কাহিনীৰ স্ফুৰ্ণস্ফুট উন্মোচিত কৰল। এৰ পৰেৰ আটবছৰ ৰোসিকে আমৰা ব্যস্ত দেখব ভিসকন্তি, মেতাৰাজ্জো, আন্তোনিওনি ইত্যাদি আৰো কয়েকজন পৰিচালকেৰ সহযোগিতায়।

১৯৫৮ সালে ৰোসি নিবেদন কৰলেন তাঁৰ প্ৰথম কাহিনীচিত্ৰ লা স্কিদা। যদিও প্ৰায় একই সময়ে হনিউড গ্যাংস্টাৰ চিত্ৰমালাকে নিয়েই গোদাৰ বৈপ্লবিক মেৰুভবন ষটিয়েছেন, ৰোসি কিন্তু নব-বাস্তব-প্ৰথাসমূহেৰ প্ৰতি বিশ্বস্তই থাকেন। তাঁৰ ছবিত্তে একটা আবেগঘন প্ৰেমের গল্পকে ছাপিয়ে বড়ো হয়ে ওঠে নেপলসেৰ ফল ও সন্ধিৰ বাজাৰেৰ দুৰ্গন্ধ। ফ্ৰাঁসোয়া ত্ৰুফো অবশ্য হতাশ ভাবে মন্তব্য কৰেন—আমৰা চেয়েছিলাম একজন ভিসকন্তি; পেলাম একজন লাগুয়াদাকে। ছবিটি

ভেনিসে বিশেষ জুরি পুরস্কার পায়। অবশ্য রোসি প্রথম আন্তর্জাতিক ভাবে অভিনন্দিত হলেন স.দা-কালোয় নির্মিত ১৯৬১ সালের ছবি 'সালভাতোর গিউলিয়ানো'র জন্য। এই ছবিই প্রমাণ করল ফ্রানসেসকো রোসি আধুনিক চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক স্বতন্ত্র সত্ত্বা ও মাত্রই নব-বাস্তবতার শরিক নন। বস্তুতঃ একটি হাই-অ্যাপল ক্যামেরা যখন ছবির স্মৃচনাতে সম্মুখ সমরে নিহত বীরচূড়ামণি ও সিঙ্গিলি-মাফিয়াদের নেতা বীরবাহু সালভাতোর গিউলিয়ানোর প্রাণহীন দেহটির উপর আছড়ে পড়ে ও অনতিবিলম্বে পুলিশ গুরু করে দেয় অল্পপুঞ্জ পর্যবেক্ষণ তখন থেকেই আমরা অনুমান করতে পারি ঘটনার বিবরণ রোসির অভিপ্রেত নয়। উষ্টোদিকে তিনি চান ঘটনার অতিরিক্ত সত্যকে জরায়ু মুক্ত করতে। এ জগুই ছবিতে গিউলিয়ানোকে কখনোই দেখানো হয় না। কিন্তু সামাজিক স্থায় ও ব্যক্তিসংস্কার সমস্যা কি করে বহুধাবিত্ত, হিংসাপরায়ণ, দুর্নীতি-প্রস্তু ও ভঙ্গুর ইতালিয় সমাজে মুদ্রিত থাকে সে বিষয়ে স্মৃনির্দিষ্ট তদন্ত চালানোর পরিপ্রেক্ষিতে রোসি সংস্কার বিশেষত বিচারব্যবস্থা বিষয়ে একটি গভীর আলোচনার প্রবর্তন করেন। ফলে ছবির বাস্তবতা বক্ষিম, সময়ের গতি অনচ্ছ, অস্বিষ্ট ও অভিজ্ঞান প্রায়ই বিচ্ছিন্ন। কোনো কোনো সমালোচক সঠিক ভাবেই এই নির্মাণকে সাধারণ বিয়োগান্ত নাট্য বলার বদলে ত্রেণটায় এপিক ভঙ্গিজাত বলেছেন। সম্পাদনার বিষয়ে রোসি প্রকাশে ঋণ স্বীকার করেন আইজেনস্টাইন সমীপে। আন্দের মনে হয় নব-বাস্তবতার বিরোধাতাস উত্তীর্ণ হয়ে রোসির এই অসামান্য সৃষ্টি একটি যৌথ ট্র্যাঞ্জেডির উৎসনুখ খুলে দেয় যেখানে নায়কের ভূমিকা নেয় কোরাস; ডেনমার্কের রাজপুত্রের সাহায্য ব্যতিরেকেই ইতালিয় ভূতলে অভিনীত হতে পারে হ্যামলেট। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় ১৯৬৩-র বার্লিন চলচ্চিত্রোৎসব ছবিটিকে রৌপ্য তল্পুক দেয়। স্বদেশে শ্রেষ্ঠ পরিচালনা, শ্রেষ্ঠ সংগীত ও শ্রেষ্ঠ ফটোগ্রাফির জল্প সম্মানিত হন রোসি। পরের ছবিটিকে বলা যায় অধঃপতিত রাজনীতির একটি আধা-দলিলচিত্র। 'শহরের ওপরে হাত' ভেনিসে শ্রেষ্ঠ চিত্রের স্বর্ণ সিংহ জয় করে। প্রশাসন-রাজনীতি-গৃহনির্মাণ বিষয়ে রোসি অবশ্য উপলক্ষ করেন একটি গল্প কিন্তু তার লক্ষ্য হয়ে ওঠে যথারীতি, যে কোনো মহৎ শিল্পীরই মতো, অসহায় মানবঅবস্থান।

রোসি বিশ্বাস করেন যদি কোনো ব্যক্তির প্রাতিষিক রহস্যের সন্ধান পেতে হয় তবে জনারণ্যে তাকে অনুসরণ করতে হবে। অন্তর্বর্তী কয়েকটি অপ্রধান অথচ মৌলিক নির্মাণের পর রোসি পুনরায় ফিরে এলেন তাঁর নিজের প্রদেশে। বর্ণিত

হলো ‘সিঁজারের পরে সবচেয়ে সবচেয়ে ক্ষমতাবান ইতালিয়’ তৈল-সাম্রাজ্যের অধিপতি এনরিকো মাস্তেই-এর বর্ণবহুল ইতিবৃত্ত ( ১৯৭২ ইল কানো মাস্তেই ) । এখানেও আমাদের নজর এড়ায় না সংশ্লিষ্ট পরিচালকের মৌল প্রবণতা যে একজন শিল্পপতির রহস্যময় মৃত্যুর প্রেক্ষাপট কখনো তাকে নিশ্চয়তাবাদের দিকে ঠেলে দেয় না । বহুবীজ সমন্বিত রোসির চলচ্ছবি এ দিক থেকে দেখলে দোন্টা-গাভরাস প্রমুখ রাজনৈতিক চলচ্ছবি নির্মাতাদের থেকে আলাদা । রোসি দর্শক নন । রোসি অভিযাত্রী ।

এর পরে রোসি যা যা রচনা করেছেন সবই ব্যক্তির একান্ত সত্যকে সমাজের সামগ্রিক সাধারণত্বে বিকীর্ণ দেখাবার প্রয়াস । যেমন ‘ভাগ্যবান লুচ্চিয়ানো’ ( ১৯৭৩ ) । ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের এই দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত যা প্রতিষ্ঠা করে তা পর্যবেক্ষণের আপেক্ষিকতা এবং তথ্যচিত্র ও উপস্থানের মধ্যবর্তী স্তর । যা বক্র, যা নিয়ত পরিবর্তমান, যা দৃশ্য ও দ্রষ্টার অবস্থানদাপেক্ষ সেই সত্যকে রোসি একক, অখণ্ডনীয়, স্পর্শাতীত ও পূর্ব নির্ধারিত মনে করেন না । আর এই ছত্তেই তার সংবাদ দুর্ভাগ্য কিন্তু কাব্যের অধিক ।

সত্তর দশকের শেষে সালভাতোর গিউলিয়ানোর পরে রোসির সবচেয়ে বিখ্যাত ছবি ‘ক্রিস্ট এবোলিতে খেমেছিলেন’ মুক্তি পায় (১৯৭৯) । নব-বাস্তবতার প্রতি একটি নম্র অর্থ্য দান হলেও এই ছবি আরেক ধরনের পদ্মানদীর মাঝি । ঈশ্বর এখানে থাকেন না জেনেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন পদ্মানদীর তীরবর্তী জনপদের কাব্যকে মহাকাব্যের অন্তর্ভুক্ত করেন, রোসি সেভাবেই ইতালির প্রত্যন্ত প্রদেশকে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে ব্যাখ্যা করেন । ‘ভ্রাতৃত্ব’ (১৯৮১) স্বপ্ন ও জাগরণের মধ্যে একটি সেতুপথ । এবং যথারীতি পরিচালক প্রদত্ত টীকা সমেত ।

পরিচালক হিসেবে রোসির মূল অবদান এই যে, নববাস্তব চলচ্চিত্রকারদের ( ভিদকত্তি, ডি সিকা, রসেলিনি প্রমুখ ) মতো তিনি প্রদক্ষিণ করেননি কিন্তু স্বদেশ ও স্ব-সমাজে প্রবেশ করেছেন ; ব্যর্থতা ও সাফল্য নিরপেক্ষ ভাবে স-ভাষ্য সেই অভিজ্ঞতা বিবৃত করেছেন । তার নেই কোনো সমাপ্তিবাচক নিশ্চয়তা ; তবু যুক্তির সংখ্যাতীত নিরাশা কাটিয়ে যা আছে তা আকাজিকত শৃঙ্গারের আশাবাদ ।

তার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে আছে Bizet’s Carmen ( ৮৪ ), Dimenticare Palermo ( ৯০ ) ।

॥ এরিক রোহ্‌মের ॥

( জন্ম ১৯২০, ফ্রান্স ) । লেখক ও চলচ্চিত্র পরিচালক ; বিভিন্ন পত্রিকার চিত্র-সমালোচক ও এক সময়ে কাইয়ে দ্ব্য দিনেমায় প্রধান সম্পাদক রূপেও কাণ্ড করেছেন । স্বল্প দৈর্ঘ্যের চিত্র দিয়ে শুরু করে তিনি কাহিনীচিত্র পরিচালনায় আসেন । নবতরঙ্গ গোষ্ঠীর পরিচালকদের মধ্যে তাঁর স্থান প্রথম দিকে ঠিক প্রথম সারিতে না থাকলেও পরবর্তীকালে তিনি বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেন । তিনি ৫৮ / ৫৯ সালে প্যারিসের পটভূমিতে একটি ছবি করেন— *Le Signe du Lion* । তাঁর উল্লেখযোগ্য অন্যান্য কাহিনীচিত্রের মধ্যে আছে *Ma Nuit chez Maud*, *Le Genou de Claire*, *L' Amour*, *L' Apres-Midi* ইত্যাদি । তিনি এই ছবিগুলিকে *moral tales* ( ফরাসি তাৎপর্য : গূঢ় কথা ) আখ্যা দিয়েছেন এবং এগুলি সমালোচকদের বিশেষ প্রশংসা পেয়েছে ( ড্র. ফ্রান্স ) । পরে আবার টিভির জন্ম তিনি বহু স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি বানান । শিল্প ধর্ম ব্যক্তি সম্পর্ক ও জীবনের প্রতি ছবির চরিত্রদের প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবেদনের নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক অনুভবেই তাঁর জগৎ, নিজস্ব জগৎ, যা মনন ও অনুভবের জগৎ, সেখানে তিনি পরিমিত ও পরিশীলিত ভাবে সৃজনশীল । তাঁর সাম্প্রতিক ছবিগুলি অবশ্য একটু অল্প ধরনের, প্রতিটি দৃশ্যের একক সম্পূর্ণতা ও সংলাপ-নির্ভরতায় চিহ্নিত । এই সমস্ত ছবিতেও মনস্তাত্ত্বিকতার বিশেষ ভূমিকা আছে ।

তাঁর সাম্প্রতিক ছবির মধ্যে আছে সামার ( ৮৬ ), কমেডিজ অ্যাণ্ড প্রোভার্বস সিরিজের ছটি ছবি ( আশির দশক ), এ টেল অব স্প্রিংটাইম ( ৯০ ) ।

রচিত গ্রন্থ : *Six Contes Moraux* ও শ্রাবলের সঙ্গে যৌথভাবে হিচকক সম্পর্কে একটি গ্রন্থ ।

॥ দি ব্যাট ট্রাপ ( এলিপ্সাথাইয়াম ) ॥

ভারত, ১৯৮২ । আহুর গোপালকৃষ্ণনের বিশ্ববিখ্যাত ছবি । এটি তাঁর তৃতীয় কাহিনীচিত্র । ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র উন্নি এক মাঝবয়সী অকৃতদার পুরুষ, এক অবক্ষয়ী যৌথ পরিবারের প্রধান । তার তিন বোন । বড় বোন জানান্মা বিবাহিতা, শগুণধর করে, আর বাপের বাড়ি থেকে তার সম্পত্তি ও ফসলের ভাগ চায় । মেজ বোন রাজান্মা অবিবাহিতা, বাধ্য, দাদার সব ছকুম এক কথায় পালন করে সে । ছোট বোন ত্রীদেবী স্কুলে পড়ে, বাইরের জীবনের স্বাদ পেয়েছে সে । একদিন

কোন স্বপ্নের হাতছানিতে সে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। অস্বস্তি হয়ে রাজাস্নানও বাড়ির বাইরে যেতে বাধ্য হয়। একা পড়ে থাকে উন্নি। পুরনো সংস্কার আর আধুনিক কাল এই সংঘাতের শিকার হয় সে, নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না, এক অদ্ভুত উদাসীনতা এসে গ্রাস করে তাকে। ছবির শেষে তার ভৌত অথবা আত্মিক যত্নহীন ঘটে।

অন্তর্বাস্তবে ও ইতিহাস চেতনায় চিহ্নিত এই ছবি। অসাধারণ প্রতীকীময়তায় সমৃদ্ধ। এলিপ্সাথাইয়াম—এই মালয়ালম শব্দটির অর্থ হলো ইঁহুরকল। কলে ইঁহুর ধরে পুকুরঘাটে নিয়ে গিয়ে জলে চুবিয়ে মারার দৃশ্য ছবিতে প্রতীকী ব্যঞ্জনা পেয়েছে, কেননা ছবির শেষের দিকে খালি বাড়িতে ভীত উন্নি কলে-পড়া ইঁহুরের মতোই ছটফট করে ও ছবির সমাপ্তিতে তার প্রতিবেশীরা তাকে জলে চুবিয়েই মারার চেষ্টা করে। এই ছবির ঝীম উত্তরাধিকারের চেয়ে বেশি কিছু, দায়ভাগের চেয়েও অধিক কিছু, তা হলো সংস্কৃত অর্থে ঋকৃথ (ড্র. গোপালকৃষ্ণন)। ছবিতে পরিচালকের আত্মজৈবনিক উপাদানের প্রবেশ ঘটেছে।

কাহিনী চিত্রনাট্য ও পরিচালনা গোপালকৃষ্ণন, চিত্রগ্রহণ রবি বর্মা, সম্পাদনা মণি, সংগীত দেবদাস, শিল্প নির্দেশনা শিবন, অভিনয় Karamana, Sarada, Jalaja, R. K. Nair।

ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট পুরস্কার, ১৯৮২ ॥

॥ পিয়ের লরেন্জ ॥

(জন্ম ১৯০৫, আমেরিকা)। চলচ্চিত্র সমালোচক ও তথ্যচিত্র পরিচালক। আমেরিকায় তথ্যচিত্রকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। সমাজ-কল্যাণ বিষয়ে একাধিক কাব্যিক ডকুমেন্টারি লরেন্জ পরিচালনা করেন। এর মধ্যে রয়েছে দি প্রাউ গাট ব্রোক দি প্লেন্স, দি রিভার ও দি ফাইট ফর লাইফ। এর মধ্যে প্রথম ছবিটি বাস্তববাদের নিরিখে ও মার্কিন সমস্যা (বিধবৎসী ভূমিক্ষয়) উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে নতুন দিক নির্দেশক। দ্বিতীয় ছবিটি চমৎকার কাব্যগুণময় ধারাবাহিক ও ভার্জিল টমসন-এর আবহ সংগীতে সমৃদ্ধ ছবি। আর তৃতীয় ছবিটি আমেরিকায় যে সামাজিক পুনর্বিজ্ঞানের প্রয়োজন সেই কথাটা তুলে ধরে। সব মিলিয়ে তাঁর ছবি ছিল বিশেষভাবে আমেরিকান। পরবর্তীকালে প্রযোজিত দি নুরেমবার্গ ট্রায়াল্‌স সংবাদকে তথ্যমূলকতায় উত্তীর্ণ করার স্বন্দর উদাহরণ। তাঁর ছবিতে কখনো কখনো অতিরিক্ত টেকনিকাল সচেতনতার পরিচয় থাকলেও প্রায়

সময়েই তা মানবিক আবেগ ও কাব্যিক স্বপ্নমার হাত ধরে আসত। জীবনের ১৭৭  
 ভাগে তিনি চলচ্চিত্র সম্পর্কে বিভিন্ন পরামর্শ দেবার জন্য একটা ফার্ম স্থাপন করেন।  
 চিত্রনির্মাণের সঙ্গে তিনি আর তখন জড়িত ছিলেন না।

## ॥ লাইটিং ॥

দৃশ্যরূপকে চিত্রায়িত করতে যে উপকরণগুলির ব্যবহার ঘটে, লাইটিং তাদের  
 অন্যতম। ফিল্ম কম্পোজিশনের ক্ষেত্রেও তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক একটি উপাদান।  
 চলচ্চিত্রে লাইটিংয়ের প্রয়োজন ও বিশিষ্ট ভূমিকার কথা ক্যামেরাভাষা, ক্যামেরা  
 ম্যান, চলচ্চিত্রের টেকনিক, গ্রেগ টোল্যাণ্ড, ডিফিউশন, ও অন্যান্য প্রকার  
 আলোচিত, সেই সমস্ত অংশ লাইটিংয়ের আলোচনায় দ্রষ্টব্য। দৃশ্যবস্তুর দৃশ্যকে  
 কৃত্রিম ভাবে আলোকিত করার এই পদ্ধতি শুধু এক্সপোজার যাতে যথাযথ হয় তার  
 জন্য নয়, তারই সঙ্গে ব্যবহৃত আলোকের মাত্রা টোন গভীরতা ও মেজাজকে নাশে  
 লাগিয়ে দৃশ্যকে সঠিক দৃশ্যরূপ ও প্রয়োজনীয় আবেগ ও নাটকীয়তা দেওয়ায়।  
 লাইটিং কম্পোজিশনের গঠন অর্থ ও ব্যঞ্জনাকে পরিষ্কৃত করে সঠিক দৃশ্যরূপ  
 করে। কম্পোজিশনের মধ্যকার অপ্রয়োজনীয় ডিটেলকে বাদ দেওয়া ও বিশেষ  
 কোনো অংশকে স্পষ্ট ও ইঙ্গিতবহু করে তোলা ওই কাজের অন্তর্ভুক্ত। আলোক  
 সম্পাতের পরিমাণ অতিরিক্ত বাড়িয়ে দৃশ্যে অবাস্তবতার এফেক্ট নিয়ে আসা, টোন  
 গ্রাহ্যতা ও দৃশ্যগভীরতা কমিয়ে বাড়িয়ে ছবিতে বাস্তবতার মাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করা,  
 বিশেষ কোনো রঙ বা রঙের কম্পোজিশন যেমন ব্যবহারের মাধ্যমে মোটকি পরিমাণে  
 উন্নীত হতে পারে ( ড. রঙের ব্যবহার ), তেমনি লাইটিংয়ে আলো ছায়ার বিশেষ  
 কোনো কম্পোজিশন বা টোন দৃষ্টান্ত ভাবে একাধিক বার ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ও পরামে  
 প্রযুক্ত হয়ে টেকনিকাল মোটকি হয়ে ওঠে। এ সমস্তই লাইটিংয়ের শিল্পগুণ। প্রয়োজন  
 ও প্রভাবের দিক থেকে লাইটিংকে ন্যূনতম যে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় তা  
 হলো : ১. ফ্রন্ট লাইটিং ( ক্যামেরার কাছে আলোর হালকা উৎস ব্যবহার করে  
 সম্মুখ থেকে আলোকসম্পাত ) ২. সফট লাইটিং ( দৃশ্যে মিডিয়াম আন্ডার  
 উপস্থিতি ) ৩. হাই কী লাইটিং ( দৃশ্যে উজ্জ্বল লাইট টোনের পরিমাণ বেশ )  
 ৪. হার্ড লাইটিং ( একটা কেন্দ্রীয় উৎস থেকে আলোকসম্পাত করে দৃশ্যে হার্ড  
 আন্ডার নিয়ে আসা ) ৫. লো কী লাইটিং ( দৃশ্যে ডার্ক টোনের পরিমাণ বেশ )।  
 এই বিভাজন শাদা ও কালোর টোনালিটির ওপর নির্ভরশীল। এই শ্রেণী বিভাজন  
 আলোর তীব্রতা, আলোর পরিমাণ ও কোন মাধ্যমের মধ্য দিয়ে আলোকে

পৃষ্ঠপুস্তক ওপর ফেলা হচ্ছে—এই তিনের ওপরই নির্ভর করে। লেন্সের মতো লাইটিংয়ের ক্ষেত্রেও ফিল্টার ( ড্র. )-এর ভূমিকা রয়েছে। আলোকসম্পাতের কথায় আলোক-সম্পাতের ধারাবাহিকতার কথাও আসে।

হার্ড লাইটিং ও সফট লাইটিং নির্দেশ করে আলোর গুণ ( আলোকসম্পাতের আপেক্ষিক তীব্রতা ), ফ্রন্ট লাইটিং সাইডলাইট, ব্যাক লাইটিং আওয়ার-লাইটিং ও টপ লাইটিং আলোর অভিমুখের নির্দেশক। দৃশ্যে আলোর অন্তত দুটি উৎস থাকবে : কী লাইট ও ফিল লাইট।

॥ লাতিন আমেরিকার ছবি ॥

দক্ষিণ আমেরিকা তথা লাতিন আমেরিকা দীর্ঘ দিন ধরেই অগ্নিগর্ভ। এক সময়ে এখানে ছিল ঔপনিবেশিক শাসন, এখন তথাকথিত স্বাধীনতা লাভের পর সামরিক শাসনের মরণ-কামড় কিংবা জনবিরোধী সরকারের অপশাসন বা সরকারের তথা দেশের অর্থনৈতিক সংকট। এ সবার বিরুদ্ধে জনগণের যে নিরন্তর সংগ্রাম, যার মধ্য দিয়ে জনগণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে, লাতিন আমেরিকার দেশগুলির চলচ্চিত্র সেই গণ আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক প্রয়াসের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই বৈশিষ্ট্যের দরুন এই চলচ্চিত্র এককালে ও কোথাও কোথাও এখনও সামরিক একনায়কতন্ত্রের বিরূপতা ও বিরোধিতা অর্জন করেছে। বিভিন্ন পরিচালক ও কলাকুশলীকে তখন নিজ নিজ দেশে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, এমনকি হত্যাকাণ্ড করা হয়েছে কখনো ( যেমন Glazierকে )। এদের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ ছিল অন্তর্দোহিতার। এই পটভূমিতে লা. আ.-র চিত্রনির্মাতারা রাজনৈতিক ও শৈল্পিক স্বাধীনতার জ্ঞান লড়াই করতে করতে যে সব ছবি বানিয়েছেন ও বানাচ্ছেন তা একই সঙ্গে রাজনৈতিক চলচ্চিত্র ও তৃতীয় বিশ্বের ছবিকে সমৃদ্ধ করে যাচ্ছে। যদিও এর পাশাপাশি বাণিজ্যিক ছবির ধারাটিও বর্তমান।

আর্জেন্টিনা : এই দেশে চিত্রনির্মাণের সূচনা ১৮৯০ নাগাদ। প্রারম্ভিক পরিচালকদের মধ্যে H. Fregonese ও L. Torres Rios উল্লেখযোগ্য। Rios-এর পুত্র L. Torre Nilsson চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ছবি নির্মাণ করেন, এঁর ছবিতে বুলুয়েলের প্রভাব সদর্শক ও অভিযাতী ভাবে পড়েছিল। ঐক্যবাদী চিত্র নির্মাণের উদ্দেশ্য নিয়ে ৫৭-য় তরুণ পরিচালকদের একটি গোষ্ঠী আত্মপ্রকাশ করে, যার মূল ফল সোলানাসের আবির্ভাব। তাঁর দি আওয়ার অব দি ফারনসেস ও Glazier-এর দি টেটর উল্লেখ্য। রাজনৈতিক চিত্রের এই

প্রবণতা সত্ত্বেও দশকে প্রাধান্য পায় যা কিছুদিনের মধ্যেই বড়া সরকারী বিরোধিতার সন্মুখীন হয়। এই দেশে বছরে এখন ৩০টির মতো কাহিনীচিত্র হচ্ছে। স্বতন্ত্রপাত হয়েছে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনেরও (স্বতন্ত্র ১৯১৯ সালেই), গড়ে উঠেছে সিনেমাথেক, সিনেমার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও সংরক্ষণকেন্দ্র, ফেডারেশন ও ফিল্ম স্কুল। চলচ্চিত্রবোধ জাগানো, পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ, জনমত গঠন ও শিক্ষা আর গবেষণার পরিবেশ সৃষ্টি করা এগুলির উদ্দেশ্য। এই কাজে স্থানীয় ক্যাথলিক আন্দোলন পরোক্ষ সাহায্য যুগিয়েছে। আত্মপ্রকাশ করেছেন বেশ কয়েকজন নতুন পরিচালকও। পুরনো পরিচালকদের মধ্যে মালুয়েল আন্তিন ও ব্যামবার্জের নাম উল্লেখযোগ্য।

উরুগুয়ে : এই দেশের প্রথম ফীচার ছবি ১৯১৯ সালে। দীর্ঘকাল ধরে চলচ্চিত্র এখানে ছিল অপেশাদার ও অব্যবসায়িক। ফিল্ম ক্লাবের সূচনা ১৯৩২য়ে। বিভিন্ন সোসাইটির মাধ্যমে চলচ্চিত্রের আন্দোলন এখানে অতি ব্যাপক, স্ফূর্ত্ত ও প্রভাবশীল রূপ নিয়েছে। চলচ্চিত্র শিক্ষণের জাতীয় ইনস্টিটিউট এবং আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের সহযোগিতায় ফিল্ম আর্কাইভয়ের আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের লাতিন আমেরিকান শাখা স্থাপিত হয়েছে। ক্যাথলিক চলচ্চিত্রের অগ্রতম কেন্দ্র এই দেশ, রাজনৈতিক সিনেমার ক্ষেত্রে M. Handler-এর অবদান উল্লেখযোগ্য।

কলম্বিয়া : ১৯১৪র পর থেকে মূলতঃ সংবাদচিত্র ও স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি দিয়ে চিত্রনির্মাণ শুরু হলেও ৬০য়ের দশকের আগে পর্যন্ত আমেরিকা ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের ছবিই যে কোনো লা. আ.-র দেশের মতো এখানেও ছিল মূল আকর্ষণ। তারপর থেকে এ দেশের ছবিতে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ দেখা যেতে থাকে। রাজনৈতিক চলচ্চিত্রেরও সূচনা হয় মোটামুটি এই সময়ে, যে প্রসঙ্গে ফিল্ম সোসাইটির ভূমিকা অনস্বীকার্য। উল্লেখযোগ্য চিত্রনির্মাতার মধ্যে সি. ও জে. আলভারেজ (স্বামী-স্ত্রী), মালুয়েল ও স্যাম্পার রয়েছেন।

কিউবা : (ড্র. কিউবা), ওখানে উল্লিখিত পরিচালকদের সঙ্গে আর একজনের নাম উল্লেখ করা দরকার : তিনি Espinosa. কাস্তোর বিপ্লবী সরকার চলচ্চিত্র-সংস্কৃতির শক্তি ও প্রভাব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও অহুশীলনও শুধু নগরকেন্দ্রিক না থেকে কিউবার সমগ্র জনসাধারণের কাছে পৌঁছে গেছে। সমাজতন্ত্রের সংকটের পর কিউবার প্রতিবাদী চলচ্চিত্রেও সমস্তা দেখা গেছে। তবু কিউবান ছবিগুলি ঙ-দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক সমস্যার কথা তুলে ধরছে কিন্তু অতিকথিত বা প্রচারমূলক এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ওঠেনি।

চিলি : দশের দশকের শেষ ভাগে চিত্রনির্মাণ শুরু হয়ে গেলেও তা মোটামুটি স্থিতি পায় বছর কুড়ি পর সিনেমায় শব্দের আগমনে। প্রথম সিনে ক্লাব স্থাপিত হয় ৫৪য়। ৭৩য়ে সামরিক অভ্যুত্থানের আগে পর্যন্ত বামপন্থী রাজনীতি চলচ্চিত্র শিল্পে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। পরিচালকদের মধ্যে ফ্রানসিয়া ও লিভিন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং ছবির মধ্যে গুজম্যানের দি ফার্স্ট ইয়ার ও দি ব্যাটল অব চিলি খুবই উল্লেখযোগ্য।

বলিভিয়া : লা. আ.-র অধিকাংশ দেশই দীর্ঘদিন ধরে ঔপনিবেশিক শোষণের ফলে দরিদ্র। তার মধ্যে বলিভিয়ার দারিদ্র যেন আরও বেশি। ৫২য় জাতীয়তাবাদী সরকার শাসন ক্ষমতায় আসার পর চলচ্চিত্র প্রযোজনা এখানে ধীরে ধীরে শুরু হয়। প্রারম্ভিক ছবির মধ্যে জর্জ রুইজের লা ভারতিনতে উল্লেখযোগ্য। সেনজিনেস এ দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিচালক, তাঁর উকামাউ, ব্লাড অব দি কনডর, ভায়লেনচা এন কুয়ের্তা, La Noche de San Juan রাজনৈতিক চলচ্চিত্র হিসেবে উচ্চ প্রশংসিত। দেশে ৬৫তে ফিল্ম ইন্সটিটিউট স্থাপিত হয়। ছাত্রসংঘ FUL ও CUB এবং ফিল্ম সোসাইটি চলচ্চিত্র অনুশীলনে বিখ্যস্ত ভূমিকা পালন করে। পরিচালক আন্তনিও এন্তইনো নয়া বাস্তববাদের প্রবর্তন করেন।

ব্রাজিল : ১৯০৮ থেকে চিত্রনির্মাণের সূচনা। হলিউড থেকে আসা বাণিজ্যিক ছবির অবাধ প্রসার, ফ্যান পত্রিকার প্রচলন ও অপসংস্কৃতির প্রাধাংশের বিরুদ্ধে ১৭য় একটি ছোট গোষ্ঠী আঙ্গপ্রকাশ করে। নৃত্ব বিষয়ে ছবি বানালেন এ. পিন্টো, ৩৬য়ে স্থাপিত হলো জাতীয় চলচ্চিত্র শিক্ষালয়, ২৮ ও ৪০য়ে অল্পস্বায়ী ভাবে ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দীর্ঘস্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো সিনে ক্লাব। ছবি নিয়ে পত্রিকা ও বই বেরোতে লাগল, হতে লাগল চলচ্চিত্র উৎসব। প্রারম্ভিক পরিচালকদের মধ্যে H. Mauro, পরবর্তীদের মধ্যে L. Barreto, N. P. dos Santos ও গ্লবার রোচা ( ১৯৩৮-৮১ ) উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে রোচার ছবিতে সমগ্র তৃতীয় বিশ্বের সংস্কৃতির জটিল দমস্কার মূল্যবান পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ আছে। ৬৪তে দামরিক অভ্যুত্থান চলচ্চিত্রের রাজনৈতিক ধারাকে দারুণভাবে ব্যাহত করেছিল। পরে অবস্থা আবার স্বাভাবিক হয়। বছরে এখন ফীচার ছবি নির্মিত হয় কম বেশি ৬০টি। কিন্তু তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছবির সংখ্যা খুব বেশি নয়।

মেকসিকো : এখানেও প্রতি বছর গড়ে কম বেশি ৬০টি করে কাহিনীচিত্র তৈরি হয়। প্রারম্ভিক চিত্রের মধ্যে দি নাইট অব দি মায়াজ ও দি ফরগটেন ভিলেজ, পরিচালকদের মধ্যে ই. ফার্নানডেজ, এবং পরবর্তী সময়ের ছবির মধ্যে

কটস ও Torezo প্রশংসিত। বুলুয়েল এই দেশে প্রথম চলে আসেন ৪৭৭ খ্রিঃ তার পর বিভিন্ন সময়ে এখানে বহু ছবি নির্মাণ করেছেন যেগুলোকে পুরোদপুর মেকসিকান ছবি বলা হবে কিনা তা নিয়ে দ্বিমত আছে।

এছাড়া নিকারাগুয়া, পেরু ও ভেনেজুয়েলার সিনেমা নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে ও কিছু কিছু কাজ হয়েছে। এর মধ্যে পেরুর ক্যাথলিক চলচ্চিত্র, ভেনেজুয়েলার প্রচারমূলক চরিত্রের কয়েকটি তথ্যচিত্র ও কাহিনীচিত্র ‘ক্যাললের জুয়ান’এর উল্লেখ করা যায়। নিকারাগুয়ার সিনেমা নিয়ে কার্যকলাপ শুরু হয়েছে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে, সত্তরের দশকে। স্থানুডিনিষ্ট ত্রাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের বিপ্লবী আন্দোলনের মাধ্যমে। তার আগে যে ছবি তৈরি হয়েছে তা শুধুই ভ্রমণ, বিজ্ঞাপন ও সংবাদ চিত্র। চিলি থেকে এসে অষ্টাভিয়ো করটেস ‘নিকারাগুয়া, সেপ্টেম্বর ১৯৭৮’ ও মেকসিকো থেকে এসে বাটা নাতারো ‘নিকারাগুয়া : দোউইল উইল মেক ফ্রিডম’ বানালেন। জুলাই ১৯৭৯তে বিপ্লবের সাফল্যের পর নিকারাগুয়ান সিনেমা ইনস্টিটিউট স্থাপিত হলো। এর উদ্যোগে তৈরি হয়েছে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সংবাদচিত্র ও তথ্যচিত্র, যাতে গ্রিয়ারসন ও ইভেনুদের প্রভাব খুঁজে পাওয়া যায়। কাহিনীচিত্র নির্মাণও সম্প্রতি এখানে শুরু হয়েছে, চিত্র-নির্মাতাদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ ও প্রাণবন্ততা দেখা যাচ্ছে, তথ্য ও কাহিনীচিত্রের মাঝামাঝি একটি শৈলী নিয়ে এঁরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন, ক্রিশ মার্কারের প্রভাব যে-প্রসঙ্গে উল্লেখ করার মতো। লা. আ.-য় ক্যাথলিক চলচ্চিত্র রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের জ্ঞান ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল, ধর্মীয় সংস্কৃতি থেকে গণ-সংস্কৃতিতে উত্তরণের এটি এক দ্বন্দ্বিক পর্যায়। লা. আ.-র প্রগতিশীল চলচ্চিত্রে একটা লক্ষ্য থাকে, উদ্দেশ্য থাকে, রাজনৈতিক যুক্তি থাকে। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তা যুক্তিকামী জনগণের কথা বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে স্তম্ভিতভাবে সক্রিয়। এই চলচ্চিত্র-শিল্পীদের মনোভাব রোচার ‘হিংস্রতার নন্দন’ প্রবন্ধে চমৎকার উদ্ঘাটিত। নিষ্ঠা সাহসিকতা সততা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে তাঁরা স্বদেশে থেকে অথবা দেশের বাইরে চলে গিয়েও এই কাজ করে যাচ্ছেন, সমাজতান্ত্রিক অস্ত্র দেশ এককালে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তাঁদের দিকে। ছবি তৈরির খরচ বাড়ছে, অস্ত্র বাধা ও সমস্যাও বেড়েছে তবু নিজেদের আদর্শে লা. আ.-র চলচ্চিত্রশিল্পীরা অবিচল থাকবেন আমরা এই আশাই করব। লা. আ.-র ও তৃতীয় বিশ্বের বিশেষত আফ্রিকার (দ্র.) প্রগতিশীল চলচ্চিত্র আজ পরস্পরের বিনিময়যোগ্য।

॥ লাস্ট ইয়ার এ্যট মারিয়েনবাদ ॥

১৯৬১, ফ্রান্স/ইতালি। ঘরের পর ঘর, বারান্দার পর বারান্দা, এক বিশাল, প্রাচীন ও অভিজাত হোটেলে এক নারীর সঙ্গে ছবির নায়কের সাক্ষাৎ হয়। যার সঙ্গে আগের বছর মারিয়েনবাদে কি আর কোনো স্থানে তার প্রেম ও অন্তরঙ্গতা ঘটেছিল বলে নায়কের দাবি। বাস্তবে হয়তো ঘটেছিল কিংবা ঘটেনি। অনেকের মতে, মারিয়েনবাদের 'বিগত বছর' সম্পূর্ণভাবে নায়কের মনগড়া ব্যাপার। সময়ের ধারাবাহিকতাকে, গঠনে প্রচলিত যুক্তিকে ও প্রসঙ্গের অবজ্ঞাকটিত বাস্তবতাকে অস্বীকার করে আলীয়া রেনে এই ছবিতে রহস্য, কাব্যময়তা ও সৌন্দর্যের এমন এক জগৎ সৃষ্টি করেন মেজাজ, প্রতিষ্ঠান ও অভিজ্ঞতায় যা পুরোপুরি ব্যক্তিগত জগৎ। ছবিতে অন্তর্দ্বন্দ্বের তথা বাস্তব বনাম কল্পনার এক মনস্তাত্ত্বিক ধাঁধা উত্থাপিত, যার কোনো সমাধান দেখানো হয়নি, বস্তুত এ ছবির সমাপ্তি চলচ্চিত্রে উন্মুক্ত পরিণতির অত্যন্ত দৃষ্টান্ত। লাস্ট ইয়ার...এর স্বপ্নময়, মার্জিত রূপ যদি প্রসঙ্গে কাব্যিক হয় তো শৈলীতে জ্যামিতিক—'সংলাপের পরিবর্তে বস্তুগুঞ্জের মাধ্যমে চরিত্র-পরিষ্কৃতির প্রয়াস' (ড্র. রেণে)। স্বাভাবিক খুব সাফল্যের সাথে ছবিতে প্রতিফলিত।

চিত্রনাট্য আলীয়া রব-গ্রিয়ে, চিত্রগ্রহণ S. Vierny, সংগীত F. Seyrig, শিল্প নির্দেশনা J. Saulnier ॥

॥ ম্যাক্স লিগের ॥

(১৮৮৩-১৯২৫, ফ্রান্স)। সৈনিক হিসেবে লিগের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। চ্যাপলিন-পূর্ব যুগের তিনি সবচেয়ে বড়ো কমেডি শিল্পী। তাঁর পূর্ববর্তী কমেডি অভিনেতাদের উদ্ভট সাজসজ্জা ও দৃষ্টিকটু অতিরঞ্জন বর্জন করে লিগের কমেডিতে বুদ্ধি, স্বঘমা ও মানবিক আবেদন নিয়ে আসেন। আত্মবিশ্বাস, ও অদ্ভুত পরিস্থিতির আকস্মিকতা, ও এই দুই বৈপরীত্যের সংঘাতে তাঁর কমেডির রস। চারশেরও বেশি ছবিতে, যা একই ধরনের সহজ সিচুয়েশনের বিভিন্ন ও বিশ্বাস-যোগ্য রূপান্তর, অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি কমেডিকে ছন্দ, গঠন ও অভিনয়ে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করে তুলছিলেন। তাঁর বিভিন্ন স্কেচের একটি নির্বাচিত সংকলন 'লাফ উইথ ম্যাক্স লিগার'ই শুধু আধুনিক দর্শকরা দেখেছেন। টুকরো টুকরো হাসির ছবি থেকেও তাঁর একটা অথও শিল্প-ব্যক্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। ফ্রান্স সহ বিভিন্ন দেশে

ছবি করে তিনি শেষ পর্যন্ত কমেডিয়ানদের স্বাভাবিক অস্থখ বিষাদরোগে আক্রান্ত হন ও তাঁর তরুণী স্ত্রীকে নিয়ে একত্রে আত্মহত্যা করেন। কমেডির ক্রমবিকাশে তাঁর প্রভাব ও অবদান স্বীকৃত। কমেডিয়ান হিসেবে তাঁর সাফল্যই ১৯১৫-র পর থেকে হলিউডেও নির্বাক কমেডির সূচনা করে।

## ॥ ডেভিড লীন ॥

(১৯০৮-৯১, ইংলণ্ড)। প্রযোজক, চিত্রনাট্যকার ও চলচ্চিত্র পরিচালক। ইংলণ্ডের সারয়ে (Surrey) কাউন্টির ক্রয়ডনে জন্ম। ১৯২৭ সালে স্বদেশের লাইন্স গ্রোভ স্টুডিওতে পরিচালক মরিস্ এলেভির অধীনে চলচ্চিত্র নির্মাণের অতি সাধারণ স্তরের কর্মী-নাট্যর বোর্ড বা ক্লাপার বোর্ড বয় হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরের বছর থেকেই চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা, পরিচালনা ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগে সহকারীর কাজ আরম্ভ করেন। ১৯৩০ সাল থেকে প্রথমে গ্যামন্ট্ (Gaumont) সাউণ্ড নিউজ্ এবং ব্রিটিশ ম্যুভি নিউজ্ সংস্থায় এবং পরে ১৯৩৫ থেকে ১৯৪২ সাল অবধি এলপ্লী স্টুডিওতে যথাক্রমে তথ্যচিত্র ও কাহিনীচিত্রের সম্পাদকের পদ পান। ‘এসকেপ মি নেভার’ (৩৫), ‘ফ্রেন্ড উইথআউট টায়ারস্’ (৩৭), ‘পিগ্ ম্যালিয়ন’ (৩৮), ‘মেজর বারবারা’ (৪১), ‘ওয়ান অব আওয়ার এয়ার-ক্র্যাফ্ট ইজ মিসিং’ (৪২) প্রভৃতি তাঁর সম্পাদিত ছবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ৪২ সালেই চিত্রপরিচালক রূপে তাঁর আবির্ভাব হয়। বিখ্যাত ইংরেজ লেখক ও অভিনেতা স্যার নোয়েল কোয়ার্ডের সঙ্গে যৌথভাবে ‘ইন হুইচ উই মার্ট’ কাহিনী-চিত্র পরিচালনা করেন। ৪২ থেকে ৪৬ সালের মধ্যে এই জুটি চারটি চলচ্চিত্র যৌথভাবে তৈরি করেন। ৪৩ সালে রোনাল্ড নিমে এবং আইনি হ্যাভেলক্ অ্যালানকে সঙ্গে নিয়ে চলচ্চিত্র প্রযোজনা সংস্থা ‘সিনেগিল্ড’ স্থাপনা করে স্যার কোয়ার্ডের কাহিনীভিত্তিক ‘দিস্ হ্যাপি ব্রীড’ (৪৪) এবং ‘ব্লিথে স্পিরিট’ (৪৫) পরিচালনা করেন। শেষোক্ত বছরে তৈরি তাঁর অপর ছবি ‘ব্রীফ্ এনকাউন্টার’। এই ছবি অন্তরঙ্গ-রোমাণ্টিক চিত্ররূপে এবং অনবদ্য অভিনয় ও স্মৃষ্কাল গঠনে চিহ্নিত। চার্লস্ ডিকেন্সের উপন্যাস ‘গ্রেট এক্সপেক্টেশনস্’ এবং ‘অলিভার টুইস্ট্’ যথাক্রমে ৪৬ এবং ৪৮ সালে তাঁরই দক্ষ পরিচালনার চলচ্চিত্রায়িত হয়ে বিপুল সাফল্য অর্জন করে। ৪৯ সালে ‘দি প্যাশনেট ফ্রেণ্ডস্’ এবং ৫০ সালে ‘ম্যাডেলেনইন’ ছবি দুটি তৈরির পর বিখ্যাত হাঙ্গেরিয়ান প্রযোজক অ্যালেক্সান্ডার কোর্ডা’র পক্ষে ইংলেণ্ডে ‘দি সাউণ্ড ব্যারিয়ার’ (৫২) এক ‘হবসনস্ চয়েস্’ (৫৪) তাঁর আরো

দুটি গুরুত্বপূর্ণ ছবি। ছবি দুটির প্রযোজকও তিনি। ইতিমধ্যে তাঁর ছবিতে একটি বিশেষ খীমের প্রচলন শুরু হয়েছে, তা হলো প্রকৃত প্রেমিকের ব্যক্তিগত একাকিত্ব। ৫৫ সালে 'সামার ম্যাডনেস' ছবি তৈরির পর থেকে তাঁর চলচ্চিত্র শৈলীতে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তা হলো বহু চরিত্র নিয়ে বিরাট পটভূমিকায় কোনো এক বিশেষ ঐতিহাসিক-সামাজিক সময়কে তুলে ধরতে। অর্থাৎ এই সময়ে লীন অন্তরঙ্গ নাটকীয়তা থেকে ছবির বিষয়বস্তু সরিয়ে নিলেন বড়ো মাপের স্পেকট্যাকলে। সক্ষম হলেন 'দি ব্রীজ অন দি রিভার কোয়াই' ( ৫৭ ), 'লরেন্স অব অ্যারাবিয়া' ( ৬২ ), 'ডক্টর বিভাগো' ( ৬৫ ), 'রায়ানস্ ডটার' ( ৭০ ) এবং 'এ প্যান্ডেজ্ টু ইণ্ডিয়া' ( ৮৪ ) ছবিগুলি নির্মাণে। ছবির প্রস্তুতি পর্ব, নির্মাণের সময়, সেট-সেটিং, ডিটেলের কাজ—সমস্ত বিচারেই এগুলি বৃহৎ প্রযোজনা। উপরোক্ত ছবিগুলির প্রথম দুটি ছবির জন্ম তিনি শ্রেষ্ঠ পরিচালকের অস্কার (Oscar) পুরস্কার পান। স্বন্দর অভিনয়, দক্ষ সম্পাদনা ও চমৎকার দৃশ্যরসের জন্ম তাঁর ছবির প্রমোদমূল্য অসাধারণ। তাঁকে অনেক সময়ে আডম্বরপ্রধান ও ব্যয়বহুল ভাবে নির্ধৃতবাদী বলে সমালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু ব্রিটিশ চলচ্চিত্রে তাঁর প্রযোজনা ও ভূমিকা ছিল অত্যন্ত জরুরী।

প্রাদঙ্গিক গ্রন্থ : G. Pratley-র দি সিনেমা অব ডেভিড লীন ॥

মিহির সেনগুপ্ত

॥ এন্থ' লুবিশ ॥

( ১৮৯২-১৯৪৭ ), জার্মানিতে জাত মার্কিন চিত্রপরিচালক। তাঁর বাবার ছিল খুবই নামী ও চালু এক দর্জির দোকান। অভিনেতা হবার জন্ম শিক্ষালাত করে তিনি কমেডি রচনা ও পরিচালনা এবং তাতে অভিনয় করা শুরু করেন। তারপর তিনি ধারা পান্টে কমেডি থেকে আসেন জাঁকজমকপূর্ণ ঐতিহাসিক রোমান্সে। যার মধ্যে মাদাম দুবারী ( ১৯১৯ ) সবচেয়ে নাম করা। ছবিটির বিপুল সাফল্য - তাঁকে ও এর নায়িকা পোলা নেগ্রিকে হলিউডে আমন্ত্রণ পেতে সাহায্য করে। আমেরিকায় এসে লুবিশ প্রথমে কমেডি চিত্রই নির্মাণ করেন—দি ম্যারেজ সার্কেল ( ২৪ ), ফরবিডেন প্যারাডাইস ( ২৪ ), ইত্যাদি। তারপর বানান মিউজিক্যাল—দি লাভ প্যারেড ( ৩০ ), ইত্যাদি। তারপর আবার কমেডি, এবার গ্রেটা গার্বোকে নায়িকা করে, নিনোৎচকা ( ৩৯ )—যে ছবিটি সর্বকালের সবচেয়ে জনপ্রিয় ছবিগুলির একটি। লুবিশের প্রধান খীম ছিল দুটি—অর্থ ও

যৌনতা। নিখাদ কৌতুকপূর্ণ ও মজাদার পোলাইট কমেডি তাঁর মাধ্যমে মেঞ্চ কমেডি হয়ে উঠল ত্রিশের দশকে। বুদ্ধিদীপ্ত ও স্বেচ্ছাস্বিক চিত্রায়ণে যৌনতাকে তিনি করে তুললেন স্বাভাবিক জিয়া, মানবিক প্রয়োজন ও উইটের খেলা। হপি উডে নুবিংশের ব্যবসায়িক ও শৈল্পিক উভয় সাফল্যই হয়েছিল বিশ্বয়কর রকমের। আমেরিকায় চিত্রপরিচালকদের গুরুত্ব ও কর্তৃত্ব তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৩৬ সন থেকে তিনি একই সঙ্গে ছিলেন তাঁর ছবির পরিচালক ও প্রযোজক। ১৯৩৭ সনে তাঁকে সম্মানসূচক বিশেষ অঙ্কার দেওয়া হয়। নির্বাক যুগে তাঁর কমেডি ছিল মার্কিন সিনেমার এক বিশুদ্ধ অঙ্গ, সর্বাক যুগে এসে তাঁর চিত্রকর্ন হলো হলিউডের নব-সাফল্যের এক প্রধান অংশীদার। এখানে বলা দরকার, নির্বাক যুগে তিনি ওয়ার্লার ত্রাদর্শের হয়ে ছবি করতেন, সর্বাক যুগে প্যারামাউন্ট পিক্চার্সের হয়ে। অল্প বয়সেই তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে, ফলে শেষ দিকে তিনি মন দিয়ে কাজ করতে পারেননি। বারবার তাঁর হার্ট অ্যাটাক হতে থাকে, ষষ্ঠবারের আক্রমণে তাঁর মৃত্যু হয়। পরবর্তীকালে Otto Preminger ও Joseph Mankiewicz-এর ছবিতে তাঁর প্রভাব লক্ষিত হয়েছে। আরো পরে কমেডি ছবিতে যৌন রসের সঙ্গে কমিক রসকে সমন্বিত করার যে প্রয়াস দেখা গেছে তাঁর আদি উৎস নুবিংশে।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ: R. J. Anobile-এর Ernst Lubitch's 'Ninotchka' starring Greta Garbo।

॥ লুমিয়ের আত্মদয় ॥

সিনেমার প্রথম স্রষ্টা বা জনকের মর্যাদা যদি কাউকে দিতে হয় তবে তা প্রাপ্য ফ্রান্সের অগাষ্ট লুমিয়ের ( ১৮৬২-১৯৫৪ ) এবং লুই লুমিয়ের ( ১৮৬৪-১৯৪৮ )-এর। চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এঁরা লুমিয়ের ত্রাদর্শ নামেই অমর হয়ে আছেন। পিতা জঁতোয়া লুমিয়েরের প্রেরণায় লুই লুমিয়ের চলমান আলোকচিত্র গ্রহণের উপযোগী ক্যামেরা আবিষ্কারে ত্রতী হন, এবং দীর্ঘ গবেষণা ও পরিশ্রমের পর এক ঘরনের ক্যামেরা ও প্রোজেক্টার বা প্রক্ষেপণ যন্ত্রের আবিষ্কারে সফল হন।

১৮৯৫ সালে আবিষ্কৃত এই 'সিনেমাটোগ্রাফি' যন্ত্রের সাহায্যে এক সঙ্গে বহু মানুষের গতিশীল চিত্রাবলী দেখার স্বেচ্ছা এনে দিয়ে যন্ত্র ও কারিগরী বিদ্যা এবং শিল্পের জগতে লুমিয়েররা এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। তারপর বছরের প্রায় শেষ দিকটাতে, ২৮শে ডিসেম্বর তারিখ থেকে লুমিয়েররা

প্যারিসে জনস্বার্থের জন্ত একটি প্রেক্ষাগৃহের উদ্বোধন করেন। মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তার ডেউ ছড়িয়ে পড়ল গোটা দুনিয়া জুড়ে। লুমিয়েররা আগের বছরই বেশ কয়েকটি ক্যামেরা ও প্রোজেক্টর তৈরি করে রেখেছিলেন। তাঁদের বিশ্বাসী কিছু লোককে ক্যামেরাম্যান ও প্রোজেক্টর অপারেটরের কাজে শিখিয়ে রেখেছিলেন। এই সব ট্রেনিংপ্রাপ্ত লোকগুলিকে লুমিয়েররা এখন বিদেশে পাঠানো শুরু করলেন। তাঁরা পৃথিবীর নানা জায়গা ঘুরে একক-শটের প্রায় বারোশ' ছবি তুলে ফেললেন।

১৮৯৬ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি লণ্ডনে লুমিয়েরদের প্রদর্শনীর উদ্বোধন হলো, এপ্রিলে হলো ভিয়েনা আর জেনেভাতে, জুন মাসে মাদ্রিদ, বেলগ্রেড ও নিউ ইয়র্কে, জুলাই মাসে সেন্ট পিটার্সবার্গ ( পরবর্তীকালের লেনিনগ্রাদ ) আর বুখারেস্টে। ঐ একই বছরে লুমিয়েরের ক্যামেরাম্যানদের দলবল ইজিপ্ট, ভারতবর্ষ, জাপান, অস্ট্রেলিয়া এবং আরো অনেক দেশে ছড়িয়ে পড়লেন। তাঁদের প্রদর্শনী জনপ্রিয়তা আর অর্থের বন্ডা নিয়ে এল। ভারতবর্ষে প্রথম লুমিয়েরদের চলচ্চিত্র প্রদর্শনী হলো ৭ই জুলাই, ১৮৯৬ সালে, বোম্বাই শহরে।

১৮৯৬ সাল থেকেই কিন্তু সিনেমাটোগ্রাফির প্রতি লুই লুমিয়েরের আকর্ষণ কমে আসতে থাকল, তিনি অল্প বিষয়ে গবেষণার কাজে মন দিলেন। তাঁদের শূন্যস্থান পূর্ণ করতে দ্বিতীয় যে ব্যক্তিটি এগিয়ে এলেন, তিনিও ফরাসি দেশের মানুষ। তাঁর নাম জর্জ মেলিয়েস। ১৯০০ সালে লুমিয়ের ভ্রাতারা তাঁদের সিনেমাটোগ্রাফের কপিরাইট চার্লস প্যাথে নামে এক ভদ্রলোকের কাছে বিক্রী করে দেন।

লুমিয়েররা একেবারে বাস্তব জীবন থেকেই ছবিগুলি তুলতেন, কোনোরকম নাজানো-গোছানোর ব্যাপার তাতে ছিল না। চলচ্চিত্র গণ মনোরঞ্জনের বিষয় বা গল্প বলার মাধ্যম হিসেবে কতখানি শক্তিশালী সে বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর ব্যাপারে লুমিয়েরদের কোনো আকর্ষণ ছিল না। তাঁদের তোলা অল্প ছবির বেশিরভাগই ফর্মের দিক থেকে অত্যন্ত সাদামাঠা। 'বেবী'স ব্রেকফাস্ট', 'টাজিৎ দি গার্ডেনার' ছবিগুলি নিছক কৌতুকের—কিন্তু কয়েকটি ছবিতে জটিলতার কিছু স্পর্শ পাওয়া যায়। 'দি কার্ড গেম', 'লাঞ্চ আওয়ার এন্ট দি লুমিয়ের ফ্যাক্টরি', 'এরাইভাল অব এ ট্রেন'—এই ছবিগুলিতে দর্শকের মনোযোগকে একাধিক দিকে আকর্ষণ করা হয়েছে। অবশ্য লুমিয়েরদের কোনো ছবিরই দৈর্ঘ্য এক মিনিটের বেশি ছিল না। [গোর্কি মনে করেছিলেন, লুমিয়েরদের এই প্রকার ছবি ভবিষ্যতে অস্তদের হাতে 'যে নারী কাপড় ছাড়ছে', 'মানুষের

মহিলা' এই জাতীয় রূপ পাবে। তাঁর ধারণা একই সঙ্গে সত্য ও মিথ্যে গলে  
প্রমাণিত হয়েছে। ( দ্র. সংযোগ ও চলচ্চিত্র ) ]।

রুজভ রাঃ

॥ সিডনি লুমেট ॥

( জন্ম ১৯২৪, আমেরিকা )। লুমেট তাঁর শিল্পজীবন শুরু করেন অভিনেতা  
হিশেবে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আধাসামরিক দায়িত্ব পালনের পর তিনি মঞ্চ-নাটক ৭৭  
টি চিত্রের পরিচালক হন। পঞ্চাশের দশকে দুশোরও বেশি টিভি নাটক ও চিত্র  
তিনি পরিচালনা করেন। কাহিনীচিত্র নির্মাণ শুরু করার পর গত তিরিশ বছরে  
লুমেটের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে তা হলো আকর্ষণীয় ও আলংকারিক  
দক্ষতা, বিশিষ্ট কিন্তু ঈষৎ নিরাসক্ত শৈলী, আবদ্ধ দমচাপা সিচুয়েশন, এক  
পেশাদার ভোগবাদী সমাজের উদঘাটন এবং প্রায় ভেঙে পড়ার মুখে এসে পড়া  
চরিত্রের উপস্থাপনা। টুয়েলভ অ্যান্ড্রি মেন ( ৫৭ ) ও দি ডেডলি অ্যাফেয়ার ( ৬৬ )  
এই প্রবল পারিবেশিক অভিঘাত ও টানটান সিনেমাটিক ড্রামার প্রমাণ। তাঁর  
তোলা বিশিষ্ট নাটকের চিত্রায়ণে, The Fugitive Kind ( টেনেসি উইলিয়ামস্  
অবলম্বনে ), ভিউ ফ্রম দি ব্রীজ ( আর্থার মিলার-এর নাটক নিয়ে ), লং ডে'স  
জানি ইনটু-নাইট ( ইউজেন ওনীল অবলম্বনে ) ও দি সীগাল ( চেখভের নাটক  
নিয়ে ), এই গুণ তুলনামূলক ভাবে কম। এগুলি অনেকটাই নাট্যধর্মী চিত্র।  
পরের ছবিগুলি, মার্ভার অন দি ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস ( ৭৪ ), ডগ ডে আফটারনুন  
( ৭৫ ) ও নেটওয়ার্ক ( ৭৬ ), একই সঙ্গে সমালোচকদের প্রশংসা ও ব্যবসায়িক  
সাফল্য পায়। তাঁর অস্বাভাবিক ছবির মধ্যে আছে প্রিন্স অব দি সিটি ( ৮১ ),  
পাওয়ার ( ৮৬ ), Q and A ( ৯০ )। এই সমস্ত ছবিতে তাঁর বুদ্ধি, সংবেদনশীলতা,  
নিঃস্ব ক্রটি ও অভিনেতাদের কাজে লাগাবার ক্ষমতা স্পষ্ট। যেমন জেন ফগা-  
অভিনীত মর্নিং আফটার ছবিতে তিনি খিলার ও কমেডি এই দুটি ধারাকে  
মেলাতে সচেষ্ট। যদিও সব মিলিয়ে স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিগত কোনো শৈলী আজও  
তাঁর গড়ে ওঠেনি বলে অনেকে অভিযোগ করে থাকেন।

॥ লেন্স ॥

দৃক-বিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুযায়ী লেন্স হলো a shaped, transparent optical  
device, generally made of fine glass, which forms within its

field of view the image of an object with acceptable definition over a specified field angle by converging or diverging light rays coming from the object. যে লেন্সে আলোকরশ্মি converged হয়ে ইমেজ গঠিত হয় তাকে পজিটিভ লেন্স ও যে লেন্সে diverged হয়ে গঠিত হয় তাকে নেগেটিভ লেন্স বলা হয়। সরলতন ক্যামেরা-লেন্সে মাত্র দুটি বিবয় বিবেচ্য — লেন্সের আকৃতি ও শাটার-এর diaphragm-এর অবস্থান। লেন্সের প্রধান অক্ষরেখার সমান্তরালে আসা আলোকরশ্মিগুলি লেন্সের মধ্য দিয়ে প্রতিসরিত হয়ে পজিটিভ লেন্সের ক্ষেত্রে অক্ষরেখার যে বিন্দুতে মিলিত হয় অথবা নেগেটিভ লেন্সের ক্ষেত্রে রশ্মিগুলি যে বিন্দু থেকে বহির্মুখী হয় অর্থাৎ বহির্মুখী রশ্মিগুলিকে সরলরেখা বরাবর পিছিয়ে আনলে অক্ষরেখার যে বিন্দুতে মিলিত হয় তাকে প্রধান ফোকাস বলে। ফ্রেমের পরিপ্রেক্ষিতে ইমেজের আনুপাতিক আয়তন ক্যামেরা-লেন্সের ফোকাল লেংথের ওপর নির্ভরশীল ও তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ফোকাল লেংথ হলো লেন্সের কেন্দ্র বিন্দু থেকে প্রধান ফোকাসের দূরত্ব। ফোকাল লেংথের তারতম্য অনুসারে লেন্সকে তিনটে শ্রেণীতে ভাগ করা হয়— নর্মাল, ওয়াইড অ্যাঙ্গেল, টেলিফটো। নর্মাল লেন্সে গঠিত ইমেজের ফ্রেমের পরিপ্রেক্ষিতে আনুপাতিক আয়তন মানুষের স্বাভাবিক চোখ সাধারণ বস্তুকে যে রকম ভাবে দেখে সেই রকমই হয়ে থাকে। ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সে ফিল্ড অব ভিউয়ের প্রসার অনেক বেড়ে যায় কিন্তু ফ্রেমের অন্তর্গত দৃশ্যবস্তু সমূহকে তুলনামূলক ভাবে আকারে ছোট দেখায়। টেলিফটো লেন্সের ফিল্ড অব ভিউ সীমিত, কিন্তু ইমেজকে তুলনামূলক ভাবে তা বর্ধিত করে দেখায়। জুম লেন্সে এই তিন প্রকার লেন্সের সন্মিলন সুবিধাই কিছু কিছু করে সমন্বিত হয়েছে। এই লেন্স ইমেজকে ধারাবাহিক ভাবে ফোকাসে রেখে নিজের ফোকাল লেংথের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। লেন্সের জুম প্রক্রিয়ায় কটি কম্পোনেন্ট রয়েছে তার ওপর নির্ভর করে ইমেজকে স্থানান্তরিত না করে ফোকাল লেংথের কটি পরিবর্তন সম্ভব। উপরের পরিচিতি থেকে নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে যে ইন্টারটেড টেলিফটো লেন্সই আবার এক ধরনের ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স। ফোকাল লেংথ অনুসারে মুভি-ক্যামেরার লেন্স ১৮ মিমি, ২৫ মিমি, ২৮ মিমি, ৩৫ মিমি, ৪০ মিমি, ৫০ মিমি, ৭৫ মিমি, ১০০ মিমি, ১৫০ মিমি ইত্যাদি হয়ে থাকে। এর মধ্যে ৩৫, ৪০ ও ৫০-কে সাধারণত নর্মাল, ১৮ ও ২৫কে (২৮কেও) ওয়াইড অ্যাঙ্গেল, ১০০, ১৫০ ও তারও অধিককে (এমনকি ১০০০ পর্যন্ত) টেলিফটো লেন্স বলা হয়। জুম লেন্সে

১৮ থেকে এমনকি ২৫০ পর্যন্ত লেন্সের সমন্বয় ঘটে। এ গেল ইমেজের আকার। ইমেজের উজ্জ্বলতা নির্ভরশীল যে সূচকের ওপর তার নাম  $f/\text{stop}$ , লেন্সের ফোকাল লেন্থকে তার এফেক্টিভ অ্যাপারচার দিয়ে ভাগ করে এই সূচক পাওয়া যায়।  $f/\text{stop}$ -এর কয়েকটি নিয়মিত মান হলো  $f/0.7, 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 45, 64$  ইত্যাদি। কোন্ লেন্স, কেমন তার গঠন, ও কী তার কার্যকলাপ এগুলি দিয়ে তার  $f/\text{stop}$  নির্বাচন করা হয়। গঠনের দিক দিয়ে লেন্স উত্তল, অবতল, অথবা দুয়েরই এক সমন্বয় যে কোনোটি হতে পারে। ক্যামেরা-লেন্স ছাড়াও ছবি মুদ্রণের সময়ে প্রিন্টারে ও ছবি দেখানোর সময়ে প্রজেক্টরে লেন্সের দরকার হয়।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : ফটোগ্রাফিক লেন্সেস / ডি. ইভানভ, অপটিকাল লেন্সেস / ড. টি. ফ্রল।

ডবলিউ. এইচ. প্রাইস

॥ লোকেশন ॥

ছবির দৃশ্যগত সম্ভাবনার বাইরের দিকটির সাফল্য মূলত নির্ভর করে লোকেশন বাছাই ও লোকেশন ব্যবহারের উপর। আক্ষরিক অর্থে স্টুডিও-র বাইরের যে কোন গ্যাটিং প্লেনকে লোকেশন বলে। তা ইনডোর ও আউটডোর যে কোনোটি হতে পারে। মূল কাহিনীর বৈশিষ্ট্য, চরিত্র, প্রকৃতি ও প্রয়োজন অনুসারে লোকেশন বাছাই করতে হয়। লোকেশনে গিয়ে ছবি তোলায় নানা রকম প্রাকৃতিক বিঘ্ন ও অনিশ্চয়তার সম্ভাবনা থাকে বলে ও সবাক গ্যাটিং সেখানে অস্ববিধাজনক বলে সম্পন্ন দেশে ও বড় খরচের ছবিতে লোকেশনের ব্যবহার এক সময়ে খুব কমে গিয়েছিল। পরে ওয়েস্টার্ন ছবি বিভিন্ন পটভূমিকে কৃতিত্বের সঙ্গে কাজে লাগাতে শুরু করল, যুদ্ধে অধিকাংশ স্টুডিও ক্ষতিগ্রস্ত হতে লোকেশনের প্রয়োজন অনিবার্য হলো ও ইতালির নিও-রিয়ালিজম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে নতুন ধরনের কাহিনীর ক্ষেত্রে লোকেশন গ্যাটিং-এর নিয়মিত প্রচলন ঘটাল। স্টুডিও থেকে বেরিয়ে এসে ছবি তোলায় আলাদা একটা আকর্ষণ আছেই। আবার লোকেশনের প্রয়োজনে কলাকৌশলগত নানারকম উদ্ভাবনও ঘটে। লোকেশনের ব্যবহার ছবিতে বাস্তবতার নির্দিষ্ট উপস্থিতি, পটভূমি ও পরিবেশের নতুনত্ব, ল্যাণ্ডস্কেপের আবেদন ও প্যানোরামিক শটের প্রসার এবং বিবিধ সম্ভাবনার মধ্য থেকে নির্বাচনের স্বযোগ এনে দেয়। বহু ছবিতে আমরা বিচিত্র লোকেশন ও

লোকেশনের বিচিত্র ও অমোঘ ব্যবহার দেখেছি। লোকেশনের অতি কৃতিত্বপূর্ণ ব্যবহার ঘটেছিল ফোর্ডের ছবিতে। আর ছবির পর ছবিতে লোকেশন তথা প্রকৃতিকে একটা প্রধান মোটিফ করে তুলতে পেরেছেন কুরোশাওয়া। লোকেশন বাছাইয়ের সময় স্থানীয় আবহাওয়া ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের কথা খেয়াল রাখতে হয় এবং লোকেশন ব্যবহারের সময় কাহিনীকে এগুলির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। লোকেশনের সঙ্গে নিয়মিত ও সফল যোগাযোগ রাখা প্রযোজকের দায়িত্ব। কোনো কোনো শট লোকেশনের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত (ড্র. শট ও শট বিভাজন)।

॥ সোফিয়া লোরেন ॥

(জন্ম ১৯৩৪, ইতালি)। সোফিয়া জীবনে অনেক উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে এসেছেন, চলতি যৌন পত্রিকার মডেল গার্ল থেকে অসাধারণ জনপ্রিয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তারকার প্রতিষ্ঠা আর কারো জীবনে ঘটেনি। সাধারণভাবে পর্দায় তাঁর মূল ইমেজ প্লে গার্লের, স্বাভাবিকী যুবতী মনোরঞ্জনার। শরীর ও হৃদয়, উভয় দিয়ে অভিনয় করেন তিনি, নাটকীয় দাপট ও কমিক স্বতঃস্ফূর্ততা তাঁর অভিনয়ের মূল দুই স্তর। যা চমৎকার ধরা পড়েছে অ্যাটিলিা দি হুন ছবিতে অ্যান্থনি কুইনের বিপরীতে তাঁর অভিনয়ে। ইতালিতে ও হলিউডেই তিনি বেশি ছবি করেছেন, এর মধ্যে ওয়ান অব দি রিটার (৫৫), দি কী (৫৮), ছোট কাইও অব ওয়ান (৫৯), হেলার ইন পিস্কে টাইটস (৫৯), টু উইমেন (৬১), বোঙ্কাচ্চিয়ো ৭০ (৬১), ইয়েষ্টারডে টুডে টুমরো (৬৩), ম্যারেজ ইটালিয়ান স্টাইল (৬৪), এ কাউন্টেন্স ফ্রম হংকং (৬৬), সিন্দেরেলা—ইটালিয়ান স্টাইল (৬৭), সানফ্লাওয়ার (৬৯), দি প্রিন্সেস ওয়াইফ (৭০), দি ক্যান্ডানডা ক্রসিং (৭৭), অ্যাঞ্জেলা (৮৪), রানিং অ্যাগেয়ে (৮৯) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ৫৭য় লোরেন প্রযোজক কার্লো পণ্ডিকে বিয়ে করেন। সোফিয়া সন্তানের জন্ম দিতে ও তাদের প্রতিপালন করতে তীব্র আগ্রহী, তাঁকে উর্বরা নারীর প্রতীক হিসেবে নেওয়া হয়, সব অর্থেই। রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে মেডেল বেরিয়েছে তাঁকে নিয়ে, ১৯৯১ সনে তিনি সম্মানসূচক অস্কার পান ও ১৯৯৪ সনে বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসব সামগ্রিক অভিনয় কর্মের জগৎ তাঁকে সম্মানিত করে।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : Donald Zec-এর সোফিয়া ॥

॥ ফ্রিৎস ল্যাঙ্ক ॥

( ১৮৯০-১৯৭৬ ) । যদিও তিনি এবং তাঁর ছবি সাধারণত জার্মানির সঙ্গে যুক্ত, ল্যাঙ্ক আসলে একজন অস্ট্রিয়ান । আর্কিটেক্ট পিতা চেয়েছিলেন ছেলে তাঁর জীবিকায় প্রবেশ করুক । পনেরো বছর বয়সে সে এলো মাধ্যমিক স্কুলে আধুনিক বিষয় ও বিজ্ঞান পড়তে । এখানেই সে বিশেষভাবে মন দিল স্থাপত্যে । আঠারো উনিশ কুড়ি, যৌবনের এই তিনটি বছর ভিয়েনায় আকাদেমী অব গ্রাফিক আর্টস এর কারিগরি বিজ্ঞান কলেজে সে কিছু লেখাপড়া শিখল । যদিও স্থাপত্যকে তিনি জীবিকা হিসাবে রাখলেন না, তবু ঐ ক্ষেত্রের সঙ্গে তাঁর যোগ তাঁকে তৈরি করে দিল expressionism-এর জন্ম এবং এর সৃষ্টিমূলক প্রয়োগে । এটা বিশেষভাবে সত্য তাঁর নির্বাক ছবি সম্পর্কে । আরও বলা যায়, লোকজন ও তাঁর গল্পের প্রতি তাঁর ঠাণ্ডা critical বহির্মুখ দৃষ্টির অনেকখানি ট্রেনিং হয়েছে বৈজ্ঞানিক নিয়ম-শৃঙ্খলার ক্ষেত্র আর্কিটেকচারে । বাসা ছেড়ে চলে আসার পর ম্যুনিখে ল্যাঙ্ক ছবি আঁকা শিখলেন । এলেন প্যারিসে । এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়ালেন ইন্দোনেশিয়া, নর্থ আফ্রিকা, চীন, জাপান, রাশিয়া । ঘুরলেন ম্যুনিখ । আমস্টারডাম । পরের বছর গেলেন ইতালি । এক বছরের মধ্যে ফিরে এলেন প্যারিস । দেখানে গিয়ে করলেন কিছু ফ্যাশান ডিজাইন, আঁকলেন কিছু কার্টুন, কাগজের জগৎ কিছু ক্যারিকেচার, আঁকলেন কিছু ওয়াটারকালার, কিছু বেচলেন । যেহেতু অস্ট্রিয়ান, অর্থাৎ কিনা শত্রু, ফরাসি পুলিশ যুদ্ধের আরম্ভেই ল্যাঙ্ককে গ্রেপ্তার করল । ফিরে এলেন । যোগ দিলেন অস্ট্রিয়ান আর্মিতে । যখন তিনি ফ্রন্টে কাজ করছেন, লড়াইয়ে তিনি তিনবার উণ্ডত হয়েছেন । দীর্ঘদিন হাসপাতালে শুয়ে থাকা দিন-গুলোতে গল্প লিখতে শুরু করেছেন । চিত্রনাট্যের আইডিয়া এবং এমনকি মূলচিত্রনাট্য । জার্মান প্রযোজক পরিচালক Joe Mayর জন্মে দুটি মৌলিক গল্প লিখলেন । ফিল্ম হলো প্রথম মহাযুদ্ধ শেষে । ল্যাঙ্ক বার্লিনে চলে এলেন । Declay যোগ দেবেন । Declay ল্যাঙ্কের প্রথম কাজ হলো গল্প-সম্পাদক এবং রীডার, এবং তার সঙ্গে তিনি ফিল্মে কাটিংয়ের কাজও করছেন আর তাই খুব দ্রুত তাঁর উন্নতি হলো সিরিয়াল ও ঐতিহাসিক চিত্রের চিত্রনাট্য লেখকের পদে, 'Die Hochzeit in Ekzentrik Klub' যখন ভিয়েনায় এল ল্যাঙ্ক ছবিটি দেখতে এসে জীবনের প্রথম ধাক্কাটা খেলেন । চিত্রনাট্য নিয়ে তারা যা খুশি করেছে । ল্যাঙ্ক ছবি দেখতে দেখতে উঠে গেলেন । কিন্তু সেদিনই ল্যাঙ্ক একটা বড় কিছু

অনুভব করলেন। একটা নতুন মাধ্যম চিনে ফেললেন এক নিমেষে। ল্যাঙ্ক বলছেন 'আমি পরিচালনা করার কথা ভাবলাম, ডিরেক্টর হব, শুধু একটাই আশা, একটা ছবি—যা আমাকে খুশি করবে। ল্যাঙ্কের কোনটা প্রথম ছবি তা নিয়ে পরবর্তীকালে কিছু বিবোধ থেকে যায়। আনলে, ল্যাঙ্কের পরিচালক হিসেবে কেরিয়ার শুরু হয় ১৯১৯ সালে যখন পমার তাঁকে The Half-breed করতে দিয়েছেন। এই ছবির পরেই হলো The Master of Love আর দুটো পার্টে ভাগ করা এ্যাডভেঞ্চার Die Spinen. ১৯১৯এ Harakiri, ঐ বছরের শেষের দিকে তিনি কাজ আরম্ভ করলেন The Wandering Image-এর, ১৯২০তে ল্যাঙ্ক মিস থিয়া ফন হারবুকে বিবাহ করলেন। তখন থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত তিনি ল্যাঙ্কের সব কটি ছবিতে চিত্রনাট্যকার হিসেবে কাজ করেছেন। যুদ্ধ পরবর্তী স্বপ্নভঙ্গ-ফলাফল নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে নৈতিক শিথিলতায় বিরল মহরতায় পৌঁছে দিল সকলকেই। জার্মানি আরো বিবধ, মনমরা, অবনত। সে যে পরাজিত।

কিন্তু রোমান্টিক দৃষ্টি, expressionism-এ যার একটা বড়ো ভূমিকা, ল্যাঙ্কে ধরে রাখলো শূন্যতায় নিমজ্জিত হওয়া থেকে, সম্পূর্ণ নেতির বশীভূত হওয়ার বিপদ থেকে। এবং তিনি রক্ষা করলেন আদর্শবাদী ভাব ও ভাবনাসকল, যেমন বিজয়-লাভ আর তা যত্নেরই মধ্য দিয়ে অথবা ব্যক্তিমানুষের মহত্বের নিদর্শনে। যেমন যুত্, মাঝে মাঝে তেমনি ক্যান্টাসি ও নির্বন্ধক বিয়ুর্ভ বিজ্জিত তাঁর ছবিতে। ল্যাঙ্কের দার্শনিক মত কখনোই অতিপ্রাকৃতে বা ধর্মীয় বিশ্বাসে সীমাবদ্ধ একথা বলা যাবে না। পরিবর্তে, তিনি সচেতন সর্বদাই জাগতিক শক্তিতে। যা ব্যক্তি-মানুষের ক্রিয়াকর্ম কার্যকরণ প্রভাবান্বিত করে। আর তাই সমাজ মনস্তত্ত্ব আর পরিবেশ উদ্ঘাটিত হলো বস্তুবাদী এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে। 'Newspaper clippings' সংগ্রহ ও রক্ষা ল্যাঙ্কের একটি প্রিয় অভ্যাস। 'খবরের কাগজ থেকে কাজ করতে আপনি পছন্দ করেন কেন', এই প্রশ্নের উত্তরে ল্যাঙ্ক বলেছেন 'মোশন পিকচার শুধু এই শতাব্দীর শিল্প নয়, মোশন পিকচার হচ্ছে 'The art of the People for the People by the People'. কোথেকে আমরা জীবন সম্পর্কিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আহরণ করি? ল্যাঙ্ক বলেছেন, তথ্য থেকে ঘটনা থেকে। ফিকশান থেকে নয়। একজন পরিচালককে সব কিছু জানতে হবে। ল্যাঙ্ক বলেছেন, একজন পরিচালক বেঞ্চালয়ে যেমন সহজ থাকবেন, তেমনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে হবে তাঁকে stock exchange-এ। প্রথমটা খুব সরল, তারই মধ্যে দ্বিতীয়টা একটু কঠিন হলেও দু'জায়গাতে তাকে ঝাপ ঝাইয়ে নিতে হবে। ১৯২১এ

Der Mude Tod, এ পর্যন্ত ল্যাঙের শ্রেষ্ঠ ছবি। শেষ পনেরো বছর ল্যাঙ্ ছবি করেননি। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত নির্বাক চলচ্চিত্র Metropolis ( দ্র. ) ১৯২৬-৭ তোলা। ১৯৩২-এ তাঁর প্রথম টকি 'M' এখান থেকে তাঁর স্টাইলেরও একটা বড়ো রকমের পরিবর্তন ঘটে। M এবং Dr. Mabuse থেকে তিনি সামাজিক সমস্যা একেবারে ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করলেন। Mabuse-এ হিটলার—বিশ্বকে শাসন করতে চাওয়া মানুষ। ল্যাঙ্ বালিন ত্যাগ করলেন, নাৎসি বউ ছাড়লেন, এলেন হলিউড, করলেন 'Liliom', ল্যাঙের সারা জীবনের কাজের অর্ধেকের বেশি আমেরিকান ছবি। হলিউডে তাঁর প্রথম দুটি ছবি Fury (1936) ও You Only Live Once (1937)। কারো কারো মতে এই ছবি দুটোর পর থেকেই তাঁর পতন শুরু। কথাটা ঠিক নয়। ১৯৪২এ তিনি বারটোশ্ট ব্রেখ্টের 'Henker Sterben Auch' থেকে 'Hangmen also Die' করলেন। দিনেমাটিক দিক থেকে অসাধারণ তিনটি গুয়েষ্টার্ন The Return of Frank James, Western Union, Rancho Notorious—শেষটিতে মালিন ডিয়াক্রিট। দিনেমা টেকনিকের দিক থেকে ত্রিলিয়াট তিনটি ছবি—Big Heat, Scarlet Street, Human Desire. 'Le Mepris' গদারের ছবি। ল্যাঙের তখন ৭৩ বছর বয়স। গদার এদে ল্যাঙ্কে বলেছেন, 'ফ্রিৎস, আমার ছবিতে ফ্রিৎস ল্যাঙ্ নামে একজন ডিরেকটোরের একটা রোল আছে। আপনি যদি রোলটা করে দেন...'। ফ্রিৎস ল্যাঙ্ তাতে ফ্রিৎস ল্যাঙের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন; গদার করেছেন ল্যাঙের এ্যান্ডিসট্যান্ট ডিরেক্টার। এরও ১২ বছর পর ল্যাঙ্ মারা গেলেন, তাঁর তখন ৮৫ বছর বয়স।

সম্পর্কিত গ্রন্থ : P. M. Jensen-এর দি সিনেমা অব ফ্রিৎস ল্যাঙ্ ॥

প্রায় শূন্য

॥ অঁরি ল্যাংলোয়া ॥

( ১৯১৪-৭৭ )। তুরস্কে জন্ম হলেও ল্যাংলোয়া পরে ফরাসি নাগরিকত্ব নেন, যে ফ্রান্স তাঁর কাছে ছিল স্বাধীন মতবাদ ও স্বতঃস্ফূর্ত মত-বিনিময়ের দেশ। ফ্রান্সের প্রথম ফিল্ম আর্কাইভ Cercle du Cinema বা Cinematheque Francaise-র অল্পতম প্রতিষ্ঠাতা বা অধিকর্তা রূপে তিনি চিত্রবিশেষজ্ঞ, চিত্র-সংগ্রাহক ও প্রদর্শন উপদেষ্টার কাজে অনন্ত কৃতিত্বের পরিচয় দেন। সিনেমাথেকে তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়াসে, ১৮৯৬ সন থেকে তৈরি হাজার হাজার চলচ্চিত্র ছাড়াও অল্পসংখ্যক চিত্রনাট্য,

গ্রন্থ, পত্রিকা, ক্যামেরা, মডেল ও কমিউন সঞ্চিত হয়েছিল, ১৯৩৫-৫৬-তে নাৎসিদের ধ্বংসের হাত থেকে যে প্রায় পঞ্চাশ হাজার চলচ্চিত্রকে তিনি রক্ষা করেন তা এই সংগ্রহের একাংশ। তাঁর মাধ্যমেই ফরাসি দর্শকরা আমেরিকা ও ইতালির বিভিন্ন দশকের ছবি সম্পর্কে, ও স্নাইডিস বা কানাডিয়ান পরিচালকদের সাম্প্রতিক রীতি পর্যন্ত, অবহিত হন। শুধু ছবি দেখানো নয়, উপযুক্ত দর্শক তৈরি করা, চলচ্চিত্র নিয়ে লিখতে উৎসাহিত করা, এমনকি নতুন ধরনের ছবির জন্ম প্রযোজক সংগ্রহের চেষ্টা করা, তাও তিনি করেছেন। সব মিলিয়ে ফরাসি হুভেল ভাগের জন্ম ক্ষেত্র-প্রস্তুতিতে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। প্রশাসনিক হিশেবে তিনি ছিলেন রীতি-বিরোধী যা তাঁকে সিনেমাথেক থেকে বরখাস্ত করতে সরকারকে ইচ্ছন জুগিয়েছিল, অবশ্য ক্রফো স্ট্রাভল ও দেমির নেভুৎসে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের ফলে বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহত হয়। ল্যাংলোয়া সাংবাদিক রূপে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন, চলচ্চিত্র বিষয়ে তাঁর বিভিন্ন রচনা সাব্‌জেস্ট অব ল্যাংলোয়া ও ফোকাস্ অন-হাওয়ার্ড হকস-গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, মন্ট্রিলের জর্জ উইলিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি সম্মানিত অধ্যাপক রূপে কাজ করেছেন। ডে সিকা থেকে ককতো পর্যন্ত অনেকে অনেকবার চলচ্চিত্রের প্রতি তাঁর অবদানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন, এর মধ্যে ইয়োরিস ইভেনসের উক্তি যেন সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক : ল্যাংলোয়া যা করেছেন তা প্রতিদিন একটা করে ছবি তৈরির সমান। ফরাসি ও বিশ্ব চলচ্চিত্রের প্রতি তাঁর যে আবেগ ও অনুসন্ধিৎসা তা ভারতীয় ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার শিল্পকলার প্রতি কুমারস্বামীর আবেগ ও মননের তুল্য। তাঁর হাতে গড়া সিনেমাথেক আজও পৃথিবীর বৃহত্তম ফিল্ম আর্কাইভ। ( ড. ইনটারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ফিল্ম আর্কাইভস )

## ॥ শট ও শট বিভাজন ॥

সিনেমা দৃশ্যকে ছোটো ছোটো অংশ ও পর্যায়ে ভাগ করে নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ ও পরিপ্রেক্ষিত থেকে চিত্রায়িত করে। এই কাজে তাকে সাহায্য করে নানারকম শট ও শটসমূহের স্ফুটনিত সমবায় ও বিস্তার। ভাষার ক্ষেত্রে বিবিধ বর্ণের সমষ্টির সংযোগে প্রাথমিক ভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনো বাক্য গঠিত হতে পারে। বেশ কিছু সংখ্যক ফ্রেমের মিলনে গঠিত ন্যূনতম ভাবে সম্পূর্ণ দৃশ্যাংশকে তেমনি শট বলা যায়। সাধারণত কতকগুলি শট নিয়ে একটি দৃশ্য ও কয়েকটি দৃশ্য নিয়ে একটা দৃশ্যপর্যায় বা সিকোয়েন্স গড়ে ওঠে। দৃশ্যবস্তুর থেকে ক্যামেরার অহুত্মিক বা উল্লস দূরত্ব এবং

দৃশ্যবস্তুর সঙ্গে ক্যামেরার কৌণিক অবস্থান, এই দুয়ের একক ও যৌথ ভিত্তিতে শটের শ্রেণী বিভাজন করা হয়েছে, যেমন লং, মিড, ক্লোজ; হাই অ্যাঙ্গেল, লো অ্যাঙ্গেল, টপ ইত্যাদি। দৃশ্যবস্তু যদি হয় মানুষের শরীর তাহলে মাথা থেকে কোমর অবধি ক্লোজ আপ ( ড্র. ), মাথা থেকে হাঁটু বা পা পর্যন্ত মিড শট, আরো ছোটো আকারে দৃশ্যবস্তুর পূর্ণাঙ্গ ছবি ও তার সঙ্গে ফোরগ্রাউণ্ড আর ব্যাকগ্রাউণ্ডের কিছুটা করে দেখানো লং শট। আরো নির্দিষ্ট হবার জন্য বিগ ক্লোজ আপ, মিড লং শট, লং লং বা এক্সট্রিম লং শট, এই সমস্ত অতিরিক্ত ও মধ্যবর্তী ভাগও করা হয়েছে। দৃশ্যবস্তু নিচে আর ক্যামেরা উঁচুতে রেখে ছবি তোলার নাম হাই অ্যাঙ্গেল শট, ক্যামেরা যেখানে দৃশ্যবস্তুর একেবারে মাথার ওপরে থাকে তাকে টপ শট, দৃশ্যবস্তু উঁচুতে আর ক্যামেরা নিচে রেখে ছবি তোলার নাম লো অ্যাঙ্গেল শট। ক্যামেরাকে প্যান, টিপ্ট ও ট্র্যাক করা ( ড্র. ক্যামেরা মুভমেন্ট ) এবং ডলি শট ( ড্র. ) ও ক্রেন শট ( ড্র. ) ক্যামেরাদূরত্ব ও ক্যামেরাকোণের যৌথ প্রয়োগ। বিভিন্ন শট ও ক্যামেরা মুভমেন্ট একত্রে মিলে দৃশ্যকে প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট রূপ দেয়। প্যানে একই জায়গায় ক্যামেরা রেখে ক্যামেরার দৃষ্টিকে পাশাপাশি ঘোরানো যায়, টিপ্টে একই স্থানে ক্যামেরা বসিয়ে ক্যামেরার দৃষ্টিকে ঋজুভাবে ওপর-নিচ করা যায়। দৃষ্টি উর্ধ্বগামী হলে টিপ্ট আপ, নিয়গামী হলে টিপ্ট ডাউন। ট্র্যাকিং সামনে, পিছনে, পাশাপাশি, কৌণিক—নানা রকম হতে পারে।

এ হলো প্রায়ুক্তিক সংজ্ঞা। এর সঙ্গেই রয়েছে প্রতিটি শটের শৈল্পিক ব্যঞ্জনা ও প্রভাব। এই শট ব্যবহার করলে এই ব্যঞ্জনা পরিস্ফুট হয়, ওই প্রভাব সৃষ্টি হয়—এ রকম যে কোনো সাধারণীকরণের বিরোধী আমাদের এই চলচ্চিত্রের অভিধান। এই অভিধানের অসংখ্য আলোচনায় বার বার এ কথাই প্রমাণিত কোনো টেকনিকেরই স্থনির্দিষ্ট কোনো অর্থ বা তাৎপর্য নেই, তা নির্ভর করে ছবির জগতের পরিপ্রেক্ষিতে পরিচালক কোন্ টেকনিককে কীভাবে কাজে লাগাচ্ছেন তার ওপর। যে কোনো শট এ রকমই মধ্যস্থ জিনিশ, কাদের সঙ্গে তার অবস্থান, তাদের সঙ্গে তার কেমন সম্পর্ক তার উপরেই নির্ভরশীল অনেকটা। ছবির মোটিফ মনতাজ বস্তুব্য গতি আবেদন সব মিলিয়ে শট ডিভিশন কল্পা হয়। তাতে প্রতিটি একক শট একটা নির্দিষ্ট সমবায় বা বিচ্ছাসের অন্তর্গত উপাদান। ছবিতে প্রতিটি শটের অন্তত দুটি নির্দিষ্ট প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য থাকে, তার একটা দৃশ্যের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন, অন্যটা সমগ্র উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে ওই শটের ভূমিকা। প্রতিটি শটের দুই প্রকার মূল্যমানও থাকে, একটা ওই শটের একক physical value, অন্যটা

দনত্র কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে তার structural value । শট সন্বেলন মানে ইমেজ-সম্বন্ধও । তা থেকে দৃশ্যরস, দৃশ্যরস থেকে যেমন দৃশ্যচিত্রা । অর্থাৎ শট ও শট বিভাজন ক্যামেরাভাষা ও চিত্রভাষার সাথে অঙ্গাঙ্গিতাবে জড়িত ( দ্র. চলচ্চিত্রের শিল্পরূপ ) । যে কোনো শট সিনেমার শিল্পরূপের ক্রমবিকাশে তিনটে পর্যায়ের মধ্য দিয়ে গেছে— ১. যখন তা ছিল নিতান্ত এক কারিগরি কৌশল, ২. যখন তার ব্যবহারে এসেছে বিশেষ বিশেষ এক্ষেপ্ত বা গুণ, ৩. যখন তা চিত্র-ভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়ে অনেকটা বিমূর্ত চরিত্র পেয়েছে ।

লং শটে যে স্থানচেতনা ক্লোজ আপে তা স্বভাবতই নেই । ক্লোজ আপ ইমেজকে স্থান-কাল-মাত্রা থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন করে নেয় । ক্যামেরা দূরত্বের এই মাত্রাগত দিক, ক্যামেরাকোণের গুণগত দিকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন শটকে quantitative-qualitative character দিয়ে যায় । যা ক্যামেরা ভূতমণ্ডলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে চূড়ান্ত quantitative-qualitative momentum গড়ে তোলে । মিজোজুটির ছবিতে লং শট, আর বার্গম্যানের ছবিতে ক্লোজ আপ ; ওজুর ছবির দৃশ্যের গতিহীনতা, আর আইজেনস্টাইনের ছবির গতিচ্ছন্দ ; ব্রেসের নৈব্যক্তিক ক্যামেরাকোণ, আর আন্তনিওনির ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ ; জুল অ্যাণ্ড জিমে হুন্দশীল প্যানিং, আর দেবস্ব উজালায় ক্রেন শটের রাজকীয়তা ; সমস্তই শিল্পের সমৃদ্ধতম প্রকাশ ও পরিচালকের নিজস্ব জগতের মুদ্রাবিশেষ । শট ছাড়া চিত্রগ্রহণ হয় না, আর সম্পাদনা তো শট সাজানোই । পদ্ধতি সাপেক্ষ আর উপাদানের সম্পর্ক সাপেক্ষ মনতাজ শটের প্রকারভেদ, স্থায়িত্বকাল ও মুণ্ডের স্থানীয়ত্বের ওপর ভীষণ নির্ভরশীল । চলচ্চিত্রের মূল শটগুলি সর্বত্র ও সর্বদা এক, কিন্তু তাদের প্রয়োগ ও ব্যবহার ভিন্ন-ভিন্ন । তাই ছবি থেকে ছবিতে, এক যুগ থেকে অন্য যুগে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে ও পরিচালক থেকে পরিচালকে শট-কম্পোজিশনের এতখানি পরিবর্তন হয় ।

## ॥ শব্দ ও সংগীত ॥

এক সময়ে চলচ্চিত্র ছিল নির্বাক, নির্বাক যে ছবি দেখাবার সময়ে ( নির্বাক যুগের পরের দিকে ) হলে পিয়ানো, অর্গ্যান, বা কখনো কখনো অর্কেস্ট্রায় উপযুক্ত সংগীত বাজিয়ে শোনানো হত । এ ক্ষেত্রে ব্যাটলশিপ পটেমকিন ছবির জন্ত মাইজেলের আবহ সংগীতের কথা স্মরণীয় । কিছু কিছু ধরনের সাউণ্ড এক্ষেপ্তও, যেমন ছোট্ট ঘোড়ার খুরের শব্দ, সিনেমা হলের বাদকরা চিত্রপ্রদর্শনের সময়ে প্রয়োজন-মতো তৈরি করত । নির্বাক ছবিতে একেবারেই যা ছিল না তা হলো সংলাপের

উচ্চারণ। ২৭য়ে দি জ্যাজ সিদ্ধার ছবিতে প্রথম গায়ক-নায়কের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। অচিরেই সম্পূর্ণ সবাক চিত্র প্রযোজিত হতে লাগল। শব্দ সিনেমায়া বাস্তবতাবোধ বাড়ালো। আবার উৎসাহের প্রাবল্যে, নির্বাক যুগে চিত্রসম্পাদনাঃ ব্যাপারে যে সমস্ত সূক্ষ্ম আবিষ্কার হয়েছিল তার অনেকগুলো হারাল। শব্দকে তৎক্ষণাৎ ব্যবহার না করে তার তাবিক দিক নিয়ে রাশিয়ার পরিচালকরা অব্যয়ন ও গবেষণা করলেন। ইমেজ দৃশ্যগত ভাবে যা দেখাচ্ছে, শব্দ যদি ধ্বনিগত ভাবে ঠিক সেটাই প্রকাশ করে তবে শব্দ অল্পতবের ক্ষেত্রে নতুন কোনো মাত্রাই যোগ করল না। কিন্তু শব্দ বা ধ্বনি ইমেজকে আরো প্রসারিত ও গভীরতর করবে। আইভান দি টেরিবল ছবিতে Euphrosyne ক্ষোভ ও বিস্ময়ের সঙ্গে বৃদ্ধ বিশপ Pimen-এর সাদা পোশাকে আচ্ছাদিত মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে যেন স্বগতোক্তিই করে, white is the cloak, but black is the soul. শব্দের এই ব্যবহার চমকপ্রদ। অনেক চিত্রনির্মাতা আজো সংলাপের বাইরে শব্দ ও ধ্বনির অল্প সম্ভাবনা সম্পর্কে তেমন সচেতন নন। চিত্রনমালোচকেরাও অনেক সময়ে ছবিতে শব্দের ব্যবহার নিয়ে বিশেষ আলোচনা করেন না। কিন্তু শিল্প-দয়ক ছবিতে শব্দের এমন সূক্ষ্ম ও জটিল প্রয়োগ থাকতে পারে যে তা বাদ দিয়ে ছবিটির আলোচনাই সম্পূর্ণ নয়।

ছবিতে শব্দের ব্যবহার অনেক রকম হতে পারে। প্রথমত, সংলাপে অভিনেতাদের ও স্তারেশনে কমেন্টটোরের কণ্ঠস্বর। দ্বিতীয়ত, সংগীত—এর ভূমিকা দুই প্রকার হতে পারে; বাস্তববাদী—যেমন কেউ হয়তো গান গাইছে, আর ফাংশনাল—যখন সংগীত ইমেজে অতিরিক্ত কিছু আরোপ করে, মন্তব্য, অর্থের প্রসার, তাৎপর্য বা ব্যঞ্জনা। এই পর্যায়ে সংগীতের ব্যবহারকে অনেকে ইম্প্রেশেনিস্ট ও এক্সপ্রেশেনিস্ট এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। ইম্প্রেশেনিস্ট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যবহার অর্থে আর এক্সপ্রেশেনিস্ট ভাবগ্রাহ্য ব্যবহার অর্থে। তৃতীয়ত, এফেক্ট দাউও—পরিবেশ ও পটভূমি থেকে যে সমস্ত স্থানীয় ও স্বাভাবিক শব্দ উঠে আসে, এবং যেসব শব্দকে ইচ্ছাকৃতভাবে অল্প কোনোখানেও লাগানো হয়। চতুর্থত, নিঃস্বরতা যার ব্যঞ্জনা ও অমোঘতা স্থান বিশেষে অসাধারণ। এ ছাড়া, ফ্রেমের বাইরে থেকে আসা সংলাপ ও শব্দ, ফ্রেমে প্রদর্শিত হচ্ছে না এমন কোনো কিছুই শব্দের সূত্র ধরে দৃশ্যস্তর, স্বগতোক্তি, ও উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে শব্দ ও সংলাপের পুনরাবৃত্তি প্রতীতিও উল্লেখ্য।

ছবিতে সংগীতের ব্যবহারের ফাংশনাল ভূমিকা নিয়ে আর কিছু বলা দরকার।

সংগীতের এক প্রয়োগ চলচ্চিত্রের প্রকাশযোগ্যতা বাড়িয়ে দেয়, বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে, পরিচালকের অনুভূতি ও মনোভাব ব্যক্ত করে। এই সংগীত দৃশ্যের শুধুই সঙ্গী না থেকে ছবির নাটকীয় সংগঠনেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তা অনেক ভাবে সম্ভব। প্রথমত সংগীত অ্যাকশনে অতিরিক্ত মাত্রা এনে দিতে পারে। সংগীত ও অ্যাকশন এমনভাবে সংলগ্ন হয়ে যেতে পারে যে দুয়ে মিলে মুভমেন্টের এক একক ও অনবদ্য অনুভূতিই উঠে আসে। দ্বিতীয়ত স্থান ও কালের বিশেষ কোনো অনুঘটকের সঙ্গে জড়িত সংগীত, যা প্রায়ই ম্যাস ব্যাকের কাজ করতে পারে। তৃতীয়ত সংগীতের মাধ্যমে নাটকীয় টেনশনের সৃষ্টি, প্রদর্শিত দিচুয়েশন বা অ্যাকশন অপেক্ষাকৃত শান্ত রেখেও টেনশনের এই অনুভব আনা যায়। আবার খণ্ড খণ্ড তথ্যমূলক দৃশ্যকে একটি স্বরস্রুত্রে গুঁথে সরস করে তোলাও যায়। চতুর্থত মানবিক আবেগ সৃষ্টির জন্য সংগীত, রজার ম্যানভেলদের ভাষায়, *all music is either the expression or the stimulant of human emotion*, সংগীত চরিত্রের এই আবেগ এবং প্যাশন, মনন ও ব্যক্তিত্বের প্রকাশক।

### গান্স্ট রোবের্জ

[ চিদানন্দ দাশগুপ্তের ভাষায়, এমনিতে সংগীত স্বয়ংসম্পূর্ণ কিন্তু চলচ্চিত্রের সংগীত স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। চলচ্চিত্রের সঙ্গে তার মিলনে দুয়েরই সম্পূর্ণতা। বাস্তব ঘটনার স্বন্দ-সংঘাত যেহেতু চলচ্চিত্রের প্রধান উপাদান, সেহেতু পশ্চিমী সংগীতকেই অনেকে চলচ্চিত্রের উপযোগী সংগীত মনে করেন। কেননা তাতে বহু বিচিত্র স্বর ও ভাবের সংঘাত ও সমন্বয়। পশ্চিমে অপেরা ফিল্ম ও মিউজিক্যালের সমৃদ্ধি ও সাফল্যের একটা বড়ো কারণ পশ্চিমী সংগীত। এই প্রকার ছবি রূপদী বা আধুনিক অর্কেস্ট্রেশন, জ্যাজ ও অন্যান্য নানা প্রকার নব-ভরঙ্গের সংগীতশৈলী, এবং কখনো কখনো কম্পিউটার ও সিন্থেটিক সংগীতেও রচিত হয়ে থাকে। ( ড্র. অপেরা ছবি, জ্যাজ, সংগীত ও চলচ্চিত্র ) ]

প্রাদিক গ্রন্থ : R. Manvell ও J. Huntley-র দি টেকনিক অব ফিল্ম মিউজিক ॥

॥ শাবানা আজমী ॥

( জন্ম ১৯৫২ )। বাবা কায়ফি আজমী বিখ্যাত উর্দু কবি। বাড়িতে ছোটবেলা থেকেই ছিল অনুকূল সাংস্কৃতিক পরিবেশ। বোধস্বতে সম্পূর্ণ দেশীয় পদ্ধতি ও

উপকরণে নির্মিত কয়েফি ও সৌকত আজমীর বাড়ি প্রায় তিন দশক কাল ধরে শিল্পরসিকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয়। বোম্বে শহরেই শাবানার পড়াশোনা ও শিক্ষাদীক্ষা। ছাত্রাবস্থাতেই বিভিন্ন মারাঠি নাটকে অংশগ্রহণ করেন। কলেজের পর্ব শেষ করে ভর্তি হন পুণে ফিল্ম ইনস্টিটিউটে। ১৯৭১-য়ে সেখানকার শিক্ষা শেষ করে বেরোলেন শাবানা। আক্সাসের সাত হিন্দুস্থানী ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ পেলেন। কিন্তু প্রথম পরিচিতি ঘটল শ্রাম বেনেগালের অল্প ছবিতে। বোম্বে স্বপ্নকারখানার সুন্দরী অভিনেত্রীদের মধ্যে শাবানা তখন আশ্চর্য ব্যক্তিক্রম। তাঁর ভাঙা চেহারা এবং পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি লম্বা দেহ দেখে অনেক দর্শকই আহত হয়ে বলেছিলেন, শাড়ি জড়ানো লম্বা বাঁশ। অল্প ছবি তৈরি হবার সময় বেনেগালের ক্যামেরাম্যান গোবিন্দ নিহালনী গিরিশ কারনাডকে বলেছিলেন, 'Shyam's chosen a rat for the movie'. কিন্তু ১৯৭২য়ে সমস্ত বিতর্ক ভেঙে শাবানা এই ছবির জন্ম শ্রেষ্ঠ জাতীয় অভিনেত্রী নির্বাচিত হন। তারপরও এই পুরস্কার পেয়েছেন বহুবার। ৮৩তে অর্থাৎ, ৮৪তে খগুর ও ৮৫তে পার-এ পরপর পুরস্কার পেয়ে হ্যাটট্রিকও করেছেন। মৃগাল সেন বলেছেন পৃথিবীর দশজন শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর একজন শাবানা, অপর্ণার মতে শ্রেষ্ঠ পাঁচজনের একজন। আর বেনেগালের রায় : না, ভারতীয় সিনেমায় তাঁর মতো অভিনেত্রীর পূর্বসূরী নেই। তুলনা টানার জন্ম যেতে হবে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রে, ইনগ্রিড থুলিন, লিভ উলম্যান বা মেরিল স্ট্রীপের কাছে।

শাবানা তাঁর অভিনীত চরিত্রের অন্তরঙ্গকারী জিয়ারেখাটিকে উচ্চতম লক্ষ্য-বস্তুর দিকে পরিচালিত করে ( ড্র. স্মিতা পাতিল ) অভিজাত রীতিতে অভিনয় করেন। তাঁর অভিনয় অন্তর্মুখী, তাতে ব্যাপকতার চেয়ে গভীরতা বেশি, প্রবৃত্তির চেয়ে বেশি মনন-নির্ভরতা। ক্রোজ আপে তাঁর মুখাভিনয় অতি সুন্দর। বাণিজ্যিক ছবি ও সিরিয়স ফিল্ম নিয়ে প্রায় একশোটি ছবিতে ( এর মধ্যে আছে মাণ্ডি, জেনেসিস, স্বামী, অবতার, ভাবনা ) আজ পর্যন্ত অভিনয় করেছেন তিনি। সেয়া অভিনয়, তাঁর মতে, খগুরে। ভানেসী রেডগ্রেভ বা জেন ফগার মতো রাজনৈতিক আত্মগত্যা না দেখালেও শাবানা গভীর ভাবে সমাজসচেতন। ১৯৮৯-য়ে তিনি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার পুরস্কার পান। চিত্রনাট্যকার জাভেদ আখতার তাঁর স্বামী।

গোপা সেনগুপ্ত

॥ লা শিনোয়াজ্ ॥

১৯৬৭, ফ্রান্স। ষাটের দশকের এই ছবি গদারের সবচেয়ে বিতর্কমূলক অথচ তাৎপর্যমণ্ডিত ছবি। মাত্রাধিক রাজনৈতিক গুণসম্পন্ন এই ছবিতে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর নিজের অস্তিত্ববাদী সমস্য়ার এক যন্ত্রণাদায়ক দর্শন। ছবিটি এক বিপ্লবী চীনা মেয়েকে নিয়ে—কিন্তু তা হয়ে উঠেছে ছবি তৈরির পদ্ধতি সম্পর্কেই একটা ছবি। নমকালীন প্রজন্মের সংস্কৃতির কথা এনেছে এখানে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশ্লেষণে যাদের অনিশ্চয়তা ভটিলতা দ্বিধাগ্রস্ততা প্রথমেই চোখে পড়ে। ছবির পাঁচটি চরিত্র সমাজের পাঁচটি স্তরের প্রতিনিধি, তারা গোপিকর লোয়ার ডেপুটিকে মনে করিয়ে দেয়। ছবিটি অবশ্য অচিরেই আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রশ্নকে ভুলে ধরে এবং চীনদেশের বৈপ্লবিক ভাবনা ও প্রসঙ্গের ওপর জোর দেয়। চরিত্রগুলির মধ্যে ভেরোনিক নতুন ধরনের বিপ্লবে বিশ্বাসী। গুইয়োম একজন অভিনেতা ও কল্পনাবিদ্যাবাদী, এবং গোষ্ঠীর বিপ্লবাত্মক ধারণার সমর্থক। রসায়নবিদ ঝঁরি শোভনবাদী, তাদের সঙ্গে কিরিলভ বলে একজন চিত্রকর থাকেন, যিনি শেষে আত্মহত্যা করেন। এবং ইভোন গ্রাম থেকে আসা একজন কৃষককন্যা। এই পাঁচজনের মধ্যে দর্শনের ছাত্রী ভেরোনিক অত্যাচারের হারিয়ে দেয় তার বৈপ্লবিক উদ্দীপনায়, মতবাদে, এবং একাই সে এগিয়ে যায় কর্তব্যকর্মে, যেন গদারের কথাই প্রমাণ করতে যে, 'সত্যিকারের সঠিক কাজে কেউ একাকী হলেও সে একাকী নয়।' প্রকৃতপক্ষে গদার ত্রেখটীয় দর্শনকেই অনুসরণ করেন, যা বলে **realism isn't about how things are real, but about how things really are.** তাঁর ছবি এই বিষয়টার ওপরই জোর দেয়, তা সত্যকে উপস্থাপিত করার পরিবর্তে দর্শককে সত্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাঁর ছবিতে তিনি সাহসের সঙ্গে দেখিয়েছেন শোষণের জোয়াল থেকে মানুষকে মুক্তি দেবার নাম করে রাজনৈতিক নেতারা কীভাবে আসল কাজের বিরোধিতাই করে যাচ্ছেন। কমিউনিস্ট আন্দোলনের শোষণবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ার বিষয়েও তিনি ইঙ্গিত করেছেন।

স্বচ্ছ ইমেজ দিয়ে অস্পষ্ট ধারণার বিরোধিতা করো, তাঁর এই মতবাদের প্রত্যক্ষ প্রমাণ লা শিনোয়াজ্, সিচুয়েশনের প্রাণবন্ত যুক্তিযুক্ত বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে যা প্রকাশিত। থিমের সুপার-স্ট্রাকচারকে অস্বীকার করে গদার এই ছবিতে মেটেরিয়ালিজম স্ট্রাকচারালিজম ডায়ালেকটিক্স ও সেমিঅলজি-র মোজেইক

প্যাটার্নের মধ্য দিয়ে বস্তু ও প্রকৃষ্টলিকে রূপ দেন ও তাদের তাৎপর্যমণ্ডিত করে তোলেন। এই ছবিতে গদারের সূক্ষ্ম ও জটিল দ্বন্দ্বিক জগতের উপস্থাপনা। তা তাঁর রাজনীতি, বিপ্লব, দ্বন্দ্বিকতার এই বড়তুজ চিন্তাধারাকে স্পষ্ট করে তোলে যে আমাদের রাজনীতি ও সংস্কৃতির দুটি ভিন্ন স্তরে একই সঙ্গে সংগ্রাম করে যেতে হবে। আমরা তাঁর উগ্র প্রবন্ধ যা কিনা পর্দায় প্রদর্শিত হয় তার মূল্যায়নের সময় খুব কমই তার মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারি, বরং জেমস মোনাকো যেমন লিখেছিলেন, দর্শককে সচেতন করার জন্য তাঁর বিভাজিত আঙ্গিকের শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ করতে করতে আমরা নিজেরাও তাঁর মতবাদ ও জগতের সক্রিয় অংশীদার হয়ে উঠি।

অভিনয়ে Wiazemski, Leaud ; চিত্রগ্রহণ রাউল কুতার, সম্পাদনা Guillemot, Desfons ; সংগীত K-H. Stockhausen, ইন্সট্রুম্যানকালার।

প্রাথমিক রচনা : বাণীশিল্পের 'গদার' বইয়ে অন্তর্ভুক্ত গান' রোবের্জের প্রবন্ধ 'অন্ত সিনেমা : জঁ লুক গদার-এর লা শিনোয়াজ' ॥

## প্রদীপ বিশ্বাস

### ॥ বিবিধ শিল্পকলা ও চলচ্চিত্র ॥

এই অভিধানে বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমের সঙ্গে চলচ্চিত্রের সম্পর্ক, যোগাযোগ ও মিথক্রিয়া বিষয়ে বিভিন্ন আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেমন কবিতা ও চলচ্চিত্র, চিত্রকলা ও চলচ্চিত্র, নাটক ও চলচ্চিত্র, সাহিত্য ও চলচ্চিত্র, সংগীত ও চলচ্চিত্র। যে কটি শিল্পমাধ্যমের সঙ্গে চলচ্চিত্রের সম্পর্ক নিয়ে পৃথক-পৃথক আলোচনা নেই তাদের একত্রে বিবিধ শিল্পকলা নাম দিয়ে এই আলোচনার অন্তর্গত করা হলো। যেমন আদিম শিল্পকলা, স্থাপত্য, নৃত্য, আলোকচিত্র ও ভবিষ্যতের শিল্পকলা। চলচ্চিত্র একটি যৌগিক মাধ্যম। বিভিন্ন মাধ্যম থেকে কিছু কিছু করে নিয়ে সে নিজেকে গড়ে তুলেছে। এইভাবে গ্রহণের সময় সে নিয়েছে সংগীতের ছন্দ, কাব্যের লিরিক, চিত্রকলার দৃশ্যতা, আলোকচিত্রের বাস্তবতা, স্থাপত্যের গঠন, উপস্থাপনের বর্ণনা, নাটকের অভিনয়, নৃত্যের গতি।

### আদিম শিল্পকলা ও চলচ্চিত্র

আদিম শিল্পকলা বলতে শ্রীডো থিয়েটার, ম্যাজিক, প্রাগৈতিহাসিক স্থাপত্য, গুহাচিত্র, মুখোশ ইত্যাদি অনেক কিছু। বাইরে বড়ো একটা আঙন দাঁড়ানো জলছে, আর তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে গুহার ভেতর বসে আছে কিছু মানুষ, গুহার

দেওয়ালের গায়ে পুতুলের মতো ছায়াগুলোর নড়াচড়া দেখছে : এমনি করেই সিনেমাতিক একটা গুহার তুলনা দিয়ে প্লেটো তাঁর বাস্তব সম্পর্কে ধারণার কথা, অহুঙ্করণের কথা ও শিল্পতত্ত্বের কথা বলেছিলেন। প্রাচীন গ্রীসে মশালের আলোয় গুহার গায়ে বিধিত চলমান ছবি দর্শনীয় ছিল এবং দর্শনের বিষয়ও হয়েছিল। তারও আগে আফ্রিকায় অহুঙ্করণ চলমান ছায়াছবি উপজাতিদের উপভোগ ও উদ্বেজনার বিষয় ছিল। এই প্রকার অনিয়ন্ত্রিত প্রক্ষেপ-ই পরে নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মাবদ্ধ হয়ে শ্যাডো থিয়েটার বা ছায়ানাটকের রূপ পায়। ছায়ানাটক এবং চলচ্চিত্র— দুটি শিল্পরূপই আলোর উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ছুটির বিকাশের মধ্যে রয়েছে বহু শতাব্দীর ব্যবধান। জুল অ্যাণ্ড জিম এবং ব্যাটল অব আলজিয়ার্স ছবিতে যুদ্ধের দৃশ্যে আলোছায়ার যে ভূতুড়ে প্রক্ষেপ তা সিনেমার চেয়েও যেন শ্যাডো থিয়েটারের বেশি কাছাকাছি।

ছায়ানাটকে আলো ও ছায়ায় ঘনিষ্ঠে আসে যে নিবিড় মায়া, সেই মায়াবী বাস্তবতা বা বাস্তবতার বিহীন প্রসঙ্গে ম্যাজিক বা জাদুর কথা আসে। আমাদের পৌরাণিক যুগের প্রথম পর্বে পৌরাণিক দেবতাদের প্রাধান্য আর দ্বিতীয় পর্বে প্রাধান্য যাগযজ্ঞ ও তন্ত্রমন্ত্রের— পরিভাষায় একেই বলে ম্যাজিক। ফলে জাদুবিদ্যা একদিকে অতীন্দ্রিয়। অতীন্দ্রিয় জাদুর একটা ব্যবহারিক দিকও ছিল। প্রাচীন-কালে জাদুর অবস্থান ছিল জীবনধারণের বাস্তবতা ও বিমূর্ত রহস্যের মাঝামাঝি। ফলে জাদু বিজ্ঞান ও দর্শনের জন্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করছিলও বলা যায়। জাদুবিদ্যাস ছিল আদিম মানুষের বৈজ্ঞানিক প্রত্যয়ের ছদ্মনাম। জাদু ব্যবহার করে আদিম সংস্কৃতির উত্তরণ ঘটানো সম্ভব হয়েছিল। জীবন ও জগতের জাদু-রূপায়ণের ফলে কৌমমানস আর বাস্তবতা এক সম্পর্ক সূত্রে বাঁধা পড়েছিল। বার্গম্যানের দি ম্যাডিসিয়ান ছবিতে ম্যাজিকের সত্যটা তথা ম্যাজিকের রহস্যটা কোন্‌খানে এটা ধরার চেষ্টা আছে। যা বৃহত্তর মাত্রা পেয়ে শিল্পসত্য এবং শিল্পরহস্য বিষয়ে একটা ভাঙ্গ হয়ে ওঠে এবং শেষপর্যন্ত হতে পারে জীবনসত্য ও জীবনরহস্য বিষয়েই নান্দনিক ভাঙ্গ। অরণ্যচারী মানুষ যে জাদুবিদ্যাস জাদুদণ্ডে বা জাদুকরের পেটিকায় ভরা আছে বলে ভাবত, আধুনিক মানস সেই জাদুবিদ্যাস এখন বায়োস্কোপের বাস্কে কিংবা বোকা বাস্কে ভরা আছে বলে ভাবে, মারণ উচাটন স্তম্ভন বশীকরণের পরে এ এক গণসম্মোহনের পর্ব চলেছে।

প্রাচীন যে গুহার কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম ওই গুহার গায়ে আঁচড়ের আঁকিবুকিগুলো, ওই গুহার আশেপাশের খাড়া মনোলিথগুলোও প্রাচীন। গুহাচিত্র

আদিম মানুষের কাছে শিল্পপ্রতীক ছিল না, কল্পপ্রতিমা ছিল না, তা ছিল বস্তু-স্বরূপ। অনেক শতাব্দী পরে মানুষ গুহাচিত্রকে শিল্পকর্ম ভেবে আলাদা করে সমাদর করতে শিখেছে। খাড়া একশিলা স্তম্ভগুলোও তেমনি আদিম সংস্কৃতির শিল্পকলার স্তরে উঠে আসার নমুনা—প্রত্ন, রহস্যময়। সবচেয়ে প্রাচীন স্থাপত্য ছিল স্থান চিহ্নিত করার জন্য পুঁতে রাখা লম্বাটে পাথর ও সমাধিস্থলের উপরকার মাটির স্তূপ। দুটিই আবার যৌন প্রতীকও। প্রথমটি পুং জননেন্দ্রিয়ের, দ্বিতীয়টি নারীর স্তনের। আদিম স্থাপত্যে নানাভাবে যৌনচেতনার লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক মানুষের মনে যে তিনটে ধারণা ছিল সবচেয়ে ব্যাপক তা হলো জীবন, মৃত্যু ও ধর্ম। ফলে প্রাচীন স্থাপত্যের ক্ষেত্রে উপযোগ, স্মৃতিরক্ষা ও আব্যায়িকতা এই তিনটে উদ্দেশ্যের মৌলিক পার্থক্য বুঝতে হবে। প্রথমটি জীবন্ত মানুষের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত, দ্বিতীয়টি মৃত ব্যক্তির প্রতি নিবেদিত, আর তৃতীয়টির উদ্দিষ্ট অপার্থিব সত্তা বা শক্তি। তাই বাসস্থান, স্মৃতিসৌধ ও উপাসনালয়ের রূপ আর পরিবেশ কেমন হবে এই চিন্তা থেকে স্থাপত্যের জন্ম, যার অর্থ স্থাপত্যের চরিত্র বিশেষভাবেই সমাজকেন্দ্রিক। পাহাড়ঘেরা গ্রীসের কোনো এক ছোটো নগরে পাথর কেটে তৈরি মুক্তাঙ্গন বিশাল প্রেক্ষাগৃহে নাট্যপ্রযোজনা আর আধুনিক কোনো মহানগরে বিশেষ প্রযুক্তিতে তৈরি হলে আইম্যান্স ফিল্মের প্রদর্শন—এই দুইয়ের ভাবগত পার্থক্য আসলে অনেকটাই রূপগত পার্থক্যসম্ভাট।

ধর্ম পুরাণ শিল্প জাহ্নবিশ্বাস কল্পবিজ্ঞান রূপকথা মিলেমিশে আদিম মানুষের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে এক সংশ্লিষ্ট চরিত্র তৈরি করেছিল, লক্ষ্য আর লক্ষ্যক সেখানে একাকার। এর ফলে গুহাচিত্রের মতোই চলচ্চিত্রের নিহিত শিল্প-সম্ভাবনা প্রথমেই বোঝা যায় না, ক্রমে শিল্পকর্ম রূপে এর প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। আদিম মানুষদের শিকারের লক্ষ্য পশুপাখি, তাদের আরাধ্য দেবতার বাহনও অনেক সময় পশুপাখি—এভাবে পশুপাখির নকলনবিশি মানুষের সংসারে বহুকাল ধরে চলে এসেছে। আধুনিক অ্যানিমিমেটেড ফিল্মে ডোনাল্ড ডাক, মিকি মাউসরাও এসেছে এই পথ ধরে। ড্রাকুলা তৈরি করেছে হরর ফিল্ম, কল্পবিজ্ঞানের দৈত্যও হয়তো বেরিয়ে এসেছে মিথের বোতল থেকে। লুমিয়ের ভাইয়েরা গ্রিমভাইদের মতো রূপকথার অধ্যাস তৈরি করতে চেয়েছিলেন আর তার পর থেকে অধিকাংশ সিনেমায় ওই ভ্রান্ত অধ্যাদেবেরই খেলা চলেছে। আমাদের দেশের নিরন্ন নিরক্ষর অর্ধনগ্ন সিনেমা-দেখা মানুষগুলি জীবনের জ্যা টানটান করে ধরে যে ভরবেগ সঞ্চয় করেছে তার চাপেই তারা সিনেমা নামক ওই আশ্চর্য জাহ্নলোকে উৎক্ষিপ্ত। ছবির পর ছবিতে একই

তাণ্ডব ও লাশ্চ, একই প্রকার নাচ ও গান, একই রূপকথা ও লোকমান্দ তাই খুবই স্বাভাবিক । এ যেন আলজিরিয়ার আদিম গুহাচিত্রে এক স্তরের পর নানা সময়ের নানান স্তর খুঁজে পাওয়া : কবে কখন কেউ একজন ছবি এঁকে শিকার করেছিল, সেই ছবি আর কাজ দেবে না, এখন অল্প সময়ের অল্প একজন আবার সেই ছবি আঁকবে । যেমন অনেকে আলাদা আলাদা করে একই ছবি বানাবে ।

মুকাভিনয়, সম্মিলিত নাচ এবং আচারাদি মিলিয়ে আদিম মানুষদের বহু চমকপ্রদ অনুষ্ঠানের কথা আমাদের জানা আছে । এই মুকাভিনয় ও মুখাভিনয় প্রসঙ্গে মুখোশের কথাও আসে । আদিকালের সেই মুখোশ পরিশীলিত ও গ্ল্যামা-রাস রূপ পেয়ে যেন আজকের সিনেমার মেক আপ হয়ে উঠেছে । বলা হয়, একটার পর একটা মুখোশ চাপাতে অভ্যস্ত অভিনেতা-অভিনেত্রীরা যদি তাদের মুখোশগুলো পরপর অপসারণ করতে পারেন ও শেষ মুখোশটি পর্যন্ত সরানো যায়, তাহলে হয়তো দেখা যাবে মুখোশের নিচে তাদের স্তম্ভ আজ আর কোনো মুখ অবশিষ্ট নেই । সুনির্দিষ্ট পটভূমির সামনে জনৈক মডেলকে রেখে তোলা একটা ছবির কথা ভাবা যাক । এবার ছবির পটভূমি ও মডেলের পোশাক যদি সম্পূর্ণ ঢেকে দিই, মডেলের মুখের মেক আপ এত উগ্র করি যেন মুখোশ বলে মনে হয় ও মুখ থেকে পরিচিতিজ্ঞাপক উপাদানগুলি—চোখ ও চোঁট—ভুলে নিই, তবে যা পাওয়া যাবে তা হচ্ছে নারীর এক চিরকালীন নির্বিশেষ প্রতিরূপ । স্থান-কালে আবদ্ধ বাস্তবতাকে স্থান-কাল-উত্তীর্ণ চিরায়ত প্রতিক্রমে রূপান্তরিত করার এক সামান্য উদাহরণ এই ।

গুহাচিত্র থেকে চলচ্চিত্রের সময় পর্যন্ত মানুষ একটা শর্তকেই অস্তিম মূল্য দিয়ে এসেছে—চারপাশের আর দশদিকের কঠিন বাস্তবের মধ্যেও সে মুক্তির একটি পরিদর খুঁজে পেয়েছে । এই অংশের সমাপ্তিতে বলতে হয়, ভাববাদী সিনেমায় পর্দা মুখোশের মতোই ওই বাস্তবকে আড়ালে রাখে, ভাববাদী সিনেমা ক্যামেরা ও পর্দাকে ফেটিশ্-এর মতো ব্যবহার করে, চেষ্টি করে তার যান্ত্রিক প্রকৃতিকে লুকিয়ে রাখবার ।

স্থাপত্য ও চলচ্চিত্র

বিভিন্ন মাধ্যম থেকে উপাদান সংগ্রহ করার সময় চলচ্চিত্র স্থাপত্য থেকে নিয়েছে গঠন । স্থাপত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের সম্পর্কের একটা হলো বহিরঙ্গ দিক । সেক্ষেত্রে ফিল্মের সেট-সেটিং ও শিল্প নির্দেশনা স্থাপত্যের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত । ক্যাভিরিয়া বা ইনটলারেন্সের মতো ছবিতে স্থাপত্য-কলার চলচ্চিত্র সম্ভাবনার

স্বাভাবিকতাবাদী, ক্যাবিনেট অব ডক্টর ক্যালিগরি বা সানরাইজের মতো ছবিতে তার অভিব্যক্তিবাদী এবং মেট্রোপলিসে বা আন্তর্জাতিকের বহু ছবিতে তার প্রতীকী প্রকাশ ও প্রভাব সমস্তই এর অন্তর্গত। স্থাপত্য ও চলচ্চিত্রের সম্পর্কের আর একটা হলো এর অন্তরঙ্গ, সাংগঠনিক দিক। আইজেনস্টাইনই প্রথম দেখান যে সিনেমা ও স্থাপত্যের রূপতত্ত্বের মধ্যে বেশ কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। তিনি বলছেন, আধুনিক সাহিত্য রীতিতে, মঞ্চ দল্লায়, কিউবিস্ট চিত্রকলায় ও পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্রে যা ঘটছে তা আগেই আমরা জাঙ্গ সংগীতে শুনেছি। তা হলো প্রচলিত অবস্থানানুপাতের রীতি পরিত্যাগ করা, বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতের যৌথ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি-কর্মের এগিয়ে চলা। আধুনিক রীতি হলো বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের জটিল সংশ্লেষণ। এই রীতি ও গঠনরূপ বিশেষত আধুনিক স্থাপত্যের গঠনরূপ। ধ্রুপদী স্থাপত্যের সঙ্গে ধ্রুপদী সংগীতের যে সম্পর্ক, আধুনিক নগর-স্থাপত্যের সঙ্গে জাজের ও আধুনিক শিল্পকলার (চলচ্চিত্রও যার অন্তর্গত) সেই সম্পর্ক। স্থাপত্যের অভিনব বিদ্যাপ এইভাবে চলচ্চিত্রকে সাংগঠনিক ভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

### নৃত্য ও চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্র নৃত্য থেকে উপাদান হিসেবে নিয়েছে গতি ও ছন্দ। স্থাপত্য বা সংগীতের মতো নৃত্যও এক প্রৌঢ় শিল্পকলা। আদিকাল থেকেই মানুষ নৃত্যকে ব্যবহার করে খেলাধুলো বা যৌনক্রিয়ার মতো ব্যক্তিগত প্রমোদ হিসেবে, মূলত একটা সামাজিক আচার রূপে। উষরতার অন্ধতমস্যা থেকে উঠে এসেছে যে অমর উর্ধ্বর যৌনচিত্র : প্রজননের সেই বেদীতে একদিন মূল সমিধ তুলে দিয়েছিল এই নৃত্য, নৃত্যকলা, মানুষের উন্মাদনাময় ও অতি সংরক্ত এই রিচুয়াল। মেফিস্টো ছবিতে হোক্‌গেন ও জুলিয়েটের নৃত্য নির্ভর শরীরচর্চা ও তার ছন্দ থেকেই উঠে আসে ওই দৃশ্যের তীব্র বস্তুতা যা শেষ-পর্যন্ত ওই ছবির চূড়ান্ত ধীমের অগ্রতম অংশ (এবং একই সঙ্গে কারণও) হয়ে উঠে। এই নৃত্য পরে ও বাঙালির জীবনে ঘরোয়া হয়ে সংনারে স্থান পেয়েছে। আজও গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে মা ছড়া কাটেন, শিশু নাচে। ছড়ার সাথে নাচের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গি। ভারতীয় সিনেমা এখনও যতটা না চলচ্চিত্র, তার চাইতে বেশি নাচ আর গানের সমাহার। ভারতীয় নাট্যকলাতেও নৃত্যকলার স্ননির্দিষ্ট উপাদানগত ও সাংগঠনিক ভূমিকা রয়েছে। চলচ্চিত্রে ক্যামেরা মুভমেন্ট ও সামগ্রিক বিচলন দুইই বিশেষভাবে নৃত্যভাষার দ্বারা প্রভাবিত! নৃত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের এই সহাবস্থানের সাফল্য

ও সমস্তা বিশেষ করে ধরা পড়ে ব্যালে ও অপেরার চলচ্চিত্রায়ণে এবং নৃত্য ও নৃত্যশিল্পী বিষয়ক তথ্যচিত্রের ক্ষেত্রে ।

আলোকচিত্র ও চলচ্চিত্র

একদিক দিয়ে দেখলে চলচ্চিত্র হলো আলোকচিত্রের প্রসারণ । ফটোগ্রাফি থেকে মুভিফটোগ্রাফি । আলোকচিত্রের প্রায়ুক্তিক বিকাশ ও বিস্তার ঘটলো চলচ্চিত্রে । অন্তর্দিকে আলোকচিত্র থেকে মাধ্যমগত উপাদান হিসেবে চলচ্চিত্র নিল বাস্তবতা । বাস্তবতা না বলে বলা ভালো 'বাস্তবতা' । কেননা বাস্তবতা এখানে অনেকটাই তথাকথিত বাস্তবতা অর্থে ।

আলোকচিত্রের ইতিহাস দেখলে দেখা যাবে, ফটোগ্রাফির উদ্ভব হয়েছে ও ক্রমবিকাশ ঘটেছে বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে সমান্তরাল ও যথেষ্ট সদৃশ ভাবে । আলোকচিত্র তাই যে বাস্তবতার ধারক তা বহুলাংশে বুর্জোয়াশ্রেণীর বাস্তবতা সংক্রান্ত ধারণার অমুগামী ! বিশ্বজগৎ সম্পর্কে বুর্জোয়াদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো 'বাস্তববাদী', ফলে আলোকচিত্রের ইতিহাসে বিষয়, আঙ্গিক ও প্রবণতার দিক থেকে এই 'বাস্তবতা'র ছাপ পড়েছে । ফলে ফটোগ্রাফিতে যে বাস্তববাদ, তা সাধারণ বাস্তববাদ নয়, উদ্দেশ্যবদ্ধ বাস্তববাদ । আলোকচিত্র বাস্তবকে শুধুই ধারণ বা সংরক্ষণ করে রাখার বদলে বাস্তবকে নিজের মতো করে সৃষ্টি করে । বাস্তবকে ভগ্ন ও বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে প্রকাশ করে । বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত এবং প্রায়ই 'ডিস্টার্বিং' প্রকাশরূপের জন্ত আলোকচিত্র যতটা না বাস্তব তার চেয়ে বেশি অধিবাস্তবের ধারক, বাহক ও রূপকার । এ ব্যাপারে বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে তার মিল রয়েছে । বুর্জোয়াশ্রেণীও বাস্তবকে ভগ্ন, বিচ্ছিন্ন ও আরোপিত করে নিয়ে নিজের কাজে লাগায় । বুর্জোয়া সমাজ যতটা না বাস্তব তার চেয়ে বেশি অধিবাস্তবের পোষক । অধিবাস্তববাদের চালক শক্তি হলো আপেক্ষিকতা, হয়তো এই কারণেই আরো ফটোগ্রাফি ও সিনেমা আধুনিক জগতের উপযুক্ত মাধ্যম । ফটোগ্রাফি যতটা না শিল্প, তার চাইতে বেশি একটা মাধ্যম, একটা ভাষা । জনসাধারণ শিল্প বা প্রযুক্তি হিসেবে ফটোগ্রাফিকে ব্যবহার করে না, করে নৃত্য বা যৌনতার মতো ব্যক্তিগত প্রমোদ হিসেবে, একটা সামাজিক আচার রূপে । এ কথা চলচ্চিত্র সম্পর্কেও অনেকটাই সত্য । তবু চলচ্চিত্র ফটোবাস্তবের চেয়ে বেশি কিছু সৃষ্টি করে, সৃষ্টি করে তার নিজস্ব বাস্তব । চলচ্চিত্র হলো একই সঙ্গে গভীর বাস্তব ও অপার রহস্যের মাধ্যম । ফটোবাস্তবের তাৎক্ষণিকতাকে ধৈর্য, পরিশ্রম ও গঠন-কাঠামোর সাহায্যে শিল্প সত্যের চিরকালীনতা দেওয়ার ব্যাপারটি

চলচ্চিত্রের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। দিনেমা এইভাবে একই সঙ্গে সমসাময়িক ও চিরকালীন।

ভাবীকালের শিল্পকলা ও চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ

কমপিউটার আর্ট, ডিজিটাল টেকনোলজি ও সাইবারনেটিক্সের মতো প্রযুক্তির প্রভাবে ও প্রকোপে ভবিষ্যতের চলচ্চিত্র হয়তো যতটা না শিল্প বা নন্দননির্ভর তার চাইতে ঢের বেশি হবে প্রযুক্তিপ্রসূত। ই. টি. স্টার ওয়ারস ও বিশেষত জুরাদিক পার্কের মতো ছবি সেই পথে বিরাট পদক্ষেপ। জুরাসিক পার্ক তো যতখানি সিনেমা তার চেয়ে বেশি ম্যাজিক। ভবিষ্যতের আলোচক হয়তো বলবে যে ফটোগ্রাফি একটি আদিম শিল্পকলা এবং কমপিউটার থেকে আধুনিক চলচ্চিত্রের জন্ম হয়েছে। চলচ্চিত্রের শিল্প পরিধি এর ফলে বাড়তে শুরু করবে না যন্ত্রপ্রযুক্তি তাকে আত্মসাৎ করে নেবে তা এখনই বলা যাচ্ছে না। মুকাভিনয়, সম্মিলিত নাচ, জাদুবিদ্যা, রঙিন আলোকসম্পাত ও চলচ্চিত্রকে একসঙ্গে মিশিয়ে সংশ্লিষ্ট শিল্পের এক চমকপ্রদ ও অবিস্মায় রূপের কথা আমরা ইতোমধ্যেই জেনেছি। ভবিষ্যতে হয়তো চলচ্চিত্র শিল্পসহ সমস্ত শিল্পকলাই পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে যাবে, তার স্থান নেবে স্পোর্টস, সেক্স ও ম্যাজিকের মতো কিছু রিচুয়াল। অথবা প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের ক্রমাগত সাহায্য নিয়ে আরো আরো দম্ভ ও অধিকারী হয়ে চলচ্চিত্র তার আওতা অধিকাংশ শিল্পকলাকে নিয়ে আসবে। যেটাই ঘটুক না কেন, জন্মের একশো বছরের মধ্যেই চলচ্চিত্র আজ এক সঙ্কীর্ণে এসে দাঁড়িয়েছে।

**ধীমান দাশগুপ্ত, বীতশোক ভট্টাচার্য**

॥ শিল্প নির্দেশনা ॥

শিল্প নির্দেশনা ছবির ইনডোর ও আউটডোর উভয় স্থানের সেট, ডেকর, মডেল, পোশাক পরিচ্ছদ, সাজসজ্জা, কেশবিদ্যা ও যাবতীয় আনুষঙ্গিক বিষয় ও দ্রব্যাদির প্রতিটি পর্যায়েই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই কাজের মধ্যে পড়ে প্রথমত সেটের নকশাঙ্কন ও সেট নির্মাণ এবং দ্বিতীয়ত সেই নির্মিত সেটের ড্রেসিং। প্রাথমিক ভাবে সেট হলো এমন ভাবে পটভূমি নির্মাণ যাতে তা পরিচালকের প্রয়োজন ও দৃশ্যের দাবি বিশেষ ভাবে যেটাতে পারে এবং আলোকসম্পাত, ক্যামেরার গতি ও অভিনেতা-দের চলাফেরায় বাধা সৃষ্টি না করে। ছবির দৃশ্যগুণের অনেকটাই শিল্প নির্দেশকের ওপর নির্ভরশীল। পরিচালক ও শিল্প নির্দেশকের পারস্পরিক সম্পর্ক একই সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ও সৃষ্টিশীল। পরিচালকের ভাবনানুযায়ী নির্দিষ্ট বাজেটের মধ্যে সেট

ও ডেকরের কাজ যথা সম্ভব ভালো ভাবে তৈরি করে দেওয়াই শিল্প নির্দেশকের কাজ। যা তাঁর ব্যবহৃত উপকরণ, বিনিয়োগ ও প্রয়োগ কৌশলের ওপর নির্ভর করে। মডেলের ক্ষেত্রে ১০০' X ২০' X ১০' মাপের জটিল ও যান্ত্রিক মডেল থেকে ১৬" X ১/৪" X ১/৪" মাপের মিনিয়চার মডেল পর্যন্ত যা ইচ্ছে হতে পারে। শিল্প নির্দেশনার খাতে কোনো কোনো বিদেশি ছবিতে ২০ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত ব্যয়িত হয়েছে। প্রকৃত ঘটনা অস্থায়ী পারিপার্শ্বিকের বিশ্বস্ত অবতারণায় প্রয়োজকরা এখন অপরিমিত অর্থলগ্নী করে থাকেন। ইউ ওনলি লিডটোয়াইন ছবিতে যুক্তজাপানি আগ্নেয়গিরি ( মাউন্ট শিমোয়ি ) এলাকা হুবহু পুনর্নির্মাণে ব্যবহার করতে হয়েছিল ২০০ নাইল দৈর্ঘ্যের টিউবলার স্টীল, ৭০০ টনের বেশি স্ট্রাকচারাল স্টীল, ২০০ টন প্লাস্টার, ৫০ হাজার টিউবলার কাপলিং, ৮ হাজার রেলওয়ে টাই, ২৫ লক্ষ গজ ক্যানভাস। শিল্প নির্দেশকের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, চিত্রশিল্প ও গ্রাফিক কলা, এবং পোশাক পরিচ্ছদ ও মেকআপের বিষয়ে-কর্মদক্ষতা ও জ্ঞান, আর চিত্রগ্রহণ ও আলোকসম্পাত সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। শুধু দৃশ্যগুণ নয়, ছবির মেজাজ ও অ্যাট্রিমস্ফিয়ারও অনেকটা এনে দেন তিনি। ফলে ফিল্ম সেন্স সম্বন্ধেও তাঁর সম্যক চেতনা থাকা দরকার। একই সঙ্গে শৈল্পিক, কারিগরি ও অর্থগত, তিনটি বিবেচনা মনে রেখে কাজ করতে হয় তাঁকে। সব মিলিয়ে তাঁর দায়িত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু স্বীকৃতি সাধারণভাবে কম। শিল্প নির্দেশনা ছবির সাথে কী রকম অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত গ্রিফিং বুঝেছিলেন। আর স্কেচ ও ড্রইংয়ের মাধ্যমে প্রতিটি পেটের, প্রতিটি চরিত্রের অগ্রিম পরিকল্পনা করে নিয়ে আইজেনস্টাইন তাকে শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছে দেন। সিনেমার গ্যাটিং-পূর্ব পর্যায়ে চিত্রনাট্যকারের সঙ্গে যেমন তেমনি শিল্প নির্দেশকের সঙ্গে পরিচালকের যোগাযোগের ব্যাপারটা জরুরি (ড্র. ফেলিনি)। সিনেমার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য শিল্প নির্দেশকদের মধ্যে রয়েছেন গিয়ভান্নি পাসত্রোনে, ফ্রাঙ্ক রটম্যান, রবার্ট হাস দাভানজাতি, মিরশ, A. Andrejew, R. Day, C. Gibbons, A. Junge, B. Leven, E. Stern, L. Meerson, W. C. Menzies, W. Rohrig, A. Trauner, H. Warm, P. Gherardi, C. Berard, B. Evein, K. Adam, R. Macdonald, C. Dillon, বংশী চন্দ্রগুপ্ত ও আরো কেউ কেউ। শিল্প নির্দেশক তাঁর নিজের জগতে যত খ্যাতিমান ও প্রতিভাবানই হোন না কেন, ছবিতে কাজ করার সময়ে তিনি সাধারণত পরিচালকের নির্দেশ ও পরামর্শ মতোই কাজ করেন। চিত্রনির্মাণ একটি যৌথ কর্ম এবং সব মিলিয়ে শিল্প নির্দেশনাতেই বোধহয় এই যৌথ কর্মের সবচেয়ে

বেশি পরিচয় মেলে। পরিচয়লিপি লিখনের কাজ শিল্প নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত কিনা এ-বিষয়ে দ্বিমত আছে।

॥ শিশুদের জন্ম ছবি ॥

শিশুদের জন্ম ছবি বড়োদের জন্ম ছবির মতো সমান যত্ন ও শিল্পবোধ নিয়ে করা দরকার, বরং তা আরো ভালো হওয়া দরকার। শিশুদের জন্ম যে ছবি তার কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন, কিন্তু তা স্বীয়, সমস্যা ও শিল্পরূপের সরলীকরণ করে নয়। শিশুদের কাছ থেকে জীবনের সমস্যা ও সংঘাতগুলোকে লুকিয়ে রাখার কোনো মানে হয় না। বরং তারা যাতে নিজেদের ঠিক ভাবে তৈরি করে নিতে পারে ভবিষ্যতের সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার জন্ম সেটাই জরুরি। দিনেমার এই বিষয়ে নির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। শিশুদের ছবি এখন আর শুধু শিশু-চরিত্র নিয়ে নয়, যে কোনো চরিত্র ও যে কোনো বিষয় নিয়ে, তবে অবশ্যই শিশুদের অনুভূতির সঙ্গে তাল রেখে। এটা খুব সহজ নয়। তাদের জন্ম কাজ করার সময়ে নিজেদের বেশি বুদ্ধিমান ভাবলে চলে না, কেননা তাদের অনুভবের ক্ষমতা বয়স্কদের চেয়ে একটুও কম নয়, বুদ্ধিও কম নয়, শুধু অভিজ্ঞতারই অভাব। ইয়া, শিশু দর্শকরা তাদের জন্ম তৈরি ছবির কাছ থেকে সচেতন ভাবে প্রত্যাশা করে জীবনের প্রতি আগ্রহ, অ্যাকশন, দৃষ্টির বৈচিত্র্য, অপহৃদ করে বক্তৃতা দেবার ভঙ্গি, আর তাদের প্রয়োজন ঘটনা ও চরিত্রের প্রতি সঠিক নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি।

সার্থক শিশুচিত্রের পরিচালক অবশ্যই শৈশব ও শিশুদের সঠিক বোদ্ধা হবেন। এটা একটা বিশেষ গুণ। জীবনের বিবিধ প্রতীতিকে অতি-সরলীকৃত না করে শিশুদের উপযোগী করে তুলতে হবে তাঁকে, কিন্তু তা নীতিবাদী সুরে নয়, খুব উঁচু দরের শিক্ষকের মতো, তাঁর কাজ হলো এমনকি সবচেয়ে প্রমোদমূলক ও মজাদার কাহিনীকেও বিষয়-সমৃদ্ধি দেওয়া, অতিরিক্ত রসিকতা না করা, যে আদর্শ দেশের, জীবনের, বড়োদের প্রথম থেকেই শিশুদের তার অংশীদার করে তোলা। শিশুচিত্রে শিশুদের প্রয়োজন শুধু তাদের সমবয়সী নায়ক নয়, বয়স্ক নায়কও; সুপরিকল্পিত আদর্শবাদী নায়ক নয়, বরং এমন এক জীবন্ত চরিত্র যাকে তারা নিজেদের বলে গ্রহণ করতে পারে। কোনো শক্তির অতিমানব নয়, কিন্তু এমন এক বিখন্ত চরিত্র যার উদ্দেশ্যের নিঃস্বার্থ বিশ্বস্ততার তারা বিশ্বাস রাখতে পারে।

শিশুচিত্র বহু ধরনের হতে পারে : অ্যানিমেটেড, তথ্যচিত্র, শিক্ষামূলক ও কাহিনীচিত্র। কাহিনীচিত্রও হতে পারে নানান ধরনের : রূপকথা ও প্রতি দিনের

গল্প ; ক্লাসিক, কমেডি ও ট্রাজেডি ; সমসাময়িক, আলোচনামূলক ও মনস্তাত্ত্বিক ; মিউজিক্যাল, ডিটেকটিভ, অ্যাডভেঞ্চার ; সায়েন্স ফিকশন, স্টাটায়ার ও জীবনী-চিত্র । শিশুচিত্রের পরিচালকদের শিশু অভিনেতাদের নিয়ে কাজ করার দক্ষতাও থাকার দরকার । আর থাকার দরকার তাঁর ছবি সম্পর্কে শিশু দর্শকরা কী বলছে তা বুঝে ওঠার ও মেনে নেবার ক্ষমতা । ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে বড়োদের ছবির অত্যধিক হিংসা, যৌনতা ও মূল্যবোধের অভাব শিশুদের ওপর দারুণ প্রভাব ফ্যালে । কিন্তু তাদের তো শেখানো উচিত জীবন ও জগৎ থেকে সবচেয়ে ভালো কী কী তারা নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করতে পারে সেটা । এই অবস্থায় বাবা-মার করণীয় হলো যে-সমস্ত ছবিতে শিশুচিত্রের পক্ষে সদর্শক ও প্রয়োজনীয় গুণগুলি রয়েছে শিশুদের তা দেখানোর ব্যবস্থা করা, যে-সমস্ত ছবি শিশুমনের পরিপ্রেক্ষিতে কাম্য নয়, সেগুলি তাদের দেখতে নিষেধ করা এবং দরকার হলে কেন এই ছবি-গুলি তাদের পক্ষে অল্পপুঙ্ক তা নিয়ে শিশুদের সঙ্গে খোলামনে কথা বলা, আর দৃষ্ট ছবিগুলি নিয়ে তাদের সঙ্গে নানাদিক থেকে আলোচনা করা । শিশুচিত্র ( অ্যানিমেটেড, তথ্যচিত্র, শিক্ষামূলক ও কাহিনী-চিত্র সব মিলিয়ে ) দেশের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক জীবনেরই এক গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ ।

### গ্রিগরি ব্রিভিকভ

[ শিল্পীর ব্যক্তিত্ব, তাঁর শিল্পলোক, চিন্তাভাবনা ও আধুনিক শিশু জগৎ সম্বন্ধে ধারণা শিশুচিত্রের রূপারোপকে প্রভাবিত করে । শিশুচিত্রের মূল আদর্শ ও উদ্দেশ্য অব্যাহত রেখে এখন নতুন ধরনের প্লট, নতুন ধরনের চরিত্র, ও নতুন ধরনের আঙ্গিকের উপস্থাপনা দেখা যাচ্ছে । শিশুর বোধ বৃদ্ধি মনন ও ব্যক্তিত্বের ক্রম-বিকাশে শিশুচিত্র তার কলে আরো সহায়ক হয়ে উঠছে । ]

### ॥ চলচ্চিত্রে শেক্সপিয়ার ॥

শেক্সপিয়ারের তেত্রিশটি নাটকের প্রায় সব কটিই কখনো না কখনো শাদামাঠা রূপায়ণে বা দূরপ্রসারী ব্যঞ্জনায়ে চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে । স্বদূর ১৮৯৯ থেকেই তাঁর নাটকের চিত্ররূপ দেওয়া শুরু হয় । আমেরিকায় দেশের দশকে এক রীলের এই রকম বহু চিত্র মুক্তি পেয়েছে । নির্বাক যুগে শেক্সপিয়ারের নাটক নিয়ে বিভিন্ন দেশে প্রায় চারশো ছবি তৈরি হয়েছিল । এইসব নাটকে ভাষা ও কবিতার যে আশ্চর্য ও মহৎ সমৃদ্ধি, নির্বাক যুগের ছবি বলে ওই চারশোর কোনোটিতেই তার কোনো প্রমাণ ছিল না । এরই মধ্যে মারিও ক্যাসারিনির রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট

( ১৯০৮ ) উল্লেখযোগ্য । সবাক যুগের প্রারম্ভে জাম বাটলারের দি টেমিং অব দি শ্র ( ২৯ ), Reinhardt-র এ মিডসামার নাইট'স ড্রীম ( ৩৫ ), জর্জ হুন্সলেম রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট ( ৩৬ ) গুরুত্বপূর্ণ । পরবর্তীকালের প্রযোজনার মধ্যে হাউসম্যানের জুলিয়াস সীজার, পিটার ব্রকের কিং লীয়ার, অরসন ওয়েন্সেল ওথেলো ও ম্যাকবেথ এবং শেক্সপিয়রের বিভিন্ন নাটক থেকে কিছু কিছু উপাদান নিয়ে Chimes at Midnight ( ৩৬ ), টনি রিচার্ডসনের হ্যামলেট, জেফেরেঞ্জির টেমিং অব দি শ্র, রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট ও হ্যামলেট, পোলানস্কির ম্যাকবেথ, প্রভৃতির নাম বিভিন্ন কারণে করা হয়ে থাকে । শেক্সপিয়রের চলচ্চিত্রায়ণে লরেন্স অলিভিয়ার-এর বিশেষ ভূমিকা আছে, তিনি অভিনয় করেছেন ও পরিচালনা দিয়েছেন রিচার্ড ৩, ওথেলো, হ্যামলেট ও হেনরী ৫ ছবিতে এবং শুধু অভিনয় করেছেন অ্যাজ ইউ লাইক ইট-য়ে । মেক্সিকো থেকে হংকং পর্যন্ত, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই শেক্সপিয়র চলচ্চিত্রায়িত হয়েছেন । কিন্তু জার্মান ও রুশরা যে ভাবে তাঁকে গ্রহণ করতে পেরেছেন তেমন আর কেউ না । তাঁর ধ্রুপদী আভিজাত্য, ভাষার আশ্চর্যতা ও নাট্যকল্পনার অনন্ততা বিশেষত কোজিনুংসেভ-য়ের হ্যামলেট ( দ্র. ) ও কিং লীয়ার-য়ে অনবগত রূপ পেয়েছে । শেক্সপিয়রের ট্র্যাজেডিগুলির মধ্যে যে কিং লীয়ারকে সবচেয়ে আধিবিগত বলা হয় তার ধ্রুপদী সারল্য ও সৃষ্টাতীক্ষ তীব্রতা পাস্তেরনাকের রুশ অনুবাদ অবলম্বনে কোজিনুংসেভের এই ছবিতে গ্রানাইট পাথর কেটে বানানো জাত ভাস্কর্যের রূপ পেয়েছে । এই প্রসঙ্গে আর একটি রুশ চিত্র ওথেলোর কথাও বলা যায় । মূল কাহিনীর শেক্সপিয়রত্ব বজায় রেখে তাকে চলচ্চিত্র হিশেবেও সার্থক করে তোলায় রুশরা অপ্রতিদ্বন্দ্বী ।

তাঁর মূল ভাবনাকে বহুবার নতুন ভাবে ঢেলে সাজানোও হয়েছে চলচ্চিত্রে । যে প্রসঙ্গে ম্যাকবেথ অবলম্বনে কুরোশাওয়ার নিজস্ব ভাষায় দি থ্রোন অব ব্লাড সর্বাঙ্গ্রে উল্লেখযোগ্য । উল্লেখ করতে হয় কিং লীয়ার অবলম্বনে তোলা তাঁর রয়ান ছবির কথাও । ম্যারোউইটজ যেমন বিভিন্ন নাটক ও নাটকস্থ ঘটনাগুলি-ই ওলোট পালোট করে নিয়েছেন । অলিভিয়ার আবার তৃতীয় রিচার্ডের রাজত্বে পদার্পণ করেছেন ধবল টাই পরে । শেক্সপিয়রের কবিত্ব, তাঁর মনস্তত্ত্ব, তাঁর অলংকৃত বাগ্মিত্য চ্যাপলিন আশ্চর্য রকম নিরুৎসাহ বোধ করেছেন, আর তাঁর নাটক থেকে উদাহরণ আইজেনস্টাইন নিজের রচনায় ব্যবহার করেছেন এত কম । তাঁর কাহিনীভিত্তিক মঞ্চনাট্যের, মঞ্চনৃত্যের ও অপেরার প্রত্যক্ষ (recorded) চলচ্চিত্র

রূপও পাওয়া গেছে যথেষ্ট। অস্বাভাবিক ছবিতে তাঁর নাটকের দৃশ্যাংশও প্রযুক্ত ও ব্যবহৃত হয়েছে অসংখ্যবার। যেমন আবার মেফিস্টো ছবিতে হ্যামলেটের দৃশ্য-বিশেষ থেকে বাংলা সপ্তপদী ছবিতে গুথেলোর দৃশ্যাংশ পর্যন্ত বহু উদাহরণ দেওয়া যায়।

[ট্র্যাজিক সংবিৎ মানুষকে পরিশুদ্ধ করে, শেক্সপিয়ার দেখলে একথা বোঝা যায়। একটা এপিক স্কেলের ব্যাপার আছে সেখানে, প্রাণের বিশাল প্রাচুর্যের সঙ্গে শেক্সপিয়ার মেলেন। শেক্সপিয়ারে জীবন এবং শিল্পের অবিরল স্থান-বিনিময় আছে, এবং এই তৃতীয় মাত্রাই তাঁর বহু নাটককে রসোত্তীর্ণ ও কালোত্তীর্ণ করে তুলেছে—ব. ভ.]

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : রজার ম্যানভেলের শেক্সপিয়ার অ্যাণ্ড দি ফিল্ম ॥

## ॥ ক্লোদ শত্রল ॥

জন্ম ১৯৩০, ফ্রান্স। নবতরঙ্গ গোষ্ঠীর এক শক্তিমান সদস্য শত্রল পঞ্চাশের দশকের শেষভাগ থেকে কাহিনীচিত্র পরিচালনা করা শুরু করেন, কিন্তু প্রথম সাত আট বছর তিনি বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ঘুরে বেড়ান কিছুটা লক্ষ্যহীনভাবে। এই পর্যায়ের *Les Cousins* (৫৯), *বেলমনদো অভিনীত এ ডাবল ট্যুর* (৫৯) উল্লেখযোগ্য। জর্জ মেলী লক্ষ্য করেছিলেন যে ‘শত্রলের শক্তির উৎস হলো তাঁর গল্প নির্বাচনের দক্ষতা। নাট্যরসের প্রাচুর্য থাকলেও এই গল্পগুলি ভেতরে ভেতরে পচনশীল এক সমাজের প্রতিচ্ছবি যদিও এই সমাজ সত্যতা এবং নৈতিকতার প্রাচীন ধারণাগুলিকে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করে চলেছে।’ যে দ্রুততার সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে শত্রল ছবি তৈরি করেছেন সেটাই হলো ‘*nouvelle vague*’-এর ক্ষেত্রে তাঁর একক অবদানের স্মৃতিস্তম্ভ প্রমাণ। ১৯৬৭ সালের মধ্যে তিনি দশটিরও বেশি ছবি তৈরি করেছেন। পরবর্তী পাঁচ বছরে তিনি আরো বেশ কয়েকটি ছবির কাজ শেষ করেন যেগুলির গঠনভঙ্গিমায়, বিষয়নির্বাচনে এবং দৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন ১৯৬৮ সালে *Les Biches* ছবি দিয়ে শুরু করে প্রায় একই ধর্ম নিয়ে সামান্য অদল-বদল করে পরপর কয়েকটি ছবি। ‘ছবির চরিত্র স্বামী, স্ত্রী ও একজন তৃতীয় ব্যক্তি। ছবির বিষয়-বস্তু : প্রেম ও সন্দেহ।’ এই ছবিগুলিই তাঁকে বিশিষ্ট পরিচালক করে তোলে। সমালোচকের চোখে শত্রল একজন গোলমলে পরিচালক। এজন্য তাঁকে ক্রমাগত গদার কিংবা রোহ্মেরের থেকে সহজেই আলাদা করা সম্ভব। অস্বাভাবিক ‘নতুন

তরঙ্গের শ্রমেরা স্পষ্টভাবেই শিল্পসচেতন এবং তাদের ছবিগুলি সর্বদাই ভাষা ব্যঞ্জনার নিরিখে আলোচিত হয়ে থাকে। অপরপক্ষে, শ্রাবলের ছবিতে আমরা পাই সাবলীল আবেগ এবং উত্তেজক দৃশ্যের উপস্থিতি। বিভিন্ন অনুষদের অতিক্রম এবং সৃষ্টি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য থেকে তিনি কখনোই সরে আসেননি। তাই ১৯৬৮ সালের পরবর্তী সময়ে নির্মিত তাঁর ছবিগুলিতে বিধৃত হয়েছে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এবং অসুস্থ দাম্পত্যজীবন থেকে সৃষ্ট অপরাধের প্রকৃতি। ‘La Femme Infidele’ ছবিতে একটি যুগের গল্পের আপাত সরলতার আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে স্বামী ও স্ত্রীর আবেগ ও দাম্পত্যের উত্তেজনাময় সমস্তা। পুলিশী-তত্ত্বের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তারা এক অত্যাচার্য একতার ভান করল। ছবিটি মূলত একটি প্রেমেরই উপাখ্যান কিন্তু ভাবাবেগের প্রকাশকে সুন্দরভাবে সংযত রাখা হয়েছে। শ্রাবলের ‘সহানুভূতি উদ্বেককারী ছবিগুলির’ মধ্যে অগতম হলো ‘Le Boucher’ (70) যেখানে একটি গ্রামের আবদ্ধ পরিসরে ক্যামেরা ঘুরে ঘুরে কয়েকটি ব্যক্তি-সম্পর্ক উদ্ঘাটনে নিয়োজিত। এক মনোরমা শিক্ষিকার প্রতি প্রেম নিবেদনে ব্যর্থ হয়ে একটি লোক মনোবিকারগ্রস্ত হত্যাকারীতে পরিণত হলো—এই নিয়েই গল্পের অবতারণা। শ্রাবলের ছবির সমস্ত অপরাধীদের মতোই এই লোকটি দর্শক-মণ্ডলীর মমতাম্বলে বঞ্চিত হয় না। তার জিয়াকলাপ এক ব্যাপকতর সামাজিক অপরাধের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। রোমাঞ্চ-কাহিনীর আঙ্গিকের বিশুদ্ধতার প্রতি শ্রাবলের আগ্রহ এই ছবিটিতে প্রকাশ পেয়েছে। হিচককের প্রতি এক বিশেষ ঋণের কথা তিনি স্বীকার করতে ভোলেননি কিন্তু এক গুরুত্বপূর্ণ বৈপরীত্যও তাঁদের মধ্যে বর্তমান। হিচককের ছবিতে অপরাধী এবং অনুসরণকারীর মধ্যে পারস্পরিক জিয়াকলাপকে কেন্দ্র করেই উত্তেজনার জাল বোনা হয়। শ্রাবলের ক্ষেত্রে প্রায়ই এই পদ্ধতিতে উত্তেজনাকে ঘনিষ্ঠে তোলা হয় না। ‘La Rupture’ ছবিটিতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের প্রতি উভয়ের অপরাধের প্রকাশ ও কারণ, ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পরিবর্তে পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ টেনে আনে। শ্রাবলের মুষ্টিমেয় কয়েকটি ছবির মতো এখানে বিচিত্র ডিটেলগুলো ছবির কেন্দ্রীয় ঘটনার সঙ্গে পুরোপুরি সম্পৃক্ত হয়নি। বিশিষ্ট শ্রাবলমার্কা জিভুজ প্রেমের প্রকাশ আবার আমরা পাই ‘Les Noces Rouges’ ছবিটিতে। এমনকি Helene এবং Paul নামগুলিও বেশ পরিচিত বলে মনে হয়। এটাই তাঁর প্রথম ছবি যেখানে রাজনীতির একটি ভূমিকা রয়েছে। এছাড়া শ্রাবলের ছবির মূল উপাদান যেমন ছোট নির্জন প্রাদেশিক শহর, খাবার সময়ের তর্ক-বিতর্ক, অন্তর্লীন হাস্যরস, কামজ অপরাধ,

হত্যাকারীদের প্রতি মহানুভূতি এবং শ্লেষাত্মক সমাপ্তি—এ সবই ছবিটিতে ছড়িয়ে রয়েছে : এগুলি যথেষ্ট উপভোগ্যতার আমেজ এনেছে এবং শ্রাবলকেও মাধ্যমটিকে উপভোগ করার সুযোগ দিয়েছে। ‘Innocents with Dirty Hands’—শোভন জীবন-যাপনের সঙ্গে কুৎসিত কামনা-বাসনার সংঘাত তুলে ধরেছে। রহস্য-রোমাঞ্চ গল্পের বৈশিষ্ট্যই হলো জটিল ও ভ্রান্তিমূলক পরিস্থিতির উদ্ভাবনা যা প্রায়ই কাহিনীবিশ্বাসের যৌক্তিকতাকে অস্বীকার করে, আলোচ্য ছবিটি যেন এই মানদণ্ডও অতিক্রম করে যায়। এখানে চাতুরী, গোপনতা এবং মিথ্যা কথনের এমনই এক ঠান্ডাবুনট জ্বল রয়েছে যে কোনো কিছুই আগে থাকতে অনুমান করা দুঃস্বপ্ন। শ্রাবলকে বলা হয়েছে পরিশীলিত থ্রিলারের (যেমন ড. এম. ছবিতে বালিনে রাসায়নিক দুর্ঘটনার পর যে মরণাস্তক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তা থেকে পলায়নের জন্য নগরবাসীদের মর্মান্তিক চেষ্টা) জাত শ্রষ্টা, কিন্তু কোনো কোনো ছবিতে অপরাধ রহস্য ও তার সমাধানে তিনি দর্শককে উত্তেজনার এত কম খোরাক দেন যা তাঁর প্রিয় শিল্পী হিচকক কোনোদিনই করেননি। তাঁর ছবিতে ক্রমেই এক ধরনের নিম্নসিদ্ধান্ত এসেছে। তাঁর শৈলীও ক্রমেই হয়ে উঠেছে সরল ও শান্ত। এখন তাঁকে হিচককের চেয়ে যেন বেশিই বেশি নিকটবর্তী মনে হয়। যদিও ৮৪ থেকে ৮৭-র মধ্যে তিনি আবার হিচকক ঘরানায় ফিরে গেছিলেন।

অস্ফাল্ট ছবি : নাদা ( ৭৪ ), ম্যাজিসিয়ানস ( ৭৫ ), দি টুইস্ট ( ৭৬ ), দি ব্রাড অব আদার্স ( ৮৪ ), স্টোরি অব উইমেন ( ৮৮ ), কোয়াএট ডেজ ( ৯০ )।

প্রাদক্ষিক গ্রন্থ : রবিন উড ও মাইকেল ওয়াকার-এর ক্লোড শ্রাবল ॥

## ॥ জন শ্লেসিংগার ॥

( জন্ম ১৯২৬, ইংলণ্ড )। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আধা সামরিক দায়িত্ব পালনের পর শ্লেসিংগার মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের অভিনেতা হিসেবে তাঁর শিল্পজীবন শুরু করেন ও তারপর বিবিদি-টিভিতে চিত্রপরিচালক রূপে যোগ দেন। লণ্ডনের ওয়াটার্লু স্টেশনের দৈনন্দিন জীবন নিয়ে তোলা মাঝারি দৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র টারমিনাস-য়ের জন্য তিনি ৬১তে ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে প্রথম পুরস্কার পান। তৃতীয় কাহিনী-চিত্র ডার্লিং ( ৬৫ ) দিয়ে শ্লেসিংগার আবার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেন। ব্রিটেনের ফ্রি সিনেমা আন্দোলনের শরিক হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা একদিকে তাঁর ছবির কাহিনীকে স্বাদে ও মেজাজে প্রায়শই ভীষণভাবে ত্রিটশ করে তুলেছে, অতীতকে তাঁর ছবির টেকনিক ও ধীরকেও প্রভাবিত করেছে। তাঁর ছবির একটি

প্রচলিত ষীম হলো ব্যক্তি মাহুযের ক্ষেত্রে স্বথ ও নিরাপত্তার প্রয়োজন। সানডে  
 রাডি সানডে, মিডনাইট কাউবয় (৬৯), দি ম্যারাথন ম্যান (৭৬), Yanks (৭৯)  
 প্রভৃতি ছবিতে তিনি এই ষীম এবং সংবেদনশীল অহুভূতি ও তীক্ষ্ণ টেকনিগ,  
 বলিষ্ঠ প্রাণবন্ততা ও তৎপর গতিকে সমন্বিত করতে পেরেছেন। Madam Souza-  
 tzka ছবিতে তাঁর ওই ষীম বিস্তার পায় পারিবারিক ক্ষেত্রে স্বথ ও নিরাপত্তার  
 প্রয়োজন। বিষয় ও রীতিতে অবশ্য ফার ফ্রম দি ম্যাডিৎ ক্রাউড এই সমস্ত ছবি  
 থেকে আলাদা। তাঁর অধিকাংশ ছবিই পেশাদারী দক্ষতায় চিহ্নিত, দৃশ্যগত ভাবে  
 আকর্ষণীয় ও মননশীল ভাবে উত্তেজক। প্রথম থেকেই অপেক্ষাকৃত নতুন পরি-  
 চালকদের মধ্যে প্লেসিংগার-য়ের স্থান সমালোচক মহলে যথেষ্ট উচুতে ছিল।  
 চলচ্চিত্র নিয়ে লেখালেখি এবং নিজের একাধিক ছবিতে অভিনয়ও করেছেন  
 তিনি। তাঁর সাম্প্রতিক ছবির মধ্যে আছে দি বীলিভারস (৮৭), মাদাম স্কাং-  
 জ্কা (৮৮), প্যাসিফিক হাইটস (৯০)।

॥ বোল মিলিমিটার ছবি ॥

কোডাক কোম্পানী ১৯২৩ সনে মূলতঃ শোখীন চিত্রনির্মাতাদের জন্ম বোল মিলি-  
 মিটার নেগেটিভ ফিল্মের প্রচলন করে। ১৬ মি. মি.-র জন্ম বিভিন্ন স্বযোগ সুবিধা  
 সহ মুক্তি ক্যামেরা, শব্দ-যন্ত্রাদি, প্রজেক্টর, সম্পাদনা ও পরিষ্কৃটন/মুদ্রণের যন্ত্রপাতি  
 স্থলত হতে এবং শাদা কালো ও রঙিন ১৬ মি. মি. ফিল্ম স্টকের মান বৃদ্ধি পেতে  
 বিশেষত উন্নয়নশীল দেশের পেশাদার চিত্র নির্মাতারাও ১৬ মি. মি.-তে ছবি  
 তোলা শুরু করলেন, যে ছবি ৩৫ মি. মি. পর্জিটিভে বর্ধিত হয়ে ব্যবসায়িক ভাবেও  
 মুক্তি পাচ্ছে। তথ্যচিত্র ও পরীক্ষামূলক / নির্দেশনামূলক চিত্র, এবং টিভি ছবি তো  
 ধনী দেশগুলিতেও ১৬ মি. মি.তেই তোলা হয় বা হত। কারিগরী দিক থেকে  
 এই ফর্ম্যাট এখন খুবই সহজ ও সফিস্টিকেটেড রূপ পেয়েছে। ডিরেক্ট সিনেমা,  
 সিনেমা ভেরিতে, ফ্রি সিনেমা, আর্ভ গার্ড ও আণ্ডারগ্রাউণ্ড চলচ্চিত্র আন্দোলনে  
 এর ব্যাপক শৈল্পিক প্রয়োগও ঘটেছে। ১৬ মি. মি. ফিল্ম স্টকের প্রতি রীলে ৪০০  
 ফুট ফিল্ম ও প্রতি ফুটে ৪০টি করে ফ্রেম থাকে। (ড্র. রো আপ)

॥ সন্ডর / পঁয়ত্রিশ মিলিমিটার ॥

আদি যুগ থেকে ৩৫ মি. মি., চলচ্চিত্রের নিয়মিত ও প্রমাণ মাপের ফিল্ম ফর্ম্যাট।  
 যার সূচনা এডিসনের হাত দিয়ে। নির্বাক যুগে ৩৫ মি. মি. ফিল্মের যে আকার

ছিল সবাক যুগে এসে সাউণ্ড ট্র্যাককে জায়গা করে দেবার জন্য পিকচার ফ্রেমের আকার তার চেয়ে দ্বিগুণ কমে গেল। ৩৫ মি. মি. ফিল্ম স্টকের প্রতি রীলে ১০০০ ফুট ফিল্ম ও প্রতি ফুটে ২৪টি করে ফ্রেম থাকে। ৩৫ মিমিতে ছবি তোলা, সম্পাদনা, মুদ্রণ ও প্রদর্শনের জন্য ৩৫ মিমি-মাপের বিভিন্ন যন্ত্র দরকার। সত্তর মিলিমিটারের প্রচলন হলো পঞ্চাশের দশকের শেষ ভাগে। ব্যবসায়িক, পেশাদার চলচ্চিত্রে ব্যাপক প্রচলিত ফিল্ম ফর্ম্যাটের মধ্যে এতদিন ৭০ মিমিই ছিল সর্বাধিক প্রসারিত আকার। কিন্তু সম্প্রতি IMAX ফিল্ম ফর্ম্যাটের প্রচলন হয়েছে। ৭০ মিমিতে ছবির বিভিন্ন কাজ করতে হলে ৭০ মিমি মাপের যন্ত্রপাতি দরকার। স্নো আপ করে তুলনীয় একেই আনা যায় না। ৭০ মিমি-র প্রসারিত পর্দায় দৃশ্যদণ্ড ও আবেদন অসাধারণ, কিন্তু এর শৈল্পিক ও কলাকৌশলগত সমস্যাও কম নয়। ব্যয়ও খুব বেশি। ( ড. চলচ্চিত্রের টেকনিক, রিডাকশন প্রিন্ট, ষোল মিমি ছবি )

॥ সত্যজিৎ রায় ॥

জন্ম : ২রা মে ১৯২১

মৃত্যু : ২৩শে এপ্রিল ১৯৯২

কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ ও শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীতে অধ্যয়ন করে সত্যজিৎ একটি ব্রিটিশ বিজ্ঞাপনী সংস্থায় যোগ দেন ( ৪৩ ) ও ৫০য়ে সেখানকার আর্ট ডিরেক্টর হন। কলকাতার ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের অগ্রতম প্রবক্তা সত্যজিৎ প্রহ্লাদশিল্পী, সন্দেশ পত্রিকার অগ্রতম সম্পাদক ও জনপ্রিয় সাহিত্যিক হিসেবেও বিপুল খ্যাতি পেয়েছেন। কিন্তু চলচ্চিত্রেই তিনি স্বরাজ্যে সম্রাট। তিনি ছিলেন সমসাময়িক প্রথম সারির চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে অগ্রতম একথা বহুদিন হলো আন্তর্জাতিক প্রাতিষ্ঠানিক মহলে স্বীকৃত সত্য। এই সত্য সত্যজিৎের শিল্পকৃতির বিশ্লেষণে আমাদের দেশের একটা বিশেষ খামতি তুলে ধরে। এখানে চিত্রসমালোচনা চিত্রনির্মাতাদের খুব অল্পই সাহায্য করে। চিত্র-নির্মাণ এমন কঠিন কাজ যে খুব বিরল প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব তাকে করায়ত্ত করা, কিন্তু প্রায় সকলেই মনে করেন যে চিত্রনির্মাতাদের কাজকে সমালোচনা করা তার পক্ষে সম্ভব। ছবির গঠনমূলক আলোচনার চেয়ে আক্রমণাত্মক আলোচনাই এখানে বেশি হয়, যার ফলে সত্যজিৎ রায়ের মতো চলচ্চিত্রকারদের কোনো উপকার হয় না। তাঁর সমালোচকদের মধ্যে সবচেয়ে সোচ্চার যারা তাঁদের চলচ্চিত্রশিল্পে খুব কমই দান আছে, এমনকি চিত্রভাবনার স্বল্পতর আদিনাতেও

তাদের কোনো দান নেই বললেই হয়। আইজেনস্টাইন একবার অহুযোগ করে ছিলেন যে তাঁর চলচ্চিত্রের ছাত্ররা যথেষ্ট শিক্ষিত নয়; সত্যজিৎও সময় সময় ভাবতে পারতেন যে তাঁর সমালোচকরা শিক্ষায় না হোক, চলচ্চিত্রের মৌলিক শিক্ষায় পিছিয়ে আছে। সত্যজিৎ তাঁর চিত্রের গল্প নেন প্রচলিত উপস্থাপ থেকে, কিন্তু তাকে চিত্রায়িত করার সময় তিনি তাঁর নিজস্বতায় নিয়ে আসেন। ফরাসির! যাকে বলে *auteur*—যার মানে এমন একজন চলচ্চিত্রকার তাঁর সৃষ্টির জন্ম যিনি একাই দায়ী—এর পরিণামেই তাঁর এই নিজস্বতা। এমন একজন *auteur* সনাজের যৌথ জীবনের সার্বিক প্রয়োজনেই ব্যক্তিগত কাল্পনিক জগৎ তৈরি করেন। আমাদের চলচ্চিত্রের এই আকালে আমাদের খুব সীমিত সংখ্যক স্বয়ংসম্পূর্ণ চলচ্চিত্রকার (*auteur*) আছেন, যার ফলে সত্যজিৎের নিজের পর্যায়ে মত বিনিময় আরো সীমিত হয়ে পড়ে। একজন স্বয়ংসম্পূর্ণ চলচ্চিত্রকারকে বিভিন্ন স্তরের মাহুঘের সঙ্গে অনবরত যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়, নয়তো তাঁর মাধ্যমের নিয়ত পরিবর্তনশীল সংবেদনশীলতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। সৌভাগ্যবশতঃ সত্যজিৎের ক্ষেত্রে তেমনটি হয়নি। সত্যজিৎের মতো সমনাময়িক জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত খুব কম লোকই আছে।

স্বদেশে সত্যজিৎের দর্শকদের মধ্যে ক্রমেই দুটো ভাগ হয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ সত্যজিৎের সব ছবিিকেই নশাৎ করে দেয়, আবার কেউ বা সব ছবিিকেই প্রশংসা করে—দুই ক্ষেত্রেই গভীরতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। এই বিপরীতনুখী বিভাজনের মূলে আছে অহুভূতির পরিবর্তন, যা ক্রমে স্পষ্টভাবেই ধরা পড়েছে এবং যা সম্ভবতঃ অপরিবর্তনীয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার মনে হয়েছিল সত্যজিৎের সামনে কিছু রাস্তা খোলা আছে। আমার সন্দেহ নেই যে তিনি সেগুলি লক্ষ্য করেছেন, এমনকি তাঁর মধ্য থেকে কোনোটি হয়তো বেছেও নিয়েছেন। তবু ভারতীয় চলচ্চিত্রের পর্যালোচনা করলেই সত্যজিৎের কৃতিত্ব ভালো বোঝা যাবে। প্রথমেই চলচ্চিত্রের প্রতি সংবেদনশীলতার প্রকৃটি নিয়ে আলোচনা করা যাক।

১৯৭০ সালের এক সাক্ষাৎকারে সত্যজিৎ আমাকে অহুভূতির বিভিন্নতার একটা সুন্দর উদাহরণ দেন যাতে তিনি রবীন্দ্রনাথের কিছু লেখার প্রতি তাঁর মনোভাব বর্ণনা করেছেন—“রবীন্দ্রনাথের কিছু গল্প আছে যা চিত্রার দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ভিত্তোরীয়। ধরা যাক ‘পোষ্টমাস্টার’—মূল গল্পের শেষে পোষ্টমাস্টার চলে যাওয়ার সময় ছোট্ট পরিচাটিকাটি তার পায়ে পড়ে বলছে ‘আমাকে ছেড়ে যেয়োনা,

তোমার সঙ্গে আমার নিয়ে ষাও'। এটা আমার কাছে ভাবপ্রবণতা বলে মনে হয়েছিল। আমি তা ব্যক্ত করতে পারিনি, কারণ, বিংশ শতাব্দীর লোক হয়ে, অন্য পরিবেশে লালিত ও প্রভাবান্বিত হয়ে সেই আবেগ আমি অনুভব করি না। তাই আমি গল্পের শেষটা আরেকটু রুক্ষ করে দেখিয়েছি। আমি বরং গল্পে যেমন ছিল তার বিপরীতটাই দেখিয়েছি। ছবিতে যেয়েটি তার দুঃখ দেখানোর চেয়ে দুঃখ নুকিয়েই রেখেছে। সে পোষ্টমাস্টারকে এড়িয়ে গেছে। সে এতো আহত হয়েছে যে সে এই লোকটিকে তার দুঃখের কথাও বলেনি। সে কুয়োয় জল আনতে গিয়ে কাঁদছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে পোষ্টমাস্টার তাকে ডাকলো তখনই সে চোখ মুছে ফেললো। সে জলের বালতিটা নিয়ে তাকে পাশ কাটিয়ে গেল এবং পোষ্টমাস্টার যে বখশিস দিতে গেল তাও উপেক্ষা করল। বিশ শতকের ষাটের দশকের শিল্পী হিসেবে এটাই আমার ব্যাখ্যা। শুদ্ধতাবাদীরা এই পরিবর্তনে আপত্তি জানায়। যেহেতু আমি একজন স্বতন্ত্র শিল্পী, তাই আমি এরকম করে বদলে নিয়েছি। আমি রবীন্দ্রনাথের গল্পকে ভিত্তি করে আমার নিজস্ব ব্যাখ্যা রেখেছি।”

কেউ কেউ সত্যজিতের উপর শ্রদ্ধা থাকার সত্ত্বেও তিনি তাঁর ছবি সম্বন্ধে যেমন চিন্তা করেন, তাঁর থেকে ভিন্নতর চিন্তা পোষণ করেন। বেশ ক'বছর আগে প্যারীর বিখ্যাত Le Monde কাগজের চিত্র সমালোচক Louis Marcorelles-এর জন্ম চারুলতা-র একটা বিশেষ প্রদর্শনীতে আমি উপস্থিত ছিলাম। আমি তখন বিশ্বাস করতাম, এবং এখনো করি যে চারুলতা ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত সত্যজিতের ছবিগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। চলচ্চিত্রের ভাষার দিক থেকে 'অপু-ত্রয়ী' হতে অনেকটা অগ্রসর। নিশ্চিতভাবেই Marcorelles-এর মতো আধুনিক চলচ্চিত্র সমালোচক, যিনি Cahiers du Cinema-তে প্রায়শই প্রবন্ধ লিখতেন, সত্যজিতের অনবদ্য পরিচালনা ও স্বতন্ত্র মিত্রের অসাধারণ ক্যামেরার কাজ লক্ষ্য করেছিলেন। তথাপি ছবিটি তাঁর পছন্দ হয়নি। এমন নয় যে তিনি ছবিটিকে খারাপ ছবি বলেছেন। কিন্তু আমি পরে বুঝেছিলাম যে Marcorelles তখন তথাকথিত 'Cinema direct' নামে এক অল্প ধরনের ছবিতে মোহাবিষ্ট থাকায় তাঁর অল্পভূতিতে এমন গভীর পরিবর্তন ঘটে গেছে যে চারুলতা আর তাঁকে টানতে পারেনি। এ ধরনের বোধ-শক্তির পার্থক্য Tarkovsky দেখিয়েছেন তাঁর Andrei Rublev ছবিতে Theophanes নামে একজন গ্রীক ও Andrei Rublev — এই দুই জনের নিজ নিজ শিল্প সংস্কৃত কথাবাহারীর মাধ্যমে। এদের কথাবাহারীর মাধ্যমে Tarkovsky চলচ্চিত্রকার হিসেবে তাঁর নিজস্ব সামাজিক কর্তব্যের আলোচনা করেছেন।

আমি কল্পনা করতাম যে স্বপ্নের ভবিষ্যতে হয়তো কোন ভারতীয় Tarkovsky ইমেজ-শ্রষ্টা সত্যজিৎ রায়-এর উপর একটা ছবি করবেন যেখানে সত্যজিৎ কথোপকথনে রত থাকবেন অল্প একজন ইমেজ-শ্রষ্টা ঋত্বিক ঘটক বা যুগল সেনের সঙ্গে অথবা নবীন চলচ্চিত্রকার শ্যাম বেনেগাল, মণি কাউল অথবা কুমার সাহানী-এর সঙ্গে। সত্যজিৎ সত্যিই বলবেন যে তিনি তাঁর আশেপাশে সাধারণের দুর্দশা দেখতে পেয়ে তা বর্ণনা করতে উদ্বুদ্ধ হন। সত্যজিৎের মতো এমন আর কোনো চলচ্চিত্রকার আছেন কি যিনি ভারতীয় জীবনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দিকগুলি নিয়ে এত বিচিত্র কাজ করেছেন? তিনি তাঁর মননশীলতায় জীবনানুগ ইমেজ সৃষ্টি করেছেন এবং ছবিতে তাদের এমন ভাবে রেখেছেন যে দর্শকদের মনে রেখাপাত করবেই। স্পষ্টতই, একটি জীবনের প্রেক্ষিতে শুধু এক রকম প্রতিক্রিয়াই হয় না। অল্প একজন হয়তো তাঁর দুর্দশার কথা চেষ্টা করে বলবেন আবার ভিন্ন একজন তার থেকে বেরিয়ে আসার রাস্তা বাৎলাবেন। অল্পদিকে, একজন দর্শক হয়তো সত্যজিৎ যেভাবে অসহ্য অবস্থাগুলি বর্ণনা করেন, তাকে commitment-এর অভাব বলে ক্ষোভ দেখাবেন। তবুও কেউ কেউ বলবেন এ ব্যাপারে 'কিছু করা'র সময় অনেকদিন আগেই এসেছে এবং তাঁরাই প্রবৃত্তি তুলবেন আমাদের জীবনের নোংরা দিকগুলি নিয়ে বিবৃতি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে। কিন্তু এভাবে এটা ঠিক বা ওটা ভুল প্রতিপন্ন করার চেষ্টা একধরনের গোঁড়ামী, যা আমার মতে চলচ্চিত্র-মাধ্যমের পক্ষে ক্ষতিকারক।

সত্যজিৎের ছবি সম্বন্ধে আমার চিন্তাধারারই অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। আমার সৌভাগ্য যে সত্যজিৎের ছবি দেখার প্রথম সুযোগেই আমি অপু-ত্রয়ীর সবগুলিই একসঙ্গে নিউ-ইয়র্কে দেখতে পাই। সেটা ১৯৬১ সালে যেদিন আমি প্রথম ভারতে আসি তার আগের রাতে। আমি এক বিশেষ মানসিক অবস্থায় ছিলাম। কিন্তু আমাকে বলতেই হয় যে 'পথের পাঁচালী' বাইরের দেশে দেখলে ভারত সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা গড়ে উঠতে পারে বলে অনেকে মনে করলেও আমার ক্ষেত্রে সেরকমটি হয়নি। অপু-ত্রয়ী আমার সঙ্গে এমন মানুষদের পরিচয় করিয়ে দিল, গভীর শ্রদ্ধায় ও বিনয়্যে যাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমার বহুদিন থেকে ছিল। কারণ, পাশ্চাত্যদেশীয় হিসেবে নিজের মধ্যে যে অহমিকা ও কর্তৃত্ববোধ কাজ করা স্বাভাবিক, তার ফলে হয়তো একজন তরুণ মিশনারীর যে ভারতীয়দের কাছে অনেক কিছু শেখার আছে ওদের কোনো সাহায্যে আসার আগে, সেই বোধই জন্মাতো না অপু-ত্রয়ী না দেখলে।

এই অভিজ্ঞতার অল্প একটা দিকও ছিল। একথা বলা যায় যে অপু-ত্রয়ী আমাদের ভারতের সঙ্গে প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, আরেকটা কথাও আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে চলচ্চিত্র কতদূর যেতে পারে। কার্যত এটা সিনেমা সম্বন্ধে আমার তৃতীয় আবিষ্কার, প্রথমটা হয়েছিল আমার ষোল বছর বয়সে Eisenstein-এর 'Battleship Potemkin' দেখে আর দ্বিতীয়টি হয়েছিল Robert Bresson-এর 'Un condamné a mort s'est échappé' দেখার পর। এবং তখন এলো অপু-ত্রয়ী—আমাকে একেবারেই ভাসিয়ে নিয়ে গেল। স্মৃত্ত মিত্র-র সিনেমাটোগ্রাফির মতো আমি আগে কখনো দেখিনি। যখন কিছুদিন পর আমি বাংলা শিবে বিভূতিভূষণের উপস্থাপন দুটো পড়লাম, যার থেকে সত্যজিতের অপু-ত্রয়ী তৈরি হয়েছে, তখন আমি বুঝতে পারলাম সত্যজিতের অপু-ত্রয়ী কত গভীর বিপ্লবাত্মক ছবি। আমার মনে হয় না বিদেশীরা ত্রয়ীর এই দিকটা বুঝতে পারবে। অধিকাংশ ভারতীয়ও বোধহয় এ ব্যাপারে সচেতন নয়। বিভূতিভূষণের লেখা ও সত্যজিতের ছবিতে তুলনা করলে দেখা যায় যে বিভূতিভূষণের পৃথিবী এক পরিবর্তনহীন, সময়হীন, পুনরাবর্তনের পৃথিবী যার প্রতীক হলো নিরন্তর বয়ে যাওয়া নদীতে একটার পর একটা কুটো ভেসে যাচ্ছে—অপুর পরে কাজল। অল্প দিকে সত্যজিতের পৃথিবী হলো গতিময় ও সময়সীমায় আবদ্ধ। এর প্রতীক হলো রেলগাড়ী। সত্যজিতের পরিবর্তনে পুনরায়ুষ্টি নেই। শৈশব থেকে বয়ঃপ্রাপ্তিতে অপু আলোকপ্রাপ্ত হতে থাকে। এবং অপুর সংগ্রামে কাজলের জীবন তার বাবার জীবন থেকে আলাদা হয়ে উঠবে।

এভাবে ১৯৫৫তে অপু-ত্রয়ীর গুরুত্ব শুধু তার নন্দনতাত্ত্বিক অসাধারণত্বের স্ফুটন নয়। অপু-ত্রয়ী একটা মতবাদ ভেঙে যে আরেকটা মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছে তাও অস্বাভাবিক নয়। সেটা হলো—ব্যক্তিগত সংগ্রামের দ্বারা পরিবর্তন আনা সম্ভব। কার্যত, সত্যজিতের ভাষায় ভারতীয় গ্রামীণ জীবনযাত্রার বিখ্যেণ যে বই তার মধ্য থেকে উপাদান নিয়ে যে মতবাদ তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন, তারই স্ফুটন ছবির এই নন্দনতাত্ত্বিক অসাধারণত্ব সম্ভব হয়েছে। একথা সত্য যে সত্যজিতের অপু খুব আত্মকেন্দ্রিক এবং তার কোনো সমাজবোধ নেই। কিন্তু সে খুব সংগ্রাম করেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অর্জন করে এবং সামাজিক দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষমতাও অর্জন করে। নববাস্তব ছবি Bicycle Thieves-এর সমাপ্তির সঙ্গে সত্যজিতের অপুর সংসারের শেষ অংশের তুলনা করা যায়। De Sica-র ছবিতে যেখানে সেই দরিদ্র পরাজিত লোকটির ছেলেকেও তার বাবার পরাজয়ের শরীক হিসেবে টেনে আনা

হয়েছে, সত্যজিতের ছবিতে ছেলেকে তার বাবা টেনে উপরে তুলে এনেছে এবং একটা আত্মমর্যাদাপূর্ণ জীবনের আনন্দ ও মুক্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।

আমি আগেই বলেছি যে অপু-ত্রয়ী থেকে চারুলতা ( ১৯৬৪ ) পর্যন্ত সমস্ত ছবির মধ্যে চারুলতার সিনেমাটিক গুণই সবচেয়ে বেশি। ১৯৬৯ সালে যখন 'অরণ্যের দিনরাত্রি' মুক্তি পেল আমার মনে হলো এটা চারুলতার চেয়েও ভালো। 'প্রতিদ্বন্দ্বী'ও ( ১৯৭০ ) আমার ভালো লেগেছে, কিন্তু 'অরণ্যের দিন-রাত্রি' আমার কাছে মনে হয়েছে আরো ভালো। আরো পরে সত্যজিতের ছবি সম্বন্ধে আমার উৎসাহে ভাঁটা পড়ে। 'সোনার কেলা' ( ১৯৭৪ ) ভালো লেগেছে কিন্তু 'অশনি সংকেত' ( ১৯৭৩ ) আমার ভালো লাগেনি। একই সত্যজিৎ রায় এবং 'অশনি সংকেত'ও নিশ্চিতই একটা ভালো ছবি তবে আমার কেন ভালো লাগলো না? আপাতবিরোধী ভাবে 'সোনার কেলা' আমার ভালো লেগেছে যেহেতু এটা আপাত অপ্রাসঙ্গিক এবং 'অশনি সংকেত' ভালো লাগেনি তার কারণ এটা স্পষ্টতই প্রাসঙ্গিক। পশ্চিমবঙ্গের দ্বিভিক্ষ সম্বন্ধে সত্য ও সাহসী বিবৃতি থাকায়, এবং তা প্রাসঙ্গিক হওয়া সত্ত্বেও আমার কাছে তা অপ্রাসঙ্গিক এমনকি বিরক্তিকর মনে হয়েছে। আমার বোধ অনুযায়ী, আরো বেশি প্রশ্নবোধক পদ্ধতিতে হৃদয়ের থেকে মননের কাছে আবেদনই দরকার ছিল। এ ছবিতে দ্বিভিক্ষের সামাজিক কারণগুলির উপর আলোকপাত করা উচিত ছিল। আমার মতে, ছবিটার অতি প্রাসঙ্গিকতাই চিন্তাশীলতা অনেক কমিয়ে দিয়েছে। সত্তরের দশকে আমি সত্যজিতের ছবি সম্বন্ধে উৎসাহের অভাব বোধ করতে লাগলাম, তার কারণ আমি ক্রমেই Marcorettes-এর মতো প্রত্যক্ষ সিনেমায় উৎসাহী হয়ে উঠেছিলাম। এবং যখন ১৯৭০-এ আমি একটি টেলিভিশন তথ্যচিত্র তৈরি করার কথা ঠিক করলাম তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রত্যক্ষ সিনেমার রীতিতেই তৈরি করতে লাগলাম। স্বভাবতই, 'The Inner Eye' ( ১৯৭৩ ) আমার খুবই ভালো লেগেছিল। কিন্তু তা শুধুই প্রত্যক্ষ সিনেমার স্পর্শ ছিল বলেই নয়। যা আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছিল তা হলো সত্যজিতের নিজের মাধ্যম দ্বারা অন্ত শিল্প মাধ্যমকে তুলে ধরার ক্ষমতা। আমি চিত্রকলার উপর এমন একটা ছবি দেখলাম যা নাকি চিত্র-কলাকে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে নতুন করে সৃষ্টি করার নামে ধ্বংস করেনি। আমার মনে হলো একজন মহৎ শিল্পীর পক্ষেই অচির শিল্পকলাকে তার নিজস্বতা নষ্ট না করে জনসমক্ষে নিয়ে আসা সম্ভব। তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ' ও 'The Inner Eye' দেখার পরই বলা যায় সত্যজিৎ কাহিনীচিত্রের মতো একজন প্রথম শ্রেণীর তথ্যচিত্র

নির্মাণ [ তাঁর অন্তর্গত তথ্যচিত্রের মধ্যে আছে 'বালা', 'সুকুমার রায়' ও 'সিকিম' ], যার মানে দাঁড়ায় যে চলচ্চিত্র মাধ্যমটির প্রায় সবরকম প্রয়োগ কোশলই তাঁর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে ।

এই তাহলে সত্যজিৎ‌র ছবি সম্বন্ধে আমার এককালীন প্রতিক্রিয়া । এই অংশ শেষ করার আগে জোর দিয়ে বলতে পারি যে কোনো একরকম ছবির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া মানে এই নয় যে সে ছবিগুলিই আদর্শ । সব ছবিই কাহিনী এবং সব কাহিনীই একটা মতাদর্শের ছাঁচে তৈরি । কেউ যদি অল্প সবরকম সিনেমা বর্জন করে এক বিশেষ সিনেমা তৈরি করতে চায়, তাকে আরো গভীরতায় গিয়ে প্রশ্ন তুলতে হবে । আসলে তর্কটা তুলতে হবে চলচ্চিত্র নির্মাণ থেকে আরো অনেক বড়ো পরিপ্রেক্ষিতে, কারণ এর সঙ্গে সমাজের সব প্রশ্ন, তার গঠন, তার বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক ফলশ্রুতি সবই জড়িয়ে আছে । যদি না কেউ তার নিঃসঙ্গ রাত্রে পুনর্বার নিজেকে আশ্রয় করার জন্য স্লোগান আউড়েই সমুদ্র খাকে, ইতিহাসের যে মুহূর্তে সে বেঁচে আছে তার হিশেব তাকে রাখতেই হবে । রাতারাতি যদি কেউ মনে করে সিনেমাতে কোনো গল্প বলাই থাকবে না, তবে ইতিহাসের অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতের কোনো পর্যায়েই তা পড়বে না । যদিও মতাদর্শগত কারণে বিশেষ কোনো ধরনের চলচ্চিত্র নির্মাণের সঙ্গে মতের অমিল হওয়াটা যুক্তিসঙ্গত, তবু আমাদের মনে নিতে হবে যে একটা বিশেষ অবস্থাতেই অল্প ধরনের ছবি তৈরি হতে পারে । সংবেদনশীলতার পার্থক্য শুধু আঙ্গিকের উপর নির্ভর করে, মতাদর্শের কোনো গুরুত্বই নেই একথা আমি বলতে চাই না । কোনো কোনো চিন্তাধারার পোষণ অনিবার্য ভাবেই সামাজিক কাঠামোয় একটা আয়তন পরিবর্তনের প্রস্তুতি ঘটায়, আবার অল্প চিন্তাধারা চলতি কাঠামোটাকেই আরো বেশি গ্রাস করে তোলে । এ ছাড়া চলচ্চিত্র নির্মাণের দ্বারা খুব বেশি বিপ্লবাত্মক কাজ সম্ভব নয় । চলচ্চিত্র সামাজিক পরিবর্তন করতে পারে শুধু বোধশক্তির অতি সূক্ষ্ম পরিবর্তন করেই । চলচ্চিত্রের কাছে আমাদের এই সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থায় এর চেয়ে বেশি কিছু দাবী করা সাহসী হতে পারে কিন্তু দুঃখজনকভাবে অসম্ভব ।

সত্যজিৎ‌ এসব ব্যাপারে খুব গুয়াকিবহাল ছিলেন । আমার তাই মনে হয়, তাঁর কাছে যে প্রশ্নগুলি রাখা হয়েছে এবং তাঁর কাজের মাধ্যমে তিনি যে জবাব দিয়েছেন সেইগুলি এইরূপ : (ক) তাঁর দর্শকদের অন্তর্গত একটা সংখ্যালঘু দলের চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর পদ্ধতিকে মানিয়ে নেওয়া উচিত হবে কিনা ; (খ) তাঁর পক্ষ থেকে এই মানিয়ে নেওয়া প্রান্তিকানিক মঞ্জুরী পাবে কিনা ; (গ) বিশেষ শৈলী

এবং আবেদনের আপেক্ষিক মূল্যের কথা মনে রেখে তাঁর নিজস্ব বহুমুখী পর্দা ৭ ( তাঁর জীবনের শেষ তিনটি ছবি যার এক অভিযাত্রী উদাহরণ ) পাণ্টে ফেলা ঠিক হবে কিনা ।

সবাই তাঁর পছন্দ হোক না কেন, সত্যজিতকে নবীন চলচ্চিত্রকারেরা বর্তমানে বা ভবিষ্যতে নেতা হিসেবেই ভাববেন । সবাই হয়তো তাঁর পদ্ধতিকে অনুসরণ করতে চান না । ( নিশ্চিতই সবার পক্ষে তা অনুসরণ করা সম্ভবও নয় ) । কিন্তু তাঁদের মনোভাব একজন নবীন চলচ্চিত্রকারের কথাতেই বলা যায়, ‘আমি সত্যজিতের সব ছবির সঙ্গে একমত নই, কিন্তু আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি ।’ আমার বিশ্বাস এই নবীন চলচ্চিত্রকারের শ্রদ্ধায় মিশে আছে কিছুটা ভক্তিয়ুক্ত ভয় এবং অনেকটাই ভক্তিজ্ঞানিত বিশ্বাস ও ভালোবাসা । আমার মনে হয় সেটাই ঠিক ।

তাঁকে নিয়ে তোলা বি. ডি. গর্গের তথ্যচিত্রে সত্যজিৎ বলেছিলেন, ‘I find myself trying, through my films, to trace the underlying pattern that binds this life together.’ গ্রেগরি বেটসনের ভাষায়, ‘The pattern that connects.’ সত্যজিতের শেষ ছবি ‘আগস্তক’ (৯১) (তাঁর আগের দুটি ছবি ‘গণশত্রু’ (৮৯) ও ‘শাখাপ্রশাখা’র (৯০) মতোই) আধুনিক সভ্যতা বিষয়ে ছবি । কিন্তু ‘আগস্তক’-এই তিনি নিজেকে সবচেয়ে খোলাখুলি ভাবে প্রকাশ করেছেন । একদিক থেকে এই ছবি হলো তাঁর সমগ্র চিত্রকর্মের উপসংহার । অ্যান্ড্রু রবিনসন যেমন ‘গণশত্রু’ ও সত্যজিৎ-পরিকল্পিত ‘দি এলিএন’-এর মধ্যে কিছু-কিছু মিল লক্ষ্য করেছিলেন ( মন্দির, সাংবাদিক, ধর্ম ও ধনের অন্তত জোট, বাজোরিয়্যা চরিত্রটি ), আমি তেমনি ‘দি এলিএন’ ও সত্যজিৎ-নির্মিত ‘আগস্তক’-এর মধ্যে কিছুটা সাদৃশ্য খুঁজে পাই । মনোমোহন মিত্র একজন বহিরাগতের দৃষ্টিকোণ থেকে এই পৃথিবীকে দেখেন । ভিনগ্রহের বাসিন্দার মতো তিনিও অস্ত্রের উপকার করেন । সবচেয়ে বড়ো কথা, ওই আগস্তকের মতো তাঁরও দেখার চোখ ও উপলব্ধি করার মন রয়েছে । অর্থাৎ আধুনিক সভ্যতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করার ক্ষমতা রয়েছে । সেই ১৯৫৫ সন থেকেই সত্যজিৎ মনে করে আসছেন যে শিল্পীর মূল কাজ হলো অনুসন্ধান করা (probing) । তাঁর প্রায় সমস্ত ছবিই বাস্তবের অনুসন্ধান (probes into reality) । যে কথা ‘আগস্তক’ সম্পর্কে আরও বেশি সত্য । মনোমোহনের নির্মোহ অনুসন্ধানের ফলাফল এই—১. অর্থের ক্ষতিকর প্রভাব ( তুলনীয় ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’, ‘নায়ক’, ‘দি এলিএন’ ) ২. যুদ্ধের অর্থহীনতা ( তুলনীয় ‘গুপী গাইন বাবা বাইন’ ) ৩. সভ্যতার প্রকৃত অর্থ ( তুলনীয় ‘শাখাপ্রশাখা’ )

ইত্যাদি। ‘আগস্কক’-এ সত্যজিৎ জীবনের, বাস্তবের, জীবনাভিষ্কৃত্যের ভিতর সম্পূর্ণ ডুব দিয়েছেন। ‘দি এলিএন’-এর মূল স্র হতো মজা, মনন সেখানে হতো অতিরিক্ত পাওনা। ‘আগস্কক’-এও নির্মল আনন্দ আছে, কিন্তু মননই এখানে প্রধান। বলা যেতে পারে, ‘আগস্কক’-এর সঙ্গে ‘দি এলিএন’-এর কিছুটা সেই সম্পর্ক, যে সম্পর্ক ‘ঘরে বাইরে’-র সঙ্গে ‘চাকলতা’-র।

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের যে অবদান, বাংলা দিনেমায়া সত্যজিতের সেই অবদান। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সত্যজিৎ নানা বিষয়ে আত্মীয়তা অনুভব করতেন। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তোলা তাঁর তথ্যচিত্রে এর সবচেয়ে জোরালো প্রমাণ মিলবে। ওই ছবির শুরুতে আছে এই ধারাত্মক, ‘On 7th August 1941, in the city of Calcutta, a man died. His mortal remains perished but he left behind him a heritage which no fire could consume. It is a heritage of words and music and poetry, of ideas and of ideals. And it has the power to move us, to inspire us, today and in the days to come. We who owe him so much salute his memory.’ এই একই কথা, বছর তিরিশ পর, সত্যজিৎ সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য হলো। এই সময়ের মধ্যে তিনি তাঁর সাংস্কৃতিক অবদান ও অভিঘাতের দ্বারা বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনে এক অনন্য স্থান অধিকার করে ফেলেছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত, সৃষ্টিশীল ও গভীর আবেগমূলক সম্পর্কের ফলস্বরূপ তিনি শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাভাণ্ড হয়ে ওঠেন। তাঁর ‘রবীন্দ্রনাথ’ তথ্যচিত্রের সমাপ্তিতে ছিল রবীন্দ্রনাথের ‘সভ্যতার সংকট’ রচনার শেষাংশ থেকে উদ্ধৃতি। আর সত্যজিতের শেষ তিনটি ছবি, একদিক থেকে দেখলে, সভ্যতার সংকট বিষয়ে সত্যজিতের চিত্রভাষ্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দার্শনিক ভাষ্যে বলেছিলেন, মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ। ‘গণশত্রু’ ছবিতে ডা. অশোক গুপ্ত দেখেন, তিনি তরুণদের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেন। মনোমোহন মিত্র দেখেন, তিনি তাঁর ভাগ্নীতে বিশ্বাস রাখতে পারেন। ‘শাখা-প্রশাখা’ কালের স্পন্দনের ছবি, এই ছবিতে আমাদের চারপাশে আলোড়িত হয় যে ভয়ঙ্কর সময়, তার মধ্যেও, দেখা যায়, মেয়েদের ওপর বিশ্বাস রাখা যায়। হ্যাঁ, সব অন্ধকার নয়। এখনও আশা আছে। ফলে শেষ জীবনে এসে সত্যজিৎ প্রকৃত অর্থেই রবীন্দ্রনাথের সার্থক উত্তরসূরি হলেন।

অনেককে বলতে শুনেছি, সত্যজিতের শেষ তিনটি ছবি নাকি ফিল্মিক

বিচারে হেমন ভালো নয়। কিন্তু চলচ্চিত্র তো তার বক্তব্য ও চিত্রভাষা দ্বা  
নিয়েই। তাঁর শেষ তিনটি ছবি, ছবির চেয়ে বেশি, এক প্রাক্ত শিল্পীর বিপ্লব, যা  
তার চেয়েও বেশি, ভাষ্য (testament)। এই তিন ছবির কেন্দ্রীয় metaphor  
হলো আলতামিরার বাইসন, পর্দায় যা জীবন্ত হয়ে ওঠে তার সারল্য ও পরিষ্কার  
নিয়ে, রহস্য ও বিস্ময় নিয়ে, ঐতিহ্য ও সর্বজনীনতা নিয়ে, যা 'drastic simplifi-  
cation of style and content'-এর কল, যার কথা, ভারতীয় চলচ্চিত্রকারদের  
জন্ম যে প্রয়োজনের কথা, ১৯৪৮ সনেই একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন।

অত্যান্ত ছবি : পরশপাথর ( ৫৭ ), জলপাথর ( ৫৮ ), দেবী ( ৬০ ), তিন কণ্ঠা  
( ৬১ ), কাঞ্চনজঙ্ঘা ( ৬২ ), মহানগর ( ৬৩ ), নায়ক ( ৬৬ ), গুপী গাইন বাধা  
বাইন ( ৬৮ ), সীমাবদ্ধ ( ৭১ ), জনঅরণ্য ( ৭৫ ), সতরঞ্জ কে খিলাড়ী ( ৭৮ ),  
হীরক রাজার দেশে ( ৮০ ), ঘরে বাইরে ( ৮৪ )।

রচিত গ্রন্থ : আওয়ার ফিল্মস দেয়ার ফিল্মস, বিষয় চলচ্চিত্র।

সম্পর্কিত গ্রন্থ : মারী সীটনের The Portrait of a Director, দিলীপ  
মুখোপাধ্যায়ের সত্যজিৎ।

তাকে নিয়ে আধ ডজনের বেশি তথ্যচিত্রও নিখিত হয়েছে।

গান্ধী রোবের্জ

॥ সম্পাদনা ॥

ছবিতে সম্পাদকের কাজকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়, যেমন—

১. যা স্কটিং করা হয়েছে তা থেকে নির্বাচন করা ও একত্র করে ফেলা অর্থাৎ  
চিত্রনাট্য অনুসারে রাশ প্রিন্টের প্রাথমিক কাটিংয়ের পর পৃথক পৃথক রোল তৈরি।

২. এই রোলগুলিকে প্রতিটি শটের প্রয়োজনীয় ও নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য অনুসারে  
আবার কাটিং করা এবং দৃশ্য ও দৃশ্যপর্যায়গুলিকে এমনভাবে সাজানো যাতে ছবির  
গল্পাংশ স্পষ্ট ও জোরালো হয়ে ওঠে এবং প্রতিটি দৃশ্যপর্যায়ের ও সামগ্রিকভাবে  
গোটা ফিল্মের প্রয়োজনীয় কাহিনী, কাঠামো ও ছান্দিকতা যথাযথ অর্জিত হতে  
পারে। দৃশ্য ও দৃশ্যপর্যায়কে এইভাবে সাজানোর জন্ম সম্পাদকের শটের ট্রান-  
জিশন অর্থাৎ স্থান পরিবর্তন ও রূপান্তর সম্পর্কে জ্ঞান থাকা চাই। দৃশ্যবস্তুর  
স্থিতিকাল, গতিময়তা, আলো-ছায়া-অঙ্ককারের টোনালিটি, রৈখিক টোনালিটি,  
স্থানকালচেতনা, শটসমূহের পারস্পর্যের মধ্যে রঙ, টোন, অ্যাঙ্গেল, ভিউশন,  
ব্যাকগ্রাউন্ড, ক্যামেরার গতি ও স্থিতি, শটের প্রয়োজনীয় দৈর্ঘ্য ইত্যাদি সম্পর্কে

স্বস্পষ্ট ধারণা ও সৃষ্টিশীল কল্পনা থাকে চাই যাতে কাজিক্ত ভাবাবেগের উদ্বেক ঘটানো সম্ভব।

৩. বিবিধ শব্দাংশ, যেমন সংলাপ আবহবনি প্রভৃতিকে সিনক্রোনাইজ করা এবং শব্দ, নীরবতা ও সংগীতাংশকে চিত্রাংশের সঙ্গে সঠিকভাবে সমন্বিত করে ছবির চূড়ান্ত অর্থ, মেজাজ ও প্রভাব সৃষ্টি করা।

৪. ছবিতে পরিচয় ও অত্মীয় লিপি বসানো, এবং ফেড, মিক্স, ডিজলভ, ষ্টীল, ফ্রীজ, সুপার-ইম্পোজিশন, ওয়াইপ, নানা ধরনের ট্রিক, অবলিক বা ইনভার্টেড ফ্রেম, ফ্রেম-গ্যাপ এবং অল্প যে কোনো ধরনের অপটিক্যাল এফেক্ট ছবিতে যুক্ত করা।

৫. শব্দের পৃথক পৃথক ট্র্যাকগুলিকে একটি সাউণ্ড ট্র্যাকে সমন্বিত করা (যা সাউণ্ড মিক্সিং-এর পদ্ধতি নামে পরিচিত) এবং ছবির চূড়ান্ত সম্পাদিত সংস্করণ অনুসারে মূল নেগেটিভকে কাটিং করা। এই নেগেটিভ ও সমন্বিত সাউণ্ড ট্র্যাককে এরপর ল্যাবরেটোরিতে প্রিন্ট করা হয়। প্রতিটি দৃশ্যপর্যায়ের প্রয়োজনীয় টোনাল বৈশিষ্ট্য ও ঘনত্ব যাতে প্রিন্টে ঠিকমতো আসে তা লক্ষ্য রাখা দরকার।

ক্যামেরাভাষার মতো সম্পাদনারীতিও চলচ্চিত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ছবির প্রভাবময়তা অনেকটাই সৃষ্টি হয় সম্পাদনারীতির ফলে। পরিচালকের নিজস্বতা ও স্বাতন্ত্র্যেরও অনেকটা উঠে আসে সম্পাদনারীতি থেকে। চলচ্চিত্র সম্পাদনার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও নন্দনতত্ত্ব আলোচনা করলে তা ভালোভাবে বোঝা যাবে।

আদিতে সম্পাদনা ছিল ছবির অন্তর্গত শটগুলিকে চূড়ান্ত ক্রম অনুসারে সহজ ভাবে সাজিয়ে দেওয়া ও প্রতিটি শটকে নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য অনুযায়ী কেটে নেওয়া। প্রতিটি পৃথক শট তখন নিজস্ব সেটিং এবং চরিত্রের নিজস্ব প্রবেশ ও প্রস্থান সহ একটি একক, স্বয়ং-সম্পূর্ণ দৃশ্য। সম্পাদনার একমাত্র যুক্তি তখন সময়ক্রম, একমাত্র লক্ষ্য গল্পরস। অল্প কোনো যুক্তিতেও যে বিভিন্ন শটকে গেঁথে তোলা যায়, স্ট্রায়েটিভ ফর্ম বা নাটকীয় ফর্মরূপে যে চলচ্চিত্রের ব্যবহার সম্ভব তার জ্ঞান আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে মেলিয়েসের *Barbe Bleue* ও পোর্টারের *লাইফ অব অ্যান অ্যামেরিকান ফায়ারম্যান* ছবির জ্ঞান। দেখা গেল, অর্থ ও ব্যঞ্জনার দিক থেকে কোনো একটি শট যে সর্বদা নিজেতেই নিজে সম্পূর্ণ তা মোটেই নয়, বরং অত্মীয় শটের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে প্রায়ই তার অর্থ ও তাৎপর্যের প্রসার ঘটে। দি গ্রেট ট্রেন রবারি ছবিতে সমান্তরাল ও ওভারল্যাপিং অ্যাকশনের স্তর ধরে সম্পাদনা করা হলো। অ্যাকশন ও ইমেজের, অর্থ্যৎ, শটের উদ্দেশ্য প্রণোদিত জাক্সটাপোজিশনে সিনেমার নাটকীয় সম্ভাবনা ও ইমোশনাল ক্ষমতা অনেকটা

বেড়ে গেল। সিনেমায় ডবলিউ গ্রিফিথের মৌলিক অবদান, পোর্টার থেকে গ্রিফিথের মূলগত অগ্রগতি এইখানে যে তিনি একটা সম্পূর্ণ দৃশ্যকে অনেকগুলি ছোট ছোট পর্যায়ে ভাগ করে নিলেন। প্রাথমিক ভাবে অসম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন দৃশ্য উপাদানে, যাদের বিশেষ পদ্ধতিতে একত্র করে দৃশ্যের সবটা পুনর্নির্মাণ করা যায়। বিচ্ছিন্ন প্রতিটি উপাদান আসলে এক একটি পৃথক শট, ক্যামেরার উপযুক্ত দূরত্ব ও অবস্থানকোণ থেকে যা তোলা হয়েছে। ফলে প্রতিটি উপাদানের নাটকীয় তীব্রতা প্রয়োজন মতো নিয়ন্ত্রিত করা যাচ্ছে। শুধু চিত্রগ্রহণে নয়, সম্পাদনাতোও। ক্যামেরা দূরত্ব ও কোণের এই দ্রুত পরিবর্তনশীলতা সম্পাদকের কাজকে আরো গুরুত্বপূর্ণ করে তুললো। বিভিন্ন ক্যামেরাকোণের শটকে, বিভিন্ন ক্যামেরা মুভমেন্টকে সংযুক্ত করার সময়ে, মেলাবার সময়ে, সম্পাদককে আরো বেশি চন্দ্র গতি ও শিল্প সচেতন হতে হলো। গ্রিফিথ সম্পাদনায় স্ট্রেট কাটিংয়ের বদলে ইন্টার কাটিং, ক্রেশ কাটিং, ফ্ল্যাশব্যাক ব্যবহার করে স্থান ও কাল উভয়কেই চলচ্চিত্রের অধিকারে আনলেন। তখনকার সম্পাদনার তিনটি বৈশিষ্ট্য হলো রিদম হারমোনি টেম্পো।

সম্পাদনার ক্রমবিবর্তনে পরবর্তী গুণগত পরিবর্তন ঘটল সোভিয়েত রাশিয়ার চিত্রপরিচালকদের তাত্ত্বিক গবেষণায় ও সৃষ্টিতে। কুলেশভ পরীক্ষা করলেন বিভিন্ন সময়ে ও স্থানে তোলা কতকগুলি শটকে একত্রে গেঁথে তাদের একই স্থানের একই অ্যাকশনের ধারাবাহিক শট হিসেবে চালানো যায় কিনা তাই নিয়ে। অভিনেতার মুখের একই শট পৃথক পৃথক ভাবে ব্যবহার করা হলো খাবারের প্লেটের শট, মৃত নারীর শট ও ক্রীড়ারত বাচ্চা মেয়ের শটের সঙ্গে। দর্শক কিন্তু অভিনেতার মুখে পৃথক পৃথক অনুভূতির অভিব্যক্তি খুঁজে পেলেন, ফ্লাশ শোক আনন্দ। ফলে দেখা গেল সম্পাদনা শুধু যে শটের অর্থের প্রসার ঘটায় তাই না অর্থের এমনকি আয়ুল পরিবর্তনও ঘটাতে পারে। এখান থেকে প্রাথমিক ধারণা সংগ্রহ করে আইজেনস্টাইন গড়ে তুললেন মনতাজতত্ত্ব (ড্র.)। দেখালেন সম্পাদনায় দুটি শটের সম্মেলন আসলে শট দুটির মধ্যে সংঘাত, যে সংঘাত থেকে উঠে আসে উভয় শট অতিরিক্ত তৃতীয় এক ভাবনা, যা দর্শকের মনস্তাত্ত্বিক স্তরে ক্রিয়াশীল হয়ে mental pictorialism-এর জন্ম দেয়। সম্পাদনা এইভাবে ব্যবহৃত হলো ভাবনা ও অনুভবের উপস্থাপনায়। শটের অর্থযুক্ত জাক্সটাপোজিশন থেকে আমরা এলায় শটের মননগত জাক্সটাপোজিশনে। চলচ্চিত্র বর্ণনাত্মক কাঠামোর চেয়ে বেশি কিছু হয়ে উঠলো।

আর্ট গার্ড আন্দোলন সোভিয়েত রাশিয়ার বাইরে পশ্চিমে ইউরোপেও সম্পাদনাকে ব্যক্তিগত, নিরাবেগ, পরীক্ষামূলক করে তুললো। সম্পাদনা এই প্রকার ছবিতে হলো শটসমূহের মধ্যে pictorial-spatial-formal সম্পর্ক স্থাপন। ইতোমধ্যে ছবিতে শব্দ এসেছে, চলচ্চিত্রের নাটকীয়তা ও প্রকাশযোগ্যতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এর ফলে। শব্দ ও সংলাপ অনেক কিছু বুঝিয়ে দিতে পারে বলে মূল ইমেজকে ফ্রেমের মধ্যে যে কোনো স্থানে রাখা যাচ্ছে, যে কোনো আকারে ও পারস্পেক্টিভে। যার অর্থ ট্রানজিশনের প্রশ্ন আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলো। ট্রানজিশন তো শুধুই শটসমূহের ধারাবাহিক সংযুক্তিকরণের ক্ষেত্রে নয়, বিভিন্ন দৃশ্য থেকে ধীরে ধীরে ক্রমবিকাশ ধীরে ধীরে পরিণতি পাচ্ছে তার ক্ষেত্রেও। সম্পাদনা এর ফলে হয়ে পড়েছে এমন এক সৃজনশীল প্রক্রিয়া যা দৃশ্য / শব্দ, মনন সেন্স—তিনটে স্তরেই ক্রিয়াশীল। স্ট্রুহাইম, সিষ্ট্রম, হিচকক, ওয়েলস, রেনোয়া, মুরনাউ, মিজোগুচি প্রমুখের ছবি তার প্রমাণ। চল্লিশের শেষ পর্বের বছরগুলোতে সম্পাদনা একটা সবাক চিত্রের fullest-finest-furthest আউটকাম অর্জন করতে শিখে গেছে। সম্পাদনা তখন একই সঙ্গে অ্যাপ্রোচ, প্রক্রিয়া ও বিশ্লেষণ। পঞ্চাশের দশকের শেষভাগে প্রসারিত পর্দার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদনার প্রধান অবলম্বন—দ্রুত ও ছান্দিক কাটিং পদ্ধতি—দৃষ্টিকটু হয়ে পড়লো। প্রসারিত পর্দায় তার ব্যবহার হয়ে পড়লো জার্কি। আবার বড়ো মাপের পর্দা একই শটের মধ্যে বিবিধ উপাদানকে সংহত করতে পারায় কাটিংয়ের মাধ্যমে এক উপাদান থেকে অল্প উপাদানে যাবার প্রচলিত পদ্ধতি আর অনিবার্য রইলো না। সম্পাদনার মনতাজসম্মত সংবিধান ফরাসি নুভেল ভাগ পরিচালকদের বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আগের তুলনায় নমনীয় ও বিভাজিত হলো। মনতাজ-বিরোধী প্রবণতা চূড়ান্ত রূপ পেল ইয়াকোর ছবিতে, হয়তো মাত্র ২০টি দীর্ঘ শট নিয়ে গঠিত হলো তাঁর ছবি। বর্তমানে অধিকাংশ ছবির সম্পাদনায় মনতাজের স্তর-গুলিকেই কিছু কিছু বিচ্যুতি বিরোধিতা ও সংশোধন সহ অনুসরণ করা হয়।

সম্পাদনা চিত্রনাট্যকারকে শেখায় এমনভাবে দৃশ্য গড়তে ও দৃশ্যগুলি সাজাতে যাতে গল্পের বিকাশ ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং পরিচালকের হাতে তুলে দেয় সেই স্বযোগ যা দিয়ে প্রতিটি দৃশ্যে ও সমগ্র ছবিতে প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ, গঠন, ছন্দ, আবেগ / নিরাবেগ ও ভাব সঠিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

ফিল্ম ফর্ম ও ফিল্ম সেন্সের বিচারে সম্পাদনারীতির কয়েকটি শ্রেণী বিভাজন করা যায়, যেমন—

১. শটের দৈর্ঘ্য বা দৃশ্যপর্যায়ের বিস্তারের পরিবর্তে শটের প্রকাশনেশ অল্পস্বারে সম্পাদনা : এই পদ্ধতিতে একটা লং শটের পরে পরেই আদ্যন্তে শ্যানে উপাদানগত একটা ক্লোজ আপ, যে উপাদানটি ক্ষুদ্রাকারে লংশটে উপস্থাপিত হয়েছিল। সম্পাদনার এই পদ্ধতিতে বৈচিত্র্য আনার জন্য ডিটেলের কয়েকটি শট পরপর এনে একটা গোটা দৃশ্য বা ঘটনা বা সিন্চুয়েশন গড়ে তোলা যায়। এখানে চূড়ান্ত ফিল্ম সেল অনেকটাই নির্ভর করবে সম্পাদনার পদ্ধতির ওপর। ছায়াচিত্রটি অজিত হবে শটের দৈর্ঘ্য ও গতির বিভেদ জনিত ঘাতের বৈচিত্র্যের মাধ্যমে। তারই সঙ্গে বিবেচ্য জয়েনিং পয়েন্টগুলোতে কীরকম জোর পড়েছে তা। একটি নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যে মিড লং শট থেকে মন্থণ ভাবে ক্লোজ আপে চলে এসে মন্থণ ভাবে গতিময়তার মধ্য দিয়ে দৃশ্যবস্তুর কোনো পরিবর্তন না হলে, কাটিং পয়েন্টে জোর পড়ে আলতো ভাবে। সেই তুলনায় লং শট থেকে ক্লোজ আপে চলে যাওয়া এবং তাতে দৃশ্যবস্তুর বা দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন অনেক জোরালো প্রভাব সৃষ্টি করে। এইভাবে কাট ও মিক্স বা ডিজলভের মধ্যে এবং কাট ও কুইক কাটের মাধ্যমে মেজাজ ও প্রভাবের পার্থক্য রয়েছে। অনেক সময়ে শটের কাটিং পয়েন্টে না কেটে বিশেষ ধরনের ছন্দ ও টেনশনও সৃষ্টি করা যায়।

২. সম্পাদনার সিনক্রনিক রীতি : এই পদ্ধতিতে সমান্তরাল ঘটনার পাব প্রেক্ষিতে শটসমূহ বা দৃশ্যপর্যায়গুলি সাজানো হয়। এরই পরিবর্তন রূপ তোলা একই স্থানের একই সময়ের অথবা একই সময়ের বিভিন্ন স্থানের মানচিত্র শ্যানে একসঙ্গে দেখানো।

৩. সম্পাদনার সিঙ্ক্লিক রীতি : সমান্তরাল বা অসমান্তরাল ঘটনা শ্যানে মধ্য থেকে একটি প্রতীকী ব্যঞ্জনা তুলে আনা। সম্পাদনার এই পদ্ধতিতে মনোচিত্রের চূড়াল মনতাজের সঙ্গে সৃষ্টি, যা বহিরঙ্গের ঘটমান বাস্তবতার পরিবর্তে সিনক্রনিক করে অন্তর্বাস্তবের ওপর।

৪. সম্পর্ক সাপেক্ষ সম্পাদনা : সম্পাদনার যে পদ্ধতি দৃশ্য বা দৃশ্যবস্তুর বিস্তারের ওপর নির্ভর করে না, যা দৃশ্যবস্তুর আকার বা শটের গতির দাপুণ্ড অল্পস্বারে অথবা আকার বা গতির বৈপরীত্য অল্পস্বারে অথবা দৃষ্ট দাপুণ্ড বা বৈপরীত্যের বিশেষ কোনো সমবায় বা বিস্তার অল্পস্বারে পরিচালিত হয়। বিদ্যুৎ ফিল্ম এই ধরনের সম্পাদনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সম্পাদনার কাজটা সব শিল্পেই আছে। সিনেমায় তার কাজ প্রাথমিক স্তরে পর, যা নিশ্চয়ই স্ববিধাজনক। একটা ছবিতে প্রাথমিক স্তর থেকে শ্যানে

স্তরে তুলে আনার জন্ত সম্পাদনা অপরিহার্য, তা ছবিটিকে নিয়ন্ত্রিত করে, স্থবিশুদ্ধ করে, স্মৃশূলভাবে ধরে রাখে। ছবির ক্রমবিকাশের ধারা ও গতিকে বিচার করে দেখে। একটা ছবির সার্বিক সাফল্য অর্জনের অত্যন্ত উপায় হলো সম্পাদনা। সম্পাদনা কীভাবে গুল্লের কাঠামো গড়ে তুলছে, আবেগ ও মননের খোরাক যোগাচ্ছে, বিভিন্ন খণ্ডাংশকে দৈর্ঘ্য, ছন্দ ও টেম্পো অনুসারে গতিশীল ও অতিষাণী করে একত্রে গেঁথে নিয়ে ছবিকে মসুর বা দ্রুতগামী করে তুলছে, ছবির মূল ধীমকে সযুক্ত করছে বা ধীমের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলিকে অস্পষ্ট করে তুলছে, প্রভৃতির উপর নির্ভর করে ছবির শৈল্পিক সাফল্য ও ব্যবসায়িক সাফল্যের সম্ভাবনা। গল্প-রসের শেষ কণাটুকুও বের করে আনা, নাটকীয় ক্লাইম্যাক্সের চরমে পৌঁছনো, অতিনাটকীয় দিচুয়েশনকে কিছুটা ইনট্রোভার্ট করে তোলা ও বিনাটকীয় দিচুয়েশনকে কিছুটা এক্সট্রোভার্ট করা প্রভৃতির একমাত্র উপায় হলো সম্পাদনা। চমৎকার সম্পাদনা একটা খারাপ ছবিকে ভালো করে তুলতে পারে, আবার একটা ভালো ছবি দুর্বল সম্পাদনার ফলে বিরজিকর হয়ে উঠতে পারে।

সম্পাদনাকর্মে সম্পাদককে লক্ষ্য রাখতে হয় উদ্দেশ্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে একটা দৃশ্যের কত বেশি বা কত কম দেখানোয় অভিঘাত সর্বাধিক। এইভাবে ছবিতে সম্পাদকের প্রধান কাজ হলো ছবির গতিকে আয়ত্তাধীন রাখা, ছবির সুর, ছন্দ ও তাল ঠিক ঠিক সৃষ্টি করে দেওয়া, এবং কোন্ দৃশ্য কতক্ষণ পর্দায় থাকলে গতি, সুর, ছন্দ অক্ষুণ্ণ থাকে ঠিক করা। জার্ক ও গিমিক কতটা কার্যকারী হবে তাও অনেকটা নির্ভর করে সম্পাদনার ওপর। এক একটা শট সম্পাদনার গুণে অল্প শটের উপর প্রভাব বিস্তার করে ছবিতে নিজেদের একেবারে মিশিয়ে ফেলবে, আলাদা করে ফলাফল বা ভালোমন্দ বিচার করা সম্ভব হবে না, বিচার বিশ্লেষণ হবে সামগ্রিক-তার ভিত্তিতে। মাত্রিক উপাদানের মধ্য দিয়ে গুণানুকৃতায় উপনীত হওয়ার একটা পদ্ধতি হলো সম্পাদনা। ছবি যা তোলা হয় সম্পাদনা তাকে অনেকাংশে অস্তরকম করে দিতে পারে, ছবিকে নিয়ে যেতে পারে বস্তুসত্য কিংবা শিল্পদত্তোর দিকে। গ্রায়াতই বলা হয়েছে, 'The editing is the exclusive analysis of thoughts for representation.'

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : K. Reisz ও G. Miller-এর দি টেকনিক অব ফিল্ম এডিটিং।

ঈশ্বর চক্রবর্তী, ধীমান দাশগুপ্ত

## ॥ সমাজ ও চলচ্চিত্র ॥

চলচ্চিত্র যখন অল্পদের জীবনযাত্রা ও কল্পনাকে তাদের নিজস্ব পরিবেশের পান প্রেক্ষিতে তার বিশেষত্ব পরিবেশন করেছে (কখনও অতিশয়িত বা বিকৃত হলেও) তখনই চলচ্চিত্রের আবেদন ও প্রভাব সবচেয়ে প্রবল হয়ে উঠেছে। ফলে সমাজে সিনেমার ভূমিকা কী তা পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

ইংলণ্ড-এর রথা, ফরাসি দেশের সাহুল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রায়মন্ড মস জেকব্‌স, চলচ্চিত্রের এই আদি ঐতিহাসিকবৃন্দ ছিলেন সমাজসচেতন। তেইন-এর উত্তরসূরি। তাঁদের রচনার প্রভাবে চলচ্চিত্র সম্পর্কে একটি ধারণা ধারণা বহুজনের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। তাঁদের মতামতসমূহে শিল্পকর্ম তার সমাজে সৃষ্টে এমনই এক বন্ধনে জড়িত যে নান্দনিক ক্রিয়ার জন্তু যে স্বাধীনতা পশ্চিম অবস্থা প্রয়োজনীয়, তার লেশমাত্র শিল্পে পাওয়া যাবে না। এত তদুপায় শিল্প ও সমাজ দুটি পরস্পরবন্ধ বিষয়। সমাজ শিল্পকর্ম সৃষ্টি করে, অপরদিকে শিল্পকর্ম সৃষ্টি করে সমাজকে। শিল্পীর মত, চিন্তা বা কল্পনার প্রকাশের স্বাধীনতার সমাজে লিখতে গিয়েও রথা এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে যাননি। তিনি শুধু ভাষা করেছিলেন যে সমাজ-শিল্প-সমাজ বৃত্তটি তিনি যে সমাজে বাস করেন সেখানে কাঙ্ক্ষিত হয়ে অল্প কোনো সমাজে কার্যকরী হোক। সমাজ-সচেতন লেখকদের কাছে চলচ্চিত্র সমাজের যথার্থ প্রতিফলন বা দর্শন। এই তত্ত্বটি নিয়ে আলোচনায় দরকার নেই। ব্যাখ্যাভীতকে ব্যাখ্যা করার যে একটি চেষ্টা। তবে শিল্পের কী ভাবে জন্ম নেয়, এই দুর্ভাগ্য প্রথমে বিচারে খানিকটা আলোকপাত করতে হবে। তবে প্রয়োগে। কিন্তু আমাদের কাছে যা প্রত্যক্ষ মূল্যবান তা হলো এই যে, যে-তত্ত্ব নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করছিলাম, তা আমাদের নিয়ে যেতে পারে এক নৈতিক দৃষ্টিকোণে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে চলচ্চিত্র ও সমাজের এই পরস্পরবন্ধ অস্তিত্বকে যেনে নিলে আমরা চলচ্চিত্রকে সমাজ পরিবর্তনের কাজে ব্যবহার করতে পারি এবং তা-ই করা উচিত। এই দৃষ্টিকোণ আগের দৃষ্টিকোণের মতো ধরে নেয় না যে শিল্পীর স্বাধীনতা নেই, বরং দর্শকের স্বাধীনতাকেই অস্বীকার করে বসে। কারণ, শিল্পীর অভিজ্ঞতা ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যেমন এক নান্দনিক দূরত্ব আছে তেমনই দর্শক যা দেখে এবং দর্শক যা করে, তার মধ্যেও এক দূরত্ব আছে। যাদের কাছে সিনেমা একটি হাতিয়ার বিশেষ, তাঁরা এত দূরত্বকেই অস্বীকার করেন।

সাধারণত ছবি তৈরি করতে গিয়ে শিক্ষক ও রাজনীতিবিদ, এই উভয় সম্প্রদায়ই চলচ্চিত্রে সমাজ-পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে ধরে নেন। রাজনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদেদের লক্ষ্যই হলো—যে সমাজব্যবস্থা আছে, হয় তাকে রক্ষা করা, নয়তো তাকে ধ্বংস করা। যখন তাঁরা প্রচলিত সমাজের উচ্ছেদে রত হন, তখন প্রতিপক্ষের চোখে তাঁরা হয়ে ওঠেন যথাক্রমে বিপ্লবী ও প্রচারক। ‘ফিল্ম ওয়ার্ল্ড’ গ্রন্থে আইভর মনটেগু বলেন, ‘একটি বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে এক ধরনের মনোভাব দেখা যায়। যা-কিছু তাঁদের মতাদর্শের সপক্ষে তা-ই তাঁরা অ-রাজনৈতিক বিবেচনা করেন, এবং সেই মতাদর্শের কোনো রকম বিরুদ্ধাচরণের অর্থই হলো ‘রাজনীতির অনুপ্রবেশ’। বস্তুত আমরা সচরাচর ধরেই নিই যে শিক্ষা হচ্ছে আমাদের পছন্দসই চিন্তাভাবনার পরিবেশন, এবং যা আমাদের পছন্দ নয় তার পরিবেশনই হলো প্রচার বা প্রপাগান্ডা। অর্থাৎ কে কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছেন, তারই উপর সব নির্ভর করে। একজনর কাছে যা শিক্ষা, অপরের কাছে তা-ই প্রচার। যেমন ‘পোটেরমকিন’ রাশিয়ায় শিক্ষার বাহন রূপেই গণ্য হয়েছিল, অথচ সেই একই ছবি আমেরিকায় প্রচার ছাড়া আর কিছুই নয় বলে চিহ্নিত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেই শিক্ষা ও প্রচার সমাজ থেকে বিযুক্ত হয়ে যায়। শিক্ষা ও প্রচার, দুয়ের কর্মপদ্ধতি অনেকাংশে একই। তবে প্রচার কখনও কখনও প্রবল চাপ সৃষ্টি করে স্বাধীনতার বিঘ্ন ঘটাতে পারে। সম্ভবত শিক্ষা ও প্রচারের মধ্যে এই একটিই পার্থক্য। দৃষ্টান্তরূপ সোভিয়েত ইউনিয়নে চলচ্চিত্রের ব্যবহার অনেক বিষয়েই আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। সেখানে বিপ্লব পূর্ববর্তী কালের দিনেমাকে এক ধরনের আফিম বলে গণ্য করা হয়েছিল। এই আফিম জনগণকে এমনই এক আত্মতৃপ্তির মধ্যে মজিয়ে রেখেছিল যে তারা সমাজ-পরিবর্তনের তাগিদে অনুপ্রাণিত হয়নি। নতুন সোভিয়েত সরকার শিক্ষা মন্ত্রকের অংশ রূপে একটি চলচ্চিত্র দপ্তর প্রতিষ্ঠা করে; তার লক্ষ্য ছিল জনগণকে শিক্ষা দান। সোভিয়েত সরকার জনগণকে সঠিকভাবে চিন্তা করার শিল্প শিখিয়েছেন এই মাধ্যমটিকে স্চিান্তভাবে প্রয়োগ করে। জার-এর আমলে যে-দিনেমা ছিল সমাজের আফিম, সোভিয়েত সমাজে তা-ই হলো নিয়ামক মন, এবং সেই মনকে ঠিক পথে চালিত করার অধিতীয় মালিকানা সোভিয়েত সরকার নিজেই গ্রহণ করলেন।

জার দ্বিতীয় নিকোলাস এবং লেনিন সম্ভবত বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়ায় একই ফিল্ম দেখেছিলেন। কিন্তু তাঁরা সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। নিকোলাস

ভেবেছিলেন, সিনেমার তেমন কোনো গুরুত্ব নেই, ভেবে শান্তি পেয়েছিলেন। দিনেমাকে শিল্প হিসেবে ভাবতে যাওয়াই তিনি পাগলামি বিবেচনা করেছিলেন। তিনি যে সমাজব্যবস্থার অঙ্গাঙ্গী ছিলেন তার সঙ্গে দিনেমার সম্পূর্ণ সংগতি ছিল। অপরদিকে লেনিন ভাবতেন বনতান্ত্রিক বা বুর্জোয়া দিনেমা 'মনোবিবেচনা' অর্থাৎ জরুরি সামাজিক সমস্যা থেকে দর্শকের মনকে বিক্ষিপ্ত করার জন্তু মনোবিবেচনা ব্যবসা। যারা সমাজে পরিবর্তন আনতে অঙ্গীকারবদ্ধ তাঁরা অভিনয়কলায় গুরুত্ব নিছক মনোবিক্ষেপক হিসেবে, অর্থাৎ কেবলমাত্র সময় কাটানো ও গোপন মনোবিবেচনা লাঘব করার উপায় হিসেবে মেনে নিতে পারেন না। বিপ্লবীরা তাঁদের বৈখ্যিক চেতনাকে ছবির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে চান এবং এই মাধ্যমের ব্যবহারেই বিপ্লব ঘটাতে চান। যেমন, কিছু ফরাসি বিপ্লবী এই মত পোষণ করেছিলেন যে একমাত্র গেরিলা থিয়েটারই যথার্থ থিয়েটার। ধারণাটি শিল্পবিরাগী। আইজেনস্টাইন আগেই বুঝে গেছিলেন যে অমিকদের নাটক তিনি কারখানায় আয়োজন করতে পারেন না। 'গ্যাস মাস্ক' নাটকের অসাকল্যের পরই আইজেনস্টাইন দিনেমায় চলে আসেন। বাস্তববাদের ভ্রান্ত ধারণা থেকে যে-শিল্প নিজেকে বিনয়ী করে তাকে ছেড়ে আইজেনস্টাইন দিনেমার শিল্পকে অবলম্বন করেন। আইজেনস্টাইন যখন 'গ্যাস মাস্ক' থেকে 'স্ট্রাইক' ও 'পোটেকিন'—এ সরে আসেন, তখন তাঁর মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল এই বোধ যে বাস্তবকে পুনর্বিষ্ণুত করা দরকার।

শিল্পই এই পুনর্বিষ্ণুত সাধন করতে পারে। অমিকদের নাটক যেমন কারখানায় অভিনীত হতে পারে না, তেমনই বিপ্লবের নাটক রাস্তায় অভিনীত হতে পারে না, গেরিলাদের নাটক গেরিলা জীবন-যাত্রার মধ্যে অভিনীত হতে পারে না। সব অর্থেই বলা যায়, বিপ্লব নাটক নয়।

'ব্যুটন অফ আলজিয়ার্স'-এর মতো কোনো ছবি যখন তার দর্শকদের সাময়িক ভাবে এক রাজনৈতিক সমাবেশে পরিণত করে, তখন তা সাধিত হয় চরিত্রিক নান্দনিক গুণের কারণে নয়, বরং ঐ বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তের মানসিক ভাষা। 'ইনডিয়ান ফিল্ম' গ্রন্থে সুলভগ্যাম্ কুব্জামী মাস্ত্রাজে প্রদর্শিত কয়েকটি চলচ্চিত্রের উল্লেখ করেছেন। প্রতীক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এই ছবিগুলি রাজনৈতিক বক্তব্য চরিত্র পরিগ্রহ করেছিল। প্রথমে এই প্রতীকগুলির ব্যবহার ছিল নিঃস্বার্থ আপত্তিক। পরে এগুলি সচেতনভাবেই প্রয়োগ করা হতে থাকে। এবং এই ছবিগুলি সন্দেহাতীতভাবেই একটি নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করে। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে কোনো ছবির নান্দনিক গুণাবলীর সঙ্গে তার রাজনৈতিক সূক্ষ্মতার

কোনো সম্পর্ক না থাকতে পারে। যখন চলচ্চিত্র এ-জাতীয় কোনো রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করে, তখন তা এক ধরনের আচারে পরিণত হয় এবং প্রায় এক যাদুবল লাভ করে।

সমস্ত সমাজেই অংশগ্রহণের নানা আচার রয়েছে। এই আচারগুলি বিদেশী অতিথিদের চোখেই সবচেয়ে প্রকটভাবে ধরা পড়ে। আমেরিকায় ফুটবল খেলা যতটা খেলা হিসেবে গণ্য তার চেয়ে বেশি একটি গণ অহুঠানে অংশগ্রহণ রূপে গণ্য। সকালে আমরা যে খবরের কাগজ পড়ি, তাও এক ধরনের অংশগ্রহণ। সিনেমাও এক আচার হয়ে উঠে যাদুবলে জনসাধারণকে এক সমষ্টিগত অস্তিত্বে আবদ্ধ করে। প্রচার বা শিক্ষাদানের দায়িত্বে নিয়োজিত চলচ্চিত্র সমাজ গঠন করে, যাদুর ভূমিকায় অবতীর্ণ চলচ্চিত্র তদানীন্তন সমাজকে বেঁধে রাখে। চলচ্চিত্রের যাদুবলকেও অবশ্য রাজনীতির কাজে লাগানো যায়। যেমন, 'পোটেকিন' ছবিটি সংকটকালে মানুষকে প্রেরণা জুগিয়েছে, এখনও জুগিয়ে চলেছে। এই কাজে সফল হতে গেলে ছবিকে যে শিল্পকর্ম হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই; যদিও শিল্প নিজেই এবং স্বভাবতই শিল্পসম্মত চলচ্চিত্রও এই কাজ করতে পারে। 'দ প্রিন্সিপ্ল্জ অফ আর্ট' নামে তাঁর গ্রন্থে কলিংউড বলেন আচারের যাদুবল সমাজের কাছে গুরুত্বপূর্ণ; এবং শিল্পের বিধি মেনে চলে না বলেই এই আচার-গুলিকে বরবাদ করার কোনো অধিকার সমালোচকদের নেই।

মানবৈতিহাসে যাদুবলে বলীয়ান ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আচার ক্রমবিস্তারিত শিল্প হয়ে উঠেছে। কারণ বৈষয়িক স্তরে কার্যকর হয়েও তারা সেই স্তর অতিক্রম করে আত্মদানের স্তরে পৌঁছে গেছে। প্রচারধর্মী ও রাজনৈতিক ছবি মুখ্যত যাদুবলসমৃদ্ধ আচারের ভূমিকা পালন করে। কিন্তু শিল্পীর হাতে সেই ছবিই হয়ে উঠতে পারে নান্দনিক আত্মদানের বিষয়ও। যদিও রাজনৈতিক ভূমিকায় সফল হতে গেলে চলচ্চিত্রকে যে নান্দনিকতার স্তরে পৌঁছতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু কোনো রাজনৈতিক ছবি যদি কাল্পনিক কোনো কাহিনী অবলম্বন করেই গড়ে ওঠে, তবে তার বক্তব্য পৌঁছে দেবার জগুই তার খানিকটা সৌষ্ঠব থাকা দরকার। এই সৌষ্ঠব প্রায়ই শিল্পের সৌষ্ঠব। (ড্র. রাজনীতি ও চলচ্চিত্র)

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : J. P. Mayer-এর Sociology of Film ।

গান্ধী রোবের্জ

## ॥ চলচ্চিত্র সমালোচনা ॥

চলচ্চিত্র বিষয়ক যে কোনো আলোচনাকে এই অনুষ্ঠিতে রাখছি। ছবি সম্পর্কে শাদানাঠা তথ্য ও চলচ্চিত্রপঞ্জী থেকে মাস-মিডিয়ায় অন্তর্ভুক্ত ফিল্ম রিভিউ, বিভিন্ন কালের ও বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস থেকে চলচ্চিত্র-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা নিয়ে আলোচনা, কোনো একক ছবি বা পরিচালক সম্পর্কে বা সাধারণভাবে চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পগত / নান্দনিক / সমাজতাত্ত্বিক / টেকনিকাল মূল্যায়ন (যাকে বলা যায় ক্রিটিকসিজম) থেকে সিনেমা বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তাৎপর্য গবেষণা (যেমন আইজেনস্টাইনের), স্রষ্টাদের জীবনী, সাক্ষাৎকার বা স্মৃতিকথা থেকে ছবির মুদ্রিত চিত্রনাট্য। ব্যক্তি, গ্রন্থ ও পত্রিকার নাম স্বাভাবিক ভাবেই আসবে। ফিল্ম রিভিউ, সিরিয়াস ক্রিটিকসিজম ও ফিল্ম থিয়োরি, সমস্ত লেগার অর্থাৎ দরকার সঠিক ফিল্ম এ্যাপ্রিসিয়েশন-বোধ। রিভিউ ছবির বিষয়বস্তু, তার ভাষা, মন্দ, সাকল্য-ব্যর্থতা নিয়ে প্রাথমিক উল্লেখ। এ্যাপ্রিসিয়েশন থেকে আসে ছবি সম্পর্কে নিজস্ব ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া। ক্রিটিকসিজম ওই প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। রিভিউয়ে মন্তব্য আসে ব্যাখ্যা ছাড়া, ক্রিটিকসিজমে যে কোনো মন্তব্যকে কিন্তু মুক্তিসঙ্গত বা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। 'স্মার সম্পূর্ণ তাত্ত্বিক গবেষণা তো সম্পূর্ণ নতুন কিছু নিয়ে যা ফিল্ম থিয়োরি'র মতো ফিল্ম ফর্ম দুটিরই অবকাশ ও সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয়। চলচ্চিত্রের আদিগুণের পাঁচগুণের মধ্যে আছেন জর্জ মেলিয়েস (ড্র.), রিকিওলো কাহুদো, জেরমেন ড্যানাল, প্যাঁ মুসিনাক, আবেল গাঁস (ড্র.), প্রমুখ। Photogenic Cinema of the 19th সময়ের দুটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা।

নিয়মিত চলচ্চিত্র সমালোচনার স্বচনা হয়েছিল বিশ শতকের গোড়ায় সংবাদপত্রে অব্জেকটিভ রিভিউ দিয়ে। তারপর মাধ্যমটির সম্ভাবনা, চলচ্চিত্রের রূপ ও রূপ প্রকাশের ভঙ্গি, বিভিন্ন টেকনিকের বিচার বিশ্লেষণ ইত্যাদি অংশে এল ক্রিটিকসিজম। বালাজ (ড্র.) চলচ্চিত্রকে একটি নান্দনিক ডিগ্রেসিভ দিতে সচেষ্ট হলেন। চলচ্চিত্রের আলোচনায় দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সমাজতাত্ত্বিক প্রসঙ্গকে মেলাতে চাইলেন বাজঁঁ (ড্র.)। আবেগ নয়, মনন, নাটকীয়তা নয়, সচেতনতা, বললেন ব্রেথট (ড্র.)। কাইয়ে ছবি সিনেমা (ড্র.) পত্রিকার চিত্র সমালোচক গোষ্ঠী বাজঁঁঁর ভাবধারাকে প্রসারিত করে তাদের auteur theory (ড্র.) কে রূপ দিলেন, যা ছবির বিবিধ উপাদানের ও মাধ্যমটির উপর সম্পূর্ণ

দখল থাকা চিত্রনির্মািতাদের জাত স্রষ্টা আখ্যা দিল। এতদিন বরে অবহেলিত হলিউডের বহু ছবি ও মিজোগুচি রেনোয়া হিচককদের মতো মাস্টারের ছবিতে তাঁরা জাত স্রষ্টার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের একই উন্নত লক্ষণ খুঁজে পেলেন। ফিল্ম থিয়োরি সমৃদ্ধ হয়েছিল যুগত রাশিয়ান মাস্টারদের রচনায়, কুলেশভ (ড্র.) পুদভকিন (ড্র.) ভের্তভ (ড্র.) এবং অবশ্যই আইজেনস্টাইন (ড্র.)। এর পাশাপাশি চলচ্চিত্রের ইতিহাস নিয়েও লেখা হয়েছে। জ্যাকবন (ড্র.) সাহুল (ড্র.) বোথা (ড্র.) লরেন্জ (ড্র.) ম্যানভেলের (ড্র.) লেখায় ইতিহাসের সঙ্গে এসেছে শিল্পরূপের কথা। এপস্ট'্যা (ড্র.) জ্যাকউয়ার দোনটাগের (ড্র.) লেখায় এসেছে শিল্পরূপের সঙ্গে বিভিন্ন তাৎকিক প্রস্তাবের উপস্থাপন। সিনেমা নিয়ে সাধারণ ও সরল রচনার পরিবর্তে আলোচনা ক্রমেই হয়ে উঠছে ব্যক্তিগত, জটিল ও পরীক্ষামূলক। আলোচনায় এক সময় মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রাধান্য বেড়েছিল, কাইয়ে গোষ্ঠী ভাববাদী নন্দন থেকে মার্ক্সবাদী বিচার পদ্ধতিতে চলে আদার মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্যে এই প্রবণতার ব্যাপক সূচনা। তার আগে অবশ্য মনটাগুর (ড্র.) লেখায় এই লক্ষণ দেখা গেছে। এখন লেখা হচ্ছে সিনেমার স্ট্রাকচারালিজম (ড্র.) সেমিঅলজি (ড্র.) ও ডিকম্‌স্ট্রাকশন নিয়ে, চলচ্চিত্রের বিভিন্ন প্রতীতির বিশ্লেষণে ভাষাতাত্ত্বিক মডেলকে কাজে লাগানো হচ্ছে, তাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা চলছে গণিত ও জ্যামিতি দিয়ে। প্রথম শ্রেণীর একজন ক্রিটিক আগে রসিক, পরে বিচারক। যখন তিনি বিচারক তখন তাঁর ক্রিটিকিজে নিদিষ্ট প্রতিশ্রুতি ও নিজস্ব রীতি থাকবে। তিনি যেমন সমগ্র ছবিকে বিভিন্ন উপাদানে বিশ্লেষণ করে দেখবেন, তেমনি বিশ্লিষ্ট উপাদানগুলিকে সংশ্লেষণ করে ছবিটিকে redefines করবেন। রিডিফাইন করা এক ধরনের re-create করা। পূর্বে উল্লিখিত হননি এমন আর ঝাঁদের লেখায় এই গুণ উপস্থিত তাঁরা হলেন জেম্‌স এজী, গ্রাহাম গ্রীন, মারী সীটন, পার্কার টাইলার, রুডল্‌ফ আর্নহাইম, নোয়েল বার্চ, ক্রিস্টিয়ান মেজ্‌, অ্যাণ্ড, স্মারিস, রবিন উড, রিচার্ড রাউড, পলিন কেইল, এদগার মোর্যা, জীন ইয়ংরাড, জঁ মিতরি, পীটার কাউই, জন রাসেল টেলার, ডোয়াইট ম্যাকডোনাল্ড, স্ট্যানলি কাউফম্যান ও আরো অনেকে। নানা সময়ের চলচ্চিত্র প্রতিকার মধ্যে দি বায়োস্কোপ, Cinea, Lef, স্ট্রীন; আমেরিকান সিনেমাটোগ্রাফার, সাইট অ্যাণ্ড সাউণ্ড, সিনেমা টেলিভিশন ডাইজেস্ট, টেক ওয়ান, সোভিয়েত ফিল্ম, ইউনিজাপান ফিল্ম কোয়ার্টারি প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য।

॥ সংগীত ও চলচ্চিত্র ॥

'শুদ্ধ' হতে (এখানে 'শুদ্ধ' বলতে নিজস্ব 'ধর্ম' বা চরিত্র থেকে বিচ্যুত না হওয়া) চলচ্চিত্রকে সংগীতের আত্মীয় বলে প্রতিষ্ঠিত করবার আত্মস্টিক তাৎপর্য চেষ্টা যথেষ্ট হয়েছে। বহু আগে ১৯২৯ সালে থিও ডোয়েসবুর্গ 'Film as Pure Form' নামক প্রবন্ধে তাকে 'optical poetry' বলে গণ্য করেছেন, তাকে dynamic light architecture বলেছেন, এবং আশা করেছেন যে চলচ্চিত্র এককালে বাথ-এর স্বপ্নকে সম্ভব করবে—স্বপ্নটি ছিল নাকি 'Of finding an optical equivalent for the temporal structure of a musical composition'. কিন্তু দেখানে চলচ্চিত্রকে বিমূর্তকরণের এমন স্তরে নিয়ে ভাবা হচ্ছে যেখানে চলচ্চিত্র আদৌ 'representational' থাকছে না, এবং ঐ optical equivalent সংগীতের মতো হবে, তাতে হয়ত সংগীত প্রকৃতপক্ষে প্রযুক্ত হবে না। যেমন আমরা 'পটেম্‌কিন'কে যখন প্রযুক্ত সংগীত বাদ দিয়ে নিঃশব্দভাবে দেখে যাই তখন হয়ত তার মধ্যে ঐ রকম একটা optical equivalent of symphony দেখতে পারি। স্বয়ং আইজেনস্টাইন রচনাপর্বে মাথায় সংগীতকে যে রেখেছিলেন তা এখন পরিচিত সত্য। এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে নয়, সময় প্রবাহকে ভিত্তি ধরে চলচ্চিত্র ও সংগীতের এই সাদৃশ্য ভাবনার সঙ্গে নিছক abstraction বা বিমূর্তকরণের কোনো আবশ্যিক সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া আইজেনস্টাইন থেকে ঐ উদাহরণটিতে 'রেপেজেন্টেশনাল' গুল্য বসে একথা বলাই যাবে না। সত্যজিৎ রায়, যিনি একেবারেই বিমূর্তকরণের সমালোচন, এমনকি আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্র ভাবনা থেকে তাঁর ভাবনা বেশ দূরে স্থিত ছিল—তিনিও নিজের মতো করে ঐ সাদৃশ্য ভাবনায় ভাবিত ছিলেন তাঁর প্রমাণ আমরা পেয়েছি। 'কাঞ্চনভঙ্গা', 'অরণ্যের দিনরাত্রি' ও 'চারণার প্রস্তুতিপর্বে' ভাবনা এবং হয়ত দর্শন শেষে অনেক দর্শকের অমুভাবনার ক্ষেত্রে কথাটা প্রাসঙ্গিক। সংগীতভাবনা ও চলচ্চিত্রভাবনাকে এভাবে এক করার সিদ্ধান্তে একটা অনুভব বা ধারণাও কাজ করে—সময়ের শরীরে খণ্ডচিত্রের গতিময় বিচ্ছাদের সঙ্গে সময় প্রবাহতেই বিভিন্ন সরের পারস্পরিক বিচ্ছাদের মধ্যে কোথাও একটা সাদৃশ্য আছে। কিন্তু এ কথাতেও এই দুই শিল্পের তাৎস্বিক সম্পর্ক চিত্রার ক্ষেত্রে একটি স্থান নির্দিষ্ট জবাব মিলছে না। দুই ক্ষেত্রে সময়ের ব্যবহার ভিন্ন একথা বলতে চাইছেন তারকভঙ্কি তাঁর 'স্কাল্পটিং ইন টাইম' পুস্তকে। তিনি বলতে

চাইছেন সময় সংগীতে পূর্ব-নির্ধারিত থাকে না, সময় ছোট বড়ো হয় পারফর্মেন্স অনুযায়ী, মানে লয় একেবারে অবধারিতভাবে পূর্বনির্দিষ্ট নয়, কিন্তু একটি চলচ্চিত্রে সময় ছবিটার সঙ্গে অবধারিতভাবে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তারকভঙ্কির এই ধারণার সঙ্গে মতাজ অপেক্ষা মিজ-ঐ-দেনকে অধিক গুরুত্ব আরোপ এবং শটে-শটে সংঘাতজনিত 'রিদম'-এর বদলে শটের মধ্যেই প্রবহমানতায় সময়ের বিচরণকে অধিক মূল্যদানের কথা—এক করে দেখবার মতো। তারকভঙ্কির মন্তব্যের জবাবে একটা কথা বলা যায়—ম্লো মোশন, অ্যাকসিলারেশন ইত্যাদির সাহায্যে একটা ছবিতে রেকর্ডের পারফর্মেন্স-এর মতো করে চলচ্চিত্রেও সময়কে ছোট বড়ো করা যায়, তুমিও করেছ। আসলে একটা জায়গায় মোটামুটি একটি দতাকে মেনে নেওয়া যায়—সেটা হলো 'গুরু'তা নিয়ে শুচিবাইগ্রন্থ হবার দরকার নেই, সংগীতের কাছে চলচ্চিত্রের ঋণ স্বীকারে লজা নেই।

যখন শব্দহীন ছিল চলচ্চিত্র, সেই পূর্বে সংগীতের ভূমিকা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ছিল ভিন্ন, শব্দযুক্ত ছবির চেয়ে। ছবি দেখবার সঙ্গে সঙ্গে পাশে বসে যে পিয়ানোতে সুর বাজানো হত তার একটা যাকে বলে 'ফাংশনাল' দিক ছিল (দ্র. শব্দ ও সংগীত)। কালে তাতে নান্দনিকতা এবং / অথবা রাজনৈতিকতা প্রদর্শন তৈরি হলো। যখন শব্দ চিত্রশরীরে যুক্ত হলো, সে শব্দ সংগীত হোক, সংলাপ হোক বা যাকে 'ইন্সিডেন্টাল সাউণ্ড' বলা হয় তা হোক,—সে ক্ষেত্রে সংযম যে থাকবে না গোড়ায় সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু দেশেবিদেশে শব্দযুক্ত ছবিতে সংগীতকে ভেবেচিন্তে অত্যাধিক প্রয়োগের কথা ভাবা হয়েছে। মোটামুটি দেখা যায়, এপিক বা লিরিকাল, 'নিও' বা অথ কিছু যে কোনো রিয়ালিজম বা বাস্তববাদের সঙ্গে যারা জড়িত তারা প্রয়োগক্ষেত্রে নির্বাচন, সংযম-এর পক্ষপাতী ছিলেন তৎপত্তভাবে এবং কর্মক্ষেত্রেও। মিউজিকের 'নারকোটিক' একেই সম্পর্কে ব্রেস্টের দাবধানবাণী সুপরিচিত, জন উইলেটের বইতে তা উদ্ধৃত আছে। ব্রেস্ট-এর সাংগীতিক সহকর্মী হান্স আইস্লার হলিউডে 'হ্যাং মেন অলসো ডাই' ছবির সংগীতবাহ রচনা করেছিলেন এবং তিনি 'কম্পোজিং ফর দ্য ফিল্ম' বলে একটি পুস্তক রচনা করেছিলেন। তাতে শ্রবণকর্মকে 'প্যাসিভ' এবং দর্শনকর্মকে 'অ্যাকটিভ' এবং অনেক বেশি বর্তমান-সম্পৃক্ত—ফলত (সিনেমার ক্ষেত্রে) অনেক বেশি বর্তমান 'অগ্রসর ইণ্ডাস্ট্রিয়াল যুগ' সম্পৃক্ত বলে যে পৃথকীকরণ করেছেন, শ্রবণকর্মকে যেভাবে অনেক বেশি স্মৃতিআসক্ত বলেছেন তা সম্পূর্ণ না মানলেও কথাটা ভেবে দেখবার মতো। ঐ পৃথকীকরণের ভিত্তিতেই তিনি

চলচ্চিত্রের স্তম্ভ সংগীতরচনায় সজাগ থাকার পরামর্শ দিয়েছেন, নিজেও থেকেছেন। লক্ষ করে দেখবার মতো ইনিও বাজারী ছবি ও মিডিয়াতে সংগীতের অসংযত এবং নারকোটিক প্রয়োগ সম্পর্কে বিরূপতা প্রকাশ করেছেন। কুর্ট লন্ডন 'কিন্ম মিউজিক' বলে যে বইটা লিখেছেন তাতেও সংগীত ও চলচ্চিত্রের সাধর্ম্য নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন, দুটি মাধ্যমের মিলনকে 'অপ্রত্যক্ষভাবে সাধিত' বলে নির্দিষ্ট করেছেন, ছবির রং-এর প্রতিটি শেড সংগীতের ধ্বনির সঙ্গে অবিলেহভাবে জড়িত একথা ভাবতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু 'পরোক্ষভাবে সাধিত' হলেও সে সাধনে তো সংগীতের কিছু দান বর্তাচ্ছেই, যতই 'পরোক্ষ' তা হোক। .কাল্‌ই বলা যায় চলচ্চিত্রে সংগীত প্রয়োগ বিষয়ে কুর্ট নেতিবাদী নয়, সংযমবাদী এবং সংগীতকে চলচ্চিত্রের অনূগত রাখার পক্ষপাতী। হামুস্‌ আইস্‌লার দেখান 'লাইট নোটফের' প্রয়োগ চলচ্চিত্রে কেমন সার্থক হতে পারে। 'লাইট নোটফ' কথাটা এসেছে অপেরা থেকে, পৌনঃপুনিকতায় সৃষ্ট সংগীতাংশ যেখানে বিশেষভাবে দ্রোতক হয়। সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে এর বিশিষ্ট প্রয়োগের কথা সুবিদিত। তবে সেখানেও অসংযত ব্যবহার অস্বস্তিকর হতে পারে, তৈরি হতে পারে টটোলজি বা ক্লিশে।

কিন্তু 'টটোলজি'র ভয়ে চলচ্চিত্রে ধ্বনির সাংগীতিক ব্যঞ্জনাতে তো বরবাদ করা যাবে না, সংগীতপ্রয়োগে পরম কৃপণরাও (যেমন বেস্‌) এমন করেন। কোলাহলকে বা অত্যন্ত অসাংগীতিক শব্দকেও এমনভাবে সাধারণ হয়ে তোলাকার কারকে যা সৃষ্টি করবে চলচ্চিত্রের পক্ষে উপযোগী বিশিষ্ট ধরনের সাংগীতকথা। স্বতন্ত্র প্রকাশধর্মিতার বলে ঋত্বিক ঘটক চলচ্চিত্রে সংগীত প্রয়োগের ক্ষেত্রে সত্যজিৎ-ধরনের অন্তর্লীনতা পাওয়া যাবে না, যাবে বরং মর্মভেদী প্রাণত্যাগ। সত্যজিৎ ছবিতে শব্দ ও ইমেজের মধ্যে বৈপরীত্য রচনায় তেমন আগ্রহী ছিলেন না, মোটের ওপর সেখানে সংগীত ইমেজের কাছে পরাবীন, ইমেজ তাকে যেখানে জায়গা করে দেয় সেখানে সে নিজের কাজটি করে। কিন্তু সংগীতের সংখ্যাতময় প্রয়োগের বহু উদাহরণ ঋত্বিক ঘটকে আছে।

বুহুয়েলের 'নাজারিন'এ সংগীতের কোনো স্থান নেই, কিন্তু শেষ দৃশ্যে আনারস হাতে পাবার পর পাত্রীর গভীরবোধে উত্তরণের দৃশ্যে যে elevationটা আমরা পাই যা বোধহয় অতটা কার্যকরতার সঙ্গে সৃষ্ট হত না, সঙ্গে বাগধ্বনিটি না থাকলে। 'স্বর' না থাকলেও একক্ষণ ধরে সংগীতের অনুপস্থিতিকে এই প্রবল উপস্থিতি আরো অর্থময় করে তুলল। 'অপরাজিত'র শেষ দৃশ্যে অপূর এগিয়ে

চলার সঙ্গে বাতাবলি সেই তুলনায় বড়ো মুদ্র, এখানে সত্যজিৎ অতিসংঘের বলি  
বলা যেতে পারে ।

উপস্থিতি ও অল্পস্থিতি দুই নিয়েই চলচ্চিত্রে সংগীত এমন এক ভূমিকা  
পালন করে আসছে যা অল্পভাবে হতো না । গদারের ছবিতে সংগীতের সাহায্যে  
মন্তব্য, চার চরিত্রের টানাপোড়েন বলে 'প্রেনন কারমেন' ছবিতে বীটোফেনের  
'কোয়ার্টেট'-এর শারীরিক উপস্থিতি—সংগীতের বৌদ্ধিক প্রয়োগের বিশিষ্ট  
উদাহরণ । বৌদ্ধিক বা আবেগাশ্রয়ী যে রকম প্রয়োগই হোক—এবং যে ভাবেই  
তা হোক, সংগীত নানাভাবে চলচ্চিত্রকে ঋণী ও ধনী করে চলবেই । এতে  
চলচ্চিত্র জগতের লোকদের লঙ্ঘিত হবার কিছু নেই, দিনেয়ার 'সুন্দতা'র দোহাই  
পেড়ে ।

ক্রম গুপ্ত

॥ সংযোগ ও চলচ্চিত্র ॥

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে যখন চলচ্চিত্রের জন্ম হচ্ছে তখন, এই শিল্প ও  
ব্যবসায়-পণ্যটির জননী বুর্জোয়া সভ্যতা ও অর্থনীতি আয়প্রত্যয়ী ও তার বিকাশের  
চূড়ান্ত পর্বে উন্নীত—সংযোগের এত বড়ো প্রত্যক্ষ, বৃহদায়তন আরোজন ইতোপূর্বে  
ঘটেনি—অল্পদিকে শিল্পের দিক থেকেও এমন সমন্বয়ী শিল্পও অশ্রুতপূর্ব : ক্রমে  
দেখা গেল, চিত্র, থিয়েটার, কবিতা, গদ্য, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, সংগীত, সব কিছু এসে  
মিলে গেল শেষে, এই শিল্পের সংশ্লেষণে, আর জনতা যেহেতু কেবল বিচ্ছিন্ন  
ব্যক্তির সমাহার মাত্র নয়, আরো-কিছু, তেমনি চলচ্চিত্রও এইসব শিল্পের সমাহার  
শুধু নয়, পৃথক সত্তা বিশিষ্ট সম্ভাবনাময় শিল্প যা বুর্জোয়া-যুগের আদিপূর্বে-জাত  
উপস্থানের স্থান অধিকার করে আরও ব্যাপকভাবে, কখনো কখনো অরণ করিয়ে  
দেয় সভ্যতার উষাকালের এপিককে ।

ফিল্ম যে সবকিছু আন্তীকৃত করেই এগোয় এর তুলনা আদি শিল্পে যদি  
কোথাও খুঁজতে হয়, তবে তা স্থাপত্য । এই শিল্প কখনো থেমে যায়নি—অল্প যে  
কোনো শিল্প অপেক্ষা এর ইতিহাস প্রাচীন । স্থালটের বেঞ্জামিন চমৎকার  
বলেন : Its claim to being a living force has significance in every  
attempt to comprehend the relationship of the masses to art.  
স্থাপত্যশিল্পই মানুষের প্রয়োজন ও সৌন্দর্যবোধ, এই দুটিকে সমান মূল্য দেয় :  
অর্থাৎ সেই স্থাপত্যকর্মই ঈঙ্গিত যেখানে দুটিই মেলে হর-গৌরী মিলনে । আর

ভারসাম্যের সামান্য এদিক-ওদিকেই, স্থাপত্য হয়ে যেতে পারে কুৎসিত অথবা অকার্যকর শিল্পখেয়াল বিশেষ ! বস্তুতঃ চলচ্চিত্রও তাই : প্রথমাবধিই এর আকর্ষণ যেমন একদিকে ব্যবসায় পণ্য হবার দিকে, তেমনি অন্যদিকে সংযোগহীন ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন 'শিল্প' হওয়ার প্রবণতা এর মধ্যে প্রবল, বিশেষতঃ ডিস্টর্টনন বা মোচড়ানোর ক্ষমতা এখন চলচ্চিত্রের এত বেশি। এই দুটির মধ্যে ভারসাম্য করা যেহেতু দুর্লভ, সেহেতু চলচ্চিত্র তার বৈশিষ্ট্য হারায় : শিল্প-সম্ভাবনা হারিয়ে হয়ে পড়ে কুৎসিত স্থাপত্যের মতো, অথবা বৃহদায়তন শিল্পের গণমাধ্যমের এত বড়ো সেতু ভেঙে গিয়ে নিমিত হয় শিল্প-শিল্প খেলা, উজ্জীবনের নন্দনতর স্থান করে দেয় মানস-অন্ধকারের খামখেয়ালকে। ভুলে যাওয়া হয়, আর্নল্ড হসার তাঁর 'দি ফিলজ্জফি অব আর্ট হিস্ট্রি'তে যেমন বলেছেন চলচ্চিত্র একধরনের লোকশিল্প থেকেই জনপদী শিল্পে বিকশিত হয়েছে। চলচ্চিত্রের ভাষা তাই দর্শকদের পৃথক-ভাবে শিখতে হয়নি—ঘটনাবলী সাধারণভাবে সরল, সর্বজনবোধ্য ভাবেই উপস্থিত করা হত, ঠিক লোকশিল্পের মতই। অন্যান্য সব বিকাশমান শিল্পেরই নিজস্ব ভাষা আছে, কেবল সেই শিল্পের প্রতি উৎসাহী তৃতীয় পক্ষেই সে ভাষা আয়ত্ত করা সম্ভব। ফিল্মেরও নিজস্ব ভাষা আছে অবশ্যই, কিন্তু সে ভাষা দ্রুত দর্শকরা আয়ত্ত করে লোকশিল্পের মতই। ক্রমে ফিল্মের এই লোকশিল্পগত চরিত্র নষ্ট হয়ে গেল : এই চরিত্রহানির পথেই এল ফিল্মের বর্তমান দ্বৈত—একদিকে জনগোষ্ঠীর গৃহ ব্যবসা, অন্যদিকে সংযোগহীন শিল্পের উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এর নন্দনতর হলো ট্যালো সজাগ শিক্ত মুষ্টিমেয়ের উৎসাহের বস্তু। আর ব্যবসার দিকটা হলো, এর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

কিন্তু সত্যই কি বিচ্ছিন্ন ? ব্যবসা, মুনাফা বজায় রাখতে গিয়ে নন্দনতাত্ত্বিক কোনো বৈশিষ্ট্যই কি চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত হলো না ? বৃহৎ গণমাধ্যম হিসাবে চলচ্চিত্র আকর্ষণ করেছে বিপুল জনসাধারণকে—এই বিরাট গণঅংশগ্রহণ, বিপুল পরিমাণ গুণগত পরিবর্তনই আদল গণসংযোগে, চলচ্চিত্রের সামগ্রিক চেহারা। জনগণকে ঝাঁর ভয় পান তাঁরা সিঁটিয়ে গেলেন। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে থাকে 'জনগণ' নামক সম্ভাটির প্রতি অবজ্ঞা। ব্যবসায়িক-চলচ্চিত্র তাই সং-চলচ্চিত্রের শত্রু—এই মানসিকতায় কিন্তু চলচ্চিত্রের ক্ষতি হয়েছে বা হচ্ছে। এ খানিকটা বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিপক্ষে হস্তশিল্পকে দাঁড় করানো—অথচ দুটি পারস্পরিকভাবে সম্পূর্ণক এ যুগে, আধুনিকতার মাত্রায় এদের কাউকেই ফেলা যায় না। তাছাড়া ব্যবসার ভাগিদ, অর্থনৈতিক মুনাফার প্ররোচনা চলচ্চিত্রকে যে নিজভাষা সন্ধানে নবনব

পথে নিয়ে গেছে সে কথা তো বেলা বালাজ অনেকদিন আগেই বলেছেন :  
 বালাজ যাকে চলচ্চিত্রের 'ফর্ম-ল্যাঙ্কোয়েজ' বলেন তা বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকরূপের  
 মধ্যে দোলনেরই স্বাভাবিক ফল। অর্থনৈতিক লাভের প্ররোচনাতেই চলচ্চিত্র  
 নতুন নতুন বিষয় নিয়েছে, যে বিষয়গুলির জন্ত আবার প্রয়োজন হয়েছে নতুন  
 কলাকৌশলের : যেমন ক্লোজ-আপ, মন্তাজ ইত্যাদি। আর এর থেকে যে ভাবার  
 সৃষ্টি হয়েছে অচিরেই তা নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছে সিনেমার বিষয়কে। আর  
 দর্শক, এদব পদ্ধতি অনায়াসেই গ্রহণ করেছে : রূপবন্ধন ছাড়া বস্তু বা বস্তু ছাড়া  
 রূপবন্ধন, এর কোনোটিই চলচ্চিত্রের স্বধর্ম নয়।

রাশিয়ায় যখন প্রথম চলচ্চিত্র দেখানো হলো, গর্কির সন্দেহ হয়েছিল।  
 লুমিয়েরের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গুরুত্ব তিনি স্বীকার করেও বলেন, শেষ পর্যন্ত  
 মানবজীবন ও মনের উন্নতিতে এ আবিষ্কার ব্যবহার করা হবে কিনা ? তিনি প্রায়  
 স্থির নিশ্চিত ছিলেন, লুমিয়েরের স্টেনের, পারিবারিক জীবনের ছবি শীঘ্রই অস্ত  
 জ্য'র ছবির দ্বারা স্থলাভিষিক্ত হবে। তখন সব ছবির নাম হবে, যেমন, 'যে নারী  
 নগ্ন হচ্ছে' বা 'স্নানঘরে মহিলা'। বস্তুতঃ গর্কির এ ভবিষ্যৎবাণী যে অদ্য প্রমাণিত  
 হয়েছে তা নয়, কিন্তু তাঁর দেশেই বিপ্লবের পর চলচ্চিত্রের প্রায় দু'দশকব্যাপী যে  
 যুগান্তকারী ইতিহাস তৈরি হয়, তা কিন্তু অস্ত কথা বলে। আইজেনস্টাইনের  
 পটেমকিনই প্রথম রুশ ছবি যা ইয়োরোপ জয় করে—এখানে মনে রাখতে হবে,  
 যে জনসাধারণ সম্পর্কে আমরা অবজ্ঞা দেখাই সেই বুর্জোয়া সমাজের, জার্মানি ও  
 অস্ত্রের জনসাধারণই এই ছবি দেখে আলোড়িত : এর আঙ্গিক ও রূপবন্ধন, যা  
 কিনা আজও আধুনিক, বিস্ময়াজ বাধার সৃষ্টি করে না। ধরা যাক চ্যাপলিনের  
 কথাও। তাঁর জনপ্রিয়তার তো তুলনা নেই। আইজেনস্টাইনের মতো মহাশিল্পী ও  
 পণ্ডিত থেকে শুরু করে, সাধারণ পথের মানুষ, সকলেই এই প্রতিভার রসায়নে  
 মুগ্ধ, উচ্ছ্বসিত। ব্যবসায়িক সাফল্যও চমকে দেবার মতো। গণমাধ্যমের চূড়ান্ত  
 নিদর্শন—উপভোগ ও উপদেশ দুই-ই আছে, অথচ শিল্পের কটিপাখরের পরীক্ষায়  
 উজ্জ্বল। অর্থাৎ তেমন প্রতিভা হলে, দু'দিকই মেলাতে পারেন এক বিন্দুতে।

তলস্তয়, নাকি বিশশতকের প্রথম দশকের শেষে পরিষ্কার বলেছিলেন,  
 চলচ্চিত্র জীবনের অনেক কাছে, কারণ চলচ্চিত্র গতিকেই দেবোপেয় করেছে  
 জীবনের মতই। সেই সঙ্গে তলস্তয় এটাও লক্ষ্য করেন, চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীদের  
 খাবার মধ্যে পড়েছে, শিল্প কাঁদছে। কিন্তু ব্যবসায়ীরা কোথায় নেই ! ব্যবসায়ীর  
 শিল্পীকে গ্রাস করা ধ্বংস নয়—পুনঃসৃষ্টির, প্রচারের এও এক পদ্ধতি। ব্যবসায়ীর

পেটের মধ্যেই ভবিষ্যতের বীজের বিকাশ ঘটে, সব ভেঙে এই বীজ বেরিয়ে আসে, বৃক্ষ হয়। তলস্তয় যে বলেছেন, ব্যবসায়ীর গর্ভেই সৃষ্টির বীজ অঙ্কুরিত হতে পারে, তা হলিউডের দিকে তাকালে তো বোঝা যায়ই, ফরাসি নব্যতরঙ্গবাদীরা এম জঁ'র-এর কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন, ফরাসি সমালোচকরা এর তাৎপর্যের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করেছেন। এই 'অথর' তাত্ত্বিক ফরাসি সমালোচকেরা, আবার পরিচালকরাও, যেমন হলিউডের স্বজনশীল পরিচালকের কথা বললেন, দর্শকদের সঙ্গে আত্মীয়তার কথা বললেন, তেমনি আবার বিচ্ছিন্ন, নির্জন মানুষকেও বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখাতে চাইলেন—সংযোগের সেতু টাল খেয়ে গেল। বাস্তবিক, বৃহত্তর জনসাধারণ যে শিল্পের অচ্ছেদ্য অংশ, তাকে সংযোগহীন করলেই মরণডঙ্কা বাজে—আর 'সংযোগ' শব্দটি বিমূর্ত নয়, দেশ-কাল-সমাজ-নির্ভর। ইয়োরোপে সংযোগ যেভাবে আসে, ভারতবর্ষে সংযোগ সেভাবে আসতে পারে না। গণসংযোগ যে চলচ্চিত্রে নিজস্ব ভাষাতেই ঘটে, এ আফ্রিকার পরিচালকরা অনুধাবন করেছেন। অবশ্যই এটা ঠিক ব্যবসায়িক-সংযোগ নয়।

একথা বারবার চলচ্চিত্রের ইতিহাসে প্রমাণিত হয়েছে, চলচ্চিত্র-স্রষ্টা নিজ শিল্পান্বেষণেই সৃষ্টি করেছেন নিজ ভুবন। কিন্তু এই স্বপ্নের ভুবন চলচ্চিত্রের মতো মাধ্যমে কখনোই বিচ্ছিন্ন, গণসম্পর্কশূন্য হতে পারে না। সংযোগী চলচ্চিত্রকে হতেই হয়, না হলে তার মৃত্যু অবশ্যজ্ঞাবী। এই সংযোগের দ্বিটি রূপ : একটি আফ্রিকার সেমবেনরা যা করেন। সঠিক বোধে চালিত হলে, এখানেও এক সামাজিক ওই সংযোগকামিতা কিন্তু শেষপর্যন্ত শিঞ্জায়েগাই। সংযোগের স্রষ্টা শিল্পাবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। সংযোগী নন্দনচিন্তাই রাজনৈতিক-সামাজিক প্রতিবাদকে তাৎক্ষণিক থেকে চিরকালে নিয়ে যায়—বিশেষ রূপবন্ধনের আনবার কাঠামোতেই এই সংযোগ আবার দাঁড়ায়। সংযোগের আর একটি রূপ : ব্যবসায়িক। এখানেও মূল কথা গণ-সংযোগ ! বলাই বাহুল্য, এ সংযোগের মূল ভাগিদে মুনাফা, তাই এ সংযোগ দর্শকের জীবনে যুক্ত হয় না, দর্শককে তার মানবিক-সামাজিক-প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে অস্থিত করে না। ব্যবসায়িক সংযোগের মূল ভিত্তি এক বিচ্ছিন্নতাকে পোষণ করা। কিন্তু ওই বিচ্ছিন্নতাও, কলাকৌশলের সৃষ্টির দরুন, শিল্প-সংযোগের সহায়তাই করতে পারে সঠিক বোধে। আমাদের দেশের হিন্দী ছবির জঁ'র ( তা বত কুংসিংই হোক না কেন ) ব্যবহৃত হতে পারে প্রবল প্রতিভার হাতে, বিশেষতঃ যখন শতকরা পঁচাত্তরভাগ ভারতীয় চলচ্চিত্রের দর্শক এই জঁ'র-এর। ব্যবসায়মুখী সংযোগকে রূপান্তরিত করা যায় শিল্পসংযোগের

সংগ্রামী মাত্ৰায়, যদি থাকে চলচ্চিত্ৰের গণসংযোগের চরিত্ৰের প্রতি নিষ্ঠা। ব্যবসায়ী-সংযোগের ছক ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারে অল্প ভাবনা।

অবশ্যই সে ভাঙার স্বত্বে বৃহত্তর ক্ষেত্রে না থাকলে, ব্যবসায়িকতাই তাকে বিকৃত করবে। অথচ 'ব্যক্তিগত ফিল্ম' বলে কিছু হতে এখনো পারে না, আমাদের এখানে। লোকশিল্পের মতই এ মাধ্যম গণমাধ্যম। যখনই শিল্প-সংযোগী ছবি একথা মনে করে এগিয়েছে তখনই সে জনগণের উৎসাহ পেয়েছে, যেমন গুপ্তী গাইন বাঘা বাইন। আর প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক-প্রতিবাদের ছবিকেও তো সংযোগীই হতে হবে সিনেমার ভাষাতেই।

### পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ সাইট অ্যাণ্ড সাউণ্ড ॥

১৯৩২য়ে স্থাপিত চলচ্চিত্ৰের ইংরেজি ত্ৰৈমাসিক পত্রিকা। প্রকাশক—ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট। সম্ভবত এটিই চলচ্চিত্ৰ বিষয়ে গ্রেট ব্রিটেনের সেরা পত্রিকা। যদিও লিওসে অ্যান্ডারসন প্রমুখের উদ্যোগে সে দেশে ১৯৪৭য়ে সিকোয়েন্স নামে আর একটি উন্নত মানের পত্রিকাও আত্মপ্রকাশ করেছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে সাইট অ্যাণ্ড সাউণ্ডে যে সমস্ত রচনা প্রকাশিত হত তা মূলত চলচ্চিত্ৰের শিক্ষা-মূলক দিক ও প্রয়োগগত ব্যবহার নিয়ে। পরবর্তীকালে সমালোচনামূলক ও তাত্ত্বিক প্রবন্ধ এবং সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে বিশ্ব চলচ্চিত্ৰের সার্বিক মূল্যায়নের প্রয়াস দেখা গেছে। রাজনৈতিক ও পরীক্ষামূলক ( বিশেষত ছাৰেটিভ বিরোধী ) সিনেমার প্রতি সাইট অ্যাণ্ড সাউণ্ডের সাধারণ অনীহা আছে বলে অনেকের অভিযোগ। সম্প্রতি পত্রিকাটি অনিয়মিতও হয়ে গেছে ( দ্র. চলচ্চিত্ৰ সমালোচনা )। একবার একজন বলেছিলেন, সাইট আর সাউণ্ড ছাড়া সিনেমার আরো দরকার সেন্সকে, 'সাইট অ্যাণ্ড সাউণ্ড'-এর সেই সেন্সের বিষয়ে আগ্রহ কিছু কম।

॥ জর্জ সাহুল ॥

( ১৯০৪-৬৭, ফ্রান্স )। চলচ্চিত্ৰের ঐতিহাসিক ও সমালোচক। বলা হয়েছে, সমালোচক নামের যোগ্য চলচ্চিত্ৰ-সমালোচক ফ্রান্সে দুজন-ই হয়েছেন—বাজঁ ও সাহুল। ঐতিহাসিক হিসেবে তাঁর অবদান অবদান ছয় খণ্ডে রচিত গ্রন্থ দি জেনারেল হিস্ট্রি অব সিনেমা। যেমন তাত্ত্বিক সমীক্ষা হিসেবে ডিক্শনারি অব

ফিল্মস ও Dictionary of Cineastes উল্লেখযোগ্য। কুড়ি বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি Les Lettres Francaises-পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ফরাসি চলচ্চিত্র-সমালোচনার ধারায় তিনি দীর্ঘদিন প্রভাবশালী ব্যক্তির রূপে গণ্য হয়েছেন। প্রথম জীবনে সাররিয়ালিজমের ভক্ত থাকলেও পরে সাদুল মাস্কাঁয় মতবাদে বিশ্বাসী হন। তিনি ছিলেন ভারতীয় চলচ্চিত্র বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী ও ঋদ্ধিক ঘটকের ব্যক্তিগত বন্ধু। (ড. চলচ্চিত্র সমালোচনা)

অত্যাশ্রয় গ্রন্থ : লুই লুমিয়ের, বিগা তের্তত ॥

॥ ইস্ত্ভান সাবো ॥

(জন্ম ১৯৩৮, হাঙ্গেরীয় চলচ্চিত্রকার, চিত্রনাট্যপ্রণেতা ও চলচ্চিত্র-শিক্ষক।) ষাটের দশকে হাঙ্গেরীয় নবতরঙ্গের অত্যন্ত মদন্য।

একটি পৃথিবী নষ্ট হয়ে গেছে যার আগে এবং যখন আরেকটি পৃথিবীর দাবি স্থির করে নিতে হলে লাগে সকালের আকাশের মতন বয়স, এমন মধ্যম পথে বিকেলের ছায়ায় কেটেছে ইস্ত্ভান সাবোর প্রথম জীবন। তাঁর চলচ্চিত্র হলো সম্ভাবনা ও সিদ্ধান্তের একটি কাব্যময় বর্ণালী বিচ্ছুরণ। শুধু এইটুকু যদি বলা হয় সাবোর প্রতি হয়তো অবিচার করা হবে। ইতিহাসের উদ্ভাপ ও অশান্তিকে সাবো এত নৈকট্য থেকে অনুভব করেছেন যে তাঁর ছবি সবসময়েই সময়ের ঞ্টনংলগ্ন; ফলে এই আশা থেকে যায় উত্তর প্রজন্ম একদিন বাসভূমি খুঁজে পাবে।

এক চিকিৎসক পরিবারে সাবোর জন্ম শীতকালে। কিন্তু ইউরোপের শান্তিশে তখন আঙনের হলকা। আর এক বছরের মধ্যেই শুরু হবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। অহংকারের দাম দিতে আবার মানুষ নিরাশ্রয় হবে, রক্তে ভিজে যাবে জাতি। সাবো প্রকৃত অর্থেই 'ওয়ারটাইম চাইল্ড'। মাতৃহত্যার মতোই ইতিহাসে তিনি প্রবাহিত দেখলেন ঘৃণা, বর্বরতা, লোভ ও হ্যাঁ, গোপন মহাম্যন্ত্রণ। যুদ্ধশেষে পিতৃবিয়োগ। সাবো বড়ো হচ্ছেন, তাঁকে ঘিরে আছে পুরুষহীন পরিবারে মা সহ অত্যাশ্রয় মহিলাদের সান্নিধ্য। এ নারী-প্রাধাত্য ভবিষ্যতে তাঁর ছবিতে এক প্রাকৃতিক ঋছুতা দেবে কিনা তা মনোসমীক্ষকের আলোচনার বিষয়। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি বালক সাবোর পরিবেশে ব্যক্তিপূজার সমারোহ, স্থালিন পৌত্তলিকতা, অদৃশ্য পাহারা, আর স্থূলজীবন যখন শেষ হলো বুদাপেস্টের পথে পথে তখন মদন্য ও সদর্পে সোভিয়েত ট্যাঙ্ক : ইমরে নাগির পতন হয়েছে, অসমাপ্ত রয়ে গেছে হাঙ্গেরীয় বসন্তধাপন।

সাবো বিতালয়ের ক্রীদমাস উৎসবে ও নানা অস্থানে অভিনয়নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। বিধা ছিল—পারিবারিক চিকিৎসকবৃত্তি বরণ করবেন না সাড়া দেবেন দৃশ্য মায়ায়। কলেজ অব ড্রামাটিক আর্টসে চলচ্চিত্র পরিচালনায় সাম্মানিক দহ ভর্তি হওয়ায় সাবোর নিয়তি নির্ধারিত হয়ে গেল। এর পরের ইতিহাস চলচ্চিত্র-দর্শকদের জানা আছে। আমি শুধু যোগ করতে চাই তাঁরই প্রাক্তন শিক্ষালয়ে সাবো একজন সুশিক্ষকও। প্রথমে তাঁর ছাত্র ছিলেন পরিচালক ও আলোকচিত্রীরা। পরে অভিনয়েচ্ছু তরুণ সম্প্রদায়। বলা ভালো গোদারের দ্বারা নান্যভাবে প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও সাবোর প্রিয় শিল্পীদের তালিকায় গোদার নেই। আছেন ফেলিনি, কুরোশাওয়া এবং অবশ্যই বার্গমান। যদি সাবোর চলচ্চিত্র জীবনটি আমাদের বিচার্য হয় তবে দেখব ইতিহাস ও ব্যক্তির সমীকরণ-ই এই পরিচালকের প্রধান আগ্রহের বিষয়। যে গোধুলি সঞ্জির নৃত্য তাঁর অভিজ্ঞতাকে বিধুর করেছে তাকে ব্যক্তির নিজস্বতায় সঞ্চারিত করা সাবোর মূল অর্নিষ্ট। তিনি একটি নির্জন মাহুষের অহুত্বের জন্ম ও মূহ্য, তার বলীরেখা ও উন্নাদকে দেখেন ক্রোজ আপে কিন্তু সাবোরই ভাষায় তাঁর পরীক্ষণীয় হয়ে দাঁড়ায় ইতিহাসের অগ্নিপরিধিতে ওই ব্যক্তির লংশটও। এই সমন্বিত অভিজ্ঞতার উপস্থিতিই ইন্ত্ভান সাবোকে তাৎক্ষণিকতামুক্ত করে।

সাবোর ডিপ্লোমা ছবি কনসার্ট (১৯৬১) বহু অভিনন্দনধন্য। এই ছবির পরাবাস্তব ও প্রতীকী মুহূর্তের প্রয়োগ দেশি-বিদেশি সমালোচকদের নজর কাড়ে, এর পরে সাবো বেলা বালাজ স্টুডিওর জন্ম যে দুটি ছবি করেন, যথাক্রমে ভ্যারিয়েশনস আপন এ থিম (১৯৬১) এবং ইয়ু (১৯৬৩) তা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করে অচ্যুত পূর্ব ইউরোপীয় সহযোদ্ধাদের মতো তিনিও আপাত পরাভব মেনেছেন জঁ-লুক গোদারের পরাক্রমে।

তাঁর প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘের ছবি দ এজ অব ডে ড্রিমিং (১৯৬৪) আসলে স্বপ্ন, স্মৃতি, সময়কে জড়িয়ে উবেগ ও আকাজ্জ্বার একটি অপরূপ চিত্রলেখ। এক অসামান্য আঙ্গিকে একটি কৃত্রিম সমাজতান্ত্রিক সমাজে তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে অতীতের বোঝাপড়া, সমঝোতা ও কথোপকথন এই ছবি। যদিও ছবিটি স্বাধীন নয়; শিল্পী তখনও স্ব-প্রতিক্রমিত রচনা করতে পারেননি। এই ছবি প্রকাশ্যেই ফ্রান্সোয়া ত্রফোকে প্রণাম জানিয়েছে।

দ্বিতীয় ছবি ফাদার (১৯৬৬)-এও তিনি নিত্যন্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমস্যার সাধারণীকরণ করেন। প্রস্নাত চিকিৎসক পিতার সঙ্গে পুত্রের যে সংলাপ পরি-

চালকের আত্ম-জীবনিকতায় সংরক্ত তা ত্রীপ্তীয় ইতিহে যেমন পরমপিতার অনুষঙ্গ বহন করে যুদ্ধোত্তর পরিমণ্ডলে স্থালিন, চার্চিল বা রুজভেল্টকেও মনে করায়। প্রকৃত প্রস্তাবে ছবির সৃচনাত্বেই তথ্যচিত্রের উদ্ধৃতি আমাদের জ্ঞানায় মার্কিন রাষ্ট্রপতি যুত। ছবিটি মস্কোতে প্রধান পুরস্কারে অভিনন্দিত হয়।

১৯৭০-এ সাবো তাঁর প্রথম রঙিন ছবি লাভ ফিল্ম নিবেদন করেন। এই 'প্রেমকাব্যটি'কে 'পিতা'রই অনুষঙ্গী বলা চলে। যদিও এ ছবিতে নৈতিকতার একটি গভীর আবরণ যুক্ত হয়েছে, নির্মাণও প্রশংসনীয় কিন্তু বলতেই হবে সাবো এখনো স্বাধীনতার স্বাদ পাননি। গোদার এবং ক্রফোর বদলে তাঁকে ঋণী করেছেন রেনে— এই ছবির কালজ্ঞান তার নির্ভুল দৃষ্টান্ত। সাবো অবশ্য ক্রমশই আমাদের কাছে অধিকতর মর্যাদাবান ভাষায় জানাচ্ছিলেন তথ্যের বাস্তব সামান্যকে প্রকাশ করে না, সর্বজনীনতার জন্ত স্বপ্ন-পরিব্রাজনা জরুরী।

এই উদ্দেশ্যের সম্প্রসারণে তিনি বুদাপেস্ট টেলস ( ১৯৭৬ ) রচনা করলেন যা আত্মত আধুনিক একটি লোককথা। ছবিটি অবশ্য সম্বর্ধনা পায়নি। পাওয়া সম্ভবও ছিল না। হাঙ্গেরীয় ইতিহাসের রূপক এই ছবিতে বড়ো স্থূল হস্তাবলপনের।

সাবোর গুণগ্রাহীরা বরং স্বস্তিবোধ করলেন যখন তিনি কনফিডেন্স ( ১৯৭৯ ) নির্মাণের স্ত্রে জীবনযাপনের গোপন ও অন্তরঙ্গ নাট্য প্রয়োজনার আশ্রয় নিলেন। সাবোর কাব্য ও অলঙ্কার বহুল রীতির বদলে এই ছবির আতঙ্ক, ভয় ও সন্দেহ সরল অথচ উপমারহিত তীব্রতায় আধুনিক ইতিহাসের পঙ্গুতাকে সনাক্ত করে। ছবিটি শ্রেষ্ঠ পরিচালনার জন্ত বার্লিনের রৌপ্য ভল্লুক পায়।

এর পরেই সাবো রচনা করেন মেফিস্টো ( ১৯৮১ ) ( জ. )— তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত সৃষ্টি। এই ছবিতে সাবো অকৃতোভয়ে প্রতিষ্ঠান বনাম শিল্পীগণের স্বীকারোক্তি চিত্রিত করেছেন। আপাতভাবে হয়তো মেফিস্টো খৈন শিল্পক সমাজে শিল্পীর ব্যর্থতা কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে ক্লাউস মারিয়া ব্রানডাউয়ার এর অভিনয় আমাদের সত্যের স্বরূপ, যে কখনো বঞ্চনা করে না, দেখতে সহায়ক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পীর মতোই মেফিস্টো একজন শিল্পীর রক্তপরীক্ষা। ছবিটি বাণিজ্যসফল ; কানের ফিপ্রেক্সি পুরস্কারপ্রাপ্ত ও অস্কারজয়ী।

অন্তঃপর মুক্তি পায় কর্নেল রেড্‌ল ( ১৯৮৪ )। উচ্চাশা ও বিশ্বাসঘাতকতার এই কথকতায় সাবো আবারও বিচ্যুত হন না তাঁর ইতিহাসচেতনা থেকে।

অনস্বীকার্য যে সাবো এখনও চলচ্চিত্রের মহামহিমায়িতদের তালিকায় পড়েন না। তাঁর স্বরূপেণে কুঠা আছে ; অভিব্যক্তিতে স্বাধীনতার অভাব। কিন্তু

একথাও সতত বিচার্য যে, রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর প্রতিবন্ধকতা সশেষে সাবো আর্দোবন চেষ্টা করেছেন যাতে জনসাধারণ সচেতনতার যুক্তি খুঁজে পায়, যাতে তাঁর ডিব্রাবলী আয়-প্রতিকৃতি উপহার দিতে পারে প্রতিটি দর্শককে। যদি সাবো স্বদেশে সফল হয়ে থাকেন তবে তা কি উত্তীর্ণ শিল্পের অভিজ্ঞান নয়? তাঁর অগ্ন্যস্ত উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে আছে রাশিয়ান টিচার, হানুসেন, ফাবিয়ান বালিট মীটন গড, দি হান্দেরীয়ানস।

## সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

### ॥ সাবটাইটেল ॥

বিদেশী ভাষার কাহিনীচিত্র অল্প ভাষার অঞ্চলে প্রদর্শনের সময় সেই ভাষায় মূল ছবির সংলাপ অনুবাদিত করে দৃশ্যের ওপর, ফ্রেমের নিচের দিকে বাকলিপি হিসেবে মুদ্রিত করে দিলে তাকে সাবটাইটেল বলে। নির্ধারিত যুগেও ছবির কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংলাপ বা জরুরি বক্তব্য ধারালিপি রূপে মুদ্রিত করা হত। (ড্র. অক্টোবর)। একে ডাবিংয়ের তুলনায় বেশি গ্রহণযোগ্য মনে করা হয় কেননা মূল অভিনেতার কণ্ঠস্বর ও শব্দের সিন্ক্রোনাইজেশন সাবটাইটেলিং-য়ে অক্ষুণ্ণ থাকে। আবার দৃষ্টিকে একই সঙ্গে দৃশ্যের কম্পোজিশন ও মুদ্রিত বাকলিপির প্রতি ননোযোগী করা অনভ্যস্ত দর্শকের কাছে কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। যে সংলাপ বলা হলো ও যে লিপি মুদ্রিত হলো, তাঁদের মধ্যে ধারাবাহিকতার নিখুঁত সামঞ্জস্য থাকা দরকার। যে জল্প সংলাপের এই জাতীয় অনুবাদ নিখুঁত, সংক্ষিপ্ত, পরিমিত ও যথাযথ হওয়া দরকার। ফটোগ্রাফিক প্রিন্ট, কেমিক্যাল এচিং, মডিকায়ড অ্যানিমেশন বা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সাবটাইটেল মুদ্রিত করা হয়।

### ॥ সার-রিয়ালিজম / সুররিয়ালিজম ॥

[ অধিবাস্তববাদ বা পরাবাস্তববাদ। এর সূচনা হয়েছিল ফ্রান্সে, বিশেষ দশকে (ড্র. বাদ)। এই আন্দোলনের প্রথম মুখপাত্র Andre Breton. অর্থোজিকের সত্য, স্বপ্ন ও গোপন কল্পনার গুরুত্ব, বিভিন্ন অবচেতন ইমেজের আবেগী ও অভিযাতী জাক্সটাপোজিশন, ব্যক্তিগত কামনা (বিশেষত যৌনতা)-র স্বাধীন চরিতার্থতা—অধিবাস্তববাদের এগুলি হলো স্বাভাবিক লক্ষণ। চলচ্চিত্রে আলোকচিত্রের কোঁশলে ফ্যানটাসি ও স্বপ্নাবস্থা তৈরির যে সাধারণ স্বযোগ রয়েছে তা সাররিয়ালিজমকে সিনেমার পক্ষে বিশেষ উপযোগী করে তুলেছে। যেমন বিচিত্র

জাকৃস্টোপোজিশন সম্ভব হয়ে উঠছে সম্পাদনার দরুন। দালির সহযোগিতায় নিমিত্ত বুলিয়েলের ছবি ছবি দিয়ে চলচ্চিত্রে সাররিয়ালিজমের সূচনা হয় (ড্র. দালি, বুলিয়েল); পরে ম্যান রে, J. Brunius ও ককতোর ছবিতে এর বিশেষ প্রভাব দেখা গেছে। সরাসরি অধিবাস্তববাদী না হলেও, বহু ছবিতেই অধিবাস্তব-বাদের কোনো না কোনো লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য অনুপ্রবেশও করেছে। এই প্রভাব হিচককের ছবি থেকে শুরু করে প্রতিবাদমূলক ছবি ফারাওণের 'থেমরক' বা আরাবেলের 'ভিত্‌ লা মেয়োতে' পর্যন্ত বিস্তৃত। (ড্র. ফেলিনি)। নিচে সাররিয়ালিজমের একটি সংক্ষিপ্ত তাত্ত্বিক রূপরেখা দেওয়া হলো। ]

সররিয়ালিজম বা পরাবাস্তববাদ আধুনিক শিল্প আন্দোলনের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় বা বুড়ির দশকে, ফ্রান্সে শুরু হয়। যদিও এ আন্দোলনের শিকড় এথিত রয়েছে মূলতঃ 'ডাডাইজম' এবং 'ফিউচারিজম' বা ভবিষ্যবাদ নামক সমসাময়িক অস্ত্র দুটি ধারার শিল্পতবে তবুও সররিয়ালিজম বা পরাবাস্তববাদ এক স্বতন্ত্র শিল্পতবে হিসাবে স্বীকৃত। 'ডাডা' এবং 'ফিউচারিজমের' মতো পরাবাস্তববাদও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতার আলোকে তথাকথিত আধুনিক যুক্তিবাদিতা, প্রযুক্তির প্রতি অন্ধবিশ্বাস, বিজ্ঞান-মনস্কতার নির্মম সমালোচনা করে। 'ডাডাইজম' যেখানে 'বিমূর্ত', 'অবাস্তব' ও 'অর্থহীন'-এর মধ্যে দিয়ে যুক্তিপূর্ণ, বাস্তবানুগ ও অর্থহীন শিল্পচর্চার বিরোধিতা করে, পরাবাস্তববাদ সেখানে মানুষকে যুক্তি, বুদ্ধি, বাস্তবতার দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে চায়। এই মতবাদের প্রবক্তা আল্রে ব্রেতঁ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সৈনিক হাঙ্গামতালের মানসিক বিভাগে কর্মরত ছিলেন এবং যুদ্ধের ভয়াবহতায় বিপর্যস্ত সৈনিকদের মানসিক বিকারের নানা অবস্থা কাছ থেকে দেখবার পর অত্যন্ত সচেতনভাবেই তিনি তথাকথিত যুক্তিবাদী মননের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। ব্রেতঁ যে পরাবাস্তববাদের কথা বলেন সেখানে শিল্প হচ্ছে মানবমনের স্বতন্ত্রসারিত সৃষ্টি যা কোনোরকম যুক্তি, কোনোরকম শৃংখলা নির্ধারিত নান্দনিক বা নৈতিক মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত নয়, ডাডাইজম যেখানে অবাস্তব শব্দ দিয়ে কবিতা, কোলাহলের শব্দ দিয়ে সংগীত, 'গুদ্র' এবং বিমূর্ত আকার দিয়ে বা রং দিয়ে চিত্র রচনার দিকে ঝুঁকিয়েছে, পরাবাস্তববাদ সেখানে ফ্যান্টাসি বা অলৌকিক কল্পনা এবং স্বপ্নলোকের পুনর্নির্মাণে রত হয়। পরাবাস্তব-বাদের মধ্যে এক ধরনের আত্মসচেতন স্বেচ্ছাচারিতা রয়েছে যার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে পাঠক / দর্শক / শ্রোতাকে একটা বড়ো রকমের ধাক্কা দেওয়া। সালভাদর দালির প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় তোলা লুই বুলিয়েলের স্থবিখ্যাত পরাবাস্তববাদী

চলচ্চিত্র 'দ্য আন্দালুসিয়ান ডগ' ( ১৯২৮ ) শুরু হয় এইভাবে : 'পুণ্ডিয়া রাত্রি, চাঁদ ঢেকে দেয় মেঘ। একজন ক্ষুর শান দেয়। চন্দ্রালোকিত রাত। একটি মেয়ের চোখের সামনে ক্ষুরটি ধরা হয়। চাঁদ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে মেঘে। ক্ষুর দিয়ে চোখের মণি কেটে ফেলা হয়।' এই দৃশ্য দর্শককে প্রচণ্ড নাড়া দেয়। বুলুয়েল বলতে চান যে পার্থিব চোখ দিয়ে দেখার বাইরে এক জগৎ রয়েছে এবং পার্থিব চোখ এ জগৎ দেখার ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়। এ ছবি নির্মমভাবে দর্শককে দেখায় এক অবচেতন মানসিক জগৎ যেখানে স্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন, ঘৃণা, কামনা, যৌনতা কোনোরকম ভণিতা ছাড়াই প্রকাশিত হয়। পরাবাস্তববাদীদের চোখে বাস্তবতা হচ্ছে নিতান্ত বুর্জোয়া ধারণা এবং এঁরা শিল্প প্রক্রিয়ার সাহায্যে ধ্বংস করতে চান প্রথাগত কাহিনী-বিশ্বাস, দৌন্দর্যবোধ ও যুক্তিবাদিতা। পরাবাস্তববাদীরা বলতে চান যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তবের বাইরে আর এক অপ্রত্যক্ষ বাস্তব রয়েছে—'এই' বিকল্প বা পরাবাস্তব লুকিয়ে রয়েছে স্বপ্ন, উদ্ভাদনা, অবচেতন, হ্যানুসিনেশন বা মায়া এবং অর্থোজিক আচরণের মধ্যে। বুলুয়েল ও দালির ছবিতে তাই ঘরের মধ্যে রাত্রি এবং বাইরে দিন, পিয়ানোয় শুয়ে থাকে মৃত গাধা, হাতের তালু থেকে বের হয়ে আসে কীট। অবচেতন মন থেকে উঠে আসা স্বপ্নের মতোই এ ছবি আপাতভাবে পারম্পর্ষহীন, অর্থহীন, অবাস্তব ও দৃশ্যের সমাহার। এই নিয়ন্ত্রণহীন, শাসনহীন শিল্প প্রচেষ্টাকেই পরাবাস্তববাদীরা শুদ্ধ মানসিক প্রক্রিয়ারূপে বর্ণনা করেছেন যেখানে শিল্প হচ্ছে মনের স্বতঃস্ফূর্ত অনুলেখন মাত্র। পরাবাস্তববাদী শিল্পকর্ম আপাতভাবে অবোধগম্য বলে মনে হলেও সামাজিক ইতিহাসের পটভূমিতে, প্রথাগত শিল্পের পরিপ্রেক্ষিতে মৈরাজ্যবাদী চিন্তা ভাবনার মধ্যে যে প্রবলভাবে 'স্বাধীন' থাকার আকাঙ্ক্ষা, স্বাধীনতার ধারণাকে অসীম করে তোলার ইচ্ছা নিহিত রয়েছে পরাবাস্তববাদী চলচ্চিত্র তাকেই জাগিয়ে তোলে।

**বীরেন দাশশর্মা**

॥ সাহিত্য ও চলচ্চিত্র ॥

[ সাহিত্য বলতে কাব্যসাহিত্য ও গদ্যসাহিত্য। গদ্যসাহিত্যে গল্প-উপন্যাস-নাটক কল্পনামূলক রচনা। ডায়েরী-চিঠিপত্র-আত্মজীবনী ব্যক্তিগত রচনা। প্রবন্ধ-গবেষণা-অ্যাকাডেমিক গ্রন্থ মননশীল রচনা। চলচ্চিত্রে কাহিনীচিত্র কল্পনামূলক সৃষ্টি। আর বিষয়বস্তুর তারতম্য অনুসারে তথ্যচিত্র ও গবেষণাচিত্র বাস্তব-অনুসারী বা মনন-প্রধান। সাত্র বলেছিলেন, সাহিত্যে ও শিল্পে বিস্তৃত গবেষকের অ্যাকাডেমিক

অ্যাপ্রোচই একমাত্র নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠাস, তথ্য ও গবেষণা-চিত্রে তার পরিচয় মেলে। মেলে প্রস্তুতি ও চর্চা, জ্ঞান ও গবেষণার প্রমাণ। ঐতিহাসিক গবেষণা, পুরাতাত্ত্বিক অনুপুত্র ও শক্তিশালী ডকুমেন্টেশন। কাহিনীচিত্র ও সার্থক শিল্পসৃষ্টি হয়ে উঠেও অ্যাকাডেমিকভাবে মূল্যবান হতে পারে, যখন সেই ছবি চলচ্চিত্র-তত্ত্বের প্রত্যক্ষ ও প্রায়োগিক উদাহরণ হয়ে ওঠে। যেমন আইজেনস্টাইনের ছবি। এই গ্রন্থে কবিতা ও চলচ্চিত্র এবং নাটক ও চলচ্চিত্র নিয়ে পৃথক আলোচনা করা হয়েছে, বর্তমান আলোচনা মূলত উপন্যাস ও চলচ্চিত্র-বিষয়ে। বিশেষত উপন্যাসের কাঠামো ও চলচ্চিত্রের গঠন বিষয়ে।]

সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের বিষয়বিভাগ তথা সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ণ সম্পর্কিত বিতর্ক বহুকালের। এ দেশে বিষয়টি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ তাত্ত্বিক আলোচনা না হলেও, প্রতীচ্যে এ নিয়ে অসংখ্য গ্রন্থ ইতিমধ্যে রচিত হয়েছে। তুলনায় আমাদের দেশে এ দুয়ের সম্পর্ক, মিল-অমিল তথা সার্বিক নন্দনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অভাব চোখে পড়ে। এদেশে এখনও সাহিত্যশ্রিত চলচ্চিত্রকে বেশিরভাগ মানুষ 'বই' বলতে অভ্যস্ত। চলচ্চিত্রের শিল্পস্বাতন্ত্র্য এবং অভিনবত্ব নিয়ে আমাদের অনেকেই এখনও সন্দেহান। বিদেশে উৎকৃষ্ট চিত্রসমালোচনা সমৃদ্ধ সাহিত্য সমালোচনার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

চলচ্চিত্র মাধ্যমের জন্মলগ্ন থেকেই, এই শিল্পশাখায় সাহিত্যালুগ কাহিনী-বিভাগের প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। ক্রমশঃ নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং প্রয়োগ-প্রকরণের স্তর পেরিয়ে সিনেমার সেই রীতির বিবর্তন ঘটেছে। চলচ্চিত্র যেহেতু যান্ত্রিক প্রয়োগ-নির্ভর শিল্পমাধ্যম, তাই নিত্য নব বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন এবং আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা এর শিল্পরূপের বিবর্তনকে স্বরায়িত করেছে। আর প্রাকরণিক অভিনবত্বে সাহিত্যের চলচ্চিত্র রূপান্তরের মৌলিক ধ্যানধারণাও ক্রমশঃ বিবর্তিত হয়েছে। উৎকৃষ্ট সাহিত্যের যোগ্য চলচ্চিত্রায়ণে পরিচালকের শিল্পবোধ, স্রষ্টা-নিষ্ঠা, অগ্নাত্ত্ব মাধ্যম সম্পর্কে তাঁর মৌলিক চেতনা, সর্বোপরি, উভয় মাধ্যমের শিল্পশর্ত ও সার্থকতা সম্বন্ধে তাঁর অনুসন্ধিৎসা খুব জরুরী বিষয়। গল্প, কবিতা, নাটক, লোকগাথা নিয়ে ছবি করার ক্ষেত্রে যেমন নানা পদ্ধতি ও সূত্র আছে, উপন্যাস অবলম্বনে ছবি নির্মাণেও তেমন কিছু বিশিষ্ট উপকরণ ও পন্থা রয়েছে।

ঔপন্যাসিক জোসেফ কনরাড ও চলচ্চিত্রের অগ্নাত্ত্ব আদি স্রষ্টা গ্রিকিথ উভয়েই তাঁদের শিল্পকর্মের অভিপ্ৰায় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মূলতঃ একই রকমের মন্তব্য করেছিলেন : 'The task I am trying to achieve is to make you

see'। চলচ্চিত্র ও সাহিত্য উভয় মাধ্যমেই প্রাথমিক শর্তে এই দেখার ব্যাপারটা রয়ে গেছে। একটি মনের দেখা, অনেকটা কাল্পনিক, অপরটি চোখের দেখা, একেবারে প্রত্যক্ষভাবে। এই মনোগত রূপকল্প এবং দৃষ্টিগ্রাহ্য চিত্রকল্পের ভিত্তিতেই দুটি মাধ্যমের কাঠামোর ভিন্নতা বিবর্তিত হয়েছে। এই ভিন্নতার সঙ্গে আবার কোথাও কোথাও আশ্চর্য সাদৃশ্যও রয়েছে। আইজেনস্টাইনের বিখ্যাত 'ডিকেন্স, গ্রিফিথ অ্যাণ্ড দ্য ফিল্ম টু ডে' প্রবন্ধে আমরা লক্ষ্য করেছি যে তিনি দেখিয়েছেন গ্রিফিথ কিভাবে ডিকেন্সের রচনায় তাঁর স্বকীয় প্রবর্তনার অনেক উপাদান ও সিনেমার বিশিষ্ট প্রয়োগের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। Eduin Muir তাঁর 'স্ট্রীকচার অব দ্য নভেল' গ্রন্থে সিনেমা ও সাহিত্যের পারস্পরিক সাদৃশ্য ও ভিন্নতা নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। নন্দনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে **We see things in terms of time, space, causality**। চলচ্চিত্রে কোনো ঘটনা পর্যবেক্ষণের সময় আমরা সবকিছুকে এইভাবে বিচার করি না। উপস্থানে যেখানে তিনটি 'কাল' বর্তমান, সিনেমায় সেখানে কেবল একটি। তা হলো ক্রম-প্রবাহমান নিত্য বর্তমান কাল। এই নিত্য বর্তমানের মধ্য দিয়েই চলচ্চিত্র স্রষ্টা নানা প্রকরণে অতীত, ভবিষ্যতের প্রতিভাস গড়ে তোলেন।

দীর্ঘ সময় ধরে পঠিত একটি উপস্থাস স্বাভাবিকভাবেই পাঠকের মনে এক ধরনের নিবিড়তার জন্ম দেয়, যাকে হেনরী জেমস 'Solidity of specification' বলে মন্তব্য করেছিলেন। উপস্থাস পড়ার সময়ে পাঠক ইচ্ছানুযায়ী পাঠরীতি ও নিজের ইচ্ছে মতো গতিভঙ্গি রচনা করে নেন। কিন্তু সিনেমায় দর্শককে অবিচ্ছিন্ন ভাবে পর্দায় প্রতিফলিত কাহিনীকে পর্যবেক্ষণ করতে হয়। খুব সুন্দর কথা বলেছেন জনৈক সমালোচক : 'The reader of a novel imposes his own pace, the man in the cinema has the film's pace imposed on him'.

অতীতকে উপস্থাসের সঙ্গে সিনেমার সাদৃশ্য একমাত্র আখ্যান বর্ণনার দিক থেকে, আর নাটকের সঙ্গে চরিত্রের বাহ্যিক প্রকাশে। কিন্তু চলচ্চিত্রের স্বাভাবিক ভাষা ও ব্যাকরণের খাতিরেই একে উপস্থাসের মূল রচনা থেকে সরে আনতে হয়। কেননা উপাদানের বৈচিত্র্য ও সময় বিধৃতির দিক থেকে উপস্থাস অনেক বেশি প্রসারিত। 'a novel can afford the diffuseness where the film must economize'। একজন চলচ্চিত্রকার যখন কোনো উপস্থাসকে ছবির পর্দায় রূপায়িত করেন তখন তিনি যেটি ছবিত্তে রূপান্তরিত করেন তা হলো

উপস্থাপন থেকে নেওয়া কিছু কাঁচা উপকরণ। কোনো উপস্থাপন-ভিত্তিক সাধারণ ছবিতে আমরা পাত্র-পাত্রীর বাইরের আচরণ, জিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটনার গতি উপলব্ধি করি। কিন্তু আর্না রেনে তাঁর 'লাস্ট ইয়ার এ্যাট মারিয়েনবাদ' ছবিতে পাত্র-পাত্রীর যা কিছু ঘটনা সংঘটন দেখিয়েছেন, তাকে চিত্রিত করেছেন তাদের অন্তর্ভুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে। বিশ দশকের উপস্থাপন শিল্পে চৈতন্য প্রবাহ (Stream of Consciousness) রীতির জন্ম হয়েছিল হেনরী জেম্‌স্‌, ভার্জিনিয়া উলফ্‌, জেম্‌স্‌ জয়েস প্রমুখের রচনার অনুঘটক। আধুনিক চলচ্চিত্রে বিশেষতঃ রেনে, রব-গ্রিয়ে ও মার্গারেট দুরাজের অনেক ছবিতে আমরা এই চৈতন্য প্রবাহের দৃশ্যকল্প ও সময় প্রবাহের বিশ্বাস লক্ষ্য করেছি।

ঔপন্যাসিক যে সব উপকরণ নিয়ে কাজ করেন বিষয়গত ভাবে তা অনেক ক্ষেত্রে নাট্যকারের রচনার সমগোত্রীয় হলেও উপস্থাপনে বস্তুগত সীমাবদ্ধতা অনেক কম। ঘটনা উপস্থাপনার তুলনায় পাঠকের মনে অনুরূপ অনুভূতি জাগিয়ে তোলার মধ্যেই উপস্থাপনের শক্তি নিহিত। আর নাট্যকারের শিল্পরীতি ঘটনা বর্ণনার তুলনায় উপস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। উপস্থাপনের তুলনায় নাটক ও চলচ্চিত্রে সংলাপও অনেক প্রত্যক্ষ রূপ গ্রহণ করে। উপস্থাপন ও সিনেমার রীতিতে আর একটা উল্লেখযোগ্য সমতা হলো সমস্থানিকতার (coincidence) ব্যবহারে। আপাত-বিরোধী হলেও মানুষের জীবন অসংখ্য সমস্থানিক ঘটনার দ্বারা পরিপূর্ণ। উপস্থাপনের রচনায় এটা ব্যবহৃত হলে তা বহুক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য হয় না। উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কাহিনী কাঠামো চরিত্রের বিবর্তনের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে এগোয়। ঔপন্যাসিকের আছে সেই ক্ষমতা যাকে সাহিত্যের ভাষায় বলা যায়, 'power of creating character from within'। চলচ্চিত্রে এ সৃষ্টি একেবারে সীমিত। আবার চলচ্চিত্রের পর্দায় চরিত্র বা ঘটনাগত সংঘাতের যে রূপ প্রত্যক্ষ করা যায় তা অল্প কোনো প্রকার শিল্পের কাঠামোয় দেখা যায় না। তার কারণ সিনেমার অবিরাম গতিই এই দ্বন্দ্বের উৎস। উপস্থাপন এবং চলচ্চিত্র উভয়েই সময়ভিত্তিক শিল্পমাধ্যম। কিন্তু যে ক্ষেত্রে উপস্থাপনের গঠননীতি মূলতঃ সময়অশ্রিত, সেখানে সিনেমার গঠনবিশ্বাস গতিভঙ্গির ওপর নির্ভরশীল। দুটি শিল্পমাধ্যমই মনস্তাত্ত্বিকভাবে টুকরো টুকরো করে সময় ও গতিভঙ্গির মাঝা তৈরি করে। উপস্থাপনের মতো চলচ্চিত্রও তার সম্পূর্ণ অবয়বে জীবনের কথা ব্যক্ত করে। উভয়ের আকাঙ্ক্ষা অবিরাম ভাববস্তুতে। উপস্থাপনে সময়ের ব্যবহার হয় মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে। চলচ্চিত্রে সময়কে দেখি বস্তুগতভাবে বাস্তবজগতের

অনুসারী। উপস্থাপনে ঘটনার গতি কেবলমাত্র পাঠ্য। চলচ্চিত্রে ঘটনার গতি বস্তুজগতের যথাযথ চলমান ছন্দের প্রত্যক্ষ রূপ। উপস্থাপনের ঘটনা সংস্থান পাঠকের কল্পনার ওপর নির্ভর করে। চলচ্চিত্রে দর্শক প্রকৃত ঘটনা সংস্থান চোখে দেখতে পায়। স্বকীয় শর্ত অনুযায়ীই দুই মাধ্যম স্ব স্ব উপাদানের ব্যবহারে নিজস্ব পদ্ধতি অনুসরণ করে। তাই প্রস্তু বা জেম্‌স্‌ জয়েস-এর রচনাকে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করা যেমন দুর্কহ, তেমনি চ্যাপলিনের চলচ্চিত্রকে গ্রন্থাকারে রক্ষা করাও অত্যন্ত কঠিন।

যদিও, চলচ্চিত্র ও উপস্থাপনের তুলনামূলক বিচারে দিনেমার প্রত্যেক মহৎ পরিচালকই মহান উপস্থাপিকের তুল্য নন। এবং উভয় বিষয়ের আলোচনায় পারস্পরিক চুলচেরা বিশ্লেষণও আক্ষরিক অর্থে করা চলে না। তা সত্ত্বেও, বলা যায় যে, দিনেমা শিল্পে আমরা কেবল রিচার্ডসনের মতো প্রণয়ী পাইনি, এ শিল্পেও ডিকেন্স, মার্সেল প্রস্তু-এর মতো শিল্পীকেও পেয়েছি। চলচ্চিত্র পরিচালকের মহতী প্রতিভার নিদর্শন সেখানেই, যেখানে তিনি তাঁর স্বজনীকল্পনার নানা সমন্বয়ে একটি মহৎ উপস্থাপনের মূল রসটুকু ছবির পর্যায় নিবিড়ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। সেখানে মূলের ব্যত্যয়, পরিবর্তন বা সংযোজনে কিছু এনে যায় না। আগলে সবক্ষেত্রে উপস্থাপনের বিষয়টি নয়, চলচ্চিত্রপ্রণয়ী তাঁর স্বজনী কল্পনায় ঐ উপস্থাপনকে কিভাবে বিছাদ করছেন, সেটাই চলচ্চিত্র আলোচনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : জর্জ বুস্টোনের নভেল্‌স্‌ ইনটু ফিল্ম এবং উল্ফ্‌ বিলার রাইটার অ্যাণ্ড দি স্ক্রীন ।

**সোমেন ঘোষ**

॥ ডোনাল্ড সিগেল ॥

( জন্ম ১৯১২, আমেরিকা )। কেশ্বিক্ষে ও লণ্ডনের রয়াল অ্যাকাডেমি অব ড্রামাটিক আর্টে পড়াশুনার পর অভিনেতা হবার অসফল চেষ্টা করে তিনি সহ সম্পাদক রূপে দিনেমার সঙ্গে যুক্ত হন ও কয়েক বছরের মধ্যে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হয়ে ওঠেন। অস্ত্রের ছবির জন্ত যোগস্বত্রক দৃশ্যপর্যায় পরিচালনা করে ( যার মধ্যে ওয়ান ফুট ইন হেভেন বা কন্‌ফেশন্‌স্‌ অব এ নার্জি স্পাই উল্লেখযোগ্য ) ও কয়েকটি প্রশংসনীয় স্বল্প দৈর্ঘ্যের চিত্র নির্মাণ করে ৪৬-য়ে তিনি কাহিনীচিত্রের পরিচালনায় আসেন। তাঁর ছবি মূলত অপরাধ জগতের অ্যাকশনধর্মী চিত্র। এর মধ্যে কিছু ছবি

অপরাধ, হুর্নীতি ও রহস্যের গোপন জগৎ নিয়ে যা ভারী আবহাওয়া, অবসন্ন মনোভাব, ধূসর স্বর ও অন্ধকার হতাশায় আচ্ছন্ন। আর কিছু ছবি তির্যক অ্যাকশন ও ইন্ডিক্টিভর্মী ঘটনায় চিহ্নিত। দ্রুত গতি, কলাকৌশলের দক্ষতা, সক্ষম শৈলী যাতে ইম্প্রোভাইজেশনের প্রবণতা রয়েছে ও কাইয়ে গোষ্ঠীর সমালোচকদের মতে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁর ছবিকে চিহ্নিত করেছে। কাইয়ে তাকে উল্লেখ করত auteur বা জ্ঞাত শ্রষ্টা রূপে। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে তিনি ছবির কাজ শেষ করতে পারতেন। ষাট ও সত্তরের দশকে তিনি বহু টিভিচিত্রও পরিচালনা করেন। কনভয় ( ৪৪ ), The Verdict ( ৪৬ ), ইন্ভেশন অব দি বডি স্ন্যাচার্স ( ৫৬ ), দি লাইন আপ ( ৫৮ ), দি কিলার্স ( ৬৪ ), The Beguiled ( ৭১ ), ডাট হ্যারী ( ৭১ ), দি লুটার্স ( ৭৩ ) তাঁর উল্লেখযোগ্য কাহিনীচিত্র। তাঁর ছবিতে ( বিশেষত কুগান'স রাফ ও অক্সাণ্ড ছবিতে ) হিংস্রতার নির্দিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক-মনস্তাত্ত্বিক-নান্দনিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ফরাসি সমালোচকদের মত ছিল ডন সিগেল-এর ছবিকে সংক্ষেপে 'Siegel's' বলা যায়, সেগুলি এতই বিশিষ্ট। যার প্রমাণ মিলবে দি গ্যাস্ট্রি, রাফ কাট, জিঙ্কস্‌ড্ ! প্রভৃতি ছবিতেও।

## ॥ সিটিজেন কেন ॥

১৯৪১, আমেরিকা। পরিচালকের প্রথম কাহিনীচিত্র হিসেবে সর্বকালের সবচেয়ে প্রভাবশালী চিত্র। বহু সময়ে বহুবার ছবিটিকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ছবি বলেও রাখা দেওয়া হয়েছে। ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র এক বৃহৎ সংবাদপত্র গোষ্ঠীর বনী মালিক। নিজের সংবাদপত্রের মাধ্যমে তাঁর একটা নির্দিষ্ট পাবলিক ইমেজ তৈরি হয়েছে। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পর জনৈক দাংবাদিক এই নিয়ে অতুমত্যান শ্রম করে যে অর্থ ও নীতি, জীবনের লক্ষ্য ও শান্তি—মৃত্যুর আগে এদের সম্পর্কে তাঁর কোনো উপলব্ধি হয়েছিল কি? সে লক্ষ্য করে তাঁর পরিচিত বা আত্মীয় ব্যক্তির। তাঁর সম্বন্ধে যে ব্যক্তিগত ধারণা পোষণ করে তার সঙ্গে তাঁর পাবলিক ইমেজের কোনো মিল নেই। তিনি জীবনে ও মৃত্যুর পরেও বিচ্ছিন্নতার শিকার। এই বিচ্ছিন্নতা আধুনিক জীবনের শূন্যতা থেকে উদ্ভূত। এই ছবি যেন 'একটা মানুষের নিকট অতীতে, তার শৈশবের মধ্যে অভিযান।' এই ধীমকে আশ্রয় করে ওয়েলস এই ছবিতে চলচ্চিত্রের মাধ্যমকে যে উৎসাহ, মৌলিকতা ও শক্তি নিয়ে ব্যবহার করেছেন তা স্মরণীয় হয়ে আছে। সন্নয় ও বর্ণনার ধারাবাহিকতা ভেঙে দেওয়া দক্ষ ও পরিমিত চিত্রনাট্য, টোল্যাণ্ডের ( ড্র. ) ওয়াইড ফটোগ্রাফি, শব্দ ও

সংগীতের মননশীল প্রয়োগ—সব মিলিয়ে ছবির জগৎটি বিখণ্ড ও অভিব্যক্তি হয়ে উঠেছিল। মিজঁসেন (ড্র.) বা চলচ্চিত্র-করণের এক অনবদ্য উদাহরণ এই ছবিটি। চরিত্রের মানসিকতার প্রকাশে আপওয়ার্ড অ্যাঙ্গেল শটগুলি কৃতিত্বের সাথে ব্যবহৃত। দেয়ালের উর্ধ্বাংশ ও সিলিং এর ফলে সেটের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে ওঠে। ওয়েলসেরও আগে ওজু, তাঁর বিশেষ ক্যামেরা উচ্চতার দরুন, সেটকে এইভাবে কাজে লাগিয়েছেন। সিটিজেন কেন আজও সমান উজ্জ্বল মনে হয় এবং পৃথিবীর সবসেরা ছবির তালিকায় তার স্থান সবসময়েই উঁচুতে। পিটার উলেনের মতে, এই ছবি হলো সিনেমা সম্পর্কে আমাদের ধারণার আমূল রূপান্তরের পথে এক বিরাট পদক্ষেপ।

অভিনয়ে ওয়েলস (সংবাদপত্রের মালিক), চিত্রনাট্য Mankiewicz, চিত্র-গ্রহণ টোল্যাণ্ড, সংগীত B. Herrmann, সম্পাদনা R. Wise.

প্রামাণিক গ্রন্থ : P. Kael-এর দি সিটিজেন কেন বুক। ছবিটি নিয়ে বাজাঁরও মূল্যবান আলোচনা আছে ॥

॥ সিনেমা ভেরিতে ॥

ষাটের দশকে নির্মিত এক শ্রেণীর তথ্যচিত্র প্রসঙ্গে সাধারণত সিনেমা ভেরিতে পরিভাষা বা বিশেষণটি ব্যবহার করা হয়। সিনেমা ভেরিতে হলো স্বতঃস্ফূর্ত সিনেমা, ধরাবাঁধা প্লট ও মনোগ্রাহী বর্ণনাতন্ত্রির পরিবর্তে যেখানে আছে যেমন আছে— সেইভাবে বাস্তবতাকে তুলে ধরা। বলা হয় এর আদি সূচনা সিনেমা সম্পর্কে ভের্তভের তাৎক্ষিক ধারণায় (ড্র. কিনো-আই) ও তাঁর স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবিতে, যদিও তাঁর ছবি আমার কাছে স্বতঃস্ফূর্তের বদলে কলাকৌশল সচেতন-ই লাগে। সর্বপ্রথম ফ্রান্সে সমাজবিজ্ঞানী ও নৃতাত্ত্বিকরা এর কাজ শুরু করেন, যে প্রসঙ্গে জঁ রুশ (ড্র.), Edgar Morrin, জিশ মার্কোর, মারিও রুসপোলি প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। সিনেমা ভেরিতে অছাচ্চ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো ১. অনেকটা সংবাদচিত্রের আদলে তা তোলা ও সাজানো হয় ২. ছবির বিষয়বস্তুর সঙ্গে সমাজতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক ভাবনা ও প্রসঙ্গকে সংশ্লিষ্ট করা হয় ৩. সাক্ষাৎকার, ধারাবিবরণী, কলাকৌশলের কাজ, সম্পাদনা সর্বত্রই এক ধরনের স্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হয়। সিনেমা ভেরিতে আন্দোলনের একটা প্রধান প্রসঙ্গ ছিল তথ্য ও কাহিনী চিত্রের মাঝামাঝি একটা আঙ্গিক নিয়ে বিস্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ফরাসি সিনেমা ভেরিতে ক্যামেরাকে ব্যবহার করে অনুঘটকের মতো, বাস্তবতার

মধ্য দিয়ে কোনো প্রব, মন্তব্য, বা সত্যকে তুলে ধরে। এর আমেরিকান ধরানা ডিরেক্ট সিনেমা ( ড্র. ) কিন্তু ক্যামেরাকে বাস্তবতার নীরব সাক্ষী হিসেবে গ্রহণের পক্ষপাতী। এর সঙ্গে কম বেশি সাদৃশ্য ও যোগাযোগ রয়েছে কানাডার লিভিং সিনেমা, গ্রেট ব্রিটেনের ফ্রি সিনেমা আন্দোলন প্রভৃতির। ( ড্র. আর্ড গার্ড, ফ্রান্স )

## ॥ সিঞ্চল ॥

যে কোনো শিল্পমাধ্যমেই সিঞ্চল একটি শক্তিশালী উপাদান, সিঞ্চল হলো বক্তব্য বা মন্তব্য আনার জন্ত ব্যবহৃত উপমা, আগে থেকে তৈরি করা স্বীকৃত কিছু ভাব। আজ সে সমস্ত image-র উপর স্থানচিহ্নিত ভঙ্গিতে নির্ভর না করে যেমন নতুনতর image-কে প্রতীক রূপে প্রয়োগ করার চেষ্টা হচ্ছে তেমনি সিঞ্চলটাকে ডিটেলের ( ড্র. ) সঙ্গে মিশিয়ে ডিটেল কাম সিঞ্চল রূপে ভাবা হচ্ছে। তাই মানুষ মুরগী হয়ে গেল কিংবা বই পিস্তল প্রমুখ প্রতীক এখনকার দিনে আড়ম্বর ও প্রকট বলেই বোধ হয়। বরঞ্চ কাহিনীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি জড়িত থাকায় লাভেস্তরা ছবির প্রতীক-গুলো আমাদের কাছে অধিকতর সাকল্যের গ্যোতক। ফলে সিঞ্চল বেছে নেওয়ার কাজে আজ পরিমিতিবোধের দিকে বিশেষ করে নজর দেওয়া হচ্ছে। সেট বা দৃশ্যে উপস্থিত উপকরণকেই সূক্ষ্মভাবে প্রতীক রূপে প্রয়োগ করা হচ্ছে। অসংখ্য বিচিত্র সিঞ্চলের পরিচয় পাওয়া যায় দেশ বিদেশের অজন্ত ছবিতে। জলসামুদ্রে ঝাড়লঠন আভিজাত্যের প্রতীক, মদের গ্লাসে ডুবন্ত আরশোলা সনাতনী বিলাস ব্যগনের আদম্ব বিনাশের ইঙ্গিত। দেবীতে ঝড় বিদ্যুৎ দুরাগত বজ্রধ্বনি ও নদীর অশান্ত জলের composition অভিশাপ ভাঙ্গা বা সর্বনাশের প্রতীক। কাঞ্চন-জঙ্ঘায় কুয়াশা, হুজনের নিভৃততম আলোচনার সময় পাশ দিয়ে লোকজন বা জীবজন্তুর চলে যাওয়া, কখোপকখনরত দুটি ছেলে ও মেয়ের মাঝখানে তীক্ষ্ণ পাথর খামের অবস্থান, ছাড়া ছাড়া দূরে ছিটিয়ে থাকা গাছপালা, কুয়াশায় অস্পষ্ট হয়ে বাদকদের ব্যাণ্ড বাজানো প্রভৃতিতে কিছু জটিল সিঞ্চলের উদাহরণ। আরতির ধরে হাওয়ায় উড়ে বেড়ায় হাক্কা সাবানের ফেনা বা চারুলতার হাতের দ্ববীন সার্থক সিঞ্চল রূপে প্রতিভাত। অরণ্যের দিন রাত্রিতে ক্ল্যাশ ব্যাকের দৃশ্যে মেয়েটার আলমারীর ঠিলের পাল্লার আড়াল থেকে সংলাপ উচ্চারণে পাল্লাটি অন্তঃসারশূতা, প্রদর্শনপ্রিয়তা ও নিরুঙ্কিতার প্রতীক রূপে ডন কুইকসোটের ঢালে রূপান্তরিত। মেলা ও বাংলোর দৃশ্যে কয়েকটি স্থানের শটের বৃত্তাকারে ঘুরে ফিরে আসা আমরা

যে শূন্যতার শিকার তাকেই তুলে ধরে। দিবারাত্রির কাব্যে লুপ্তনের প্রজ্জ্বলিত শিখা, চিমনির ঘন কালো কালি, শব্দ করতে করতে একটা করাভের কাঠচেরা, ভুবন সোমে ব্যবহৃত কার্টুন সিঙ্ঘলের কয়েকটি অনবণ্ড প্রয়োগ। বিশেষ পরিস্থিতিতে সিঙ্ঘলটাই চিত্রকল্প। বগ্ন, কল্পনা বা বিভ্রমের এমন কোনো দৃশ্য যাতে সেটি কোনো বিমূর্তকে মূর্ত করল বা জটিল কোনো অল্পভূতিকে রূপ দিল। যেমন রো আপের শেষ দৃশ্যকল্পটি। এমন ক্ষেত্রে পুরো দৃশ্য বা দৃশ্যসমূহের সম্মেলনটিই প্রতীকী। অনেকগুলি শটকে মনতাজ রীতিতে গেঁথে যেমন নির্দিষ্ট কোনো একটি অভিব্যক্তি, তেমন অনেকগুলি প্রতীকী শটকে ঐ রীতিতে গেঁথে নিঃসন্দেহে একটি প্রতীকী মণ্ডলের রূপায়ণ। একটা প্রতীকই আবার বারবার ফিরে আসে বিভিন্ন ছবিতে নানান অর্থ নিয়ে। পথের পাঁচালীর ট্রেন কোতুহল ও জীবনের প্রতীক, অপূর সংসারে ট্রেন বিরক্তির প্রকাশ, নায়কে ট্রেনকে ব্যবহার করা হয় জীবনের উদ্দাম গতি বোঝাতে। একই ভাবে একটা সিঙ্ঘলকেই আবার একই ছবিতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনা যায়। কোনো একটা মন্তব্য তাতে আসে কিনা, একটা স্ননির্দিষ্ট সিঙ্ঘল বার বার ঘুরে ফিরে এসে দৃশ্য বা ধ্বনির বৃত্ত সম্পূর্ণ করছে বা তাকে ভেঙে দিচ্ছে। অর্থাৎ কোনো দৃশ্যে বিপরীত স্বরের ধ্বনির প্রয়োগে বৈদ্যাদৃশ্যটি সম্পূর্ণ করা বা একই ধ্বনির সহযোগে বিপরীত স্বরের কতগুলো দৃশ্য গেঁথে দিয়ে সাদৃশ্যটি দেখানো। এগুলো ডিটেল ও সিঙ্ঘলের কিছু যুগ্ম জটিল প্রয়োগ যা নিঃসন্দেহে নির্দিষ্ট কোনো মন্তব্য এনে দেয়। কী ধরনের সিঙ্ঘল ছবিতে ব্যবহৃত হবে তা অনেকটাই পরিচালক ও কাহিনী নির্ভর। ভুবন সোমে স্থানচ্যুত বালি মানসিকতার পরিবর্তন বোঝাতে প্রতীক রূপে ব্যবহৃত। ঐ একই কারণে জলন্ত মোমবাতির গলে গলে পড়া মোমকে কাজে লাগাতে পারি আমরা। একটা উঁচু অঙ্ককার ওভারব্রীজে একসারি নিভে থাকা নিয়ন আলোর মধ্যে একটার থেকে থেকে জলে ওঠা, মোটরের সাইড স্ক্রীনে অপস্ফয়মান ফেলে আসা পথ ক্ষেত্র বিশেষে ভারি স্পন্দর প্রতীকের কাজ করে। ফাউন্টকে চিত্ররূপ দিতে গেলে নায়কের মানসিকতা স্পষ্ট করার জন্ত রঙ (ড্র. চলচ্চিত্রে রঙের ব্যবহার) ও মালুঘের ছায়া সেখানে অন্ততম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। এই ছবিতে মাথার খুলি থেকে বালির ষড়্‌, ভাঙা চাঁদ থেকে তীরধনুক পর্যন্ত বহু বস্তুকে প্রতীক বা আর্কিটাইপ রূপে প্রয়োগ করা সম্ভব। প্রসঙ্গক্রমে, অন্তর্মুখী বিভিন্ন দৃশ্যে ফটো এবং প্রতিবিম্বও প্রতীকী ভূমিকা নেয়। কোনো একটা দৃশ্যের পিছনে যে সৌন্দর্যরস তাও অনেক সময় প্রতীকের কাজ করে, সেই শিল্প বা স্পন্দরের ব্যাপারটিই ঐ দৃশ্য বা চিত্রকল্পকে প্রতীকী করে

তোলে। বার্গম্যানের দি নেক্‌ড নাইট চিত্রের একটি প্রায় নগ্ন দৃশ্যে কামানের অবস্থানের সঙ্গে জননাদের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। আবার দুর্গার মৃত্যুর পর হরিহরের বাড়ি ফিরে আসার দৃশ্যটিতে নব্বই সেকেন্ডে স্থায়ী গরুর জাবর কাটা বড়ের পূর্বের ঋমথমে ভাব। দি এণ্ড অব সেন্ট পিটার্সবার্গ, আইডান দি টেরিবল, নাইফ ইন দি ওয়াটার প্রতৃতি চিত্রে আমরা কিছু জটিল প্রতীক ও উপমার সাক্ষাৎ পাই। একটা ট্রেন মোটর বা বিমানের বিভিন্ন যন্ত্রাংশকেও ব্যবহার করা যায় নানান অবস্থার প্রতীক রূপে। মোটরের হেডলাইটের অনবরত জ্বলা নেভা, গীয়ার বদল, ব্রেককথা, ঘূর্ণায়মান চাকা, সাইড স্ক্রীন ও অস্বাভাবিক অংশগুলো সমস্তই সার্থক প্রতীক হিসেবে পরিচালকের কাজে লাগে। গদার তাঁর উইক-এণ্ড চিত্রে তাদের সার্থক প্রয়োগ দেখিয়েছেন। সেই অংশগুলি composition of shots-এরও সূন্দর উদাহরণ। দৃশ্য বা দৃশ্যাংশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ-বিহীন উপকরণকে উপমা রূপে ব্যবহারের পরিবর্তে এখন ফিল্ম টেকনিকের সৃষ্টিত প্রয়োগে, দৃশ্য বা দৃশ্যাংশ প্রতীকী করে তোলা হচ্ছে। যেমন freeze-এর প্রয়োগ, deep focus-এর ব্যবহার, আকস্মিক পীড়াদায়ক আলো, ফ্রেম ছোট, অবলিক কি ইনভারটেড করে দেওয়া। যেমন চিত্তাশীল composition of shots। Super imposition-ও অনেক সময় সাদৃশ্য বা বৈপরীত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে তত্ত্বুতি বা মন্তব্যটা তীক্ষ্ণ করে, এখানে তার কাজ সিফল। দ্রুত ও সূত্রী ইন্টারকাট করা বিভিন্ন দৃশ্যাংশ কখনও প্রতীকের কাজ করে। যেমন করেছে ড্রেয়ারের জোয়ান অব আর্ক চিত্রে জোয়ানের মানসিকতা পরিষ্কৃটনের অংশটুকুতে। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা যাক, সার্থক close upও এমন ক্ষেত্রে সিফল তুল্য কাজ করে, তার প্রমাণ ঐ ছবিতেই বিচারকদের মুখের শটে। দাঁত জিভ আলজিত সমস্ত হিংস্রতাকে পুরোপুরি ফুটিয়ে তুলেছে। মিরাকল ইন মিলানের নীলাম দৃশ্যের কথাও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। ইন্দিময় ইলিউশনের চিত্তাশীল প্রয়োগও প্রায়শঃই প্রতীকের ভূমিকা নেয় এবং চিত্রকল্পের ব্যাপকতা ও গভীরতা বৃদ্ধি করে। লক্ষ্য রাখা উচিত, ইলিউশনের দৃশ্যটি যেন আগের বা পরের দৃশ্যের সঙ্গে যত বেশি সম্ভব identified হয়। কোনো দৃশ্য বা দৃশ্যাংশে স্নো বা কুইক মোশনের ব্যবহার, একটি থেকে অপরটিতে চলে যাওয়া, কিংবা যে কোনো একটি থেকে স্বাভাবিক গতিতে ফিরে আসা নিঃসন্দেহে ক্ষেত্র বিশেষে প্রতীকের কাজ করে। আর ছবিতে রঙ-এর ব্যবহার তো সব সময়েই প্রতীকী পরিমণ্ডল পরিষ্কৃট করার জন্ত। বিমূর্তকে মূর্ত করা, আপাত অসম্ভব ভাবনা চিত্তাকে রূপ দেওয়া। সিফল হিসেবে

রঙ-এর প্রয়োগটা সরাসরি এবং সেই কারণেই আরো ফলদায়ক। প্রতীক প্রদক্ষে রূপক, প্রক্ষেপ, মোটিফ ( দ্র. ) ও আর্কিটাইপের কথাও আসে।

### ॥ মিশেল সিমোঁ ॥

( ১৮৯৫-১৯৭৫, ফ্রান্স )। আসল নাম ফ্রঁসোয়া সিমোঁ, জন্ম সুইটজারল্যান্ডে। ষোল বছর বয়সে সিমোঁ প্যারিসে চলে আসেন এবং মুষ্টিযোদ্ধা, আলোকচিত্র-শিল্পী, সংগীতানুষ্ঠানের প্রমোদশিল্পী প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের কাজ করে মঞ্চে অভিনয় শুরু করেন। ১৯২৫য়ে তিনি চিত্রাভিনয়ের স্বযোগ পান। কিন্তু তাঁর মূল প্রসিদ্ধি সবাক যুগে এসে। প্রায় দেড়শোটি কাহিনীচিত্রে তাঁর অভিনয় কয়েকটি সৃষ্টিশীল বৈপরীত্য স্পষ্ট করে তোলে। মুষ্টিযোদ্ধাসুলভ শরীর ও অদ্ভুত বাচনভঙ্গি নিয়ে তিনি একই সঙ্গে তৎপর ও বিব্রত। রুক্ষ হয়েও ঘরোয়া, অভিনয়ে একই সঙ্গে শক্তি ও আবেগের প্রকাশ। তাঁর চরিত্রচিত্রণে বহু বৈচিত্র্য, কিন্তু প্রায় সমস্ত চরিত্রই মাটির পৃথিবীর, অভিনয়ের তীব্রতা ও একাঙ্গতায় যা বিখ্যাত ও আপন হয়ে ওঠে। উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে আছে Jean de la Lune ( ৩১ ), রেনোয়ার ( যার সঙ্গে ছিল তাঁর গভীর বন্ধুতা ) La Chienne ( ৩১ ) ও Saving Boudu from Drowning ( ৩২ ), ভিগোর L' Atalante ( ৩৪ ), Bizarre Bizarre ( ৩৭ ), ক্লেয়ারের বিউটি অ্যাণ্ড দি ডেভিল ( ৫০ ), দি মার্চেন্ট অব ভেনিস ( ৫২ ), দি টু অব আস ( ৬৭ ), ইত্যাদি।

### ॥ ভিক্টর সিস্ট্রম ॥

( ১৮৭৯-১৯৬০, সুইডেন )। আসল নাম Victor Sjostrom। নাট্য পরিচালক, অভিনেতা ও চলচ্চিত্র পরিচালক। যদিও এম. ষ্টিলার-এর Vampyren ( ১৯১৩ ), নিজের Korkalen ( ২১ ), বার্গম্যান-এর ওয়াইল্ড স্ট্রবেরীজ ( ৫৭ ) ও অন্ত বহু ছবিতে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন, চলচ্চিত্রে তাঁর প্রধান খ্যাতি চিত্র-পরিচালক রূপে। প্রারম্ভিক সুইডিশ সিনেমার তিনিই সম্ভবত সবচেয়ে প্রভাবশালী ও সৃষ্টিশীল পরিচালক। সুইডেনে নির্মিত তাঁর ছবিগুলি বিচিত্র লোকেশনের ব্যবহার, ক্যামেরার প্রথা-বিরোধী প্রয়োগ, চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক গভীরতা ও সমাজ-সচেতনতায় চিহ্নিত। লোকেশনে গিয়ে শুটিং করার ফলে ছবিতে এসেছে প্রসার, সৌন্দর্য ও কাব্যময়তা, ক্যামেরা শৈলীর বিশেষত্ব এনে দিয়েছে চিত্রগতি ও সম্পন্ন ক্রমবিকাশ, সমাজচেতনা যুক্ত হয়েছে দর্শনবোধের সাথে। সুইডিশ

সিনেমার এই জাতীয় দর্শনচিন্তা মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে, মানবিক আবেগকে প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে সংযুক্ত করে। প্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতি অনেক সময়েই পরস্পরে বিনিময়যোগ্য হয়ে ওঠে। Terje Vigen (১৭), Korkalen, দি আউটল' অ্যাণ্ড হিজ ওয়াইফ (১৮), The Girl from Stormycroft সিনেমার ছবির কলাকৌশলগত সমৃদ্ধি, ইমেজের অদ্ভুত প্রভাময়তা, পরিমিত অভিনয় ও কাব্যিক ছাচারালিঙ্গনের সুন্দর প্রমাণ। এই সাফল্যের পিছনে চিত্রগ্রাহক Jaenzon-এর কৃতিত্বও অরণীয়। শেষোক্ত ছবিটি ডেয়ারের আইড অব গ্লোমডাল-এর সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। ১৯২৩য়ে তিনি হলিউডে আসেন ও ২৯য়ে সুইডেনে ফিরে যাবার আগে ওখানে নটি ছবির পরিচালনা দেন। এর মধ্যে দি স্কারলেট লেটার, দি উইও, ও হি হু গেটস স্ল্যাপ্‌ড উল্লেখযোগ্য। তিনটি ছবিতেই ভালো ও মন্দে দুন্দে সংকটাপন্ন মানুষের চিত্র উদ্ঘাটিত। দি উইও-য়ের সম্পাদনায় প্রযোজক অন্ত্যায় হস্তক্ষেপ করেন ও নির্বাক চিত্র রূপে পরিকল্পিত ছবিতে শব্দ চাপিয়ে দেন। ছবিটি ব্যবসায়িক ভাবেও অসফল হয়। এই ছবি প্রকৃত মর্যাদা পায় আধুনিক কালে এসে। তৃতীয়টিতে এক্সপ্রেসনিজমের জটিলতা ও প্রতীকী রূপারোপ এসেছে। তিনি একই সঙ্গে setter of scenes (ড্র. বোর্ন) ও একজন জাত শ্রষ্টা। ৩০য়ে তিনি একটা সবাক চিত্র নির্মাণ করেন।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : B. I. Almquist-এর Victor Sjostrom ।

### ॥ সুইডেন ॥

বিশ শতকের একেবারে গোড়ার দিক থেকেই পিটারসন, ফ্লোরম্যান ও অগ্গরা স্থানীয় ঘটনা, কমেডি ও মঞ্চ নাটকের নির্বাচিত দৃশ্য নিয়ে স্বল্প দৈর্ঘ্যের চিত্র নির্মাণ শুরু করেন। সুইডিশ নির্বাক চলচ্চিত্রের আদি যুগে C. Magnusson-এর প্রভাব সুইডেনে দূরপ্রসারী হয়েছিল, তাঁরই চেষ্টায় একটা প্রাইভেট প্রযোজক কোম্পানি Svensk Filmindustri-র রূপ পায়, যা আজও সুইডেনের প্রধান প্রযোজক-সংস্থা। তিনি ছিলেন নতুন প্রতিভার অসাধারণ আবিষ্কর্তা, ভিক্টর স্জস্ট্রম (সিস্ট্রম) ও মরিজ স্টীলারকে চিত্রপরিচালক রূপে তিনিই চুক্তিবদ্ধ করেন। স্জস্ট্রমের Terje Vigen (১৭), স্টীলারের লাফ অ্যাণ্ড জার্নালিজম (১৬), মিস জুলি (১২), দি ফাদার (১২) সুইডেনের প্রারম্ভিক ছবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। স্ট্রীণবার্গ, লাগেরলফ ও ইবসেনের কাহিনী অবলম্বনে তখন বহু ছবি নির্মিত হয়েছে। তখনকার দুই সেরা পরিচালকের নাম আগে বলেছি, সেরা

অভিনেতাদের মধ্যে হ্যানসন, গার্বো, ও চিত্রগ্রাহকদের মধ্যে Jaenzon-এর নাম করা দরকার। প্রথম থেকেই স্বেডেনের ছবিতে নরডিক ঐতিহ্যের প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে, পাওয়া গেছে বিভিন্ন দেশজ মোটিফ এবং জাতীয় জীবন ও সংস্কৃতির সাথে জড়িত প্রসঙ্গ, প্রকৃতির বন্দনা আর প্রকৃতির সাথে অনুভবের একাত্মতা, প্যাশন ও ইন্সটিংক্ট, অনবদ্য দৃশ্যরস ও মনস্তাত্ত্বিক গভীরতা। স্বেডেনের সিনেমা সমৃদ্ধির চরমে পৌঁছল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। কিন্তু ক্রমেই হলিউড থেকে আগত ছবির সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়ে এই দেশের ছবি শিল্পগণের পরিবর্তে প্রমোদনমূল্যকে বেশি গুরুত্ব দিতে লাগল, যদিও তাতে ব্যবসায়িক সাফল্য তেমন বাড়ল না। শিল্পসত্তা বিসর্জন দিয়েও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সুরাহা হলো না। বিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে সনত্র তিরিশ শতক এই দেশের চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে মন্দাকাল। পূর্বোক্ত শিল্পীরা প্রায় সকলেই একে একে হলিউডে চলে এলেন। দেশে থেকে চিত্রনির্মাণ করছিলেন পি. লিওবার্গ ও মোল্যাণ্ডার ভ্রাতৃদ্বয়। শব্দের আগমন হতে নতুন সমস্যা এল, ভাষাগত দুরূহতার জঘ এ দেশের ছবির পরিবেশন বিদেশে আরো কমে এল। এই সময়ের একমাত্র উল্লেখ্য ছবি Intermezzo ( ৩৬ ) যার নাট্যিক বার্গম্যানও কিছুদিনের মধ্যেই হলিউড চলে গেলেন। চলচ্চিত্রশিল্পে আবার উন্নতি এল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতে, বিদেশী ছবির আমদানি প্রায় বন্ধ হয়ে গেল ও স্বেডেন যুদ্ধে অংশ না নিতে তার শিল্পচর্চা মোটেই ব্যাহত হলো না। স্বেডিশ সিনেমার দ্বিতীয় স্বর্ণযুগ এটা। Sjoberg এলেন টরমেন্ট ( ৪৪ ) নিয়ে : চিত্রনাট্য—বার্গম্যান, বার্গম্যান নিজে এলেন ক্রাইসিস্ ( ৪৬ ) নিয়ে। অস্বাভাবিক স্বরণীয় ছবির মধ্যে আছে আনুএক্সপেক্টেড মিটিং, প্রাইভেট বস্, ব্লাড অ্যাণ্ড ফায়ার, দি ওয়র্ড, ওনলি এ মাদার, দি গ্রেট অ্যাডভেঞ্চার। বিভিন্ন স্বেডিশ ছবির আন্তর্জাতিক স্তরে ক্রমাগত সাফল্য এই সমস্ত ছবিকে স্বদেশে আরো জনপ্রিয় করে তুলল। এই সময়ে ছবির টিকিটের প্রমোদকর হঠাৎ অত্যধিক বৃদ্ধি পেতে আর টেলিভিশন থেকে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূচনা হতে পঞ্চাশের দশকে চলচ্চিত্রশিল্পে ফের সংকট এল। তবু নতুন পরিচালকের আবির্ভাব—ম্যাটসন, ওয়াইডারবার্গ, Sjoman—বন্ধ হলো না। গুরুত্বপূর্ণ ছবির মধ্যে ওয়ান সামার অব হ্যাপিনেস, দি ক্যান্টম ক্যারেজ ( দুটিই ম্যাটসনের ), মিস জুলি, দি আইল্যাণ্ড ( দুটিই Sjoberg-এর ), স্যাভেন'স এণ্ড, ম্যান অন্ দি ব্লফ, ভিক্টোরিয়া ( তিনটেই ওয়াইডারবার্গের ), ৪৯১, আই এন্ড কিউরিয়াস ইয়েলো, দিয়েস্তা সান্স ( তিনটেই Sjoman-এর ), দি এমিগ্র্যান্টস,

দি নিউ শ্যাণ্ড, ব্যাং ( তিনটেই জোয়েলের ) । এবং বার্গম্যান । পঞ্চাশ ও ষাটের দশকটি বার্গম্যানের যুগ, স্নইডেনে, আন্তর্জাতিক স্তরেও । স্নইডেনের ছবি তাঁর মাধ্যমে জগদ্বিখ্যাত হলো । এই দেশের শিল্পকর্মে যে বিশিষ্ট স্বাদ ও মেজাজ এবং ছবির যে বিশ্বস্ত ও অভিব্যক্তী জগৎ তিনি তাঁকে চূড়ান্ত রূপ দিলেন । চলচ্চিত্র উৎসবে অম্বদের ছবিও পুরস্কৃত হচ্ছিল । ৬৩তে স্নইডিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট স্থাপিত হলো । তারপর থেকে এখানকার ছবিতে প্রতিবাদ ও রাজনীতির প্রাধান্য এল ধীরে ধীরে । ৭৬য়ে বার্গম্যান স্বদেশ থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসন নিলেন । তরুণ ও তরুণতরুরা কিন্তু কাজ করে গেলেন তখনও । পরে বার্গম্যান আবার দেশে ফিরে এসে সিনেমা থেকে অবসর নিয়ে এখন থিয়েটার নিয়ে ব্যস্ত । কিন্তু নতুন নতুন পরিচালকের আবির্ভাব অব্যাহত আছে । এই সেদিনও তৈরি হয়েছে বেস্ট ইন্টেনশন্স-এর মতো ছবি । সব মিলিয়ে বিশ্ব চলচ্চিত্রে স্নইডেনের দান সত্যিই অপরিণীম ।

সম্পর্কিত গ্রন্থ : Peter Cowie-র স্নইডিশ সিনেমা ।

॥ এস. স্মখদেব ॥

( ১৯৩৩-৭৯, ভারত ) । স্মখদেবের কাছে ক্যামেরাটা ছিল একটা দুর্ভাগ, তীব্র নেশার সামগ্রী, প্রায় ওব্‌সেশন । তাঁর যে-কোনো ছবিতে প্রবান ভূমিকা অবিস্মৃতিতভাবে ক্যামেরার ; সে ক্যামেরা সতত সঞ্চরণশীল, জুম বা টেলিফটো লেন্সের নিরবচ্ছিন্ন ব্যবহারে, ফোকাসের বিরামহীন পরিবর্তনে তাঁর ছবিও অদ্ভুত গতিময় । স্মখদেবের তথ্য-চিত্র বা বিজ্ঞাপন-চিত্র একবার দেখলেই চেনা যেত । তাঁর ক্যামেরার সন্ধানী চোখ খুঁটিনাটি এমন অনেক কিছু আবিষ্কার করত যা সাধারণত সাদা চোখে ধরা পড়ে না । যে-ছবি করে তিনি প্রথম খ্যাতি অর্জন করেন, এক জেলবন্দীর, প্রাত্যহিক জীবন নিয়ে I Want to Live নামক আধ-ঘণ্টার সেই ছবিটিতে, গল্পাংশ বা বন্দীর স্বগত-সংলাপ যে কিছু অসাধারণ হয়েছিল তা নয় । কিন্তু ক্যামেরার হঠাৎ ধরে-ফেলা এক একটি মুহূর্ত—যেমন জেলখানার প্রাক্ষেপে পাখির আসা-যাওয়া—ছবিটিতে বিশেষ একটি মাত্রা যোগ করেছিল । India 1967 ছবিটিও যে অরগীষ হয়েছিল তাও ওই candid শটগুলির জন্ত ।

পল জিন্স-এর এককালীন সহকারী স্মখদেব হয়তো কোনোদিন ভারতের Jean Rouch হতে পারতেন । কিন্তু তাঁর একমাত্র কাহিনী-চিত্র My Love ব্যর্থ হয় । তিনি নিজেও আর কাহিনী-চিত্র করার চেষ্টা করেননি । তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর প্রতিভা মুহূর্তের সত্যগুলিকে ধরে রাখার মধ্যে, কোনো গভীর

দার্শনিক তাৎপর্য নিয়ে তাঁর কারবার নয়। বোধহয় সেই জন্মই বিজ্ঞাপন-চিত্র-  
গুলিতেই তাঁর সব নৈপুণ্য ঢেলে দিয়েছিলেন। বিজ্ঞাপন ছবি করার বিপদ  
থেকেও স্বথদেব মুক্ত ছিলেন না। চটপট বিক্রীর আশায় এমন ছবিও তিনি  
করেছেন যার জন্ম ভাবীকাল তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ নাও করতে পারে। কিন্তু  
ক্যামেরার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেই স্বথদেব হয়ে উঠতেন এক অসাধারণ দ্রষ্টা—যাঁর  
চাবিকাঠি লুকিয়ে থাকত লেন্স নামক জাদুদণ্ডে। ভারতীয় তথ্যচিত্রে তাঁর দক্ষতা,  
আন্তরিকতা ও ক্ষেত্র বিশেষে সাহসিকতার, বিশেষ স্থান রয়েছে যা ভোলার নয়।

অজ্ঞাত ছবি : আর্গো মাইলস টু গো, আফটার দি ইন্সপিঙ্গ, এ ভিলেজ  
মাইলস, বিহাইণ্ড দি রেড লাইন, থিলোনওয়াল্লা, নাইন মাস্‌স টু ফ্রীডম।

প্রামদিক গ্রন্থ : Jag Mohan-এর S. Sukhdev : Film-Maker ।

॥ সুবর্ণরেখা ॥

১৯৬২তে তৈরি কিন্তু ১৯৬৫তে মুক্তিপ্রাপ্ত, ভারত, প্রযোজকের কাহিনী ও নিজের  
চিত্রনাট্যে সুবর্ণরেখা ঋষিকের বিতর্কিত ছবিগুলির অত্যন্তম, ঋষিক passionate  
শিল্পী, এ সমাজকে তিনি ঘৃণা করেন, ভালোও বাসেন, সুবর্ণরেখার সারা শরীরে  
এই passion-এর ছাপ। পূর্ববাংলার কিছু বিপর্যস্ত উদ্বাস্ত সুবর্ণরেখার মূল চরিত্রে।  
কিন্তু শুধু পূর্ববাংলা কেন? এক অর্থে আমরা সকলেই উদ্বাস্ত—‘বায়ুভূত নিরালম্ব’।  
‘বাস্তহার’ শব্দটি ভৌগোলিক স্তরে সীমায়িত না থেকে বৃহত্তর অর্থে উন্নীত। তাই  
সবাই অন্ধকারে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়েছে—সীতা, অভিরাম, দৈবর, হরপ্রসাদ।  
এরা কোনো একক সত্তা নয়, প্রত্যেকেই ব্যক্তি সত্তার পরিমণ্ডলে সমষ্টি সত্তার  
প্রতিভূ। অজ্ঞাত ছবির মতো এ ছবিতেও তাঁর গভীর দার্শনিক ভাব archetypal  
ইমেজে পরিস্ফুট। আর এরোড্রোমে বহুরূপী কালীমূর্তি তো terrible mother-  
এরই ইমেজ। ঋষিকের নিজের ভাষায়, আমার কেমন মনে হয়, গোটা মানব  
সত্তা terrible mother-এর archetypal image-এর সামনে পড়ে গেছে;  
আজ সব সত্যতার জীবন মরণ সমস্তা ঐ confrontation-এর ওপরে। পথভ্রান্ত  
আমরা এক সংহারশক্তির সামনে। সুবর্ণরেখায় ছাতিমপুর স্টেশনে অভিরামের  
মায়ের মৃত্যু, দৈবরের আয়ত্বতার দুহুর্থে হরপ্রসাদের পুনরাগমন, দুর্ঘটনার  
অভিরামের মৃত্যু, মদ খেয়ে বেঙ্গা বাড়ি যাবার পথে বোনের বাড়ি গিয়ে ওঠা  
ইত্যাদি আরো অনেক coincidence রয়েছে। ঋষিক coincidenceটাকেই  
একটা পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করেছেন এই ছবিতে। এপিক সাহিত্যে যেমন

হয় তেমনটি। এ ছবির সংগীতও ছবির পরিবেশ ও চরিত্রগুলির সঙ্গে মিশে চূড়ান্ত অমোঘতাকে স্পষ্ট করেছে। ভূঁড়িখানার দৃশ্যে প্যাট্রিসিয়ার ব্যবহারও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, বিস্তীর্ণ পটভূমি জুড়ে ফটোগ্রাফি এ ছবির ধর্মকে সংহত করে এনে অপূর্ব রূপরেখার সৃষ্টি করেছে।

অভিনয়ে মাধবী মুখোপাধ্যায় (সীতা), সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, অন্নি ভট্টাচার্য, বিজয় ভট্টাচার্য; চিত্রগ্রহণ দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সংগীত বাহাদুর খান, সম্পাদনা রমেশ যোশী।

## ॥ সেনসরশিপ ॥

সেনসর বা স্বরদারি কথাটা এসেছে সেনসস বা জনগণনা কথা থেকে। চলচ্চিত্রের সেনসরশিপের আদি উদ্দেশ্য ছিল পুলিশকে চিত্রপ্রদর্শনীতে অগ্নিনিরোধের দায়িত্ব দেওয়া। কিন্তু অচিরেই পুলিশ নৈতিক গুচিতা রক্ষার দায়িত্বও গ্রহণ করে বসল। মানবিক প্রেমের গুরুত্ব রক্ষাই তখন সেনসরশিপের মূল লক্ষ্য হলো। যদিও সেই লক্ষ্যসাধনে সেনসরশিপ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। অনেকের মতে, ফিল্ম-এর ক্ষেত্রে কোনো সেনসরশিপ থাকাই উচিত নয়। কারণ, অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা জানি যে সেনসরশিপ-এ কোনো কাজই হয় না; আর একটু ভাবলেই আমরা বুঝতে পারি যে, সেনসরশিপ-কে বাঁচানোরও কোনো পথ নেই। অথচ চলচ্চিত্রের সেনসরশিপ তো আর ধারণামাত্র নয়। এটি সম্পূর্ণই এক বাস্তব ব্যাপার। চলচ্চিত্রের সেনসরশিপের রীতি প্রায় সারা পৃথিবী জুড়েই বলবৎ রয়েছে। সাম্প্রতিকাল পর্যন্ত কেবল বেলজিয়ম, ডেনমার্ক ও উরুগুয়েই দেখা গেছে ব্যতিক্রম। গণতান্ত্রিক বা স্বৈরতান্ত্রিক, যে শাসনব্যবস্থাই হোক না কেন, জনসাধারণের কাছে ছবি পৌঁছবার আগে কোনো না কোনো ভাবে তাকে নিষিদ্ধ করবার বা কাটা-ছেঁড়া করবার ব্যবস্থা আছে। সেনসরের বিধির চৌহদ্দির মধ্যে তাঁদের ছবিকে কিভাবে বাধবেন তা-ই স্থির করতে চলচ্চিত্রনির্মাতাদের ক্ষমতার অনেকটাই ব্যয়িত হয়। সেনসরশিপ কতটা ছায়সংগত বা কতটাই বা আইনসংগত, সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে। ছবির সেনসরশিপ হবে, এই ব্যাপারটাই অনেকের কাছে অত্যন্ত ঘৃণ্য এক বিধি। তাছাড়া এই বিধির প্রয়োগ যে কত খানখেয়ালি ও অর্থোক্তিক হতে পারে, সে-বিষয়ে ক্রমাগত অভিযোগ শোনা যায়। তবুও সেনসরশিপ রয়েছে। অনেক দেশেই এটিকে ভুলে দেওয়ার জোরদার দাবি উঠলেও সেনসরশিপ এখনো টিকে রয়েছে।

চলচ্চিত্র ব্যবসা, সরকার (যেখানে সরকার ও ব্যবসা অভিন্ন নয়) এবং জনসাধারণের মনোভাবের সমন্বয়ে নির্ধারিত হয় সেনসরশিপের সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক চরিত্র। ধরে নেওয়া হয়, সাধারণের মধ্য তথাকথিত 'নিয়ন্ত্রণের লোকেরাই' সিনেমাকে অবাধ রাখতে চান, এবং যারা ভিতরে ভিতরে নিজেদের 'উচ্চ শ্রেণীর মানুষ' বলে বিবেচনা করেন, অর্থাৎ বাবা-মা, শিক্ষাত্রী ও 'দাঙ্গি-দুশীল' নাগরিকেরা সিনেমাকে কঠোর নিয়ন্ত্রণের অধীনে রাখতে চান। এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যই প্রচণ্ড দক্ষিণপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা যায়; এঁদের বক্তব্য হলো, সিনেমা এতই গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার যে তাকে কতকগুলি অযোগ্য লোকের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না।

১৮৯৭ সালের মে মাসে প্যারিস-তে একটি চ্যারিটি মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সেখানে যে স্টল-টতে চলচ্চিত্র দেখানো হচ্ছিল, তার মধ্যে প্রোজেক্টরে আঙুন লেগে গেলে ভূমল আতঙ্ক ও গোলমালে ১৮০ জন প্রাণ হারায়। মেলাটির উদ্বোধনা ছিলেন প্যারিস-র অভিজাত সম্প্রদায় এবং ইয়োরোপের প্রায় সব বড়ো বড়ো পরিবারের লোকজন। এই অগ্নিকাণ্ডে এঁরা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হন। 'মৃতদের আত্মার শান্তি কামনার্থ নোংর দাম গির্জায় একটি ভাবগভীর অনুষ্ঠানে প্যের ওলিভার যে নীতিবাক্য উচ্চারণ করেন তাতে তিনি বলেন, এই দুর্ঘটনায় যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁরা যুক্তিবাদী ফরাসিদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন।' এই দুর্ঘটনা এবং পরে আরো কয়েকটি অগ্নিকাণ্ডের পরিণতিস্বরূপ চলচ্চিত্র প্রদর্শনকেই সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন করা হয়। যদি কোনো চিত্রপ্রদর্শন জনসাধারণের বিপদের কারণ হতে পারে এমন আশঙ্কা থাকে, তবে পুলিশ সেই প্রদর্শন বন্ধ করে দিতে পারে, এই মর্মে আইন পাস হলো। বস্তুত ১৯৫০ সাল পর্যন্ত চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত অধিকাংশ ফিল্ম-ই নাইটেট-এ তৈরি হতো। নাইটেট দাঙ্গ পদার্থ। পরবর্তীকালে অবশ্য ট্রাই অ্যাসিটেট ও অ্যাসিটেট প্রোপিওনেটের সাহায্যে তথাকথিত নিরাপদ ফিল্ম-এর উদ্ভাবন হয়েছে। আজকের স্বচ্ছ ফিল্মস্ট্রিপ-এ কোনো বিপদাশঙ্কা নেই। কিন্তু সেই পুরনো ভয় এখনো কাটেনি। চলচ্চিত্র নানা দিক থেকেই ভয়ংকর বস্তু, তাই তার উপর প্রতিনিয়ত খবরদারি রাখা সরকার। চলচ্চিত্রের উপর এই খবরদারির রীতির নাম সেনসরশিপ।

ভারতে একটি সরকারি সংগঠন সনাসরি ছবি সেনসর করে। ইংলণ্ডে একটি আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান এই দায়িত্ব পালন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সিনেমা-শিল্পের

সঙ্গে যুক্ত একটি সংগঠন ছবি সেনসর করে। সোভিয়েত রাশিয়ায় সেনসরশিপ হতো সরকারি নিয়ন্ত্রণে।

ইংলণ্ড—১৯০৯ সনে রূপপ্রাপ্ত দি সিনেমাটোগ্রাফ অ্যাক্ট সেনসরশিপের পরিকাঠামো তৈরি করে দেয় ও ১৯১২ সনে ব্রিটিশ বোর্ড অব ফিল্ম সেনসরস গঠিত হয়। H (হরর ফিল্ম), U (সার্বজনীন) ও A (প্রাপ্তবয়স্ক)—এই তিনভাবে ছবিকে চিহ্নিত করা হতো। পরবর্তীকালে তা দাঁড়ালো AA (১৪ বছরের নিচে নয়), A (নিষিদ্ধ নয় কিন্তু আপত্তিকর) ও X (প্রাপ্তবয়স্ক)—এই তিন প্রকার চিহ্নে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র—১৯২২ সনে সেনসরশিপের জন্ম একটি আত্মনিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা স্থাপিত হয়। পরে প্রোডাকশন কোড অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করা হয়। কোনো কোনো অঞ্চলে স্থানীয় সেনসরশিপেরও ব্যবস্থা ছিল।

সোভিয়েত রাশিয়া—অজ্ঞাত সমাজতান্ত্রিক দেশের মতো এখানেও ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রি ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত্ব। ছিল সেনসরশিপের নিজস্ব রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি। সোভিয়েত রাশিয়ায় ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রির জাতীয়করণ ঘটে ১৯১৯ সনে ও ১৯২২ সনের একটি বিধির দ্বারা সেনসরশিপের ক্ষমতা দেওয়া হয় বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রের কমিশারিয়াট অব এডুকেশনের উপর। এদেশে সবসময়েই কিছু কিছু ছবিকে বিদেশে প্রদর্শনের জন্ম অস্বীকার দেওয়া হতো কিন্তু দেশের ভিতর প্রদর্শনের ছাড়পত্র দেওয়া হতো না।

কোনু কোনু শর্ত সাপেক্ষে ছবি অস্বীকারিত হবে তার একটি বিধি সর্বত্র রচিত হয়; এবং সেই বিধি অস্বীকারে ছবি বিচার করা হয়। সেনসরশিপ-এর পদ্ধতি সর্বত্রই এক, কেবলমাত্র তার আইনগত চরিত্রেই যা-কিছু ভিন্নতা। কিন্তু আসলে একই মানসিকতা সব রকমের নীতিবোধতাড়িত সেনসরশিপ-এর উৎস।

চলচ্চিত্রের সেনসরশিপ ব্যাপারে যে বিষয়টি সবচেয়ে লক্ষণীয় তা হলো ব্যাপ্তি, এবং দ্বিতীয়ত, সেনসরশিপ-এর অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ। অধিকাংশ মানুষই যেন ছবিকে বাধা দেবার একটা ভাগিদ অনুভব করেন। কোনো সেনসর সংস্থা তার ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করলে বহু স্বনিযুক্ত সেনসর বোর্ড সঙ্গে সঙ্গেই সেই শূন্য স্থান পূরণ করতে এগিয়ে আসবে। 'জনি মেরা নাম' ছবিটি দেখে পঁচিশ বছর বয়সী এক নিরক্ষর ব্যক্তি বলেন যে, এই ছবিতে একটি 'খারাপ' নাচের দৃশ্য আছে। তিনি বলেন, তিনি নিজে নাচটি উপভোগ করেছেন, কিন্তু তিনি তাঁর স্ত্রীকে নাচটি দেখতে দেবেন না, কারণ নাচটি দেখলে তাঁর স্ত্রী 'খারাপ' হয়ে যেতে পারেন। দায়িত্ববোধ নামে বর্ণিত এই ধরনের মনোবৃত্তি ভয়াবহ ভাবে ব্যাপক। এই

মনোবৃত্তি সাধারণত এই ধরনের এক একটি উক্তির মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে : ‘সেনসরশিপ থাকা উচিত নয়, কিন্তু...’ কিংবা কেউ কেউ আবার বলেন সেনসরশিপ-এর দাবিধ্বংস থাকা উচিত সুশিক্ষিত, উদার মনোভাব সম্পন্ন, জ্ঞানীভূগীদের উপর। তাঁরা ছবি থেকে যাবতীয় অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ দৃশ্য এবং অপ্রয়োজনীয় যৌনতা পরিহার করতে সচেষ্ট হবেন। যারা এরকম কথা বলেন তাঁরা অবশ্যই চান যে এই আদর্শ সেনসর-রা তাঁদেরই মতামত ও রুচির ধারক-বাহক হবেন।

‘কোনো সেনসরশিপ থাকা উচিত নয়...কিন্তু’ এই যুক্তিটি উদ্ধৃত করে আমরা এই কথাই বলতে চেয়েছি যে চলচ্চিত্র সেনসরশিপ-এর বিরোধিতায় কোনো কিন্তু-এর অবকাশ নেই। হয় সেনসরশিপ থাকবে, নয় থাকবে না। যদি সেনসরশিপ বহাল রাখতেই চান তবে আপনাকে মেনে নিতে হবে, আদর্শ সেনসরশিপ বলে কিছু হতেই পারে না। অথচ সেনসরশিপ রয়েছে। আমরা এখানে কেবল সমাজে তার ভূমিকাটুকুই পরীক্ষা করে দেখতে পারি।

সব ফিল্মের ওপরেই ‘সেনসরশিপ’ প্রযোজ্য; এবং সেই উদ্দেশ্যে ফিল্মকে প্রধান তিনভাগে ভাগ করা যায় : আর্ট ফিল্ম, বিনোদনের ফিল্ম এবং প্রচার বা প্রপাগ্যান্ডা ফিল্ম। আমাদের আবেগের সঙ্গে সম্পর্কের ওপরেই এই শ্রেণী-বিভাগ দাঁড়িয়ে আছে। আর্ট ফিল্ম-এর বিষয় কেবলমাত্র আবেগের অভিব্যক্তি। বিনোদন ফিল্ম আবেগকে খানিকটা স্ফুর্স্ফুড় দেয় এবং পরোক্ষ ভূষি দান করে। প্রচারচিত্রও দর্শকদের আবেগ জাগিয়ে তোলে, কিন্তু তারপর তাকে বিশেষ কোনো চিন্তা বা কাজের দিকে চালিত করার চেষ্টা করে। সুতরাং এই তিন ধরনের ছবির প্রতি ‘ভালো’ বিশেষণটি প্রয়োগ করতে গেলে আমরা দেখব তার যুক্তি তিন ক্ষেত্রেই পৃথক। ভালো আর্ট ফিল্ম বিশেষ এক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে, একজন শিল্পীর আবেগের স্বার্থ অভিব্যক্তি; ভালো বিনোদন চিত্র, এককথায়, বিনোদনে সক্ষম। (কিন্তু যা একের কাছে বিনোদন, তা অপরের কাছে বিরক্তিকর হতে পারে), এবং ভালো প্রচারচিত্র দর্শকদের কোনো-না-কোনো উদ্দেশ্যে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে সাহায্য করে।

সেনসরশিপ-এর উদ্দেশ্য উন্নততর ছবি তৈরি করা নয়, কারণ সমালোচকদের মতোই, হাতেনাতে ছবি তৈরি করার কোনো দায় সেনসর-দের নেই। এটি একটি উপায় মাত্র, যার মাধ্যমে চলচ্চিত্র-বিনোদনে দর্শকদের অংশগ্রহণের চরিত্রটি কেমন হবে একটি বিশেষ সমাজ বা শিল্প তা নির্ধারণ করে। জনসাধারণ স্থির করতে পারে যে আর্ট ফিল্মে ও প্রচার ফিল্মে বিধিনিষেধ প্রয়োগ করা অবাঞ্ছনীয়। কারণ

সেনসরশিপ প্রথমটিকে নষ্ট করবে, এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ থাকতে পারবে না। কিন্তু বাস্তবে, যেমন ভারতবর্ষে, সমাজ এই সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে শিল্পের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন সব কারণে এবং অধিকতর মঙ্গলের জন্তে, আর্ট ও প্রচার ফিল্ম (অথবা শিক্ষামূলক ছবি) নিয়ন্ত্রিত হওয়া চাই, বা তাকে কাটাছাঁটা করা চাই বা এমনকি সময় বিশেষে সেটিকে নিবন্ধ করারও প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন কর্তৃপক্ষ, এবং ধরে নেওয়া হচ্ছে যে তাঁদের সিদ্ধান্তের পিছনে যুক্তি থাকবে।

অতএব সেনসর-এর মাধ্যমে, জনসাধারণ স্থির করে যে বিনোদন চিত্রে আবেগকে একটা বিশেষ মাত্রার বেশি উত্তেজিত করা উচিত নয়, কিন্তু সেই মাত্রাটি কী তা অবশ্য পরিষ্কারভাবে নির্ধারণ করা দুর্ভর, যেমন ধরুন, জনতা ত্রাসের ছবি দেখতে চায়, কিন্তু বেশি ত্রাসের নয়; তারা ক্রাইম বা অপরাধ-বিষয়ক ছবি দেখতে চায়, কিন্তু সে ছবিতে যেন খুব বেশি রক্তারক্তি না থাকে; তারা হিংসাত্মক ছবি দেখতে পছন্দ করে, কিন্তু ছবিতে যেন মারদাঙ্গা বেশি না থাকে; তারা যুদ্ধের ছবি চায় কিন্তু তাতে যেন বেশি বর্বরতা না থাকে; তারা যৌন উত্তেজনার ছবি দেখতে ভালোবাসে; কিন্তু...এখানে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে যেতে হয়; কারণ এখানে মাত্রা নির্ধারণ করা কঠিন।

ভারতবর্ষে অনেক দর্শককে বলতে শোনা গেছে, 'আমরা সেন্স ফিল্ম চাই কিন্তু তাতে যেন চুষনের দৃশ্য না থাকে।' যখন লোকে বলে যে তারা ফিল্ম-এ চুষনের দৃশ্য দেখতে চায় না, তখন এর তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে তারা খানিকটা উত্তেজনা চায় বটে, কিন্তু 'ট্যাবু' বা সামাজিক অনুশাসন ভাঙতে তারা রাজি নয়। তাছাড়া, এটাও হতে পারে যে আবেগের মাত্রাধিক্য তারা চায় না। কিন্তু সমস্যাটা এই যে যৌন উত্তেজনা কেবল চরিত্রগুলির বিশেষ কোনো অভিনয়দৃশ্যের ওপরে নির্ভর করে না, বিশেষত শরীরের ভ্রূণপ্রত্যঙ্গগুলি ক'ই ফি দেখানো হলো তার ওপরে তো নয়ই। তাই চুষনকে একটি নির্দিষ্ট মাত্রা বলে ধরলেও সেনসরশিপের কাজে এর প্রয়োগ সত্যিই খুব একটা কার্যকরী নয়।

গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সেনসরশিপের সামাজিক কাজ হলো, ফিল্ম-ইনডানট্রি বা চলচ্চিত্র-শিল্পকে এমন একটি গণ্ডির ভিতর আবদ্ধ রাখা যে গণ্ডির মধ্যে একটি বিশেষ শ্রেণীর দর্শকেরা একটি বিশেষ সময়ে নিজের আবেগকে উদ্দীপ্ত করে আনন্দ পায়, এবং আগেই বলা হয়েছে যে উক্ত তিনশ্রেণীর ছবির ক্ষেত্রে আরো নানা কারণে বিধিনিষেধ প্রয়োগ করা হয়; সরকারি মতে সেগুলি 'যুক্তিসঙ্গত'।

সাধারণ অর্থে ফিল্ম হচ্ছে অভিব্যক্তির মাধ্যম এবং সেই কারণে ভারতীয় সংবিধানে একে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও ১৯ ধারার ২নং শব্দে এই অভিব্যক্তির স্বাধীনতাকে কিছু কিছু যুক্তিগ্রাহ্য আইনকানুনে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। এই সাংবিধানিক নিয়মাবলীর ওপরেই ভিত্তি করে রচিত হয়েছে ১৯৫২ সালের 'সিনেমাটোগ্রাফ অ্যাক্ট'। অংশটি এই রকম : 'জনসমক্ষে প্রদর্শনের জন্তে একটি ফিল্মকে নিষিদ্ধ করা হবে, যদি সার্টিফিকেট দানের অধিকারপ্রাপ্ত যোগ্য ব্যক্তির এমন মনে করেন যে ঐ ফিল্ম বা তার অংশবিশেষের দ্বারা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হতে পারে, বন্ধুরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে, নাগরিকদের শান্তি, শালীনতাবোধ ও নৈতিক রুচি ব্যাহত হতে পারে, অথবা আদালত অবমাননা করা হবে, বা অপরাধকর্মের আচরণে দর্শককে উদ্বুদ্ধ করা হবে।'

তাহলেই দেখা যাচ্ছে ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির ওপরে সেনসরশিপ নির্ভর করে। এবং 'যে আইনবলে সেনসরশিপের ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে তা সংবিধানের ক্ষেত্রে অনধিকার চর্চা বা 'আলট্রা ভিরেস' বলে গণ্য হবে না, যদি তা যুক্তি-সম্মত বলে গণ্য হয়।' কিন্তু যে আইন ব্যক্তিগত ভূমির ওপরে দাঁড়িয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়—তাকে সহজেই আদালতে বিচারার্থে টেনে আনা সম্ভব। কিন্তু এটি সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ। সম্প্রতিকালে, আমেরিকায়, যে কটি এই ধরনের মামলা হয়েছে সেগুলিতে আদালত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিচালকের পক্ষে এবং সেনসরের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে। নৈতিক ব্যাপারে অভিব্যক্তি-প্রকাশের স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখলে হয়ত ভবিষ্যতে নৈতিক সেনসরশিপের কোনো প্রয়োজন থাকবে না। যে প্রসঙ্গে অটো সেনসরশিপের কথাও আসে।

ফিল্ম-সেনসরশিপ কোনো সময়েই একটি স্বতন্ত্র ঘটনা নয়। বি. আর. আগরওয়ালার মতে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আমলে কড়া সেনসরশিপের প্রবর্তন হয়েছিল। পূর্ববর্তী শাসকরা নৈতিকতা প্রসঙ্গে সহজ দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করেছিলেন। ব্রিটিশ শাসনকর্তারা শিল্পের ক্ষেত্রে যে বিধিনিষেধের প্রবর্তনা করেছিলেন তার লক্ষ্য ছিল নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও নৈতিক মর্যাদা রক্ষা করা।

একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির কারণ হলো অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্তে নিয়ন্ত্রণবিধি তৈরি করা। বয়স্কদের সমস্ত অধিকার ছোটোদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, এবং তাদেরও যে স্বতন্ত্র অধিকার আছে সে কথাকে অস্বীকার করা যায় না। কাগজে কলমে অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্তে কিছু কিছু ছবির প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা কঠিন নয়; কিন্তু এর ফলে নানান বাস্তব সমস্যা দেখা দিয়েছে। অপরদিকে পর্দার সামনে বসলে কে

যে অপ্রাপ্তবয়স্ক তা নির্ধারণ করাও সহজ নয় । ভারতবর্ষে সমস্তাটির অধিকতর গুরুত্ব-পূর্ণ দিক হলো, শিক্ষিত লোকেরা নিরক্ষর লোকদের ছোটো বলে মনে করে । অশিক্ষিত লোকেরা হয়ত অধিকতর সরল, কিন্তু অনেক শহুরে শিক্ষিত লোকের তুলনায় আবেগের দিক থেকে তারা অনেকেই বেশি পরিপক্ব এবং সাধারণ বুদ্ধির অধিকারী । ভারতীয় গ্রামবাসীরা শিশুদের সঙ্গে তুলনীয় এই ধারণা ব্যাপক, এবং ভারতীয় দেনসরশিপ অক্ষুণ্ণ রাখার সপক্ষে একটি প্রভাবশালী যুক্তি ।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : N. M. Hunnings-এর Film Censors and the Law ।

গান্ধী রোবের্জ

॥ ম্যাক সেনেট ॥

( ১৮৮৪-১৯৬০, কানাডায় জন্ম, আমেরিকার নাগরিক ) । আঁসল নাম মিশেল সিনোট । সিনেমা জগতে স্ন্যাপটিক কমেডিকে এক অল্পম ধরানার প্রতিষ্ঠা দেন ম্যাক সেনেট । উৎসটির সন্ধান পাওয়া যাবে Commedia dell' Arte, Vaudeville, প্যাটোমাইম এবং মার্কাস-এ । শুরুতম ভাবের কমেডি ছবির কথা বলতে গিয়ে আমরা কখনই সিনুয়েশন, চরিত্র বা সংলাপকে ধিরে কমেডির উদ্ভাবনকে বোঝাই না । বরঞ্চ কমেডি ছবির অন্তর্ভুক্ত হলো দৃশ্যগত চমক এবং অনাবিল গতিময় আনন্দ যা কিনা পর্দাতেই দেখানো সম্ভব । একটা সত্যিকারের কমেডি ছবির অস্তিত্ব অবিবাস্যব জগতেই সম্ভব যেখানে সরল যুক্তিবোধকেও বিসর্জন দেওয়া হয়েছে । এই ধরনের ছবিতে ক্যামেরার জাহ্নকরী কায়দা-কাছন এবং সম্পাদনার কলা-কৌশলের স্বযোগ নেওয়া হয় । আর এর ফলে এক অলীক, ভ্রান্তিময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় । চোখ মেলে পর্দায় আমরা যা দেখি এবং বাস্তব জগৎ বলতে আমরা যা জেনে এসেছি—এই দুয়ের দ্বন্দ্বই প্রকৃত মজার উৎস । তা ব্যক্তিগত ও সামাজিক রীতি-নীতিগুলিকে উন্টো করে বসিয়ে দেয় এবং এগুলিকে পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবার দাবী জানায় । কমেডি ছবির শিল্পরূপে এটাই হলো সেনেটের অনন্ত অবদান । Biograph কোম্পানীতে গ্রিফিথের অধীনে সেনেট অভিনেতা, লেখক এবং পরে পরিচালক হিসাবে কাজ করেন । সেনেটের অনিয়ন্ত্রিত চিন্তাভাবনার সঙ্গে গ্রিফিথ কখনোই একমত হতে পারেননি । যখনই স্বযোগ এল সেনেট নিজের নতুন কোম্পানী গঠন করলেন । এটা ছিল ১৯১২ সাল এবং তাঁর কোম্পানীর নাম হলো Keystone । ১৯৪০ সালে এক আলোচনায় Iris Barry

সেনেটের ছবিগুলি সম্বন্ধে লিখেছিলেন—‘এক নিয়মাহুগ পাগলামি, এক উন্নত মানের সিনেমা প্রকরণ যেখানে দৃশ্যগত ছন্দ এবং গতির ওপর এক সহজাত পটুত্ব স্বাভাবিকভাবেই উপস্থিত।’ [ ১৯০৭ সাল থেকে শুরু হওয়া সেনেটের কমেডি ছবি হলো তাৎক্ষণিক সিচুয়েশন, স্বতঃস্ফূর্ত মেজাজ ও দ্রুত গতির। সামাজিক প্লেব থেকে অসম্ভব মুহূর্ত পর্যন্ত বিস্তৃত এই বিশাল জগতের নাম দেওয়া হয়েছিল ক্রেজি কমেডি। ] মানুষ গুরুত্ব দেয় এরকম প্রতিটি বিষয়কেই সেনেটের ছবিতে বিদ্রূপ করা হয়েছে। বিদ্রূপ করা হয়েছে আবেগ আকাঙ্ক্ষা, মাতৃস্নেহ, ব্যবসায়িক সফলতা আর ফোর্ড গাড়ীকে। এমনকি চলচ্চিত্রও এই তালিকা থেকে বাদ যায়নি। সেনেটের ছবিগুলি প্রায় ক্ষেত্রেই কোনো প্রাক প্ৰস্তুতি ছাড়াই নির্মিত হয়েছে। সেনেটের পরিকল্পিত অধিবাস্তব জগতে সময়ও থেমে যায়, কখনো এর গতিপথ যায় পেছন দিকে যুরে, কখনো এর বেগ বেড়ে যায়। ১৯১৬ সালের মধ্যেই এই ধরনের বিবিধ কারিকুরি সেনেটের ছবির স্ননির্দিষ্ট অঙ্গ হয়ে ওঠে। ১৯১৭ সালের জুন মাসে সেনেট Triangle ছেড়ে দেন এবং Paramount-এর হয়ে ছবি রিলের কমেডি ছবি তৈরি শুরু করেন। এই সময়েই Ben Turpin তাঁর ছবিতে কাজ করা আরম্ভ করেছেন। Turpin-এর আমূদে, ‘অ্যাজ ইউ লাইক’ ইমেজে সেনেট স্টাটায়ারের প্রলেপ লাগালেন এবং তাঁকে প্রধান চরিত্রাভিনেতা করে তখনকার উল্লেখযোগ্য ছবি ও অভিনেতাদের (Valentino, গিলবার্ট, ফুহাইম) প্যারডি করে প্রহসনচিত্র নির্মাণ করলেন। প্রকৃতপক্ষে আমেরিকার জনজীবনে যা কিছু শঙ্কার ও মূল্যবান তার সবই ম্যাক সেনেটের ছবিতে কমেডিরূপ পেয়েছিল। তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন Arbuckle ও বাসটার কীটনও। সেনেটের একটি আত্ম-জীবনী মূলক গ্রন্থ আছে—কিং অব কমেডি।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : K. C. Lahue-র Mack Sennett's Keystone : the Man, the Myth and the Comedies।

আইলিন বাউজার

॥ সেভেন সামুরাই ॥

১৯৫৪, জাপান। জাপানে ষোড়শ শতকের সম্পন্ন গ্রামবাসীরা ভাকাতদের আক্রমণের হাত থেকে নিজেদের ধনসম্পত্তি রক্ষার জন্য রক্ষীবংশের সামুরাইদের অর্থে বিনিময়ে নিয়োগ করত। এই রকম সাতজন সামুরাইকে নিয়ে সেভেন সামুরাই। তাদের বীরত্ব, সততা ও অস্বাভাবিক মানবিক গুণাবলীকে একদিকে

মনস্তাত্ত্বিক বাথার্থ দিয়ে (মানুষের দুর্বলতার মধ্যেই যেখানে মানবিক গুণের সন্ধান মেলে) ও অত্মদিকে নিপুণ ঐতিহ্যবোধ ও নিখুঁত ইতিহাস-চেতনায় ঐতিহাসিক পটভূমিতে স্থাপন করে কুরোশাওয়া মধ্যযুগের এই অ্যাডভেঞ্চারকে এক অদ্ভুত সংহত ও অনবগত রূপ দেন। হিংস্রতার তীক্ষ্ণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ, ইমেজারির সূক্ষ্মি, মনোবোণ আকর্ষণকারী উত্তেজক দৃশ্যরূপ, সরল কিন্তু শক্তিশালী স্টারোটভ, দ্রুত-গতি, প্রাণবন্ত ও বলিষ্ঠ ক্যামেরা স্টাইল, এবং তীক্ষ্ণ ও ছন্দময় সম্পাদনা (ছবিতে একটা লোক তীরবিদ্ধ হয় ঠিক বারোটি ফ্রেমে, যার জন্ম সময় লাগে মাত্র আধ সেকেন্ড) ২০০ মিনিটের এই ছবিতে দর্শককে স্তব্ধ করে ধরে রাখে। এই ছবির কাহিনী নিয়ে পরে ইংরেজিতে দি ম্যাগনিফিসেন্ট সেভেন নির্মিত হয়। তাতে মেকসিকোর একটা গ্রামের অধিবাসীরা সম্পত্তি রক্ষার জন্ম সাতজন আমেরিকান বন্দুকবাজকে ভাড়া করে। আকশনের উত্তেজক দৃশ্য ছাড়া সেই ছবির বাকিটা বাগাড়ম্বর আর ভগিতা। সেভেন সাগুরাইয়ে পরিচালকের নিজস্ব শিল্পপ্রতিভার যে মুগ্ধকর প্রকাশ ও নিজস্ব দর্শনের যে প্রত্যয়ী রূপ তার কোনো ছাপ ওই রিমেকে নেই।

অভিনয়ে T. Shimura, তোশিরো মিমুনো, কে কোদো; চিত্রগ্রহণ এ. নাকাই, সংগীত F. Hayasaka, সম্পাদনা কুরোশাওয়া।

॥ দি সেভেন্থ সীল ॥

১৯৫৬, সুইডেন। এর আগে বার্গম্যান ১৬টি ছবি করেছেন। দি সেভেন্থ সীল চলচ্চিত্র ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য ছবি। 'দি সেভেন্থ সীল' তৈরি হয়েছে বার্গম্যানের 'Painting on Wood' নামে একটি একাঙ্ক নাটক থেকে। অনেক সমালোচকই একে বার্গম্যানের প্রধান নাট্যকর্ম বলে মনে করেন। আর এই নাট্য থেকে ইতিহাস দর্শন ও কাব্য একদিকে রূপান্তরিত হয়েছে চলচ্চিত্র ভাষায়।

তুমি কে ?

আমি মৃত্যু।

তুমি কি আমার জন্তে এসেছো ?

আমি অনেক কাল ধরে তোমার পাশে পাশে হাঁটছি।

আমি জানি।

তুমি কি তৈরি ?

আমার এই শরীরটা তব্ব পাচ্ছে, আমি পাচ্ছি না।

ঠিক আছে, এতে লজ্জার কিছু নেই।

এক মিনিট দাঁড়াও।

সবাই এটা বলে। আমি কিন্তু দণ্ড দিতে বিলম্ব করি না।

তুমি দাবা খেল, তাই না?

‘সেভেথ সীল’ করে দুটো জিনিশের হাত থেকে আমি ছাড়া পেয়েছি। মৃত্যুর ভয়, এখন আর আমি এই ভয়টা পাই না, আর ঈশ্বর সম্পর্কিত আমার ধ্যান। ধর্ম নিয়ে বড়ো বেশি আচ্ছন্ন ছিলাম। এখন মনে হয়, বস্তুবাদী হও, সব কিছু স্বচ্ছভাবে চাখো।’ বার্গম্যান বলছেন, ‘অবশ্য, ধর্ম—এখন আবার ওটা আমায় ঘিরে ধরেছে।’

[ এই বিশ্বাস ও বস্তুবাদ, জীবন আর মৃত্যু, শিল্প ও ধর্ম—এই তিনের দ্বন্দ্ব আর জীবন ও শিল্প ও ধর্মের স্থান বিনিময় বার্গম্যানের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। ‘দি সেভেথ সীল’ ও সাধারণভাবে বার্গম্যানের যে-কোনো ছবিই এক ধরনের catholic response to Eisenstein’s dialectical montage. ]

ধারা ‘সেভেথ সীল’-এ খুঁজে পান চরম নৈরাশ্য, ভুল করেন তাঁরা। বার্গম্যানের কথার মধ্যেই রয়েছে এ ছবির মূল কথা : ‘বয়ে চলেছে জীবনের ধারা। আমি বিশ্বাস করি জীবন প্রবাহে, এই জীবনে, মৃত্যুর পরে এক জীবনে, সব রকমের জীবনে……মৃত্যু তো জীবনেরই একটা অঙ্গ।’

অভিনয়ে মাক্স ভন সিডো, Bjornstrand, বিবি অ্যানডারসন ; চিত্রগ্রহণ গুনার ফিশার, সম্পাদনা L. Walien, সংগীত ই. নর্ডগ্রীন, শিল্প নির্দেশনা পি. লুগুগ্রীন। কানে বিশেষ পুরস্কার, ১৯৫৭ ॥

প্রায়শুর

॥ উসমান সেম্বেন ॥

মোটামুটি ভাবে বলা হয় আফ্রিকাতে ফরাসি কলোনি-নীতি (Assimilation) এবং ইংরেজ কলোনি-নীতির (Indirect Rule) প্রধান পার্থক্য ছিল এই যে ফরাসিরা কৃষাদেদের সম্পূর্ণভাবেই ইউরোপিয় করে তুলতে চেয়েছিলেন (ফ্রান্স ফানোর ব্ল্যাক-ইউরোপিয়ান অভিধাটি অরণীয়) কিন্তু ইংরেজরা আফ্রিকীয় সামাজিক ও প্রশাসনিক কাঠামো অটুট রেখেই ধীরে ধীরে তাদের স্বয়ংনির্ভর করতে প্রয়াসী হয়। কথাটার মধ্যে একটা বিরাট বৃজ্জকি আছে ইংরেজদের ক্ষেত্রে। লর্ড লুগার্ড, যিনি ইনডাইরেক্ট রুল নীতির বাইবেল প্রণেতা (Dual

**Mandate in British Africa)** আসলে এই ব্যবস্থাকে কাজে লাগান আঞ্চলিক শাসনের ক্ষেত্রে পয়সা ও পরিশ্রম বাঁচাবার জন্ত, উত্তর নাইজেরিয়ার ইসলামি সংস্কৃতির প্রতি প্রেমবশত নয়। তা ছাড়া ফরাসিরা যে আফ্রিকানদের 'সাহেব বানাবার তালে আফ্রিকীয় সংস্কৃতিকে সমূলে উচ্ছেদ করেছিল'—সেটাও সত্য নয়। তবু এ কথা মোটামুটি বলা যায় যে ফরাসি কলোনিগুলির উচ্চশিক্ষিত আফ্রিকানরা (evolué) পশ্চিমী সভ্যতার জগতে অনেক ভেতরে প্রবেশ করতে পায়, ব্রিটিশ প্রজাদের পক্ষে সেটা (কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া—যথা দক্ষিণ নাইজেরিয়া) ততটা সম্ভব হয়নি। উত্তর আফ্রিকার দেশগুলি (মরক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিস) বাদ দিলে এ ব্যাপারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দেশ সেনেগাল। আন্তর্জাতিক স্বাতিসম্পন্ন চিত্রপরিচালক উস্মান সেম্বেন সেই দেশের নাগরিক।

সেনেগাল আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিম উপকূলের একটি ক্ষুদ্রায়তন দেশ, উত্তর আফ্রিকা থেকে মরুভূমি অতিক্রম করে আগত ইসলামি সংস্কৃতির (আংশিক ভাবে) সূপ্রাচীন পটভূমি; দাস ব্যবসার স্বত্রে ষোড়শ শতাব্দী থেকে ইউরোপিয় সংসর্গে আগত, গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ফরাসি সাম্রাজ্যের অন্তর্গত, ১৯৬০ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্ত। রাজধানী ডাকার (Dakar) কলোনি আসলে ফরাসি-পশ্চিম আফ্রিকার প্রশাসনিক কেন্দ্রস্থল, এবং আধুনিকতার প্রসারের কেন্দ্রবিন্দু (ভৌগোলিক অর্থে নয়)। এ শহর যেন পারীর আফ্রিকান সংস্করণ, চেহারায় ও চরিত্রে। সেন্গোর (Senghor)-এর কাব্যের শেকড় পারীতে ও ডাকার-এ। সেম্বেনের কর্মক্ষেত্রে এঁর নতুন পুরোনোতে মেশা ডাকার নগর। চলচ্চিত্র উৎসব অচুপিত হয় এখানে, অনিয়মিত ভাবে।

উস্মান সেম্বেনের জন্ম ১৯২৩ সালে। বিচিত্র অভিজ্ঞতায় তাঁর জীবন ও মনন সমৃদ্ধ। মৎসজীবী, মেকানিক ও রাজমিস্ত্রী হয়ে তিনি নিচুতলার জীবনকে একেবারে ভেতর থেকে দেখেছেন ও বুঝেছেন। দশ বছর ধরে ফ্রান্সের মার্সায়ি বন্দরে ডক শ্রমিক হয়ে কাজ করাত্তে তিনি ধনতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির ভেতরকার চেহারা দেখতে পান। পরে মস্কোতে তিনি কিছুকাল চলচ্চিত্রের কারিগরি দিকটা আয়ত্ত করেন প্রধানত ডনস্কয়ের (Donskoi) সঙ্গে কাজ করে।

চলচ্চিত্র সৃষ্টির বিবিধ ক্ষেত্রে সেম্বেন 'প্রবর্তক' হিসাবে চিহ্নিত হতে পারেন। সাহারা-নিম্ন অঞ্চলের (প্রাগৈতিহাসিক যুগে সাহারা অঞ্চল উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে বিভাজক ছিল না, মরুভূমি ছিল না তখন এই অঞ্চল। কালক্রমে প্রাকৃতিক ও কিছুটা মানুষী-ধ্বংসের কারণে শুষ্ক মরু এই দুই আফ্রিকার দেশগুলিকে এতটাই

দূরদর্শকীয় করে তোলে যে আফ্রিকা বলতে সাধারণত (ভৌগোলিক অর্থে ছাড়া) সাহারা-নিম্ন আফ্রিকাই বোঝায়।) আফ্রিকাতে প্রস্তুত প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি 'লা নোয়ার দু...' অর্থাৎ 'কালো মেয়ে' সেম্বেনের সৃষ্টি। কৃষ্ণবর্ণ আফ্রিকার প্রথম রঙিন ছবি 'মান্ডাবি' (মনি অর্ডার)-ও সেম্বেনের সৃষ্টি।

বলা বাহুল্য সনাতন ও আধুনিক মূল্যবোধের দ্বন্দ্বকে ঘিরে আফ্রিকানদের মনন ও অহুত্ব তাদের শিল্পভাবনা ও শিল্পকর্মতে অনেকটা জায়গা জুড়ে প্রতিফলিত হয়েছে। নাইজেরিয়ার ঔপন্যাসিক চিনুয়া আচেবে ও সিপ্রিয়ান একোয়েসির রচনাবলীতে আফ্রিকান সাহিত্যের ফসলকে দেখি। এই সংঘর্ষের ক্ষেত্র স্বভাবতই আফ্রিকান নগর, ফলত গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে আগমন এইসব উপন্যাসের আধার—যথা একোয়েসির 'পিপল অফ দ্য সিটি' এবং চিনুয়া আচেবের 'থিংস ফল এপার্ট' এবং 'নো লদার এ্যাট ইজ'। 'কালো মেয়ে' ছবিতে সেম্বেন তাঁর নায়িকাকে ফ্রান্সের নিস্ (Nice) শহরে নিয়ে গিয়ে তার মূলচ্ছেদকে আরো মর্যাদিত করেছেন। সম্পূর্ণ অনানুষ্ঠানিক স্বৈতিকায় সমাজের অমানবিক অবস্থা তাকে চরম নিঃসঙ্গতায় টেনে নেয় এবং একমাত্র আত্মহত্যাতেই সে মুক্তির পথ খুঁজে পায়।

সাদা কালোতে তৈরি ছবির সাদা কালোর দ্বন্দ্বের সরলীকরণেই সেম্বেন আবদ্ধ থাকতে পারেন না—আফ্রিকার বহু মাঝারি লেখক যে স্তরে স্থান হয়। তাঁর সমাজগচেতনতা তাঁকে সমাজের অন্ত্যন্ত সত্যকে বিধ্বস্ত করবার প্রেরণা দেয়। সেনেগালিসদের নিজেদের মধ্যেই শ্রেণীভেদ, পাশ্চাত্য শিক্ষার দান এতোলুয়েদের নিরক্ষর সাধারণ মানুষকে প্রভারণা—এইসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাঁকে ভাবায়, বর্ণ বিভেদ-আশ্রয়ী জাতীয়তাবোধই শুধু তাঁকে ধরে থাকে না। স্বল্প দৈর্ঘ্যের 'বোরোম্ সারেট' (Borom Sarret) ছবিতেই আধুনিক সেনেগালি সমাজে কীভাবে নিরক্ষর দরিদ্র সাধাসিধে মানুষকে ঠকায় তা তিনি দেখিয়েছেন, তবে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্তির ফুল-এর ওপর মন্তব্যটি এখানে মামুলি; 'মান্ডাবি' বা 'মনিঅর্ডার' ছবিতে সেম্বেন অভ্যন্তরস্থ শোষণকে অধিকতর ভাবে পরিণত বোধশক্তির ফসল রূপে প্রতিপন্ন করেছেন। এ ছবিতে ঔপনিবেশিক দায়ভাগের দ্বন্দ্ব এবং আফ্রিকান ধারা আফ্রিকানদের নির্যাতন, সামাজিক সত্যের এই দ্বিবিধ অন্ত্যায়কে স্কৌশলে সংবদ্ধ করা হয়েছে। আলোকপ্রাপ্ত ভাইপোর পারী শহরে চাকরি করা নিয়ে নিরক্ষর কাকার গর্বাটি সেম্বেন প্রথমে সন্নেহ কৌতুকে দেখছেন এবং দেখিয়েছেন। ভাইপো মনিঅর্ডার করে টাকা পাঠিয়েছেন কাকাকে, সন্দে চিঠি। নিরক্ষর কাকা

সে চিঠি নিয়ে দোরে দোরে ঘোরে এবং কিভাবে সে টাকা ডাকঘর থেকে নিতে হয় তার পরামর্শও যেচে বেড়ায়। টুকরো টুকরো এপিসোডের মাধ্যমে বেচারী খুল্লতাত কিভাবে 'আলোকপ্রাপ্ত'-দের কাছে প্রভাবিত হন তা সেম্বেনে কৌতুক-ব্যঙ্গ ও প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ মিলিয়ে উচ্চাঙ্গের ডার্ক কমিডি সৃষ্টি করেছেন এই ছবিতে।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজের নিম্নস্তরকে উপজীব্য করলেই কোনো ছবিকে 'নিও-রিয়ালিজম্' লেবেল এঁটে দেওয়ার বদভ্যাসের সঙ্গে আমরা পরিচিত। সত্যজিৎ রায়ের প্রথম দিককার ছবির বিষয়ে এ নিয়ে আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। সেম্বেনেকেও 'মাস্টার অফ আফ্রিকান নিওরিয়ালিজম্' (Master of African Neorealism) বলা হয়েছে সমালোচক মহলে। এ কথা ঠিক যে নগরের অন্তর্বাদী ব্যতিক্রম বাদ দিলে অধিকাংশ আধুনিক আফ্রিকান শহরেই দরিদ্র আফ্রিকানরা বাস করেন উপকণ্ঠে কমপাউণ্ড বা শ্রাণি টাউন (Compound or Shanty Town)-এ। 'কমপাউণ্ডের' আফ্রিকানরা তাঁর গোড়ার দিকে ছবিতে উপস্থাপিত, এবং 'কালো মেয়ের' চিত্রভাষাতে নয়া-বাস্তববাদের আদলটি আছে, কিন্তু 'মনি-অর্ডার' ছবির গঠনে ও প্রতিমা প্রয়োগে ডিনিকা-রসেলিনির সমাজসচেতনতা ছাড়া আর কিছু আছে কি? রং-এর প্রয়োগই এ ছবিকে 'বাইসাইকেল থীভ্‌স্'-এর ধূসর দানা বিভক্ত আলোকচিত্রের জগৎ থেকে দূরে সরিয়েছে। শেষ পর্যন্ত একজন শিক্ষিত ব্যক্তি কাকাকে তার চিঠিটা পড়ে শোনায়। এখানে সেম্বেনে ঋষিকের ভাষায় 'একটা কাণ্ড করেছেন,' এবং সে কাণ্ড পৃথিবীর চলচ্চিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি বলে বিবেচিত হবে। কাকা সাহেবদের দেশে ভাইপোর সাফপ্যের সংবাদে উৎফুল্ল মুখ, থেকে থেকে ইন্টার কাট করে দেখানো হচ্ছে পারীর রাস্তাতে কুয়াশা মেশা ভোরবেলাতে রাস্তার পটে রাস্তা ঝাড়ার একটি সম্মার্জনীর অগ্রভাগ-এর সফট ফোকাসের মিডশট। অফ থেকে একেইয়ে স্বরে তার চিঠির পাঠ শোনা যাচ্ছে। কাকাকে খুশি করার জন্য ভাইপো তাতে নিজের অবস্থা সম্পর্কে গালভরা বড়ো বড়ো কথা লিখেছে—সেই শব্দের সঙ্গে ঝাড়ুদারের (১৯৭৩ সালে ইংলণ্ডের দূরদর্শনে 'Who will do the dirty job' নামে পশ্চিম ইউরোপে, ছনিয়ার নানা স্তর থেকে আসা শ্রমিকদের জীবনধারণের ভয়াবহ ছবি চমৎকার ভাবে দেখানো হয়। পারীর কাছেই এ ধরনের শ্রমিকদের বস্তির চেহারা সেখানে আমেরিকার ঘেটোকেও ছাড়িয়ে যায় বীভৎসতায়) ঝাঁটার চিত্রকল্প মর্মান্তিক আয়রনি সৃষ্টি করেছে। এ চিত্রাংশ বিশেষভাবেই নিওরিয়ালিজম্ ছেড়ে যাবার উদাহরণ হিসাবে গণ্য হতে পারে।

আফ্রিকান আধুনিক সাহিত্যে একটি অনভিপ্রেত অবস্থা এখনও বর্তমান—তা ইউরোপিয়ান ভাষাতে রচিত। ফলত ঔপন্যাসিক চিন্তা আচাবে বা নাট্যকার গুলে সোইংকো পশ্চিমী ছিনিয়াতে যতটা পরিচিত স্বদেশে ততটা নন। চলচ্চিত্রে এই সমস্যার সমাধান সেম্বেনকে করতে হয় একটা ধাক্কা খাবার পর। অমিতা মালিককে সেম্বেন জানান, রাশিয়াতে শিক্ষানবীশীর শেষে তিনি গ্রামীণ জীবন নিয়ে ছোট ছবি করে কৃষকদের বলেন ‘দেখো তোমাদের জন্ত ছবি করেছি’, উত্তরে তারা বলে ‘তবে তা আমাদের ভাষাতে করে’। দিয়ালাদের ভাষাতে করা ‘এমিটাই’ ছবিটি তারই প্রতিক্রিয়া। ‘সেডডো’ ছবিতেও সংলাপ ওলোফ (Wolof) ভাষাতে রচিত। বলা বাহুল্য চলচ্চিত্রে এটা অপেক্ষাকৃত সহজ, সাহিত্যক্ষেত্রের তুলনায়,—সাব-টাইটেল ব্যবহারের দায়ভাগে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত ফরাসি শাসকদের বাধ্যতামূলক চাল সংগ্রহের বিরুদ্ধে মেয়েদের সংঘবদ্ধ বিদ্রোহ ‘এমিটাই’তে বিধৃত; দু’দিক থেকে এ ছবি গুরুত্বপূর্ণ। মশজ্ব বিপ্লব এখানে স্বাভাৱ্যবোধভিত্তিক রাজনৈতিক ভাবানুভূতির স্তরে আটকে না থেকে আর্থনৈতিক পটভূমিকার ওপর জোর দেওয়া এবং সমাজে নারীর স্থানের প্রসঙ্গ উপস্থাপন।

হালা (Xala) ছবিতে সেম্বেন দেশীয় বুর্জোয়াদের ওপর রূপকাত্মে তীব্র আক্রমণ করেছেন। এটি একটি অতুলনীয় ডার্ক কমেডি। একজন কোম্পানী-কর্তাকে স্বাধীনতাউত্তর নপুংসক কৃষ্ণাঙ্গ বুর্জোয়ার প্রতিনিধি করা হয়েছে। সে ইসলামি সংস্কৃতির বহুবিবাহের স্বযোগ নেয়, সনাতনী আফ্রিকান সংস্কৃতির ওকা-তন্ত্রর স্বযোগ নেয়, এবং ধনতন্ত্রবাহিত সমস্ত উপকরণ বাড়িগাড়ি তো আছেই। তার প্রতিপক্ষ তার দ্বারা উৎখাত হওয়া ভূমিহীন কৃষক, যারা এখন শহরে ভিথিরি, যাদের মুখপাত্র তারই আঙ্গীয়, এবং তার কন্যা যে ফরাসি ভাষাকে বর্জন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ওলোফ (Wolof) ভাষা শিখতে আগ্রহী। একটা সময়ে তৃতীয় বিশ্বের পর নববধু সংগম করতে গিয়ে দেখে সে নপুংসক হয়ে গেছে। অভিশাপের (Xala=অভিশপ্ত) ফল। এখানে নপুংসকতা উৎপ্রেক্ষা হিসাবে প্রযুক্ত। শেষ দৃশ্বে সে সকল কর্তৃক পরিত্যক্ত, এবং সেই উৎখাত হওয়া ভিথিরিরা সবাই তার খোলা গায়ে খুঁ ফেলার ভয়াবহ দৃশ্য ফ্রিঙ্ক করে ছবি শেষ করা হয়—প্রায়শ্চিত্তের প্রতিমা। শেষদিকে ‘বেচারার’ হিসাবে সে দর্শকদের কিছুটা সহানুভূতি আকর্ষণ করে, কিন্তু তাতে ছবির তীব্র রাজনৈতিকতার কোনো হেরফের হয় না—সে কথা বলতে আজকাল অনেক চলচ্চিত্র তাত্ত্বিকদের অস্ববিধা হয়। ভিথিরিদের তার বাগানে ঘেরা প্রাসাদ অভিযানের দৃশ্য (প্রতিবন্ধী সহ) বুহুয়েলের ‘তিরিদিয়ানা’র

আরক হয়। সেনেগাল সরকারের একদলীয় শাসনে ছবি তৈরির স্বাধীনতা ছিল কম, রূপকের আশ্রয় তার একটা কারণ সম্ভবত। ইতিহাসে ফিরে গিয়ে ছবি তৈরি অনেক সময় এ ব্যাপারে সহায়ক। সম্ভবত তাই তাঁকে উনিশ শতকের ফরাসি অধিকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল রাষ্ট্রনায়ক (বর্তমান গিনি অঞ্চলে) 'সামোরি'কে নিয়ে ছবি করার কথা ভাবতে হয়। সে ভাবনা রূপ পরিগ্রহ করেনি। কলোনিয়াল আমলের পূর্বেকার সেনেগালি সমাজে সংঘর্ষ ও শোষণের ভিন্নধর্মী ছবি সেম্বেনের 'সেড্‌ডে' দেখি। ছবিটির ঐতিহাসিক কাল নির্ণয় সম্পর্কে একটু পরিচয় থাকা প্রয়োজন—শুধু মাত্র উনবিংশ শতাব্দী বললে ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে না। প্রকৃত পক্ষে এ ছবির কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের মধ্যে যে কোনো সময়ে বন্ধ মনে করা যেতে পারে। তখনও ফরাসি রাজশক্তি সেনেগালকে ক্রয়শক্ত করেনি, ইউরোপিয় সংস্পর্শ দাসব্যবসা ও মিশনারি ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে আবদ্ধ। শাসক শ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত তখন সনাতনধর্মী রাজা ও ইসলামধর্মী ইমাম (ইসলামধর্ম ও খ্রীস্টধর্ম বোঝাতে চায় যে এই দুই ধর্মে দীক্ষিত নয় যারা তারা ধর্মবিহীন। ডুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার উদ্দেশ্যে আফ্রিকার সনাতনী ধর্মকে ফেটিশিজম্ (fetishism), অ্যানিমিজম্ (animism), পেগানিজম্ (paganism) ইত্যাদি অপমানসূচক নাম ব্যবহার করেন। তবে জিয়োফ্রি প্যারিন্ডারের পুস্তকাবলীতে আফ্রিকার ধর্ম নিয়ে অন্ধা নিয়ে বিচার করবার নির্দর্শন রয়েছে।) দরিদ্র কৃষক (সেড্‌ডে শব্দটির অর্থ চাষী) এই দুই শক্তির শোষণের পাত্র। অবস্থা জটিল হয় সনাতনধর্মী রাজার অকস্মাৎ ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেওয়ার এবং তার বাগদত্তা কন্যাকে ভবিষ্যৎ স্বামী ও তার সঙ্গীরা চুরি করে নিয়ে যাবার ফলে। দরবারে কন্যাকে আনা হয় তার অপরাধের বিচারের জ্ঞা। তাকে রক্ষার্থে আসে মেয়েটির ভাইয়েরা ও তার হরু স্বামী। প্রান্তে থাকে বন্দুক, মদ ও সস্তা কাপড়ের বদলে দাস সংগ্রহকারী চতুর খেতকায় দালাল এবং খ্রীস্টধর্ম প্রচারে উৎসাহী খেতকায় প্রচারক। ছবিতে দাসব্যবসায়ীর প্রতি যে ঘৃণা সেম্বেন প্রকাশ করেন, প্রতিতুলনায় মিশনারির প্রতি তাঁকে কিছুটা সহানুভূতিশীল মনে হয়। ব্যক্তি হিসাবে সব ইউরোপিয়ই যে একরকম নন তা দেখিয়ে তিনি সম্ভবত ভারসাম্য রাখবার চেষ্টা করেছেন। মনে হয় না এ ছবিতে সে জাতীয় কিছু প্রয়োজন ছিল। যাই হোক, রাজার রহস্যজনক মৃত্যু দেখিয়ে সেম্বেন ত্রিমুখী সংঘর্ষকে দ্বিমুখী করেছেন। ছবিতে একেও একটা দুর্বল দিক মনে হয়, প্রতি-যোগীদের একজনকে সরিয়ে নেওয়ার মধ্যে কিছুটা সরলীকরণ রয়েছে। ইমামের

হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়া দেখাতেই এই উপায়টি অবলম্বন করেন সেম্বেন। সহিংস বিদ্রোহে কৃষকরা প্রতিবাদ জানান, শেষপর্যন্ত রাজকন্টার বন্দুকের গুলিতে ইমামকে হত্যার দৃশ্বে প্রতিবাদ কেন্দ্রীভূত হয়ে একটি ফ্রিজ্ শটের মধ্যে মূর্ত হয়। কলোনিয়াল শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনের বাঁধা সড়কে সঞ্চার না করে আফ্রিকার ইতিহাসের নিজস্ব জগতে ফিরে তাকানোর মধ্যে সেম্বেনের সন্ধানী মনের সক্রিয়তার নিদর্শন হিসাবে 'সেড্‌জো' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রচনা।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতির চাপে সমাজসমষ্টার চিত্রণে বিভিন্ন শিল্পীর বাঁকা পথ ধরেন, কিংবা ইতিহাসে ডুব দেন। ইস্লামি আভিজাত্য সেনেগালে এখনও শক্তিশালী (বছর কয়েক আগে সেনেগাল থেকে কবি মামাদু ট্রাওরে দিয়প এসেছিলেন কলকাতায়, তিনি অবশ্য সেনেগালে ধর্মীয় বিভেদের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন)। পশ্চিম আফ্রিকায় প্রায় সব কটি দেশেই কৃষকেরা নামে মাত্র মুসলমান, মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় গৌড়ামি সমাজের ওপর তলাতে, ফলত খ্রীষ্টিয় কলোনিয়াল সরকারের অপসরণের পর সে ক্ষেত্রে ইস্লামি অভিজাত শ্রেণী ক্ষমতায় ফিরে আসেন এবং তাদের বিরূপ সমালোচনা করা স্বাধীন সেনেগালে খুব সহজ ব্যাপার নয়। ১৯৭৯ এ অমিতা মালিকের সঙ্গে সাফাৎকারে উস্‌মান সেম্বেন জানান কান্-বালিন-মস্কোতে প্রদর্শিত হলেও সেনেগালে বা অত্যন্ত আফ্রিকান দেশে তা মুক্তি পায়নি, এবং সেটা শুধু ব্যবসায়িক কারণেই নয়, রাজনৈতিক কারণেও। বহুকাল সেনেগাল সোংহোঁদের 'সমাজবাদী' সরকারের শাসনে থাকা সত্ত্বেও মাল্লামী শ্রেণী এখনও সতেজ।

সেম্বেন এ ছবিতে চিত্রভাষা ও অভিনয় রীতিতে পৃথক, ছবির চাহিদা অনুযায়ী। সেম্বেনের চিত্ররীতি অবশ্য কোনো ছবিতেই খুব দ্রুতগতি নয়, কিন্তু এ ছবিতে লয় বিশেষভাবেই বিলম্বিত। অনেকটা জাপানি সাগুরাই-চিত্রের মতো। বিচারদত্বের দৃশ্যগুলি তাঁর এ রীতি প্রয়োগের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এখানে ক্যামেরা গতির ধীর ঘূর্ণন কুরোশাওয়ার 'রশোমন' ছবির আরক। উত্তেজনা উৎকর্ষা এ ছবির রীতিতে ছায়া ফেলে না, যদিও যে জগৎকে তিনি দেখান তা শারীরিক সংঘর্ষ থেকে মুক্ত নয়। অভিনয়রীতি এখানে সম্পূর্ণভাবেই চ্যাচারালিজম থেকে মুক্ত, সে দিক থেকেও এ ছবিতে অভিনেতৃবর্গ তোশিরো মিয়ুনে, মাচিকো কিওর কাজকে স্মরণ করায়। রীতির পেছনে সম্ভবত আফ্রিকানদের আত্মপরিচয় উদ্ঘাটন ও প্রতিষ্ঠার তাগিদ কাজ করছে।

আঙ্গলপরিচয় উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রেও একটা বিপদ থেকে যায়, নিজেদের প্রাক্ ইউরোপিয় পর্বের সংস্কৃতিও সমৃদ্ধ এটা প্রমাণ করতে ইতিহাসের সে পর্বের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে প্রয়োজনাত্মিক জায়গা দিয়ে দেওয়া হয়। ত্রাজিলের গ্রাউবের রোশা তাঁর প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি 'বারাভেনতো' (সামুদ্রিক ঝড়) ছবিতে আফ্রিকা থেকে আগত দাসদের বংশধর বাহিয়া উপজাতির রিচুয়ালস্ তুলে ধরেন কিছুটা ঐ ধরনের মনোভঙ্গিতে। এ জাতীয় অতিকৃতি বিদেশি দর্শকদের এক্সোটিক (exotic) দৃশ্যের চাহিদা মেটানোর একটা উদ্দেশ্য হতে পারে (বলা বাহুল্য রোশা-র ক্ষেত্রে সে প্রসঙ্গ অবান্তর)। স্ট্রাকচারবাদী নৃতাত্ত্বিকদের প্রভাবও এ ক্ষেত্রে একভাবে দায়ী মনে হয়। কারণ যাইহোক, এ অবাস্তিত ব্যাপার সেম্বেনের ছবির ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক মনে হয় না। এই সমাজসচেতন আঙ্গুনিক মনের অধিকারী শিল্পী অব্‌স্কিয়োর্যাণ্টিজমের বলি নন। তিনি উদ্ভট দৃশ্য বেচেন ইউরোপের বাজারে বলা সত্যজিৎ রায়, গৃণাল সেনের বিরুদ্ধে পশ্চিমে দারিদ্র্য বেচে খাওয়ার অভিযোগের মতো ভিত্তিহীন।

জ্যঁ-লুক্ গদার ষাট দশকে বলেন—আফ্রিকাতে কৃষাদ্দদের চলচ্চিত্র বলে কিছু নেই কারণ ছবি তৈরির ক্ষেত্রে কৃষাদ্দরা খেতাদ্দদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুকরণ করেন। কথটা আংশিক ভাবে সত্য ছিল তখন। কিন্তু সত্তরের দশকের শেষে এ নালিশ প্রযোজ্য নয়। সেম্বেন, মাহামা ট্রাওরের ছবি আফ্রিকান দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তৈরি। 'সেড্‌ডো' নির্মাণ ও প্রদর্শনের ক্ষেত্রে প্রতিকূলতার প্রেক্ষিতে প্রধানত দেশের লোকের জন্ত চলচ্চিত্র রচনার একটি উজ্জল নিদর্শন। তবে 'আফ্রিকান দৃষ্টিভঙ্গি' থাকলেই তাকে 'আফ্রিকানিজম' লেবেলের সমসত্তাকরণ মনে করা উচিত নয়।

তন্নিষ্ঠ চলচ্চিত্র রচয়িতাদের সম্ভবত সব দেশেই প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করতে হয়, এমন কি পশ্চিমী ছনিয়াতেও। আন্তনিনিনি ঘন ঘন ছবি করার জন্ত টাকা পান না, লিগুসে অ্যাওয়ারসনকে জীবিকার তাগিদে থিয়েটারের আশ্রয় নিতে হয়। সেম্বেনের পক্ষেও ঘন ঘন ছবি তৈরি করা সম্ভব হয় না, তবে তাঁর স্ত্রী অধ্যাপনা করে তাঁর ভরণপোষণ করেন একথা তিনি পূর্ব-উল্লিখিত সাক্ষাৎকারে জানান। কিন্তু প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি এই মাধ্যমকে আফ্রিকাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ সম্পর্কে আশাবাদী। সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তিনি প্রস্তাব করেন তৃতীয় ছনিয়ার দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সাহায্যের। সাক্ষাৎকারে এক জায়গাতে তিনি বলেন, 'যদি কোনো ইউরোপিয় পরিচালক কারারুদ্ধ হন তবে অস্থান

দেশের চলচ্চিত্র কর্মীরা নানাভাবে তাকে সাহায্য করেন, আমরা উন্নতিকামী দেশগুলি সে রকম কিছু করতে পারি না কেন? তুর্কী পরিচালক গুণে অবশ্য এশিয়ই, কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে ইউরোপ। সেম্বেন বলেন দিল্লীতে ১৯৭৯ সালে। ১৯৮২তে এ ব্যাপারে কোনো কিছু করা সম্ভব হয়নি। তা হবে — যদি এশিয়, আফ্রিকীয়, দক্ষিণ আমেরিকান দেশগুলির মধ্যে সম্পর্ক সরকারি মহলের 'সাউথ-সাউথ' (South-South) দোস্তির ফাঁকা বুলি সে সব দেশের কোটিপতি ব্যবসায়ীর লাভের বাজারে লেনদেনের গলিপথ ছেড়ে সত্যিকারের সক্রিয় সংহতির স্তরে উঠে আসে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতার সাম্প্রতিক আবহাওয়াতে সে বিষয়ে অধিক কিছু আশা করা সম্ভব নয়।

দীর্ঘকাল পর ১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দে উদ্‌মান সেম্বেন ক্যাম্প থিয়ারোইয়ে (Camp Thiaroye) ছবিটি তৈরি করেন, সে বছরই ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে বিশেষভাবে সম্মানিত হয়, এবং লগুন চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়। এ ছবির একটি অত্যন্তম বৈশিষ্ট্য হলো এর প্রযোজনা ও গুটিং পরবর্তী সমস্ত কাজ আফ্রিকাতে হয়, পশ্চিমী সাহায্যের অপেক্ষা না রেখে। আফ্রিকার ক্ষেত্রে এ ধরনের উদ্যোগের এই প্রথম নজীর। ইতিহাসাশ্রিত এই ছবির ঘটনাস্থল ১৯৪৪ সালে সেনেগালের একটি যুদ্ধ শিবির, যেখানে একদল যুদ্ধফেরৎ কৃষ্ণাঙ্গ সৈনিকদের ফরাসি অফিসাররা নৃশংস ভাবে হত্যা করে। এখানে সেম্বেন সরাসরি কলোনিয়াল বনাম জাতীয়তাবাদী সংঘর্ষের ক্ষেত্রে কর্নরত হয়েছেন, অত্যাচার ছবির মতো ফরাসি ভাষার সঙ্গে স্থানীয় আফ্রিকান ভাষাকে বৈপরীত্যে গ্রস্ত করেছেন কিছুটা ব্যঙ্গাত্মকভাবে, প্রথাসিদ্ধ কাহিনীবর্ণনকে অবলম্বন করেছেন সাধারণ বাস্তবতাবাদের সূত্রে। কিন্তু তারই মধ্যে স্বপ্নদৃশ্য, একটি বিকৃতমস্তিষ্কের ব্যঞ্জনাময় উপস্থিতি, মাউথগর্গানের একটি সুরের প্রয়োগ, অন্তরকম মেজাজ এনেছে। এবং যাকে 'সাইকোলজিকাল রিয়ালিজম' বলা হয় তা মোটের ওপর পরিহার করে, 'প্লট' পরিহার করে, ইতিহাসের ঞ্চারেটিভের প্রবহমানতা রক্ষা করে, 'হালা' (Xala)-র উত্তর-কলোনিয়াল 'স্বাধীন' সেনেগালের সমাজকে না ধরলেই সে ছবির এবং সেম্বেনের নিজের বিশিষ্ট রাজনৈতিকতারই ছাপ রেখেছেন। সেদিনকার সেই রাণী ছোকরা এখনও বৃদ্ধ হয়েও 'জুদু' আছেন।

শ্রবণ গুপ্ত

## ॥ সেমিওলজি / সেমিওটিকস্ ॥

সেমিওটিকস্ বা চিহ্নতত্ত্ব এবং সেমিওলজি বা চিহ্নবিজ্ঞান মূলতঃ একই তাত্ত্বিক মতবাদের ফরাসি এবং মার্কিন পরিচয় মাত্র। ভাষাতত্ত্ব বা লিঙ্গুইষ্টিকস্ এবং সংগঠনবাদ বা স্ট্রাকচারালিজম থেকে চিহ্নতত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশ যা চলচ্চিত্র আলোচনায় একটি পৃথক ধারার সূত্রপাত ঘটিয়েছে সত্তরের দশকে। ‘চিহ্নতত্ত্ব’ বলতে এককথায় ভাষা ও শিল্পের ক্ষেত্রে ‘সাইন’ বা চিহ্নের নির্মাণ, প্রয়োগ ও পদ্ধতিগত সংগঠনের আলোচনা। বলা বাহুল্য, এখানে ‘চিহ্ন’ একটি বিশেষ পরিভাষা এবং এর সঠিক ধারণা ছাড়া চিহ্নতত্ত্ব বোঝা অসম্ভব। ‘চিহ্ন’ ঠিক কি? ‘চিহ্নের’ তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, প্রথমত চিহ্নের একটি আকার বা শরীর রয়েছে, দ্বিতীয়ত চিহ্ন অবশ্যই নিজেকে ছাড়া একটি ‘দ্বিতীয় কিছুর’ সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং তৃতীয়ত চিহ্নের ব্যবহারিকতার বা উপযোগিতার স্বীকৃতি থাকে। রোল্যান্ড বার্থ প্রদত্ত বহু পরিচিত উদাহরণটি আবার স্মরণ করা যেতে পারে। বার্থ বলেন যে একটি গোলাপ ফুলের একটি বাহ্যিক আকার বা শরীর রয়েছে এবং আমরা যখন ‘গোলাপ’ শব্দটি উচ্চারণ করি তখন ফুলের ঐ শরীর বা আকার আমাদের সামনে ভেসে ওঠে। কিন্তু একজন প্রেমিক যখন প্রেমিকাকে গোলাপ উপহার দেয় তখন ‘গোলাপ’ আর নিছক ফুল থাকে না, সে হয়ে ওঠে ‘চিহ্ন’—যা ‘প্রেম’ নামক একটি দ্বিতীয় ধারণাকেই মনে করিয়ে দেয়। চিহ্ন হিশাবে গোলাপের ভূমিকাটি কোনো গুঢ় রহস্য নয়—প্রেমিকা তা স্বীকার করে, অনুধাবন করে। চিহ্নতত্ত্ব ভাষা ও শিল্পে (চলচ্চিত্রেও) চিহ্ন কিভাবে অর্থবহ হয়ে ওঠে, কিভাবে তাকে প্রয়োগ করা হয়, ইত্যাদি আলোচনা করে—একেই বার্থ বলেছেন ‘সাইন-সিস্টেম’ বা ‘চিহ্ন-পদ্ধতি’, যা প্রতিটি শিল্পের ক্ষেত্রেই পৃথক কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সিগনিফায়ার (সূচক) এবং সিগনিফায়েড (সূচিত) দুটি অংশের সাহায্যেই ‘চিহ্ন’ তৈরি হয়। ফার্দিনান্দ স্যুরর তাঁর ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় সর্বপ্রথম ‘সূচক’ ও ‘সূচিত’ সম্পর্কে বলেন। স্যুরর চিহ্নের শারীরিক রূপকে ‘সূচক’ আখ্যা দিয়েছেন এবং ‘সূচিত’ হচ্ছে চিহ্নের সেই বৈশিষ্ট্য যা চিহ্নের প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। ‘গোলাপের’ বাহ্যিক রূপের ধারণা ‘গোলাপ’ নামক চিহ্নের (উচ্চারিত শব্দ বা ছবি) ‘সূচক’ এবং প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে গোলাপ ফুলের বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে গোলাপের যে বিশেষ ভূমিকা প্রতিভাত হয় তাকেই বলা যেতে পারে ঐ চিহ্নের ‘সূচিত’ বৈশিষ্ট্য। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে চিহ্নতত্ত্বের নানা প্রয়োগ রয়েছে যা

বিতর্কিত এবং জটিল। চিহ্ন নানা ধরনের হতে পারে। একটি বিশেষ শব্দ, বা 'চিত্র' থেকে শুরু করে চলচ্চিত্রের ফোটোগ্রাফিক ছবি এবং একটি শট যেমন 'চিহ্ন' হিসাবে মর্যাদা পেতে পারে তেমনি সামগ্রিকভাবে চলচ্চিত্রতাবা 'চিহ্ন' ব্যবহার করতে পারে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে। উদাহরণ হিসাবে সত্যজিৎ রায়ের 'পিকু' ছবির শেষ দৃশ্য মনে করা যেতে পারে যেখানে পিকু সাদা ফুল কালো রঙ দিয়ে আঁকতে শুরু করে। পিকুর কালো রঙে আঁকা ফুল কোনো বাস্তব ফুল নয়। চিহ্ন হিসাবে কালো ফুল আগের উদাহরণের গোলাপ ফুলের মতো ঠিক কি সূচিত করে? এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই লুকিয়ে আছে ছবির তাৎপর্য, ছবির গুরুত্ব। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে পিকুর অঙ্কিত কালো ফুলটির আপাত কোনো অর্থ নেই—এটি শিশুমনের খেয়াল মাত্র। অহৃদিক থেকে দেখলে পিকু এবং পিকুর মা—যিনি কালো রঙে সাদা ফুল আঁকতে সাহায্য দেন—তিনিও কোনো অসঙ্গতি দেখতে পান না, কিংবা চান না। কিন্তু পিকু কি নিজে কোনো অসঙ্গতি দেখতে পায় না? যদি 'চিহ্ন' হিসাবে আমরা ছবির পর্যালোচনার পরপর আরো প্রশ্ন আনতে পারি এবং দেখতে পারি কিভাবে একটি বিশেষ চিহ্ন সূচক হিসাবে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, একইভাবে চিহ্নটি যা সূচিত করে তাও ছবিকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। গোলাপ ফুলের ক্ষেত্রে চিহ্ন কি সূচিত করতে চেয়েছে আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি—কিন্তু পিকুর ছবির ক্ষেত্রে পারি না। কেন? কারণ এ ছবিতে সত্যজিৎ কোনো প্রথাগত চিহ্ন বা সাইন ব্যবহার করেন না (যেমন ঘরে বাইরে ছবিতে বিমলার পরনে সাদা খান বা বৈষব্যকে সূচিত করে)—এখানে চিহ্নটির (পিকুর আঁকা কালো ফুল) ব্যবহারিকতার কোনো পূর্ব নিদর্শন নেই। কেন সত্যজিৎ একটি নতুন চিহ্ন তৈরি করতে চান? কেন তিনি এমন চিহ্ন ব্যবহার করেন যার কোনো প্রয়োগগত ইতিহাস নেই? সম্ভবত তিনি এমন একটি বিষয়কে, এমন একটি মানসিকতাকে ধরতে চান যা প্রথাগত 'চিহ্ন' দিয়ে সূচিত করা সম্ভব নয়, যা দাবি করে নতুন চিহ্নের। অল্পভাবে বলতে গেলে যা তৈরি করে নেয় এক 'চিহ্ন'—যে চিহ্ন সেই বিশেষ চলচ্চিত্রের ভাষারীতির মধ্যে দিয়েই একমাত্র সূচিত করা সম্ভব। সেমিওটিকস্ বা চিহ্নতত্ত্ব অল্প অনেক কিছুর সঙ্গে 'চিহ্নের' উদ্ভব, প্রয়োগ এবং গুরুত্বের পর্যালোচনা করে। [সিনেমাকে অর্থবহ চিহ্ন সমাহার রূপে বিচার করার এই পদ্ধতি চলচ্চিত্র তত্ত্বের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত আলোকপাত করতে পারে এবং সেইসূত্রে সিনেমার বিভিন্ন ভাবিক ক্ষেত্র আলোকিত হবে। স্নুহরের সমন্বয়ময়িক, আমেরিকান চার্লস পিয়ার্স 'চিহ্ন-সমুদয়কে

তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন : প্রতিমা (আইকন), স্ফটিক (ইনডেক্স) এবং প্রতীক (সিম্বল)। পিয়র্স বিশ্বাস করতেন যে, যে-তিনটি দিককে তিনি পৃথকভাবে চিহ্নিত করেছেন সেগুলি পরস্পর নিরপেক্ষ নয়। প্রতিটি চিহ্নেই উপরোক্ত তিনটি চরিত্র বর্তমান। শুধু তিনটির মধ্যে যে-কোনো একটি প্রাধান্য পায়। পিটার ওলেন-ও এই মতের সমর্থক। তাঁর বক্তব্য হলো সিনেমায় প্রতিরূপ একই সঙ্গে প্রতিমা, স্ফটিক ও প্রতীক চিহ্নে চিহ্নিত। হেরফের যা রয়েছে তা কেবল মাত্রায়। এই তিনটি শ্রেণীর যে-কোনো একটি বা দুইটিকে কেন্দ্র করেই অধিকাংশ সিনেমা-তত্ত্ব তৈরি হয়েছে। দর্শকও একটি বিশেষ ছবি দেখতে দেখতে তার নিজের মানসিক বিচার-বিবেচনা অনুযায়ী প্রতিরূপ থেকে প্রতিমা, স্ফটিক বা প্রতীকী অর্থগ্রহণ করে।’]

বীরেন দাশগর্মা

॥ সৃজন সোন্টাগ ॥

(জন্ম ১৯৩৩, আমেরিকা)। দর্শনের শিক্ষক, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, চিত্রনির্মাতা—বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মকুশলতার পরিচয় দিলেও সোন্টাগের ভাবনার স্পষ্টতা ও মৌলিকত্ব সবচেয়ে বেশি খোলে প্রবন্ধ রচনায়। চলচ্চিত্র, সাহিত্য, শিল্প, নাটক ও আলোকচিত্র—বিবিধ বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি। *Against Interpretation* গ্রন্থে তিনি শিল্পসৃষ্টির মধ্যে অর্থ খুঁজে বেড়াবার প্রবণতার বিরোধিতা করেছেন। বলছেন, *by interpretation one tames the work of art, makes art manageable, comfortable.* ধর্ম মনস্তত্ত্ব ব্যক্তি শিল্প সমাজ—সমস্ত কিছুকে বিশ্লেষণ করায় আগ্রহ তাঁর, যার আরো প্রমাণ অনু ফটোগ্রাফি গ্রন্থে। আলোকচিত্র বিষয়ে সবচেয়ে মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত ও পুরস্কৃত হয়েছে এ বই। বইটি শুধু ফটোগ্রাফি সম্পর্কে নয়, আধুনিকতা সম্পর্কেও, আধুনিক জীবনযাত্রা সম্পর্কে। বেশ কিছুদিন তিনি ছরারোগ্য রোগে ভুগেছিলেন, যে অনুভবের ফসল ইলনেস এ্যাজ মেটাফোর। এই গ্রন্থ শুধু রোগ ও অস্বস্থতা নিয়ে মননশীল আলোচনাই নয়, জীবন ও মৃত্যু নিয়ে দার্শনিক ভাষ্যও। অসাধারণ মৌলিক ও মননশীল এই লেখিকার রচনা একই সঙ্গে সাহিত্যগুণ, ইতিহাসবোধ ও দর্শনচেতনায় সমৃদ্ধ।

অন্যান্য গ্রন্থ : I, etcetera ; সৃজন সোন্টাগ রীডার।

পরিচালিত চিত্র : *Duet for Cannibals* ( ৬৯ )।

## ॥ সোভিয়েত রাশিয়া ॥

লুমিয়ের ভাইদের সিনেমাটোগ্রাফি আবিষ্কারের মাত্র কয়েকমাস পরেই, ১৮৯৬-এর গ্রীষ্মকালে রুশদেশেরও প্রথম চলচ্চিত্রটি তৈরি হয়ে যায়। বছর দশ-বারের মতো তারা ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিও তৈরি করে ফেলে। কিন্তু, ঐ সময়ের রুশ চলচ্চিত্রের প্রধান বিষয় ছিল, দর্শকদের মিছক আনন্দ দেওয়া। এরই মধ্যে স্টেয়ারভিচের প্যাপেটচিত্রগুলি উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালের যে সোভিয়েত চলচ্চিত্র, তার জন্মলগ্ন ধরা হয় সেই মুহূর্তটিকে, ২৭ আগস্ট, ১৯১৯-এর যে মুহূর্তে ভি. আই. লেনিন চলচ্চিত্র শিল্পকে জাতীয়করণের ডিক্রিতে স্বাক্ষর দেন।

এরপর থেকেই সোভিয়েত চলচ্চিত্রের অগ্রগতির সাথে সাথে নতুন নতুন চলচ্চিত্র অভিনেতা অভিনেত্রী ও চিত্র পরিচালকদের আবির্ভাব ঘটতে থাকে। শিল্পের জ্ঞান শিল্প এই মূল্যবোধের রূপান্তর ঘটতে থাকে। জীবনের জ্ঞান শিল্প— এই বৈপ্লবিক মূল্যবোধ সামনে রেখে। এ হলো সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা। ১৯২৫। সের্গেই আইজেনস্টাইনের বয়স তখন মাত্র সাতাশ। আর ঐ বয়সেই তিনি তৈরি করলেন, পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ছবি 'যুদ্ধজাহাজ পতেমকিন'। রুশ জারের বিরুদ্ধে 'প্রিন্স পতেমকিন ভাভরিচেস্কি' যুদ্ধজাহাজে যে বিদ্রোহ সংগঠিত হয়, যে বিদ্রোহের আশ্রয় ছড়িয়ে পড়ে সারা রুশদেশে এবং যে বিদ্রোহ জার কর্তৃপক্ষ নিষ্ঠুরভাবে দমন করে— ছবিটির বিষয়বস্তু সেই ঐতিহাসিক ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে। সত্তর মিনিটের এই ছবি পৃথিবীর হাজার হাজার চিত্র সমালোচকদের ওপরেই গুণু প্রভাব বিস্তার করেনি, লক্ষ লক্ষ দর্শকের মনেও আলোড়ন তুলেছে। এর কারণ, সমস্ত রকম প্রতিকূলতা ও সাময়িক বিপর্যয় সত্ত্বেও ছবিটি সত্য ও সত্যের মাহুকের সংগ্রামের কাব্যগাথা।

'যুদ্ধজাহাজ পতেমকিন', 'অক্টোবর', 'স্ট্রাইক' ছবি দিয়ে আইজেনস্টাইন সোভিয়েত চলচ্চিত্রে সমষ্টির ভূমিকার মাধ্যমে যুগের হৃৎস্পন্দ শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রকাশ করতে চাইলেন। তাঁর ছবির প্রধান অভিনেতা অভিনেত্রী আর কেউ না— জনগণ। অগুদিকে আর এক তরুণ চলচ্চিত্র পরিচালক পুদভকিন ব্যক্তির ভূমিকার মধ্য দিয়ে তুলে ধরতে চাইলেন জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও যুগের হৃৎস্পন্দন। ১৯২৮-এ 'চেঙ্গিজ বানের বংশধর' ছবিতে তিনি দেখালেন এক মঙ্গোল তরুণ-এর কাহিনী। প্রতিক্রিয়াশীলচক্র যাকে নিজেদের অধীনস্থ উত্তরাধিকারী শাসক ও পুতুলশাসক বানানোর পরিকল্পনা করে। পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত,

তরুণটি ওদের হাত থেকে পালিয়ে এক বিদ্রোহ পরিচালনা করে। পুদভকিনের 'মা' ছবিটির মধ্য দিয়ে ঐ একই কথা অল্পভাবে প্রকাশিত। বস্তুত বৈপ্লবিক ঘটনার সঙ্গে করুণ রনের সমন্বয়ে কী আইজেনস্টাইন কী পুদভকিন তাঁদের গভীর ও অন্তর্ভেদী শিল্পকলার প্রয়োগে আমাদের এ শতাব্দীর প্রধান বিষয় বিপ্লবকে এক জীবন্ত ও ঘন-কেলাসিত রূপ দিলেন। চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগের শেষ পর্বে বিশ্ব চলচ্চিত্রে সোভিয়েত সিনেমার ভূমিকাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার আদর্শের মধ্যে থেকেও বিভিন্ন শক্তিশালী পরিচালকের ছবি হয়ে উঠছিল নিজস্ব প্রকাশভঙ্গির ( কিন্তু আঙ্গিকসর্বস্বতার নয় ) স্বস্পষ্ট পরিচায়ক। ঠিকই বলা হয়েছে যে 'their films were rich individual responses to the stimulus offered by a young revolutionary society.'

সোভিয়েত চলচ্চিত্র তার জন্মগত থেকেই বহুজাতিক শিল্প হিসেবে আঙ্গ-প্রকাশ করতে থাকে। ইউক্রেনে দেখা দিলেন দভঝেক্সো, জর্জিয়ায় দেখা দিলেন শেমুগেলায়া ও চিয়াউরেলি, আর্মেনিয়ায় বেক-নাজারভ। দভঝেক্সোর ছবি 'জুভেনিগোরা' ( ১৯২৭ ), 'অস্ত্রাগার' ( ১৯২৯ ) ও 'পৃথিবী' ( ১৯৩০ )-কে একই সঙ্গে কবিতা ও চলচ্চিত্র বললে কিছু তুল হয় না। বিপ্লবের মহিমা ও নিদারুণ বাস্তবকে জাতীয় মেজাজের সংবেদনশীল উপলব্ধির সঙ্গে তিনি মিশিয়েছিলেন।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত চলচ্চিত্রের গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছে, মোড় নিয়েছে। তিরিশের দশকের ছবিগুলির মধ্যে তাই সেইসব নায়ক-নায়িকার দেখা মেলে নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়বার কাজে যারা উৎসর্গিত প্রাণ। জীবনকে যারা নতুনভাবে গড়ে তুলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ইওসিফ খেইফিৎস ও আলেকজান্ডার জাখির 'মেসার অব দি গবর্নমেন্ট' ( ১৯৪০ ) ও 'ডেপুটি অব দি বাস্টিক'; কোজিনৎদেভ ও ত্রাউবার্গের 'দি ট্রেলজি অব ম্যাকসিম'; ভাসিলিয়েভ ভাইদের 'চাপায়েভ' যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই সময়ের চলচ্চিত্রে শুধু যে মানুষের অপরাঙ্কের বিজয় গাথার কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে, তা না। সম্পূর্ণ এক নতুন সমাজ গড়তে গিয়ে মানুষ যেসব সমস্যা ও দুঃখ কষ্টের সামনে পড়েছে তাও শিল্পসম্মতভাবে তুলে ধরা হয়েছে, যা দর্শককে নায়ক-নায়িকার দুঃখকষ্টের প্রতি গভীর সহানুভূতিতে একান্ত ও অভিজ্ঞ করে তোলে। এই সময়ের ছবিগুলির মধ্যে আমরা দেখতে পাই মহাকাব্যার্থী বিস্তার এবং সেই সঙ্গে ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুকে অত্যন্ত বিস্তৃত, জীবন্ত ও সত্যনিষ্ঠভাবে তুলে ধরার প্রয়াস। দভঝেক্সোর 'শুখরদ', ইউতকেভিচের 'বন্দুকধারী মানুষ'; মিখাইল

রম্-এর লেনিন বিষয়ক ছবি—‘অক্টোবরে লেনিন’, ‘১৯১৮-তে লেনিন’, ( ১৯৩৭ ও ১৯৩৯ ) পরেও জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করেছে। সমাজতন্ত্রের জলহাওয়ায় যে নতুন মাহুশ গড়ে উঠেছে তাদের নিয়ে নির্মিত হলো গেরাসিমভের ‘সাতজন সাহসী মাহুশ’ ও ‘কমসোমল’; লুকভের ‘মহানজীবন’। একথা ঠিকই, তিরিশের দশকের ছবিগুলির সাফল্যের প্রধান কৃতিত্ব অভিনেতা অভিনেত্রীদের, ধারা রুশ বা সোভিয়েত থিয়েটারের ঐতিহ্যকে লক্ষ লক্ষ দর্শকের কাছ থেকে অভূতপূর্ব স্বীকৃতি আদায় করে নেবার জ্ঞান পুরোমাত্রায় কাজে লাগিয়েছেন।

সোভিয়েত চলচ্চিত্র বরাবরই নতুন ধারার সৃষ্টি করে এসেছে। যার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় সংগীতপ্রধান কমেডিগুলি। এই কমেডি নির্মাতাদের অগ্ৰতম শ্রেষ্ঠ হলেন আইজেনস্টাইনের শিষ্য গ্রিগরি আলেকসান্দ্রভ। আলেকসান্দ্রভকে পৃথিবীর সংগীতধর্মী চলচ্চিত্রের অগ্ৰতম পুরুষও বলা যেতে পারে। তিনি কম্পোজার আইজাক দ্বনায়ভস্কি, প্রথম সোভিয়েত চিত্রতারকা ল্যুবোভ ওরলোভা ও সোভিয়েত জাজ নৃত্যের স্রষ্টা লিওনিদ উত্‌সোভের সঙ্গে ‘হাস্তন্থর সঙ্গীত’, ‘সার্কাস’, ‘ভোল্‌গা ভোল্‌গা’, ছবি সৃষ্টি করেন, ই. পাইরিয়েভের ‘ধনী নববধূ’, ‘ট্রাস্টের ড্রাইভার’, এবং ‘শুক্রপালকবালিকা ও মেঘপালক’-ও রীতিমতো উল্লেখযোগ্য। চল্লিশের দশকের শুরুতে ফ্যাশিস্ত আগ্রাসনের ফলে সোভিয়েত চলচ্চিত্র নতুনদিকে মোড় নেয়। বিষয়বস্তু যেমন হয়ে ওঠে নতুন, কাজের ধরনও হয়ে ওঠে আলাদা। সোভিয়েত ইউনিয়নের ইউরোপীয় অংশের পশ্চিম ও মধ্যভাগ থেকে চলচ্চিত্র স্টুডিওগুলি মধ্য এশিয়া ( সোভিয়েত ইউনিয়নের ) কাজাখস্তান ও ট্রান্সককেশাসে স্থানান্তরিত করা হয়। ফলে স্থানীয় স্টুডিওগুলির সঙ্গে স্থানান্তরিত স্টুডিওগুলি একযোগে কাজ করতে থাকে। ঐ সময়ের ঘটনাবলী ব্যাপকভাবে জনসাধারণের সামনে প্রচারের জ্ঞান নিউজরীলেরও প্রাধান্য বাড়ল। সোভিয়েত ক্যামেরাম্যানেরা একেবারে রণাঙ্গনের মধ্যে দাঁড়িয়ে ইতিহাসের নাটকীয় ঘটনার গতি ছবির ফ্রেমে ধরে ছিলেন। ছবি তুলতে তুলতে অনেকে নিহতও হয়েছেন। তথ্য ও সংবাদচিত্রের এই আদর্শ ও প্রবণতা অনেকটাই ভেতরত জন্মপ্রাপিত। রণাঙ্গনে তোলা শটগুলোকে স্থনিপুণ ভাবে ব্যবহার করে পরিচালক ভারলামত ও কোপালিম ‘মস্কোর কাছে জার্মান বাহিনীর পরাজয়’ ( ১৯৪২ ) তথ্যচিত্রটি পরিচালনা করেন। কারমেন তৈরি করলেন ‘যুদ্ধের মধ্যে লেনিনগ্রাদ’ ( ১৯৪২ ) এবং হুরেমবার্গ বিচার সম্বন্ধে ‘জনগণের রায়’ ( ১৯৪৬ ), পাইরিয়েভের ‘পার্টি রিজিওন্সাল কমিটির সেক্রেটারি’ ( ১৯৪২ ); এর্মলারের ‘মাতৃভূমির প্রতিরোধে

সে ( স্ত্রী )' ( ১৯৪৩ ), দনস্কোয়ের 'রামধনু' ( ১৯৪৪ ) নাৎসি হানাদারদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত জনগণের সংগ্রামের বীরগাথা ।

সোভিয়েত চলচ্চিত্রের বিপুল ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে যুদ্ধপরবর্তী যে ছবিগুলি আমাদের অভিভূত করে, তা হলো ; আইজেনস্টাইন পরিচালিত জগৎ বিখ্যাত ছবি 'ভয়ঙ্কর ইভান' । গেরাসিমভ পরিচালিত 'তরুণ রক্ষী' ছবির মধ্যে পাই ফ্যাশিশ্ত দখলীকৃত ইউক্রেনে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামরত এক তরুণ পার্টিজানের কাহিনী । একই পথানুসারী রমের 'আগ্রাদন' । এইসব ছবির মধ্য দিয়ে যে চরম সত্যকে তুলে ধরা হয়েছিল, তা ঐ সময়ে ফ্রন্টে লড়াইরত সৈনিকদের মনোবল প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছিল, তাদের মধ্যে দেশপ্রেমের অল্পপ্ৰেরণা ও গভীর বিশ্বাস জাগিয়েছিল, শেষপর্যন্ত তারা যে বিজয়ী হবেই এই আশায় উদ্দীপনার সঞ্চার ঘটিয়েছিল ।

পঞ্চাশের দশকে চলচ্চিত্রশিল্প আবার নতুন নতুন পরীক্ষানিরীক্ষা ও সৃষ্টির দিকে মোড় নেয় । পূর্ববর্তী দশকগুলির তুলনায় এ দশকে ছবির সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে । বিশেষভাবে পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগ ও ষাটের দশকের শুরুতে যে নতুন পরিচালকদের আবির্ভাব ঘটে থাকল তাঁরা যা কিছু 'গ্রামার'কে বাতিল করে দিলেন, অতীত ও বর্তমানের যত কিছু জাঁকজমক, বাহু আড়ম্বর তা পরিহার করলেন, আঘাত-সংঘাতে পরিপূর্ণ জীবন যা—তাই চলচ্চিত্রে রূপ দিতে শুরু করলেন । এ সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে ছবিগুলি আন্তর্জাতিক পীঠিক্তি আদায় করেছে, তা হলো : গ্রিগরি চুখরাইয়ের 'একজন সৈনিকের জীবনগাথা', সের্গেই বন্দারচুখের 'মানুষের ভাগ্য', মিখাইল কালাতোসভের 'উড়ন্ত সারসেরা', আন্দ্রেই তারকোভস্কির 'ইভানের ছেলেবেলা' যুদ্ধের সময়ের বিয়োগান্তক কাহিনীকে বিষয়বস্তু করে তোলা । আলেকসেই সালতিকভের 'সভাপতি', আপেক-সান্দ্র দভঝেকোর 'নমুদ্রের কবিতা', গ্রিগরি চ্যানিলিয়া ও ইগর তালানকিনের 'সেরিওঝা', ভিতাউতাস জালাকেভিসিয়ানের 'কেউই মরতে চায় না' এবং রমের 'বছরের ন-দিন' ছবিগুলির মধ্যে আনরা শুধু সমকালীন সোভিয়েত জীবনযাত্রার অগ্রগতি ও সাকল্যের পরিচয়ই পাই না, পাই যেসব সমস্যা ও বাধা বিয়ের সম্মুখীন হতে হচ্ছে—তার জীবন্ত চিত্রগাথাও । এই ধরনের অনেকগুলি ছবি নিয়ে 'The Unknown Soviet Cinema of the 60s' নামে একটি রেট্রোস্পেক-টিভের আয়োজন করা হয় ইতালিয় তুরিণ চলচ্চিত্র উৎসবে ১৯৮৭-র নভেম্বরে । ষাট ও সত্তরের দশকে আরো ছবি করলেন ভাদিসিল গুশিন, লারিসা শেপিৎকো,

নিকিতা খিখালকত প্রমুখ। এর মধ্যে প্রথম দুজনের অকালমৃত্যু হয়। শুধু লারিসা নয়, আরো অনেক নারী পরিচালকের আবির্ভাব হয় সোভিয়েত ইউনিয়নে।

বিগত সমস্ত বছরে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত চলচ্চিত্র তার জাতীয় এবং নান্দনিক ঐতিহ্যসম্পদ সমৃদ্ধ চলচ্চিত্রশিল্প গড়ে তুলেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের পনেরটি প্রজাতন্ত্রেরই নিজেদের স্টুডিও ছিল, নিজেদের অভিনেতা অভিনেত্রী এবং প্রত্যেক স্টুডিও যার যার স্বযোগ স্ববিধে, অভিজ্ঞতা ও রুচি অমুযায়ী কাজ করত। বাণ্টিক প্রজাতন্ত্রের ছবিগুলি তাদের চিন্তাশীল ও শান্তিপ্ৰিয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল, ককেশাসে তৈরি ছবিগুলি স্বতঃস্ফূর্ত মেজাজের জগ্ন বিখ্যাত, ইউক্রেন ও মোলদাভিয়ার ছবিগুলি উষ্ণমধুর কাব্যগাথার জগ্ন প্রসিদ্ধ।

ফিচার এবং ডকুমেন্টারি ছবি ছাড়াও সোভিয়েত ইউনিয়নের ৩৯টি স্টুডিও জনপ্রিয়-বিজ্ঞান ও শিক্ষামূলক ফিচার এবং কার্টুন ছবিও তৈরি করত। ১৯৭১-এর একটা হিসেব থেকে দেখা যায় ঐ বছরে সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৮১টি কাহিনী-মূলক ছবি ছাড়াও, ৩৭টি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের বিজ্ঞান ও শিক্ষামূলক ছবি তৈরি করেছে। তাছাড়া, ১১০২টি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি এবং ১১৬৭টি নিউজরীল। ১৯৭১-এ প্রকাশিত একটি পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় ১৫৭,২০০ পাবলিক ফিল্ম প্রোজেক্টর সোভিয়েত ইউনিয়নে ছবি দেখাচ্ছে, যার মধ্যে ১৩৩, ১০০ প্রোজেক্টর ছবি দেখায় গ্রামাঞ্চলে। আর প্রতিদিন এককোটি তিরিশ-চল্লিশ লক্ষ লোক সিনেমা দেখে। আশির দশকে এইসব সংখ্যা আরো বেড়েছে। সোভিয়েত চলচ্চিত্রের সমস্ত কাজ নিয়ন্ত্রণ করত গস্কিনো অর্থাৎ স্টেট কমিটি ফর সিনেমাটোগ্রাফি অব দি ইউ এস এস আর.কাউন্সিল অব মিনিস্টারস।

বৈচিত্র্য, রুচি ও মেজাজের পার্থক্য থাকা সবেও একটি বিষয়ে সোভিয়েত চলচ্চিত্র পরিচালকেরা সজ্জবদ্ধ, তা হলো, সাম্প্রতিক জীবনকে চলচ্চিত্রে রূপ দেবার জগ্ন নতুন নতুন বিষয়বস্তুর অনুসন্ধান। চলচ্চিত্র-নির্মাতারা প্রধানত প্রতিনিধিত্ব মূলক বাস্তব ঘটনার দ্বারা পরিচালিত হতে ইচ্ছুক। তাঁরা ভালোই জানেন, তাঁদের সমসাময়িক মানুষ যেমন জটিল তেমনি আবার চমকপ্রদ। স্মরণ্য, তাদের সেই-ভাবে রূপালি পর্দায় উপস্থিত করতে হবে, তা না হলে তাঁদের সৃষ্টির মধ্য থেকে কোনো সত্য বেরিয়ে আসবে না—যা যেকোনো শিল্পেরই মূল্যবান উপাদান। তারকোভস্কির পরবর্তী ছবিগুলি বা 'অনুশোচনা'-খ্যাত তেল্লিজ আবুলাদজে বা 'কমিশার', 'বিষয়বস্তু', 'ফিরে আসা', 'দীর্ঘ বিদায়', 'বিপজ্জনক খেলা', 'হারুণ অল-রশিদ', 'কিশোরী ভেরা', 'স্বরা মাহুঘের চিঠি'-র মতো ছবি তারই প্রমাণ।

সোভিয়েত চলচ্চিত্র বলতে আমরা প্রধানত 'যুদ্ধ ও শান্তি'-ধর্মী রূপদী চলচ্চিত্র ( যার মধ্যে পড়ে শেক্সপীরের ট্র্যাজিডিগুলি অবলম্বনে চলচ্চিত্রও ) বা যুদ্ধপ্রধান চলচ্চিত্র বুঝে থাকি । এবং প্রায়শই, এ দেশীয় দর্শকদের কাছ থেকে এই অভিযোগ শোনা যায় : জটিল মনস্তত্ত্বধর্মী চলচ্চিত্র সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রস্তুত হয় না । পূর্বোক্ত ছবিগুলি ( হয়ত প্রাসঙ্গিক ও পেরেজ্জেকার ফলস্বরূপ প্রস্তুত বা প্রদর্শিত ) এই ধারণাকে নস্যাৎ করে দেয় ।

সোভিয়েত চলচ্চিত্র শুধু 'উৎপাদন' ভিত্তিক ও 'যুদ্ধ' প্রধান ছবি করে থাকে এ ধারণা অত্যন্ত ভুল । প্রেম-ভালোবাসা, সংসার, স্ত্রীমান্নীতিবোধ, পুরাতনের নঙ্গ নতুন প্রজন্মের দ্বন্দ্ব ইত্যাদি বিষয়গুলির ওপরও অজস্র ছবি হয়ে থাকে, এছাড়া তার রূপদী সাহিত্যকে এবং অত্যন্ত সমৃদ্ধ কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যকে ছায়া-চিত্রে রূপ দেবার ব্যাপারতো আছেই । সোভিয়েত চলচ্চিত্রের বৈচিত্র্য তার বৈচিত্র্যময় জীবনযাত্রার মতোই বহুমুখী । তা নাহলে, পৃথিবীর চলচ্চিত্র জগতে তার স্থান প্রথম সারিতে হত না । চলচ্চিত্র বিষয়ে রচনা ও গবেষণার ক্ষেত্রেও সোভিয়েত রাশিয়ার অনবদ্য অবদান রয়েছে । যে প্রসঙ্গে কুলেশভ, আইজেন-স্টাইন, পুদভকিন, ভের্তভ থেকে আধুনিক কালের কারামাজভ পর্যন্ত অনেকের তুমিকাই উল্লেখযোগ্য । অভিনয় ও পরিচালনা ছাড়া চলচ্চিত্রের অস্বাভাবিক শাখাতেও রাশিয়ানদের কৃতিত্ব প্রথম শ্রেণীর । যেমন চিত্রগ্রহণে Tisse বা Moskvin. সংগীতে সোস্টাকোভিচ বা ষ্ট্র্যাভিনস্কি । এবং অ্যানিমেটেড ও শিশুদের জন্য ছবি ।

সমাজতন্ত্রের সংকটের পর বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়ন রাশিয়ান ফেডারেশন ও বিভিন্ন স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে গেছে । এই রাজনৈতিক-আর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক ভাষাভাষে চলচ্চিত্র কোন্‌খানে কোন্‌ পথে যাবে তা একমাত্র ভবিষ্যতেই বলা যাবে ।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : T. Dickinson ও C. de la Roche-র সোভিয়েত সিনেমা । এন. জোরকায়া-র সোভিয়েত সিনেমা টুডে ।

বিপ্লব মাজী

॥ স্টিকার ॥

১৯৮০, সোভিয়েত ইউনিয়ন । অর্ধে তারকোভ্‌স্কির কল্পবিজ্ঞানচিত্র । প্রখ্যাত সোভিয়েত লেখক স্লুগাৎস্কি ভ্রাতৃত্বের কাহিনী অবলম্বনে এই ছবি কল্পবিজ্ঞান চিত্রের চেয়ে অধিক কিছু, এক আধিবিদ্যক চিত্র যা বেশ কিছুটা আধ্যাত্মিকও

বটে। ছবির সময়কাল কোনো কাল্পনিক ভবিষ্যত, স্থান পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলস্বরূপ সৃষ্ট এমন এক অঞ্চল যেখানে অদ্ভুত-অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে থাকে। ছবির নায়ক, একজন গাইড, এই রহস্যময় অঞ্চলে যায় দুজন অভিযাত্রীকে নিয়ে, যার কাল্পনিক এক 'স্বপ্নের যন্ত্র'কে সেখানে পরীক্ষা করে দেখতে। যে যাত্রা শেষ-পর্যন্ত হয়ে ওঠে বিচ্ছিন্নতা, মানবিক শূন্যতা ও দৈতসত্তার ভিতর অভিযান ও অনুসন্ধান। কল্পবিজ্ঞানচিত্র হলেও এই ছবি ভীষণভাবে সমকালীন কিছু নৈতিক সমস্যাকে তুলে ধরে। ফলে স্পীলবার্গের কল্পবিজ্ঞানচিত্র ( যাকে বলা হয়েছে 'escape into fantasy' ) থেকে তারকোভ্‌স্কির কল্পবিজ্ঞানচিত্র সোলারিস বা স্টকার অনেকটাই আলাদা, এগুলি দার্শনিক চিত্রভাণ্ড, মানবজীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষের চিরন্তন দার্শনিক জিজ্ঞাসার অপরিহার্য অংশ। বিশেষত স্টকার বাস্তব ও কল্পনা, লিরিকাল ও এপিক, বিশ্বজগৎ ও মনোজগৎ এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সমন্বয়ে বার্গম্যানের ছবির মতোই অভিযাত্রী। স্টকার-এর নায়ক সম্পর্কে বলা হয়েছে এরকম বিষয় নায়ক পর্দায় অল্পই দেখা গেছে ( যেটা বিশ্বাসের কিছু নয়, কেননা প্রথমত স্বপ্নের অনুসন্ধান মানুষ ব্যর্থ হতে বাধ্য, দ্বিতীয়ত মানুষ হিশেবে তারকোভ্‌স্কি নিজে ছিলেন আবেগপ্রবণ ও সহজেই বিষণ্ণতার শিকার, আর তৃতীয়ত রুশীয় বিবাদ তো এক জাতীয় বৈশিষ্ট্যই ), তবু ছবির সমাপ্তিতে শেষ-পর্যন্ত মানুষের চারিত্রশক্তিই জয় হয়, গভীর হতাশার অতল থেকে উঠে আসে নানান মানবিক গুণাবলীর জন্ত মানুষের গভীর আকুলতা। এখানেই স্টকারের ভাৎপর্য ও গুরুত্ব।

অভিনয় A. Kaidanovsky, Grinko, Solonitsin ; চিত্রগ্রহণ A. Knyazhinsky, প্রোডাকশন ডিজাইন তারকোভ্‌স্কি ॥

॥ জোসেফ ফন স্টার্নবার্গ ॥

( ১৮৯৪-১৯৭০, মার্কিন চিত্রপরিচালক )। অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে তাঁর জন্ম। ১৯০৮ সালে জোসেফ যখন চোদ্দ বছরের কিশোর বালক স্টার্নবার্গদের পরিবারটি তখন স্থায়ীভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসে বসবাস করতে থাকে। ১৯১৪ সালে কুড়ি বছরের জোসেফ স্টার্নবার্গ নিউ ইয়র্কে ওয়াল্ড ফিল্ম কোম্পানীতে একটি কাজ পায় ফিল্ম কাটাকুটি করবার। ফিল্ম সম্পাদনার প্রাথমিক কিছু কামদা-কালু শিখে নেবার পর স্টার্নবার্গকে ওয়াল্ড ফিল্ম কোম্পানী উইলিয়াম ব্র্যাডির অধীনে সম্পাদক ও সহকারী পরিচালকের কাজ দেয়।

ইতিমধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং স্টার্নবার্গ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বিভাগে 'আর্মি সিগন্যাল কোর'-এ ক্যামেরাম্যানের কাজে যোগ দেন। যুদ্ধ শেষ হবার পর বেশ কয়েক বছর বরে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইংল্যান্ডে বিভিন্ন চলচ্চিত্র পরিচালকের অধীনে সহকারীর কাজ করেন। ধৈর্য বরে চলচ্চিত্র পরিচালনার পদ্ধতি শিখে নেবার পর চলচ্চিত্র পরিচালনার কাজে তিনি স্থায়ী ভাবে যোগ দেন। তাঁর পরিচালিত প্রথম নির্ধাক ছবি 'দি স্মালভেশন হাটার্স' ( ১৯২৫ )। খুব অল্প টাকার মধ্যে এই ছবিটি তুলতে হবে বলে স্টার্নবার্গ মাথা খাটিয়ে নানারকম নতুন নতুন পন্থা আবিষ্কার করেন।

তাঁর দ্বিতীয় ছবি মেট্রো গোল্ডউইন মেয়ার কোম্পানীর হয়ে 'দি এক্সকুইসিট দিনার'। তা ফিলিপ রোসেন নামে আর একজন পরিচালককে দিয়ে পুনর্নির্মিত করানো হয়। স্টার্নবার্গের জীবনের তৃতীয় ছবির নাম 'দি মাস্কড্ আইড'—কিন্তু এটিও তুলতে তুলতে অভিনেতাদের সঙ্গে তাঁর ঝগড়াঝাটি হয়ে যায় এবং পরিণামে এম. জি. এম. কোম্পানী স্টার্নবার্গকে বাতিল করে দিয়ে ষ্টি ক্যাবানে নামে আর একজন পরিচালককে দিয়ে ছবির বাকী কাজটুকু শেষ করান। এর পরে তাঁকে একটি স্বেযোগ দিলেন দি গ্রেট চার্লি চ্যাপলিন। এডনা পারভিয়ানসকে নায়িকা করে স্টার্নবার্গের পরিচালনায় 'দি সীগাল' ( ১৯২৬ ) নামে এই ছবিটি কোনোদিন মুক্তিই পেল না।

একের পর এক এই রকম বাধাবিপত্তিতে স্টার্নবার্গের পক্ষে প্রতিষ্ঠিত হওয়া খুবই কষ্টকর হয়ে উঠছিল। তখন তাঁকে স্বেযোগ দিলেন প্যারামাউন্ট কোম্পানি। ১৯২৭ সালে তিনি তুললেন একটি বিখ্যাত ছবি 'আওয়ার ওয়াল্ড'। প্রযোজক প্যারামাউন্ট ছবিটি দেখে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না এবং অত্যন্ত হেলাফেলা করে এটিকে মুক্তি দেওয়া হলো। কিন্তু ছবিটি দর্শক মহলে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে পড়ল এবং পরিচালক হিসেবে স্টার্নবার্গ পায়ের নিচে কিছুটা মাটি পেলেন। চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এই ছবিটিকেই বলা চলে প্রথম 'গ্যান্ডস্টার ফিল্ম'। স্টার্নবার্গ ষোট ষতগুলি নির্ধাক ছবি তুলেছিলেন তাঁর ভেতর এই ছবিটিই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ছবির গল্পটি দৃঢ়-সংবদ্ধ এবং আবেগের প্রকাশ অত্যন্ত সংযত। পরের ছবি 'দি লাস্ট কমান্ড' ( ১৯২৮ )ও কাহিনীর বৈশিষ্ট্য এবং পরিচালনার গুণে দর্শকদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই ছবির গঠনরীতিতে একই সঙ্গে বিভিন্ন স্টাইলের প্রয়োগ করা হয়েছিল। বিক্রপ ও রূপকের সুন্দর ব্যবহার ছবিটিকে অরণীয় করে রেখেছে। ঐ একই বছরের আর একটি ছবি 'দি ড্রাগ নেট'-এরও

চিত্রধর্মিতা এবং ডিটেল রচনার কাজ অত্যন্ত উঁচু দরের। পরের ছবি 'দি ডকস অফ মিউ ইয়র্ক'ও প্রয়োগনৈপুণ্যে যথেষ্ট উচ্চমানের। স্টার্নবার্গ পরিচালিত শেষ নির্বাক ছবি 'দি কেস অফ লেনা স্মিথ' (১৯২৯)।

নির্বাক যুগের সমাপ্তির সাথে সাথেই স্টার্নবার্গকেও তাঁর চিত্রধর্ম-সর্ব্ব আঙ্গিক কিছুটা বদলাতে হলো, এবং তিনি তাঁর প্রথম সবাক ছবি 'দি ব্লু অ্যাঞ্জেল' (১৯৩০) তুললেন। ছবিটি জার্মানি (ড্র.)-তে তোলা হয়। এমিল জেনিংস (ড্র.) ও মালিন ডীট্রিশের (ড্র.) অসাধারণ অভিনয়ের জন্তু এই ট্রাজেডি ফিল্মটি প্রতুত আর্থিক দক্ষল্য অর্জন করে। এই ছবিতে অভিনয়ের দৌলতেই ডীট্রিশ পরবর্তী-কালে হলিউডের একজন জনপ্রিয় অভিনেত্রীতে পরিণত হন; স্টার্নবার্গ নিজেও তাঁর পরের ছয়টি ছবিতে ডীট্রিশকে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করান। এই ছবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'মরক্কো' (১৯৩০) এবং 'দি ডেভিল ইজ এ ওয়ান' (১৯৩৫)।

আলো এবং ছায়ার কৌশলপূর্ণ প্রয়োগের দ্বারা ইমেজ বা চিত্রকল্প রচনাতে স্টার্নবার্গের দক্ষতা ছিল অসাধারণ। পরবর্তীকালে তাঁর 'দি ব্লু অ্যাঞ্জেল' ছবিটির প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে সুইডেনের স্বনামধন্য চলচ্চিত্র পরিচালক ইঙ্গমার বার্গম্যান রচিত 'ফ্রেঞ্জি' (১৯৪৪) ছবির চিত্রনাট্যে। ১৯৩১ সালে প্যারামাউন্ট কোম্পানি সোভিয়েত রাশিয়ার যুগান্তকারী পরিচালক সের্গেই আইজেনস্টাইনকে থিয়োডর ড্রেজারের উপস্থান 'দি আমেরিকান ট্রাজেডি' অবলম্বনে একটি দিনেমা তুলবার দায়িত্ব দেন। কিন্তু আইজেনস্টাইন রচিত চিত্রনাট্যটি প্রযোজকের পছন্দ হলো না। তাঁরা তখন স্টার্নবার্গকে ছবিটি তুলতে বলেন। ছবিটি তোলা শেষ হয়ে গেলে ড্রেজার দিনেমাটি দেখে অদম্বষ্ট হন এবং এই ছবির কাহিনীকার হিশেবে তাঁর নাম প্রত্যাহার করে নেন। আইজেনস্টাইনের প্রতি শ্রদ্ধা ও মহানুভূতিবশত কিছু দর্শক ও সমালোচকও এই ছবিটির প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠেন।

যদিও হলিউডের প্রযোজকদের সৃষ্টি করা প্রথার বিরুদ্ধে স্টার্নবার্গ কখনোই সরাসরি বিদ্রোহ করেননি, তবুও প্রযোজকদের কাছে তিনি পুরোপুরি বশুতাও স্বীকার করেননি। যেহেতু তাঁর নিজস্ব অনুভব-শক্তি ও কল্পনার ভিতর কিছুটা মৌলিকতা ছিল সেই জন্তু হলিউডের প্রথার মধ্যে থেকেও তিনি কিছু কিছু নতুন চিন্তাভাবনার স্বাক্ষর রেখে যেতে পেরেছেন।

১৯৫৫তে রচিত একটি প্রবন্ধে হলিউডের চলচ্চিত্র সম্পাদনার রীতিকে স্টার্নবার্গ তীব্র সমালোচনা ও বিদ্রূপ করেছেন। চলচ্চিত্রে অভিনেতার ভূমিকা

সম্বন্ধেও স্টার্নবার্গ তাঁর ঐ প্রবন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। জোসেফ ফন স্টার্নবার্গ সম্ভবত ছিলেন এমন একজন চলচ্চিত্রকার যার প্রতিভা ছিল, কিন্তু সেই প্রতিভাকে বিকশিত করবার জন্ত খুব বেশি স্বযোগ তিনি পাননি। আর শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের চরিত্র সম্বন্ধেও তাঁর ধারণা ছিল নিতান্তই অপরিণত।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : John Baxter-এর দি সিনেমা অব জোসেফ ফন স্টার্নবার্গ।

রজত রায়

॥ এরিক ভন স্ট্রহাইম ॥

( ১৮৮৫-১৯৫৭ )। স্ট্রহাইম অভিনেতা ও চিত্রপরিচালক, জন্ম অস্ট্রিয়ায়। বাবার কুটিরশিল্পের কারখানায় তিন বছর বয়সে স্থপারভাইজার হিসেবে কাজ শুরু করেন, পরে অস্ট্রো-হাঙ্গেরীর সৈন্ত-বাহিনীতে কিছু দিনের জন্ত যোগ দেন। ১৯০৬ থেকে ০৯-এর মধ্যে কোনো এক সময়ে আমেরিকা চলে আসেন। হলিউডে উপস্থিত হন ১৪-য়। গ্রিফিথের কোম্পানীর একজন নিয়মিত সদস্য করা হয় তাঁকে। পরে অল্পদের বহু ছবিতেও অভিনয় করেন। উল্লেখযোগ্য অভিনয়ের মধ্যে রয়েছে ব্লাইও হাজব্যাণ্ড্‌স, ফুলিশ ওয়াইভ্‌স, রেনোয়ার দি গ্র্যাণ্ড ইন্যুশন, ফাইভ গ্রেভ্‌স টু কাঙ্করো, Sunset Boulevard, নেপোলিয়ন। কিছুটা টাইপ চরিত্রে অভিনয় করতেন তিনি, চাপা শীতল ঈষৎ-নিষ্ঠুর প্রেশিয়ান অফিসারের চরিত্রে, যার সম্পর্কে সিনেমার বিজ্ঞাপনে লেখা হতো : যে মাত্রষটাকে ঘৃণা করতে ভালোবাসেন আপনারা ! চিত্রপরিচালক রূপে তিনি ছিলেন আনুসঙ্গিকপ্রমাইজিং। প্রথম ছবি ব্লাইও হাজব্যাণ্ড্‌স ( ১৯ ) নিজের গল্প অবলম্বনে, ত্রিকোণ প্রেম ও যৌনতার অভিনাটকীয় কাহিনী। ত্রিকোণ যৌনতা পরের দুটি ছবিরও [The Devil's Passkey ( ১৯ ) ও ফুলিশ ওয়াইভ্‌স ( ২১ )] কেন্দ্রীয় বিষয়। তিনটে ছবিই কৃষ্ণশীল অভিধাত, নিখুঁত ডিটেল, বিরল লোকেশন, তীক্ষ্ণ মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ ও অত্যধিক দৈর্ঘ্যে চিহ্নিত। শেষোক্ত বৈশিষ্ট্যের জন্ত তাঁর ছবি শেষ করতে অনেক সময় লাগত, ও স্বাভাবিক ভাবে খরচও বেড়ে যেত। তা এড়াবার জন্ত ছবির প্রযোজকরা প্রায়ই তাঁর ছবির চূড়ান্ত সম্পাদনার দায়িত্ব অল্পকে দিয়ে দিতেন। এর চরম ও ট্রাজিক উদাহরণ হয়ে আছে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্র গ্রীড ( ২০ ) ( ড্র. )। ব্যয়সাপেক্ষ কর্মপদ্ধতির জন্ত তাঁকে বলা হয়েছিল Stroheim। অপেরা থেকে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করে তিনি পরের ছবি করলেন, দি মেরি উইভো ( ২৫ ), ধর্মকাম বিকৃতি ব্যাভিচারের বর্ণনা সহ এক উন্নত ব্ল্যাক কমেডি। অবশ্যের এই

চিত্র পরের ছবি দি ওয়েডিং মার্চ ( ২৭ )-য়েও স্পষ্ট, অতিরিক্ত দৈর্ঘ্যের জন্ত বা দুই পর্বে মুক্তি পায়। স্ট্রাইমের শৈলী ছিল সন্দেহাতীত ভাবে নিজস্ব, তা অতিনাটক ও স্বাভাবিকতা, আর রোমান্স ও নিরাশার পাশাপাশি অবস্থান, আবার ধ্রুপদী দৃষ্টিকোণ আর মানসিক অহুপুষ্টি, আর বিস্তার ও পরিমিতির সার্থক সমন্বয়ে নিখুঁত বাস্তববাদী ও শিল্পগত ভাবে অভিব্যক্ত। সিনেমায় শব্দের সম্ভাবনাকে তিনি চমৎকার অহুমান ও অহুভব করেছিলেন কিন্তু কোনো দবাক চিত্র সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। কেননা ওয়েল্দের মতো তাঁকেও হলিউডের পেশাদার জগৎ থেকে শেষ পর্যন্ত সরে আসতে হয়। তখন তিনি অভিনয় করেছেন, অণ্ডের ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন, আর তিনটে উপস্থাস।

অণ্ডাণ্ড ছবি : মেরি গো রাউণ্ড ( ২২ ), কুইন কেলী ( ২৮ )।

সম্পর্কিত গ্রন্থ : J. Finler-এর স্ট্রাইম।

## ॥ স্ট্রাকচারালিজম ॥

আধুনিক সাহিত্য ও শিল্পকলার আলোচনায় স্ট্রাকচারালিজম বা সংগঠনবাদ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। যাটের দশকে ফ্রান্সে সংগঠনবাদ ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় এক যুগান্তকারী দৃষ্টিকোণ উপস্থাপিত করে যা অল্প সময়ের মধ্যে শিল্প-সংস্কৃতির অণ্ডাণ্ড বিভাগেও রীতিনীতে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। তব্ব হিণ্ডাবে সংগঠনবাদ অত্যন্ত দুর্গহ, জটিল এবং বিভক্তিত বিষয়। সংগঠনবাদের মূল প্রতিপাত্ত হচ্ছে এই যে ভাষা নহ মানুষের যাবতীয় শিল্প এবং মনন প্রক্রিয়া যদিও আপাতভাবে সহজাত, স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত বলে মনে হয় প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে এক ধরনের নিম্নিত মাত্র। প্রতিমার বাইরের রূপের প্রকারভেদ থাকলেও যেমন ভেতরকার কাঠামোর এক স্থনির্দিষ্ট সাংগঠনিক চরিত্র রয়েছে ভাষা ও শিল্প প্রক্রিয়ার মধ্যেও একইভাবে এক অস্থনির্হিত সাংগঠনিক কাঠামো রয়েছে এবং এটা কোনো প্রাকৃতিক ভাবে অর্জিত বৈশিষ্ট্য নয়—এটা তৈরি করা হয়েছে, এটা এক ধরনের নিম্নিত বা কনস্ট্রাকশন। সংগঠনবাদের শিকড় রয়েছে ভাষাতত্ত্বের গভীরে এবং শিল্প এবং চলচ্চিত্রের আলোচনায় সংগঠনবাদের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ হয়েছে এবং হচ্ছে ভাষাতত্ত্বের আলোচনার সূত্র ধরেই। ফরাসি তাত্ত্বিক ফার্দিনান্দ স্যসুর যদিও নিজে কখনো 'সংগঠনবাদ' কথাটি ব্যবহার করেননি সংগঠনবাদের প্রবক্তাদের কাছে স্যসুরের দেওয়া অনেক তাত্ত্বিক ধারণা এবং প্রস্তাবনার খুবই গুরুত্ব রয়েছে। চলচ্চিত্র আলোচনায় সংগঠনবাদের ভূমিকা

আলোচনা করার আগে সেইজন্ম কয়েকটি মূল পরিভাষা (টার্ম) বুঝে নেওয়া দরকার। ভাষা বলতে আমরা সাধারণভাবে যা বুঝি স্যম্বর তাকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন : ল্যাঙ (ফরাসি শব্দ) বা ভাষাপদ্ধতি এবং প্যারল বা বচন। বচন বলতে স্যম্বর বোঝাতে চেয়েছেন ভাষার ব্যবহারিক রূপ—যেভাবে আমরা ভাষাকে চিনি, জানি, বুঝি এবং প্রয়োগ করি। ভাষাপদ্ধতি হচ্ছে ভাষার নৈর্ব্যক্তিক ও সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য—যে বৈশিষ্ট্য (অনেকটা ব্যাকরণের মতো, কিন্তু আরো গভীর এবং আকারহীন) শুধুমাত্র ভাষার বাচনিক প্রয়োগের মধ্যে দিয়েই অনুধাবন করা সম্ভব। চম্‌স্কি একইভাবে ভাষার কমপিটেন্স্ (পারদর্শিতা) এবং পারফরমেন্স্ বা প্রয়োগ সম্পর্কে বলেছেন। চম্‌স্কি বলেছেন যে ভাষার অন্তর্নিহিত এক 'ডিপ স্ট্রাকচার' বা গূঢ়-সংগঠন কথ্য ভাষার বিবিধ ও বৈচিত্র্যময় প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে নির্দিষ্ট বক্তব্য প্রকাশ করতে সাহায্য করে। উদাহরণ হিসাবে ভাষার এই দুটি ভিন্ন প্রয়োগ বা বচন দেখা যেতে পারে : ১. 'আমি এ কাজ করতে পারবো না'; ২. 'আমার দ্বারা এ কাজ হবে না'। বাক্য দুটির শব্দ সংগঠন আলাদা হলেও কিভাবে এরা একই বক্তব্য পেশ করছে? চম্‌স্কির মতে বাক্য-দুটির দুটি বাহ্যিক সংগঠন থাকলেও এদের একটিমাত্র গূঢ়-সংগঠন রয়েছে এবং সেইজন্ম দুটি ভিন্ন বাক্য একই অর্থ বহন করছে। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে সংগঠনবাদীরা প্রথমত চলচ্চিত্রকে 'ভাষা' হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। সামগ্রিকভাবে চলচ্চিত্র যদি ভাষা হয় তাহলে প্রতিটি পৃথক ছবিকে 'প্যারল' বা বচন বলা যেতে পারে। একইভাবে 'বচন' পর্যালোচনার মধ্যে দিয়ে আমরা চলচ্চিত্রের 'ভাষা-পদ্ধতি' বা 'ল্যাঙ'-সম্পর্কে ধারণা পেতে পারি। একইভাবে স্যম্বর আরো কিছু পরিভাষা ব্যবহার করেছিলেন যা চলচ্চিত্র আলোচনায় প্রায়ই ব্যবহৃত হয় : সাইন (চিহ্ন), সিগ্‌নিফায়ার (সূচক), সিগ্‌নিফায়েড (সূচিত) ইত্যাদি। সংগঠনবাদের একটি উপধারা সেমিওটিক্ (ড্র.) বা চিহ্নতত্ত্ব দ্রুত একটি স্বতন্ত্র তাত্ত্বিক ধারা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্যম্বর প্রদত্ত উপরোক্ত পরিভাষা ও তাদের তাত্ত্বিক অবস্থানকে আরো পরিবর্তিত করে। ভাষাতত্ত্বের চর্চায় সংগঠনবাদ সচেতনভাবেই ভাষার বিবর্তন, ভাষার সামাজিক ইতিহাস, ভাষার দর্শন ইত্যাদিকে সরিয়ে রেখে ভাষার নৈর্ব্যক্তিক সংগঠন ও নির্মিতির স্বতন্ত্রস্বত্বানু নিয়োজিত হয়। অতভাবে বলতে গেলে একটি বিশেষ বচন (অথবা একটি শিল্পবস্তু বা কোনো নির্দিষ্ট চলচ্চিত্র) 'ঠিক কি বলতে চায়?' তা জানতে না চেয়ে 'ঠিক কিভাবে বলতে চেয়েছে?' তা জানতে চায়। আর, ঠিক এই কারণেই সংগঠনবাদকে কঠোর সমালোচনার

মুখোমুখি হতে হয়েছে। চলচ্চিত্র আলোচনায় সংগঠনবাদ ঠিক কি ভূমিকা পালন করে? সংগঠনবাদ দেখাতে চায় একটি চলচ্চিত্রের বাহ্যিক রূপটি কিভাবে তার ভাষারীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, কিভাবে এই ভাষা-রীতি সংগঠিত হয়েছে এবং চলচ্চিত্রের অর্থ প্রকাশে কাজ করেছে। রুদ লেভি-স্ট্রাউস মিথ্ বা উপকথার পর্যালোচনায় এবং তাঁরও আগে ভ্লাদিমির প্রপ রুশ রূপকথার বিশ্লেষণে সংগঠনবাদের সাহায্য নেন। লেভি-স্ট্রাউস দেখান যে মিথ্ আদলে একাধিক ছোটো ছোটো সম্পর্কের সূত্রে গাঁথা। উপকথার সংগঠনে এই সম্পর্কগুলো ঠিক ভাষারীতির মতোই কাজ করে। উদাহরণ হিসাবে লেভি-স্ট্রাউস আদিম উপজাতি সমাজের নানা ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকার কথা বলেন এবং দেখান যে কিভাবে নারীর নানা ভূমিকা সাংগঠনিকভাবে একই শব্দের নানা প্রয়োগের সমতুল্য। প্রয়োগরীতির ভিন্নতার জন্য একটি শব্দের যেমন অর্থ পরিবর্তিত হতে থাকে আদিম উপজাতি সমাজে 'নারীর' অর্থ বদলে যেতে থাকে তার সামাজিক অবস্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। প্রপ রূপকথার আলোচনায় দেখান যাবতীয় রূপকথা কিছু স্থনির্দিষ্ট সম্পর্ক-মালার ভিন্ন ভিন্ন সংগঠন ছাড়া আর কিছুই নয়। একইভাবে সংগঠনবাদ এক সামগ্রিক ভাষারীতির কথা বলে যা একান্তভাবেই চলচ্চিত্রের নিজস্ব, যা যে কোনো চলচ্চিত্রকেই টেক্সট বা 'পাঠ' হিসাবে গণ্য করে এবং এক 'টেক্সচুয়াল দিস্টেম' 'পাঠগত পদ্ধতি'র বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে চলচ্চিত্রের সাংগঠনিক গুরুত্বকে স্পষ্ট করে তোলে। সত্তরের দশকে সংগঠনবাদ তিনটি আলাদা ধারায় ভাগ হয়ে যায় : দেমিওটিকস্ বা চিত্রতত্ত্ব, ডিকনস্ট্রাকশন বা অবগঠন এবং পোস্ট-স্ট্রাকচারালিজম বা অধি-গঠনবাদ। [ 'চিহ্নবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রমশ আরো বিদগ্ধ আলোচনা হচ্ছে। স্ট্রাকচারালিজম, ডি-কনস্ট্রাকশন ও সাইবারনেটিক্সের নানা প্রয়োগপদ্ধতির তত্ত্ব মানবিকী বিচ্যাবলিকেও গ্রাস করতে চাইছে। প্রদঙ্গ বা বিষয়ের দিকে অতীতে যে বাড়তি ঝোঁক পড়েছিল অনেকটা তার প্রতিক্রিয়া হয়েই বর্তমানে গঠন পদ্ধতির উপর অতিরিক্ত জোর পড়েছে। তা হলেও যোগাযোগপ্রসূত চলচ্চিত্র কখনোই বক্ষ্যা, বিচ্ছিন্ন ও অপ্রকাশ্য কিছু নয়।' ]

বীরেন দাশশর্মা

॥ স্থান-কাল চেতনা ॥

বাস্তবে সবকিছু স্থান ও কাল, এই দুয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। চলচ্চিত্রেও কালকে ধরে রাখতে হয় স্থানের আধারে। চলচ্চিত্রের স্থান ও কাল বাস্তব স্থান-কাল

থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হলেও, চলচ্চিত্র ও স্থানচেতনা ও কালচেতনা (ড্র.) উভয়ের দ্বারা চালিত, কাল ও স্থান পরস্পরে সম্পৃক্ত, সংশ্লিষ্ট ও অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, পরস্পরের বিনিময় ও অল্পবাদ-যোগ্য। বাস্তবের ত্রিমাত্রিক স্থান (space) চলচ্চিত্রে প্রদর্শিত হয় দ্বিমাত্রিক রূপে, স্থানের এই রূপারোপ আবার ফ্রেমের গভীরতা ও আলোকসম্পাত, আর ফ্রেমের অন্তর্গত মূল ইমেজের প্রতি ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ ও ইমেজের আকারের ওপর নির্ভরশীল। বাস্তবের স্থান সিনেমায় মাত্রাগতভাবে কিছুটা সীমায়িত হয়ে গেলেও স্থান থেকে স্থানান্তরে অনায়াস গমন এবং ক্যামেরা মুভমেন্টের (যা স্থানকে সঞ্চক করে ও সময়কে করে সংক্ষিপ্ত) মাধ্যমে অবস্থানান্তরপাতের দ্রুত পরিবর্তন ও সম্পাদনার মাধ্যমে স্থানিক ধারা-বাহিকতা ও বৈচিত্র্যের ফলে গুণগত ভাবে তা উন্নততর। চলচ্চিত্রে যে শুধু এক মুহূর্তে এক স্থান থেকে অল্প স্থানে চলে যেতে পারে তা-ই নয়, একই মুহূর্তে উপস্থিত থাকতে পারে একাধিক স্থানেও।

বাস্তবে আমরা concrete space ও concrete time নিয়ে কাজ করি। সিনেমায় কিন্তু স্থান ও কাল উভয়কেই বিভাজিত, প্রসারিত, সংকুচিত, ধারা-বাহিকতা-বর্জিত যা ইচ্ছে করা যায়। এবং স্থানের যে কোনো ম্যানিপুলেশনের সঙ্গে কালের যে কোনো ম্যানিপুলেশনকে সমন্বিত ও করা যায়। খুব অল্প সময়ের কোনো অ্যাকশনকে চরম স্লো মোশনে অনেকগুলি ফ্রেম ছুড়ে দেখিয়ে কালকে স্থানে রূপান্তরিত করা ও চরম কুইক মোশনের সাহায্যে স্থানকে কালে অল্পবাদিত করাও সম্ভব। চলচ্চিত্রে প্রতিটি একক শটের নিজস্ব স্থান-কাল চেতনা, আবার একটি নির্দিষ্ট অংশের সমস্ত শট মিলিয়ে সামগ্রিক স্থান-কাল চেতনা। প্রথমটি মূলত ক্যামেরা দ্বারা ও দ্বিতীয়টি ক্যামেরা ও সম্পাদনা উভয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সম্পাদনা যখন একটা শটের সঙ্গে আরেকটা শটকে সংযুক্ত করে তখন উভয়ের স্থান-কাল পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল বা নিরপেক্ষ যে কোনোটা হতে পারে। সিনেমা সাধারণত বিভিন্ন স্থানের অংশবিশেষকে সময়ের ক্রমানুসারে সাজিয়ে দেয়, সংযোগ নিখাদ বাস্তব, মনস্তাত্ত্বিক ধারাবাহিকতা বা কনসেপ্ট ধর্মী যে কোনোটা হতে পারে। আবার সিনেমায় যা ঘটছে সবই 'বর্তমানে' ঘটছে (ড্র. নাটক ও চলচ্চিত্র), ফলে বিভিন্ন কালকে বর্তমানে সংঘটিত দৃশ্যের অর্থাৎ স্থানের মাধ্যমে রূপ দেওয়া হচ্ছে। এইভাবে চলচ্চিত্রে স্থান ও কাল অচ্ছেদ্য স্থান-কাল চেতনায় আবদ্ধ এবং উভয়ই বিমূর্ত গুণের অধিকারী (আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদে যেমন)। অবশ্য এই স্থান-কাল চেতনা চলচ্চিত্রের একেবারে নিজস্ব চেতনা, বাস্তব থেকে স্বতন্ত্র,

আরো বেশি বিখ্যাত ও কখনো কখনো উন্নততর, যার দর্বাশ্রেষ্ঠ উদাহরণ মনতাজ-  
তবে (ঙ.) ।

## ॥ স্টিভেন স্পীলবার্গ ॥

জন্ম ১৯৪৭, ইহুদী বংশজাত মার্কিন চলচ্চিত্র প্রযোজক ও চিত্র পরিচালক ।  
চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এমন কয়েকজন চলচ্চিত্রকার এনেছেন যাদের মাধ্যমে  
চলচ্চিত্রের গুণ মাত্রাগত নয়, ষাতগত পরিবর্তন ঘটেছে । যেমন গ্রিকিথ । যেমন  
আইজেনস্টাইন । যেমন গদার । তেমনই একজন চলচ্চিত্রকার স্টিভেন স্পীলবার্গ ।  
একথা যদি সত্যি হয় যে, চলচ্চিত্র কাজ করে শিল্প, বিজ্ঞান ও তৃতীয় আর কিছুকে  
নিয়ে, তবে সেই তৃতীয় সত্তা গদারের বেলায় হলো রাজনীতি, বার্গম্যানের বেলায়  
দর্শন, আইজেনস্টাইনের বেলায় নান্দনিকতা । আর স্পীলবার্গের ক্ষেত্রে তা হলো  
প্রযুক্তি । বস্তুত কম্পিউটার গ্রাফিক্স, ডিজিটাল টেকনোলজি ও সাইবারনেটিক্সের  
মতো প্রযুক্তিকে তিনি এত বিচিত্র ও ব্যাপক ভাবে চলচ্চিত্রে প্রয়োগ করেছেন  
যে, ‘ছ ফ্রেম্‌ড্‌ রজার র্যাবিট’ ও ‘স্কুরাদিক পার্ক’-এর মতো ছবিতে সম্পূর্ণ  
গাণিতিক ও প্রায়ুক্তিক ভাবে প্রকল্পিত রূপকল্পের সামনে দাঁড়িয়ে এই প্রশ্ন  
ওঠে যে, এই প্রকার দৃশ্যকল্পের ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের নন্দনতব কীভাবে ও কতটা  
প্রযুক্ত হব । একদিকে তিনি মুভি ম্যাগনেট য়ার একটার পর একটা ছবি  
সর্বকালের সবচেয়ে জনপ্রিয় ছবিগুলির মধ্যে নিজেদের স্থান করে নিয়েছে,  
অন্যদিকে তিনি এক স্বপ্রদ্রষ্টা শিল্পী যিনি দৃশ্যাদম্বর, প্রযুক্তি ও ম্যাজিককে মিলিয়ে  
মিশিয়ে এমন এক চিত্রভাষার সৃষ্টি করেছেন যা চলচ্চিত্রকে তার অপহৃত জনপ্রিয়তা  
ফিরিয়ে দিয়েছে ।

তঁার জন্ম হয় ওহিওতে, বাবা ছিলেন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, প্রথম  
কম্পিউটার তৈরি করেন য়ারা সেই যন্ত্রবিজ্ঞানীদের একজন, মা পিয়ানোবাদিকা,  
কনসার্টে অংশ নিতেন । বিজ্ঞান ও শিল্পের সহাবস্থান তঁার জীবনে শৈশব থেকেই ।  
ছেলেবেলাটা পরিবারের সঙ্গে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে ঘোরাঘুরিতে  
কেটেছে তঁার, স্কুলের পড়াশুনোয় ব্যাঘাত ঘটেছে । স্কুলের শেষ পরীক্ষায় শাদামাটা  
ফলের দরুন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চলচ্চিত্র বিভাগে ভর্তি হবার সুযোগ  
মেলেনি । কিন্তু বাবার কিনে দেওয়া হোম মুভি ক্যামেরায় ও পরে অ্যামেচার  
কোডাক ক্যামেরায় তিনি একেবারে ছোটবয়স থেকেই নিজের খুশি মতো ছবি  
বানাতেন । চার বছর বয়সে দি গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ দেখতে গিয়ে স্পেশাল

ইফেক্টের যে বিস্ময় তাঁকে পেয়ে বসেছিল সেই বিস্ময়বোধ ও রহস্যের প্রতি টান আর তাঁকে কোনদিন ছাড়েনি। তাঁর অধিকাংশ ছবিই কিছুটা বাস্তব, কিছুটা বিজ্ঞান, কিছুটা কল্পনা ও বাকিটা ফ্যানটাসি।

তাঁর প্রথম দিরিয়স ছবি স্বল্প দৈর্ঘ্যের চিত্র 'Amblin'—একাধিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত, যার ফলস্বরূপ ইউনিভার্সাল কোম্পানি তাঁর সঙ্গে সাত বছরের এক চুক্তি স্বাক্ষর করে। ২১ বছর বয়সে স্পীলবার্গ হয়ে ওঠেন হলিউডের তরুণতম চুক্তিবদ্ধ পরিচালক। তাঁর প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি 'ডুয়েল', টিভির জন্ম নির্মিত, পরে ইউরোপে হলে মুক্তিপ্রাপ্ত ও ব্যাবসায়িক ভাবে দারুণ সফল। ব্যাস, স্পীলবার্গ তাঁর পথ খুঁজে পেলেন। বাণিজ্যিক সাফল্য হয়ে উঠলো তাঁর প্রধান গুণ। প্রযোজক / পরিচালক রূপে তাঁর 'ক্লোজ এন্কাউন্টারস অব দি থার্ড কাইও' (৭৭), 'রেইডার্স অব দি লস্ট আর্ক' (৮১), 'জন্' (৭৫) [ সর্বকালের সবচেয়ে জনপ্রিয় ছবির তালিকায় অষ্টম স্থানাধিকারী ], 'ইণ্ডিয়ানা জোনস' লাস্ট ক্রুসেড' (৮৯) [ উক্ত তালিকায় পঞ্চম স্থানাধিকারী ], 'ই. টি.' (৮২) [ তালিকায় দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ] ও 'ছুরাসিক পার্ক' (৯০) [ প্রথম স্থানাধিকারী ] হলিউডকে দিল টিভি ও ভিডিওর কাছ থেকে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হওয়া এক কঠিন সময়ে স্থিতি ও ভারসাম্য। এই প্রদক্ষে জর্জ লুকাসের নামোল্লেখ করাও দরকার।

কিন্তু একথা অবশ্যই বলতে হবে যে, প্রায়ুক্তিক দক্ষতা ও বাণিজ্যিক সাফল্য ছাড়া অল্প গুণ ও বৈশিষ্ট্যও আছে তাঁর। আছে পূর্ণাঙ্গ জীবনের প্রতি টান ও গভীর জীবনানুভূতি ( তাঁর প্রথমা স্ত্রী Amy Irving, বর্তমান স্ত্রী Katy Capshaw, দুজনেই অভিনেত্রী, দত্তক পুত্র সহ চারটি সন্তান তাঁর ), তীব্র ইতিহাস-চেতনা ও প্রগাঢ় দায়িত্ববোধ ( বহু-প্রশংসিত ও অনেকগুলি অস্কার পুরস্কারে ভূষিত 'শিওলার্স লিন্ট'—যা হরর বা আতঙ্কের পাশাপাশি গভীর আশাবাদও তুলে ধরে ), প্রথম দিকে বিচ্ছিন্ন থাকলেও ক্রমেই সংহত রূপ পাচ্ছে এমন এক শিল্পদৃষ্টি ( যা গড়ে উঠেছে কল্পনা, উৎসাহ, রসবোধ ও মানবিকতা নিয়ে ) এবং গভীর আবেদনমূলক কাহিনীর মধ্য দিয়ে শিশুর দৃষ্টি ও বয়স্কের চেতনাকে মেলাতে পারার এক বিরল ক্ষমতা।

কোনো সন্দেহ নেই যে তিনি পর্দায় গল্প বলেন ও বলেন মস্তমুগ্ধ করে রাখার মতো করে, কিন্তু গল্পকথকের চাইতে বেশি তিনি, তিনি হলেন এক চরম অভিযাত্রী, যার অভিযান জলের অতলে, মহাশূন্যের অসীমে, মানবমনের গভীরে, বিনোদনের উন্মাদনায়। শুধু অভিযানের বাসনা নয়, রূপান্তরের আকাঙ্ক্ষাও তাঁর রক্তে, যা

এক জাহ্নকরী প্রবণতা, তাঁর নিজের ভাষায়, 'I have always felt like Peter Pan. I still feel like Peter Pan.' তাঁর নিজের ধারণা, পর্দার পক্ষে উপযুক্ত নাট্য হলো এমন কোনো কাহিনী যাতে নায়ক নিজের জীবন ও ঘটনা প্রবাহের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাবে ও নিজের চেষ্টায় আবার তা কিছুটা ফিরে পাবে। হিচককের ছবিতেও কাহিনীর বিকাশ অনেকটা এইভাবেই হয়ে থাকে। স্পীলবার্গের ছবিতে আমরা যা পাই তা হলো অসাধারণ সব ঘটনা সম্পর্কে সাধারণ মানুষজনের প্রতিক্রিয়া ও সেই সংক্রান্ত অ্যাকশন। তাঁর বহু ছবিতেই দেখা যায়, নায়কের ওপর বাইরের কোনো না কোনো শক্তি ক্রিয়াশীল। এটা যে তাঁর কোনো অতীন্দ্রিয় বা আধ্যাত্মিক বিশ্বাস থেকে হচ্ছে তা ততটা নয়, হচ্ছে মূলত অভিনয়ী স্মলভ মানসিকতা থেকে ('His extravagant adventures are escapes into fantasy.')

ডিজনির ম্যাজিক ও ফ্যানটাসিকে তিনি আরো জোরদার করে ফিরিয়ে এনেছেন সিনেমায়ে। আয়াতাই বলা হয়েছে, তাঁর মধ্যে সহাবস্থান ঘটেছে পিটার প্যানের হৃদয় ও আলফ্রেড হিচককের প্রকরণের, যার ফলে স্পীলবার্গের চিত্রলোক স্বপ্নলোক সদৃশ ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে অসাধারণ অভিনয়ী। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার, বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বিচার করলে, স্পীলবার্গের ছবি মূলগত ভাবে নৈতিক সমস্যার ছবি। সত্যজিতেরও তাই। কিন্তু স্পীলবার্গ সবদময়েই নীতিবাদী। সত্যজিৎ তা নয়।

ধীরে ধীরে কিন্তু অবধারিত ভাবে, বিগত কয়েক বছরের মধ্যে, স্পীলবার্গের রীতি সংহত চরিত্রায়ণ ও সমৃদ্ধ স্মারটভের দিকে গেছে। তাঁর নিজের মতে, এই পরিবর্তন শৈলীর দরুন নয়, বিষয়বস্তুর কারণে। স্নুদর ১৯৭৪ সনেই তাঁর 'সুগার-ল্যাও এক্সপ্রেস' ছবিতে চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু পরে এই সম্ভাবনা ও ক্ষমতাকে আর তেমন কাজে লাগাননি। অনেক বছর বাদে 'দি কালার পার্পল' (৮৫) ও 'ছক' ছবিতে এই সম্ভাবনা সম্পূর্ণ রূপ পেল। প্রথম ছবিটি সর্ব অর্থেই বড়োদের জ্ঞান বড়ো ছবি, মার্কিন সমাজে এক গ্রামীণ কুম্ভান্দ নারী কীভাবে যৌন বৈষম্য, বর্ণ বৈষম্য ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার, ছবিতে আছে অসাধারণ সৌন্দর্য ও স্বয়ংস্বতার সব মুহূর্ত। আর দ্বিতীয় ছবিটিতে আছে এমন সব টাইপ চরিত্র, চিত্রগত মোটিফ আর থিমটিক প্রসঙ্গ-অনুসঙ্গ যেগুলি বিচ্ছিন্ন ভাবে তাঁর ছবিতে মাঝে-মাঝেই দেখা গেছে, কিন্তু এই প্রথম তা এক অথও সংহত সমৃদ্ধ শিল্পরূপ পেল। এ-ছবি সৌন্দর্য, রহস্য ও

অনুগ্রহণের ছবি। তাঁর 'অলওয়েজ' (৮৯)-ও এক অন্তর্মুখী ছবি, সাররিয়ালিজমের মতো চেতনার মুক্তির প্রকাশ, বন্ধুতা-মৃত্যু-শিল্প-প্রেরণা-প্রেম-কল্পনা বিষয়ক ধারণাদির মধ্যে ক্রমাগত দোলাচল। 'ছক' ও 'অলওয়েজ' ছবিতে দেটিং ও অ্যাকশন যতই কল্পনাপ্রসূত হয়ে ওঠে, চরিত্রাদি ও আবেগানুভূতি ততই মানবিক ও বাস্তবদন্মত হয়। ফলে বলা যায়, তাঁর ছবির জগৎ আজ মনস্তাত্ত্বিক বাস্তব-বাদের জগৎ। 'শিও'লার্স লিফ্ট' যেমন শুধু মনস্তাত্ত্বিক নয়, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক হাতিয়ার হিসেবেও কাজ করে।

স্পীলবার্গ মার্কিন টেলিভিশনের জন্মও অনুষ্ঠান নির্মাণ করেছেন ('অ্যামাজিং স্টোরিজ'), তরুণ পরিচালকদের ছবি প্রযোজনা করেছেন ('ছ ফ্রেম্‌ড্ রজার রাবিট', 'বাক টু দি ফিউচার', 'Poltergeist', 'ইয়ং শার্লক হোম্‌স্'), প্রযোজনা করেছেন আরো অনেক ছবি এবং পরিচালনা করেছেন 'এম্পায়ার অব দি সান' (৮৭), 'ইণ্ডিয়ানা জোনস অ্যাণ্ড দি টেম্পল অব ডুম' (৮৪), 'টুইলাইট জোন - দি মুভি' (৮০), '১৯৪১' (৭৯) [ চলচ্চিত্রের ভাষায় যত রকম শটের কথা আছে সব শটের ব্যবহার পাওয়া যায় এই ছবিতে ] প্রভৃতি ছবিও।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : Steven Spielberg – A Beekshan Publication ।

ধীমান দাশগুপ্ত

॥ স্মিতা পাতিল ॥

( ১৯৫৫-৮৬, ভারতীয় অভিনেত্রী )। সত্তরের দশকে যে এক বাক নতুন অভিনেতা একদিকে আবির্ভূত হয়ে নতুন ভারতীয় সিনেমাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন ও ভারতীয় চলচ্চিত্রে নতুন অভিনয় রীতির প্রবর্তন করেছিলেন নাদিরুদ্দিন শাহ, ওম পুরী, শাবানা আজমী ও স্মিতা পাতিল তার প্রধান চারজন। ভারতীয় চলচ্চিত্রে একটা সময় এসেছিল যখন শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর আসনটি নিয়ে শাবানা ও স্মিতার মতো এক অলিখিত সূত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলত। আমাদের দেশে ভালো অভিনয় বলতে সাধারণত কিছুটা গ্ল্যামার মেশানো রিয়ালিস্টিক বা হ্যাচারালিস্টিক অভিনয় বোঝাতো। ক্রমে মাধবী নুখোপাধ্যায় ( ড্র. ) এলেন তাঁর অন্তর্মুখী ও সূক্ষ্ম অভিনয় নিয়ে। সেই অন্তর্মুখী আভিজাত্যের সঙ্গে প্রচ্ছন্ন গ্ল্যামার মিশিয়ে শাবানা ( ড্র. ) এলেন আর ঠিক তার বিপরীতে প্রায় একই সময়ে স্মিতা উপস্থিত হলেন তাঁর অনভিজাত বস্তু অভিনয় নিয়ে। অভিনয়ের এই ধারা আমাদের দেশে অনেকটাই নতুন। স্মিতার পারিবারিক পরিবেশ, মানসিক গঠন, বেড়ে ওঠা ও

অভিনয়ে শিক্ষানবিশির মধ্যেই ওই ধারায় অভিনয়ের কারণ নিহিত ছিল। ফিজিক্যাল অ্যাক্টিং যা অভিনয়ের একটি মূল অঙ্গ তার চমৎকার নিদর্শন মেলে স্মিতার অভিনয়ে। বিভিন্ন চরিত্র সৃষ্টির মুহূর্তে কল্পনাশক্তি ও বিচারবোধের সঠিক প্রয়োগে চরিত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ডিটেলগুলি উপস্থাপনেও তিনি সক্ষম। স্বরক্ষেপণে প্রয়োজনমতো স্টাইলাইজেশনেও তিনি ছিলেন পারদর্শী। শাবানা যখন সূক্ষ্ম ও অন্তর্মুখী অভিনয়ে আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করেছেন, স্মিতা তখন বলিষ্ঠ ও বহির্মুখী অভিনয়ে আমাদের চেতনায় ধাক্কা দিয়েছেন। চরিত্র উপস্থাপনার ক্ষেত্রে শাবানা গভীরতাকে ছুঁতে চেয়েছেন, স্মিতা চরিত্রাভিনয়ে এনেছেন বিস্মৃতি। শাবানা চরিত্রকে গুটিয়ে এনেছেন, স্মিতা চরিত্রকে খুলে ছড়িয়ে দিয়েছেন। দুজনের অভিনয়েই মনন ও প্রবৃত্তির প্রয়োগ থাকলেও, শাবানা মূলত মনন-নির্ভর অভিনয় করেন, স্মিতার অভিনয় মূলত প্রবৃত্তি-নির্ভর। দুটি নারীনির্ভর চলচ্চিত্র বৎসর ও ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে এসব ধরা পড়বে। শাবানা ও স্মিতা একই গোষ্ঠী থেকে অভিনয়ের দুই বারা নিয়ে উপস্থিত।

যে-কোনো অভিনয়েই বাহ্যিক ছন্দ ও অভ্যর্থনের ব্যাপক ব্যবহার থাকে। বিষয় দুটিকে এইভাবে বোঝানো যায়—

সংলাপ + ভাবভঙ্গি + চলাফেরা + কণ্ঠস্বর = বাহ্যিক ছন্দ।

উপলব্ধি + অনুভব + আবেগ + অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা = অভ্যর্থনা। অভিনয় একই সঙ্গে বিষয়ও বটে আবার উদ্দেশ্যও বটে। উদ্দেশ্য ও বিষয়গত সচেতনতাকে মিলিয়ে অভিনেতা চরিত্রের অন্তর-সঞ্চারী জিয়ারেখাটিকে -উচ্চতম লক্ষ্যবস্তুর দিকে পরিচালিত করেন। স্মিতা অভিনীত শক্তি বা নেমকহালাল-এর মতো বাণিজ্যিক ছবির ক্ষেত্রে ওই লক্ষ্যবস্তু কখনো কখনো স্থানচ্যুত হয়ে পড়েছে। সেই কারণেই এই সমস্ত ছবি বিচ্ছিন্নভাবে সুন্দর মুহূর্ত সৃষ্টি করলেও সৃষ্টির পরিপূর্ণতা এনে দিতে পারেনি। বাণিজ্যিক ছবির জগৎ ম্যামার তৈরি করার প্রবণতাই বোধকরি এর কারণ। শাবানা কিন্তু কি ভালো কি খারাপ কোনো ছবিতেই অভিনয় করতে গিয়ে ওই লক্ষ্যবস্তু থেকে বিচ্যুত হননি। তিনি সঞ্চারী রেখার সমস্ত ছোট ছোট এককগুলিকে একত্রিত করে উচ্চতম লক্ষ্যবস্তুর দিকে পরিচালিত করতে পেরেছেন। স্মিতা কিন্তু শেষের দিকে বর্ষের পরিবেশ-পরিস্থিতির শিকার হয়ে পড়েন। তাঁর উচ্চারণে কিছু কিছু অহিন্দী ভাব লক্ষ্য করা যায় বলেও হিন্দীভাবীরা উল্লেখ করে থাকেন। সেসব বাদ দিলে গুলেন লিগুয়ম, ইনগ্রিড থুলিনের ঘরানায় আমরা পেয়েছি স্মিতা পাতিলকে। যেমন

পেয়েছি লিভ উলম্যান, মাধবী মুখোপাধ্যায়ের ধরানায় শাবানা আজমীকে । মাধবী শাবানার অভিনয় যদি হয় অভিজাত মহিলার কলমের পালক, স্মিতার অভিনয় তবে আদিবাসী তরুণীর চুলে গৌজা রঙিন পালক । আমরা অপেক্ষা করে আছি কবে ভারতীয় সিনেমায় দেখা পাব বেলমন্ডোর মতো ক্যাছ্যাল ইনফর্মাল অভিনয়ের, আঃ সে তো বিরঝিরে হাওয়ায় উড়ে আসা ফুরফুরে পালক । স্মিতার উল্লেখযোগ্য অভিনয়ের মধ্যে আছে আর্থ, চক্র, আলবার্ট পিটো কা গুস্মা কিউ ভাতা হ্যায়, মহন, সদগতি, আকালের সন্ধানে, ভূমিকা, মির্চ মশালা, মাণ্ডি, দেবশক্তি, উমবার্তা, কোন্দুরা, চিদাম্বরম, ভব্নি ভবাই, আক্রোশ, অর্ধসত্য, ইত্যাদি । কষ্টা-গাত্রাপ বলেছিলেন, স্মিতা পৃথিবীর ছজন শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর একজন । ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অভিনেতা রাজ বকরের স্ত্রী । তাঁর অকালমৃত্যুতে আমাদের যে ক্ষতি হয়েছে তা অপূরণীয় । যুগাল সেন বিষয়ে একটি বাংলা সংকলন গ্রন্থ তাঁকে উৎসর্গ করা হয়েছে—‘রক্ত ঘাম ঝরা, সে তুমি বেদনার নিরুদ্বাহাকার : তোমার জন্তে স্মিতা পাতিল ।’

গোপা সেনগুপ্ত

॥ হাওয়ার্ড হক্‌স ॥

(১৮৯৬-১৯৭৭) । আমেরিকার চিত্রপরিচালক । মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশুনো শেষ করে তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন । যুদ্ধের শেষে তিনি সহ সম্পাদক হিসেবে চলচ্চিত্রশিল্পে যোগ দেন, পরে চিত্রনাট্যকার হন, তারপর ২৬য়ে প্রথম কাহিনীচিত্র পরিচালনা করেন । দি রোড টু গ্লোরি । পরবর্তী চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি নানা ধরনের ছবি করেছেন । স্কারফেস ( ৩২ ), অ্যাকশন ধর্মী ছবি Only Angels have Wings ( ৩৯ ), এয়ার ফোর্স ( ৪৩ ); কমেডি চিত্র টুয়েন্টিয়েথ সেন্চুরি ( ৩৪ ), ক্রিংগিং আপ বেবি ( ৩৮ ), হিজ গার্ল ফ্রাইডে ( ৪০ ); মিউজিক্যাল Gentlemen Prefer Blondes, তথ্যচিত্রধর্মী রেড লাইন ৭০০০ ( ৬৫ ), এবং ওয়েস্টার্ন রেড রিভার ( ৪৮ ), রিও ক্র্যাভো ( ৫৯ ) । তাঁর ছবির দ্রুতগতি সম্পন্ন অ্যাকশন অসাধারণ পরিমিত ও দৃশ্যগত শক্তিতে সংহত । কমেডির ক্রমবিকাশ দৃশ্যের ও সংলাপের কমিকতা ও নিয়ন্ত্রিত গতিবেগ তিনের ওপরই নির্ভরশীল । গ্র্যারেটিভ কলনামযুক্ত, বলিষ্ঠ ; তীক্ষ্ণ ব্যক্তনাম্বক সংলাপ তাতে । হক্‌সের ছবিতে পুরুষালি গুণগুলির প্রাধান্য । নিজের ছবিতে একটা অদ্ভুত বৈপরীত্যকে আশ্রয় করে থাকেন তিনি । সেখানে চরিত্রগুলির নিজেদের

ব্যর্থতা সম্বন্ধীয় ধারণা থেকেই বেরিয়ে আসে তাদের আশাবাদ, কমেডি সিচুয়েশনকে ঘিরে রাখে বিষয় ধূসরতা, অ্যাকশনধর্মী টু হাত অ্যাণ্ড হাত নট হয়ে ওঠে প্রকৃত প্রেমের কাহিনী, রিও ত্র্যাভো যেমন সংলাপের দিক থেকে হয়ে পড়ে কমেডি। হক্‌স সারাজীবনই হলিউডের ব্যবসায়িক, প্রচলিত ছকের মধ্যে থেকে কাজ করেছেন। বোগদানোভিচের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি স্বীকার করেছিলেন ছবিকে মজাদার ও দর্শকের কাছে গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা করেছেন সব সময়ে। তবু তাঁর কলাকৌশলের দক্ষতা, নিজস্ব কিন্তু অতি স্বচ্ছন্দ ক্যামেরা ও সম্পাদনা রীতি (দি আমেরিকান সিনেমা গ্রুয়ে অ্যাণ্ড স্যারিস শ্রেষ্ঠ চোদ্দজন মার্কিন চিত্র-পরিচালকের যে তালিকা দিয়েছেন তার মধ্যে হক্‌স রয়েছেন) আর ছবির গুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এর সমস্ত উপাদান ও চলচ্চিত্র মাধ্যমটির উপর সম্পূর্ণ দখলের জ্ঞান কাইয়ের সমালোচকরাও তাঁকে জাত শ্রষ্টা বলতেন। পূর্ণাঙ্গ চিত্রনির্মাণ। তাঁর মনন ছিল আবেগজাত মনন, কলাকৌশলের কাজ ছিল অদৃশ্য কারিকুরি, তাঁর শিল্প হলো সরল স্বাচ্ছন্দ্যের। সমগ্র শিল্পজীবনের স্বীকৃতিতে ৭৫য়ে তাঁকে সম্মান-সূচক অস্কার দেওয়া হয়। (ড. হলিউড)

সম্পর্কিত গ্রন্থ : রবিন উডের হাওয়ার্ড হক্‌স ॥

॥ হলিউড ॥

(ড. আমেরিকা)। লস এঞ্জেল্‌স নগরীর অন্তর্গত এক স্বতন্ত্র ডিস্ট্রিক্ট, এই ভৌগোলিক পরিচিতির চাইতে হলিউড একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ও ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবেই বেশি চিহ্নিত। হলিউড এমন একটা ফিল্ম ঘরানা বা স্টাইলের ধারক ও বাহক যা চরম গ্ল্যামার ও অসাধারণ পেশাদারী দক্ষতার পরিচায়ক। হক্‌সের ভাষায় এই স্টাইল ছবিতে রাখতে চায় as much fun and business as possible. মিউজিকাল, ওয়েস্টার্ন, কমেডি, sci-fi spectacle ও ম্যান্টিলিয়ন ডলার প্রযোজনায় হলিউড, বলা যায়, অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী। তার যে নির্দিষ্ট সিস্টেম তার সঙ্গে মানিয়ে কাজ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। অনেকের মতে, রীতি-বিরোধী প্রতিভার পক্ষে প্রায়ই অসম্ভব। যার প্রমাণ অরসন ওয়েল্‌স বা এরিক স্ট্রাইম। হলিউডের অগ্রাণু বৈশিষ্ট্য, সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা আমেরিকা অংশে আলোচিত। হলিউডের বিভিন্ন জাতের ছবি ও বিভিন্ন পরিচালককে নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনাও এ বইয়ে আছে। হলিউডের কিছু উল্লেখযোগ্য ছবির কথাও আছে। বিশেষ ও ত্রিশের দশকদুটিই হলিউডে সবচেয়ে সৃষ্টিশীল কাল। অ্যাণ্ড

স্যারিস শ্রেষ্ঠ চোদ্দজন মার্কিন চিত্রপরিচালকের যে তালিকা প্রস্তাব করেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই এই দুই দশকে ছবি করেছেন। যেমন—গ্রিফিথ, চ্যাপলিন, ক্ল্যাহার্ট, কোর্ড, হক্‌স, ল্যাঙ, লুবিৎশ, মুরনাউ, স্টার্নবার্গ।

প্রাদম্বিক গ্রন্থ : অ্যাণ্ড স্যারিস সম্পাদিত হলিউড ভয়েসেজ ।

॥ হল্যাও ॥

১৮৯৬ থেকে চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী ও ১৯০২ থেকে চিত্রপ্রযোজনা শুরু হয় এখানে। যুদ্ধ-পূর্ব সময়কালে বিশ্ব চলচ্চিত্রে হল্যাওর সবচেয়ে বড়ো অবদান ইয়োরিস ইভেন্স। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ এই তথ্যচিত্র নির্মাতা তাঁর দেশের পরবর্তী প্রজন্মের চিত্রপরিচালকদের ওপর অপরিদ্রা়্য প্রভাব বিস্তার করেছেন। এই দেশের ছবিতে সমসাময়িক প্রয়োজন ও নির্মোহ সত্যের প্রতি আকর্ষণের যে ঐতিহ্য তথ্যচিত্রের আদর্শ থেকেই তার জন্ম। যে প্রদম্বে Haanstra-র কথাও আসবে। এটি চিত্রের দিক। পরিমাণগত ভাবে যুদ্ধ পরবর্তী সময়কালেও হল্যাওর সিনেমাশিল্প কিন্তু ছোটো আকারেই রয়ে গেছে। বছরে বড়োজোর দশ-পনেরটি কাহিনীচিত্র নির্মিত হয়। Wim Verstappen সন্তবতঃ এই দেশের সবচেয়ে কৃত্তী চলচ্চিত্র পরিচালক যিনি এ পর্যন্ত প্রায় এক ডজন কাহিনীচিত্র নির্মাণ করেছেন। চলচ্চিত্র মাধ্যমটির সূচারু উপলব্ধির জন্য তাঁর ছবিগুলির একটি যুগোপযোগী প্রভাব আছে। 'Pastorale' (1943) এই পরিচালকের সবচেয়ে জটিল এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছবি। যুদ্ধের সময়ে হল্যাওর মানসিকতা এবং অন্তর্দর্শন ছবিটির মূল উপজীব্য। Paul Verhoeven আরেকজন পরিচালক যিনি যুদ্ধকে ছবির বিষয় হিসাবে ব্যবহার করেছেন। শুধু পার্থক্য এই যে তিনি যুদ্ধকে একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নতুন আলোকে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর 'Survival Run' এই পর্যায়ভুক্ত ছবি। যুদ্ধের দিনগুলিতে ওলন্দাজদের অস্তিত্বকাতর জীবনযাপনের বিষয় ধরন এই ছবিতে চিত্রিত হয়েছে। Jos Stelling-এর চলচ্চিত্রকর্ম কিছু পরিমাণে যশ ও সাফল্য এবং কিছু বিফলতায় ভরা। মানবীয় আবেগ, কামনা-বাসনা এবং হৃদয় প্রেমাত্মকতার সমন্বয়ে তিনি যে 'Rembrandt' ছবিটি নির্মাণ করেন সেটি আসলে বিখ্যাত চিত্রকর Rembrandt-এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। শিল্পীর জীবনে নেমে আসা নিদারুণ উদ্বেগ, মর্মস্পর্শী একাকিত্ব ও দুঃখকষ্টের এক বিশেষ জগৎ এই ছবিতে আবিষ্কৃত হয়েছে। রোগনির্গমে পারদর্শী একজন ডাক্তার যেভাবে মানব-দেহের খুঁটিনাটি পরীক্ষা করেন সেই একই মনস্তাত্ত্বিক Rembrandt-এর জীবনপঞ্জী

পরিচালক লিপিবদ্ধ করেছেন। ফরাসি পরিচালক Bresson-র পদ্ধতির সঙ্গে এই ছবিটির গঠনশৈলীর বেশ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। হল্যান্ডের উঠতি পরিচালকদের মধ্যে Adriaan Ditvoorst তাঁর ছবির পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি, ষষ্ঠার্থ গতিশীলতা এবং উজ্জ্বল রসবোধের জ্ঞান দর্শকমন জয় করেছেন। সত্তরের দশকে প্রস্তুত তাঁর ছবি 'The Cloak of Charity' টেন কম্যাণ্ডমেন্ট্‌স্-এর একটি আধুনিক ব্যঙ্গাত্মক প্রতিক্রম। কয়েকটি উপাখ্যানের মিলিত রূপ এই ছবি, যেখানে যুল বক্তব্যটি গঠনচাতুর্য এবং সূচিস্তিত মন্তব্যের সাহায্যে পরিষ্কৃত করা হয়েছে। এলোমেলো-ভাবে ছড়িয়ে থাকা নকশাগুলি প্রতীকের আশ্রয় পেয়ে উজ্জ্বল ও স্নেহাত্মক হয়ে উঠেছে। অষ্টাশ পরিচালকদের মধ্যে Paul de Lussanet, George Sluizer, Frans Bromet, Rene van Nei, Otto Jongerius এবং Ate de Jong উল্লেখযোগ্য। ফরাসি হুভেল ভাগ-এর আদর্শ এঁদের সৃষ্টিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। হল্যান্ডের চলচ্চিত্র জগতে অবশ্য এখন পর্যন্ত দীপ্যমান জ্যোতিষ্কের মতো বিরাজ করছেন Bert Haanstra ( ড্র. )। Fons & Lili Rademakers-এর কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। Rademakers-দের ছবি-গুলি ও নানান ধরনের ছবি আন্তর্জাতিক স্তরে উচ্চ প্রশংসা অর্জন করে কাহিনী-চিত্রের ক্ষেত্রে এই দেশের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। অষ্টাদিকে Haanstra তাঁর উন্নতমানের তথ্যচিত্রগুলির সাহায্যে ডাচ্ সিনেমাকে বিশ্বের চলচ্চিত্র-দরবারে একটি স্থায়ী আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ডাচ্ সিনেমা সবেমাত্র তার অন্তর্নিহিত শক্তি এবং সম্ভাবনাকে আশ্রয় করে অগ্রগতির দিকে ঝুঁকছে। আশা করা যায়, এই মাধ্যমে কর্মরত অধিকাংশ নতুন পরিচালক তাঁদের উৎসাহ ও প্রাণবন্ততার নবীন নিদর্শনকে বিশ্বজনচিতে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারবেন।

## প্রদীপ বিশ্বাস

### ॥ হাঙ্গেরী ॥

প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ১৮৯৬য়ে। এর দু বছর পর হাঙ্গেরীতে প্রথম ফিল্ম কোম্পানী স্থাপিত হয়। প্রথম ফিল্ম স্টুডিও স্থাপিত হয় ১৯১২য়। তখন সে দেশে সামন্ততান্ত্রিকতার যুগ। বিদেশ থেকে আসা ছবি দেশ জুড়ে প্রদর্শিত হচ্ছে। আদি পর্বের স্বদেশী পরিচালকদের মধ্যে আলেকজাণ্ডার কোর্ডা, Michael Curtiz ছবি করছেন। ওই সময় থেকেই চিত্রসমালোচনা, চলচ্চিত্রের অনুশীলন ইত্যাদি বিষয়ে আগ্রহ দেখা দিতে শুরু করে যা পরে বেলা বালাজের ( ড্র. ) প্রচেষ্টায়

খুব উল্লেখযোগ্য রূপ পাবে। তিরিশের দশকের প্রথম অর্ধে হাঙ্গেরীতে বহু বিদেশী ছবির স্রাটি হয়। ৩১শ্রে নির্মিত হলো দেশের প্রথম সবাকচিত্র। এই দশকে হাঙ্গেরীর বেশ কিছু ছবি আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে রফতানি হলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে চলচ্চিত্রশিল্পি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে এল। স্থাপিত হলো জাতীয় ফিল্ম কমিটি। নাৎসিদের যুদ্ধকালীন অধিকার থেকে দেশ মুক্তি পেল ৪৫য়ে। বালাজকে দায়িত্ব দেওয়া হলো দেশের চলচ্চিত্রশিল্পকে স্বগঠিত করার। ৪৭য়ে হাঙ্গেরী রূপান্তরিত হলো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে। এই সময়কার কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি দি সয়েল আগার ইয়োর ফিট, সামহোয়ার ইন ইউরোপ, Ludas Matyi, The Birth of Menyhert Simon. এলেন নতুন পরিচালক—Charles Vidor, জোলতান ফাবরি, Felix Mariassy. বালাজের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ৫৮য় স্থাপিত হলো বেলা বালাজ স্টুডিও। এলেন K. Makk, মিকুলোশ ইয়াকো, J. Hersko, অন্দ্রে কোভাচ, ফেরেন্স কোসা, ইস্ত্ভান সাবো, ইস্ত্ভান গাল। পরে আরো এলেন মার্ভা মেজারোস, এই সমস্ত নতুন পরিচালকদের ছবিতে ইতিহাসচেতনা ও ইতিহাস-মুখীনতার বিশেষ পরিচয় রয়েছে। এই অতীত-প্রবণতা কোনো পলায়নী মনোবৃত্তি নয়, বরং এক ধরনের আত্মসমালোচনা ও আত্মশুদ্ধি। যেমন ফাবরির রিকওয়াইম ছবিতে একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতীকী রূপ পায় দুটি নরনারীর শারীরিক আকৃতির মধ্য দিয়ে। শৈলীর দিক দিয়ে এঁদের ছবিকে সমালোচকরা তিনটি স্বতন্ত্র ধারায় বিভক্ত করেছেন : সহজ বুদ্ধিবাদ বা সিম্পল ইন্টেলেক্চুয়ালিজম যার মধ্যে পড়বে দাবোর 'ফাদার'। বিমূর্ত বুদ্ধিবাদ বা অ্যাবস্ট্রাক্ট ইন্টেলেক্চুয়ালিজম যার মধ্যে পড়বে ইয়াকোর 'দি রাউণ্ড আপ'। বিশ্লেষণী বুদ্ধিবাদ বা অ্যানালিটিকাল ইন্টেলেক্চুয়ালিজম যার মধ্যে পড়বে ফাবরির 'অ্যাপ্ট'স্ নেট'। ইতিহাসচেতনা ছাড়া আর যে লক্ষণ ও বিষয় হাঙ্গেরীর নব্য তরঙ্গের ছবিতে প্রাধান্য পেয়েছে তা হলো ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক ও দুই প্রজন্মের ইন্টারঅ্যাকশন। এই দেশের অধিকাংশ পরিচালকই দীর্ঘকাল ছিলেন মার্ক্সীয় নীতিতে বিশ্বাসী, যার অর্থ হলো যুগপৎ গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় সমালোচনায় বিশ্বাস। পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের সংকটের পর তাঁদের ছবিতে (যেমন 'গড ওয়াক্‌স্ ব্যাকওয়র্ড' বা 'রাশিয়ান টিচার') এখন ধরা পড়ছে কম্যুনিজমের দায়ভাগ ও উত্তরাধিকারের কথা। শিল্পসম্মত ছবির ক্ষেত্রে হাঙ্গেরীর ভূমিকা আজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যে কোনো দেশের তুলনায় হাঙ্গেরীর ছবির গড়

মানও উন্নততর বলে মনে হয়। এখানকার পাপেট ও অ্যানিমিমেটেড ছবিও বহুকাল ধরেই জগৎ বিখ্যাত।

## ॥ বার্ট হান্স্‌ত্রা ॥

(জন্ম ১৯১৬, হল্যাণ্ড)। আলোকচিত্রগ্রাহক হিসেবে শিল্পজীবন শুরু করে হান্স্‌ত্রা ১৯৪৯ থেকে স্বল্প দৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র নির্মাণে হাত দেন। তথ্যচিত্রের শ্রষ্টা হিসেবে হান্স্‌ত্রাকে খুব উঁচু আসন দেওয়া হয়। ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফির শৈলী ও ঐতিহ্যকে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন ডকুমেন্টারি ফিল্মে। তাঁর পূর্ববর্তী দুই উল্লেখযোগ্য তথ্যচিত্র শ্রষ্টার দুটি মূল্যবান গুণের সমন্বয় ঘটেছে তাঁর ভিতর। ফ্ল্যাহার্টীর লিরিসিঙ্কম ও ইভেন্সের সায়েন্টিফিক ইন্সটিটিউট। এই প্রসঙ্গেই আলোচ্য হতে পারে কতটা করে মিল / অমিল তাঁর জঁ রুশের মতো চলচ্চিত্রের নৃতাত্ত্বিকদের সঙ্গে, জ্যাক কুস্তোর মতো বৈজ্ঞানিক চলচ্চিত্রকারের সঙ্গে, স্বাভাবিকতাবাদী ডিজনির সঙ্গে। মিরর অব হল্যাণ্ড (৫০), দি রাইভাল ওয়ার্ল্ড (৫৮), প্লাস (৫৯), পূর্ণ দৈর্ঘ্যের এপ অ্যাণ্ড সুপার এপ, কাহিনীচিত্র ফ্যানফেয়ার (৫৮) ও Alleman (৬৬) প্রভৃতি ছবির মাধ্যমে তিনি প্রায় সত্তরটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছেন, হল্যাণ্ডের নবাবধর্মী তথ্যচিত্রের বিকাশে তাঁর প্রভাব দূরপ্রসারী হয়েছে (ড. হল্যাণ্ড)। তাঁরই পূর্বকার একটি ছবিকে আয়তনে ও নাত্রায় আরো উদ্দেশ্যস্বক করে এপ অ্যাণ্ড সুপার এপ-য়ে তিনি মানুষ ও নহুয়েতর প্রাণীর আচরণের যে সাদৃশ্য দেখান এবং প্রকৃতির প্রতি মানুষের আচরণ ও বাস্তবাবিচার ক্ষেত্রে তার করণীয় সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন তা বিতর্কিত হলেও স্কর। এই প্রসঙ্গে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী পরিবেশবিজ্ঞানী লোরেন্স-এর বৈজ্ঞানিক দর্শনের কথাও উল্লেখনীয়। তিনি একই সঙ্গে তীক্ষ্ণ দ্রষ্টা ও বিজ্ঞানী হলেও শুভ বুদ্ধির অধিকারী। তাঁর চিত্রশৈলীতে সরস ডিটেস ও সহৃদয় ধীম, বর্ণময়তা ও বিমূর্তন, উইট ও শিরিকের স্বন্দর মিল ঘটেছে। তাঁর চিত্রশৈলীর আলোচনায় খুবই মূল্যবান কাঁচ বিষয়ক তাঁর দুখানি ছবির প্রতিভুলনা। একটিতে বিষয় কাঁচের দৈনন্দিন ব্যবহারের সঙ্গে সম্পর্কিত, অল্পটিতে কাঁচের রূপান্তরের সঙ্গে। একটিতে কাঁচ যেন দৈনন্দিন জীবনের চারদিক ঘিরে বেখেছে, অল্পটিতে কাঁচ যেন সাবিক জীবনের মতো বৈচিত্র্যময়।

অগ্নাঙ্ক ছবি : Panta Rhei ( ৫১ ), Rembrandt ( ৫৬ ), দি ভয়েস অব দি ওয়াটার ( ৬৬ ) ॥

## ॥ জন হা(হিউ)স্টন ॥

( ১৯০৬-৮৭, আমেরিকা )। চিত্রজীবন শুরু হয় সহযোগী চিত্রনাট্যকার রূপে। প্রথম কাহিনীচিত্রের পরিচালনা দেন ১৯৪১য়ে, ছবির নাম **The Maltese Falcon.** ( ড. ফিল্ম নয়ার ) তারপর কয়েকটি শাদামাটা ছবি করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে দুটো অসাধারণ প্রচারমূলক তথ্যচিত্র নির্মাণ করলেন, দি ব্যাটল অব সান পিয়েরো ও লেট দেয়ার বী লাইট। যুদ্ধের পর আবার কাহিনীচিত্র : দি ট্রেজার অব দি সিয়েরা মাদ্রে ( ৪৮ ), দি আফ্রিকান কুইন ( ৫২ ) ও পর পর আরো বহু ছবি। যত্নের আগে পর্যন্ত। পঁয়তাল্লিশ বছরের চেয়েও বেশি দীর্ঘ তাঁর শিল্প-জীবনের সামগ্রিক ক্রমবিকাশের ধারাটি তেমন স্পষ্ট ও স্বতন্ত্র ভাবে বিশিষ্ট নয়। ব্যবসায়িক সিনেমার সীমাবদ্ধ রূপরেখার মধ্যো কাজ করেও তিনি তাঁর ছবিকে কখনো কখনো উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও রীতি-বিরোধী করে তুলতে পেরেছেন, এটা ঠিক। কিন্তু যৌনের ক্রমবিবর্তন ও শৈলীর ক্রমপরিণতিতে তিনি চলচ্চিত্র জগতে কোনো ব্যক্তিগত প্রভাব রাখতে পেরেছেন কিনা তা ভাববার। তাঁর চিত্রশৈলী মূলত বহিমুখী, খুব কমই তা গল্পের গঠন ও আন্তরিক প্রয়োজন থেকে উঠে আসে। **The Maltese...**, দি ট্রেজার..., দি আফ্রিকান..., রিফ্লেকশন্স ইন এ গোল্ডেন আই ( ৬৭ )—তাঁর সেরা ছবিগুলো মনে হয় আকর্ষণীয় কাহিনী, আটো-সাঁটো চিত্রনাট্য, শক্তিশালী অভিনয়, সডিটেল চিত্রায়ণ, এবং ভিসুয়ালের বর্ণ-সচেতনতার যোগফল ; কিন্তু মন্থণ ও সামগ্রিক কোনো সংশ্লেষণ নয়। মূলত তিনি স্টোরি টেলার, ও বাস্তববাদী। ছবির মূল চরিত্রগুলি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অভিলাষী, যার প্রয়োজনে ও তদুপরেও ( হার্টনের শ্লেষাত্মক ব্যঙ্গনা এই বৈপরীত্যেই ) তারা নিজেদের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতাবান কোনো প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংঘাতে নামে, সাহসে চালিত ও নিয়তি-ভাঙিত হয়ে নামে, নামে পরাজয় প্রাপ্ত নিশ্চিত জেনেই। ( ড. ওয়েস্টার্ন )

তাঁর ছবিতে প্রেম ও আবেগের ভূমিকা গৌণ। নারী-পুরুষ সম্পর্কের প্রতি তাঁর কিছুটা অবিশ্বাসই আছে বলা যায়, পরিবর্তে বন্ধুত্বের প্রতি বিশ্বাস ( হক্‌সের ছবিতে যেমন ) বা পরিবারের প্রতি টান ( ফোর্ডের বহু ছবিতে যেমন )—তারও কোনো লক্ষণ নেই। ফ্যাট সিটি ( ৭২ ) ছবিতে আমরা গল্পের চেয়ে বেশি কিছু পাই, ধীম। ব্যক্তিগত ব্যর্থতার ও আত্মমর্যাদার চিত্রায়ণে পরিচালক এখানে নিজের শৈল্পিক ব্যক্তিত্বকে ব্যবহার করেন, বিষয়বস্তুর সাথে অন্তরঙ্গ একাত্মতা অহুতব

করেন। হলিউডের ব্যবসায়িক কাঠামোর মধ্যে প্রথাবিরোধী শৈল্পিক ব্যক্তিত্ব—  
তাকে বলা যায় বিদ্রোহী সন্ন্যাসী। ওই ছবি ও দি ম্যান হু উড বী কিং-য়ে তিনি  
দীর্ঘ-সচেতন। আবার যতই তিনি দীর্ঘ-সচেতন হন, তাঁর প্রয়োগ ও কলাকৌশল  
ততই প্রত্যক্ষ ও আত্মসচেতন হয়ে পড়ে। কাহিনীচিত্র ছাড়া একটি জীবনীচিত্র  
'ফ্রয়েড' ( ৬২ ) ও কল্পনা-মিশ্রিত জীবনীচিত্র 'Moulin Rouge' ( ৫২, চিত্রকর  
ভুলু-লোজেককে নিয়ে ) তিনি তৈরি করেছেন। তাঁর অজ্ঞাত ছবির মধ্যে আছে  
দি নাইট অব দি ইন্ডিয়ানা ( ৬৪ ), দি ম্যাকিন্টশ ম্যান ( ৭৩ ), কোবিয়া ( ৮০ ),  
প্রিজিস অনর ( ৮৫ ), দি ডেড ( ৮৭ )।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ : W. F. Nolan-এর John Huston : King Rebel ॥

## ॥ আলফ্রেড হিচ্‌কক ॥

( ১৮৯৯-১৯৮০, গ্রেট ব্রিটেনে জন্ম হলেও তাঁর অধিকাংশ ছবি আমেরিকার  
হলিউডে এসে তোলা। ) ১৯৫৭ মালে এরিক রোহ্মের ও ক্রোড শ্চাত্রল নামে দুজন  
প্রায় অপরিচিত লেখক যখন করাসি 'হিচ্‌কক' গ্রন্থটি প্যারিসে প্রকাশ করেন,  
তখন চলচ্চিত্র জগতের পণ্ডিতরা রীতিমতো জ্ব কুঞ্জন করেছিলেন। তখন পর্যন্ত  
হলিউডে, শিল্পজগতের বিচারে, হিচ্‌ককের স্থান যে বিশেষ উপরের দিকে ছিল তা  
নয়। কারণ, তিনি ছিলেন মুখ্যত রহস্য-রোমাঞ্চ ছবির নির্মাতা, জাতির বিচারে যে  
ছবি কুলীন নয়। এ হেন পরিচালকের মধ্যে রোহ্মের ও শ্চাত্রল আবিষ্কার করে  
বদলেন একজন auteur বা অনন্ত স্রষ্টাকে। তাঁকে তুলনা করলেন মুরনাউ এবং  
আইজেনস্টাইনের সঙ্গে। এর কয়েক বছর পরে ক্যাসিয়ে দ্য সিনেমা গোল্ডার অপর  
এক নেতা ফ্রঁসোয়া ত্রুফো তাঁর গ্রন্থে 'উৎকর্ষার শিল্পী' রূপে হিচ্‌ককের স্থান  
নির্দেশ করলেন দত্তয়েভস্কি, এডগার অ্যালান পো এবং কাফ্‌কার সঙ্গে একই  
নারিতে। এই ছিল হিচ্‌কক সম্পর্কে 'দীর্ঘদিন' আলোচনার সূত্রপাত—তাঁর ষাট  
বছর বয়সে এবং পঞ্চাশটি ছবি করার পর। চলচ্চিত্রের ইতিহাসে হিচ্‌ককের  
স্থান কোথায় এ নিয়ে সমালোচক মহলে আর বিশেষ মতভেদ নেই। বিতর্ক যা  
আছে তা স্রষ্টা হিসেবে হিচ্‌ককের বিশ্বাস অ বিশ্বাস ও প্রকরণের তাৎপর্য নিয়ে।  
হিচ্‌কক প্রদত্ত উল্লেখযোগ্য ১. transference of guilt বা দায়ভাগের  
পাত্রান্তরের কথা যা রোহ্মের ও শ্চাত্রল প্রথম উল্লেখ করেছিলেন। ২. ক্যাথলিক  
বিশ্বাসের প্রদত্ত যা রবিন উড্‌ এবং ত্রুফোর বিচারে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। এবং  
৩. হিচ্‌ককের কাহিনী-বিজ্ঞান যাতে ডার্গান্ট উনবিংশ শতাব্দীর নাটক ও

উপস্থানের story-telling প্রভাব দেখতে পেয়েছেন। হিচ্‌ককের কাহিনীবিত্তাস মোটের উপর প্রখাল্লগ। তাঁর নাট্যক্রিয়ায় individualism বা ব্যক্তিবাত্ত্ববাদ স্থনিশ্চিতভাবে আর সব কিছুর উপর প্রাধাঘ্য পেয়েছে কিন্তু হিচ্‌ককের প্রায় সব ছবি যে বিষয়ের তা individual psyche অবলম্বন করেই গড়ে উঠতে পারে। প্রশ্ন সেটা নয়। প্রশ্ন হচ্ছে একটা স্থপরিচিত ও বহু ব্যবহৃত genre গ্রহণ করে হিচ্‌কক তাঁর মধ্যে স্বকৌশলে বৈচিত্র্য স্থষ্টি করেছেন তাঁর নাট্যবস্তুর উপস্থাপন ও ব্যবহারের মাধ্যমে। ক্রফো হিচ্‌ককের ছবিতে ফর্ম দংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রতি প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। হিচ্‌ককের চলচ্চিত্রের মূল উপাদান হিসেবে যে-তিনটি বিষয়কে ক্রফো চিহ্নিত করেছিলেন সেগুলি হলো ভীতি, যৌনতা ও মৃত্যু। ক্রফো এই বিষয়গুলিকে বলেছিলেন রাজ্জিহ্লভ অর্থাৎ অন্ধকারের সমালোচকরা মোটের উপর এই ব্যাখ্যা যেনে নিয়েছেন ('Is and always has been a frightened man'.) যদিও এই ভীতির চরিত্র সম্পর্কে মতান্তর আছে। হিচ্‌ককের হাশ্বকৌতুকেও এই ভীতির ছায়া এসে পড়েছে কারণ বেশ কয়েকটি ছবিতে হাশ্বরস এবং ভীতির একটি অস্থিত্জিনক সহাবস্থান দেখতে পাওয়া যায়। আধুনিক সমালোচকরা এই ভীতির মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেছেন; হিচ্‌ককের যে ত্রাস গুরু হয়েছিলো পাঁচ বছর বয়সে পুলিশ হাঙতে পাঁচ মিনিট বন্দী থাকার সঙ্গে সেটি মারাজীবন চলেছে অবিচ্ছিন্নভাবে—শেষদিন পর্যন্ত তাঁর জীবনে সবচেয়ে বড়ো ভীতি তাঁর স্ত্রী আলমা (বিবাহ ১৯২৬)। অগ্ধদিকে বলা যায় যে হিচ্‌ককের ব্যক্তি ও কর্মজীবন এত নিখুঁতভাবে সংগঠিত হওয়ার কারণ অনিশ্চয়তা সম্পর্কে তাঁর ভয়। টেলর তাঁর হিচ্‌কক দৃষ্ণে জীবনীগ্রন্থে এমন কিছু চমকপ্রদ তথ্য উপস্থিত করেছিলেন যা হিচ্‌ককের স্থনির্নিত ভিত্তৌয়ীয় কাঠামোকে নাড়া দিয়ে যায়। যেমন, কেন তিনি তাঁর ছবির নায়িকাদের সম্পর্কে অতিমাত্রায় possessive? Marnie (৬৪) ছবির নায়িকা টিপি হেডরেনের সঙ্গে ছবি চলাকালেই তাঁর বাক্যালাপ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে আমরা জানতে পারি, কারণ সাক্ষ্য-নিমন্ত্রণের আসরে তাঁর পরিধেয় কি হবে সে বিষয়ে হিচ্‌ককের নির্দেশ মানতে স্ত্রীমতৌ হেডরেন রাজ্জী হননি। বোধ করি এও মনোবিজ্ঞানীর বিচার্য বিষয় হওয়া উচিত—কেন এক স্থথী, গৃহী, বয়স্ক শিল্পস্রষ্টা এক তরুণী অভিনেত্রীর ব্যক্তিগত জীবনের উপর এতখানি স্বত্ব দাবী করেন। মনোবিজ্ঞানের একাধিক প্রসঙ্গ শুধু হিচ্‌কক সম্পর্কেই প্রযোজ্য নয় তাঁর ছবির বহু চরিত্রের ক্ষেত্রেও

প্রযোজ্য। তাঁর চল্লিশ ও ষাটের দশকের অনেক ছবিতে মনস্তাত্ত্বিক প্রদঙ্গ ও সদস্তার কথা এসেছে এবং মনোবিশ্লেষণের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে।

ব্যক্তি হিচককের মতো কর্মোদ্যোগী extrovert মানুষের লাজুক ও প্রচার-বিমুখ স্বভাব টেলরের বিশ্বয় উৎপাদন করে এবং প্রায় মনোবিকলনের সামগ্রী বলে মনে হয়। তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে শ্রষ্টার অবদমিত ইচ্ছা শিল্পের মাধ্যমে প্রকাশিত হতে পারে। 'Mr. Hitchcock is not so much in his films : he is his films.' নৈতিক মূল্যবোধের প্রভাব বোধ হয় হিচককের ছবিতে সর্বাধিক আলোচিত বিষয়। তাঁর ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাস কি সত্যিই তাঁর চলচ্চিত্রের নৈতিক ভিত্তি রচনা করেছে? হিচককের স্বভাবসিদ্ধ ঠাট্টা কিন্তু ধর্মকেও অব্যাহতি দেয়নি। একবার রোমে থাকার সময়ে স্বয়োগ পেয়েও তিনি পোপের দর্শনান্তিলাষী হননি। তার অর্থ হয়তো এই যে ধর্মবিশ্বাসকে তিনি দাম্পত্য-প্রেমের মতো তাঁর কর্মজীবন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে নিয়েছেন, হিচককের স্মৃৎগঠিত জীবনযাত্রায় প্রতিটি কর্মের নিজস্ব এলাকা রক্ষিত—তার মধ্যে যেমন রবিবারে চার্চে যাওয়া ছিল তেমনি প্রতি বৃহস্পতিবারে তাঁর প্রিয় রেস্তোরাঁয় নির্দিষ্ট টেবিলে সস্ত্রীক ডিনারও ছিল।

আবার সেই লাজুক, মুখচোরা আলফ্রেড হিচকক নামক ব্যক্তিই যখন তাঁর নতুন ছবির প্রচারের জ্ঞান বিচিত্র ভঙ্গিতে ( মাটিতে গুয়ে, মুখোশ পরে ) ছবি তোলাতে রাজী হন তখনও আমাদের তিন হিচককের ( public, private ও professional ) পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে ভাবতে হয়। তাঁর Rear Window ( ৫০ ) ছবির নায়ক জেম্‌স স্টুয়ার্ট দূরবীন দিয়ে একবার একটি তরুণীকে পোষাক বদল করতে দেখে ; পিঠোপিঠি তার মুখের যে ক্লান্ত আপ দেখানো হয় তাতে স্টুয়ার্টের অভিব্যক্তি কামের। পরে সে দেখে এক মা ও শিশুকে ; এখানে ক্লান্ত আপে স্টুয়ার্টের অভিব্যক্তি মমতার। মজা এই যে উভয় দৃশ্যে স্টুয়ার্টের একই ক্লান্ত শট ব্যবহার করা হয়েছিল। রাশিয়াতে কুলেশভের স্মৃৎসিদ্ধ মুখ + খাত = ফুধা পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা জানার আগেই হিচকক জেনে গিয়েছিলেন যে দর্শক তার নিজের অন্তর্ভুক্তি কুশীলবের উপর আরোপ করে। কর্মজীবনের একেবারে গোড়ার দিকে ফেমাস স্টুডিওর টাইটেল বিভাগে কাজ করার সময় তিনি বহু অসফল বিয়োগান্ত ছবিকে কেবল টাইটেল বদল করে সফল কমেডি ছবিতে পরিণত করেছিলেন। চলচ্চিত্রে খোদার উপর খোদকারি হিচককের একেবারে প্রাথমিক শিক্ষা।

হিচ্‌ক কখনো নিজেকে সীরিয়স শ্রষ্টা হিসাবে দাবী করেননি। ক্রফোকে তিনি বলেছিলেন তাঁর একমাত্র লক্ষ্য আরও বেশি দর্শককে চলচ্চিত্রের দিকে আকর্ষণ করা, চিত্রগৃহের সব আসন পূর্ণ করা। তাহলে কি হিচ্‌কক নিছক প্রমোদবিহারী? টেলরের শ্রদ্ধাপূর্ণ জীবনীগ্রন্থেও হিচ্‌কককে দার্শনিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার কোনো চেষ্টা নেই। তাঁর কাছে হিচ্‌কক এক আশ্চর্য শিল্পী, কিন্তু এক ত্রস্ত ও শঙ্কিত শিল্পী যিনি চলচ্চিত্র নামক মাধ্যমটিতে দু-একবার দু-একটা স্বীকারোক্তি করেছেন, আবার ওই চলচ্চিত্রের মাধ্যমকেই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন শত্রুভাবাপন্ন পৃথিবীর মোকাবিলা করার জন্ত।

অত্যাচ ছবি : ব্ল্যাকসেল ( ২৯ ), The Man who Knew Too Much ( ৩৪ ও ৫৬ ), দি থার্টী-নাইন স্টেপ্‌স ( ৩৫ ), দি লেডি ভ্যানিশেস ( ৩৮ ), রেবেকা ( ৩৯ ), Saboteur ( ৪২ ), স্পেলব্যাউট ( ৪৫ ), স্ট্রেঞ্জার্স অন এ ট্রেন ( ৫১ ), ডায়াল এম ফর মার্ভার ( ৫২ ), ভার্টগো ( ৫৮ ), নর্থ বাই নর্থ-ওয়েস্ট ( ৫৯ ), সাইকো ( ৬০ ), দি বার্ডস ( ৬৩ ), টর্ন কার্টেন ( ৬৬ ), টোপাজ ( ৬৯ ), Frenzy ( ৭২ ), Family Plot ( ৭৬ )। হিচ্‌কক টেলিভিশনের জন্ত ১৯৫৫ সাল থেকে পরবর্তী দশ বছরে 'আলফ্রেড হিচ্‌কক প্রজেক্টন' নামে ৩৬৫টি এপিসোড প্রযোজনা করেন। যার মধ্যে ২০টি তিনি নিজেই পরিচালনা করেছিলেন।

সম্পর্কিত গ্রন্থ : ফ্রান্সোয়া ক্রফোর হিচ্‌কক ও জন রাসেল টেলরের হিচ্‌ ।

অমিয় বসু

॥ হিরোশিমা মনু আয়ুর ॥

১৯৫৯, ফ্রান্স / জাপান। রেনের প্রথম কাহিনীচিত্র। হিরোশিমার ধ্বংসাত্মক চেহারার পাশাপাশি সেই ভয়ঙ্কর সর্বনাশের সঙ্গে চূড়ান্ত ক্ষমতায় প্রেমের গল্পকে জুড়ে দিয়েছেন রেনে। চেতন অবচেতন, অন্তর্জগৎ বহির্জগতের মাঝখানের সীমারেখা ভেঙে গেছে। আধুনিক হিরোশিমার পটভূমিতে বলা হয়েছে এক ফরাসি মহিলা ও তার জাপানি প্রেমিকের গল্প। পুরুষ ও মহিলা দুজন কেউ কাউকে এই সাক্ষাতের আগে চাখেনি। একদিনের মধ্যেই মহিলাকে ফ্রান্সে ফিরে যেতে হবে। ছবির কেন্দ্রীয় ঘটনা গতি লাভ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। চোদ্দ বছর আগে, মহিলার বয়স যখন কুড়ি, এক জার্মান সৈনিকের জন্ত তার তখনকার ভালোবাসার কথায়, সেই স্মৃতির টুকরো সেই ইমেজগুলি পর্দায় ভেসে ওঠে। জাপানি প্রেমিককে মহিলাটি তার নেভার্সের প্রেমের কথা বলে।

নেতারা ঐ নারীর সঙ্গে একাত্ম, হিরোশিমা এই পুরুষের সঙ্গে। যা দুটি ভিন্ন পরিস্থিতিতে দুটি বাস্তবতার ছবি ফুটিয়ে তোলে। নারীর একান্ত ব্যক্তিগত শোক এখানে বেশি মূল্যবান, কারণ সেখানেই তার পরিচয়ের চাবিকাঠি রয়েছে। এখনও সে তার প্রথম প্রেমে বিশ্বাসিত। জাপানি প্রেমিক এটা অনুভব করে, সে এমনভাবে কথা বলে যেন সেই জার্মান সৈনিক। কারণ এটাই একমাত্র রাস্তা যেখান দিয়ে সে নারীটির কাছে পৌঁছতে পারে, একটা গোটা সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। রেনে চেয়েছেন দুটো গল্পের, দুটো প্রেমের মধ্যে সম্পর্ক ছবিতে গড়ে তুলতে। দুটি কাহিনী এমনভাবে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে যে ছোট্ট হরটাই, মেয়েটির ঐ স্মৃতির আচ্ছন্নতা, ঐ আবিষ্টতা শেষ পর্যন্ত ছবিটির হৃদয়ে মোচড় দেয়। লোকটা তাকে হিরোশিমায় থাকতে বলে, সে রিফিউজ করে।

আধুনিক চলচ্চিত্র ভাবনায় ঐতিহাসিক কাঠামো উন্মোচনে এই ছবির গুরুত্ব অসাধারণ। দুটি নারী পুরুষকে তাদের সম্পর্কের মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে, যা ইন্ডিয়গ্রাফ, বিশুদ্ধ, যেখানে সৌন্দর্য অনিবার্য। তারা মিশিত হয়, তারা সরে যায়, সেই শহর যা পারমাণবিক বিধ্বস্ততার প্রতীক, সেখানে, যা খুলে দেয় তাদের হতাশার বাঁটি উৎসটা। নিঃসঙ্গতার ওপরে তাদের সাময়িক জয়, আত্মগত মাত্র, একেবারেই ব্যক্তিগত, ইতিহাসের বিরুদ্ধে এটা একটা বিদ্রোহ, সবশেষে কিন্তু তাদের ফিরে যেতেই হবে অতি সাধারণ সেই জীবনের শূন্যতায়। এই ছবি বিচ্ছিন্নতা বিষয়ে ছবি, সংযোগ বিষয়েও।

অভিনয়ে E. Riva, E. Okada, B. Fresson ; চিত্রনাট্য মার্গেরিৎ ডুরাজ, চিত্রগ্রহণ S. Vierny, T. Michio ; শিল্প এসাকা, মেয়ো, পেত্রি ; সংগীত G. Fusco, G. Delerue ॥

**প্রায় শূন্য**

॥ হ্যামলেট ॥

১৯৬৪, সোভিয়েত রাশিয়া। [কোজিনৎসেভের হ্যামলেট অসাধারণ। কারণ শেক্সপিয়ারের সাহিত্যকে এত দক্ষতার সঙ্গে ‘Visual content’-এর জগতে অনুবাদ করা হয়েছে যে কখনও হ্যামলেট কাব্যরসের অনুভব কমে গেছে বা থমকে যেতে হয়েছে, এরকম ঘটেনি। অথচ এরকমও মনে হয়নি যে দূর কোনো ক্লাসিক পৃথিবীর চিত্ররূপ আমাদের শুধুমাত্র অজানা আগ্রহের টানে বসিয়ে রেখেছে। হ্যামলেট অসম্ভব সমসাময়িক, অত্যন্ত মানবিক। কারণ, মানবিকতার শর্তই হলো কারাগার চূর্ণ করা, পৃথিবীটাকে পার্টানো—হ্যামলেট সেই চেষ্টায়

কোনো ত্রুটি রাখেনি। টাইটেলের পাথর আর মশালের আঙুন—কারাগার আর মুক্ত চেতনার এক নিঃশর্ত ডায়ালেকটিক। হ্যামলেট বনাম অন্ডায়-আর ত্রাসের রাষ্ট্রশক্তি। উইটেনবার্গের ছাত্র হ্যামলেট, মার্টিন লুথার, ডঃ ফনটাস। হ্যামলেটের মধ্যে রেনেসাঁস ও প্রোটেষ্ট্যান্ট বিশ্বচেতনা মিশে যায়। হিউম্যানিটাস বনাম ফেরিটাসের লড়াই। আজকের সঙ্গে এর তফাৎ কোথায়?—ন. ভ.]

হ্যামলেট, রুথ হ্যামলেট, কোজিনৎসেভের হ্যামলেট দেখলাম, স্মৃতির গুপ্তধা হলো। ট্রাজিক সংবিৎ মানুষকে পরিশুদ্ধ করে, কোনো সাহিত্যতাত্ত্বিক বিতর্কের মধ্যে না গিয়েও অন্তত এটুকু বলা যায়। এই হ্যামলেট আমায় বিশেষভাবে প্রাচ্যস্বভাবের কথা মনে করিয়ে দেয়। বঙ্কিমচন্দ্ররা যেভাবে দেশদিমোনা, শকুন্তলা ও মিরান্দার সরল সমীকরণ করতেন তেমন স্থূলভ সমাধানের স্পষ্টতা নেই এখানে। তবু একটা এপিক স্কেলের ব্যাপার আছে, রুথরা উপস্থাস দিয়ে তার কিছুটা মেপেছেন, তাঁদের শেক্সপিয়ার চর্চা আরেকটা পরিমাপ। জার্মানরা এবং রুথরা যেভাবে তাঁকে নিয়েছেন, নিতে পেরেছেন, বলতেই হয়, স্তম্ভন আর কেউ না। আর আকস্মিকও বলা চলে না যোগাযোগটাকে। প্রাণের বিশাল প্রাচুর্যের সঙ্গে শেক্সপিয়ার মেলেন, মহাভারত মেলে। হ্যামলেট হোরেশিও কবর খুঁড়িয়ে মানুষটি বারবার একটা টানটান বৌদ্ধ বেদনার তারে ঘা দেন। এটাকে প্রাচ্য কেন বলছি, জিগেন্দ করলে অবশ্য এখনই বলতে পারবো না। ইতিহাসের বিড়ম্বনা এই হ্যামলেটের রুথ অসুবাদে জন্ম এঁদের নির্ভর করতে হয়েছে পাস্তেরনাকের উপর। তরুণ হ্যামলেটের মুখ এখানে পাস্তেরনাকের আদলে তৈরি মনে হয়। পাস্তেরনাকদের সময়টা এরকমই একটা মূর্ত ক্ষয়িষ্ণু মুহূর্ত। তাঁর সঙ্গীরা একে একে খশে গেলেন। পাস্তেরনাক একা রাত জেগে বসে রইলেন। জিভাগো হ্যামলেটের এক আধুনিক রুথ সংস্করণ বোধ হয়। পাস্তেরনাকের জীবনের বিনিময়ে জিভাগোর জীবন ও কবিতা পাওয়া গেলো। জীবন ও শিল্পের এই বিনিময় আছে খুব কম লেখকের রচনায়। রিলকে মান পাস্তেরনাকের মতো জার্মান রুথ মানস ছাড়া তার বিশেষ খোঁজ পাই না। হ্যামলেটে জীবন এবং শিল্পের অবিরল স্থানবিনিময় আছে, এবং এই তৃতীয় মাত্রাই কোজিনৎসেভের হ্যামলেটকে রসোসীর্ণ করে তুলেছে মনে হয়।

অভিনয়ে শ্বোকভুনোভস্কি, নার্ভানভ, Radzin ; চিত্রগ্রহণ I. Gritsyus, সংগীত সোস্টাকোভিচ ॥

বীতশোক ভট্টাচার্য

## ॥ চিত্র-পরিচিতি ॥

১এ. চলচ্চিত্রের গতি আদলে গতিশীলতার বিভ্রম। অবস্থানের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিবর্তনশীল স্থিরচিত্র অতি দ্রুত পর্দায় ফেলে এই গতিশীলতার বিভ্রম আনা হয়।  
১বি. উপযুক্ত কম্পোজিশন চলচ্চিত্রের ফ্রেমকে পেষ্টিং করে তুলতে পারে। এই ছবিতে আরো এসেছে স্থান-কাল-নিরপেক্ষ এক বিঘূর্ত চেতনা। বার্গম্যানের দি সেভেন্থ সীল চিত্র থেকে।

২এ. ক্লোজ আপের (বিগ ক্লোজ আপ) নাটকীয়, আবেগ-সমৃদ্ধ অভিব্যক্ত। ডেয়ারের প্যাশন অব জোয়ান অব আর্ক থেকে, যেখানে জোয়ানকে বধ্যভূমির জন্তু তৈরি করা হচ্ছে।

২বি. ক্লোজ আপ অভিব্যক্তির প্রতিটি ডিটেলকে প্রকাশ করে। আইজেনস্টাইনের আইভান দি টেরিবল ছবির এই বিগ ক্লোজ আপ একই সঙ্গে শক্তিশালী ও সংবেদনশীল প্রয়োগ।

৩এ. লোকেশনের সুবিধা হলো ল্যাণ্ডস্কেপের আবেদন ও প্যানোরামিক শটের প্রসার দুইই পাওয়া যায় এতে। লোকেশনের কৃতিত্বপূর্ণ ব্যবহার ঘটেছে ফোর্ডের স্টেজকোচ ছবিতে।

৩বি. লোকেশন তথা নেচারকে একটা প্রধান মোটিফ করে তুলতে পেরেছিলেন কুরোশাওয়া দি সেভেন সামুরাই ছবিতে।

৪এ. ক্যামেরাকোণের সূত্র প্রয়োগ কম্পোজিশনকে জ্যানিতিক ভাবে সংবদ্ধ করে। এটি ক্যামেরার আপ্ ওয়ার্ড অ্যাঙ্গেল শট।

৪বি. ওয়েলদের মিটিজেন কেন ছবিতে আপ্ ওয়ার্ড অ্যাঙ্গেল শট। দৃশ্যগত ভাবে একটা ভল্যুম ও ডেপ্থ এসেছে এর ফলে। এ রকম শট ওয়েলদেরও আগে শিল্পসম্মত করে ব্যবহার করেছেন ওজু।

৫এ. স্ট্রাইইমের গ্রিড ছবি থেকে। লালসা ও মানবিক অবনতির এই বলিষ্ঠ ও অতিবাস্তব চিত্রে 'য' পাওয়া যায় তা হলো এপিক থীমের শক্তি।

৫বি. গ্রিফিথের ইনটলারেন্স ছবি থেকে। অসাধারণ গঠন-স্বষমার এই ছবিতে থীম হলো মানুষে মানুষে ঘৃণা ও বিদ্বেষের আর সামাজিক অত্যাচার ও অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক শুভেচ্ছা ও বন্ধুতার জয়গান।

৬এ. স্থপার ইম্পোজিশন। অবচেতনের প্রকাশ হিশেবে ওইডো জেবার-এর তোলা বহু স্বপ্নদৃশ্যের একটি।

৬বি. এক্সপ্রেসনিজমে মানুষের চেয়ে সেট-সেটিং ও অলৌকিকের প্রাধান্য বেশি। স্থিনের দি ক্যাবিনেট অব ডক্টর ক্যালিগারি ছবি থেকে।

৭এ. হিচককের জগৎ অপরাধ ও আতঙ্কের জগৎ, হয়তো তার সঙ্গে কিছুটা ফার্সও মেশানো। হেলিকপ্টার (প্রাগৈতিহাসিক আকারের যন্ত্রকীট?) তাড়া করেছে মানুষকে, দি নর্থ বাই নর্থ-ওয়েস্ট ছবি থেকে।

৭বি. এর বিপরীত যেকৃত্তে মিরাকল ইন মিলানের জগৎ, বাস্তব ও ফ্যানটাসি, গল্প ও কাব্যের নিও-রিয়ালিস্ট মিশ্রণ।

- ৮এ. চলচ্চিত্রে নারী চরিত্রের চিত্রণ। রোজেলিনির ছবিতে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে পরাধীন নারী। ফল : অসহায়তা।
- ৮বি. নারী চরিত্র—শ্রমের ছবিতে। অর্থনৈতিক ভাবে স্বাধীন নারী, কিন্তু যৌন ও মনস্তাত্ত্বিক কারণে বিচ্ছিন্ন। ফল : নিঃসঙ্গতা।
- ৯এ. ডায়নামিক পেস্টিং কখনো কখনো সিনেমার মতো গতি ও গতিভঙ্গির বিভ্রম আনতে পেরেছে। ১৯০৭য়ে ঝাঁকা জিয়াকোমো বাল্লার ছবি।
- ৯বি. শ্রাভো থিয়েটার এবং ফিল্ম—দুটি শিল্পরূপই আলোর উপর নির্ভরশীল। দুটির বিকাশের মধ্যে কিন্তু রয়েছে কয়েক শতাব্দীর ব্যবধান। ১৮৪২ সন নাগাদ আলজিয়ার্গে অস্থায়ীভাবে একটি ছায়ানাটকের দৃশ্য।
- ১০এ. ‘...man reduced in relation to objects’. রেগের স্তাভিস্কি...ছবি থেকে স্থিরচিত্র।
- ১০বি. ...man enlarged in relation to objects.
- ১১এ. চলচ্চিত্রে শিশু চরিত্রের চিত্রণ। ইভেন্সের ছবিতে। এই শিশু দরিদ্র, কিন্তু জীবনের প্রতি কৌতূহলে টান পড়েনি তার ফলে।
- ১১বি. ক্রফোর ছবিতে। নিঃসঙ্গ ও অস্থায়ী কাটে এর শৈশব। ফল : বিচ্ছিন্নতা।
- ১২এ. উপযুক্ত কম্পোজিশন কীভাবে ছবিতে সঠিক পরিবেশ ও সেন্স এনে দেয়।
- ১২বি. সঠিক শট ছবিতে নিয়ে আসে আয়তন ও প্রসারের ধারণা। প্রিজনারস অব ওয়্যার ছবিতে ডাউনওয়ার্ড অ্যান্ডেল শট।
- ১৩এ. ফ্যানটাসি—সাররিয়ালিজম প্রভাবিত—বুয়েলের বেল ডু ছুর ছবিতে।
- ১৩বি. মীথ ও মরালিটির সংঘর্ষের প্রকাশে ফ্যানটাসি—অবচেতন প্রভাবিত—ফেলিনির স্চারিফন ছবিতে।
- ১৪এ. হিংস্রতা আধুনিক অস্তিত্ববাদের লক্ষণ। গদারের ছবিতে তা কমিক, স্টাইলাইজড, প্রোটোটাইপ বা আলঙ্কারিক। দি লিটল সোলজার ছবির স্থিরচিত্র।
- ১৪বি. violence in the name of law and order. হাউফের দি ক্রটালাইজেশন অব এফ. ব্লুম ছবির স্থিরচিত্র।
- ১৫এ. নগ্নতার স্বয়ম। নৃত্য ও ছন্দ শিগ্গার স্কুল : হেগে ৭২ ক্রাফ্ট উন্ট্-শ্চোণ্-হাইট ( ১৯২৫ )—এর অর্থ শক্তি ও দৌন্দর্যের পথে।
- ১৫বি. মাকাভেলিকের দি সুইচবোর্ড অপারেটর ছবির স্থিরচিত্র। প্রেম ও যৌনতাকে সমাজ কী করে প্যাথলজির স্তরে নামিয়ে আনে তার বর্ণনা আছে এই ছবিতে।
- ১৬এ. সৈকত ভট্টাচার্যের অবতার ছবিতে মাধবী মুখোপাধ্যায়—ভারতীয় নারীর এক রূপের চিত্রণে।
- ১৬বি. মৃগাল সেনের ভুবন সোম ছবিতে মহাদিনী মূল—ভারতীয় নারীর আরেক রূপের চিত্রণে।



একনজরে বাণীশিল্পের চলচ্চিত্র ও ফোটোগ্রাফি বিষয়ে অগ্রান্ত বই

ফিল্ম সেন্স [ ১৯৮৬ ]	সেগেই আইজেনস্টাইন	৩০°০০
চালি দি কিড [ ১৯৮৩ ]	সেগেই আইজেনস্টাইন	১০°০০
আইজেনস্টাইন [ ১৯৮৬ ]	সম্পাদনা : দিলীপ মুখোপাধ্যায়	২৫°০০
লিখেছেন : মারী সীটন উৎপল দত্ত ভাদ্রাদিমির নিঝনি গান্ত' রোবের্জ		
সিনেমার কথা [ ২য় সংস্করণ / ১৯৯৫ ]	গান্ত' রোবের্জ	১০০°০০
নতুন সিনেমার সন্ধান [ ১৯৮৪ ]	গান্ত' রোবের্জ	২৫°০০
নিজের কথা [ ২য় সংস্করণ ১৯৯৫ ]	আইজেনস্টাইন, চ্যাপলিন, প্রমুখ	৫০°০০
গদার [ ১৯৮৫ ]	দিলীপ মুখোপাধ্যায় প্রলয় শূর গান্ত' রোবের্জ প্রমুখ	১৫°০০
সত্যজিৎ [ ১৯৮৬ ]	দিলীপ মুখোপাধ্যায়	৩০°০০
ঋত্বিককুমার ঘটক [ ১৯৮৮ ]	সম্পাদনা : অতনু পাল	৩৫°০০
লিখেছেন : রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রলয় শূর, সুবিমল মিশ্র, ক্রম গুপ্ত, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, ইরবান বহুরায়, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয় বাগ'চী, প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য ও ঋত্বিককুমার ঘটকের সঙ্গে সুদীর্ঘ সাফাৎকার প্রবীর সেন, চিত্রনাট্য : 'দি কোয়েশ্চন' ঋত্বিককুমার ঘটক।		
মৃগাল সেন [ ১৯৮৭ ]	সম্পাদনা : প্রলয় শূর	৩০°০০
নতুন বাংলা সিনেমা [ ১৯৮৪ ]	ধীমান দাশগুপ্ত	২২°০০
চলচ্চিত্র সমালোচনা ৪০ [ ১৯৮৭ ]	সম্পাদনা : উত্তম চৌধুরী	৩৫°০০
লিখেছেন : সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃগাল সেন, বুদ্ধদেব বসু, গুরুদাস ভট্টাচার্য, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, উৎপল দত্ত, কিরণময় রাহা, গান্ত' রোবের্জ, মৃগাক্ষশেখর রায়, পূর্ণেন্দু পত্রী, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, ইরবান বহুরায়, সোমেন ঘোষ, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, নেত্যাশ্রয় ঘোষ, ধীমান দাশগুপ্ত প্রমুখ ৪০ জন খ্যাতনামা সমালোচক।		
চলচ্চিত্রের টেকনিক ও টেকনোলজি [ ৩য় সংস্করণ / ১৯৯৫ ]		
	বাণীশিল্প সংকলন	১২৫°০০
তথ্যচিত্র পরিচালনা ও নির্মাণ [ ১৯৮৮ ]	সম্পাদনা : অজয় সরকার	২৫°০০
গৃহযুদ্ধ : চিত্রনাট্য [ ১৯৮৮ ]	বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত	১২°৫০
কম্পোজিশন [ ১৯৮৭ ]	ধীমান দাশগুপ্ত	২৫°০০
চিত্রনাট্য রচনা ও চিত্রনাট্য বিশ্লেষণ [ ২য় সংস্করণ/১৯৮৯ ]	ধীমান দাশগুপ্ত	৪০°০০
টিভি প্রযোজনা ও টেলিভিশন [ ১৯৮৮ ]	ধীমান দাশগুপ্ত	২৫°০০
স্বপ্ন, সময় ও সিনেমা [ ১৯৯৪ ]	বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত	৩০°০০
তাহাদের কথা : চিত্রনাট্য [ ১৯৯৩ ]	বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত	২০°০০
সিনেমার আঙ্গিক [ ১৯৯৩ ]	ধীমান দাশগুপ্ত	৫০°০০
ফোটোগ্রাফি-অভিধান [ ২য় সংস্করণ/১৯৯৪ ]	রবি দত্ত	৮৫°০০

